সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ | দ্বিতীয় সংখ্যা

কোন রোগ ?

শ্রীশৈলবালা ঘোষ-জায়া

সাধারণ অবিবেচক মানুষ মাত্রেরই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে। তাহারা যার কাছে এতটুকু উপকার পায়, তার কাছেই এতখানি বেশী উপকার পাইবার দাবী করিয়া বসে। এ জুলুম যে তাহাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নয়, নিজেদের অসমর্থতার গ্লানি মোচনের উদ্যম ও সাধনাই যে তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, এ কথা আলস্য-বিলাসী, পরনির্ভর-শীলতা-প্রিয় মানুষরা বুঝিতে চায় না। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বৃথা আত্মাভিমানবশে তাঁহারা যা কিছু সিদ্ধান্ত করে, তাহাই চরম সত্য। অর্থাৎ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষা পাওয়াই তাহাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত, ভিক্ষাদাতার অসামর্থ্য অনিচ্ছা, বিরক্তি, বা বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের কাছে বিস্ময় ক্ষোভ ও নিরাকার অদৃষ্টদোষ মাত্র।

দেশের পুলিশের সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মনোভাব যে অনেকটা এই রকম হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা লইয়া সেদিন আলোচনা চলিতেছিল।

সিংহবাবুদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে একটা শুভ-বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি আত্মীয়-কুটুম্ব সমবেত হইয়াছিলেন। গতকল্য বিবাহ চুকিয়াছে, আগামী কল্য পাকস্পর্শ। পাকস্পর্শের আয়োজন বিরাট; সন্ধ্যার পর বর্ষিয়সী মহিলারা একতলার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া পরদিনের জন্য তরকারী কুটিতেছিলেন। কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালক ও যুবক আত্মীয়, ছাদের অন্যপ্রান্তে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন। সদর বাটীতে কর্ত্তা-ব্যক্তিদের সভা বসিয়াছে। তে-তলার ছাদে নব বধূকে লইয়া অল্প বয়স্কারা আনন্দ করিতেছেন, সুতরাং এই [illegible]টি আর কোথাও মনোমত আশ্রয় না পাইয়া এইখানে আড্ডা জুটিয়াছে।

গ্রীষ্মকাল, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মিট্ মিট্ করিয়া তারাগুলি জ্বলিতেছিল। একটা গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া ছাদের মাঝখানে রাখিয়া তার চারিদিকে ঘেরিয়া পাঁচ সাতখানা বঁটি পাতিয়া বসিয়া, মেয়েরা কুটনা কুটিতে কুটিতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন।

ছেলেরা দূরে বসিয়া রাজনীতি ও দেশ, বিদেশের নানা কথা আলোচনা করিতেছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে এদেশী ও বিদেশী পুলিশের কার্য্য পদ্ধতির ধারা সম্বন্ধে তুলনা মূলক সমালোচনা আরম্ভ হইল।

ভারত সম্রাটের খাস রাজধানী লণ্ডন সহরে সামান্য কনেষ্টবলদের কনেষ্টবলী বিদ্যায় সুশিক্ষা-দানের জন্য কি সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে,—কি চমৎকার প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া তাহাদের নির্ভীক, সত্যসন্ধ, সূক্ষ্ম-ন্যায়পরায়ণ এমন কি আইনজ্ঞ ও সদ্যঃ আহতের চিকিৎসা ব্যাপারেও অভিজ্ঞ করিয়া তোলা হয়,—তাহাদের সভ্যতা ভব্যতা কতদূর মার্জ্জিত রুচি সঙ্গত ও উন্নত করা হয়, একটি নবীন উকীল তাহারই বর্ণনা করিতেছিলেন।

সে দেশের কনেষ্টবলদের চরিত্র গঠনের জন্য এবং মনুষ্যোচিত কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জনের জন্য সে দেশে কত যত্ন লওয়া হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিতে শুনিতে বালক বিহারীলাল ঘোষ [illegible]

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আর আমাদের দেশের পুলিশের কর্তারা? এঁরা শুধু তিনটি গুণ দেখে—যত রাজ্যের গুণ্ডাকে পুলিশের কনেষ্টবলীতে ঢোকান একটি গুণ, সে মনুষ্যত্বহীন, 'পাহাড়ে' বজ্জাত কি না? দ্বিতীয় গুণটি সে সাফাই হাতে ঘুস নিয়ে, উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাতে জানেন কি না? তিন নম্বর গুণ, সে বিনা প্রমাণে সন্দেহমাত্রেই নিরপরাধ ভদ্রলোকের ছেলের গলায় হাত দিতে পারে কি না! এই তিনটি গুণ থাকলেই ব্যস্ কেল্লা মার্ দিয়া!"

বিহারীর বয়স বছর চৌদ্দ, সে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাহারা কলিকাতায় থাকে। কলিকাতার প্রহরীদের সে নাকি ভালরকমই চেনে।

বিহারী যখন কথা বলিতেছিল, তখন ডাক্তারী বিদ্যালয়ের ছাত্র মোহনলাল তার চশমা জোড়ার ভিতর হইতে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে,—বিহারীর করুণ ভাবোদ্দীপক মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। বিহারীর নিগূঢ় মর্ম্মব্যথার কারণটা মোহনের জানা ছিল। হঠাৎ সে সরিয়া আসিয়া বাঁ হাতে বিহারীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কর্কশ সুরে খোট্টাই টানে বলিল, "এই খোঁখা,—ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল' কিনিয়েসিস্?"

বিহারীকে কে যেন জলবিছুটি মারিল! মুহূর্ত্তে ভীষণ বিক্রমে ছটফট করিয়া, মোহনের বাহু-বন্ধন হইতে নিজের কণ্ঠ মুক্ত করিয়া সক্ষোভে বলিল, "আঃ, ছাড় মোহন দা, কি ফক্কুড়ি করো? যাও!"

মোহন মজলিসে সমাগত সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা ওকে জিজ্ঞাসা করুন, —'ক্যা টাকা দিয়ে সাল্ কিনিয়েসিস্' কথাটার মানে কি?"

বিহারী সক্রোধে বলিল, "হুঁ্যাঃ! জিগেস্ করবেন! করুন না, আমি চল্লুম!"

সে সবেগে স্থান ত্যাগে উদ্যত হইল। সকলে তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মনঃক্ষোভ দূর করিবার জন্য সময়োচিত সান্ত্বনা দিয়া সকলে মোহনের অন্যায় স্বীকার করিলেন। ছোটদের ক্ষেপাইয়া মজা দেখা, মোহনের একটা পুরাতন ব্যাধি বলিয়া, এক বর্ষিয়সী আত্মীয়া তিরস্কার ও করিলেন। মোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু পুলিস কনেষ্টবলদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার কথা স্বীকার কর্‌তে ওর লজ্জাই বা কেন? ওঃ, বেচারীর সেই শীতের রাত্রের,—সেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত খুনী আসামীর মত মুখের ভাবটা,—আমার আজও মনে পড়ে! মোষ্ট প্যাথেটিক্ সিন্!"

বিহারীর ক্ষোভের উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে একজন বলিলেন, "ব্যাপারটা কি হয়েছিল হ্যাঁ মোহন?"

মোহন বলিল, "গেল বছর শীত কালের কথা। বোধ হয় ডিসেম্বর মাস হবে। ওর স্কুলের এগজামিনের তাড়া পড়েছে, অনেক রাত অবধি জেগে রোজ পড়াশুনো করছে। একদিন রাত সাড়ে দশটার সময় পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ ওর কি একটা পাঠ্য পুস্তকের দরকার হয়। বইখানা ওর এক প্রতিবেশী ক্লাসফ্রেণ্ড চেয়ে নিয়ে গেছ্‌ল, বিকেলে ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল বুঝি,—কিন্তু দেয় নি।

—"বন্ধুর বাড়ী ওদের বাসার খান পাঁচ ছয় বাড়ীর পর, একটা গলির মধ্যে। এগজামিনের পড়াটা তখুনি ঠিক করে রাখ্‌বে, মনস্থ করে—বিহারী সেই রাত্রেই বইখানা আন্‌তে বন্ধুর বাড়ী গেল।"

—"তাড়াতাড়ির জন্যে ভুলেই যাক্, কিম্বা কাছেই বন্ধুর বাড়ী ভেবে হোক, ও বেচারী

জুতো না পরে,—খালি পায়েই গেছল। গায়ের কোট খুলে রেখেছিল, শুধু গেঞ্জীর ওপরে সবুজ রংয়ের একটা র‍্যাপার ছিল।"

—"বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লে, বৈঠকখানার দুয়ার বন্ধ। জানালা খোলা ছিল, ভিতরে আলো জল্‌ছিল। যদি ঘরে কেউ থাকে, তার কাছে বইখানা চাইবে,—ভেবে, ও বেচারী বৈঠকখানার বারাণ্ডায় উঠে, জানালা দিয়ে উঁকি দিলে। দেখ্‌লে, ঘরে কেউ নেই। ও ভাব্‌লে বন্ধুটি বোধ হয় তার অভিভাবকদের সঙ্গে আহারের জন্যে অন্তঃপুরে গেছে। অতএব এ সময় তাঁদের ডাকাডাকি করে, বইয়ের জন্যে বিরক্ত করাটা ভদ্রতা নয়। ফিরে যাওয়াই ভাল।

নিঃশব্দে ফির্‌ল্। গলির মোড়ে এসে দেখে একজন গোট্টা কনেষ্টবল ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে, এক মনে এক ধ্যানে খৈনি মর্দ্দনে নিবিষ্ট। সে যে এতক্ষণ ওর ওপর গোয়েন্দার দৃষ্টি পেতেছিল, কার সাধ্য তা বিশ্বাস করে! বিহারী কাছাকাছি হতেই কনেষ্টবলটা হঠাৎ এগিয়ে এসে বিনা দ্বিধায় হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল্‌!

বিহারী চম্‌কে উঠ্‌ল! মেজাজ কেমন তিরিক্ষে দেখছেনই ত! বিরক্তির মাথায় দাঁত খিঁচিয়ে, একটা অনাবশ্যক দীর্ঘ ঈকার যোগ দিয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, "কী ?"

কনেষ্টবল পরম গম্ভীর চালে, ওর র‍্যাপারটা দেখিয়ে মুরুব্বিয়ানা স্বরে বল্‌লে, "এই খোঁধা— এ সাল্‌ কোথা পেলি।"

হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে এবং এই অপমানসূচক প্রশ্নে অত্যন্ত চটে-মটে, ও ফস্‌ করে জবাব দিলে, "কেন ? আমি কিনেছি!"

অভিভাবকদের বাদ দিয়ে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে নাবালকের নিজের কর্তৃত্ব জাহির করাটা কনেষ্টবলী আইনে বোধ হয়, ওর বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গেল। কনেষ্টবলটি ব্যাজ স্বরে বল্‌লে "ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল্‌' কিনিয়েসিস্‌ ?"

মূল্যের অঙ্কটা ওর জানা ছিল না, এবং তখন বোধ হয় ওর চেতনা হোল যে ক্রয় ব্যাপারের ও যখন বিন্দু বিসর্গও জানে না, তখন সে দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে টেনে নেওয়া সুবুদ্ধি হয় নি! ওর নিজের কথাটা ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বুঝে,— বিহারীর মাথা বিগড়ে গেল—"

বিহারী সজোরে প্রতিবাদ করিল, "মাথা বিগড়ে গেল ? কক্ষণো নয়! আমি এমন 'ভয় তরাসে' নয় ?"

মোহন মৃদু হাসিয়া বলিল "তাহলে বোধ হয় সাহসের দাপটেই, মহামহিমার্ণব শ্রীমান্‌ বিহারীলাল কিঞ্চিৎ আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।"

বিহারী অধিকতর জোরে বলিল, "আত্ম-হারা ?—কিছুতেই নয়! আমি—"

মোহন বলিল "I beg your pardon! তাহ'লে,—আত্ম-বিস্মৃত! যেহেতু পাহারাওলাটা যখন পুনশ্চ রসিকতা করে বল্লে, "সাল্‌ কিনিয়ে-সিস্‌, না 'চোরি' করিয়েসিস্‌ ? ওই বাড়িমে কি 'চোরি' করতে গিয়েছিলি ?" তখন স্তম্ভিত বীরপুরুষ নিজের চৌর্য্যবিদ্যার অপটুত্বের প্রমাণ স্বরূপ ক্ষীণকণ্ঠে শুধু জবাব দিলেন,—"আমি চোর নয়। আমি বাবুদের বাড়ীর ছেলে।"

বিহারী ক্ষোভ-কাতর কণ্ঠে বলিল— "কিন্তু হতভাগা মেড়ো কি তা বিশ্বাস করে ?"

নবীন উকীল বলিলেন, "ততটা আশা করা উচিত নয়। কারণ তারা পুলিশের নিম্নশ্রেণীর প্রহরী মাত্র। লোকের মুখ দেখে চরিত্র অনু করা তাঁদের সাধ্যাতীত। কিন্ত

যে সত্যিই 'বাবুদের বাড়ীর ছেলে' সেটা প্রমাণ করবার জন্যে তোমার বন্ধুর বাড়ীর ভদ্রলোকদের ডাকলে না কেন ?"

অধৈর্য্য হইয়া বিহারী বলিল, "ডাকব কি ? তাঁরাও পাহারাওলার কথা শুনে যদি আমায় সন্দেহ করতেন ? তা হ'লে ?"

সকলে হাসিলেন। মোহন কপট সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তা হ'লেই ত বেচারাকে সদ্য জেলে যেতে হোত! বিহারী আত্মবিস্মৃত নয়, আত্ম-জ্ঞানী পুরুষ!"

নবীন উকীল বলিলেন, "তারপর ?"

মোহন বলিল, "তারপর বুদ্ধিমান বিহারী ও ততোধিক বুদ্ধিমান খোট্টা বাবাজীর মধ্যে আইন জ্ঞানের গবেষণা সুরু হোল। আইনের সূক্ষ্ম জটিল রহস্য ভেদে দু'জনেরই কাণ্ডজ্ঞান সমান; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটার কি যে নিষ্পত্তি হোল, কেউ বুঝলে না। পাহারাওলাটি বোধ হয় ভেবে চিন্তে দেখলে, সে সরকারের নিমকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথোচিত মাত্রায় দুর্ব্বৃত্ত দমন করেছে, রাজ্যে আর চোর ডাকাতের ভয় নেই,—সুতরাং ভদ্রদস্তুর প্রথায় কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই সে গম্ভীরভাবে প্রস্থান করলে। কিন্তু পাহারাওলার স্নেহালিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ করে যখন ঘরের ছেলেটি ঘরে ফিরলেন, তখন অবস্থা শোচনীয়! ঠিক যেন ছ' মাসের ম্যালেরিয়া জীর্ণ ক্যাহিল রোগী!"

বিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "দ্যাখো মোহন-দা, বাড়াবাড়ি কোর না বলছি।"

মোহন বিনয়-নম্র-কণ্ঠে বলিল, "সে ইচ্ছে থাকলে বলতাম ধনুষ্টঙ্কারের রোগী! তা কি বলেছি ? বরঞ্চ এখন—"

বলিয়া বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, সে সস্মিতমুখে বিহারীর দিকে অর্থসূচক কটাক্ষে চাহিল।

বিহারী নবোদ্যমে পুনশ্চ হাত পা ছুঁড়িয়া কি একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। মোহনের বচন গরিমায় ও নয়ন ভঙ্গিমায় দমিয়া গেল! নিরুদ্ধ ক্রোধে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া,—ঘাড় গুঁজিয়া রহিল!

নবীন উকীল একটু হাসিয়া বলিলেন, ডাক্তারের চোখ,—শকুনির চোখই বটে! কিছুই এড়াবার যো নেই!"

আর একজন বলিলেন, "ডায়োগ্নোসিসের জন্য ধন্যবাদ!"

অপর একজন বলিলেন, "রোগ বিকার, সুতরাং নিরাময় প্রয়োজন!"

বিহারী অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, দেখিয়া নবীন উকীল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "forget and for-give, কিন্তু পাহারাওলা মশাই ছোট ছেলের সঙ্গে ও রকম রসিকতা করলে কেন ?"

তাঁহাদের অদূরে,—ছাদের শেষ প্রান্তে কতকগুলা দেবদারু কাঠের খালি প্যাকিং বাক্স জমা হইয়াছিল। তার অন্তরাল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ন-মাসিমা। সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ওটা বোধ হয় ওদের স্বধর্ম্ম। ওদের প্রভুভক্তি যথেষ্ট। কিন্তু যখন কাজ পায় না, তখন নিষ্কর্ম্মা অবস্থায়, কতকগুলো অকর্ম্ম যোগাড় করে ভুলক্রাম বাধিয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে ওরা ব্যস্ত হয়। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদের স্বভাব দেখেছি,—দেশী ঝি-চাকররা কাজ ফাঁকি দিয়ে গল্প করতে আর ঘুমুতে মজবুত; কিন্তু অধিকাংশ বেহারী ঝি-চাকর দরোয়ানরা সে পাত্রই নয়! কাজে তারা 'আজে' না। কিন্তু কাজ না পেলেই অকাজে দস্যিবৃত্তি করে বেড়াবে। তা সে খামকা কাউকে সেলাম বাজানই হোক, বা খামকা কারুর মাথা কাটানই হোক,—একটা কিছু ওদের চাই-ই!—"

ন'-মাসিমা এত নিকটে ছিলেন! খোশ গল্পকারীরা সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা কারণে ন'-মাসিমার ব্যক্তিত্ব মহিমা সকলেই একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন।

ন' মাসিমা আবাল্য-বিধবা। ধর্মচর্চ্চা, জ্ঞান-চর্চ্চা এবং কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সহিত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন। এখন প্রায় পঞ্চাশের কাছা-কাছি পৌঁছিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে সমীহ করে। যেহেতু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাকি রীতিমত প্রখর।

মোহন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আ রে! আপনি এখানে আহ্নিক করতে বসেছিলেন! আমরা ত জানতুম না—"

আহ্নিকের আসনটা ঝাড়িয়া তুলিয়া গঙ্গাজলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "ভেবেছিলাম তোমাদের জান্‌তে দেব না, নিঃশব্দে সরে পড়ব। কিন্তু বিহারী বেচারীর ওপর তোমরা বড় অত্যাচার করেছ,—"

বিহারী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "বলুন তো আপনি! এরা যেন আমায় 'কি' পেয়েছে!"

ন' মাসিমা বলিলেন, "তাই দেখছি বাবা! ছেলেদের সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে!—"

মুহূর্ত্তে সকলে সমস্বরে বলিল, "আসুন—আসুন! বসুন এইখানে।"

তিনি বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা, এ গুলো আগে পূজার ঘরে রেখে আসি।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে খান দুই বারকোশ এবং গামলায় ভিজানো কতকগুলা কিসমিস্ বাদাম পেস্তা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে দুইটী বালিকা। তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কিসমিস্ প্রভৃতি বাছিবে। আগামী কল্য যজ্ঞ। পোলাওয়ের উপকরণ আজই গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

ছেলেরা ততক্ষণে খান চার কুশাসন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি! ঝগড়া করতে এসেছি। কথকতা করব না কি?—"

মোহন সবিনয়ে বলিল, "আপনার ঝগড়া মানেই কর্ণমর্দ্দন কাহিনী! কাণ ত বাড়িয়েই রেখেছি মাসিমা—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "তা হ'লে নিরুত্তর হওয়াই ভাল।"

বিহারী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "তা হ'লে মোহন-দা আমায় ফের জ্বালাবে ন'-মাসিমা। আপনি ওকে একটু বকুন।"

মোহন বলিল, "আমিও ত তাই বলছি। হয় আমি পাহারাওলার গল্প বলি! বিহারী ধনুষ্টঙ্কার প্র্যাকটিস করুক,—নয় ন'-মাসিমা—"

বিহারীর পুনশ্চ ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম দেখিয়া ন'-মাসিমা বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলছি। কিন্তু এটা ধনুষ্টঙ্কার কি জলাতঙ্ক,—তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রোগকে কি বলে, তোমরাই বিচার করো বাছা। বিহারী ত ছেলেমানুষ, ক'লকাতার পথে বেরিয়ে পাহারাওলার বজ্রমুষ্টির ফাঁদে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে ঘরের কোণে বসে, একটা নিরেট মূর্খ অদ্ভুত স্ত্রীলোকের কবলে পড়ে যদি আমাকেও ত্যক্ত হ'তে হয়, তা হ'লে তোমরা কি বলবে?"

মুহূর্ত্তে সকলে স্তব্ধ! ক্ষণ পরে মোহন বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আপনাকে? বলেন কি মাসিমা?"

মাসিমা বলিলেন, "যথার্থই বলছি। বেশী দিন নয়। গত শ্রাবণ মাসের কথা। আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঝুলন বসেছে। অতিথিশালায় বিস্তর লোক আসা-যাওয়া করছে, গ্রাম সরগরম! ঠিক সেই সময় আমাদের হুজুগে ঝি

ঠাকরুণ একদিন বৈকালে এসে খবর দিলে,—'অ-দিদিমণি, একজন ভৈরবী এসেছেন। তাঁর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে হরিদ্বারে গিয়ে বাস করছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সকলের কাছে ভিক্ষা করে রেলভাড়া যোগাড় করছেন। আপনার কাছেও কাল আসবেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন। সৎ কাজ,—দান করলে নিজেরই পুণ্যি'..... ইত্যাদি।

দানের ক্ষেত্রে আমরা পাত্রাপাত্র বিচার করাটা অপরাধ বলেই মনে করি, সে তর্ক তুলিও না। কিন্তু পরিচয় শুনে মনে একটু কৌতূহল জাগল। স্ত্রী ভৈরবী, স্বামী সন্ন্যাসী হরিদ্বার-বাসী। ভৈরবী ঠাকরুণ স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করেছেন,—এটা নিশ্চয়ই পুণ্য কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামী যদি হরিদ্বারে বাস করেন, তবে ভৈরবী-পত্নী বাস করেন কোথা? প্রশ্নটা অতর্কিতে বাচনিক উচ্চারণ করলুম। মোহিনী জবাব দিলে—"উনি কাশীতে থাকেন। কাশী থেকে এখানে এসেছেন, ভিক্ষে-শিক্ষে করে রেলভাড়া যোগাড় করবেন।"

মনে কেমন খট্‌কা লাগল। হরিদ্বার যাত্রাই যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি কাশী থেকে চারশো মাইল পিছু হেটে এখানে আসবেন কেন? মনে হোল, মোহিনী ঠিক জানে না, আন্দাজেই সবজান্তা বিদ্যা জাহির করছে।

যাক। কথাটা সেদিনের মত সেইখানেই চাপা পড়ল। আমিও নিজের কাজকর্ম্মের তাড়ায় ভৈরবীর কথা ভুলে গেলুম।

তারপর,—দিন পাঁচ-ছয় শরীর অসুস্থ হওয়ায় তেতলার ঘরটায় পড়ে রইলাম। বাইরে কোথা কি হচ্ছে তার খবর পেলুম না। সুস্থ হয়ে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নীচে গেছি, শুনলাম ওদিকের দালানে ঝিয়েদের আড্ডায় পাড়ার মেয়েরা জড় হয়ে মহা সোর-গোল জুড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি?"

শ্যাম ঠাকরুণ, শ্যামার মা, সবাই ভক্তি গদ গদকণ্ঠে বললেন, "সেই ভৈরবী ঠাকরুণ তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ক'দিন ধরে আনাগোনা করছেন, তাঁদের নানা রকম "ভাল ভাল" "আশ্চর্য্য" কথা শোনাচ্ছেন। সে সব অদ্ভুত কথা তাঁরা জন্মাবধি কখন শোনেন নি। ভৈরবী ঠাকরুণটি যে সে পাত্রী নন। তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী। নিজের জীবনের যে অলৌকিক মর্ম্মরহস্যময় ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন, তা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁকে সবাই যথেষ্ট পয়সা কড়ি দিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভাল ভাল কথাগুলা কি?"

কেউ তার সদুত্তর দিতে পারলেন না। শ্যামার মা প্রশ্ন শুনে রাগ করে বললেন, "এ কি ডাল ভাত রান্নার কথা যে এক নিশ্বাসে গড় গড়িয়ে বলে দেব? আমরা শুনতে হয় শুনে গেছি। অত ভাল কথার মানে কি ছাই বুঝতে পারি, যে আপনাকে বলব?"

মনে একটু অনুতাপ হোল। আহা, এমন সাধুসঙ্গ আমার বরাতে জুটল না! এত ভাল কথার একটাও আমি শুনতে পেলাম না! একেই বলে দুর্ভাগ্য!

কিন্তু সৌভাগ্যের সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াবার সখ থাকলেও, সময় আমার নেই। কাজেই নিজের কাজে ডুব দিলাম। ভৈরবীর কথা আবার ভুলে গেলাম।

অসুস্থতার জন্যে ক'দিন দেবালয়ে যেতে পারি নি। সেদিন দুর্ম্মতি হ'ল,—আরতি দর্শনের জন্যে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর বাড়ী গেলাম। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও চললেন।

ঝুলন উৎসব. ঠাকুর বাড়ীতে সেদিন ভীষণ ভীড়। একপাশে দাঁড়িয়ে আরতি দেখ্‌ছি, শ্যামার মা আমার হাতে চাপ দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন, "ন'-মাসিমা, ওই দেখুন। ওই সেই ভৈরবী মা!"

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটার ঠিক সামনেই, অর্থাৎ নাট-মন্দিরের মাঝখানে এক লম্বা চেহারার প্রৌঢ়া মেয়েমানুষ, মাথার কাপড় খুলে, এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরণে সাধারণ লাল পাড় শাদা শাড়ী, গলায় একছড়া কাঁচের মালা। হাতে দু'গাছি শাঁখা। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মন্দ নয়। কিন্তু সে যাই হোক,—সেখানে আর যাই থাক, যথার্থ ভজনানন্দী সাধুর মুখের দীপ্ত লাবণ্য-শ্রী কই?

আমার মন দমে গেল!

তার চোখের দিকে চেয়ে আরও আশ্চর্য্য হলাম। দেখলাম, তিনি আরতি দর্শন কর্‌তে কর্‌তে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে, পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে,—তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছেন। সে অন্বেষণ গভীর মনোযোগ পূর্ণ!

দৃশ্যটা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। ভক্তি করবার ভরসাটা অনেক কমে গেল। চোখ আর মন দুটোকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগলাম। তিনি যে কি করলেন, না কর্‌লেন, আর দেখতে প্রবৃত্তি হোল না।

আরতি শেষ হবামাত্র প্রণাম করে দেবালয় থেকে সরে পড়লাম। পাছে তাঁর গুণমুগ্ধদের উৎপীড়নে সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হয়,—সে ভয়টা ছিল।

পরদিন সকালে ঝিন্ধি-ঝি জানালে কাল সারারাত্রি তাদের সঙ্গে জেগে বসে ভৈরবী-মা ঠাকুর বাড়ীতে যাত্রা শুনেছেন।

শুনে ভাবনা হোল; হরিদ্বার যাবার রেল ভাড়া সংগ্রহ করা কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? সে উদ্দেশ্য যদি থাকত, তা'হলে কাশী থেকে রেলভাড়া করে, এই বর্ষার দিনে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে এসে, নিশ্চিন্ত হয়ে রাত জেগে যাত্রার রং-তামাসা দেখার সাহস অন্ততঃ আমার ত থাকত না, এটা নিশ্চয়। বিশেষতঃ নাট-মন্দিরে পুরুষদের ভীড়ের সামনে সেই যে বিসদৃশ ভঙ্গীর দাঁড়ানো, আর সেই যে অনুসন্ধান উৎসুক-দৃষ্টি, সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ঝিন্দির সংবাদে মন আরও মুসড়ে গেল।

কিন্তু অনধিকার চর্চ্চাটা ভাল নয়। সুতরাং প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বললাম না।

পরদিন বৈকালে কাপড় কাচতে যাব বলে নীচে নাম্‌ছি, এমন সময় ঝিন্দি এসে জানালে "ভৈরবী মা আপনার কাছে ভিক্ষা করবার জন্যে আসছেন।"

ভিক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় তাঁকে আসতে বললাম। যদিও আমার সময় অল্প, তবুও তাঁর সত্য-পরিচয়টা জান্‌বার জন্যে ইচ্ছা হোল। ঘরে এনে বসালাম, একটা প্রণা[ম] ও করলাম। দেখলাম প্রণাম গ্রহণের সময় তি[নি] অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। অনেক সা[ধু] সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা নিজের পূর্ব্ব-জীবনে[র] পরিচয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় অনিচ্ছুক কিন্তু এঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই আগ্রহে[র] সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব-জীবনের বিস্তারিত পরিচয় বিবৃ[ত] কর্‌তে লাগ্‌লেন। সে বিবৃতি এত বেশী, [যে] সময়ের অভাব স্মরণ করে, আমি অতিষ্ঠ হ[য়ে] উঠলাম। তাঁর [illegible]

ইন্‌স্পেক্টার স্বামী নাকি পূর্ব্ববঙ্গে কোন জেলায় থাকতেন। স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ে দেশের লোককে পীড়ন করতে অসম্মত হয়ে, তিনি নাকি চাকরী ছেড়ে দেন। তারপর দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই অবস্থায় তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাদের জন্ম বৃত্তান্তও এমনই অলৌকিক দৈব-রহস্যপূর্ণ—যার বিবরণ নির্লজ্জ গুলিখোর বদ্‌মাইসের মুখেই শুধু শোভা পায়। কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মুখে—নয়!

বুঝলাম, কোন শ্রেণীর "ভাল ভাল" আশ্চর্য্য কথা শুনে মোহিনী, বিন্দি, শ্যামার মার দল শ্রদ্ধায় আত্মহারা হয়েছে! আমার কিন্তু হত-শ্রদ্ধায় মরতে ইচ্ছে হোল। আত্মসম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার ছেলে দুটির এখন বয়স কত?

উত্তরে শুনলাম, "একজন বিশ বৎসরের, একজন চোদ্দ বৎসরের। বড় ছেলেটি একটি প্রকাণ্ড পালোয়ান, পশ্চিমের কোন রাজবাড়ীতে সে মোটর ড্রাইভার। ছোটটি প্রকাণ্ড সাধু, সে বাপের কাছে থেকে তাপশ্চর্য্যা করে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—দেশোদ্ধার!"

শুনে মোহিত হব কি না ভাবতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটাও মনে উদয় হোল, যাঁর উপার্জ্জনশীল উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমান, তিনি কাশী থেকে রেলভাড়া খরচ করে বাংলাদেশে ভিক্ষা করতে এলেন কেন?

আমাকে স্তব্ধ অন্যমনস্ক দেখে তিনি কি ভাবলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে, গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে চুপি চুপি এমন গুটি কতক কথা বল্লেন, যা তোমাদের মত উষ্ণ-মস্তিষ্ক ছেলেদের কাছে প্রকাশ করতে আমার সাহস নেই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ন'-মাসিমা সহসা নীরব হইলেন। তাঁহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল,—পায়ে পড়ি ন'-মাসিমা, আমরা কিছুতেই মাথা গরম করব না। আপনার কোন ভয় নেই, বলুন।"

নবীন উকীলটি বাধা দিয়া বলিলেন,"ন'-মাসিমা ওদের বিশ্বাস করবেন না। তিনি কি বলেছেন, তা আমি আন্দাজেই বুঝতে পারছি। আর বোধ হয় চেষ্টা করলে বলেও দিতে পারি, তিনি কোন দলের গুপ্তচর; গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবার জন্যে ওরা নিরপেক্ষ নিরীহ লোকদের অমনি ভাবেই উত্যক্ত করে বেড়ায়। থাক, তাঁর কথাটা বাদ দিয়ে, তারপর কি হোল বলুন।"

ন'-মাসিমা বলিলেন, "কচি কচি দুধের বাছাদের হিংসার মন্ত্র শিখিয়ে যারা উত্তেজিত করে বেড়ায়, তারা ভুল করে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করছে এ কথা আমি স্বীকার করি। দৈত্য-শক্তি—ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নয়, মনুষ্য-ধর্ম্মও নয়! রাজনীতির কোন তত্ত্বই আমি কস্মিনকালে বুঝি না, বরঞ্চ ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শটা কিছু কিছু বুঝি। যাক সে কথা।—তাঁর কথাগুলো শুনে প্রথমটা মনে হোল, তিনি পাশ্চাত্যের আমদানি বিপ্লবপন্থী দলের মারণ মন্ত্র প্রচার করতে এসেছেন! অসৌজন্য হবে জেনেও স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লাম, আপনারা আত্মিক উন্নতি সাধনার পথ গ্রহণ করে সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন। এসব রাজনৈতিক বিপ্লববাদ, হিংসা-বিদ্বেষ-চর্চ্চায় আপনাদের দরকার কি? এ গুলো যে সাধন পথের সর্ব্বনাশা—প্রতিবন্ধক!

পাকা চোরেরা কি করে জানি না, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পৃথিবীর সংস্রবে বাস করছি।

ভাঁড়ার ঘরে, আর ছাদে কুল-আচার, আম-আচার চুরি করবার সময় কাঁচা চোর গুলোকে অনেক বার ধ'রেছি। বমাল শুদ্ধ হঠাৎ গ্রেপ্তার হলে, তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয়, তাও লক্ষ্য করেছি। আমার কথা শুনে, মুহূর্ত্তে তাঁর মুখেও সেই ভাব ফুটে উঠল। নিরতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে ! এ সব আমাদের চর্চা করা,... এ সব চর্চা ভাল নয়, ভাল নয় বটে। এ সব চর্চা কি ভাল ? তা নয় বটে !"

অবস্থা কাহিল দেখে দয়া হোল, হাজার হোক ভগবানের জীব ! মুহূর্ত্তে আমি সে কথা চাপা দিয়ে তাঁর সাধন ভজনের সংবাদ নিতে প্রবৃত্ত হলুম। তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। খুশীর আতিশয্যে সম্ভবতঃ আমাকে মোহিনী ঝি বা আমার মাব সংশ্রেণীস্থ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন জীব স্থির করে, ভীষণ বিক্রমে আবার আত্মশ্লাঘা প্রচার সুরু করলেন। এ কথা গুলো তোমাদের বলতে বাধা নেই। সুতরাং তিনি যেমন বলেছেন, আমি ঠিক অবিকল বলে যাচ্ছি। তোমরা শোনো।

জিজ্ঞাসা করলুম, "মোহিনী বলছিল আপনি ভৈরবী। আপনারা—তান্ত্রিক ?"

তিনি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালেন "হুঁ।"

পুনশ্চ প্রশ্ন করলুম, "কি ভাবে আপনি সাধন করেন ? দিব্যভাব, না বীরভাব, না পশুভাব ?"

তাঁর মুখে প্রচ্ছন্ন কাতর ভাবই ফুটে উঠল। স্পষ্ট বুঝলাম, এ প্রশ্নের সামনে তিনি নিজেকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত বোধ করছেন। কাকে দিব্য ভাব বলে, কাকে বীরভাবে বলে, তিনি তার কিছুই জানেন না। ঢোক গিলে, কষ্টে সৃষ্টে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি সবিনয়ে বললেন, "দেখুন, আসলে আমি ভৈরবী নয়। ওই ঝি-টি 'ভৈরবী' বলে,—তাই আমিও বলি। নইলে সবাই বুঝবে না। আমরা হচ্ছি নানকপন্থী।"

বাংলাদেশে এত ধর্ম্মমত, এত ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাকতে, নিজেদের কুলাচার ত্যাগ করে, সুদূর পাঞ্জাবের গুরু নানকের ধর্ম্মমত গ্রহণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে কেমন করে সুলভ হোল, বুঝতে পারলুম না। হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছি দেখে, তিনি বললেন, "আমার স্বামী এক নানক পন্থী সাধুর কাছে সাধন নিয়েছিলেন। আমাকেও তাই, সেই গুরুর মত নিতে হয়েছে।"

উত্তম। আপত্তি করবার কিছু নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানক পন্থীদের সাধন প্রণালী বিশেষ রকম না জানলেও কিছু কিছু আমার জানা ছিল। আমি সেই সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করতেই, তিনি আর সামলাতে পারলেন না। ভীত, ব্যস্ত, গলদঘর্ম্ম হয়ে, সকাতরে বললেন, তিনি সাধন গ্রহণ করলেও, সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।'

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মর্ম্ম না জেনে, যারা ফোঁটা তিলক কেটে বৈষ্ণবী সেজে "জয় রাধে" হেঁকে বেড়ায়, বুঝলাম ইনিও সেই শ্রেণীর নানক পন্থী ! মনের দুঃখ মনেই রেখে সবিনয়ে বললাম, "আপনি কতদিন সাধন গ্রহণ করেছেন ?"

এবার খানিক সাহস সংগ্রহ করে, তিনি স্মিত মুখে পুনরায় বললেন, "অনেকদিন। আমার স্বামী চাকরী ছেড়ে, বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর আমি তেল মাখা ছেড়ে দিই, চুল বাঁধা ছেড়ে দিই। তাইত আমাদের দেশের ছেলেরা আমার জন্তে সেই গান বেঁধেছিল, সেই যে ! সে গান বোধ হয় আপনারা শুনেছেন ! শুনেছেন নিশ্চয় ! সেই—সেই—কেন গো মা তোর

মলিন বদন, কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !—"

হায় দ্বিজেন্দ্র লাল। তাঁর সাধের সঙ্গীতের অদৃষ্টে এত দুর্গতি ছিল! এবার যথার্থই স্তম্ভিত হয়ে বললুম, সে গান বুঝি আপনার জন্যে তৈরী ?"

গণ্ড-মূখ স্ত্রীলোক অনেক দেখেছি, কিন্তু এত বড় দুঃসাহস প্রকাশের স্পর্দ্ধা আর দেখি নি। কিম্বা বোধ হয়, পল্লীগ্রামে শ্যামার মা, মোহিনী, ক্ষান্ত ঠাকুরাণী শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দলে ভিড়ে, এম্নি সব ডাহা মিথ্যা কথার ফাঁকে নিরীহ জীবগুলিকে মোহিত স্তম্ভিত করে, পয়সা আদায়ের সুযোগ পেয়ে, তাঁর ভণ্ডামীর স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর মিথ্যা কথার বহর দেখে আমি স্তম্ভিত হলুম, কিন্তু তিনি সেটা নিছক ভক্তিরসের অন্তর্গত একটা বিশেষ করুণ অবস্থা ঠাউরে নিয়ে, পুনশ্চ মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন! মুচ্‌কি হেসে, আহ্লাদে গদ গদ কণ্ঠে বললেন "হ্যাঁ! সে গান শুধু আমার জন্যেই ফরিদপুরের ছেলেরা বেঁধেছিল। শুধু তাই নয়, আমার শ্বশুরের নাম "ভগবান চন্দ্র" কি না? তাই ছেলেরা তাঁর নামেও গান বেঁধেছিল। সেই যে গান, শুনেছেন বোধ হয়—

"বাংলার মাটী, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
ধন্য হোক, ধন্য হোক,
ধন্য হোক, হে ভগবান!"

উপসংহারে তিনি পুনশ্চ—বিশেষ ভাবে—স্মরণ করিয়ে দিলেন—"আমার শ্বশুরের নাম ভগবান চন্দ্র" বলে, তাঁর নামে ঐ গান বাঁধা হয়!"

যেন তার শ্বশুরের নাম 'ভগবান চন্দ্র' না হলে এ গান রচনাই হোত না!

বিহারী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "জোচ্চোর! একেবারে হস্তীমূর্খ!"

নবীন উকীলটি একটু হাসিয়া বলিলেন, "যাঁরা, তাঁকে গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে পাঠিয়েছিল, তাঁরা অন্য অন্য গোয়েন্দা পাঠান, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আপনাদের মত লোকের কাছে, মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠাবার সময়, তাঁরা যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্না মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠাতেন, তাহলে তাঁদের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে একটু শ্রদ্ধা কর্‌তে পার্‌তুম। যাক্, তারপর আপনি কি করলেন বলুন।"

ন-মাসিমা বলিলেন,—"অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ! যথার্থই কেউ তাঁকে গোয়েন্দা গিরি কর্‌তে পাঠিয়েছিল কিনা জানিনে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার জন্য আমারও দুঃখ হোল। আর তাঁকে বেশী কথা বলবার সুযোগ দিলে নিজের ধৈর্য্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী বুঝে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। ভিক্ষার্থীকে রিক্ত হস্তে বিদায় দিতে নাই, তাই একটা নিকেলের আনি দিয়ে তাঁকে বললুম, এখন আসুন। আর আমার সময় নেই।"

আমাদের মোহিনী ঝি, শ্যামার মা, এরা কেউ ছয় আনা, আট আনার কম তাঁকে "সৎকার্য্যে দান" করেন নি। কিন্তু আমার কাছে মাত্র এক-আনা তিনি কেন পেলেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুললেন না। সস্মিত মুখে প্রস্থান করলেন।

পর দিন সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম্ম সেরে একটু অবকাশ পেয়ে, নীচে গিয়ে বসলুম। মেয়ে মহলের মাতব্বরগুলিকে ডেকে, ভৈরবী ঠাকরুণের যথার্থ-ভৈরবীত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে তাদের সাবধান করে দিলুম। কথা বল্‌ছি, এমন সময় আমাদের বুড়ো গয়লা খুড়ো, দুধ দিতে এসে একটু দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলি শুনলে। তারপর

বললে, "গ্রামের ভদ্রলোকরাও ভৈরবী ঠাকৃরুণের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ-শঙ্কিত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অন্তঃপুরে গিয়ে তিনি গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে, মেয়েদের কাছে যে রকম কথাবার্ত্তা বলে এসেছেন, তাতে সকলেই আশঙ্কা করেছেন, ঠাকৃরুণটি কি একটা ফ্যাসাদ বাধাবার মতলবে খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন! সকলেই পরস্পরকে সাবধান করছেন! তাছাড়া গয়লা খুড়োও আজ মাঠে গরু চরাতে গিয়ে দেখে এসেছে, মাঠের নির্জ্জন রাস্তায় সাঁকোর ওপর, ঠিক-দুপুরের সময় তিনি বসেছিলেন। এমন সময় কোথা হতে জবা ফুলের মালা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ভীষণ গুণ্ডাকৃতি একটা লোক সেই দিকে এল। তারপর কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে থেকে দুজনেই নির্জ্জন বনের দিকে চলে গেল।

গয়লা খুড়োকে মিথ্যা কথা বল্‌তে কখনো শুনি নি। যাই হোক তারপর দিন থেকে ভৈরবী ঠকৃরুণ হঠাৎ অদৃশ্য হলেন। এরপর আর তাঁর খোঁজ পাই নি।

উকীল শ্রোতাটি একটু হাসিয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ তিনি এখন নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস করছেন। বুড়ো বয়সে আর কত খাটবেন ?"

বিহারী সাতিশয় ক্ষোভের সহিত বলিল, "কিন্তু পুলিশের খুদে বরকন্দাজগুলোর জন্যেই আমার ভাবনা! ওদের বদ্রিনারায়ণে তীর্থ সেবা করতে পাঠান দরকার, কিম্বা ওদের ভদ্র দস্তর সংবৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটা স্কুল খোলা কর্ত্তব্য। চাণক্য বলেছেন,—"মূর্খে নিয়োজ্য মাণে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ। অযশশ্চার্থনাশশ্চ—"

মোহন বলিল, "বাকী টুকু পাঠান্তর করে বল—চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্।"

ন'-নসিমা স্মিত হাস্যে বলিলেন "ধনুষ্টঙ্কারের পর চক্ষুঃপীড়া!—ভাল, আমাদের খামকা দুর্ভোগের জন্যে কোন রোগ বরাদ্দ করবে ডাক্তার ? জলাতঙ্ক ? না স্নায়ু বিকার ?—

পর কখনও আপন হয় না

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

উৎপল আসিয়াছিল।

রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো হইয়া কপালের অর্দ্ধেকাংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কতকাল তাহাতে যেন তেল পড়ে নাই। ছেঁড়া জুতা পায়ে থাকিলেও, হাঁটু অবধি ধুলা উঠায় তাহাকে ঠিক যেন পাগলের মত দেখাইতেছে। গায়ে সেই সবুজ রঙের আলোয়ান, পরণে আধময়লা কাপড়, শেলের চশমা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী,—সব কিছু মিলিয়া সে অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে।...

তার আগমনে আমার গল্প লেখায় বাধা পড়িল।...

সে আসিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার সামনের চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"এক কাপ চা বোলাও।"

কি শীত, কি গরম, সকাল দুপুর, বিকেল, রাত্রি সব সময়ই তার চা চাই।

নমিতাকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিলাম।

উৎপল তার ক্লান্ত দেহটাকে সোজা করিয়া বলিল, "কি বন্ধু, গল্প লেখা চলেছে? বেশ চালাও।"

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সে বলিয়া চলে,—"আচ্ছা পরাগ, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পার না?"

বলিলাম—"তোমাকে নিয়ে যে আমার ঢের আগেই অনেক গল্প লেখা হয়ে গেছে? তা বুঝি তুমি জান না? তা যাক্; তোমার এ রকম চেহারা কেন হলো?"

উত্তর সে দিল না, শুধু হাসিল মাত্র।

নমিতা চা দিয়া যাইলে বার কতক আমার দিকে নিরর্থক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিল।

চাটুকু নিঃশেষ করিয়া সে গম্ভীর ভাবে বলিল, —"কোন্নগর গেছলুম।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন, সেখানে কি করতে?"

সে উত্তর দিল,—"বৌদির সঙ্গে দেখা করতে, লতা বৌদি বুঝলে?"

হাসিয়া বলিলাম—"নিজের বৌদি ত নয়, পাতান বৌদি! তাকে নিয়ে তুমি যা পাগলামী আরম্ভ করেছ.....!"

উৎপল দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া চলিল,—"পাগলামী তুমি বলতে পার পরাগ, আমার কাছে এটা কিন্তু মোটেই পাগলামী বলে মনে হয় না। আমার মতন অবস্থায় এলে, তুমিও ঠিক এমনি পাগল হয়ে যেতে।

মা যখন মারা যান তখন আমি ও আমার ভাই বোন, সবাই পাগলের মতই হয়ে গিয়েছিলুম। ছোট বোন,—অনিমা বিছানায় পড়ে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মনে ভাব, তখন আমাদের কতবড় বিপদ! এমন সময় বাবার এক বন্ধুর পুত্র ও তাহারপত্নী বুঝি দৈব প্রেরিত হয়েই দেখা শুনা করতে এলেন। সেই সময় থেকে লতা বৌদিকে আমরা পাই।

লতা বৌদি ঠিক মায়ের মতই বোনটির পাশে এসে বসলেন সে অসুখের ঘোরে মা, মা, এসেছ, বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। স্পষ্ট দেখলাম

পরাগ, তাঁর চোখ, দুটো জলে ভরে উঠ্‌লো। মাতৃত্বের কি অপূর্ব্ব জ্যোতি সেদিন সেই অচেনা নারীর মধ্যে জেগে উঠেছিল। তারপর কত দিন আমাদের তাঁর স্নেহাতুর বুকের তলে ঢেকে রেখেছিলেন। বৌদি বলি বটে, দেখি কিন্তু ঠিক নিজের মায়ের মত। আজও পর্য্যন্ত তাঁর স্নেহছবি শতকাজের মধ্যেও মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারি নি পরাগ। অনিমার রোগশয্যা পার্শ্বের সেই মাতৃমূর্ত্তি, অনেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আগে পরে কত পরিচিতের ছবি এ হৃদয় উপকূলে ভীড় করে এসেছিল, তাঁহার স্নেহের অমৃত স্পর্শে সে সবই অন্তর হতে ধুয়ে মুছে গেল। তারপর বিদায় নিয়ে বাড়ী যাবার সময় তাঁর সে কি কান্না, সে কান্না তুমি যদি দেখতে পরাগ···।

বাধা দিয়া বলি,—"দেখতে চাই না উৎপল। ওই সব অকারণ ক্ষণিক স্নেহ ছবিই মানুষের জীবনকে বিষময় ও বিড়ম্বিত করে ফেলে। আমার মনে হয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় শুধুই এইরূপ ব্যথার পসরা মাথায় তুলে নেবার জন্যে।"

উৎপল মূকের মতন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে থাকে,—"তোমার ও কথাটা আমি খুবই মানি! অন্ততঃ এখন! এর আগে হয়তো মানতুম না। হাঁ ভাই, সত্যই সত্য বৌদির ও বিনয়দার সঙ্গে পরিচয়ে আমি আনন্দও সুখের চেয়ে, বেদনাই পেয়েছি বেশী। তাঁদের ওপর আমার যে কোন অধিকারই নেই, তাও বুঝেছি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে। একটা ঘটনা শুনবে? শুনলে বেশ ভাল ভাবেই বুঝ্‌তে পারবে।"

জিজ্ঞাসা করিল সত্য কিন্তু অনুমতির সে অপেক্ষা করিল না, বলিতে লাগিল,—বৌদির কাছ হতে তাঁর একখানি ফটো চেয়ে নিয়েছিলুম এই বলে, এটা হতে একটা এনলার্জ করিয়ে নিয়ে কপিটা আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। বৌদি হেসে বলেছিলেন, "আমার ছবি নিয়ে তুমি কি করবে উৎপল?" খুব বড় মুখ করেই বলেছিলাম, '—আমার পড়বার ঘরে আপনার ছবিখানি টাঙ্গিয়ে রেখে দেব।' সেদিন তিনি মুখে কিছু বললেন নি, বোধ হয়, আমার বেদনার বোঝা বাড়াবার ভয়ে, মনে মনে কিন্তু তিনিও বিনয়দা দু'জনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন। মুখে সে অসন্তোষটা সেই সময় প্রকাশ করে দিলে, হয় ত আমাকে এতটা পঙ্গু করে তুলত না। তারপর একদিন বৌদির বাপের বাড়ী, রাণীগঞ্জে যাই।"

গল্পের মাঝখানে আমি বলিলাম,—"হাঁ, উৎপল তুমি সত্যিই একটা আস্ত পাগল। তোমার আত্মসম্মান জ্ঞানটা একেবারেই নেই;—একে পাতান বৌদি, তার আবার বাপের বাড়ী লজ্জার মাথা খেয়ে সেখানে তুমি কি করতে গেলে বলতো?"

আমার প্রশ্ন উৎপলকে বড়ই বিব্রত করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে নিতান্ত অসহায় হইয়া বলিয়া ফেলিল, "এখন বুঝেছি ভাই! সত্যই আমি সেখানে গিয়ে নেহাৎ নিলর্জ্জের মত কাজই করে ফেলেছি।"

পরক্ষণেই আবার সে দীপ্ত চোখ মেলিয়া বলিতে থাকে,—"ওটা যে কোন প্রকারে অন্যায় কাজের মধ্যে আসতে পারে, আগে তা ভাবি নি। ভেবেছিলাম, মানুষের কাছে মানুষ আপন হতেও আপন। ভেবেছিলাম, মানুষের কাছে মানুষের দাবী অসীম।"

উৎপলকে থামাইয়া বলিলাম,—নাও নেকামী রাখ, বৌদির ফটো নিয়ে কি হ'লে সেইটাই বল।'

আপনাকে সামলাইয়া উৎপল বলিতে লাগিল, বৌদির বাপের বাড়ীতে এ অদ্ভুত জীবটীকে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। দু'একদিনের মধ্যে কিন্তু আমার—সেখানে বৌদির বড় বৌদি

আর তাঁর ভাই বোনদের সঙ্গে রীতিমত আলাপ জমে গেল। একদিন সকলে মিলে একসঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় বিনয়দা এসে বল্‌লেন, —উৎপল, তোমার বৌদির ফটোটা কি গিলে ফেল্‌লে? প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, পরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে শান্ত ভাবে বল্‌লাম,—গিলে ফেল্‌ব কেন বিনয় দা, ওটা থেকে একটা এনলার্জ কপি তোলা হয়ে গেলেই, ফেরৎ দেব। আমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে, তিনি বলে গেলেন,—না, না, ও সব চলবে না, আমার স্ত্রীর ফটো তুমি এনলার্জ করাবে কেন, কোন সাহসে? কলকাতায় গিয়েই সব ফেরত দিয়ে দেবে।

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। একঘর লোকের মাঝে অতটা অপমানিত হয়েও আমাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে হলো! কিন্তু বুঝতে পারলুম না, মা বলে যাঁকে অন্তর দিয়ে ভক্তি করি, তাঁর ফটো রাখার দোষটা কি?

অন্য কোনও জায়গা হলে আমার সিংহ তেজ বিনয় দা দেখতে পেতেন। এখানে আমি যে নিরুপায়, বিনয়দার শশুরবাড়ীতে কিছু বল্‌তে যাওয়াই মূর্খতা, তবে সেদিন প্রথম সে কথা বুঝলাম, দাদা আর বৌদির উপর আমার কতটুকু দাবী! এতদিন শুধু মরীচিকার পেছনে ছুটোছুটি করেছিলাম। নিমিষের মধ্যে অনেক স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। অস্ফুট চন্দ্রালোকে বৌদির সঙ্গে একসঙ্গে গান গাওয়া, একসঙ্গে চা খাওয়া, বেড়ান, আমোদ, হাসি, সবই কি মিথ্যে! সবই কি ছলনার অভিনয়! সেদিন আমি সমস্ত দুনিয়াকে যেন এক নিমিষে চিনে ফেল্‌লাম।

উৎপল কিছুক্ষণের জন্য থামিল, স্পষ্ট দেখিলাম, তাহার চোখদুটী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই বলিলাম, "বেশ ভাল, এক নিমেষে জগৎকে চিনেও আজ তোমার চোখে আবার জল কেন?"

সে উচ্ছসিত রোদনের বেগ সামলাইয়া লইয়া আবার বলিয়া চলিল, "আবার আমার চোখে জল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজ আমার নিজের কাছ হতেও পাই না। আমি কিন্তু এর আগে কল্পনাও করতে পারি নি পরাগ, মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে। এখন আমি বুঝেছি, পর চিরকালই পর, তারা কখনই আপন হতে পারে না, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত তা হয়ও নি কোথাও। কিন্তু ভাই, বৌদিকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তার সেই স্নেহময়ী ছবি হৃদয় হতে কিছুতেই মুছতে পারছি না যে, চেষ্টা কি করছি কম? তবু শত দুঃখে, শত বেদনার মধ্যেও বৌদির ছেলে পিণ্টুর কথা। কি সুন্দর ছেলেটি!—আমার চোখে সে যেন এক স্বপ্ন। কি ভাল বাস্‌তো আমায় তা তো তুমি জান না পরাগ, তাই হাস্‌ছো। বিনয় দা ও বৌদি যখন বেড়াতে যেতেন, তখন রেখে যেতেন তাকে আমার কাছে। সে লক্ষী ছেলের মতন আমার কাছে থাক্‌তো! ওই সরল প্রাণ শিশুর আমি যে ভালবাসা পেয়েছি—তা খাঁটী! ওই ভাবাসাই হ'ল আমার পথের মস্ত পাথেয়। শুনেছি, পিণ্টু নাকি আজও আমায় ভোলে নি! আমার শেখান গান আজও সে আধ-আধ স্বরে গায়। আর কি চাই পরাগ, শত ক্ষতি, শত ব্যথার মাঝে, ওই তো আমার এক মস্ত লাভ লুকিয়ে রয়েছে।

...আর একটা কি জান পরাগ, সকলের নির্ম্মম ব্যবহারেও ভেবেছিলাম যে বৌদি আমার ঠিক তেমনই আছেন। প্রথম প্রথম বৌদির খুব চিঠি পেতাম, কিন্তু মাঝে তিন বছর একেবারে তা বন্ধ হয়ে গেছে। বারবার চিঠি লিখেও আর উত্তর পাই না, বিজয়াতেও যখন এক লাইন আশীর্বাদও এলো না, তখনও বৌদিকে ভুল বুঝি নি বা ভাবি নি আমার সেই স্নেহময়ী বৌদি বদ্‌লে অন্যরকম হয়ে গেছেন।

এই সেদিন কোন্নগর হতে ফিরে এসে বুঝলাম যে বৌদিও একবারে বদলে গেছেন। ট্রেণ থেকে নেমে, পাকা তিন মাইল হেঁটে, অতি কষ্টে যখন বাড়ী খুঁজে বিকেলে সেখানে পৌছালাম! তখন তিনি চুল বাঁধছিলেন। তাঁর বৌদি আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পেলিটি হোটেলের মতন এক কাপ চা এসে হাজির হলো। বৌদি এসে শুষ্ককণ্ঠে জিগ্যেস কর্‌তে হয় বলেই বোধ হয় করলেন,—"এই যে, কেমন আছ?"

এর উত্তর দেব কি? অতি কষ্টে হাসি চাপলাম। আমি জিগ্যেস করলাম,—"দাদার হাত দিয়ে আপনার দু'খানা ছবি ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম, তা পেয়েছিলেন?"

মৌনে সম্মতি লক্ষণ প্রকাশ হলো। তার পর অনেক কথাবার্ত্তাই হলো। সমস্তই যেন প্রাণহীন বলে মনে হলো, কেন তা জানি না, অথচ আদর-যত্নের কোনও ত্রুটী দেখলাম না। বৌদির চাহনিতে স্নেহের কিন্তু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পেলেম না। মনের ভিতর শত বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা সহ্য করতে না পারায়, তখনই মিছে ছল করে চলে যেতে চাইলাম। শেষে তাঁদের মৌখিক অনুরোধ ইচ্ছে করেই রাখলাম, অর্থাৎ সেদিনটা আমাকে থাকতেই হলো। ..

হঠাৎ বৌদি বল্‌লেন—"দেখ উৎপল, কিছু মনে করো না, আমাদের এক বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে। একলাটী তোমায় একটু কষ্ট করে বসে থাকতে হবে। ফিরতে আমাদের রাত দশটা বাজবে হয় ত। তার আগেই বামুন-দি তোমায় খাবার দেবে।"

কিছুক্ষণ পরে ওঁরা চলে গেলেন, আমি চৌকির উপর বসে সামনে হেরিকেনটা রেখে কেবলই ভাবতে লাগলাম, এখানে আমি [illegible] এলাম কেন? নিজের পাগলামী দেখে নিজেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লাম। আর এক হাতে চোখের জল মোছা সুরু হলো। সেদিন হাসি ও কান্না আমাকে এক সঙ্গে পেয়ে বস্‌লো। একা একটী নির্জ্জন ঘরে সাত ঘণ্টা বসে থাকায় যে কি অতুলনীয় সুখ পাওয়া যায়, তা সেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। অতীত স্মৃতির পাতা হাতড়ে হয়ত অনেক কিছু পাওয়া যায়, হয়ত অনেক কিছু চোখের সামনে জেগে ওঠে, তাও চলে যায়, আবার আরও অনেক আসে।

কিছুক্ষণ পরে বামুনদির দেওয়া গরম লুচি খেয়ে উদর দেবতাকে শান্ত করি। ওঁরা ফিরলেন রাত একটায়।

...বৌদি বল্লেন,—"খুব কষ্ট হয়েছে না উৎপল? কিছু মনে করো না ভাই, আনন্দে সেখানে বড্ড মেতে গেছ্‌লাম।"

...আমি বল্লাম,—"না না মনে আর কি করবো! আমিও এখানে বেশ ছিলাম, কোনও কষ্ট হয় নি।"

...তার পরই ওঁরা শুতে গেলেন।

এইবার উৎপলকে ক্ষণকালের জন্য থামাইয়া বলিলাম,—"এইবার বুঝেছ তো, বৌদি, দিদি, কাকীমা, মামীমা, মাসীমা যাই কেন যার সঙ্গে পাতাও না, সব সময় একটা কথা মনে রাখবে, তারা তোমার প্রকৃত কেউ নয়, সকলেই পর।"

উৎপল হঠাৎ মহোল্লাসে টেবিলের উপর একটা ঘুসী মারিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঠিক বলেছ পরাগ,—এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ। এটা খুব খাঁটী কথা, কেন খাঁটী তা বলছি, শোন :—

...তারপর সেদিন রাতটা কাটিয়ে সকাল বেলায় চা খাচ্ছি, এমন সময় বৌদি,

উঠেছে, আমি কিন্তু একটাও বাঙ্গ্লা টকি আজ পর্য্যন্ত দেখি নি।' কথাটা শুনে কেন যে মন খারাপ হয়ে গেল, তা জানি না। তাই হঠাৎ বলে ফেল্‌লাম, 'চলুন আপনাকে টকি দেখিয়ে নিয়ে আসি, আজ কিংবা কালকে।' বৌদি মৃদু হাস্‌লেন। সে হাসির অর্থ আমি বুঝ্‌লাম, তাই পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লাম,—আজ যদি আপনি আমার নিজের বৌদি হতেন তো, আমি জোর করে নিয়ে গেলে কেউ কিছু বল্‌তো না, কিন্তু আপনি পর, আপনার সে স্বাধীনতা নেই! আমারও সে স্বাধীনতা নেই।' তোমার কথার সত্যতা আমি তখনই পাই।...

...রাত্রে বৌদি কার্পেটের আসনে ফুল তুলছিলেন, আমি চৌকির উপর বসেছিলাম, বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু না বলেও থাকতে পারলাম না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা বৌদি কোনও দিন চিঠি না দিন, দুঃখ নেই! কিন্তু বিজয়ার আমার চিঠির উত্তরটা দিলে তো পারতেন! কই তাও তো দেন নি?'

...বৌদি হাতের সেলাইটা কিছুক্ষণের জন্যে থামিয়ে বল্‌লেন,—"দেখ তোমাদের চিঠি লিখ্‌তে কি আমার অগাধ, তবে আমার শশুর ওসব পছন্দ করেন না।"

এ কথার উপর ত প্রতিবাদ চলে না, চুপ করে রইলাম।

অনেক দিন তোমার কথায় আমি রাগ করে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি পরাগ! কিন্তু এখন তোমার সেই নির্ম্মম সত্য, সত্যই ফলে গেল।"

উৎপলের পিঠটা চাপড়াইয়া দিয়া বলিলাম,—"তাহ'লে এই অধমের কথার কিছু মূল্য আছে বন্ধু। আর কেন, এখন জগৎকে চিনে নিয়েছ, তোমার ছেলেমানুষীও কেটে গেছে! উঠে পড়ো চান ও আহারটা এখানেই সেরে যাও।"

উৎপল গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। আমরা দুই বন্ধুতে স্নান সারিয়া আহারাদি শেষ করিয়া ফেলিলাম!

ছুটীর দুপুরটা তার সঙ্গে নানা রকম গল্প গুজবেই কাটিয়া গেল বটে, আমার কিন্তু গল্পটা লেখা হইল না। তবে মনে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলাম এই ভাবিয়া যে, উৎপলের ছেলেমানুষী বোধ হয় এত দিনে কাটিয়া গিয়াছে, এবং সে বুঝিয়াছে—পর কখনও আপন হয় না, —পর চিরকালই পর।

পেত্নীর ভালবাসা

ডাক্তার কার্ত্তিক শীল

শীতের রাত্রি। এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ নিঝুম! বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রাম! লোক চলাচল একেবারে বন্ধ বলিলেই চলে। কদাচিৎ শিবার আর্ত্তনাদ আর মাঝে মাঝে পাতার খস্‌খস্ শব্দ,তাহাদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রামখানি ছোট হইলেও বেশ কয়েকঘর লোকের বসবাস আছে, তবে বেশীর ভাগই চাষা ও কৈবর্ত্ত। ভদ্র পরিবার খুব অল্প।

বিকাশের বিধবা মাতা পুত্রের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। কোন্ বৈকালে কয়জনে বাহির হইয়াছে এখনো পর্য্যন্ত ফিরিবার নাম নাই!—এতখানি রাত হইল, পথে কোন আপদ-বিপদ ঘটিল না ত? গেলই বা কোথায়?—কিছুই ত বলিয়া যায় নাই!…মায়ের প্রাণ; পুত্র অভুক্ত থাকিবে, তিনি কোন্ প্রাণে নিজের আহার সারিয়া শয্যা গ্রহণ করেন! কিন্তু পোড়া চোখ কিছুতেই মানিতে চাহে না! বারবার বিদ্রোহ করিয়া মুদিয়া আসে। জলের ঘটী হইতে জল গড়াইয়া দুই চোখে ভালরূপে ঝাপ্‌টা দিয়া প্রৌঢ়া সময় বিশেষের জন্ত বাধা দেন, আর পুত্রের উদ্দেশ্যে অভিমানে তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগ করেন, এতটা বয়স হোল বাপু, এ সব কি আক্কেল? আমি কি আর এ বয়সে এ-সব পারি? বিয়ে থা দেব, তাও অদৃষ্টের গুণে যদি সুবিধে মত মেয়ে পাওয়া যায় একটা!…

এই ভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; বাজিয়া গেল। মুখে কিছু না দিয়াই বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিলেন, জানিনে বাপু এ সব কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! দাশুও ত রয়েছে, তারই বা কাণ্ডখানা কি? তোর বাপ না হয় জমিদার, বড়লোক, তাবলে এতরাত পর্য্যন্ত আমাদের মত গরীব গুরবোর ছেলে নিয়ে ফূর্ত্তি—এসব কি!…প্রৌঢ়া সদর দরোজা ভেজাইয়া একখানি কাঁথা লইয়া দাওয়াতেই শুইয়া পড়িলেন।

রাত বোধহয় সাড়ে বারটা বাজিয়া গিয়াছে—সেই মাত্র প্রৌঢ়ার ক্লান্ত চোখ দুটী অবসাদে মুদিয়া আসিয়াছে, ঝনাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া ঝড়ের বেগে বিকাশ প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মা! আলোও একটা জেলে রাখো নি?

জননী ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—এঁয়া এই এলি? কোথায় গিছলি বাবা? আমি ত ভয়েই মরি!…প্রত্যাবৃত্ত পুত্রকে পাইয়া জননী-হৃদয় সমুদয় অভিমান ভুলিয়া গেল। কঠোরতার লেশমাত্র মনে র'হল না।

ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বিকাশ বলিয়া উঠিল, দয়া করে আলোটা জ্বালো;—খুব পয়সার সুখোর করা হয়েচে।

বাধা দিয় জননী বলিলেন, না রে না,—বোধ হয় হাওয়ায় নিবে গেছে। এই ত 'শুচ্ছি'!…আর আলোর দোষ-ই বা কি? সন্ধ্যে থেকে সেই লাগাড়ে জ্বলছে, হয় ত তেলই নেই। বলিয়া ফুক্‌চিতে তৈলের সন্ধানে ভাঁড়ারে প্রবেশ করিলেন।

করিলেন, এত রাত হোল কেন রে, কোথায় গিয়েছিলি আজ? আমায় একটু বলেও ত যেতে হয়; বলিতে বলিতে আলো লইয়া দাওয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ অস্বাভাবিক জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, আবার তুমি এখানেও এসেচ?—

পুত্রের ভাবভঙ্গী দেখিয়া প্রমাদ গণিয়া মাতা বলিলেন, এই ত আলো জ্বালতে বললি, আর এখানে আসবো না ত যাবো কোথায়? ভাত খাবি নে?

কণ্ঠের জোর বজায় রাখিয়া বিকাশ বলিল, যাও,—শীগ্‌গির চলে যাও বল্‌ছি। এখানে পর্য্যন্ত আসতে সাহস করেচ?—তোমার সাহস ত বড় কম নয়!

—কি রে কি সব বলছিস্?

সামলাইয়া লইয়া বিকাশ বলিল, না মা তোমায় বলি নি। দেখ না, ঐ মেয়েটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানে পর্য্যন্ত এসে হাজির হয়েছে।

চারিদিকে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ার্ত্ত-স্বরে জননী বলিলেন, কইরে?—এখানে আবার মেয়ে পেলি কোথায় তুই?

তাঁহারই দিক অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইয়া বিকাশ বলিয়া উঠিল, ওই যে তোমার ঠিক পাশেই! আবার দাঁত বের করে হাসি হচ্ছে!...

আর একবার চারিদিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জননী আসিয়া পুত্রকে কোলের ভিতর টানিয়া লইলেন। মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, ছি বাবা, ও সব বলতে নেই। চলো দুটো মুখে দিয়ে, শুয়ে পড়্‌বি' গে।

সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া বিকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল, এই দেখ মা, তোমার কোলের আসছে। কি ভয়ানক নির্লজ্জ মেয়ে মানুষ!...

তাঁহারা দুইজন ব্যতীত বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া জননী-হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—তিনি হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পার্শ্বেই রঘু কৈবর্ত্তের বাড়ী—সম্প্রতি কিছু দিন আগে ভেদবমি হইয়া রঘু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রি!—ক্রন্দনের শব্দে জাগরিত হইয়া রঘুর বৌ রূপসী, শায়িত অবস্থাতেই বলিয়া উঠিল, কি হয়েছে গা দিদি ঠাকরোণ?—বলি, এত রাতে কেঁদে উঠলেক কেন গো?

কাঁদিতে কাঁদিতেই বিকাশের মাতা বলিলেন, আর কি হয়েছে? এখুনি একবার এখানে আয় ত বাছা?

বিকাশ ইতিমধ্যে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে, ঘরময় হাতড়াইয়া চারিদিকে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিয়াছে! —মনে ক'রছ তোমায় ধরতে পারবো না? আজ তোমার চুলের ঝুঁটি ছিঁড়ে যদি না দিই, ত কি বলেছি আমি!... টাল সামলাইতে না পারিয়া মুখ থুবড়াইয়া বিকাশ সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে রূপসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বিকাশের ঐ প্রকার ভিত্তিহীন ধাবমান ও পতন অবস্থা দেখিয়া সে ক্ষণিকের জন্য স্থির হইয়া গেল। পরে ব্যাপার বুঝিয়া নিম্নস্বরে বলিল, এ যে 'হাওয়া' দেখ্‌চি গো ঠাকরোণ। বাবু কোথায় গুয়ে ছেলেন?

শিরে করাঘাত করিয়া জননী বলিয়া উঠিলেন, শোবে কোথায়? এই ত ও এলো। বিকেলে খাও, হরিপদ, অজিত—ওদের সঙ্গে সব বেরিয়ে

বন বাদাড়ের দিকে কোথাও গেছলেন নাকি?
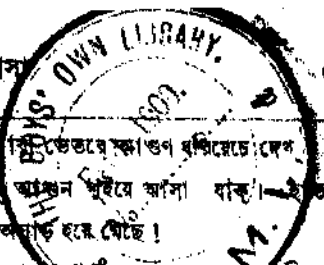
কান্নামাখা সুরে প্রৌঢ়া বলিলেন, তা ত বলতে পারি নে বাছা! এসে অবধি ঐ রকম করছে। কোথাও কিছু নেই, দেয়ালের দিকে চেয়ে কেবল বলছে, তুমি এখানে এলে কেন?...

রূপসীই শেষে যুক্তি দিল। তোমার কোথাও গিয়ে আর কাজ নেই গো ঠাকরোণ। তুমি ওঁকে নিয়ে ওঁর মাথার কাছে বোসোগে। আমি 'গঙ্গাজল'কে ডেকে তুলি আগে। ও বিশু ওঝার বাড়ী চেনে। তাকে একটা খবর দিক্‌,—আমি একবার দাশু বাবুকেও ডেকে আনি। কোথায় গেছলেন, কি হয়েচে, সেটা ও ত জানা দরকার—যদি এখন সেখানে গিয়েই কিছু কাটাতে টাটাতে হয়।

বিষাদমাখা সুরে বিকাশের মাতা বলিলেন, বেশ, তবে তাই কর বাছা, দেখে শুনে আমার হাত পা আসছে না!

ঘাড় দোলাইয়া মুখে একটা 'চুক্‌' করিয়া শব্দ করিয়া রূপসী বলিল, সে কি আবার একটা কথা হোল গা?—একটা মাস্তর ছেলে! কোথাও কিছু নেই, এ সব কি কাণ্ড বাপু!...সে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

দাশু আসিয়া উপস্থিত হইল। ওঝাকে লইয়া রূপসীর 'গঙ্গাজল' এখনো ফিরে নাই।

বিকাশের মাতা বলিলেন, কোথায় সব গিয়েছিলে একবার বলো ত বাবা! এসে অবধি কি রকম করছে!

বিকাশের অবস্থা দেখিয়া দাশু বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল, সে আর শুনে কি করবেন মাসিমা? বিকাশের যতো সব 'উদ্‌ভুটে' খেয়াল! আমরা ত কিছুতেই যাব না। 'বড়-বাগানের' কথা আর কে না জানে, বলুন ত? সন্ধ্যের অল্প একটু পরে আমরা ফিরে আসব ভাবছি, ও জিদ ধরল, বাগানের ভেতরে আগুন জ্বলিয়েছে দেখ, চল্‌ না একটু আগুন পুইয়ে আসা যাক্‌।—ঠাণ্ডা পা গুলো অসাড় হয়ে গেছে!

মরা প্রথমে অমত করলেম, কিছুতেই শুনলে না। শেষে আমার হাত ধরে টানাটানি সুরু করে দিলে, তোমরা—না যাও, আমি একলাই যাচ্ছি। অগত্যা যেতে হোল। কিন্তু আগুন লক্ষ্য করে আমরা যতোই এগুতে লাগলেম, আগুন সেই ততদূরেই।... হরিপদ আমার গা টিপে বললে,—ব্যাপার কি বল'দিকি? আলেয়া নয় ত? আমরা মনে মনে একেই সন্ত্রস্ত ছিলেম, তার কথায় আরো ভয় পেয়ে গেলেম। বিকাশ কিন্তু পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে, বললে, যত তোদের মেয়েলী ধারণা!

অষ্টমীর আধখানা চাঁদ কুয়াসা ভেদ করে তার ম্লান আলোটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে, হঠাৎ বিকাশ চীৎকার করে উঠল, দাশু দেখ দেখ, অমন সুন্দর চেহারা মেয়েটা কোথায় উঠে বসে রয়েছে?—এ্যাঁ! ওটা বাঁশ গাছ না?—দেখ দেখ কি সুন্দর মুখের আকৃতি!

আমরা ক'জনেই দেখলেম। তা ই বটে! চমৎকার চেহার, সুন্দর মুখশ্রী—বয়স বোধ হয় বছর চোদ্দ পনের। আলোর বেশ জোর ছিল না, কাজেই মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাই নি। তবে ঝাপ্‌সা আলোতে যেটুকু দেখলেম, তাতে বুঝলেম নিশ্চয়ই কোন বড় লোকের মেয়ে।

বিকাশ আমাদের পিঠ চাপড়ে বলে উঠল, তোরা না বল'ছিলি, এ বাগানে কেউ আসে না, থাকে না; ঐ ত কোন্‌ ভদ্দরলোক বেড়াতে এসেচে। চল্‌ না গিয়ে একটু আলাপ করে আসা যাক্‌—

...দেখতে দেখতে বাঁশ গাছের ঠিক নীচে এসে উপস্থিত হলেম, কিন্তু কোথাও বসতি বা লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেম না। অলিন্দ

মন আরো সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠল। মুখে কিছু না বলে চুপ করে রইলেম। সামনেই প্রকাণ্ড একটা বাঁশ একেবারে মাটীর ওপর শুয়ে পড়েছে—সচরাচর এ রকম দেখা যায় না, অন্ততঃ মাটী থেকে চার পাঁচ হাত-ও উঁচুতে থাকে। মেয়েটী তখনো সেই ভাবে বসে আছে, আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

বিকাশই প্রথম কথা কইল, তুমি কাদের মেয়ে? গাছে উঠে কি হচ্চে?…মেয়েটী মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু হাত নেড়ে তাকেও উঠে যাবার জন্ত ইঙ্গিত করল। বিকাশ বলল, বাঁশ গাছে ত উঠতে জানি না, তুমি বরং নেমে এস্নো। এই বলে, সেই মাটীর ওপর শায়িত বাঁশটী যেমন সে ডিঙ্গিয়েছে, অমনি সশব্দে তাকে শুদ্ধ নিয়ে বাঁশটা চড়াক্ করে ওপর দিকে উঠে গেল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেম। মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হোল না।

…অল্প পরে দেখি বিকাশ সেই মেয়েটীর ঠিক পাশে বসে আছে, সেও মৃদু মৃদু হাসছে। মুখে তার উদ্বেগের একটা চিহ্নও নাই। আমরা অবাক্ হয়ে তার কার্য্যকলাপ দেখতে লাগলেম। হঠাৎ দেখি মেয়েটা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছে। বিকাশ বিব্রত হয়ে উঠল, শেষ অবধি ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে এবং লজ্জায় আমরা কাঠের মত শক্ত হয়ে গেলাম, মুখ তুলে আর তাকাতে পারি না।

এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, ওকে ফেলেই বা আসি কি করে, এইসব চিন্তা করছি, এমন সময়ে দেখি বিকাশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে।…আমাদের কথা বলবার শক্তি হারিয়ে গেছে। মুখে কোন কথা না বলে গাছের দিকে একবার চাইলেম, কিন্তু মেয়েটীকে আর দেখতে পেলেম না এবং ভয়ে বিস্ময়ে মনের এমনি অবস্থা হয়েছিল, যে বিকাশকেও ও-সম্বন্ধে কিছু জিগেস করতে সাহস হোল না।…

তারপর ত সবাই ভালভাবেই বাড়ী চলে এসেছি।

…রূপসীর 'গঙ্গাজল' দেবীবালা ওঝাকে লইয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বেশ্বর ওরফে বিশু ওঝা দাশুর মুখে আদ্যোপান্ত মোটামুটি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। বলিল, তাহলে মা, আপনারা একটু বাইরে যান, এসব পেত্নীর ব্যাপার, বন্ধন কাজটা আগে সেরে নিই, বলিয়া কতক গুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সরিষা এবং অন্যান্য আর আর কি যেন ছড়াইয়া দিল।

তারপর কতকগুলি মন্ত্র বলিয়া বিকাশের গায়ে কিছু সরিষা ছড়াইয়া দিতেই করুণ কণ্ঠে সে কাঁদিয়া উঠিল,—ঠিক যেন কোন রমণী কাঁদিতেছে!

ওঝা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, তুই কে?

কোন উত্তর নাই। পুনর্ব্বার দু'টী সরিষা ছিট্‌কাইয়া প্রশ্ন হইল, তুই কে বল?

ইতস্ততঃ হাত পা নাড়িয়া উত্তর হইল, বলছি বলছি,—আমি রাণী।

—রাণী? কোথাকার রাণী? কুইন ভিক্টোরিয়া নাকি?

বিদ্রূপের সুরে উত্তর হইল, না গো না, কুইন ভিক্টোরিয়া হতে যাব কোন্ দুঃখে? আর, তাই-ই যদি হবো, তাহ'লে কি তোমার মত দিশী ওঝা আসতো, তখন কতো সাহেব-সুবো আসত। আমি হোলুম বেচু ঘোষালের মেয়ে রাণী।

—কোন্ বেচু ঘোষাল? মাঝ গাঁয়ের নাকি?

—হাঁ গো, হাঁ।

—তা' তুই এখানে কি মনে করে?

হঠাৎ স্ত্রী কণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া হাসির আওয়াজ হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল,

যাঃ রে, আমার স্বামীর কাছে আমি আসতে পারো না ?

—তোর স্বামী ? তোর ত বারুইপুরে এক বুড়ো জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ? বিকাশ বাবু কি করে তোর স্বামী হোলেন ?

বিকাশের মাতা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। পেচু ঘোষালের মেয়ে রাণীর নাম শুনিয়া তিনি একটী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন,—আহা, পোড়াকপালী !

বিশু জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা, কিছু জানেন নাকি ?

—জানিনে আবার ? ঐ রাণীই ত আমার ঘরের রাণী হয়ে আজ ঘুরে বেড়াবার কথা বিশু ! বিয়ের সব ঠিক ঠাক, মায় আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে ; হঠাৎ ওর বাপ টাকার লোভে এক বাষট্টি বছরের বুড়ো জমিদারের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে। তিনটী মাস গেল না, বিধবা হোল। শেষে গলায় দড়ি দিয়ে হতভাগী এই ত ক'মাস হোল মরেছে।

চুপিসাড়ে বিশু কহিল, তাহলে ত মা, বাবুকে বাঁচান শক্ত হবে। তারপর বিকাশের উদ্দেশ্যে বলিল,—সব বুঝেছি, তুই ত এখন আর এ জগতের নোস্—এখন ওঁকে ছেড়ে চলে য।

—তুমি কি তোমার বৌকে ছেড়ে চলে যাও ? কিম্বা তোমার বৌকে কেউ যদি বলে, তোর স্বামীকে নিয়ে চললুম, আর তুমি তার পাশে থাকো, তাহলে সে তোমা'য় ছেড়ে দেয় ?

—আমরা যে জ্যান্ত-মানুষ !

—কেন, তোমরাই ত বলো, অপঘাতে যারা মরে তারা ঠিক মরে না।

—ওসব বাজে কথা নয়, ভালভাবে বলছি চলে যাও। নইলে আমার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু।

দাশু অদূরেই বসিয়াছিল। সংজ্ঞাহীন বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া সে বলিল, তাহলে উপায় ?

বিশু বলিল, উপায় আমার জানা আছে, একবার বেয়ে চেয়ে' দেখি। এরকম কেস্গুলো প্রায়ই বড় গোলমেলে হয়ে যায়।

বিষাদের মধ্যেও দাশুর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু যতোই বলো বিশু, আমার এ-সব কি রকম কি রকম লাগছে। নেহাৎ চোখে দেখা,—নৈলে এ-ও আবার সম্ভব নাকি !

ও কথা বলবেন না বাবু। ওরা 'উপরি দেবতা', —আমি জানি, একজন এইরকম ঠাট্টা করেছিল বলে তার ঘাড় ধরে উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল।

বাধা দিয়া দাশু বলিল, থাক্, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। ওরা লোক বুঝেই ওসব করে। বলি আমরাও ত ক'জনে সঙ্গে ছিলুম, আমাদের কিছু হ'ল ? কিছু না মনের ভুল।

থামুন বাবু, বিশ্বাস যদি নাই হয় চুপ করে থাকুন। ওসব কথা বলে—

হাসিয়া দাশু কি বলিতে যাইতেছিল—

তাহার মুখের কথা মুখেই লোপ পাইল। হঠাৎ বিশুর পায়ের কাছে পড়িয়া সে গোঁঙাইতে গোঁঙাইতে মাটিতে মুখ ঘষিতে শুরু করিল।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই সকলেই প্রমাদ গণিলেন। বিকাশের মাতা গোলমাল করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

মুখ ঘষিতে ঘষিতে মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া গেল, সেদিকে দাশুর খেয়াল নাই ! হঠাৎ উঠিয়া বিশু মন্ত্র পড়িয়া প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই সে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। পরে রাস্তায় পড়িয়া রীতিমত ছুটিতে লাগিল।

বিশু তাড়াতাড়ি কতকগুলি ধূলা

বাহিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, খবরদার।

দাশুর গতিরোধ হইল, রাস্তার মাঝেই যে সশব্দে পড়িয়া গেল। বিশু তাহার নিকটে আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, চলো, উঠে চলো।

ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত দাশু তাহার পিছু পিছু ফিরিয়া আসিল। বিকাশ তখনো সেইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ইতিমধ্যে আরও একটী অভাবনয়ী কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দাশুর শয়ন গৃহের পার্শ্বেই তাহার পিতা করুণাময়ের শয়ন ঘর। হঠাৎ দাশুর শয়ন-গৃহে একটা ভারী জিনিষ পড়িয়া যাইবার মত বিকট শব্দ হইল। কতকগুলি বাসন ইত্যাদি একটী 'তাকের' উপর গুছান ছিল—ঝন্ ঝন্ করিয়া সেগুলি পড়িয়া গেল। করুণাময় উঠিয়া হ্যারিকেনের পলিতাটি বাড়াইয়া দিয়া দাশুর ঘরের দ্বার ঠেলিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। যেন প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—গৃহের প্রত্যেকটী জিনিষই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। টেবিলের উপরের বইগুলি স্তূপীকৃত হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। দোয়াতটী উপুড় হইয়া অনেকটা স্থান মসীলিপ্ত করিয়াছে। বিছানা-পত্র চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ান। খাটের 'ছত্রি' ভাঙ্গা; মশারিটী খুলিয়া ফেলা হইয়াছে।...

একটা ঘূর্ণী বায়ুর মত কি যেন সজোরে করুণাময়কে ধাক্কা মারিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দাশুর মাতা সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, এসব ত বড় ভাল কথা নয়! একবার বিকাশদের ওখানে যাও দেখি!...

বিকাশের বাটীতে পুত্রের অবস্থা দেখিয়া করুণাময় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, যতো টাকা লাগে আমি দেব, তুই ওদের দু'টোকে বাঁচিয়ে দে বাবা।

হঠাৎ সংজ্ঞাহীন বিকাশ স্ত্রীকণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল: বাপের মন ত নরম আছে, ছেলে যেন মিলিটারী!

বিশু বলিল, ছেলে মানুষী করে না। ওদের ছেড়ে তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও, বলছি।

অল্প কিছু পরে স্ত্রীকণ্ঠে বিকাশেরই মুখ দিয়া উত্তর হইল, দাশু পরপুরুষ, ওঁকে না হয় তোমার কথায় ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু—

বাধা দিয়া বিশু বলিল,—নানা এর ভেতর আর কিন্তু-টিন্তু চলবে না। থলির ভিতর হইতে কি যেন লইবার জন্য বিশু হাত বাড়াইল, কিন্তু সকলের চোখের সম্মুখে থলিটী ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

বিরক্তির স্বরে বিশু হাঁকিয়া উঠিল, আবার?

হঠাৎ ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া একটা উচ্চহাস্য করিয়া বিকাশ খুব জোরে উপবিষ্টা জননীর কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল।···

সদ্যনিদ্রোত্থিতের মত দাশু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। করুণাময় তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন।

···জিনিষ পত্রগুলি থলির মধ্যে গুছাইতে গুছাইতে বিশু বলিল, কিছুই পারলাম না মা, সব শেষ হয়ে গেছে। এ ওদের মনের মিল, প্রাণের ভালবাসা;—এ সব ছাড়ান বড় শক্ত ব্যাপার!

জননী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগী এই তোর মনে ছিল!

আদিম জন্তু

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বই কেনেন পুরুষরা,—পড়াশোনা চর্চ্চাও চলে সে বিষয়ে—

মেয়েদের বিদুষী বলা যায় কি না আর শিক্ষিতাও কি না বলা যায় না। অবসরে বাংলা বই নিয়ে তাঁরাও নাড়া চাড়া করেন। আলোচনাও হয় তাঁদের, সেটা প্রায় কঠিন বা সহজ অবোধ্য কথার মানে নিয়ে।—

সন্ধ্যাবেলা পুরুষরা বেড়িয়ে ফেরেন না,—আর ছোট ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ে—এমনি ধারা সময়ই অবসর;—তাস, বই, গল্প, আলোচনা অবাধে চলে।

সুতরাং সেজ-বৌ বল্লেন, 'ভাই তোমার শেষ হ'ল ওইটা?

ফিরিওয়ালার কাছে কেনা একটা চক-চকে মলাটের বই ছোট-বৌ পড়ছিল।

'হুঁ দিচ্ছি ভাই'—

সেজ-বৌ কি আর বল্লেন, 'আচ্ছা ভাই বড়দি, চতুরঙ্গ পড়েছ, আদিম জন্তুটা কি?—'

গা যেন শিউরে ওঠে'—বড়দি বল্লেন।

মেজ-বৌ বল্লেন, কি সে পড়লে?—

সেজ-বৌ বল্লে, 'এই চতুরঙ্গে।'

কিন্তু কি ওটা?—' বড়-বৌ বল্লেন।—

সেজ-বৌর মনে হ'ল, সরীসৃপ জাতীয়—কথাটা আছে। গায়ে যেন কাঁটা দেয়! সাপ? টিকটিকী?

'সরীসৃপ জাতীয়'?—

জেঠতুতো খুড়তুতো ননদরা দু'তিনজন ছিল ওপাশে তাসে মগ্ন হয়ে।

'ঠাকুঝি, জানো নাকি?—ওই আদিম জন্তু

ঠাকুঝিদেরও মাঝে ঐ অস্বস্তিসূচক ভাবটা প্রকাশ পেল। কিন্তু তারাও কিছু যখন বিশেষ বলতে পারলেন না। মেজ-বৌ বল্লে, আজকে জিজ্ঞেস করি সেজ-ঠাকুর পোকে।

খুড়তুতো ননদ বল্লেন—সেও মনে করবে।—ও আর কি—এই—কিন্তু তিনিও পারলেন না।

ন-বোর বাপের বাড়ীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে, খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল কোণের খাটে বসে, খোকা ঘুমলে সে উঠে এলো, কি জানি, আমার মনে হয়, মনের যেন কি একটা ভাব?

যাঃ—মেজ-জা বল্লে!

'আচ্ছা, জিজ্ঞেস করো ভাই সেজ-বড়ঠাকুরকে—'

'হুঁ—আমি জিজ্ঞেস করি—আর আমাকে ঠাট্টা করুন চিরকাল ধরে—'

—সকলেই হাসলে।—

'তাহ'লে চুপ করেই থাক্, মেজ-বৌ হেসে বল্লেন।

জুতোর শব্দ শোনা গেল বারাণ্ডায়। বধূরা, বোনেরা চকিত হয়ে রান্না ঘর খাবার ঘরের তত্ত্বাবধানে উঠে পড়লেন।

সব ভাইদের খাওয়া হয়ে গেছে, আহারান্তে হাতে লেবু নুন রগড়াতে রগড়াতে প্রাণখোলা হাসি গল্পালাপ চলছে—একটু পরে বড়রা দু'ভাই উঠে গেলেন।

মেজ-বৌ বল্লেন, 'হ্যাঁ ঠাকুর পো, আদিম জ মানে কি ভাই?'

'আদিম জন্তু?' সবিস্ময়ে তিন ঠাকুর

'জান না ?'—কোনে সেজ-বৌ ওরাও জানে না—

'কিসের কথা ছাই—কিসে আছে ?,—

'আহা আজ মেজ-বৌ ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ না কি পড়ছিল, তাইতে ওরা বল্লে সাপ'—

ছোট ভাই খুব পড়ে—সে অট্টহাস্য কল্লে—ও মেজদা মনে নেই ?—

সকলেরই মনে পড়ল, হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল—মানে কেউ বল্লে না।

শুধু ছোট ঠাকুরপো মেজ-বধূকে গম্ভীরভাবে বল্লে, কেউটে সাপের আয়ুর্ব্বেদিক নাম।

ন-বৌ ছোট-বৌ পান সাজছিল—কনিষ্ঠ দেওর ন-বৌয়ের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।—

মেজ, ন'-ভাই হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল।—

দলের মধ্যে ছোট বালবিধবা নিরুপমা ছিল সভার মাঝ। বইকটা তার ও পড়া।

শোবার অবসরে বইখানা খুল্লে।

রাত্রি শুরু হয়ে গেছে—বিছানার ওপাশে যারা—তারা ঘুমুচ্ছে। বাড়ীর সবাই বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।

নিরু বই সাজ করে—মুড়লে। আদিম জন্তুটার নাম কি—কোথায়—কোন মাটির মাঝে, গুহার মাঝে বাস কে জানে ? মনেই যেন ? কেমন যেন অস্পষ্ট ভাবের—বোঝা যায় না।

নিরু আলো নিবিয়ে দিলে, দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। পাশে ন-বৌয়ের ঘরে যেন ন-দাদা ন-বৌর হাসি গুঞ্জন শোনা গেল।

মাসটা শ্রাবণ নয়—কিন্তু অসাময়িক মেঘের আগমনে আকাশের আলো ভাগে ভাগে ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টি ফোঁটা কতক হয়েছিল যেন—

বইয়ের কথার মানে বোঝা যায় নি। কিন্তু নিরুর মনটি কি অনির্দ্দেশ্য বেদনায় ভরে উঠছিল—কে জানে, তার চোখ ছাপিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা জল ঝরে পড়তে লাগল।
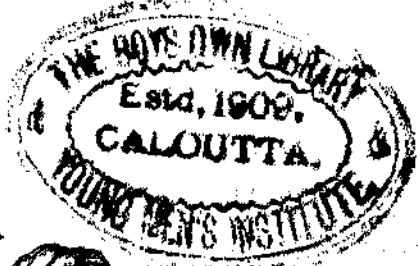
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০	দ্বিতীয় সংখ্যা

যোগসূত্র

(গল্প)

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

মনের সম্পর্ক না রেখেও কদম একরকম স্বচ্ছন্দেই স্বামীর সংসারটীর চাকা ঘুরিয়ে চ'লেছিল। মনের আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ জম্‌লেও সে শরতের মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী, সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের গা গড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উড়ে যেতো। মেঘ জম্‌তো যেম্‌নি চকিতে, তেম্‌নি মনের আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে ঝল্‌মল কর্‌তোও, চকিতে।

এম্‌নিভাবেই কদম এই দীর্ঘ সাতটী বচ্ছর স্বামীর ঘর কর্‌চে। স্বামী মনের বাঁধন দিয়ে তার মনকে হয়তো নিবিড় অটুট্ ক'রে কোনদিনই বাঁধতে পারে নি, কিন্তু অবনিবনাও তাদের মাঝে এতটুকু ছিল না।

খোলা উঠানের পাশে মস্ত ঐ কৎবেলের গাছটার নীচে স্বামী চন্দর ঝুড়ি চুপ্‌ড়ী বোনে, কদম গোয়ালের কাজকর্ম সেরে ঘরের দাওয়ায় রান্না করে। বেলা বাড়তে থাকে, মাথার ওপর সূর্যি এসে দাঁড়ায়, চন্দরের হুঁস্ থাকে না, কাজ করেই যায়। কদম এসে জানায় রান্না হ'য়েচে। চন্দর মাথায় তেল ঘস্‌তে ঘস্‌তে পুকুরে ডুব দিতে যায়।

দুপুরে আবার তারা দুজনে একসঙ্গে চুপ্‌ড়ী বুনতে বসে সেই গাছের ছায়ায়। কদম ভিজে চুলের রাশ পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে, পুরন্ত গালের ভেতর থাকে দোক্তা পান। পানের রসে ভিজে রাঙা ঠোঁট দু'খানি তার মৃদু কাঁপ্‌তে থাকে, আঙ্গুলগুলি নাচ্‌তে থাকে চুপ্‌ড়ির ফাঁকে ফাঁকে দ্রুতগতিতে! পাশে বাঁশ চিরতে চিরতে চন্দর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায় তার মুখের পানে চেয়ে। কদম জানতে পেরে, কটাক্ষ হেনে তাকে শাসন করে। চন্দর হাস্‌তে হাস্‌তে হাতের কাটারিখানা মাটিতে ফেলে তার পাশে এসে,

বসে। কদম তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় কিংবা নিজে স'রে ব'সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চন্দর টল্‌তে টল্‌তে উঠে গিয়ে আবার কাজে মন দেয়।

কদম নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়, কাজের মাঝে। কাজের ভীড়ে সে তার নিঃসঙ্গ মনের নির্জ্জনতা ঘোচাতে চায়, চন্দরের হাত হ'তে অব্যাহতি পেতে চায়। কেন? সেই জানে। রাত্রে, চন্দরের উঠানে যখন ডোমপাড়ার যুবকদের বৈঠক বস্‌তো, তাড়ির ভাঁড় আর ঢোলকের সঙ্গে গানের হর্‌রা উঠ্‌তো, কদম তখন কাজের অভাবে নিঃশব্দে ঘরের দাওয়ার আঁধার কোনে বসে স্বপ্ন দেখতো এক ছায়া সুনিবিড় গাঁয়ের বুকে তার শৈশবের ও কৈশোরের সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার কত যে ছোট খাট কাহিনী! কি আনন্দেই বুকখানা ভরপুর হ'য়ে থাক্‌তো। —কত আশাই না তার আগত যৌবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌তো। সেই হারানো দিনের সহস্রসুখ-স্মৃতি তার অনুভূতিকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌তো।

পাশের গাঁয়ে হাট হয় প্রতি বুধবারে। সারা সপ্তা কদম ও চন্দর যা কিছু ঝুড়ি, চুপ্‌ড়ী তৈরি করে, বুধবারে তাই নিয়ে হাটে যায়, বেচতে।

হাটের দিন শেষ রাতে গাড়ী বোঝাই ঝুড়ি চুপ্‌ড়ী নিয়ে তারা হাটে যায়। দু'টি গাঁয়ের মাঝে ক্রোশ দুই ব্যাপী ধানের মাঠ। ধানের জলায় কোলে কোলে আঁকা বাঁকা মেঠো পথ। সেই পথে গাড়ী চল্‌তে থাকে মন্থর গতিতে। চন্দর গরু তাড়ায় গাড়ীর সাম্‌নে ব'সে, গাড়ীর মাঝখানে ঝুড়ির স্তূপের উপর পা ঝুলিয়ে বসে, কদম। চোখে ঘুমের নেশা ভোরের হাওয়ায় ঘন হ'য়ে ওঠে, সে ঘুমমন্থর চোখে পূর্ব্বাকাশের যেখানটায় ধীরে ধীরে আঁধার সরে গিয়ে আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে সেই দিকে চায়। পথের ধারে গাছের মাথায় পাখীরা চঞ্চল হ'য়ে কলরব ক'রে ওঠে আলোকের আভাস পেয়ে। জাগরণের সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। বাঁশঝোপের পাতায় পাতায় শিহরণ জেগে ওঠে, পথের ধারে ডোবার জল হিল্লোলে কাঁপ্‌তে থাকে, দিগন্তে আলোর রেখাগুলো নেচে নেচে স্পষ্ট হ'য়ে কদমের চোখের সাম্‌নে আসন্ন প্রভাত কত-না আশায় শিখা জ্বেলে আগ্রহে কাঁপতে থাকে। চন্দর আবিষ্টের মত মুখে রকমারি আওয়াজ দিতে দিতে গরু হাঁকিয়ে চলে। মন্থর গতিতে গাড়ী চল্‌তে থাকে, কদমের সারা দেহটা গাড়ীর তালে দুলে ওঠে, দেহের প্রতিটি শিরায় ঘুমন্ত নিথর রক্ত ধারা জেগে উঠে কানাকানি করতে থাকে। ভোরের বাতাস তার তপ্ত-দেহের পরশ পেয়ে সঙ্কোচে ফিরে যায়। চন্দরের পানে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। সে মুখ ফিরিয়ে স্বপ্নঘেরা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পানে চায়। সেই আলো আঁধারে ঢাকা ঝাপ্‌সা মাঠের বুক হতে মাথা উঁচু করে তার চোখের সামনে নাচতে থাকে বিস্মৃতদিনের কত সে ছবি। মনে পড়ে দূরদূরান্তের ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের অন্তরালে একখানি পরিচিত কুটীরের মাঝে কার সুশ্যামল, সুপুষ্ট দেহ,—সুদর্শন মুখের উপর কার একজোড়া উজ্জ্বল দীর্ঘায়ত চোখ! তার কাছে ঐ চন্দর! চন্দরের সাথে তার মিলন, সে শুধু অদৃষ্টের নির্ম্মম উপহাস! তার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা!

কিন্তু চন্দর তার সুখের জন্য উন্মুখ! আর সে?—সে শয়তান! সে কদমের মনটাকে পাথরের উপর আছড়ে ভেঙেছে। কদমকে নিঃস্ব কাঙাল করেছে সে,—লজ্জার পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দিয়েচে।

কদম সোজা হয়ে ব'সে শাড়ীর আঁচলটা টেনে টেনে গায় জড়ায়। তার মনের এই লজ্জাকর দৈন্যতাকে ঢাকা দেবার জন্যই যেন তার এই সতর্কতা!...না, সে তার কথা ভাববে

না। সে তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে।

চন্দরের পানে চেয়ে সে ভাবে বুকের জড়ো-করা ব্যর্থতা নিংড়ে সে ওই আপনভোলা মানুষটিকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুল্‌বে। নিজের ব্যর্থতা যেন ওর জীবনের বসন্তকে বর্ষার মেঘে ঢেকে না দেয়। কদম ঐ শুক্‌নো কঠিন মাঠের মতই শক্ত হ'তে চায়।

শক্ত হ'য়েই সে চলে, এই হাটের দিনটিতে। সপ্তাহের এই দিনটি যেন তার স্বপ্নের ঘোরে, একটা আনন্দময় চেতনার মাঝ দিয়ে কেটে যায়। উদ্বেলিত বুকখানা চেপে সে কাজে মন দেয়। সেও আসে এই হাটে নিজের গাঁ হ'তে জিনিষ বেচ্‌তে। সঙ্গে আসে তার স্ত্রী।

খুব শক্ত হ'য়েই কদম তাদের এড়িয়ে চল্‌তে চায়, কিন্তু সঙ্গোপনে তাকে দেখ্‌বার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার সকল কাঠিন্যকে সজল আকাশের মতোই কোমল ক'রে তোলে। শরীরের প্রতি তন্ত্রীতে নূতনতরো রক্তের ঢেউ লাগে, নূতনতরো ক্ষুধার চেতনায় তার সারা শরীর আকুলি বিকুলি ক'রে ওঠে। সে চন্দরের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে পা ফেলে এক সময় এসে দাঁড়ায়, হাটের পশ্চিমের অশথ-গাছটার নীচে, যার অনতিদূরে ভোলা দোকান সাজিয়ে বসে। কদমের বিশুষ্ক রুক্ষ মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির লাবণ্য; চোখ হ'তে ঠিক্‌রে প'ড়ে তীব্রোজ্জ্বল আশার শিখা, মন্থর মস্তিষ্কে সজাগ হ'য়ে ওটে আনন্দময় উদ্দীপনা! সে সঙ্গোপনে ভোলার মুখের পানে এম্‌নি বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে থাকে, যেন সেইটুকুই তার ব্যর্থ জীবনের সঙ্গতি। পাবার অধিকার থেকে সংসার তাকে বঞ্চিত করলেও, এ অধিকারটুকু কেউ তার কাড়্‌তে পারে নি, পারবে না। বুঝিবা ভোলার পাশের ঐ নারীও নয়!

রাগে তার সর্ব্বশরীর কেঁপে ওঠে। মুখ-চোখ আবার কঠিন হয়ে ওঠে। ওই কদর্য্য নির্লজ্জা নারীই তো তাকে কেন্দ্রচ্যুত ক'রে নীচে নামিয়ে দিলে, তার জীবনের অবারিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে শূন্যতায় ভরিয়ে দিলে। এই নির্লজ্জ প্রলোভনের হাত হ'তে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কদম সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে। মনকে এমনভাবে প্রশ্রয় দেওয়া চল্‌বে না, কিছুতে না। এ হীনতা সে সহ্য করতে পারবে না—নিতান্ত দেহের তাড়নায়। এবার হ'তে কঠিন হয়ে সে নিজেকে শাসন কর্‌বে। সে দ্রুতপদে ছুটে চলে স্বামীর কাছে সেই আতঙ্কময় শূন্যতার অতল গ্রাস হতে রক্ষা পাবার আশায়।

ভোলা আর হাটে আসে না। ক'হপ্তাই কদম ভোলাদের হাটে দেখ্‌তে পেলে না। কদমের সন্ধানী চোখদুটি ভোলার খোঁজে ব্যাকুল হ'য়ে হাটের আপ্রান্ত ঘুরে বেড়ায়। সপ্তাহে একটিবার দেখার তৃপ্তিই কদমকে আবার পূর্ণ একটি সপ্তাহ এক অনুভূতিহীন গাঢ় তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তো, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন কদম তাদের দেখাও পেলে না এবং তাদের কোন সন্ধানও করতে পারলে না তখন তার মনে হলো এক সীমাহীন আঁধার গহ্বরের অতলে কে যেন তাকে হিড়্‌ হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে চলেছে। আতঙ্কে তার শরীরের হাড়গুলো পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌তে লাগল'। এতদিন যাকে এড়িয়ে চল্‌বার জন্য, নিজের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে প্রতিক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকৃতো, তারই অদর্শন যে তাকে এমনি ভাবে নিষ্পেষিত ক'রে ফেল্‌বে, এ ছিল কদমের ধারনার অতীত!

সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে হাটের দিনটির প্রতীক্ষা করে। বুকে আশার শিখা জেলে চন্দরের সঙ্গে হাটে যায়, কিন্তু সারাদিন অপেক্ষা ক'রেও যখন

তাদের সন্ধান পায় না, তখন তার বুকের আশা ভরসা যায় ধোঁয়া হয়ে শূন্যের কোলে মিলিয়ে—চোখ দু'টি সজল হ'য়ে ওঠে!

সে ভেবে কিছু ঠিক্ করতে পারে না, কেন সে আসে না, এবং আর কখনো সে আস্‌বে কি না। উচ্ছসিত আর্ত্তবায়ুর মতই তার বুকের নীচেটা হাহা কর্‌তে থাকে। সে দিক্‌হারার মতো থম্‌কে দাঁড়ায়, চল্‌বার পথ খুঁজে পায় না।

তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে সেদিন ঠিক্ দুপুর বেলাতেই ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় করে কদম বেরিয়ে পড়লো, তাদের গাঁয়ের দিকে। কিন্তু যেতে তাকে হলো না। তাদের বাড়ীর বাইরে আস্‌তেই কদম দেখ্‌লে উঁচু ঢিবিটার ওপর একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে একটা লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে,—হাতে একটা পুটুলির মত কি নিয়ে।

কদম চোখদুটি বিস্ফারিত ক'রে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে, যে দাঁড়িয়ে আছে সে ভোলা। ভোলাও বুঝি তাকে দেখ্‌তে পেলে। দেখামাত্রই সে মাথা নীচু ক'রে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো কদমের কাছে।

কদমের আহত অভিমান মাথা উঁচু ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল। নিজেকে রক্ষা করবার জন্য যতটুকু কঠিন হওয়া প্রয়োজন সেইটুকু রুক্ষতার আবরণ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভোলা তার সাম্‌নে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো নিঃশব্দে। কদম অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করলে, ভোলার দেহের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মুখের সে লাবণ্য নেই, চোখের ঔজ্জ্বল্য নেই, মুখের প্রতিটি রেখায় অব্যক্ত দুঃসহ যাতনার চিহ্ন! রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল, মুখখানা দাড়ি গোঁফের বাহুল্যে কণ্টকাকীর্ণ। তার চেহারা দেখে কদমের মায়া হলো। তবু সে নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে না। কঠিন হয়ে নিজেকে চোখ রাঙালে।

ভোলা পুটুলির মত জিনিষটাকে নীচু করে কদমের দৃষ্টির তলে ধরে ভগ্নকণ্ঠে বললে, এর মা মরে গেছে কদম, সাতদিনের জ্বরে।

কদম পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে অপলকে চেয়ে রইল, কাঁথায় জড়ানো খুদে ছেলেটার পানে। গোল-গাল তুল্‌তুলে দেহটি, ছোট ছোট হাত পা গুলি, কালো মুখের ওপর পুটপুটে উজ্জ্বল দুটি চোখ, মাথায় একরাশ পাৎলা কালো চুল। কদম চেয়েই থাকে, স্তব্ধ বিস্ময়ে! ছেলেটার মুখটি যেন একেবারে বাপের মুখের ছাঁচে গড়া।

ভোলা ধরা গলায় মিনতির সুরে বললে, তুই একে নে কদম, নইলে এ বাঁচ্‌বে না।

কদমের বুকের নীচেটা উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো, সারা শরীরটা শির্ শির্ কর্‌তে লাগ্‌লো। রুক্ষ তাচ্ছিল্যে তার মুখখানা সহসা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। সে নিরতিশয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, আমার ব'য়ে গেচে ওকে নেবার জন্যে। মরুক্ না—আমার কি? মা মাগী নিজে গেল, আর ওকে নিয়ে যেতে পার্‌লো না?—

কদম সদর্পে সজোরে পা ফেলে চলে যাচ্ছিল, ভোলা ডাকলে, কদম!

ভোলার আর্ত্তস্বর কদমকে উচ্চকিত ক'রে তুল্‌লে। বহুদিনের পরিচিত এই ডাক তার গতিরোধ করল।

—বাস্‌নে কদম।

কদম ফিরে দাঁড়াল। মুখে সেই শুষ্ক বিরূপতা! চোখে উদ্ধত দৃষ্টি! ভোলা মাথা নীচু করলে।

কদম চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, একি অত্যাচার! আমি কেন তোর ছেলে নিতে যাব? বেঁচে শত্রুতা করেও মাগীর ঝাল মেটে নি। মরেও আমার সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বে?

—না কদম, শত্রুতা তো সে করে নি। মর-

বার সময় সেই আমায় পথ দেখিয়ে দিলে, সেই বলে গেল, ছেলেটাকে কদমকে দিও, সে তোমায় ভালোবাসে, ওকে ভালো না বেসে পারবে না।

শেষের দিকে ভোলার স্বর কেমন মুখের মাঝে জড়িয়ে গেল। কদম গন্‌গনে আগুনের মতো মুখ রাঙা ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, মরণ দশা আমার! ঘুম হয় না তোমায় ভালোবাসবার জন্যে। চলে যা আমার সাম্‌নে হ'তে, আমি পারবো না ও সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে। শত্রুর ছেলেকে আমি ঘরে পুষতে পারবো না।

ভোলার রেখাঙ্কিত শীর্ণ মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, চোখে ফুটে উঠ্‌লো নীরব কাকুতি! সে নিঃশব্দে নতমুখে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলো কদমের পরিপূর্ণ দৃষ্টির তলে!

ভোলার সেই নিঃসহায় নীরবতা কদমের নারীমনের দুর্ব্বল কোনটিতে সজোরে আঘাত করলে। সে অসহ্য অস্থিরতায় বলে উঠ্‌ল, আবার দাঁড়িয়ে রইলি বড়? আমার জবাব ত পেয়েচিস। এখন যে পথে এসেচিস, সেই পথে ফিরে যা—আমি চল্‌লুম।

ভোলা তেম্‌নি নিশ্চল, নির্ব্বাক। কদম যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে, ভোলার হাড় উঁচু গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেচে। কদম মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, পরক্ষনেই দুর্ব্বহ যাতনায় সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, ওরে বাবা, একি শত্রুতা! একি পাপ!

ভোলা নিরতিশয় লজ্জায় হাতের কনুয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে, একে দয়া কর্ কদম, একে বাঁচা—

সহসা একটা অসহ্য উত্তেজনার ঝাঁকানিতে তার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো, সে টিপ, করে ছেলেটাকে কদমের পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়ে বলল, তোর পায়ের তলায় একে ফেলে দিয়ে চল্‌লুম, তোর যা খুসী তাই করিস্, ইচ্ছে হয় ওই ডোবার জলে ফেলে দিস্। আমি আর দেখতেও আস্‌বো না—

ভোলা যে সত্যি সত্যিই চলে গেল! কদমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তার কান্নার ইচ্ছেকে রোধ করে দিলে, ছেলেটার কান্না।

কদম চোরের মত চুপিসাড়ে, ছেলেটার গায়ের ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়ে বলল, ওরে বাবা একি! শত্রুতা, একি পাপ। মুখে বল্‌লেও কিন্তু ছেলেটার পানে চেয়ে তার চোখদুটো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ছেলেটার কান্না শুনেও তো ভোলা একবার পাছু ফিরে তাকালো না। কদম সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটার পানে চেয়ে গজ গজ করতে লাগলো, রাক্কুসী কি ছেলেই পেটে ধরেছিল, হাসা করবার ঢং দেখো একবার। ছিরি হয়েছেও তেম্‌নি ডাইনি মায়ের মতো। তারপর ভোলাকে উদ্দেশ করে উঁচু গলায় বলল, নিয়ে চললুম একে, কিন্তু ওই ছুতো করে যে যখন তখন এসে আমার সঙ্গে আবার ভাব জমাবে, তা হবে না। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

পরদিনই দেখা গেল, ছেলেটার গা'টা তেল চকচকে হ'য়েচে, চোখে কাজল পড়েচে, দাওয়ায় দড়ির উপর শুকোচ্চে রং-বেরঙের কতকগুলো কাঁথা!

*　　　*　　　*

কদমের নারীমনের অতিবড় বেদনার স্থানটিতে আঘাত ক'রে ক'রে যারা তার জীবনকে দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছিল, তাদেরই শিশুটির জীবনের হিসাব নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবার সে সংসারে চলাফেরা সুরু করলে। চন্দর কিন্তু এই অনিমন্ত্রিত শিশুটির আগমনে তার জীবন-আকাশের এক কোণে প্রলয়কর দুর্য্যোগের সূচনা।

দেখ্‌তে পেল। কিন্তু কদমকে বাধা দেবার শক্তি তার ছিল না। মাঝে মাঝে কদমের পানে চেয়ে তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তো! কদম ছেলেটিকে পেয়ে অবধি যেন বড় বেশী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, মন যেন তার সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে অচেতন হ'য়ে পড়েচে। চন্দর তার নাগাল পায় না, কাছে আস্‌বার মত সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। সে দূর হ'তেই তার উপর চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

চন্দরের সংসারে আস্‌বার পর হ'তে যে-সব কথা কোনদিন ভাববার প্রয়োজন হয়নি আজকাল সেই সব নিয়েই কদমকে মাথা ঘামাতে হয়। ছেলের কাঁথা সেলাই, দুধটুকু জ্বাল দেওয়া এম্‌নি সব ছোটখাট কাজগুলি শেষ ক'রে তাদের [illegible]নের রান্না করতেই তার দিন যায় কেটে। ছেলেকে দাওয়ার একপাশে কাঁথায় শুইয়ে কদম রান্না করে। রান্না করতে করতে কদম ছুটে গিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আদর করে। দুপুরে, স্বামীকে সাহায্য করার পাটটি গেচে উঠে, এই ছেলেটি আসার পর হ'তে। সারা দুপুর সে ছেলের সঙ্গে খেলা করে, তাকে আদরে চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। একটা গভীর তৃপ্তি তার মুখে-চোখে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে।

ছেলেটা কাঁদতে থাকে, কদম এদিক্‌ ওদিক্‌ চেয়ে, সঙ্গোপনে নিজের স্তনাগ্রটি দেয় তার মুখে গুঁজে। দুষ্টু ছেলে পরম আরামে চুক্‌ চুক্‌ করে টান্‌তে থাকে। বুকের রস কিছু পায় কিনা সেই জানে, কিন্তু সে নিঃশব্দে গভীর আরামে চোখ বুঁজে চুষ্‌তে থাকে। কদমের সমস্ত শরীর অনভূত পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, তার শিরায় রক্তধারা উত্তাল হ'য়ে ছুটে আসে বুকের পানে, অনভ্যস্ত পীবর বক্ষদুটি অপরিসীম আনন্দের ব্যথায় ভারী হ'য়ে ওঠে।

* * *

সন্ধ্যা হয় হয়। দু'হাতে দুটো তাড়ির ভাঁড় নিয়ে চন্দর বাড়ী ঢুক্‌লো! উঠোনের মাঝে কদম ছেলেটাকে বুকে নিয়ে নাচাচ্ছিল, ছেলেটা দু'হাতে দুমুঠো চুল ধ'রে টানাটানি করছিল। কদম কিছুতেই তার ছোট্ট হাতের মুঠো হ'তে তার চুলগুলো মুক্ত করতে পারছিল না। কদম তার হাত হ'তে চুল ছাড়াবার চেষ্টা করচে, আর ছেলেটা ফিক্‌ ফিক্‌ ক'রে হাস্‌চে। ছেলেটার হাসি, তার কচি পরশ কদমকে বিভ্রান্ত ক'রে তুল্‌চে। বিহ্বলের মতো কদম তার নিষ্পাপ ফুলের মতো দেহটাকে মুঠোর মাঝে জড়ো ক'রে ধরে গভীর তৃপ্তিতে তার গালে, মুখে, বুকে, চুমো দিচ্চে। সে এম্‌নি মগ্ন যে চন্দর কখন্‌ যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েচে, জান্তেও পারে নি।

চন্দর ক্ষুধার উদ্রেকে বেশ একটু উগ্র হ'য়েই এসেছিল, তার ওপর এই দৃশ্য তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌লে। তার ইচ্ছে হলো ছেলেটাকে কদমের কোল হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে দিতে। সে পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগলো, কদম জানতেও পারলে না। অসহিষ্ণু হ'য়ে শেষে একসময় চন্দর বল্‌লে, খিদে লেগেচে, খেতে টেতে দিবি না ঐ কুড়োনো হাবাতে ছেলেটাকে নিয়ে সোহাগ করবি। দিনরাত ভালোও লাগে।

কদম ফিক্‌ ক'রে একটু হেসে বল্‌লে, দেখ্‌না কি রকম হাস্‌চে। কী মায়াবী ছেলে বল্‌তো— যেন আমাকে একবারে পেয়ে ব'সেচে।

চন্দর বেশ একটু উগ্র হ'য়েই বল্‌লে, তা দেখ্‌লে তো আমার পেট ভরবে না। পেটের ভেতর যে কুকুর ছানা লাফাচ্চে—

কদম অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্যে বল্‌লে, ঐ ঘরের কোণে হাঁড়িতে ভাত আছে জল দেওয়া, নিংড়ে নিয়ে খা—

চন্দর ঘরের দাওয়ায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে জিগ্‌গেস্ করলে, আর কাঁকড়া চচ্চড়ি?"

কদম অপ্রস্তুত হ'য়ে কপালে চোখ তুলে বল্‌লে, ঐ যাঃ ভুলে গেচি। কাকড়া গুলো ঐ চুব্‌ড়িতে পড়ে আছে—

চন্দর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। কদম মিনতির সুরে বল্‌লে, রাগ করিস্ নি, ছোড়াটাকে একবার ধর্, আমি দুখানা ঘুটে জেলে ওগুলো প্যাঁজ দিয়ে ভেজে দি'চ্চ, এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।

চন্দর চেঁচিয়ে উঠ্‌ল'—বলিস্ কি? ঐ শুয়োরের বাচ্চাকে আমায় কোলে নিতে হবে?

কদম তেম্‌নি দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো. না নিস্ চুপ ক'রে বোস্। আমি ছেলে ঘুম পাড়িয়ে রেঁধে দিচ্চি তোর কাঁকড়া চচ্চড়ি—

চন্দর রক্তচক্ষু পাকিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে একবার কদমের পানে চাইলে, তারপর সহসা তাড়ির ভাঁড় দুটো তুলে নিয়ে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে, শুয়োরের ছা জম্মের মতো ঘুমুক্ তারপর খেতে আস্‌বো—

কদমের বুকে হাসির তরঙ্গ ফেনিয়ে উঠ্‌লো। সে নিঃশব্দে ছেলেটাকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধ'রে চুম্বন কর্‌লো।

সন্ধ্যায় বাড়ীতে আর তাড়ির আড্ডা বসিয়ে হল্লা করবার জো নেই, ছেলের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে কদম অনুযোগ করে। চন্দরও বেগতিক দেখে বাড়ীতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থাটা উঠিয়ে দিলে, সেই দিন হ'তে।

* * *

…তিন দিন ধ'রে ছেলেটার জ্বর। গায়ের তাতে কদমের বুক পুড়ে যায়। দিনরাত কদম তাকে বুকে নিয়ে শুশ্রূষা করে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা পরিসীমা নেই। তার উপর চন্দরের দর্শনও দুর্ল্লভ হ'য়ে উঠ্‌লো। গভীর রাত্রে একা রুগ্ন ছেলে নিয়ে কদম আতঙ্কে শিউরে ওঠে। 'মিটমিটে প্রদীপটার চারিপাশে তাল তাল আঁধার জড়ো হ'য়ে তাকে বিভীষিকা দেখায়। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কদমের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, চোখ দুটি জলে ভরে আসে।

সকালে চন্দর যখন বাইরের গাছতলায় চুব্‌ড়ী বুন্‌ছিল, কাঁথায় জড়ানো ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে কদম এসে তার সাম্‌নে দাঁড়ালো। চন্দর চোখ তুলে তার মুখের পানে চাইলে। কদমের ঘুমকাতর পল্লবের নীচে চোখদুটো দপ্‌দপিয়ে জ্ব'লে উঠ্‌লো, সহসা তার দৃষ্টি গেল ঝাপ্‌সা হ'য়ে, অশ্রুতে ভ'রী হ'য়ে চোখদুটো নুয়ে পড়্‌লো। সে অবনত মুখে বল্‌লে, ঘর দোর সব রইলো, দেখিস্। আমি এ আপদকে বিদেয় করতে চল্লুম।

চন্দর কথাটা বোধ হয় ঠিক্ বুঝতে পারলো না, তাই বিস্ময়ে চোখদুটি প্রসারিত ক'রে দিলে কদমের পানে। কদম নিঃশব্দে আঁচলে চোখ মুছে চলা সুরু করলে। চন্দর উঠে দাঁড়ালো, তার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগ্‌লো।

কদমের পায়ের শব্দ যখন মিলিয়ে গেল, চন্দরের বুকের ভেতরটা একটা অসহনীয় ব্যথায় মুচ্‌ড়ে উঠলো। তার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে কদমকে বাধা দেয়, তাকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তার সাহস হলো না, পা উঠ্‌লো না।

…মেঠো পথ ভেঙ্গে, সূর্য্যের তাপে মুখ চোখ রাঙা করে, অবসন্ন দেহে কদম যখন ভোলার বাড়ীতে এসে পৌঁছলো, ভোলা তখন উঠোনের গাছতলায় উবু হ'য়ে ব'সে দুর্জন সঙ্গীর সাথে পচাই খাচ্চে। কদম উঠোনের মাঝে এসে দাঁড়াতেই ভোলার নেশা গেল ছুটে। তার

সাথে চোখোচোখি হ'তেই ভোলা এমনিভাবে তার মুখের পানে চাইলে যেন পুরাণো চোর পুলিশের দারোগা দেখেছে। তার মুখের চেহারা গেল বদলে। সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গীদের ইসারা করতেই তারা সরে পড়লো। তাদের পালানোর ভঙ্গীমা দেখে কদম হেসে উঠ্‌লো। ভোলা কিন্তু মুখ তুলে তার মুখের পানে চাইতে পারলে না।

কদম রুক্ষস্বরে বল্‌লে, মরণ দশা! পরের হাতে ছেলে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্দি হ'য়ে মদ খেতে লজ্জা করে না? ছেলে মরতে বসেছে আর ওর ইয়ারকী চল্‌চে। আশ্চর্য্যি!

ভোলা নীরবে কদমের ছেলেটার পানে চাইলে।

কদম ঘরের দাওয়ায় উঠে ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে মুখখানা বিকৃতি ক'রে বল্‌লে, এই তোর ছেলে রইলো, তিনদিন জ্বরে ধুঁকচে, বাঁচাতে হয় বাঁচাস্, না হয় মরে গেলে ওর মার কাছে দিয়ে আসিস্। আমি এত ঝামেলা সইতে পারবো না।

কদম দাওয়া হতে নেমে উঠোনে পা দিতেই ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। তাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে ভোলার উদ্যত হাতদুটোকে ধাক্কা দিয়ে কদম তাকে ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিয়ে নাচাতে সুরু করলে। বিমূঢ় বিস্ময়ে ভোলা তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। কদম ছেলে-টাকে নাচাতে নাচাতে বল্‌লে, ভালো মানুষটির মত হাঁ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে হবে না, একটু দুধের জোগাড় কর—ছেলের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেচে,—

ভোলা একটা বাটি হাতে নিয়ে ছুট্‌লো, গোয়ালের পানে। যেতে যেতে ভোলা শুনতে পেলে, কদম বল্‌চে, আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যেই আঁটকুড়ী মাগী ছেলেটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে গেল।

দুধ নিয়ে ফিরে ভোলা দেখলে ছেলেটাকে বুকে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে কদম দাওয়ায় পা-চারী করচে, আর ছেলেটা পরম আরামে তার বুকের মাঝে ঘুমুচ্চে।

...কদম ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্চে।

ভোলা একটু দূরে বসে নির্নিমেষে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। অনেকক্ষণ সাহস সঞ্চয় করে ভোলা বল্‌লে, বেলা অনেকখানি হ'য়ে গেচে কদম, আমি তাহলে খাবার যোগাড় করি। তারপর রোদ পড়লে তোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

কদম ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বল্‌লে, আমার সঙ্গে আর অত কুটুম্বিতে করতে হবে না, নিজের গেলবার কি ব্যবস্থা হয়েছে শুনি,—

ভোলা একটু হাসিমাখা সুরে বলে উঠল, আমার জন্যে ব্যবস্থা আর কি করবি? আমার ব্যবস্থা আমিই করে রেখেচি!

পচাই-এর বড় জ্বালা দেখে কদমের বুকের নীচটায় মোচড় দিয়ে উঠল। এখানে-ও এই অবস্থা!...উদ্গত অশ্রু কোনমতে রোধ করে দীর্ঘায়ত দৃষ্টি মেলে সে বলে উঠল, এর পক্ষে আপন ঘর যখন পরের-ও অধম, তখন আমাকেই যোগসূত্র হয়ে ওর পথের পথ খুঁজে দেখতে হবে। সারা দুনিয়ায় কি ওর একটা শান্তির আশ্রয় মিলবে না?...রুদ্ধ অভি-মানে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল।

...বিহ্বল দৃষ্টিতে ভোলা তার চলার পথের চেয়ে রইল।

অসতী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বয়স হয়েছে অনেক—রূপ-নদীতে যৌবন-জোয়ার আর বয় না, চিরস্থায়ী চড়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু—তবু পঁচিশ বছরের অভ্যাস অতীতের রঙ্গলীলার স্মৃতি রোজ সন্ধ্যাবেলায় সাজিয়ে-গুজিয়ে আর পাঁচজনের মতন সুন্দরীকেও দাঁড় করিয়ে দেয়—সরু গলির মোড়ের মাথায়—বড়রাস্তার ধারে।

কত লোক কত রকম বেরকমের জামা-জুতা পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে পথ চলে, কত সুন্দর অসুন্দরের জনস্রোত। চোখ তুলে সবাই গলির দিকে তাকায়, কার' চোখে সহানুভূতি, কার' উপহাস আবার কার' বা চক্ষুভরা লালসা। গলির সম্মুখের সুন্দরীরা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে কার চোখে কি ভাষা। তারাও অনেকগুলি, পঁচিশ হতে পঞ্চাশ বছরের রকমারি বেসাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখের ভাষা বোঝাই যে হচ্ছে তাদের ব্যবসায়ের চাবি, কাজেই খরিদ্দার চিনতে তাদের একটুও দেরী হয় না—সবাই একটু ভঙ্গী করে' সচেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, সবাই মনে করে সে চোখ বুঝি তাকেই পছন্দ করেছে। আবার যখন তাদের আশার বুকে অপছন্দের চাবুকের আঘাত করে' তারা চলে যায়, তখন মনকে প্রবোধ দিতে তারা সবাই বলে ওঠে—'মরণ আর কি'—'কানা'—ট্যাঁকে নেই কড়ি, খুঁজছে পথে দড়ি'—ইত্যাদি আরও কত কি—কত ঠাট্টা কত বিদ্রূপ কত হাসি! সুন্দরীও সে হাসিতে প্রাণ খুলে যোগ দিত, এইটুকুই ছিল তার জীবনের আনন্দ! আর সকলের অপেক্ষা সুন্দরীর কিছু সকর ছিল, সেকারণ পথের অনাহুত আশাও ছিল কম, তাই সে যখন হাসত' তখন দেখত' অন্য সবার চোখে বইছে—বিষাদের ফল্গুধারা। হাসি দিয়ে কান্নাকে ঢেকে রাখবার এটা যেন একটা বিরাট ও কদর্য্য প্রয়াস।

নন্দিনী মেয়েটা সবে বছর দেড়েক হ'ল এসেছে। তারও আসার পেছনে হয়ত' একটা ব্যথা-কাহিনী ছিল—যেমন সকলেরই থাকে। কিন্তু এ মেয়েটা ছিল একেবারে স্বতন্ত্র ধাতুর। রূপে গুণে বয়সে সে সবার উপরে হয়েও দুঃখ ছিল তার অনন্ত! পেটে অন্ন জোটে না, পরণে ছিন্নবাস। দারিদ্র্য যেন তার ললাটে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছিল।

সুন্দরী এই মেয়েটাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখত, সেও এই স্নেহের দাবী নিয়ে সুন্দরীকে ডাকত—মা। কিন্তু হ'লে কি হয়, মেয়েটার এক গুঁয়েমি স্বভাব সকল সমবেদনাকেই পরাস্ত করে' দিত। সুন্দরী মাঝে মাঝে ভয়ানক চটত' দু'-একদিন তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলত না। কিন্তু আবার তার বিষাদমাখা শুষ্ক মুখখানার দিকে চেয়ে সব ভুলে গিয়ে নিজের আহার্য্যের ভাগ দিয়ে তার উপবাস ভঙ্গ করত।

সেদিনও দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল সারাদিন কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে নি। নন্দিনী শুষ্কমুখে গলির একপার্শ্বে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। সুন্দরী একগাল পান-দোক্তা মুখে দিয়ে হেসে হেসে নন্দিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল—"অত তেজ ভাল নয়, বুঝলি কুসুম, আমরাও এসেছি আজ পঁচিশ তিরিশ বছর কত তেজ দেখলাম—খাঁদা দত্ত কায়েতের

ছেলে, কত বড় বিচিলির আড়ত, তাকে কি না চাঁদবিবির পছন্দ হ'ল না—সে হ'ল মাতাল! বলে 'ছুঁও নাকো কালা, আমার অঙ্গ হবে কালো'—অদৃষ্টে যার দুঃখ, তাকে কে সুবুদ্ধি দেবে বল।"

এই ব্যাপারটা নিয়েই আজ তাদের মনোমালিন্য! নন্দিনী কোন উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরী রসনায় আর এক পোঁচ রসান চাপিয়ে বলল,—"মাতাল সোয়ামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন মহাপ্রভুর মন্দিরে, তাই মাতাল দেখে শিউরে উঠেন—বলে

'নিম ছেড়ে পলতার ঝোল,
ঢাক ছেড়ে বাজায় ঢোল!'"

সুন্দরীর কথায় সবাই খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠল। নন্দিনীর চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে এল।

ঠিক এই সময় একজন মাতাল টলতে টলতে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে—নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করল—"ঘরে জায়গা হবে তোমার?"

নন্দিনীর তখন বুক ঠেলে কান্না এসে গলার স্বর বন্ধ করে' দিয়েছিল। উত্তর না পেয়ে লোকটা আর সবাইকে উদ্দেশ্য করে' বলল—"বোবা নাকি?"

সুন্দরী উত্তর দিল—"বোবা কেন—সবে পড়তে শিখছে তাই—হবে জায়গা!"

—"দাম?"

—"দু' টাকা।"

—"মদ খায়?"

—"খায়।"

"বেশ—রাজী আছি—চলহে গাংশালিখ"—

নন্দিনী নড়েও না, চড়েও না। লোকটা পুনঃপুনঃ যখন তাকে ঘরে যেতে বলল, তখন নন্দিনী উত্তেজিত-স্বরে উত্তর দিল—"আমি মদ খাই না—আর মাতালের জায়গাও হবে না আমার ঘরে—"

নন্দিনীর কথার উত্তরে সুন্দরী তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—"কেন জায়গা হবে না শুনি—? দুঃখের জ্বালায় ত' শেয়াল-কুকুর কাঁদে—তবু তেজ যাবে না—কেন—"

রাগে দুঃখে অভিমানে নন্দিনীর শরীর কাঁপছিল, সে মাথা উঁচু করে' সুন্দরীর চোখের দিকে চেয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল "মা—"

আর কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরল না, ঝরঝর করে তার বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে জল ঝরে পড়ল!

নন্দিনীর অশ্রু সুন্দরীর বুকের মাঝে হঠাৎ তুফানের সৃষ্টি করল। স্মৃতির পাতার পাতায় নিজের জীবনেরচিত্র তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তাকেও যে একদিন বিনা অপরাধে অসতী আখ্যা নিয়ে মাতাল স্বামীর পদাঘাতে জর্জরিত হয়ে ঘরের বার হয়ে আসতে হয়েছিল, যার ফলে আজ পঁচিশ বছর এই প্রাণহীন দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে—সংসারের কাঁটাবনের উপর দিয়ে। এতদিন পরে নন্দিনীর এই অভিমান-ক্ষুব্ধ ছোট্ট 'মা' শব্দটা যেন তার মনে একটা চেতনা এনে দিল, সে মাতালটাকে বলল—"হবে না মশাই—আপনি অন্য রাস্তা দেখুন—"

—"আচ্ছা বাবা—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না—" বলতে বলতে লোকটা চলে গেল।

সুন্দরী সে সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করলে না নন্দিনী সকলের অজ্ঞাতসারে—ঘরে চলে গেল।

দূরের একটা ঘড়িতে রাত বারটা বেজে গেল। যেটুকু আশা সকলের মনে তখনও

ধুক্ ধুক্ করছিল, তাও একটার পর একটা কঠোর ঘা পড়ে নিঃশেষ করে' দিল।

এক এক করে' সবাই ঘরে চলে গেল। রইল কেবল একলা—সুন্দরী! একলা ঘরে —অন্যদিন নন্দিনী এসে তার কাছে থাকে, আজ সেও হয়ত আসবে না! গাল দিক্ আর যাই করুক মেয়েটা তার জন্য তবু তার মন পোড়ে! একে ছেলেমানুষ—তার উপর স্ত্রীলোকের যা' গর্ব্ব স্বামীর ঘর—স্বামীর নির্য্যাতনে সে যে নিজের হাতে সেই গর্ব্ব চূর্ণ করে' পথে এসে—

ঠিক সেই সময় রাস্তার উপর রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দের সঙ্গে জড়িত-কণ্ঠে কে বলল—"এই রোখো—রোখো—গাড়ী থামা—"

সুন্দরী ফিরে দেখল, গাড়ীর ওপর একজন বৃদ্ধ মদের নেশায় সোজা হয়ে বসতে পারছে না। সুন্দরীকে ফিরতে দেখে বুড়ো তাকে সম্বোধন করে' বলল—"বলি—শুনছ—জায়গা পাওয়া যাবে?"

সুন্দরী হেসে উত্তর দিল "কেন পাওয়া যাবে না বাবু।"

—"বেশ—বিদেশী লোক আমি—একটু বেসামাল হয়ে পড়েছি—এখন এত রাতে—" টলতে টলতে বৃদ্ধ গাড়ী থেকে নামল, একে বুড়োমানুষ তার উপরে অত্যধিক মদ্যপানে তার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। সুন্দরী —তাকে ধরে নিয়ে গেল।

তখনও কি জানি কেন নন্দিনীর ঘর খোলা ছিল। সুন্দরী কিছু না বলে লোকটাকে নিয়ে একেবারে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ তাদের এ অতর্কিত আগমনে নন্দিনী চমকে উঠে ফোঁস ক'রে উঠল। তার সে বিষের নিশ্বাস সহ্য করবার জন্যে সুন্দরী কিন্তু আর সে ঘরে ছিল না।

ঘরে ঢুকে লোকটা আর দাঁড়াতে পারল না, জুতো জামাসুদ্ধই বিছানার উপর শুয়ে পড়ল; এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে নন্দিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল।

নন্দিনী লোকটার সেই অসহায় অবস্থা দেখে রাগ ভুলে গেল।

হ্যারিকেনের আলোটা জোর করে' দিয়ে বৃদ্ধের নিকটে এসে তার মুখের পানে চেয়ে নন্দিনী একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠল—এ কে?

তার সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল। দু'হাত দিয়ে কপালটা টিপে ধরে' সে বাইরের বারান্দায় গিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করল। ঘরে এসে বৃদ্ধের জুতা জামা খুলে নিয়ে পায়ে মাথায় মুখে জলের হাত বুলিয়ে দিয়ে পাখা হাতে করে' তার মাথার গোড়ায় বসল।

সারারাত কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে, নন্দিনীর তা' খেয়ালই ছিল না—সমানে তার হাতের পাখা চলেছিল।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের কলরবে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে দেখল—নন্দিনী পাখা হাতে তার পায়ের তলায় নিদ্রিতা। বৃদ্ধ তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল—"ওগো, শুনছ?"

নন্দিনী ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই বৃদ্ধ বলল—"আমার জামা?"

—"আছে—দিচ্ছি"—বলে নন্দিনী খাটের ওপর থেকে নেমে আনলা থেকে জামা ফতুয়া চাদর নিয়ে বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হতেই বৃদ্ধ বলল—"ফতুয়ার পকেটে—অনেক টাকা ছিল—"

—"যা' ছিল সব ঠিক আছে।"

বৃদ্ধের হাতে সেগুলি দিতেই লোকটী ফতুয়ার পকেট থেকে মণিব্যাগটা বের করে' এক এক করে' নোট ক'খানা গুণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জামা গায়ে দিতে লাগল।

নন্দিনী বলল—"এই ত' সবে ভোর হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি কেন? শুনলুন বিদেশী লোক, এখানেই স্নান-টান করে' কিছু খেয়ে দেয়ে—"

—"ওরে বাবারে—দশটার মধ্যে আদালতে যেতে হবে—"

—"বেশ ত' দশটার মধ্যেই যাবেন—"

—"না,না—পরের বাড়ী এসে উঠেছি—আমি বরং সন্ধ্যাবেলা আসব—বুঝলে কাল ভারি যত্ন করেছিলে—মনে থাকবে—"

—"কিন্তু নেয়ে-খেয়ে গেলে ভারী খুশী হতুম। আমাদের হাতের ভাত না খান, অন্ততঃ একগ্লাস মিছরির জল—দুটো মিষ্টি—"

—"না না—তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না,—আমি বরং সন্ধ্যাবেলায় একবার আসব—" বলেই বৃদ্ধ একখানা পাঁচটাকার নোট নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। ঘরের আশে-পাশের অনেকগুলি উৎসুক-দৃষ্টি কৌতুহল ভরে এই দৃশ্যের রহস্যটুকু ভালরূপেই উপভোগ করছিল।

নন্দিনী তা' গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বৃদ্ধের কথার উত্তরে মৃদু হাস্যে বলল—"ওটাও সন্ধ্যাবেলাতেই নেব—টাকা আমি এখন চাই না—"

বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠল—"এত বড় আশ্চর্য্যের কথা—টাকা চাও না!"

—"না।"

—"বেশ—আচ্ছা—সন্ধ্যাবেলাতেই না হয়—তা' হ'লে এখন আসি—বলেই গমনোদ্যত হতেই নন্দিনী বলল—"একটু দাঁড়ান।"

বৃদ্ধ দাঁড়াতেই নন্দিনী গলবস্ত্র হয়ে তার পায়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই বৃদ্ধ হেসে বলল—"এ সব কি ব্যাপার!"

"ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নিচ্ছি—এতে আর দোষ কি?—কত পাপ করেছি"—

—"কিন্তু আমার মতন মাতালের পায়ের ধুলোয়—"

—"গঙ্গাজল কি কখন অপবিত্র হয়?"

—"না তা' হয় না—তবে—আচ্ছা—এখন তা' হলে যাই"—বলেই বৃদ্ধ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে পুনরায় নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল—"হ্যাঁ, তোমার নামটা—"

"নন্দিনী—"

বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ নন্দিনীর মুখের পানে চেয়ে বলল—"—ন-ন্দি-নী!—"

তার শরীরে তড়িৎ প্রবাহ ছুটে গেল, সে খপ করে' নন্দিনীর বাঁ হাতখানা চেপে ধরে'—বলে উঠল—"এ কি! এখানটায় এ কিসের দাগ?

—"পুড়ে গিয়েছিল।"

—"কিন্তু তার পূর্ব্বে এখানে কি কিছু লেখা ছিল?"

—"তুমি—তুমি—তু—"

চক্ষের নিমেষে বৃদ্ধের হাত থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই ধড়াস করে' দরজা বন্ধ করে' দিয়ে নন্দিনী তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি অস্পৃশ্যা—অসতী—"

প্রেমের কাহিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিতৃশ্রাদ্ধের আগের দিন পর্য্যন্ত প্রতুল ভাবিয়াছিল শ্রাদ্ধ সে এইখানেই করিবে; যে বিমাতা তাহাকে তাহার পিতার স্নেহ হইতে, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যাহার স্বার্থপরতার অন্ত নাই, তাহার কাছে জীবনে সে আর কোনোদিনই ফিরিয়া যাইবে না। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন সকালে হঠাৎ তাহার মত পাল্‌টাইয়া গেল। ভাবিল, মৃতের মুখাগ্নি যে করিয়াছে শ্রাদ্ধ তাহাকেই করিতে হয়, তাহা ছাড়া সে-ই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। সুতরাং স্থির করিল, বিমাতার কাছে গিয়া শ্রাদ্ধ সে সেইখানেই করিয়া আসিবে এবং এই সুযোগে এই কথাটা সে তাহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিবে যে, নীচ স্বার্থপরতা যদি একজনকে বিবেক বুদ্ধিহীন অন্ধ করিয়া তোলে ত তাহার দেখাদেখি অপরেও ঠিক তেমনি নীচ তেমনি স্বার্থপর হয়ত নাও হইতে পারে।

প্রতুল যে শ্রাদ্ধ করিতে আসিবে রমাসুন্দরী তাহা ভাবিতে পারে নাই, তাই সে স্থির করিয়াছিল তাহার বড় ছেলে অতুলই শ্রাদ্ধ করিবে। অতুলের বয়স মাত্র ন' বৎসর। কষ্ট তাহার একটুখানি হইবে। তা হোক্।

কিন্তু হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রাদ্ধের দিন সকালে প্রতুল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, রমাসুন্দরী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, ভালই হলো বাবা, বাঁচা গেল। ও-সব শ্রাদ্ধের ঝঞ্ঝাট কি আর ওইটুকু ছেলে সইতে পারে কখনও!

যাই হোক্ ঝঞ্ঝাট কাহাকেও পোহাইতে হইল না। সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত ঝঞ্ঝাট প্রতুলই পোহাইল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে বেলা চারটা বাজিল। প্রতুল তখনও পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করে নাই। পুরোহিত বলিলেন,'এবার আপনি উঠতে পারেন।'

প্রতুল তাহার মৃত পিতার উদ্দেশ্যে হেঁট হইয়া প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিতে গিয়া চোখের জল তাহার আর কিছুতেই বাধা মানিল না। যে পিতা তাহাকে এত স্নেহ করিতেন, সেই তিনিই যে তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন সে কথা তাহার মন যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না। তবু সে বার বার তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিল।

তাহার পর চোখ মুছিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বোধকরি সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রমাসুন্দরী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে তুমি যেয়ো না প্রতুল, শোনো!'

প্রতুলকে রমাসুন্দরী ওদিকের একটা নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিল বলিল, 'বোসো'।

প্রতুল দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল, "বল না কি বলবে।"

রমাসুন্দরী বলিল, 'বলছি'। বলিয়াই সে ডাকিল, "মাতু!'

মাতু ঝি তাহার এক হাতে একটি পাথরের গ্লাসে বেদানার রস ও এক হাতে আর-একটি পাথরের থালায় কিছু ফলমূল লইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'এইখানে ধরে দিয়ে তুই একগ্লাস খাবার জল এনে দিয়ে যা মা !'

খাবার ধরিয়া দিয়া ঝি জল আনিতে গেল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'খেতে বোসো।'

এত আদর যত্ন প্রতুল তাহার জীবনে কোনোদিনই তাহার কাছ হইতে পায় নাই। ইহারও মধ্যে কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কিনা তাই বা কে জানে !

বসিতে প্রতুল ইতস্ততঃ করিতেছিল। রমাসুন্দরী আবার বলিল, 'বোসো। তোমার কোনও ভয় নেই।'

প্রতুল বলিল ভরসাও বিশেষ নেই। আচ্ছা বসছি।'

বলিয়া সে সত্যই খাইতে বসিল।

জলের গ্লাস নামাইয়া দিয়া ঝি চলিয়া গেলে রমাসুন্দরী বলিল, 'উইলে উনি তোমায় কিছু দিয়ে যাননি সত্যি, কিন্তু আমি ভাবছি, তোমায় কিছু দেওয়া আমার উচিত। না দিলে অধর্ম্ম হবে।'

প্রতুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তোমার অনুগ্রহ !'

রমাসুন্দরী বলিল, 'তা তুমি হয়ত হাসতে পার প্রতুল, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি করব ভেবেছি। আজ থেকে তুমি আর কোথাও যেয়ো না, এইখানেই থাকো।'

প্রতুল মুখ তুলিয়া বলিল, 'তা বেশ। যখন দেবে তখন থাকব। আজ থেকে কেন ?'

রমাসুন্দরী বলিল, 'কিন্তু একটি কাজ তোমায় করতে হবে প্রতুল। আমার একটী খুব সুন্দরী ভাইঝি আছে, তাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।'

প্রতুল আবার হাসিল। বলিল, 'ভাইঝি ? সে যে আমার মামাতো বোন হবে।'

রমাসুন্দরী বলিল, 'আমি ত' তোমার সৎ-মা। সে আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। তাতে দোষ নেই।'

প্রতুল বলিল, 'বিয়ে আমি করব না ভেবেছি।'

রমাসুন্দরীও এবার ঈষৎ হাসিল। বলিল, সে অমন অনেকেই ভাবে। তারপর আবার করেও।'

প্রতুল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমাসুন্দরী বলিল, 'জবাব দিলে না যে ?'

প্রতুল বলিল, 'বিয়ে না করলে আমি কিছু পাব না, কেমন, এইত ?'

'না তা কেন ? বিয়ে করবার জন্যে আমি তোমায় অনুরোধ করছি।'

প্রতুল বলিল, 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব। আজ চললাম।'

এই বলিয়া সে আর অপেক্ষা না করিয়া সত্যই চলিয়া যাইতেছিল, রমাসুন্দরী তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল,—'যেয়ো না প্রতুল, শোনো, বলি।'

প্রতুল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'তোমায় কিছু না দেওয়ার জন্যে তোমার বাবার দোষ কেউ দেবে না প্রতুল, সবাই ভাববে আমিই বুঝি তোমায় দিতে দিই নি। তা বেশ; তোমার বাবা দিলেও যা, আমি দিলেও তাই। আমিই দেবো। কিন্তু তুমি আমায় আজ কথা দিয়ে যাও। আবার কবে আসবে বল।'

প্রতুল বলিল, 'আজ হঠাৎ এ রকম ইচ্ছা তোমার হলো কেন আমি কিছু বুঝতে পারছি নি।

'সে সব বুঝে তোমার প্রয়োজন নেই প্রতুল। আমি দেবো এইটুকু জানলেই তোমার যথেষ্ট হবে।'

প্রতুল বলিল, 'কিন্তু আজ দিতে চাইলেই নিতে আমি সত্যিই পারব কিনা সে সম্বন্ধে আমার একটুখানি সন্দেহ আছে।'

বলিয়াই প্রতুল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রেণুকা তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। প্রতুল ফিরিয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'এত দেরি হলো যে? বলে গেলে ওখানে জলগ্রহণ করবে না, শুধু শ্রাদ্ধ সেরে দিয়েই চলে আসবে—'

গায়ের চাদরটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রতুল ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, 'শ্রাদ্ধ শেষ হ'ল বেলা চারটের সময়। তারপর একটুখানি না খাইয়ে ছাড়লে না।'

রেণুকা বলিল, 'আর আমি এদিকে তোমার জন্তে খাবার তৈরি করে' বসে আছি।'

'বেশ ত', সে সব তুমি খাও।'

রেণুকা বলিল, 'এমন কী খাইয়েছে? আর একবার খাও না! সারাদিন ত' উপোস করে' আছ!'

প্রতুল বলিল, 'একটু পরে।'

বলিয়াই টেবিলের উপর যে দুখানা বই পড়িয়াছিল আনমনে তাহারই একখানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইতে গিয়া দেখিল হেমেনের লেখা বই, উপহার-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—'সুন্দরী প্রধানা শ্রীমতী রেণুকার করকমলে—'। বইখানি রেণুকাকে সে স্বহস্তে লিখিয়া উপহার দিয়াছে।

সেখানা নামাইয়া রাখিয়া প্রতুল আর এক-খানা তুলিয়া লইল। দেখিল, সেখানিও তাই। তবে তাহার উপহার পৃষ্ঠার লেখার ভঙ্গী একটু-খানি অন্ত রকম। তাহাতে লিখিয়াছে—'যাহার রূপ দেখিয়া দেবী কি মানবী চিনিবার উপায় নাই, যাহার লীলাচঞ্চল দুইটি চক্ষু তারকায় অতলস্পর্শী সাগরের গভীরতা, আরক্তিম দুটি ওষ্ঠপ্রান্তে যাহার অতৃপ্ত তৃষ্ণা, সর্বদেহে যাহার অপরূপ লাবণ্য, অলক্তরাগ রঞ্জিত যাহার দুটি সুকোমল চরণ-স্পর্শে ধরণী ধন্যা, সেই ভুবন বিজয়িনী নারী—শ্রীমতী রেণুকা দেবীর করকমলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি শোভা পাইবে—কল্পনা করিয়াও নিজেকে আজ আমি কৃতার্থ মনে করিতেছি।'

প্রতুল হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, 'সর্বনাশ! হেমেনের কি মাথা খারাপ হলো নাকি?'

এই বলিয়া মুখ তুলিয়া রেণুকার মুখের পানে তাকাইতেই দেখিল, মুখ টিপিয়া টিপিয়া সেও হাসিতেছে।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'নিজে এসে দিয়ে গেল বুঝি?'

রেণুকা বলিল, 'সারাদিনই ত' ছিল। এই মাত্তর উঠে গেল। বাবাঃ! এত বকতেও পারে! আমি বাপু ওর সঙ্গে কথায় পারি না।'

প্রতুল বলিল, 'ওর সঙ্গে কথায় পারবে কি রকম! ও যে একজন বিখ্যাত লেখক। কি রকম সুন্দর মানুষটি দেখলে ত!'

'হ্যাঁ, সুন্দর না ছাই! লিখতে পারে এই যা! নইলে এমন আর কী!'

প্রতুল বলিল, 'তুমি তাহ'লে মানুষ চেনো না'

'খুব চিনি তোমার চেয়ে বেশি চিনি।' বলিয়া রেণুকা হাসিতে লাগিল।

প্রতুল তখনও হেঁটমুখে একখানি বইএর পাতা উল্‌টাইতেছিল। রেণুকা বলিল, 'তুমি যে ওকে কি চোখে দেখেছ জানি না। এত প্রশংসা তুমি ওর কর—ওকে যে না দেখেছে, তোমার মুখে শুনলে তার মনে হয় ও মানুষ নয়, দেবতা। কিন্তু আমার ত' বাপু সে রকম মনে হলো না,

প্রফুল বলিল, 'তুমি এখনও ওকে চিনতে পার নি। আর কিছুদিন যাক্।'

রেণুকা খানিক থামিয়া কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা তোমার কি বিশ্বাস, হেমেন বাবু তোমায় খুব ভালবাসেন?'

বই হইতে মুখ তুলিয়া প্রফুল জোর করিয়া বলিল, 'নিশ্চয়। এমন দিন গেছে যে দিন ওকে না দেখে আমি থাকতে পারতাম না, ও-ও আমাকে না দেখে থাকতে পারতো না। শেষে আমিই তোমাকে পেয়ে—'

রেণুকা আবার হাসিল। বলিল, 'আমাকে পেয়ে তুমি তোমার এমন বন্ধুকেও ছেড়ে দিলে? আমি, তা'হলে তোমার বন্ধুর চেয়েও বড়?'

প্রফুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'যাঃও! কি যে বল...'

বলিয়া আবার সে বইএর পাতায় মন দিল।

রেণুকা বলিল, 'কিন্তু ওই আমার কাছে তোমার অনেক নিন্দাই করেছে।'

কথাটা প্রফুল প্রথমে বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'মিছে কথা। কখ্খনো না।'

রেণুকা বলিল, 'আমার কথা বিশ্বাস করলে না? সত্যি বলছি।'

কথাটা সে যে রকম গম্ভীরভাবে বলিল, প্রফুল এবার আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, 'তাহ'লে তোমার সে পরীক্ষা করতে চেয়েছে।'

রেণুকারও চট্ করিয়া কেমন যেন মনে হইল—হয়ত' বা তাই, সত্যই হয়ত' সে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাহার স্বামীর নামে মিথ্যা কতকগুলা অপবাদ রটাইয়া গেছে।

কিন্তু ছি ছি, এমনি নির্ব্বোধ সে, কই একটিবারের জন্যও এমনি করিয়া কথাটা ত' সে ভাবিয়া দেখে নাই! যাক্, রেণুকা হঠাৎ যেন বুকটুখানি খুসী হইয়া উঠিল।

প্রফুল তখনও সেই উপহার পৃষ্ঠায় লেখাটা দেখিতেছিল।

রেণুকা হাসিয়া বলিল, 'বার বার ও লেখাটা তুমি এমন ক'রে দেখছ কেন বল ত? বন্ধু ওপর রাগ হচ্ছে?'

কথাটা প্রফুল ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'রাগ কেন হবে?'

রেণুকা বলিল, 'ওই এতগুলো মিথ্যা কথা লিখেছে বলে।'

প্রফুল হাসিল। 'হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। কথাগুলো মিথ্যাই বটে।'

রেণুকা বলিল, 'কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে হ'লেও অন্যের কাছে নয়।'

মুচ্‌কি হাসিয়া প্রফুল চুপ করিয়া রহিল। রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছ?'

প্রফুল আবার সেই উপহার পৃষ্ঠাটি বাহির করিয়া বলিল, 'ভাবছি—এই কথাটা। এই যে লিখেছে 'আরক্তিম দুটি ওষ্ঠ প্রান্তে যাহার অতৃপ্ত তৃষ্ণা'...তাই ভাবছি তোমার ওষ্ঠে অতৃপ্ত তৃষ্ণার কথাটা আমার বন্ধুর কাছে সত্য হ'লো কেমন করে!'

রেণুকা—হাসিতে লাগিল।

প্রফুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 'ভাল! তাই যদি হয়ে থাকে ত' আমার চেয়ে বন্ধুকে আমার সৌভাগ্যবান বলতে হবে।'

কিন্তু প্রফুলের মুখের পানে তাকাইতে গিয়া রেণুকার মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়াছে। রেণুকা দেখিল যে বন্ধু তাহার কাছে সাধারণ মানুষের অনেক ঊর্দ্ধে হঠাৎ ওই একটি কথায় তাহারও বিরুদ্ধে ঘনান্ধকার ঈর্ষার একটা কালো ছায়া প্রফুলের মুখের উপর ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে রেণুকা তৎক্ষণাৎ এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

(ক্রমশঃ)

অযাত্রার ফল

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

না, ভবতোষ কল্পনায়ও একথা ভাবিতে পারে নাই।

তর্ক করা চলে না; কারণ, কাজ উদ্ধার ত তাহাতে হইবেই না বরং অঘটন একটা কিছু ঘটিয়াও যাইতে পারে। বলা ত যায় না, বৃদ্ধের কঠোর মন, এক কথায় বলিয়া বসিলেই হইল, "না, তোমার পথ তুমি দেখ, এ বোঝা আমি আর বইতে পারব না!"

তখন?—কিন্তু, এদিকেও যে সমান বিপদ!

স্ত্রী মালতী যে কিরূপ একগুঁয়ে ভবতোষ ত তা' জানে! আর সে বেচারির এমনই বা কি অপরাধ! আট দিন অন্তর একখানা গায়ে মাখা সাবান,নয় সামান্য একটু গন্ধ তেল, হলো বা মাথার একটু বাহারি ফিতেটা-আসটা, কিম্বা একটু পমেটম, স্বামীর নিকট স্ত্রীর এতটুকু আবদার যদি না চলে, তবে এ বিবাহিত জীবনটাই যে একটা মহা বিড়ম্বনা!

কিন্তু কথাটা, সেই বহুকালের আগত সেকেলে লোকটীকেও কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না। নিজের এ পাড়াগাঁয়ের গণ্ডিবেড়া একচুল সরাইয়া দেখিতে তিনি নারাজ। যুগের সঙ্গে সেই অতি পুরাতন ঝরঝরে ভাব ব আচারের ধারাগুলি যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই আড়বুঝা লোকটীকে কথাটা কেই বা বুঝাইবে!

তাই অন্তরে রীতিমত ভয়, মুখে বেশ একটু সাহসের রেশ মাখাইয়া ভবতোষ মরি বাঁচি করিয়া মালতীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একবার মাত্র আড়চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া মালতী কিন্তু তার অন্তরের অতি যত্নে লুকান কথাটা ছাপার হরপের মত সুস্পষ্ট পাঠ করিয়া ফেলিল। মুখের উপর বেশ একটু ঘোরাল ছায়া জমাট বাঁধিয়া নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল, "বললুম, বাবা ডাকছেন, একবার গিয়েই দেখ। সাধা ভাত অপমান করে' ফেরালে ফল এমনি করেই ভুগতে হয়, এটা জানা কথা।

মুখখানা অসম্ভব ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সেটা ঠিক ধরা পড়িবার লজ্জায় কি কৃতকার্য্যের সঠিক উপলব্ধিতে তা' বোঝা গেল না। আমতা-আমতা করিয়া ভবতোষ বলিল,—"উনি বলেন,' এ পাড়াগাঁয়ে ওসব সৌখিনীর দরকার নেই, কি করি, বুড়ো মানুষ!"

কথাটা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। বেশ একটু ঝাঁঝাল, কণ্ঠে স্বামীর কথা চাপা দিয়া মালতী বলিল, "তুমি নিজেও ত ওই বাপেরই বংশধর। চাও, রীতিমত কেলেঙ্কারীর ভেতর দিয়ে আমায় টেনে নিয়ে যেতে, নইলে সাবান চাইলে খোল এনে হাজির কর! তোমাদের পাড়াগেঁয়ে ভুতুড়ে চালে ওই বোধ হয় যথেষ্ট সম্মান! কিন্তু জেনো, আমাদের তা' সয় না, গায়ে বাজে।"

বলিয়া পাড়াগাঁয়ের সর্ব্বপ্রকার আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেই যেন সে ঘৃণাভরে মুখ কুঞ্চিত করিল। অপরাধী ভবতোষ, বাপের কাছে শ্বশুর ও তার মেয়েদের চাল-চলনের সম্বন্ধে যা' কিছু বলিয়া বৃদ্ধের গোঁড়ামির পাগলামী ভাঙিতে চাহিয়াছিল, তাহা আর প্রকাশ করিতে পারিল না; ধীরকণ্ঠে শুধু এই বলিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চাহিল—পয়সার অভাব সে যদি স্ত্রী হইয়া অনুভব

না করে, অক্ষে তা' উপেক্ষায় উড়াইয়া দিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে।

মালতী কিন্তু বেশ একটু রাগিয়া উঠিল। পরুষ-কণ্ঠে বলিল, "নিজে যদি অভাব কিনে নাও, কুবের তার ভাঁড়ার নিয়ে সেধেও তোমার ও বরাত ফেরাতে পারবে না।"

ভবতোষ কথাটার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বেশ ভাল রকমই বুঝিল এবং বারবার নিজের দুর্ব্বলতার উপর আঘাত পাইয়া মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। বেশ একটু রুক্ষস্বরেই সে বলিল, "তার মানে! তোমার বাপের গোলামী করা, কেমন এই ত! সবাই যে ঘাড় পেতে অন্নদাস হওয়ার অপমানটাকে মেনে নেবে, এমন ত কছু কথা নেই।"

মালতী রাগিয়া বলিল, "কাজ কি! কেই বা সাধছে? বাবা ছাপোষা মানুষ, কাক-চিলকে ছড়াবার ভাত তাঁরও নেই, তবু যে বলেছিলেন, কেবল আমার মুখ চেয়ে, এখন থেকে যা' হয় কিছু জুটলে রগড়ে রগড়ে অন্ততঃ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। নইলে আজও যা',কালও তাই—চিরকাল হাড়ির হাল, পরের গলগ্রহ থাকাই সার; বেশ ত, এইটেই যদি ভাল লাগে, তাই থাক। আমার কিন্তু এত কষ্ট সয়ে থাকা পোষাবে না, এই স্পষ্ট বলে দিলুম।"

ভবতোষ কঠোর কণ্ঠে উত্তর দিল, "করতে চাও কি শুনি, বাপের শ্রীমন্দিরে গিয়ে উঠতে ত? বেশ যাও, আজই দূর হয়ে যাও। আমার কিন্তু চাকরাণী খরচ দেবার পয়সা নেই।"

কথাটা শেষ করিয়াই ভবতোষ সরিয়া গেল, দাঁড়াইল না। আঘাত দিতে গিয়া পাল্টা আঘাত পাইয়া মালতীও 'গুম' হইয়া গেল, কথা কহিল না।

ইহার এক টুকরা ইতিহাস ছিল। বিবাহের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতার ভয়ে ভবতোষ শ্বশুরালয় অভিমুখী হইতে পারে নাই, পরস্পর পত্রালাপের মধ্য দিয়াই তাহাদের প্রেম-নিবেদন করিত। এই পত্রের আদান-প্রদান চলিত পল্লীর রামী মেছুনীকে দিয়া। নিত্য শিয়ালদহে মাছ কিনিতে যাইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরের বাহকরূপে সে উভয় পক্ষের নিকট হইতেই কিছু কিছু হাতাইত; তা' ছাড়া, জানা ঘরে কারবার ত আছেই। মোট কথা, রামীর ইহাতে বেশ মোটা লাভই হইত; কাজেই আপত্তি সে ত করিতই না, বরং উৎসাহই দিত।

দেনা-পাওনার সম্বন্ধে রামী খুব বেশী রকমই সতর্ক ছিল; তাই এ পক্ষকে বলিত, "ছি, পয়সার কথা কি সেখানে তুলতে পারি দাদাবাবু, তোমাদের মুখ হাল্কা করা হবে যে! এও কি নিত্যম ভবে গাড়ীভাড়াটা রোজ কোত্থেকে জোগাই বল, আমিও ত ছাপোষা মানুষ!"

আবার অন্য পক্ষকে জানাইত, "দাদাবাবু পোড়ো ছেলে, কোথায় কি পাবে বল! কাজেই তুমি যা' দাও দিদিরাণি, লজ্জার মাথা খেয়ে হাত পেতে তাই নিতে হয়; কি করি, গরীবলোক দিদিরাণী, পেটের দায় বড় দায়। তা' লোভ আমি করি না—তোমার দেওয়া এই খুদকুঁড়োই আমার পাহাড় পর্ব্বত!"

কথাটা আজ সর্ব্বপ্রথম এইভাবে প্রকাশিত হইল, এবং বেশ একটু বেসুরাই শোনাইল।

দুই

রাত্রির আঁধার আবরণ অনেক কিছুর শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে সক্ষম। তন্মধ্যে দাম্পত্য কলহ একটা। পরস্পর কি ভাবে যে বিষয়টীর সমাধান হইল, তাহা জানা না থাকিলেও, পরের দিন বৃদ্ধ বাপের নিকটে গিয়া ভবতোষ যখন বেশ স্পষ্টাক্ষরেই শুনাইয়া দিল, এ ভাবে সম্পূর্ণ হাত তোলার উপর থাকা তাহাদের পোষাইবে না, কাজেই উপায়ের উপায় করিতে তাহাদের যাইতে হইবে।

হরিবিলাসবাবুর পক্ষে পুত্রের দিক্ হইতে এভাবের আঘাত পাওয়াটা এই প্রথম। কাজেই তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন! কিয়ৎকাল পরে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁ, তা' বেশ, যেতে পার।"

ভবতোষ পিতার দিক্ হইতে একটা দমকা হাওয়ার প্রতীক্ষা করিয়াই মনে মনে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরিবর্ত্তে এ ভাবটা তাহার মনের দোলায় বেশ একটু দোল দিয়া গেল। তথাপি অতি যত্নের পাখীপড়া গৎ আওড়াইতে সে ভুলিল না; বলিল, "ছেলের কাছ থেকে নিয়মিত দেনা-পাওনা বুঝে নিয়েও যে বাপ নিজের কর্ত্তব্য করতে ভুলে যান, এর বেশী তাঁর আর কিই বা—"

বৃদ্ধ কিন্তু কথাটা শেষ করিতে দিলেন না, বেশ একটু হুঙ্কার তুলিয়া বলিলেন, "বেশ,বলেছি ত যেতে পার! আবার কেন কথা বাড়াও!"

মা মেয়েমানুষ এত সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারেন না, কাজেই বলিলেন—"সেকি রে, আমাদের চেয়ে, ওঁর চেয়ে, তোর শ্বশুর-শাশুড়ী বড় হ'ল!"

হরিবিলাস বলিলেন "তা' হয় গিন্নি! ও সব তুমি বুঝবে না, আর দরকারও তেমন বোধ হয় নেই। শোন ভবতোষ, এরপর তোমায় আমায় এক বাড়ীতে বসবাস চলতেই পারে না। ঘণ্টাখানেক সময় দিচ্ছি, যা' কিছু নেবার গুছিয়ে নিয়ে চলে যাও। হাঁসখালির ঘাটে নৌকা থাকবে। বৌমার বাপ তোমার অতি বড় নিকট আত্মীয়, আমি কেউ নই।"

ভবতোষ হয় ত কিছু বলিত, কিন্তু ইহার পর একটি ভাষাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিল।

আগ্রহভরে মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল, হঠাৎ চেঁচামেচি কিসের?"

বিমর্ষমুখে ভবতোষ উত্তর দিল, "হ'ল ভালই—চিরদিনের জন্যে নির্ব্বাসন!—এক ঘণ্টার বেশী এ বাড়ীতে আমরা থাকতে পাব না!"

ঠোঁট উল্টাইয়া মালতী বলিল, "বাপ বটে! যাক্, ভেব না, বাবা সে লোকই নন, জলে ত পড়বেই না, বরং চিরদিনের মত একটা সুব্যবস্থা তিনি করে' দেবেন।"

যাইবার পূর্ব্বে ভবতোষ পিতার চরণে শেষ অভিবাদন জানাইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মালতী বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বুঝাইয়া দিল,—মানুষের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করা খুবই চলে এবং সেটা কর্ত্তব্যও, কিন্তু পশুত্ব শক্তির নিকট অবনমন কেবল যে কর্ত্তব্যের অপব্যবহার তা' নয়, এভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ চিরদিনের জন্য নৃশংসতার পদে দেবত্বের বলিদান—না, প্রাণ থাকিতে সে তা' করিতে দিবে না।

গৃহিণীর চক্ষের ধারার দিকে চাহিয়া হরিবিলাস ফিকে হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এমনই হয় গিন্নি, হাতের চেয়ে আম বড় হ'লে তাকে ধরে রাখা যায় না। বৃথা শোক করতে চাও কর, বাধা দেব না। কিন্তু এটাও জেনো, স্নেহ জিনিষটা যে নিতে চায় না, সেধে তাকে তা' দিতে যাওয়া শুধুই বিড়ম্বনা নয়, জীবনের একটা মস্ত বড় ভুলও। মেয়েমানুষ তুমি, তাই নিজের দুর্ব্বল অন্তরের ভাষাই শুনছ, এত সুস্পষ্ট প্রত্যাহার প্রত্যাখ্যান মনে বিঁধছে না। কিন্তু একটু ভেবো, মা হ'য়েছ বলেই মায়ের পাওনা-গণ্ডা না বুঝে নেওয়া কাপুরুষতা ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে পাপও।"

এ কথার উত্তর মায়ের মুখে ফুটিল না,তিনি শুধু ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কঠোর পাষাণ এতে টলিল না, বরং উল্টা কঠিন

ফলিল। গম্ভীর আদেশের সুর তাঁহার বাহ্যিক অশ্রুর আবর্তন শুকাইয়া ফেলিল। তবে অন্তর সে যে ভগবানের স্থান, কাজেই সেখানকার আর খবর দিতে ভরসা বোধ হয় না করাই ভাল; কারণ,ব্যবহারিক শাস্ত্র মত হয় ত তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে; সুতরাং, কাজ কি?

একখানি পত্র বৎসর দুই পরে পল্লীভবনে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার মর্মার্থ এই:—

"বাপের ছেলেকে ত্যাগ করা যত সহজ,ছেলের তত নয়, তাহার প্রমাণ এই পত্র। স্নেহের টান এতদিন জানিতাম নিম্নগামী, এখন দেখিতেছি তা' নয়, এর পথ উর্দ্ধমুখী, তাই এতদিন বাদে আমার দিক হইতেই প্রথম সম্ভাষণ চলিল।

"দূরে থাকিলেও আপনার সব খবরই যে রাখি, তার প্রমাণ, ছোট ভাই দু'টির বিবাহ দিয়াছেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় দু'টি স্বর্গীয় শিশু আপনার আনন্দ বর্দ্ধন করে, এ সবই আমার জানা।

"শুনিলাম, আমার হাতের পোঁতা কলমের আমগাছটার ফল আপনি নিজে ত ভোগ করেনই না, এমন কি বাটীর কাহাকেও উপভোগ করিতে দেন না। আপনার পুত্রবধূ বলে, এটা আপনার আন্তরিক কোপের ফল, আমি কিন্তু জানি মোটেই তা' নয়, কতখানি স্নেহের ফল্গু বুকে চাপিয়া আপনি নিত্য চলিতেছেন ফিরিতেছেন, তার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এইটী।

"আরও শুনিলাম আমার নিজস্ব ঘরখানি আপনি নিজে চাবি দিয়া রাখিয়াছেন। দিদি, ঠাকুর, বা ভাঁড়ার ঘরের জন্য বারবার ব্যবহার করিতে চাহিয়া ধমক ছাড়া বিশেষ কিছু সুফল পান নাই; তবেই এও কি আপনার গোপন স্নেহের অন্ত একটী প্রমাণ নয়?

"এই দুই বৎসর আপনি মাছ ত্যাগ করিয়াছেন, একসন্ধ্যা হবিষান্ন মাত্র গ্রহণ করেন। হইতে পারে সন্ন্যাস সকল ধর্ম্মের সার, আর সে পথের বিশেষ গোপান ত্যাগ, বৈরাগ্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—এ গেরুয়ার পিছনে অন্তরের টান যদি থাকে, তবে তা' কতটা উচ্চমার্গের হয়?

"থাক্, এখন আমার নিজের কথা কিছু বলি —চাকরী করিতেছি। বাঙলার বাহিরে নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন কেবল কয়টী কুলি ও লৌহবর্ম্মের কচকচিতে মুখর, আত্মবন্ধু বলিতে আপনার পুত্রবধূ ও আমি! তাও দিনের অধিকাংশ সময় আমি থাকি ষ্টেশনে, সে থাকে কোয়ার্টারে। পরস্পরে যতটুকু দেখা হয়, সে সময়টুকু আর সম্ভাষণের কোন কিছু থাকে না। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমি হই নিদ্রালু, বিরক্তচিত্ত, সুতরাং অলস। আর সারাদিনের অপেক্ষায় সে হয় বীতশ্রদ্ধ, জানি এ কিসের বা কার অভিশাপের ফল, কিন্তু উপায় কিই বা তার?'

"ইচ্ছা হয় আবার তেমনি করিয়া মায়ের হাতের সুক্তা, ডালনা, ছেঁচকি প্রাণ পুরিয়া খাইয়া জীবনটা আর একটু নূতন রসানে রাঙাইয়া লই। ওসব বালাই এখানে নাই। বাজার বা হাট তিন-চার ক্রোশ তফাতে, নির্ভর রেলের কুলি বাবাজীবনের উপর; তিনি দয়া করিয়া যা' আনিয়া দিবেন, তাহাই উপাদেয়। হয় বেগুন, নয় শিম, অথবা আলু-কপি, লাউ-কুমড়া, ধুঁধুল-ঝিঙা-ঢ্যাড়স। যাই আনুক, এক তরকারী ছাড়া সে বেচারী অন্ত কিছু যেন কিনিতেই জানে না। বকিলে, ধমক দিলে মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে, নয় পরের হাটে করলার ঝুড়ি মাথায় লইয়া হাজির। এই আমাদের নিত্য জীবনের আহারীয় উপাদান। একটা সুখ এখানে আছে দুধ-দই-ঘি অপর্য্যাপ্ত। কাজেই দুধে আঁচান জিনিষটা এখন আর আমাদের পক্ষে প্রবাদ প্রবচন নয়, কিন্তু অমৃত তাও কি চিরদিন তৃপ্তিদায়ক হয়? জানেন ত আমরা কেহই সহিষ্ণুশীল নই কাজেই—

"যাক্, যে জন্য পত্রলেখা, তা' এইবার বলি — অবশ্য মাইকা এখানে চারিদিকে ছড়ান। মনে হয়, একজন আপনার মত পাকা লোক অন্ততঃ কিছু দিন যদি এখানে আসিয়া থাকেন, ব্যবসায় লক্ষপতি কেন ক্রোরপতি হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

"এক কথা, এ অতুল ঐশ্বর্য্য কাহারও অবাধ অধিকারের নহে। আমি এখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছি, খুব সামান্য বন্দোবস্তে তিনি আমাকে এগুলি ছাড়িয়া দিতে পারেন। তবে আপনার মত বিশেষজ্ঞের সৎপরামর্শ ব্যতীত একাজে নামিতে মোটেই ভরসা হয় না। আসিবেন কি?

"যদি আসেন, পূর্ব্বাহ্নে আমায় খবর দিবেন। আমি পাস পাই, অনর্থক ঘরের পয়সায় পরের উদর পূর্ণ করিতে নারাজ। মা আসেন যদি, বড় ভাল হয়, দিন দুই মুখটা অন্ততঃ বদলাইয়া লওয়া যায়।

"ভাল কথা, আপনার পুত্রবধূ বলিতেছে, সঙ্গে সামান্য কিছু ফলটল আনিবেন, এখানে এক কলা আর পেঁপে ছাড়া অপর কিছুই পাওয়া যায় না।

"অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রণাম লইবেন কি? মা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে আমাদের বিমুখী করিবেন না। যত অপরাধীই হই, আমি তাঁহার ও আপনার সেই চিরদিনকার—ভবতোষ।"

পত্র পাইয়া হরিবিলাস গৃহিণীকে ডাকিয়া শুনাইলেন।

গৃহিণী ক্ষুব্ধকণ্ঠেই বলিলেন, "যাবে ত?"

কর্ত্তা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "উত্তরটা যদি না দিয়ে দিতে পারতুম, তবে বেশী সুঠাম ও স্বাভাবিক হ'ত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দুটোর কষ্টের আঁচ বুকে বেজেছে। অন্ততঃ, একবার চোখের দেখাটা করে অতীতকে ভুলিয়ে দিয়ে আসব। তুমি যাবে?"

গৃহিণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল?"

"মন্দ কি! চল, একবার দেখেই আসা যাক্। তা' ছাড়া, তোমার অনেকদিনের সাধ গয়ায় পিতৃলোকের কাজ কিছু করবার, অমনি সেরে আসা যাবে'খন।"

ছেলেদের সব আপত্তি উপেক্ষা করিয়া উভয়ে যেদিন রওনা হইলেন, সেদিন দিনটা নাকি মোটেই ভাল ছিল না। কর্ত্তা দৈবজ্ঞের উত্তরে হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সুদিনের দিন আমাদের জীবনে ফুরিয়ে গেছে আচার্য্যি, আর ফিরবে না। সময় থাকতে এটুকুও যদি করে' না যাই, পরে আপশোষ থেকে যাবে তোমাদেরও, আমারও। তাই বলি, কাজ কি? সময় থাকতে কাজ সেরে যাওয়াই ভাল, নয় কি?"

আচার্য্য উত্তর দিতে পারিলেন না, মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ছেলেরা বাপ-মায়ের প্রত্যাগমন আশায় রহিল, কিন্তু সেই অযাত্রায় সুযাত্রা করিতে তাঁহারা আর মোটেই ফিরিলেন না। কেহ বলিলেন, ইদানীং সন্ন্যাস পথ তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন পুরোপুরি তাহাই হইয়া গেলেন। অপর জন বলিলেন, তা' নয়, ভবতোষের কর্ত্তব্য জ্ঞানের কাছে এত দিনে তাঁহারা ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। হবে না, হাজার হোক বংশের বড় ত সে।

সংসারের চাপে ছেলেদের নিজে গিয়া বাপ-মাকে দেখিয়া আসিবার ফুরসৎ মিলিল না। কাজেই আজকাল করিয়া কালই কাটিয়া চলিল।

—চার—

সিঙ্গার কোম্পানীর দালাল কিষণলাল পুরাদস্তুর সাহেব, আবার একটু খামখেয়ালিও। কাজেই দিনের অবসানে একটা বেপড়, নাম নাজানা ষ্টেশনে আসিয়াই যে নামিবেন, স্যুটকেস হাতে

তেমন আশ্চর্য্য হইবার মত কিছুই ছিল না।

ঝিল্লী-মুখর সন্ধ্যার রঙিন আকাশ-পট বড় মনমোহন, বড় স্নিগ্ধ। পবিত্রতা-পূরিত আনন্দ-ধারা কিষণলালকে একেবারে মোহিত করিয়া তুলিল। আপন-মনে শিস্ দিতে দিতে সে স্থান-কাল-পাত্র সব কিছুই বিস্মৃত হইল।

ফাঁকা মাঠ, মাঠের পর মাঠ, কেবল মাঝে রেখার মত আইল বিশালকে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। একটু বেশী দূরে সে রেখাও যেন আর বোঝা যায় না। মানুষের সকল প্রচেষ্টাকে উপহাস করিয়া মুক্ত ধরিত্রী বিশালতার মধ্যে আনন্দে আত্মহারা! দূরে, বহু দূরে বুঝি দিগন্তের স্পর্শ করিয়া বৃক্ষশ্রেণী শান্ত তপস্বীর ন্যায় দণ্ডায়মান কতকগুলি নাম-না-জানা পাখী মাথার উপর দিয়া শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। একখানা চলন্ত ট্রেণ প্রয়োজন না থাকাতেই বোধ হয় এ ক্ষুদ্র ষ্টেশনে না থামিয়া জমি কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। আত্মহারা কিষণলাল কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শুনিল, "এসব কোথায় রাখা যাবে সাহেব, সাহেব লোকদের ঘরে?"

ফিরিয়া দেখিল ষ্টেশনে জনৈক কুলি তাহারই মুখের কথার অপেক্ষায় জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া আছে। কিষণলাল ধীরকণ্ঠে বলিল, "কেন, আজ রাতটুকু বই ত নয়, ষ্টেশনের বাবুদের সঙ্গেই থাকা যাবে।"

বোধ হয় একজন টিকিটবাবু, অথবা মাল-বাবুই হইবে, নিকটেই দাঁড়াইয়া কয়েকজন নিরীহ যাত্রীর উপর অনর্থক কর্তৃত্ব করিয়া নিজের বিশেষত্ব জাহির করিতেছিল, হঠাৎ এ কথায় সে চঞ্চল হইয়া উত্তর দিল, "বা হে, মজা ত মন্দ নয়! তোমার জন্যে আমি নিজের ঘর ফেলে বনে যাই। এই লক্কড়ের বোঝা, বল কি করে'?"

লোকটী যেরূপ বেপরোয়াভাবে মুখের দিকে চাহিল, তাহাতে মুখফোড় হইয়াও কিষণলালের কণ্ঠে ভাষা স্ফুরিল না। ধীরভাবে সে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া নিঃশব্দে তাহার চক্ষু সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

লোকটী বেশ একটু বিরক্তিমাখা-কণ্ঠে বলিল, "ও আবার কি বাবা, ক্রোকী পরোয়ানা না নিলামের ইস্তাহার। তা' ও সব এ গরীবের উপর মেলে দিচ্ছে জুলুম কেন? আছে ত পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে এই দেহটা, তা' নিয়েও যদি তোমরা জুলুম কর, তা' হ'লে নেহাত ডাক ছেড়ে গাইতে হয়—'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা'।"

পত্রখানি এজেন্টের আদেশ-পত্র, প্রত্যেক রেলকর্ম্মচারীর উপর আদেশ দিয়া লিখিত, তারা যেন মালপত্রসহ কিষণলালের সর্ব্ব বিষয়েই সুবিধা করিয়া দেয়। কথাটা বুঝাইয়া দেওয়া হইলে বাবুটী বলিল, "আমিই বা কোন নারাজ বাবা, ষ্টেসনে তোফা ওয়েটিং-রুম রয়েছে —একেবারে খাস রয়েল। সেখানে যান, থাক-বেন ভাল, স্প্রিংয়ের খাট, ইলেকট্রিক পাখা, পাশেই গোসলখানা, ওই বল্লুম যে, একেবারে ফাষ্ট ক্লাস। এই কুলি, বাবুকো ইউরোপীয়ান ওয়েটীং রুমমে লে যাও।"

দাঁড়াইয়া মিছা তর্ক-যুদ্ধ করিবার মত প্রবৃত্তি কিষণলালের ছিল না, কাজেই এরপর বিনা আপত্তিতে সে মালপত্রসহ কুলির নির্দ্দেশিত ঘরখানিতে যাইতে আর কোন আপত্তি তুলিল না।

পরদিনের কার্য্য তালিকা প্রস্তুত এবং অফিসে গতদিনের হিসাব পাঠাইতে প্রায় রাত্রি এগার কি সাড়ে এগারটা বাজিল; তারপর সঙ্গের টিফিন কেরিয়ার খুলিয়া কিঞ্চিত জলযোগ সারিয়া কিষণ শুইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

গোসলখানার ভিতরের দিকের দরজাটা

টানাটানি করিয়াও বন্ধ করা গেল না। তখন অপর পার্শ্বের অর্থাৎ মাঠের দিকের দরজাটা বহু কষ্টে টানিয়া চাবি লাগাইয়া কিষণ খাটখানার উপর বিছানা-পত্র ফেলিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু, ওঃ, কি অসহ্য গরম! কিষণ ভাবিয়া পাইল না, এত রাত্রে এমন খোলামাঠের উপরের রেলের টিনের সেডের ওয়েটিং রুম এত অধিক গরম হইতে পারে কি করিয়া?

কিছুই যখন ধারণায় আসিল না, তখন জলন্ত ইলেকট্রিকের বাতিটাই যত অনর্থের মূল ভাবিয়া সেটাকে আপাততঃ ছুটি দেওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিল। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখাটা চালাইয়া সে ঘর অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

এ অস্বাভাবিক গুমটের কিন্তু তথাপি কিছু-মাত্র অবসান উপলব্ধি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। কিষণ ভাবিল, কোন অজানা মুহূর্ত্তে তাহার কি চিত্তবিকার ঘটিয়াছে। অথবা দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ফলেই এ নরক-যন্ত্রণার উপভোগ?

বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। যদি কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিদ্রাদেবী তাহাকে কোলে তুলিয়া লন। কিন্তু দেবীর বোধ হয় সেদিন অন্তর হইতে নারীর স্বভাব-করুণ কোমলতা শুকাইয়া গিয়াছিল, তাই কিষণের আপ্রাণ সাধ্য-সাধনাতেও তাঁহার প্রাণ গলিল না। হঠাৎ কিসের একটা চাপ সারা দেহটার উপর অনুভব করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এ নির্জ্জন গৃহে কোন বদলোক আসিয়া ঢুকিল না কি? নিশ্চয় তাই, নচেৎ এমন করিয়া গলা টিপিয়া ধরে কে? আর সে পেষণ ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। এর উদ্দেশ্য কি—প্রাণে মারা, যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন? তা' ছাড়া আর কি ই বা হইতে পারে?

বহু কষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া কিষণ বিছানার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের এক-ফালি চাঁদিনীর আলোকে স্পষ্ট দেখিল, কে একজন পরিণতবয়স্ক ভদ্রলোক তাহার বিছানা আশ্রয় করিতেছে।

অবসাদ, ক্লান্তি, সর্ব্বোপরি বিরক্তিতে কিষণের অন্তর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব রসিক লোক ত মশায় আপনি, রাত দুপুরে আপনার এ অভদ্র আত্মীয়-তায় মোহিত হ'য়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ!"

লোকটী কোন কথা কহিল না, কেবল চক্ষু তুলিয়া বক্তার মুখের দিকে একবার চাহিল, সে দৃষ্টি যেমন প্রখর, তেমনি জ্বালাময়! কিষণলাল ভয়চকিত হৃদয়ে কয়েক পদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

পাশের গোসলখানার দ্বার যা' এতক্ষণ টানাটানি করিয়াও বন্ধ করিতে পারা যায় নাই, এবার কি কৌশলে জানি না হঠাৎ তা' একত্র মিলিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কষ্টকর শ্বাসরোধজনক বাষ্পে ঘরখানি পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, গৃহের এতক্ষণের উন্মুক্ত ফাঁকগুলি কে বা কাহারা খুব যত্নে তেরপল, চামড়া, কাদা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ টানাটানি করিল, কিন্তু বাহির হইতে পারিল না। তখন সকল শক্তি একত্রিত করিয়া সে গোসলখানার দ্বারে আঘাত করিল, পরন্তু এদিকেও সমান অকৃত-কার্য্যতা তাহার সকল প্রচেষ্টাকে নিভাইয়া দিল।

আশ্চর্য্য হইয়া কিষণ চাহিয়া দেখিল, খাটের উপর একজন বর্ষিয়সী নারীমূর্ত্তি উপবিষ্টা। বৃদ্ধ তাহার নিকটে আসিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিল, "ছেলের হাতের শেষ জলটা বড়ই না কি মিষ্টি গিন্নি, তাই ভবতোষ আমাদের ছাড়তে পারলে না। নাও, অন্তিমের জল গণ্ডুষটুকু চেয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হও!"

গৃহিণী কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন,

না, এমনি ভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

পকেটের রুমাল বাহির করিয়া কিষণলাল নাকে-মুখে বেশ করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাই সে বাষ্পজালে তাহার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিল না।

একজন মেঝের, অন্যজন খাটিয়ার অতি শীঘ্র ঢলিয়া পড়িল! বৃদ্ধ বয়সের যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য অবশ্য তা' দিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার পর। পাশের গোসলখানা হইতে একটা পৈশাচিক হাসির সহিত একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল।

কিষণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, সবেগে গোসলখানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটী যুবকের হাত ধরিয়া এক তন্বী সুন্দরী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক ছুটিয়া গিয়া একবার মেঝের পতিত পুরুষ এবং পর মুহূর্ত্তেই শয্যায় পতিত নারীর দিকে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর হাহাকার শব্দ করিয়া উভয়ের মাঝখানে লুটাইয়া পড়িল।

যুবতী কিন্তু বেশ সহাস্য মুখেই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলিল। যুবক সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশী, ওরা যে আমার বাপ-মা!"

যুবতীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "ওরা যে তোমার আপনার জন, তা' আমায় মনে না করিয়ে দিলেও চলত। যারা তাড়িয়ে দিয়েছিল,তাদের তুমি ভুল্‌তে পার, কিন্তু আমি পারি না! আর বসে বসে ও আত্তি দেখবার, সহ্য করবার ক্ষমতাও আমার নেই—তাই এই বিষাক্ত গ্যাসে ওদের এমন জায়গায় পাঠালুম, যেখান থেকে কোন মানুষ কোনদিন ফেরে না।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুবক তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। মুক্তি পাইবার জন্য নারী সাধ্যমত বলে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি হইতে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। সংজ্ঞাহারা, অথবা মৃত্যুর কোলে সে অচিরে ঢলিয়া পড়িল।

যুবক চুপিচুপি একবার বৃদ্ধের নিকটে আসিয়া ডাকিল, "বাবা, বাবা!" আবার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "মা, মা, চল, এই বেলা পালিয়ে চল, ওকে ঘুম পাড়িয়েছি! না, আর ও তোমাদের জ্বালাতন করতে আসবে না!"

কিষণ আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গোসলখানার দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ষ্টেশনের তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, সেই পূর্ব্বের লোকটী কিষণের নিকট কাহিনীটা আগাগোড়া শুনিয়া বলিল, "আজ কি গাঁজার মাত্রাটা কিছু বেশী হয়েছিল সাহেব, না, বিয়ার, ভুলে গ্লাস দুই বেশী টেনে ফেলেছ!"

কথাটায় নিজেকে বিশেষ একটু অপমানিত জ্ঞান করিয়া কিষণ আর তাহার সহিত কোন কথা কহিল না। সম্মুখের ইজিচেয়ার-খানা টানিয়া লইয়া প্লাটফরমের উপর বিছাইয়া কম্বল আবৃত অঙ্গে শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে রাত্রে নিদ্রা সম্ভব কি?

ভোরের ট্রেনে যে গার্ডসাহেব আসিলেন, আমূল সকল সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মিথ্যে একচুলও নয় বাবু, তবে শুনুন।"

তাঁহার কথিত গল্পটী আমরা আগেই শুনাইয়াছি। কাহিনী শেষ করিয়া সাহেব কহিলেন, "পরের দিন পাগলকে আমিই ট্রেনে তুলে রাঁচি পৌঁছে দিয়ে আসি। মাঝে মাঝে খবরও নিতুম। বছরখানেক আগে শুনলুম, সে না কি আত্মহত্যা করেছে।"

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

অজয় এবং অভয়াপদ মামাতো পিসতুতো ভাই, শিবানী ধনীর কন্যা—অজয়ের বিদুষী, রূপবতী স্ত্রী। এই তিনজনকে লইয়া ক্ষুদ্র সংসার।

সংসার ক্ষুদ্র, কিন্তু খরচ তাহার অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। অজয় কোন একটা সওদাগরী আফিসে মোটা মাহিনার কেরাণী আর ছোট ভাই অভয়াপদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া সম্প্রতি কলেজে প্রবেশ করিয়াছে।

সহোদর ভ্রাতা নহে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের ভ্রাতৃস্নেহ, বোধ করি, এক মায়ের পেটের ভাইয়ের অপেক্ষা বেশীই ছিল।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া অজয় ঘরের মেঝেয় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। শিবানী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিল, আমার চুড়ি এনেছ? কৈ দাও!

অজয় মিনিটখানেক নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, চুড়ি? না চুড়ি তোমার আনতে পারি নি। তোমায় চুড়ি দেব বলেছিলুম বটে, কিন্তু হঠাৎ অভয়ার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে মাত্র গোটাকতক টাকার জন্যে আটকে গেছল। শুনলুম, তারা বড়ো গরীব, দু'মুটো ভাতও পেট ভ'রে খেতে পায় না; কাজেই—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া অজয় শিবানীর মুখের দিকে চাহিল।

শিবানী মুখ বিকৃতি করিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া কিছু বলিল না; গুম হইয়া গেল।

তারপর ভ্রূকুটি করিয়া একবার স্বামী মুখের পানে চাহিয়া, ব্যর্থরোষে ফুলিতে ফুলিতে দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অজয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

শিবানী যে আজ এত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, শিবানী যেন দিন দিন কেমন নীচমনা হইয়া যাইতেছে—কোথায় স্বার্থ-সিদ্ধির উপকরণ তালিকা, আর কোথায় দুঃস্থ পরিবারের কন্যাদায়ে সাহায্য করা! এই দুইটা অজয়ের কাছে যেন পাশাপাশি নরক ও স্বর্গ বলিয়াই মনে হইল।

দুই

ব্যাপারটা যত সহজে মিটিল ভাবিয়া অজয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল তাহা কিন্তু ততটা সরল-ভাবে গেল না।

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই অজয় বৈকালিক ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরিয়া শুনিল, তাহাকে একটা মুখের কথায় জিজ্ঞাসা না করিয়াই শিবানী পাশের বাড়ীর ব্রাহ্মিকাদের সহিত বায়স্কোপে গিয়াছে। মাসকতক হইল, এই ব্রাহ্মবধূটী শিবানীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইনি না কি নারী স্বাধীনতার প্রধান কর্ত্রী! মাসের মধ্যে প্রায় পনের দিন পাড়ায় নারী-সমিতি আহ্বান করিয়া পুরুষের বাঁধন-কষণ ছিন্ন করিতে তীব্র বক্তৃতা দেন।

অজয় মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া

রহিল, পরে ধীরে ধীরে উপরে নিজের কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। অভয়াপদ কলেজের পড়া মুখস্থ করিতেছিল, দাদাকে সহসা কক্ষে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অজয় চাদরটা হুকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, বস্ বস্ অভয়া, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লি কেন!

এই বলিয়া অজয় মিনিটখানেক একদৃষ্টে ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তোর মুখটা আজ এত শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন রে? কলেজ থেকে এসে জল টল খেয়েছিলি তো?

অভয়াপদ মুখ নীচু করিয়া, ক্ষণকাল সেই-ভাবেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া সে শিবানীকে দেখিতে পায় নাই। ক্ষুধায় তাহার গা 'পাক্' দিয়া উঠিতেছিল, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া বামুনঠাকুরের নিকট হইতে খাবার চাহিয়া উত্তর পাইয়াছে, ছোটবাবু আপনার খাবার তো আজ নেই।

অভয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল—নেই কেন?

বামুনঠাকুর শুষ্ক মুখে জবাব দিয়াছে, ও বাড়ীর বৌদি এসেছিলেন, তাই সেগুলো তাকে খাইয়ে বৌদি বায়স্কোপ দেখতে গেছেন।

অভয়াপদ দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, তাড়াতাড়ি উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

কথাটা দাদাকে বলা চলে না, তাই সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ব্যাপারটা অজয়ের বুঝিয়া লইতে মোটেই বিলম্ব হইল না। তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তোকে খেতে দেয় নি, তা' হ'লে,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। ভাইয়ের গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিল, অভয়া, তুই এখানে একটু বস্ ভাই, আমি এখুনি আসছি। বলিয়াই সে দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরেই অজয় একঠোঙা খাবার আনিয়া, একখানা কাঁচের প্লেটে সাজাইয়া কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দিয়া কহিল, নে ভাই, বসে পড়, ছেলেমানুষ তুই, এতক্ষণ না খেয়ে কি থাকতে পারিস্?

অভয়াপদ চক্ষু নত করিয়া উদাসভাবে খাবারের দিকে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই মন্ত্র-চালিতের ন্যায় ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। দাদার কথা সে কোনদিনই ঠেলিতে পারে না—আজও পারিল না।

রাত্রে অজয় ঠাকুরকে উপরের ঘরে দু-ভাইয়ের ভাত দিয়া যাইতে বলিল।

বামুনঠাকুর ভয়ে-ভয়ে কহিল, বড়বাবু, বৌদি ছোটবাবুর চাল দিয়ে যান্ নি, যা কিছু তৈরী হয়েছে, তা কেবল আপনার জন্যেই। বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অজয় একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, বলিল, কি চাল দিয়ে যায় নি? তাই বোবা হয়ে বসেছিলে এতক্ষণ পাজি, হারাম-জাদা, চাবুক মেরে তোমায় সিধে করে দেব। ন্যাকাসির আর জায়গা পাওনি?—বোকা উড়ে কোথাকার?

বামুনঠাকুর এ বাড়ীতে কাজ করিতেছে বহুবর্ষ ধরিয়া, বাবুর মেজাজ সে বোঝে, তাই ধমকে দুঃখিত হইল না, কহিল, আজ্ঞে! বড়বাবু, আমার কি দোষ বলুন? আমি তো ছোটবাবুর চালের কথা বলেছিলুম, কিন্তু বৌদি বল্লেন, তার খাবার অভাব হবে না। দাদার কাছে ভোগা দিয়ে বন্ধুর নাম করে যে টাকা গুলো জমিয়েছে, তাতেই চলে যাবে'খন।

হু বলিয়া অজয় বহুক্ষণ অসম্ভব গম্ভীর হইয়া, নীরবে বসিয়া রহিল, পরে নীচু স্বরে কহিল, ছোটবাবু কোথায় রে?

—তিনি নীচের ঘরে পড়ছেন।

—ওকে একবার ওপরে পাঠিয়ে দে ত।

কিছুক্ষণ পরে অভয়াপদ কক্ষে প্রবেশ করিলে অজয় কহিল, রাত্ তো অনেক হলো, খেয়ে নে অভয়া। বেশী রাত করলে, ভাত শুকিয়ে কড়্‌কড়ে হয়ে যাবে যে খেতে পারবি কেন? নে বস্।

অভয়াপদ মাত্র একটা ঠাঁই দেখিয়া দাদার পানে চাহিয়া কহিল, তোমার ভাত! তুমি খাবে না?

অজয় অসুখের ভাণ করিয়া, কাত্‌রাইয়া কহিল, না রে, আজ আমি খাবো না, হঠাৎ পেট্‌টা অত্যন্ত কামড়ে উঠেছে!

বলিয়াই অজয় বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িল।

অভয়াপদ ব্যস্ত হইয়া দাদার অতি নিকটে সরিয়া আসিল, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, বড্ডো কি পেট্ কামড়াচ্ছে দাদা, 'যোয়ানের জল' আনবো?

অজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, না, ওসব কিচ্ছু দরকার নেই, রাতে ভাত না খেলেই সেরে যাবে।

—তবে অন্য কিছু খাও দুধ-টুধ, আনবো?

অজয় ধমক্ দিয়া কহিল, পেট কামড়ালে বুঝি দুধ খায় রে হতভাগা, ভারী ডাক্তার হয়েছিস্ যে দেখ্‌ছি!

কিন্তু পরক্ষণেই কোমলস্বরে কহিল, আমার জন্যে তোকে এত ব্যস্ত হতে হবে না অভয়া, দাদার কথাটা রাখ ভাই।

ভাত ডাল দিয়া মাখিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই কয়েক গ্রাস উদরস্থ করিয়া অভয়াপদ উঠিয়া গেল।

তিন

রাত্রি তখন অনেকটা...

একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া অজয়ের দুয়ারে লাগিল। শিবানী গাড়ী হইতে নামিল।

তখনো অজয় ঘুমায় নাই, বিছানায় শুইয়া, হ্যারিকেন্‌টা শিয়রের কাছে রাখিয়া, কি একখানা মাসিক পত্রিকা একমনে পড়িতেছিল। শিবানী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সে পদ শব্দে একবার তাহার মুখের দিকে চোখ্ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই পাঠে মন দিল।

শিবানী একবার আড়-চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া জামা কাপড় খুলিতে লাগিল। ঘরের সর্ব্বত্র আলো পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পড়িতেছিল না, সে কি একটা খুঁজিতে গিয়া না পাইয়া ঝঁঝিয়া উঠিল, সবে একটা তো হ্যারিকেন, তাও আবার নিজের কাছে রেখে এত রাতে বই পড়া হচ্ছে! একশোদিন বলেছি, কেরোসিনের আলো আমার সয়না, ইলেক্‌ট্রিক্ আলোতে দেখা আমার অভ্যাস্—তা কার কথা কে শোনে?

অজয় নীরবে হ্যারিকেনটা মাটির উপর বসাইয়া দিয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

শিবানী আর কোন কথা বলিল না, আলোটা উস্কাইয়া দিয়া, কি একখানা ইংরাজী বই খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে বসিল।

বহুক্ষণ পরে অজয় এপাশ ফিরিয়া কহিল, আমার বেলাই যত দোষ, কিন্তু নিজে যে বিনা অনুমতিতে, বায়স্কোপ দেখে এত রাত্রে ফিরলে, ফিরেই আবার বই নিয়ে পড়তে বসলে—তার বেলায় বুঝি দোষ হয় না?

শিবানী বই হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, অনুমতি কি আবার? সব কাজেই কি তোমার অনুমতি ভিক্ষা করতে হবে নাকি? বাধ্

াদির মধ্যে আমি থাকতে পারবো না, তা কিন্তু তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখছি।

মুহূর্ত্ত মাত্র মৌন থাকিয়া সে আবার কহিল মিসেস চ্যাটার্জ্জি ঠিকই বলেন যে, পুরুষজাতি অন্যায় ভাবে নারীজাতীকে পরাধীন করে রাখে। যার কথায় মর বাঁচ সেই সোহাগের ভাইকে উপদেশ দাও গে। পেটে খেলে পিঠে সয়, সেও সব সয়ে নেবে হয় ত। দুঃখের বিষয় অতটা বুদ্ধি নিয়ে জন্মাতে পারি নি। তা ছাড়া বাবার দোষে দু'পাতা পড়তেও শিখেছি। কাজেই জানাতে হচ্ছে, যা বলবে তাই মাথাপেতে নিতে পারব না।

অজয় সহসা বিছানার উপর তড়াং করিয়া উঠিয়া বসিল, চক্ষু রক্তাবর্ণ করিয়া কহিল, দেব না ভাইকে উপদেশ? একশোবার দেব। কিন্তু তোমার—বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই অজয় দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শিবানী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বইএর খোলা পাতাটার দিকে চাহিয়া, বসিয়া রহিল।

চার

পৌষের শেষাশেষি...

অফিস হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে, অজয় সহসা দেখিল, একখানা ভাড়াটে মোটারে শিবানী, ধূর্জ্জটী এবং আর একজন কে, তাহাকে সে ভালো করিয়া দেখিতে পাইল না। ধূর্জ্জটী মোটার চালাইতেছিল, এবং শিবানী তাহারই পাশের সীটে ঘেঁষাঘেষি ভাবে বসিয়া আছে।

মোটারখানা অজয়ের পাশ দিয়া জোরে চলিয়া গেল।

অজয় বহুক্ষণ পথের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যতদূর দৃষ্টি যায়, চাহিয়া থাকিয়া অভিমান এবং ক্রোধ ভরা মন লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল।

উপরে উঠিয়া গিয়া সে হাঁক দিয়া অভয়াপদকে ডাকিল, সে আসিলে, চোখ-মুখ লাল করিয়া কহিল, অভয়া, তোর বৌদি বেরবার সময় তোকে কিছু বলে গেছে?

—আমাকে? কৈ না!

অজয় সহসা অকারণে অত্যন্ত ধমক দিয়া উঠিল, কৈ, না? তুই বাড়ী থাকিস হতভাগা, যে তোকে বলে যাবে? দিনরাত এর বাড়ী তার বাড়ী করে বেড়াবে, পাজী কোথাকার!

এই তিরস্কারের জন্য অভয়াপদ আদৌ প্রস্তুত ছিল না, দুই মিনিট নীরব থাকিয়া মুখ নীচু করিয়া কহিল, আমি তো কলেজ যাই দাদা, ছুটি হয় চারটের পর।

অজয় নিজের ভুলে অত্যন্ত নরম হইয়া পড়িল, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল তোর কলেজ ছিল না?

সহসা ঘড়িটার পানে চাহিল, কি ভাবিয়া কহিল, অভয়া বায়স্কোপ দেখতে যাবি?

অভয়াপদ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ আজ হইল কি? যে অজয়কে সাধিয়াও কেহ কখন বায়স্কোপে লইয়া যাইতে পারে নাই, সে আজ স্বেচ্ছায়—অভয়াপদ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ইণ্টার ভ্যালের সময় সহসা অজয়ের চোখ গিয়া পড়িল, বক্সের দিকে। ওখানে শিবানী, ধূর্জ্জটী এবং মিসেস চ্যাটার্জ্জী না? অজয় চোখ দুইটা একবার রুমাল দিয়া ভালো করিয়া মুছিয়া লইল। দেখিল—হাঁ, ঠিক তাই-ই বটে। সে স্পষ্ট দেখিল, ধূর্জ্জটী কি একটা কথা লইয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকসমুদ্রের মধ্যখানেই নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় শিবানীর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে...

ছিঃ ছিঃ! অজয় আর সেদিকে চাহিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি আপনার জায়গা

হইতে উঠিয়া অজয়াপদকে সে কহিল, তুই বস, আমি একবার বাইরে থেকে আসছি।

এই শিবানী? পরপুরুষের সঙ্গে তাহার এমনিই অবৈধঘনিষ্ঠতা?

আলো নিবিল, ছবি পুনরায় পর্দার উপর পড়িল, কিন্তু অজয়ের হৃদয়ে একটা রেখাপাতও করিতে পারিল না। বয়স্কের কুৎসিত দৃশ্যটা বারবার মনে পড়িয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

বায়স্কোপ ভাঙ্গিতেই অজয় কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভাইকে লইয়া সোজা বাহির হইয়া আসিয়া বাস ধরিতে চলিয়াছিল। দৈব প্রতিকূল, একেবারে সামনাসামনি শিবানীর সহিত দেখা হইয়া গেল। তখনও ধূর্জ্জটীর হাতের মধ্যে শিবানীর একখানা হাত ধরা রহিয়াছে। সে সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া দ্রুতপদে বাসে উঠিয়া পড়িল।

পাঁচ

এ সম্বন্ধে অজয় কিন্তু শিবানীকে কোন কথাই বলিল না, শিবানীও তুলিল না, অন্তরে অন্তরেশুধু সে খড়ের আগুণের মত দগ্ধ হইতে লাগিল।

মাঘের চার পাঁচ তারিখ পরে···

অজয় অফিস হইতে জ্বর লইয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার গা জ্বরের উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই অজয় বিছানায় শুইয়া পড়িয়া, লেপটা গায়ের উপর টানিয়া দিল। মাথার যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ঘরে আলো দিতে আসিয়া শিবানীর বিছানার উপর দৃষ্টি পড়িল। ধীরে ধীরে আলোটা মেঝের উপর রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে স্বামীর পীড়া-কাতর মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ কতদিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে! শিবানীও ভাল করিয়া কথা কহে নাই, অজয়ও না। কি জানি কেন শিবানীর অন্তরটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া মমতাভরা কণ্ঠে বলিল, জ্বর হয়েছে না কি?

অজয় কোন জবাব দিল না, গায়ের লেপটা মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া 'জড় সড়' হইয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

শিবানী মিনিট্ কতক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অজয়াপদ বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেই শিবানী শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, তোমার দাদার জ্বর হয়েছে বোধহয়, ওপরে একটু বসলে হ'ত না? আমি দুধটা গরম ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। বলিয়াই সে একবাটী দুধ লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

একটু পরেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি, ধূর্জ্জটীকে মোটরে রাখিয়া, অজয়াদের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া শিবানীকে ডাক দিলেন। আজ নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা খুব বড় বক্তৃতা আছে, মিসেস চ্যাটার্জ্জিই প্রধান বক্তৃ; কথাছিল, তিনি শিবানীকে ডাকিয়া লইয়া যাইবেন!

বান্ধবীর গলার স্বর শুনিয়া, শিবানী তাড়া তাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, শুষ্ক হইয়া কহিল, আজতো যেতে পারব না ভাই—ওঁর জ্বর হয়েছে।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী সহসা সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, শিবানীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, জ্বর হয়েছে? তবে আর কি এতটুকু জ্বরে সে···

শিবানী অসন্তুষ্ট হইল, বাধা দিয়া ক'হল, আস্তে ভাই, শুনতে পাবেন। আমাকে মাপ কর' এ অবস্থায় তাকে ফেলে যেতে পারবো না। এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে ফিরিল।

মিসেস্ চাটার্জ্জী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, মিষ্টার

মুখার্জ্জী তোমার জন্যে উদগ্রীব হয়ে গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। তুমি না গেলে তিনি বড় দুঃখিত হবেন। তোমার কাছে থেকে এ আমি আশা করি নি।

শিবানী ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মানুষের মন ও মত বদলাতে বেশী দেরী হয় না, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। আর আমি তো তাঁকে অপেক্ষা করতে বলি নি তিনি দুঃখিত হন বা না হন, তাতে আমার কি? বলিয়াই সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং পরমুহূর্ত্তেই গরম দুধের বাটীটা লইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী অবাক-বিস্ময়ে ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

অভয়াপদ দাদার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

অজয় চোখ তুলিয়া ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না; শুধু ভাইয়ের হাতখানা নিজের কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া, নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

অভয়াপদ দাদার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিল, তোমাকে তো সকালেই বলেছিলুম দাদা, তোমার শরীর ভালো নেই, আজ চান করো না, ভাত খেও না, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না এখন তার ফল ভোগ করছ তো?

বলিতে বলিতেই তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। অজয় ভাইয়ের হাতখানা নিজের সমস্ত কপালটায় বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে কহিল, ঠিক্ বলেছিস্ অভয়া, তোর কথা না শুনেই… কিন্তু সহসা সে দুইমুহূর্ত্ত থামিয়া রহিল, কথার মোড় ঘুরাইয়া কহিল, অভয়া মিসেস্ চাটার্জ্জীর গলা পাচ্ছি না, ও বুঝি এখানে আবার এসেছে?

অভয়াপদ সে কথার কোন উত্তর দিল না। শিবানী ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, একটু দুধ খাবে? সেই তো কোন্ সকালে দুটী-খেয়ে বেরিয়েছিলে? বলিয়াই সে প্রত্যুত্তরের আশা না করিয়া বাটীটা স্বামীর মুখের কাছে ধরিল।

অজয় সে কথার কোন জবাব না দিয়া ওপাশ ফিরিয়া কণ্ঠে শ্লেষ মাখাইয়া কহিল, মিষ্টার মুখার্জ্জী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, নারী স্বাধীনতার এমন সুযোগ ত্যাগ করে এখানে আসা নারীত্বের বড়ো অপমান!

শিবানীর মাথার ভিতর সহসা দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হাতের বাটীটা টান মারিয়া জানালা গলাইয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং পর মুহূর্ত্তেই চোখ্ দিয়া আগুন বাহির করিয়া কহিল, রোগ করে পড়ে আছো তাই এসেছিলুম, তার আবার এত কথা? তার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, অকস্মাৎ তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু অজয়ের অলক্ষ্যে নিঃশব্দেই ঝরিয়া পড়িল।

অজয় কহিল, তুমি না এলেও চলত শিবানী, কেন না আমি সারা অন্তর থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তোমার মন যদি আমাকে না চায়, তাহ'লে জোর করে ধরে রাখবার মত দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমার কোন দিন না হয়, তুমি যাও। তোমাকে বাধা দিতে আর আমার ইচ্ছে নেই।

উত্তর দিবার জন্য শিবানীর ওষ্ঠদ্বয় একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে নাকি অসম্ভব ক্রোধে ও অভিমানে ফুলিতেছিল, তাই কোন কথা বলিতে পারিল না, একবার স্বামীর পানে আগুন

মাথা দৃষ্টিতে চাহিয়াই দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

অভয়াপদ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু এখন কহিল, দাদা, এটা কিন্তু তোমার ভালো হ'ল না ; বৌদিকে...

অজয় সহসা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পরক্ষণেই অভয়াপদর গালে একটা ঠাস্ করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, পাজী কোথাকার, তুই আমাকে ভালোমন্দ শেখাতে এসেছিস ? তোদের জন্তে কি রোগেও একটু শান্তি পাব না ?

সপ্তম

পরদিন অজয়ের জ্বর আরো দুই ডিগ্রী বাড়িয়া গেল।

অভয়াপদ কি করিবে ঠিক্ না পাইয়া শিবানীর কাছে গিয়া কহিল, বৌদি, দাদার জ্বর তো প্রায় ১০৩ ডিগ্রী, ডাক্তার ডাকৃতে যাবো ? তুমি একটু তার কাছে বসবে ?

শিবানী কোন কথা না বলিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। অভয় আবার অনুরোধ করিতেই কাজ ফেলিয়া হন হন করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটা...

ডাক্তার অজয়কে দেখিয়া যখন নীচে নামিয়া আসিল, শিবানী সম্মুখের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন দেখ্‌লেন ডাক্তারবাবু ? অসুখ কি শক্ত ? বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিল, রোগটা বড়ো সহজ নয় টাইফয়েডে টার্ন নিতে পারে।

শিবানী ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া কহিল, সারবে তো ? মুখ নীচু করিয়া কহিল, ওঁকে সারিয়ে তুলুন, আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেব! বলিয়া অকারণ শিবানী আপন হস্তদ্বয়ের অত্যন্ত আদরের বালা দু'গাছা খুলিয়া, ডাক্তারের দিকে বাড়াইয়া দিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, অত ব্যস্ত হয়ো না মা, যত্ন কর, অমনই সেরে যাবে। ভিজিট আমি পেয়েছি। তোমার গা থেকে ওগুলো খুলে অকল্যাণ করব না।

দিনকতক পরে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়ে শিবানী অভয়াপদকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, ঠাকুর পো, তুমি কাল রাত জেগে তোমার দাদার কাছে বসে ছিলে, সকাল সকাল চান করে, ভাত খেয়ে শুয়ে পড় আজ আর কলেজ গিয়ে কাজ নেই।

শিবানীর সহসা এই পরিবর্ত্তন অভয়াপদকে নিতান্তই বিস্মিত করিয়া তুলিল। বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি সে কিছু আবিষ্কার করিতে লাগিল।

শিবানী সহসা তাহার একখানা হাত ধরিয়া কহিল, আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছ ঠাকুর পো যে আমার পক্ষে এ কি করে সম্ভব হ'তে পারে, না ?

একমুহূর্ত্ত থামিয়া পুনর্ব্বার কহিল, তিন রাত্রি ধরে না ঘুমিয়ে এই সব কথাই ভেবেছি ঠাকুর পো, বুঝেছি মনে বিদ্বেষ রেখে, আপনার জনকে ঘৃণা করে, মরীচিকার মত নারী স্বাধীনতার দিকে দৌড়লেই শান্তি পাওয়া যায় না। নিজের ঘরকে বাদ দিয়ে স্বাধীন হবার দুর্ভাগ্য যার আসে আসুক, ভগবান করুন আমার যেন আর না আসে! তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ, কি দেখছ ভাই ? এর একটা কথাও অতিরঞ্জিত নয়।

বলিতে বলিতেই শিবানীর দুইচক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহা বিন্দু আকারে দুই গাল বাহিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

চক্ষু মুদিয়া পুনরায় কহিল, কিন্তু সে কথা

থাক ; যা এখানে কখনো করিনি তাই আজ করেছি—তুমি যা ভালবাস বেছে বেছে বসে তাই রেঁধেছি! ইচ্ছে, আজ তোমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াব নাও ভাই, এ সাধে বাধা দিও না।

অভয়াপদ কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে গেল; মিনিট দশ বার পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কৈ বৌদি, ভাত দাও।

শিবানী রান্নাঘরে বসিয়া দেবরের জন্যই পরিপাটী করিয়া ভাত বাড়িতেছিল, অভয়াপদ আসিতেই, সে হাত ধুইয়া স্বহস্তে ঠাঁই করিয়া, তাহার সম্মুখে ভাতের থালাটা রাখিল, কহিল, বসে পড় ভাই।

শুধু এইটুকুতে যে এত তৃপ্তি লুকান ছিল, তাহা শিবানী আজ নূতন করিয়াই উপভোগ করিল।

ইহার পাঁচ-সাত দিন পরে—দুপুরে শিবানী নিদ্রিত স্বামীর শিয়রে বসিয়া একখানা ধর্মমূলক বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেছিল। এমনি সময়ে বামুন-ঠাকুর তাহার হস্তে একখানা খামসমেত পত্র দিয়া আপন কাজে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে লইয়া, আজ শিবানীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, সে খামের ইংরাজী অক্ষরগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিল এ চিঠি ধূর্জটীর কাছ হইতেই আসিয়াছে।

কিন্তু পত্র কেন? শিবানীর সহসা মনে পড়িয়া গেল, একদিন ধূর্জটী স্পষ্টই বলিয়াছিল, সে তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে না পাইলে তাহার জীবন···

কথাটা মনে করিতেও শিবানীর এখন অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। পত্রখানা না পড়িয়াই, সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, আগুণে পুড়াইয়া ফেলিল; তাহার পর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার নিদ্রিত পীড়াকাতর মুখখানার দিকে চাহিতেই কাঁদিয়া ফেলিল! হায়! তাহার নারীত্বের অপমান করিবার এ সুযোগ, সেই তো নিজে হইতেই দিয়াছে?

অজয় আরোগ্যলাভ করিবার দিন কতক পরে—অফিস্ হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে, একটা তোরঙ্গ কিনিয়া আনিল। নিজের কক্ষে ঢুকিয়া, তাড়াতাড়ি, খানকয়েক ধুতি গোটা কতক জামা এবং আরো কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ সেই তোরঙ্গটার মধ্যে পুরিয়া, চাবী বন্ধ করিল। পরে ফতুয়ার পকেট হইতে, দশগাছা সোণার নূতন চুড়ি বিছানার একপার্শ্বে রাখিল, শিবানীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, তোমার চুড়ি, রইল।

শিবানী দেবরের সঙ্গে বিছানার উপর বসিয়া দাবা খেলিতেছিল? তা বেশ, রেখে দাও ঠাকুরপোর বিয়েতে বৌকে যৌতুক দিতে হবে।

অজয় সেকথার কোন উত্তর দিল না, ভাইয়ের হাতখানা ধরিয়া টানিয়া কহিল, শীগ্‌গিরি তৈরী হয়ে নে, পাটনায় যেতে হবে—ওখানকার কলেজেই তোকে ভর্ত্তি করে দেব—কোলকাতায় থাকা আমার আর চলবে না।

শিবানী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তেই স্বামীর পদদ্বয় দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কোথায় যাবে, যাও দেখি? নিজের বিষে নিজেই ছট্‌-ফট্‌ করে মর্‌ছি; ক্ষমা কি তোমার কাছে পাব না?

বলিতে বলিতেই শিবানীর দুই চক্ষু ফাটিয়া সহসা শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুই মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া স্থির হইয়া চাহিয়াই, ধীরে ধীরে তাহার প্রসারিত পদদ্বয়ের উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

বিজয়ার ব্যথা

শ্রীমতী মাধবী দেবী

এক

বিজয়ার সন্ধ্যা মজলিস্‌টা গীতিদের বাড়ীতেই বসেছিল। প্রত্যেকবার জলভ্রমণেই সেটার পরিসমাপ্ত হয়, এবার কিন্তু গীতির শরীর খারাপ বলে তার বাপ-মা ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে কিছুতেই যেতে দিতে রাজী হন নি। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গীতি পিতা মাতার কথায় ভ্রমণের লোভ সম্বরণ করেছিল, আর তার একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে তার বন্ধুগুলিও তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন। আসরটা জমেছিল মন্দ নয়, হাসির সঙ্গে উপাদেয় আহার সকলের নিকট খুব লোভনীয় হয়ে উঠছিল। এমন সময় হঠাৎ অমিতা বলে উঠল,—গীতি শুনেছিস?

গীতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করল,—কি শুনব?

·দাদার ক্লাসফ্রেণ্ড অমরবাবু আজ সকালে মারা গেছেন।

—কেন, কি করে, কি হয়েছিল, এই সব প্রশ্নে সবের হাসির উৎসটাকে উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে দিল। গীতি বিস্মিত-দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার দু'চোখে ব্যথার অশ্রু। অমিতা শুধু বললে, দাদা বলছিলেন এদানী খুব মদ খেতো সেই জন্যেই হার্ট ফেল করেছে। আহা, লোকটার ঐ এক দোষ ছাড়া আর সকলদিকেই গুণী ছিল।

গীতি এতক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিল। বীণার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলে, তার মুখ মৃতার মুখের ন্যায় বিবর্ণ। গীতি কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ডাকলে,—বীণা!

বীণা কোন উত্তর দিলে না, শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তার নিস্পন্দ দেহটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

একটা অজ্ঞাত, স্বল্প-পরিচিত লোকের মৃত্যু-সংবাদে বিজয়ার আনন্দ মুখরিত ঘর খানাকে মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান করে দিয়ে ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারী হাওয়াটা মিলিয়ে গেল। সকলেই আবার কৌতুক-আনন্দে যোগ দিল। শুধু বীণার ম্লান মুখখানি আরো ম্লান হয়ে উঠল। এর আগেও কেউ কোনদিন তার মুখে চপল হাসি দেখেনি, তবু এই ধীর গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটীকে ভালোবাসত সবাই। সবার চেয়ে গীতিই তাকে ভালোবাসত বেশী। গরীবের মেয়ে সে, অর্থ ত তার নাই, বেশ-ভূষার পারিপাট্যও তার ছিল না, তাতেই তাকে কিন্তু সুন্দর মানাতো। গান গাইতে সে খুব ভালোই পারত, গীতিরও সে খ্যাতিটা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বীণার মৃদুকণ্ঠে মধুর তাকে যেন ফুটিয়ে তুলত। তার ওপর সে তার স্বভাব-সুন্দর প্রকৃতিতেই সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। তাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে, স্কুল-বোর্ডিংয়েই সে থাকত!

গীতির বিজয়ার আনন্দ বীণার ম্লান মুখ দেখে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! আসর আর কোন মতেই জমছিল না। দশটায় সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে

গেলো। বীণাও বিদায় নেবার জন্ত উঠে দাঁড়ালো, এর আগে অনেকদিনই সে গীতিদের বাড়ী তার মার অনুরোধে রাত কাটিয়েছে। সেই সাহসেই গীতি মিনতি করে তার হাত ধরে বললে,—আজ এখানেই থাক বীণা, কাল একসঙ্গে যাবো, তোকে রেখে আসব'খন।

বীণার বুঝি আর আপত্তি করবারও শক্তি ছিল না, সে শ্রান্তভাবে আবার বসে পড়ল। গীতির ঘরেই তার শোবার ব্যবস্থা হোলো। রাত প্রায় বারোটা তখনও বিসর্জ্জনের বাজনার রেশটুকু ভেসে আসছিল। দশমীর চাঁদের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে বিছানার উপর লুটোপুটী খাচ্ছিল, এক একটা বাড়ী থেকে তখনও গানের সুর ভেসে চলেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। দু'জনেই বুঝতে পারছিল দু'জনার কেউই ঘুমোয় নি। গীতি ডাকলে,—বীণা তোর ঘুম আসছে না, কেন রে?

বীণা বললে,—তোরই বা আসছে কৈ?

গীতি বললে—আচ্ছা বীণা, তুই হঠাৎ অমন হয়ে গেলি কেন ভাই? আমায় বলবি না?

—কি বলব গীতি, আমার বলবার কি আছে ভাই! ব্যাথার অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

গীতি মিনতি ভরাকণ্ঠে বললে,—তোর মনের কোনে নিশ্চয় কিছু লুকন আছে। কি তা যে আমাকে বলতেও তোর বাধছে।

বীণা একটু চুপ করে বললে,— আমার দুঃখের কাহিনী তুই শুনবি? তোর কাছেই বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সবই ত ফুরিয়ে গেল, আর কি শুনবি গীতি!

দুই

বিছানার বাইরে এসে গীতি বীণার একখানি হাত ধরে বললে,—আমার কাছে তুই লুকিয়ে রেখেছিলি বটে বীণা, কিন্তু তোর ঐ ম্লানমুখ আমায় জানিয়ে দিত, তোর মনে কি একটা ব্যথা আছে। সেটা বলতেই হবে তোকে, বল ভাই।

বীণা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। গত বিজয়ার স্মৃতি তাকে আজ নূতন করে সচেতন করে তুলছিল। দু'চোখ তার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসছিল, রুদ্ধ কণ্ঠটাকে কোন রকমে পরিষ্কার করে সে বললে,—ঘরে নয় গীতি, বাইরে ছাতে যাই চল।

গীতি কোন কথা না বলে বীণার হাত ধরে ছাতে একটা বেদীর উপর এসে বসল। শরতের স্নিগ্ধ বাতাস যেন তাদের মনে অনেকখানি স্বস্তি এনে দিলে।

বীণা বললে,—গত বছর জ্যাঠাইমাকে বিজয়ার প্রণাম করে ফিরছি, বাড়ী ঢুকতেই শুনতে পেলুম মা বলছেন,'রমু, তোর বন্ধুর জন্য কি খাবার তৈরী করব বল দেখি?' আমি একটু আশ্চর্য্য হলুম, দাদার বন্ধুরা প্রায় আসত, চা-মিষ্টিতেই মা তাঁদের অতিথি-সৎকার করতেন, দাদাকে জিজ্ঞাসা করে মা কোনদিন কোন কাজ ত করেন না, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে বরাবর মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমাকে দেখেই দাদা বলে উঠলো, 'এই যে, তোকেই আমি খুঁজছিলুম, আমার বন্ধু অমর এসেছে, খুব ভালো করে চা তৈরী করে দে দিকিন, শীগ্‌গীর দিবি, দেরী করে ফেলিস না যেন।'

আমার উপর চা-র ভার দিয়ে দাদা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি হেসে বললুম, বাঃ দাদা, তোমার বন্ধু কি খালি চা খেয়েই থাকবে নাকি? ফিরে দাঁড়িয়ে দাদা মার দিকে তাকিয়ে বললে,—'আর কি হবে মা?'

মা কিছু বলবার আগেই দাদা আবার বললে— 'তুমি যা হয় কোরো মা, আমি চললাম।' মা একটু হেসে অতিথির আহারের বন্দোবস্ত করতে

লাগলেন, আমিও মাকে খুঁটিনাটী সাহায্য করতে লাগলুম। দাদার এই নূতন বন্ধুটীকে এর আগে আমি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। মাকে জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন 'রমুর মুখে ওর কথা শুনেছি, কখনও আমাদের বাড়ী আসে নি, এই প্রথম এসেছে। খুব বড়লোকের ছেলে, কিন্তু বেশ মিশুক, প্রথমেই আমাকে মা বলে ডেকেছে, যেন কতদিনের চেনা।'

এই নূতন লোকটীর সুখ্যাতি শুনে, না দেখার মধ্যেও মনটা নুয়ে পড়ল। সেই সময় দাদা ডাকলেন, 'বীণা দুটো পান নিয়ে আয় ত ভাই।'

আমি মায়ের মুখের দিকে তাকালুম। মনের ভাব বুঝতে পেরে মা বললেন, 'লজ্জা করছে বুঝি যেতে? আমার হাতে যে ময়দা মাখা মা, তুমিই দিয়ে এসো, বাড়ীতে অতিথি এলে অতো লজ্জা করতে নেই!

আপত্তি থাকলেও মায়ের আদেশ কখনও অমান্য করি নি, পান নিয়ে তাই বাইরের ঘরে এলুম। দাদা ও তিনি পাশাপাশি বসে আছেন। একবার মাত্র চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম, দরজা পর্য্যন্ত এসে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম, পা যেন আর উঠছিল না। অত লজ্জা যে কি করে এলো, আর কেনই বা এলো তখন বুঝি নি এখন বুঝতে পারি।

আমার চুড়ীর শব্দেই হয় ত দাদা ফিরে তাকালেন। সেই সঙ্গে তিনিও। আমি আগেই দৃষ্টি নত করে নিয়েছিলুম, তবু যেন মনে হোলো, তিনি আমারই দিকে চেয়ে আছেন! দাদার কথায় চমক ভাঙ্গলো তিনি বলছেন, কত দেরী করলি বীণা। দিয়ে যা এই দিকে।

আমি টেবিলের উপর পানের ডিবে রাখতে যাচ্ছি, তিনি বলে উঠলেন, 'অত দূরে রাখলে চলবে না! আমার এখনই চাই যে।' বলে হাত বাড়ালেন।

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে দাদা বললেন, 'ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বীণা, ওকে তোমার লজ্জা করলে চলবে না।'

অগত্যা দুটো পান তাঁর হাতে তুলে দিলুম। হাতটাও হাতে ঠেকে গেল, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। শুনতে পেলুম তিনি বলছেন 'ভারী লাজুক, এইতেই কিন্তু মেয়েদের শোভা বাড়ায়!'

আমার তখন যে কি আনন্দ হোলো, তা এখনও বুঝে উঠতে পারি না। রান্নাঘরে এসে দেখলুম, মা ঘি চড়িয়ে বসে আছেন, আমাকে দেখে বললেন, 'চট্ করে আয় ত মা, এক হাতে এগোচ্ছে না, লুচি ক'খানা বেলে দে।'

লুচি বেলতে বসলাম বটে, মন কিন্তু অন্য দিকে পড়ে রইল। তাঁর প্রশংসমান-দৃষ্টিটাই আমার মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মা ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'ওকি লুচি বেলছিস বীণা, ভদ্রলোক খাবে, ভালো করে বেল!'

কিন্তু সেদিন শত চেষ্টাতেও আমার বেলা লুচি ভালো হোল না। আবার খানিক পরে দাদা আমায় ডাকছেন শুনতে পেলুম। মাকে বললুম, না মা, আর আমি যেতে পারব না, তুমি যাও আমার ভারী লজ্জা করছে। অন্য দিন কারো সামে বেরোতে আপত্তি জানালে মা জেদাজেদি করতেন না, সেদিন যেন একটু জোর করেই বললেন, 'বাড়ীতে ভদ্রলোক এসেছেন কি বলছেন শোনো গে অমন লজ্জা করলে কি চলে মা?'

আমি বাধ্য হয়ে উঠে গেলুম। আমাকে দেখে দাদা বললেন, 'তুই একটু বোস্ বীণা, আমি জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করে আসি, নইলে তিনি রাগ করবেন।'

আমার কোন আপত্তি করবার আগেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভারী চটে উঠছিলুম, দাদার কি আক্কেল!

একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে আমাকে একলা রেখে গেলেন কি করে? হলোই বা বন্ধু। থাকব কি যাবো ভাবছি, এমন সময় তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়েই রইলে যে, বস!' বলে নিজে একটু সরে বিছানার উপরেই জায়গা করে দিলেন। আমি যে কি করব ভেবে যেন বিব্রত হয়ে পড়ছিলুম, ঘামে যেন সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছিল, কাজেই সেখানেই বসে পড়লুম। চৌকিটা ছোট, মাত্র দু'হাতের ব্যবধানে বসেছিলুম, ভারী লজ্জা বোধ হতে লাগলো। বসে যখন পড়েছি, বসেই রইলুম। তিনি বললেন, 'রমানাথ বলেছিল তুমি খুব ভালো গান গাহিতে পার। আমাকে কিন্তু শোনাতে হবে।'

ছি ছি দাদার এর মধ্যে এ খবরটাও দেওয়া হয়ে গেছে। ভদ্রতা রাখবার জন্ম কোন রকমে বললুম—দাদা আসুন। তিনি বললেন, 'সে ত নিশ্চয়, তোমার নাম বীণা বুঝি? ছোট নাম অথচ কি সুন্দর। যোগ্য নামই দেওয়া হয়েছে।

লজ্জায় আমি মুখ আরো নামিয়ে নিলুম। তিনি হেসে বললেন, এখনকার শিক্ষিতা মেয়েরা ত এত লজ্জা করে না, তারা ত সচ্ছন্দেই সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

নিজের নিদারুণ লজ্জায় নিজেই অস্থির হয়ে পড়ছিলুম, আবার এই শিক্ষার কথা? জোর করে লজ্জার ভাবটা দমন করে বললুম, পাড়াগাঁয়ে বাড়ী শিক্ষার অবকাশ ত পাই নি, মা যে ভাবে শিখিয়েছেন তাই শিখেছি।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কি শিক্ষা পায় না? তার প্রমাণ ত তুমি, ঘরে বসে পরীক্ষার উপাধি পাওয়া কম অধ্যবসায়ের পরিচয় নয়।

বুঝলুম দাদার এই আদরের বোনটীর কোন কথাই আর এই বন্ধুটির কাছে গোপন নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে দাদা ফিরে এলেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। খাবার জন্ম উঠে দাঁড়াইতে তিনি বললেন, 'ও কি গানের কথাটা ভুলে গেলে বুঝি? রমা তুই বল, তোর অনুমতি না পেলে ও গাইবে না।'

দাদাও তেমনি! অনুমতি দিতে একটুও দেরী হোল না। কিন্তু আমি তবুও দাঁড়িয়ে আছি দেখে দাদা মাকে ডেকে বললেন, 'মা, দেখো বীণা গান গাইছে না।'

মা আদেশেরসুরে বললেন—দাদার অবাধ্য হয়ো না বীণা!

বুঝলুম আমার বার বার অবাধ্যতার জন্ম মা একটু বিরক্ত হয়েছেন। আর কিছু না বলে গাইতে বসলুম। গান শেষ করে মুখ তুলতেই দেখলুম, তাঁর মুগ্ধ-দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। বাইরে এসে আর মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারলুম না, একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। শত চেষ্টাতেও সেদিন ঘুম এলো না, মনে মনে ভগবানকে বললুম, আমার পবিত্র কুমারী জীবনে আজ এ কি ঝড় আনলে প্রভু!

সমস্ত রাত্রির পর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই ক্লান্ত চোখ কখন মুদে এসেছিল জানতে পারিনি। হঠাৎ মায়ের ডাকে চোখ চেয়ে দেখি, চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে। মা বলছেন, 'বীণা, চট্ করে কাপড় ছেড়ে আয় ত মা, অমর আজই যাবে, খাবার দাবার করে দিতে হবে।' ঘুমের মাদকতায় নিজের মনের চঞ্চলতা কিছুক্ষণের জন্ম ভুলেছিলুম, ঐ নামটীর সঙ্গে সঙ্গে আবার সব মনে পড়ায় আমার মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

আমার মন অপ্রসন্ন থাকলেও মায়ের আর দাদার মুখ অস্বাভাবিক প্রসন্ন, কথায়-বার্ত্তায় বুঝতে পারলুম, একটা কি ঘটেছে। যাবার সময় তিনি মাকে প্রণাম করে আমার দিকে চেয়ে

হেসে বললেন, 'আবার শীঘ্রই আসবো গান শুনতে, তোমার গান আমায় পাগল করেছে, মনে থাকে যেন!

অবশ্য একথা ক'টী সকলের অজ্ঞাতেই আমায় বলে ছিলেন। দু'একদিনের মধ্যেই শুনতে পেলুম, এই অভাগীকে তার বড় পছন্দ হয়েছে, আমাকে ছাড়া তিনি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবেন না। আমার আনন্দ-কল্পনা আমায় যেন স্বর্গে তুলে দিলে। ঘরে খিল দিয়ে খুব খানিকটা কেঁদে নিজেকে হাল্কা করে নিলুম। দুঃখের দিনের মত আনন্দের দিনেও যে মানুষকে কাঁদতে হয়—সেকথা সেদিন প্রথম উপলব্ধি করলুম।

স্বর্গসুখের কল্পনায় বড় সুখে দু'দিন কাটল, ত্রয়োদশীর দিন দাদার হাতে একখানা চিঠি, স্পষ্ট দেখলুম, তাঁর মুখ নিরাশার ব্যথায় ম্লান, মার হাতে চিঠি দিয়েই তিনি চলে গেলেন। মা চিঠিখান পড়তে লাগলেন, আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। চিঠি পড়ে মা যখন মুখ তুললেন, দেখলুম তাঁর চোখে জল, আমার দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, বড্ড ভুল করেছি মা, এ অভাগীর গর্ভে জন্মে তোরাও যে অসুখী হবি এ আমি আগে ভাবি নি, ভাবতে পারি নি। বলে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

আমার মুখের অবস্থা কি রকম হয়েছিল, দেখতে পাইনি, কিন্তু মনে যে আমার কি তুফান উঠেছিল, তার সে আলোড়ন আজও বুকের মাঝে অনুভব করছি। বেদনায় অশ্রুতে বীণার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

গীতি এতক্ষণ ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনী নীরবে শুনছিল, তার অশ্রুও বুঝি আর বাধা মানে না। বাধা দিয়ে বললে,—আজ না হয় থাক বীণা, দু'দিন পরে বলিস্।

রুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বললে—গীতি আজই শেষ করতে দে, যদি একটু বুকটা হাল্কা হয়! মা যে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়েছিলেন, সেখানা তখনও পর্য্যন্ত পড়ি নি; এইবার সেইখানা খুলে দেখলুম, তাতে লেখাছিল :—

বীণা, তোমাকে পাওয়ার সৌভাগ্য এজন্মে হোল না, কারণ আমি পরাধীন, তবুও আমার হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কেউ বসবে না, একদিনের দেখাতে তুমি আমার বুকে যে দাগ দিয়েছ, কোন জন্মে তা মুছবে না, এ জন্ম হয়ত আমার হবে না, পরজন্মে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, তুমি আমারই হবে। ইতি।

গীতি, এই ক'টী কথা, তাঁর দু'দিনের কার্য্য-কলাপ, আমার মন থেকে একদিনের জন্যও মোছে নি। তাঁর পিতামাতার অমতেই যে তিনি এ অভাগীকে ত্যাগ করলেন, এ আমি বুঝেছিলুম তাই দুঃখে বুক ভেঙ্গে গেলেও মনে মনে তাঁর চরণে প্রণাম করলুম। সেই থেকে আমার মুখের হাসি বোধ হয় একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল, আমার মুখের পানে চেয়ে মা দাদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন। আমার মন যদি একটুও ভালো থাকে, তাই গরীব হলেও আমায় এখানে এনে লেখাপড়া শেখবার ব্যাবস্থা করে দিলেন। এখানে এসেই একদিন দাদাকে তাঁর খোঁজ নিতে বললুম। দাদা ফিরে এসে বললেন, 'বীণা, যা হয় ভালোর জন্যই, তোর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি ভালোই হয়েছে, অমর চরিত্র হারিয়েছে!'

বুঝলুম দাদার এ মিছে সান্ত্বনা: দেবতার মত যা'র চরিত্র, তাকে আর যে যা বলে বলুক, দাদা তা বলবে না, এ হতভাগীর স্মৃতি ভোলবার জন্যই তিনি কলঙ্কের পশরা মাথায় নিচ্ছেন।

তারপর অনেকদিন কোন খবর পাই নি, আজ যা খবর পেলুম, সেটা না পাওয়াই ছিল ভাল। বীণা চুপ করল। তার দু' চোখ বেয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়ল। গীতি

স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, সে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। নীরবে বীণাকে আপনার বুকের মধ্যে টেনে নিলে। তখন দশমীর ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে!

তিন

বছর ঘুরেছে। আবার বিজয়া এসেছে, তেমনি বিদায়ের আনন্দাশ্রু নিয়ে। গীতি এখনও পড়ছে। বীণার পড়া আর হয় নি, শক্ত ব্যাধি তাকে আশ্রয় করেছে। যাবার সময় গীতির দু'টী হাত ধরে বীণা বলেছিল, এই প্রবাসে তোকে ব্যথার ব্যথী পেয়েছিলুম, আমার মত অভাগীকে কখনো মাঝে মনে করিস্। গীতি নীরব অশ্রুর সঙ্গে বন্ধুকে বিদায় দিয়েছিল।

আজ সেই বিজয়া, গীতির বুকের মাঝে বীণার দুঃখ-কাহিনী কেবলই জেগে উঠছে। তার মন আজ বীণার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। চিঠি দিলে জবাব পায় না, বীণা তার আপন কেউ নয়, তবুও সে তাকে ভুলতে পারে নি। তাকে আপন ভগ্নীর মতই ভালোবাসে। সকালে গীতি মার কাছে গিয়ে বললে,—মা, আমায় বীণাদের বাড়ী যেতে দেবে?

আদরের একমাত্র দুহিতার কোন আবদার কোনদিন তাঁরা অগ্রাহ্য করেন নি। সেদিন মেয়ের ম্লান মুখ দেখে তিনি বললেন—তোর শরীর কি ভালো নেই? আবার সেই পাড়াগাঁয়ে যেতে চাইছিস্?

মাথা নেড়ে গীতি বললে,—না মা, শরীর আমার ভালোই আছে। বীণার জন্য মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে, একবার যেতে দাও মা, মা!

মা একটু চিন্তার পর বললেন,—তবে যাও, কিন্তু সাবধানে থেকো!

গীতি তার ব্যথাহতা সখীটির জন্য বাস্তবিকই ব্যাকুল হয়েছিল, না জানি তার ব্যথা আরো কতখানি নিবিড় হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার সময় সে বীণাদের বাড়ী এসে পৌছল। বীণার মা তাকে দেখেই কেঁদে উঠলেন। গীতির মুখ দিয়ে খানিক কোন কথাই উচ্চারণ হোল না। একটা অজানা-আশঙ্কায় তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে—বীণা কোথায়, কেমন আছে সে?

বীণার মা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলেন। বাড়ীর প্রায় সবই গীতির জানা ছিল, বীণার অনুরোধে সে তার সঙ্গে দু'একবার এসেছিল। নির্দ্দেশিত গৃহে প্রবেশ করে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ম্লান শয্যায় বীণা শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। গীতির মুখ দিয়ে আর কোন সম্ভাষণ বার হোল না। তার দু'চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল! তার উপর দৃষ্টি পড়তেই বীণার ম্লান মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দ কম্পিত কণ্ঠে সে বললে,—গীতি এসেছিস্। কাছে আয়, তুই তাহ'লে আমায় ভুলিস নি! মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তোর অপেক্ষায় আমি দিন গুণছি। জানি, শেষদিনে তোর দেখা পাবোই।

গীতি বীণার শয্যাপার্শ্বে বসে আর্ত্তকণ্ঠে বললে, —বীণা, তোর এত অসুখ আমায় খবর দিস নি কেন ভাই, এমন অসময়ে কোথায় যাবি তুই।

বীণা গীতির একখানি হাত আপনার রোগ শীর্ণ হাতের মধ্যে নিয়ে ম্লান হেসে বললে—তোর প্রাণের টানে তুই এসেছিস, আমার উপর তোর অগাধ স্নেহ, একথা আমি জীবনে ভুলব না বোন্।

গীতি নিঃশব্দে বসে রইল, তার তখন মনে হচ্ছিল, কেন সে দু'দিন আগে আসে নি। একেবারে শেষ সময়ে সে এসেছে। দুর্ভাগিনী সঙ্গিনীর কত কথাই হয়ত বলবার থেকে যাবে। বীণা গীতির মুখের দিকে চেয়ে ছিল; গীতি সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—ভালো হবি বীণা, হতাশ হ'স নে,

এ জন্মে তোর ভালবাসা ব্যর্থ হয়েছে, পরজন্মে সুখী হবি, এই প্রার্থনাই আমি করি।

বীণার মৃত্যুম্লান মুখে একটু তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠল, বললে,—ভালো হবো ও কথা আর বলিস নে. শেষের প্রার্থনাটাই করিস, সেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ, এ জন্মে শুধু যে আমি অসুখী হলুম, তা নয়, আমার দেবতা যে আমার জন্য কলঙ্ক মাথায় নিয়ে জীবন হারালেন, আমার জীবন ত তুচ্ছ, এ অভাগীর জন্যে তাঁর যে মহা মূল্যবান জীবন তিনি নষ্ট করেছেন, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব গীতি ?

বাধা দিয়ে গীতি বললে, আজ আজ ও সব কথা থাক বীণা, আর একদিন বলিস্, একটু ভালো হ' !

আবার ভালো হবো ? বলে বীণা একটু হাসলে।

গীতি লক্ষ্য করছিল, বীণা কথা কইতে কইতে ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুম আসছে বীণা, একটু ঘুমো।

বীণা চমকে বললে, ঘুম ? আসছে বৈকি গীতি, বড্ড ঘুম আসছে। আমার চোখের সাম্‌নে খালি তাঁর দেবমূর্ত্তি ভেসে উঠছে, আমার জন্য তিনি অসময়ে চলে গেছেন, আমার কি আর থাকা সাজে ভাই ? কি কুক্ষণে আমি তাঁকে দেখা দিয়েছিলুম !

বীণার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মানসিক উত্তেজনার আতিশয্যে তার দুর্ব্বল দেহখানি গীতির কোলের উপর নেতিয়ে পড়ল। আঁচলে চোখ দু'টো পরিষ্কার করে গীতি ডাকলে—বীণা, বীণা ? কোন সাড়া পাওয়া গেল না ! ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সে ডাকলে,—মা, এদিকে একবার আসুন।

বীণার মা পাশের ঘরেই ছিলেন, গীতির আহ্বানে তিনি আলু-আলু বেশে ছুটে এলেন—বীণা মা আমার, কি কষ্ট পাচ্ছ মা ! তার গায়ে হাত রেখে একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, মূর্চ্ছা হয়েচে,মাঝে মাঝে হয়, একটু চোখে-মুখে জল দিয়ে দাও ত মা।

গীতি কলের পুতুলের মত তার আদেশ পালন করলে। একটু পরে বীণা চোখ মেলে চেয়ে ডাকলে, মা।

সস্নেহে চুম্বন করে তিনি বললেন, কি মা, কি কষ্ট হচ্ছিল তোমার ?

কই কিছুই ত হয় নি মা, গীতি এসেছিল না, কোথা সে ?

গীতি সরে বসে তার কপোলে কপোল রেখে বললে—এই যে আমি কি বলবি, বীণা ?

গীতির হাতটী ধরে হেসে বীণা বললে—বলবো, অনেক কথা, কিন্তু সময় নেই। বলেই আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

কাতর স্বরে গীতি বললে, কি বলবি বলে যা, বীণা !

এঁ্যা, বলে বীণা একটু চমকে উঠল, পরক্ষণেই তার পাণ্ডুর মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল করে বললে—আজ বিজয়া, না ? আমি আজ তাঁর কাছেই চল্‌লুম। এক বিজয়ার তার ভালোবাসা পেয়েছিলুম, আর এক বিজয়ায় তাঁকে হারিয়েছি, আজও সেই বিজয়া তাঁরই পাশে যাচ্ছি। বলতে বলতেই চোখ মুদে এলো বুকের স্পন্দনটুকুও থেমে গেলো।

বুক ভাঙ্গা কান্নায় বীনার মা তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

গীতি দুইহাতে মুখ ঢেকে পাষাণ প্রতিমার মত বসে রইল। তার মনে হচ্ছিল। আজই সত্যিকার বিজয়া আজকের বিসর্জ্জনে বুঝি সারা জগত হাহাকার করছে।

এপ্রিল ফুল

শ্রীপাপিয়া বসু

ফিবে মার্চ্চ আসতেই মণিকা মনে মনে ভেবে রেখেছে, এবার এপ্রিলের প্রথমে জামাইবাবুকে সে আচ্ছা জব্দ করে দেবে। একেবারে 'এপ্রিল ফুল' যাকে বলে। আর করবার কথাও যে! গত বছরে যে নাকালটা ওকে করেছে সে! মণিকা ভাবল, এবার একবারে নিজের হাতে তাকে কানমলা খাইয়ে ছাড়বে।

মণিকার আসল পরিচয় বলতে হ'লে শুধু এটুকুই বলা যায়, সে একজন লেখিকা। লেখে, লিখতে পারে সে। গল্প কবিতা দু'টোতেই তার হাত বেশ। ছোট-ছোট মাসিক সম্পাদকেরা লেখা তার আগ্রহ করেই ছাপে। সাপ্তাহিকের ত কথাই নেই। প্রায়ই চিঠি এসে উপস্থিত হয়, 'আমাদের এ সংখ্যায় অনুগ্রহ করে একটী ছোট গল্প দেবেন, না হয় একটি কবিতা। আপনার আশায় আমরা ছাপা বন্ধ রাখব। ইত্যাদি।

মণিকার আনন্দ ধরে না। একজন লেখিকার পক্ষে এ সম্মান কি কম গৌরবের! যথাসাধ্য তাদের চাহিদা সে মেটাতে চেষ্টা করে।

মা বাবা ওরা বলেন, এত কষ্ট করে এত লিখিস, একটি পয়সাও দেখি তোকে দেয় না কেউ!

মণিকা হাসে। টাকা পয়সাই কি সব! এই যে দিনের পর দিন ছাপার হরপে তার হাতের লেখাগুলো জল জল করে ওঠে, এ আনন্দই সে চেপে রাখতে পারে না। তার ওপর টাকা পয়সা দিয়ে সে কি করবে! সে ত আর ব্যবসা করতে বসে নি। টাকা দিলেই সে লেখা দেবে যেন! এ কথাটা তার ভাল করেই জানা আছে যে, সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা করা চলে না। ব্যবসা করতে গেলেই সে মারা পড়বে পথে ঘাটে। অন্তরের প্রেরণা থেকে যে অনুভূতি জেগে ওঠে তাকে ফুটিয়ে তোলা যায় শুধু ততদিনই, যতদিন মনে একটা সত্যিকারের আগ্রহ প্রবল থাকে। কেমন করে বড় হওয়া যায়, এ চিন্তা নিয়ে সে এগিয়ে চলে। কিন্তু বড় হয়ে যায় যখন, তখন আরম্ভ হয় টাকা নিয়ে কারবার। তখন আর সে আগ্রহ তার থাকে না। তখনই ঘটে তার সত্যিকারের মৃত্যু, তখনই শুধু লিখতে হয় ব্যবসার খাতিরে। আর এটুকুও ভাল করেই জানা থাকে তার, যা কেন না লিখবে সে, সম্পাদকরা ছাপতে বাধ্য, টাকা না দিয়েও পারবে না! কারণ বাজারে তার নাম হয়ে গেছে! আগের নেশায় পাঠকরাও তার লেখা পড়বেই, তা যতই হোক না কেন, যা-তা লেখা!

কিন্তু মণিকা ঠিক এমন চায় না! সে চায় শুধু লেখার আনন্দটুকু অনুভব করতে। তা নিয়েই মেতে থাকে সারাদিন। বড় হবার আগ্রহ তার খুবই আছে। আর কারই বা না থাকে! সকলেই বড় হতে চায় নাম কিনে। কিন্তু টাকা পয়সা কবে পর্য্যন্ত পাবে কিনা পাবে, এ চিন্তা এক দিনের জন্ত তার মাথায় আসে না।

তার লেখার এখন বড় সমজদার দু'জন।

একজন তার জামাইবাবু! গিরীন্দ্র দত্ত, আর একজনের নাম করতে তার লজ্জা করে। তা তার লজ্জা হলেও আমাদের ত আর লজ্জা নেই! স্পষ্ট করেই আমরা তার নাম বলতে পারব, বিকাশ দত্ত! নূতন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছে এখানে। এ পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের তার পরিচয় হলেও, মণিকা তার সঙ্গে দু'একটি কথার বেশী কোনদিনই বলতে পারে নি। কারণ প্রথম পরিচয় থেকেই, কেমন একটা কানাঘুষা চলে আসছে! কিন্তু বিকাশের সে লজ্জার বালাই নেই। সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারের সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে; মণিকার সঙ্গেও বাদ দেয় না। কিন্তু মণিকা থাকে অধোমুখী হয়ে, তার নাকি ভয়ানক লজ্জা করে ওর সঙ্গে কথা বলতে।

প্রতি রবিবারে গিরীন্দ্র-বিকাশের এখানেই সারাদিন আড্ডা! শনিবার বিকেলে আসে, কখন বা রবিবার প্রাতেও, আবার সোমবার প্রাতে অফিস করতে চলে যায়। গিরীন্দ্রও এখানেই কি একটা চাকুরী করে, বড়ই, তাই স্ত্রীকে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে রাখে, আবার এখানেও ফেলে রাখে কিছু দিন। কিন্তু প্রতি রবিবারে এখানে হাজিরা দেওয়া, তার একটা ডিউটির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। হবেই বা না কেন, স্ত্রীকে যে সে প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসে। বিকাশও আসে ভাবী বড় শ্যালিকার কাছ থেকে সাদর-নিমন্ত্রণ পেয়ে। এদিনটা বেশ আমোদেই কাটে ওদের।

গিরীন্দ্র বিকাশ এসেই একসঙ্গে বলে ওঠে, দেখি মণি, কি কি লেখা বেরুল তোমার!

সলজ্জে মণিকা দেখায়! চুপি চুপি জামাই বাবুকে বলে, ওকে নিয়ে ওঘরে পড়তে বল।

বিকাশের কাণ দু'টো যেন হরিণের মত খাড়া, গিরীন্দ্র বলবার আগেই সে শুনে ফেলে। মুচকি হেসে বলে,—হুঃ, ওঘরে যেতে আমার গরজ পড়েছে. আমি এখানেই বসব। বলেই সে ধুপ করে বসে পড়ে।

গিরীন্দ্র চোখ দু'টো লাল করে রুখে দাঁড়ায়। বেয়াদপ, লক্ষ্মীর কথা শোন না, অধঃপাতে যাবে যে!

মণিকা জামাইবাবুকে একটা চিমটি লাগিয়ে দেয়। যাঃ, অসভ্য! মুচকি হাসি বেরিয়ে পড়বার ভয়ে, ছুটে বেরিয়ে যায় আগেই। লজ্জা কি ওর কম করে!

গিরীন্দ্র হেসে বলে, সার্থক ভাই তোমার জন্ম! একেবারে সর্ব্বগুণেগুণান্বিতা লক্ষ্মী স্বরূপিণী রাণী পাবে তুমি। আমার জন্ম...

বিকাশ হেসে ওঠে! হ্যা হ্যা, জন্মটা আপনার একেবারেই নিরর্থক। সত্যি, কেন যে ওকে বিয়ে করেছিলেন, ঝকমারী আর কি!

গিরীন্দ্র মুখখানা কাল করে বলে, সত্যি ভাই, ঝকমারীই বটে!

এমন সময় রেণুকা প্রবেশ করতেই বিকাশ বলে উঠল, শেষে কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবেন না। উনিই ঘরের কথা সব বের করে আমাকে লাগাচ্ছেন। আপনাকে বিয়ে করে নাকি ওর সমস্ত সুখ-শান্তিই নষ্ট হয়ে গেছে, ইত্যাদি।

রেণুকা স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে হাসে: হ্যা, দিন রাতই ঐ নিয়ে আছেন। কিন্তু ওঁকে বিয়ে করে আমারই যে কোন সুখটা হয়েছে তাই কেবল ভাবি!

বিকাশ হো হো করে হেসে উঠল: তাহ'লে এতটা অশান্তি যখন সংসারে, তখন আর একটা বিয়ে কেন আপনি করে ফেলুন না। ডাইভোর্স সিস্টেম! তবেই ত আর কোন অশান্তি থাকবে না।

রেণুকা হাসল: তাই হয় ত করতে হবে।

কিন্তু এই অপদার্থ মানুষটার কি উপায় হবে শেষে, সেটাই ত আমার আসল ভাবনা।

গিরীন্দ্র ওদিকে থেকে আস্তে করে বলল, ডাইভোর্স করবারই মতলব যদি, তবে এত চিন্তাই বা কিসের জন্তে?

বিকাশ হেসে উঠল: কি, এবার উত্তর দেবেন না?

রেণুকা বলল, না ভাই, উত্তর আর জুগিয়ে কাজ নেই, জোগাতে গেলে হয়ত অনেকই জোগান যায়। কিন্তু সময়ের বড্ড অভাব এখন। তুমি এস ত একবার আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—এসোই না কেন, মণিকা ডাকছে!

বিকাশ হাসল। এর চেয়ে অসম্ভব কথা আর নেই। মণিকার তাকে ডেকে পাঠান আর রাত্রিতে সূর্য্য ওঠা সমান।

—হ্যা, হ্যা, এসোই না কেন, দেখবে'খন ডাকছে কি না!

বিকাশ হেসে উঠে এল।

মণিকা একটা বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে, দিদির সঙ্গে বিকাশকে প্রবেশ করতে দেখেই সটান লাফিয়ে উঠল। দিদির মতলব বুঝিতে তার বাকী নেই, ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিকাশ বলল, কি হোল?

রেণুকা বলিল,—না, মেয়েটা আজকাল ভয়ানক বজ্জাত হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে চালাকি খাটে না।

এপ্রিল মাসটা এ বছর আরম্ভ হবে শনিবার থেকে। তাই জামাইবাবুকে জব্দ করবার চিন্তায় শুক্রবারই মণিকা উঠে প'ড়ে লেগে গেল! কিন্তু মুস্কিল হোল একটা। সামনাসামনি পেয়ে ওকে জব্দ করবার কোন উপায়ই নেই। কারণ তার আসছে আবার সেই রবিবার। আঃ, রবিবারই যদি এপ্রিলের পয়লাটা হোত! শুধু একটি দিনের জন্য, শনিবার ত পড়লই, রবিবারটা পড়তে দোষ ছিল কি?

তবু যেমন করে হোক জব্দ করতেই হবে। মণিকা ভেবে ভেবে ঠিক করলে, কোন উপায়ই যখন নেই, তখন চিঠিতেই যে টুকু পারা যায় করা যাক্। তাই নানান জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে কত 'কিম্ভূতকিমাকার' ছবি এনে জুটাল। যত সব খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন। কোনটা হয়ত বাত-ব্যাধিতে মুখটা বিকৃত করে আছে, কোনটার হয়ত যক্ষা রোগ, কোনটার বা টিউমার কি এমনি কিছু হ'য়ে গলাটা লাউয়ের মত ঝুলে পড়েছে, আবার কোনটা হয়ত জ্বরে পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে, এমনি সব।

একটা বড় কাগজের উপর আঠা দিয়ে ছবিগুলো ধীরে ধীরে লাগিয়ে দিল। তারপর ভাঁজ করে পুরে দিল খামের ভেতর, কিন্তু কোন চিঠি দেবে না ঠিক করলে। চিঠির আশায়ই উনি খুলবেন ত, কিন্তু শেষে যখন দেখবেন এসব হিজি বিজ, তখন নিশ্চয়ই খুব জব্দ হয়ে যাবেন। মণিকা মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করল। তবু মনটা ঠিক ভরে উঠল না, তার ওযেন নিতান্তই জলো হয়ে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগল সে, আর কি করা যায়। কিছুক্ষণ ভেবে ভারী সুন্দর একটা জিনিষ তার মনে এসে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে এধার-ওধার খুঁজে চট করে একটা বেঙ ধরে আনলে। এটাকে একটা কোটোতে ভরে সুন্দর করে ধীরে ধীরে প্যাক করে নিলে। তারপর পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখল—গিরীন্দ্রকুমার দত্ত,—নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাল পর্য্যন্ত বেঙটা হয়ত মরবে না, যে প্রাণ ওদের, খোলা মাত্র যদি দত্ত সাহেবের গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ে তবে কি মজাটাই না হবে!

তারপর ছোট করে একটি কবিতা লিখে যেই সে চিঠি বন্ধ করতে যাবে, দিদি এসে ঘরে প্রবেশ করল : কার কাছে চিঠি লিখছিস, মণি ?

মণিকা হেসে বলল, জামাইবাবুর কাছে।

দেখি কি লিখেছিস ?

মণিকা থপ করে চিঠিখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলল—না, তোমার দেখে কাজ নেই।

রেণুকা ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত চিঠিখানা লুফে নিল। ফাজিল মেয়ে!—এ কি, এগুলো কি দিয়েছিস ? চিঠি কই ?

মণিকা মুচকে মুচকে হাসছে। হঠাৎ রেণুকার কবিতার কাগজখানার উপর নজর পড়ল। এ আবার কি লিখেছিস ?—

কাগজে লেখা ছিল—

এপ্রিল ফুল !

দত্ত সাহেব, বল দিকি এর ভেতরে কি ?
একটা চিঠি, কিম্বা কিছু হবেই চকমকি ?
না হয় হবে এমনি কিছু তুলনা যার নাই ;
গল্প প্রেমের ; কিম্বা হবে একটা কবিতাই ?
কিন্তু সাহেব এতই সোজা ? করলে বেজায় ভুল,
শূন্য চিঠি দিলাম তোমায়, কান মলা খাও ফুল !

রেণুকা হেসে উঠিল। সত্যি এত সব রসিকতাও জানিস তুই।

একটু পরেই নজর পড়ল তার কৌটাটার উপর।—ওটা আবার কি ?

মণিকা হাসল। একটা বেঙ ! ওটাও জামাই বাবুকে পাঠাব। রেজিষ্ট্রার্ড পার্শেলে। আচ্ছা, বেঙটা যদি লাফিয়ে পড়ে তার গায়ের উপর, তবে কি মজাটা হবে বলত !

রেণুকা হেসে বলল,—মাথায় এত ও আসে তোর। আর একটু কাজও করে দে তাহলে। আর একটা চিঠি ছোট্ট করে লিখে দে বিকাশের কাছে। দিদির ভয়ানক অসুখ, আজ সকাল থেকে পাঁচ সাত বার ভেদবমি হয়েছে, শীগগীর চলে এস। দেখবি কি ভাবে ছুটে আসবে।

মণিকা বলিল,—ধেৎ !

রেণুকা বলিল,—ধেৎ কি ? আমার কথা ত লিখবি !

—না, আমি পারব না।

—কেন ?

মণিকা উত্তর দিল না। রেণুকা বলল,—আচ্ছা, তাহলে আমার কাছেই দে। আমিই ছোট সাহেবকে জব্দ করে দিই। দেখবি কাল যদি ছুটে না আসে, তবে আমার নাম ফিরিয়ে রাখিস্। রেণুকা লিখল, দত্ত সাহেব পত্র পাঠ চলে এসো, উঠবার শক্তি নেই ; সাত আটবার ইত্যাদি !—দে এখন ঠিকানা লিখে পাঠিয়েদে।

মণিকা ধীরে ধীরে দু'খানা খামে সুন্দর করে ঠিকানা লিখে, টিকিট লাগিয়ে, চাপরাশির হাতে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে পার্শেলটাও।

পরদিন প্রাতে।

ঘড়ির কাঁটা ন'টার ঘর ছাড়িয়ে কিছু এগিয়ে গেছে। শাঁ-শাঁ করে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। গিরীন্দ্র লাফিয়ে নেমে পড়ল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, ভেতরে এসে ঢুকল ঝড়ের মত।

দুই বোন এতক্ষণ এর জন্যই আকুল ভাবে অপেক্ষা করছিল। গিরীন্দ্র ঢুকতেই মণিকা উঠে এসে একখানা হাত ধরে বলল,—কেমন জব্দ ?

গিরীন্দ্র মুখ যথাসাধ্য গম্ভীর করে বলল,—কিন্তু মণিকা এ তোমার ভারী অন্যায়। ব্যাঙটা আমার মুখের উপর লাফিয়ে উঠেছিল। যদি বিষ-টিস লেগে যেত ?

দুইবোন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। যা ভেবে পাঠিয়েছিল তার চেয়ে বেশীই হয়ে গেছে। মণিকা বলল, বেশ হয়েছে, গতবারের কথা মনে

নেই ? বিষ লেগে যদি ফুলে উঠত তবে আরও ভাল হোত।

গিরীন্দ্রও আর গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে পারল না, হেসে ফেলল। তবুও মুখটা বিকৃত করে বলল,—হ্যাঁ, ভাল হোত! আচ্ছা, এর মজা দেখাব আগামী বার। এবার আবার মনে ছিল না বলেই।···আর তোমাকেও বলি, এমনি করে কেউ অসুখের খবর লেখে ?

দু'বোনের মুখই সহসা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তার কাছে ত অসুখের কথা লেখা হয় নি।

রেণুকা বলল,—অসুখের খবর তোমার কাছে লিখেছি ?

গিরীন্দ্র হাসল : বা রে লিখে আবার অস্বীকার! এই যে সে চিঠি!

দুই বোনই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এ কি, এ যে বিকাশকে লেখা পত্র!

ঠিক সেই সময়ই আর একখানা ট্যাক্সি এসে গেটের সামনে দাঁড়াল।

বিকাশকে দেখেই মণিকা ছুটে পালাচ্ছিল। রেণুকা ধরে ফেলল। কোথায় যাস লো লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে, বোস এখানে।

বিকাশ প্রবেশ করতে করতে বলল,—এই দেখুন আপনার বোনের কাণ্ড! কিভাবে কাণটা আমার মলে দিয়েছে। আর কত সব রুগীর দলের ভীড়।

চিঠির ঠিকানা ভুল হয়ে গেছে, মণিকা লজ্জায় মরমে একেবারে মরে গেল। ছিঃ! ছিঃ! কিই যেন ভেবেছেন উনি, মণিকা দিদির কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

ভুলের খবরটা গোপন রেখে, রেণুকা যেন কিছুই জানে না এমনি করে বলল,—কি লো, কি লিখেছিস বরকে ?

মণিকা জোরে খুব দিদিকে একটা চিমটি কেটে দিলে!

—চিমটি কাটিস কি বেয়াদপ মেয়ে! বরকে কি যা-তা লিখতে হয় ? আহা, কাণটা বেচারার লাল হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গিরীন্দ্র সুর তুলল : আহা সত্যিই ত, দেখি! একেবার গোলাপের মত হ'য়ে গেছে যে! দেখি দেখি, কেমন করে কাণটা মলেছে ? আহা ষাট্! ষাট্! গিরীন্দ্র মণিকার পিঠ জোরে জোরেই চাপড়িয়ে দিল।

তার কাণ্ড দেখে সবাই হেসে উঠল। শুধু মণিকা ছাড়া। লজ্জায় এখন মরে যাচ্ছে সে। দিদিটাই বা কি রকম বেহায়া! বললেই ত হয়, এটা ওকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয় নি। ছিঃ ছিঃ, আবার ইয়ারকি সুরু করেছে।

বিকাশ হেসে বলল, থাক থাক, ওকে আর লজ্জা দেবেন না, ছেলেমানুষ করে ফেলেছে একদিন!

রেণুকা হেসে উঠল। ইস্, বড় দরদ দেখছি যে।

বিকাশও হাসল। গিরীন্দ্রকে লক্ষ্য করে বল্ল, তা, এসময় আপনিও যে এখানে ?

গিরীন্দ্র বলল,—ঐ একই কারণে ভাই! দু'জনেই আজ 'এপ্রিল ফুল।' তা তুমি অল্পের উপরই সেরেছ, কাণ মলা খেয়ে, আমি খেয়েছি আস্ত একটা ব্যাঙের লাথি।

সবই এবার হো-হো করে হেসে উঠল। মণিকাও হাসি চেপে রাখতে পারল না। দিদির কোলের ভিতর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তিন

খুব ঘটা ক'রে মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল। কলকাতা থেকে ডেকরেটার এসেছিল—মন্দির এবং তার সংলগ্ন স্থানটিকে লতা-পাতা এবং রঙীন কাপড় দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো হ'ল। অতসীর সেদিন আর নাইবা-খাবার সময় রৈল না।

বিকেলে যখন রমা-পিসির সঙ্গে উৎসব সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম তখন মন্দিরের প্রাঙ্গন লোকে ভ'রে গিয়েছে। যাঁদের আমরা জানি তাঁরা তো আছেন-ই, তাছাড়া বহু অপরিচিত নর-নারী এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। শুনলাম, তাঁরা সেখানকার অধিবাসী নন, খবর পেয়ে দূর দূরান্তর থেকে এসেছেন।

উৎসব অনুষ্ঠানের প্রথমে অতসী একখানি গান গাইলে,—পুরণো ব্রাহ্ম সঙ্গীত, কিন্তু অতসীর মিষ্টি গলায় তা শোনালো ভারী মিষ্টি! চমৎকার কণ্ঠ অতসীর! ওর ওপর মাঝে মাঝে আমার ঈর্ষ্যা হয়।

গান শেষ হবার পর বাবা উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত লোকজনকে নমস্কার ক'রে তিনি প্রথমে তাঁর গুরুর আশীর্ব্বাদ পাঠ করলেন। তারপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকে উপলক্ষ ক'রে ধর্ম্ম বিষয়ে আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে তাঁর মনের কথা বিবৃত করতে লাগলেন।

উদাত্ত তাঁর কণ্ঠ! তেজোপূর্ণ তাঁর বলার ভঙ্গী! উৎসব সভা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর সেই সমুদ্র-কল্লোলের মতো দৃপ্ত গম্ভীর বক্তৃতা শুনতে লাগলো! পিতৃগর্ব্বে আমার অন্তর পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো। এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই নিষ্পলক-নয়নে বাবার মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা যেন গ্রাস করছে।

আমার ডান পাশে রমা পিসি; তাঁর চোখ [illegible]তি। তন্ময় হয়ে গেছেন। বাঁ-দিকে যে প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকটি বসেছিলেন, তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে প'ড়ছে! ওধারের মেয়ে-পুরুষগুলিও অভিভূত হয়ে বাবার বক্তৃতা শুনছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাই এসেছে—কেবল দুটী লোক ছাড়া।

বক্তৃতা শেষ হ'লে বাবা উপনিষদ থেকে শ্লোক পড়লেন, তারপর আর একখানি গানের পর সভা ভঙ্গ হল।

সভার শেষে আরও কয়েকটা কাজে বাবা মন্দিরে রৈলেন। অতসী তাঁর সঙ্গে রৈল। আমি আর রমাপিসি বাড়ী ফিরলাম।

রমা পিসিকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী চলে এলাম। অনেকক্ষণ ধ'রে এক-জায়গায় ব'সে থেকে থেকে ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। তাই এসেই বারান্দার ওপরকার ইজি-চেয়ারটার উপর গা মেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তখনো সন্ধ্যা হোতে দেরী আছে! আকাশের ইস্পাতের রঙ মুছে গিয়ে চারিদিকে তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। গোয়ালিনী তার প্রাত্যহিক দুধের জোগান দেবার জন্য বাড়ীর উঠানে এসে

দাঁড়িয়েছে। বুধুয়া কুয়া থেকে জল তুলছে, গোয়ালিনী তাকে দুধের জায়গা এগিয়ে দেবার জন্যে বার বার তাগাদা দিচ্ছে,কিন্তু বুধুয়ার তাতে কাণ-ই নেই ; একমনে জল তুলছে তো তুলছেই। বুধুয়ার দুষ্টামী গোয়ালিনী বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কাছাকাছি আমি রয়েছি বলে ও কিছু করতে পারছে না। আমি না থাকলে ও হয়ত এগিয়ে গিয়ে তার গালে এক চড়-ই বসিয়ে দিত! এমনি ধরণের শাস্তি বুধুয়া এর আগে পেয়েছে দু'একবার; আড়াল থেকে আমি দেখেছি।

গোয়ালিনী দুধ দিয়ে চলে গেল এবং কি একটা কাজের অছিলায় বুধুয়া-ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। চারিদিকের সেই মন্থর নির্জ্জনতার মাঝে একাকী আমি নিজেকে যেন একান্ত অসহায় এবং অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ওরা ফিরে আসবে কখন ?

সহসা দেখি বারান্দার নীচে ক্রোটন-গাছটার কাছে একটা ছোট কুকুর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে শুয়ে পড়ল। সুন্দর কুকুর-টা! কিন্তু কার কুকুর ? গলায় ওর দামী রূপোর বগ্‌লস্ রয়েছে !

নেমে গেলাম। কুকুর-টার সামনের পাখানা একেবারে গেছে! বেচারী সেই পা-টিকে মাটী থেকে শূন্যে তুলে কাতর মুখে ক্রোটন-গাছটার তলায় শুয়ে পড়েছে। নীচু হোয়ে দেখলাম, ছোট নরম পায়ের ওপরকার খানিকটা ছাল উঠে গেছে !

ভারী মায়া হ'ল। তাড়াতাড়ি বাবার ঘর থেকে টিঞ্চার আইডিনের শিশি এবং ব্যাণ্ডেজ করবার খানিকটা কাপড় নিয়ে এলাম। বিদেশে দরকারে লাগতে পারে, এই জন্যে বাবার কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র সব সময়েই মজুত থাকতো এবং তাঁর কাছ থেকে এই সমস্ত ওষুধ-পত্রের ব্যবহার আমরা দুই বোনে ভাল কোরেই আয়ত্ত করেছিলাম !

কুকুরটি খুব শান্ত ; কোলের ওপর পাখানি তুলে দিয়ে মুখ নীচু ক'রে শুয়ে রৈল। আমি সাবধানে তার পায়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিতে লাগলাম।

যা মনে করেছিলাম, তাই! পিছনে কাঁকরের ওপর দিয়ে ভারী জুতোর ঘস ঘস শব্দ ; তারপরেই আমার পিঠের কাছে গলার স্বর।

—মাপ করবেন, আমার কুকুরটা বোধ হয় এইখানে এসে ঢুকেছে !

গলার স্বরটা কী ভারী আর মোটা! আমার পিঠের ওপর তাদের স্পর্শ যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম। কথার উত্তর দিলাম না। তখনো আমার বাঁধা শেষে হয় নি! ভদ্রলোক বোধ হয় কুকুরটাকে তখনো দেখ্‌তে পাননি ; উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—ডলি, ডলি !

প্রভুর স্বর কাণে পৌঁছিবামাত্র কুকুরটা আমার হাত ছাড়িয়ে মনিবের কাছে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করেছিল। কি অকৃতজ্ঞ!

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—দেখুন দেখি, এইটি বোধ হয় আপনার ডলি !

ডলিকে পেয়ে ভদ্রলোকের আনন্দ আর ধরে না। আমার কথার উত্তর দেবার সময়ই তিনি পেলেন না। কুকুরটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

মনে মনে ভারী রাগ হ'ল! কী রকম ভদ্রলোক! বল্‌লাম—দেখ্‌বেন, যেন ওর পায়ে না লাগে। পা-খানা জখম হোয়ে গেছে!

এতক্ষণে তিনি ওর পায়ের ব্যাণ্ডেজটা দেখতে পেলেম ; বল্লেন—তাইতো! পায়ে লেগেছে দেখছি! কেমন ক'রে পায়ে চোট্

লাগালে, ইউ নটি বয়? না; তোমায় নিয়ে আর পারি না!

লোকটা কি পাগল? আমায় কি ও দেখতে পাচ্ছে না? পরের বাগানের মধ্যে ঢুকে কুকুর কোলে নিয়ে আদর করছে, অথচ যাদের বাগান তাদেরই বাড়ীর লোক সামনে দাঁড়িয়ে,—তার প্রতি শিষ্টাচার দেখানোর সৌজন্যও ওর নেই! আশ্চর্য্য!!

ভদ্রলোক কুকুরটির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পাখানি নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন আর আপন মনে বকতে লাগলেন:

—নিশ্চয় এ মাধো-র কাজ! আচ্ছা, কাল-ই তাকে দেখাচ্ছি মজা! খুন করব বেটাকে!

মুখ তুলে এতক্ষণে আমাকে দেখ্‌তে পেলেন;

—ওঃ! মাপ্‌ করবেন! আপনি যে এখানে আছেন তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আপনি চলে গেছেন! যাই হোক, ধন্যবাদ! এ ব্যাণ্ডেজে এখনকার মতো কাজ চ'লে যাবে! নেহাৎ মন্দ হয় নি!

কী নীরস কণ্ঠ! আর কথা বলবার কি শ্রীহীন ভঙ্গী। বল্লাম—ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই! পশু পক্ষী দুঃস্থ হয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে, তাদের শুশ্রূষা করা আমাদের কর্ত্তব্য! স্বতরাং কর্ত্তব্য করার জন্যে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য ব'লে মনে করি নি!

আমার গম্ভীর কণ্ঠের এই লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনে ভদ্রলোক অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন; উত্তরে কী যে বলবেন, তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে বল্লেন—তাতো বটেই, তাতো বটেই! (কী অর্থহীন হাস্যকর উক্তি) আচ্ছা, আসি তা'হ'লে! নমস্কার!

কুকুর শুদ্ধ দুহাত তুলে তিনি আমার নমস্কার জ্ঞাপন করবার চেষ্টা করলেন। হাসি চেপে বল্লাম—জানতে পারি কি—খুন করবেন যাকে, সে কে, আর তার অপরাধই বা কি?

মুহূর্ত্তকাল আমার মুখ পানে অবুঝের মতো তাকিয়ে তিনি বলে উঠ্‌লেন—ও, আপনি মাধোর কথা জিজ্ঞাসা করছেন! মাধো আমার এক প্রজা। সে-ই ডলির পা জখম ক'রে দিয়েছে!

—কেন? সে তো আপনার প্রজা?

—আহা, বুঝছেন না; তার যে মুরগার চাষ আছে। ডলি মাঝে মাঝে তার সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকে—

বল্লাম—ও বুঝেছি! অবশ্য এ-রকম কোরে পা জখম কোরে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু মিষ্টার সেন, আপনার ডলির অন্যায়ও কম নয়!

এতক্ষণে সেন-মহাশয় আত্মস্থ হলেন। বিস্ময়ে দুই চোখ বড়ো ক'রে বল্লেন—আপনি আমার নাম জানেন নাকি? কি আশ্চর্য্য! কেমন ক'রে জানলেন!

বল্লাম—কেমন ক'রে জানলাম, সে কথা বলতে আমি বাধ্য নই। জানতে পারি কি, আপনি আমার পরিচয় জানেন কি?

—না। জানি না তো!

—সে কি! আমিই যে এখানকার আচার্য্যের "লম্বা মতো ফ্যাকাশে বড়ো মেয়ে" সে-কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন! আমার বাবার নাম—জগদীশ মিত্র! তিনিই তো এখানকার মন্দিরের নতুন আচার্য্য!

নিশীথ বাবুর মুখে কথা নেই! নিষ্পলক নেত্রে তিনি আমার পানে তাকিয়ে আছেন! সে-দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং কৌতূহল (এবং হয়ত সপ্রশংস কৌতুক) প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমার এই প্রগলভ কথার উত্তরে তিনি কি বলতেন জানি না, সহসা গেটের কাছে পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, বাবা আসছেন!

আনন্দিত হোয়ে বল্লাম—ভালই হোয়েছে। বাবা এসে গেছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করলে আপনি সুখী হবেন!

বাগানের মধ্যে আমার সামনে এক অপরিচিত পুরুষমানুষকে দেখে বাবা বিস্মিত হোয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। কাছাকাছি আসতেই নিশীথ বাবু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ ছিল।

নিশীথবাবুই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন; বল্লেন, জগদীশবাবুর সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় করবার আবশ্যক হয়ত নেই! উনি হঠাৎ কলকাতার কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে এখানে চলে এসেচেন দেখে আমরা অনেকেই আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি!

নিশীথবাবুর কথা শুনে বাবা কিছুক্ষণ মৌন হোয়ে রৈলেন, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে কঠিন-তর কণ্ঠে জবাব দিলেন—আপনাদের বিস্ময় আমার পক্ষে একান্ত অর্থহীন! তবে, এ-কথা যদি জানতাম যে এখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনারাও আছেন তাহলে এখানে আসবার আগে বিশেষ চিন্তা করতাম!

—সে তো বটেই। এবং হয়ত তা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনকই হ'ত। যাই হোক, আমাদের মধ্যে যত কম দেখা শোনা হয় ততই ভাল। নমস্কার!

আমার দিকে মাথাটা ঈষৎ অবনত ক'রে নিশীথবাবু দৃঢ়-পদক্ষেপ এবং উদ্ধত ভঙ্গিমায় বাগান পার হোয়ে চলে গেলেন। যতদূর দেখা যায় বাবা তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রৈইলেন। এরই মধ্যে তাঁর প্রশান্ত মুখের ওপর কালো রেখা নেমে এসেছে। দুইচোখে অপরিসীম অবজ্ঞা এবং ক্রোধের ছায়া!

নিশীথবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর বাবা ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন। বিস্মিত-বিবর্ণ মুখে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম; এইবার তাঁর নিকটবর্ত্তী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—

—ওকে তুমি চেন, বাবা? কোথায় ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হোয়েছিল? কে ও?

বাবা উদগত দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ ক'রে বল্লেন—আমার জীবনের শোচনীয়তম অধ্যায়ের সঙ্গে ওই লোকটা সংশ্লিষ্ট! তোমরা জন্মাবার পরেই সে অধ্যায়ের অবসান হয়েছে! তারপর অনেক, অনেক দিন কেটে গেছে; কিন্তু ওই লোকটাকে দেখে সমস্ত কথা গত কালকার মতো স্পষ্ট হয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠলো! সে স্মৃতি, আমায় বিদ্ধ করে কেতকী, ছুরির ফলার মতো বিদ্ধ ক'রে!

স্মৃতির বেদনায় বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর্ত্ত ভিখারীর কাকুতির মতো করুণ হ'য়ে উঠেছে! দুই চোখে তাঁর অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য! হাতদুটী শিথিল হয়ে অসহায়ের মতো দু'পাশে ঝুলে পড়েছে!

তাঁর হাত দুখানি দুহাতে তুলে নিয়ে বুকের ওপর মুখ রেখে বল্লাম—যা চুকে-বুকে শেষ হ'য়ে গেছে, তার কথা ভেবে মন খারাপ করবার দরকার কি বাবা! তুমি ওসব কথা আর ভেবো না। আমিও ভাববো না।

আকাশের পানে দুই চোখ মেলে আপন মনে বাবা বললেন—ঠিক বলেছিস মা। যা শেষে হয়ে গেছে, তার কথা ভেবে মন খারাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়! চল্ মা, আমরা বাড়ীর ভেতর যাই। অতসীর আসতে দেরী হবে! সে গেছে

তার বন্ধুর বাড়ী! ওরে, বুধুয়া আলো কৈ, আলো?

বারান্দা পার হয়ে বাবা নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘরে আলো দেবার জন্য বুধুয়ার খোঁজ করতে বারান্দা পার হয়ে মালীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে। বাগানের গাছ-পালার ওপর অন্ধকার আজ যেন নিবিড়-তর হোয়ে নেমে এসেছে! অন্ধকারে একলা পথে আমার গা-ছম্ ছম্ করতে লাগল। বিগত জীবনের এ কী মসী-লিপ্ত ছবি আমার চোখের সামনে নেমে আসতে চাইছে। ও আমি দেখতে চাই নে। অতীত আমার কাছে বড়ো নয়। যা শেষ হোয়ে গেছে, তাকে আমি স্বীকার করি নে।

কিন্তু সত্যিই কি সব শেষ হোয়ে গেছে?

সহসা চকিত হোয়ে উঠ্‌লাম। মুহূর্ত্তকালের জন্যে ও ভয়ে আমার সকল অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

অদূরে অন্ধকারে গাছের মাথায় একটা বাদুড় ছানা ডেকে উঠ্‌লো—ঠিক যেন একটা সদ্যোজাত কচি-ছেলে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লো। একবার। দু'বার। তিনবার।

চার

পরদিন অপরাহ্ণ।

একা-একা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হু হু ক'রে হাওয়া বইছে। তার উদ্দাম গতিকে উপেক্ষা ক'রে আমি চলেছি। আমার মাথার এলো-খোঁপা তার ঝাপটায় খুলে গিয়েছে। আঁচলের প্রান্ত কিছুতেই বশ মানতে চাইছে না। আমার আশে-পাশে ছোট বড় গাছগুলো মাথা নুইয়ে যেন আমাকে অভিবাদন করছে। ভারী ভালো লাগছে আমার। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতির সঙ্গে আমি এক হ'য়ে মিশে গিয়েছি।

সহসা বাতাসের বেগ ক'মে গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তব্ধ নিস্পন্দ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য্য হোয়ে মাথার ওপর তাকিয়ে দেখ্‌লাম—পাংশু রক্ত বর্ণ মেঘে আকাশ ভারী হ'য়ে উঠেছে, বাতাসে আসন্ন ঝড়ের আভাস।

এমন সময়ে মাঠের শেষে পথের বাঁকে উপস্থিত হতেই সহসা যেন পাদুটো মাটিতে ব'সে গেল। সামনে আমার স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে—মনীষা, যার কলঙ্কিত কাহিনী রমা পিসি সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন!

তাঁর বড়ো বড়ো চোখ দুটী আমার পানে নিবদ্ধ! সকৌতুকে তিনি আমায় নিরীক্ষণ করছেন। অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম! পরক্ষণেই তিনি আমায় সম্বোধন করলেন। পরিষ্কার মিষ্ট কণ্ঠ—সহজ অথচ গম্ভীর! এমন-ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, যেন আমি তাঁর বহুদিনের পরিচিত।

বল্লেন—ঝড় উঠ্‌লো বলে। এখানকার বাদল সহজ ব্যাপার নয়। এই ঝড়ের মধ্যে গাছের তলা দিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমার বাড়ীতে এসে খানিকক্ষণ বোসো। ঝড় থামলে, বাড়ী যেও।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দিকদিগন্ত অন্ধকার ক'রে হাওয়া উঠ্‌লো! নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর ধুলো আকাশকে কালো ক'রে দিলে। গাছগুলো মাটীর সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগলো!

ভয়ে আমার বুকের ভিতর গুরুগুরু করতে লাগলো! বল্লাম—আপনি আমায় বাঁচালেন। একা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতাম কী করে?

আমার কথা শুনে তিনি মৃদু হেসে আমার হাত ধ'রে বল্লেন—এসো!

পথের ওপরেই তাঁর বাড়ী! ক্ষিপ্রপদে দুজনে গিয়ে ভিতর প্রবেশ করলাম। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন মিশে প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা সুরু হ'য়ে গেছে।

পরিষ্কার সাজানো বাড়ীখানি! নীচের বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানি অয়েল পেণ্টিং টাঙানো। ঘরের প্রান্তে দেওয়ালের ধারে তামার সিংহাসনের উপর ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি! সিংহাসনের নীচে দুধারে দুটী পিতলের পিলসুজ, পাশে ধুপদান, ধুনুচি এবং অন্যান্য পূজার উপকরণ সাজানো!

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—চমৎকার! আচ্ছা, আপনি কি—?

মনিষা দেবী বললেন—কী! বল। থামলে কেন?

বল্লাম—না! প্রথমে মনে হয়েছিল, আপনি বুঝি বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন।

তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন—সে ভুল ভাঙ্গলো কিসে?

বল্লাম—এদের দেখে!

এই কথা বলে ঘরের অপর প্রান্তে অবস্থিত ক্রস-বিদ্ধ খৃষ্ট এবং কারারুদ্ধ মহাত্মার প্রকাণ্ড অয়েল-পেণ্টিং দুখানির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

মনীষা দেবী বল্লেন—ছবি দুখানি ভালো?

—ভালো? চমৎকার! এতো বড়ো, আর এমন সুন্দর অয়েল পেণ্টিং, আমি খুব কমই দেখেছি! বুদ্ধ মূর্ত্তিটিও ভারী সুন্দর!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনের বারান্দায় ইজি চেয়ারের ওপর বসলাম! চওড়া বারান্দায় পিতলের টবে নানা রকমের ফুলগাছ দিয়ে সাজানো।

মনীষাদেবী আমার পাশে ব'সে বল্লেন—এই খানে ব'সে ঝড় দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। দেখ্ছো, একটা গাছ ভেঙে প'ড়ল। ভাগ্যিস তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা ডুবিয়ে দিয়ে মেঘ গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। ভীষণ শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনার কথা শুনে তাঁর প্রতি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমার মন আকৃষ্ট হ'ল। বল্লাম—আপনি না থাকলে, আমার আজ ভারী বিপদ হ'ত। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—ইংরেজী আদব কায়দাগুলি বেশ আয়ত্ত করেছ দেখছি! ধন্যবাদ-টা না জানিয়ে বুঝি শান্তি পাচ্ছিলে না।

লজ্জিত হ'য়ে চুপ ক'রে রৈলাম। তিনি নির্নিমেষ নয়নে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রৈলেন। তাঁর দুই চোখ সহসা যেন অপরিসীম কৌতূহলে ভ'রে উঠেছে। বারবার আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগলেন। তার সেই দৃষ্টির সামনে মনে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ অনুভব করতে লাগলাম।

—তোমার পানে এমন ক'রে তাকিয়ে আছি দেখে তোমার ভারী বিশ্রী লাগছে, না? জানি। আজ কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে! আচ্ছা, এর আগে কি তোমায় কোথাও দেখেছি?

মাথা নেড়ে বল্লাম—বলতে পারিনে। কাল যদি মন্দিরে গিয়ে থাকেন, তাহ'লে আমায় হয়ত দেখে থাকতে পারেন।

—মন্দিরে। না। মন্দির টন্দিরে আমি

বড় একটা যাইনে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় মন্দিরে বাস কর না ?

তাঁর কথা শুনে হেসে ফেল্লাম ; বল্লাম— না ! অন্য একটি বাড়ীতে থাকি। আমরা তো এখানে এক সপ্তাহ এসেছি। আমার নাম, কেতকী। এখানে যে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল, আমার বাবা তারই আচার্য্য হ'য়ে এখানে এসেছেন। তাঁর নাম—শ্রীযুক্ত জগদীশ মিত্র !

আর একবার অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুত জলে উঠ্‌লো।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে রৈলাম। মুহূর্ত্তমাত্র। তার পরেই মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। নিজের অজ্ঞাতে দুইচোখ মুদে এলো। বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপছে !

চোখ খুলে দেখলাম, দুই হাতে মুখ ঢেকে মনোবা দেবী মাথা নীচু ক'রে রয়েছেন। তাঁর পিঠের ওপর কার কাপড় বিস্রস্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

বল্লাম—বাজের শব্দ শুনলে বুক সত্যি ই কেঁপে ওঠে। এবারকার মতো এত ভীষণ জোর শব্দ আর কখনো শুনি নি। মনে হল যেন, ছাদের ওপরেই বাজ পড়ল ! শব্দ শুনে আপনি দেখছি নার্ভাস্ হ'য়ে পড়েছেন !

আমার কথার পর আরও অনেকক্ষণ কেটে গেল ; কিন্তু তবুও তিনি মুখ তুল্‌লেন না, বা আমার কথার উত্তর দিলেন না। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—কি হ'ল আপনার ? অসুখ করল নাকি ? কারুকে ডাকবো ?

মুখ তুলে আমার পানে তাকিয়ে তিনি আমায় বসতে ইসারা করলেন। তাঁর মুখ শাদা হয়ে গেছে। দুই চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। মাথার খোঁপা খুলে গিয়ে চুলগুলি তাঁর পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সারা দেহ তখনো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

অতিশয় কোমল এবং নম্রকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন—তুমি বোসো। আমি সুস্থ হ'য়ে উঠেছি। ও কিছু নয়। আমার মাঝে মাঝে হয়।

চুপ ক'রে রৈলাম। তিনিও নীরব হ'য়ে বাইরে আকাশের পানে তাঁর চোখ মেলে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে রৈলেন। ক্রমশঃ ঝড়ের বেগ কমে এলো। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরো দেখা যেতে লাগল। মাতাল গাছগুলো ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে শান্ত আকার ধারণ করল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অবশেষে তিনি বল্লেন—বাঁচলাম !

তারপর আমার পানে তাঁর আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বল্লেন—তাহলে আমরা প্রতিবেশী ; কি বল ?

—নিশ্চয়। নিকট-প্রতিবেশী ! সামনের ওই দেবদারু গাছের বন আমাদের বাড়ী দুটোকে আড়াল ক'রে রেখেছে ; তা নাহলে বোধ হয় উঁচু গলায় ডাক দিলে এখান থেকে ওখানে শোনা যায় !

—তোমাকে দেখে আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল ; কিন্তু তবুও ঠিক করতে পারছিলাম না। তোমাকে দেখে কিন্তু মন্দিরের আচার্য্য মশায়ের মেয়ে ব'লে মোটেই মনে হয় না।

বল্লাম—হয়ত ! কিন্তু সে আমার দোষ নয়। চিরকাল যে বাড়ী-ছাড়া হ'য়ে বোর্ডিং-এ মানুষ হয়েছে—

আমার কথা থামিয়ে তিনি বল্লেন্—বোর্ডিং-এ ছিলে ? কোথাকার বোর্ডিং ? কলকাতার ?

—হ্যাঁ ! এই তো সবে বছর খানেক হ'ল

বাবার কাছে এসে আছি। সেই জন্তেই আমি বাবার কোন কাজে লাগতে পারি না। তার জন্তে ভারী দুঃখু হয়। ভাগ্যে আমার ছোট বোন ছিল, তাই রক্ষে। সে না থাকলে বাবার ভারী কষ্ট হত। আমি যেন অপদার্থ, অতসী তেমনি কাজের মেয়ে। বাবার সমস্ত কাজকর্ম সে-ই করে!

মনীষা দেবী স্মিতমুখে আমার কথা শুনছিলেন; বল্লেন—এ-জায়গাটা কেমন লাগছে? এখানকার লোকজনের সঙ্গে ভাব-সাব হ'ল?

বল্লাম—জায়গাটা বেশ লাগছে। তবে ভাব করবার মতো মানুষ একজনও পেলাম না।

—পাবে গো পাবে। এই তো সবে এসেছো। থাকো কিছুদিন; দেখবে, কতো মানুষ তোমার দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে।

তাঁর এই চাপা রসিকতায় বিষম অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলাম; মুখ-চোখ আমার লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্লো। কী যে বলব, ভেবে ঠিক করতে না পেরে আঁচলের খুট-টা নিয়ে আঙ্গুলে জড়াতে লাগলাম।

আমার এই বিব্রত ভাব তিনি বুঝতে পারলেন; বল্লেন—তোমার নামটি কি, তাতো জানা হল না। ও, হাঁা, হ্যাঁ। তখন বল্লে বটে! কেতকী! বেশ নামটি! এখানে কার কার সঙ্গে চেনা হ'য়েছে বল;—কুমুদ বাবুদের সঙ্গে! কেমন লোক ওঁরা। আচ্ছা, লেডী মিত্রকে চেন?

বল্লাম—হ্যাঁ চিনি। কেন বলুন তো!

—এমনিই বলছি! ভারী ধার্ম্মিক মহিলা! শ্রদ্ধা হয়। দূর থেকে দেখলেই তাঁকে আমি প্রণাম করি!

হেসে ফেল্লাম। বল্লাম—আমরাও ওঁকে খুব ভক্তি করি। অতসী ওঁর নামে অজ্ঞান।

দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠ্লাম। রহস্য পূর্ণ কথাগুলি বলবার ভঙ্গী মনীষা দেবীর ভারী মিষ্টি! তাঁকে যত দেখছি, ততই আমার ভালো লাগছে। এমন মন খুলে কথা জীবনে খুব কমই বলেছি। তিনি যখন গম্ভীর মুখে রসিকতা করছিলেন তখন কৌতুকে তাঁর চোখের পাতাগুলি নেচে উঠ ছিল; অবরুদ্ধ হাসির উচ্ছলতায় গালের ওপর টোল দেখা দিচ্ছিল; অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল তঁাকে তখন!

কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, এখানকার নিশীথ-এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে? নিশীথ সেন?

এক নিমিষে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্লাম। রমা-পিসির কাছে যা শুনেছিলাম, সে কথা এতক্ষণ ধ'রে ভুলতে চেষ্টা করছিলাম। এখন মনীষা দেবীর মুখে সেই নাম শুনে সমস্ত কথা আমার মনে জেগে উঠ্ল। সম্ভবতঃ রমা-পিসির কথা মিথ্যা নয়।

গম্ভীর মুখে তাঁর পানে তাকিয়ে বল্লাম—না। তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই।

কিন্তু তবুও ও সব কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মনীষা দেবীকে দেখে তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা মনে যে জাগতেই পারে না। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাঁর বয়েস। দীপ্ত উজ্জ্বল মুখ, বুদ্ধিতে, মাধুর্য্যে, করুণায়, অপরূপ সুন্দর! পরণে তাঁর অত্যন্ত সাধারণ পরিচ্ছদ, কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর রুচির পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর কথায়-বার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে সব সময়ে যে মহিমময় মাধুর্য্যের পরিচয় পাচ্ছি, তার পাশে রমা-পিসির কথাগুলো যেন অসম্ভব ব'লে মনে হয়।

আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন তাঁর চক্ষু

এড়িয়ে গেল না। কি বুঝলেন, জানিনা। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে কথার স্রোত ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—কলকাতার বোর্ডিং থেকে একেবারে এখানে এসেছো বুঝি? তাহ'লে কয়েকদিন স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হবে। বেশী লোক-জন তো নেই!

—এখানে আসবার আগে কিছুদিন আমাদের দেশে ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার মোটে ভাল লাগে নি।

—পল্লীগ্রাম তোমার ভাল লাগে না! আশ্চর্য্য!

বল্লাম—সত্যি কথা অনেক সময়ে এমনি আশ্চর্য্য লাগে। কবির কলমের মুখে পাড়া-গাঁয়ের ছবি খুব সুন্দর ক'রে ফোটানো যায় বটে কিন্তু সে কবির কল্পনা—বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। সেখানে যে কদিন ছিলাম, তার মধ্যে যে-কজন ছোট বড় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'ল দেখলাম, তারা প্রত্যেকেই সব-চেয়ে আনন্দ পায় পরচর্চ্চা করতে। অবলীলাক্রমে এমন সব কুৎসিত কথা তারা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, যা শুনলে আপনি শিউরে উঠ্‌বেন। সেখানকার পুরুষগুলোও প্রায় তেমনি। সময় পেলেই তারা অন্দরমহলে এসে স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে নয় গালাগালি মন্দ, না হয় পরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়। রাস্তাঘাট যেমন নোংরা তেমনি দুর্গম; অন্যের সুবিধে হবে ব'লে নিজে অসুবিধা ভোগ ক'রেও সেখানকার লোক, রাস্তাঘাট, পুকুর-মাঠ সংস্কার করবার চেষ্টা করে না—এমনি পরশ্রীকাতর প্রকৃতি!

আমার এই সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাসের উত্তরে মনীষা দেবী শুধু একটু হাসলেন। তাঁর এই মৃদু হাসির কাছে আমার এই আন্তরীক উচ্ছ্বাস যেন অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হল। মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লাম। উনি আমাকে এমনিই ছেলেমানুষ ভাবেন নাকি! ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লাম—আপনি হাসলেন; কিন্তু এ সব অতি সত্যি কথা।

বল্লেন—সত্যি বৈকি। খুবই সত্যি! যাক্, এতক্ষণে ঝড়-বৃষ্টি একেবারে থেমেছে। কিন্তু না। এর মধ্যে উঠ্‌তে দিচ্ছি না। একটু চা খাও। চা-খেয়ে তারপর যাবে।

আমার কোন আপত্তিই তিনি কাণে তুললেন না; দাসীকে ডেকে বল্লেন রাধু! ঠাকুরকে আমাদের দুজনের মতো চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বল্! আর দ্যাখ্! কাল সকালে যে পিঠে তৈরী করেছিলাম, তাই খানকয়েক নিয়ে আয়। আমি উঠ্‌তে পারছি না। উঠ্‌লেই এ পালাবে।

দাসী ভিতরে চলে গেল। আমি তাঁকে উদ্দেশ ক'রে কী একটা কথা বলতে যাব, সহসা পিছনে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

পিছন থেকে লোকটি আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়াল; তারপর মনীষা দেবীকে উদ্দেশ ক'রে তরল-কণ্ঠে বল্‌ল—আমাদের বুঝি পিঠে খাওয়ার ভাগ্য নেই। যা কিছু করেছো, সবই কি এঁর জন্যে!

মনীষা দেবী অবাক হ'য়ে বল্লেন—তুমি! নিশীথ! কখন এলে?

—বহুক্ষণ! ঘরে ব'সে এতক্ষণ তোমার উপন্যাস-এর যে ইনষ্টলমেণ্ট-টুকু এ-মাসে ছাপ্‌তে যাবে' সেটুকু পড়ছিলাম। কিন্তু সত্যি বলছি—সুব্রতর প্রতি তুমি অবিচার করছ! এর প্রতি-বাদ করব আমি।

—বেশ তো; কর না। কে তোমায় আট্‌কে রেখেছে।

—আজ আর সময় নেই। তা নাহলে,

আজ এই খানে ব'সেই লিখতাম। যাই হোক অতিথি রয়েছেন তোমার কাছে। চল্লাম এখন।

—যাও। কিন্তু কাল সকালে একবার এসো। দরকার আছে।

—আসবো। ব'লে তিনি সহসা আমায় একটা দ্রুত নমস্কার ক'রে বারান্দা পার হ'য়ে পথে নেমে পড়লেন।

সহসা তাঁর এই আকস্মিক শিষ্টাচারের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। থতমত খেয়ে গেলাম। প্রতি নমস্কারের আগেই তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

আমার মুখের পানে চেয়ে মনীষা দেবী বল্লেন—

—নিশীথের আচরণে অবাক হয়ে গেছে দেখছি। চিরকাল ও ওই রকম খাপছাড়া মানুষ ভেবে চিন্তে গুছিয়ে কোন কিছু করা বা বলা ওর ধাতে নেই।

একান্ত সহজ এবং সরল ভাবেই তিনি নিশীথ বাবুর সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। সব কথা আমার কাণে প্রবেশও করল না। রমা-পিসির অভিযোগগুলো তখন আমার কাণে বাজছে।

সহসা প্রশ্ন করলাম—ইনি কি আপনার আত্মীয়?

দাসী থালায় করে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি খাবারের থালাটি তার হাত থেকে নিয়ে তাকে চায়ের সরঞ্জাম আনতে আদেশ করলেন।

দাসী চলে যাবার পর তিনি আমার দিকে ফিরে বল্লেন—কি বলছিলে, বল?

পুনরায় প্রশ্নটি আবৃত্তি করলাম।

উত্তর দিলেন—না। উনি আমার বন্ধু! অনেকদিন থেকেই ওকে আমি জানি।

বন্ধু! কথাটা ভাল লাগল না।

বল্লেন—কেন, হঠাৎ ও প্রশ্ন করলে যে?

তাঁর সপ্রশ্ন স্থির দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু হয়ে গেলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে বার বার আমি এমন করে বিলীন হয়ে যাচ্চি—আমার এই ক্ষুদ্রতা বোধ নিজের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে হ'ল। মাথা তুলে বল্লাম—শুধু কৌতূহল। আর কিছু নয়!

চা এলো।

মনীষা দেবী নিজের হাতে চা তৈরী করে আমায় খাওয়ালেন। একখানা খাবার পর দ্বিতীয় পিঠে খানা খেতে আপত্তি করতেই তিনি জোর ক'রে পিঠে খানা আমার মুখে পুরে দিলেন,—ঠিক যেমন কোরে মা বা অন্য কোন গুরুজন তাদের ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে দ্যান তেমনি নিঃসঙ্কোচ জোরের সঙ্গে তিনি আমায় একখানার পর আর একখানা পিঠে খাওয়াতে লাগলেন। তাঁর এই স্নেহের অত্যাচারের কাছে একান্ত মনে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজেকে সহসা সুখী বোধ করতে লাগলাম!

চা এবং জলযোগ শেষ হবার পর একসময়ে বল্লাম—ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা আর করব না। তাহলে হয়ত আবার বকুনি খেতে হবে। এত খাওয়ার পর ও জিনিষটার আর কোথাও স্থান হবে না। কিন্তু একটা কথা জানতে ভারী কৌতূহল হচ্চে।

—কি বল?

—নিশীথ বাবু আপনার উপন্যাসের কথা বলে গেলেন। প্রশ্নটা সেই বিষয়ে। আপনি কি উপন্যাস লেখেন,—মানে, আপনার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস আছে নাকি?

তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্মিত-মুখে আমায় উল্টে প্রশ্ন করলেন গল্প-টল্প,—

মানে, বাঙলা সাহিত্য নিয়ে তুমি আলোচনা কর নাকি?

—আলোচনা করি নে। তবে আমি পড়ি। গল্প উপন্যাস, মাসিক পত্র—এ-সব পড়তে আমার ও ভাল লাগে।

—তাই নাকি। খুব ভাল কথা। তুমি আমায় যা জিজ্ঞেস করছিলে, এইবার তার উত্তর দিই। গল্প আমি লিখেছি—বেশী নয়, গোটা কয়েক। উপন্যাস এই প্রথম।

মনে মনে অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছিল। তাঁর মুখের পানে চেয়ে বল্লাম—আচ্ছা, "বঙ্গনারী" মাসিক পত্র খানা—

হাসিমুখে তিনি বল্লেন—হ্যাঁ। বল।

—আপনিই তার সম্পাদিকা! কী আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু মোটেই ভাবতে পারি নি!

—কি ক'রেই বা পারবে বল! একঘণ্টাও এখনো হয়নি, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে—এটুকু সময়ের মধ্যেই আমি কি করি না করি সব জেনে নিতে চাও!!

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কাগজ খানা পড়? কেমন লাগে?

—সুন্দর লাগে! চমৎকার লাগে! আপনার লেখা নারী-প্রগতির প্রবন্ধগুলি আমি অনেক-বার করে পড়েছি!

—তার জন্যে গুরুজনদের কাছে বকুনি খাও নি? শুনেছি, সেই সব প্রবন্ধ লেখার জন্যে অনেক সমাজ রক্ষক নেতৃস্থানীয় লোকেরা আমাকে পুলিসে দেওয়া যায় কি না—সে বিষয়ে মাঝে মাঝে গুরুতর আলোচনা করেন।

উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্লাম—তা জানি। কিন্তু আপনি জানবেন, আমাদের বোর্ডিং-এ এবং অন্য জায়-গায় আপনার অনেক ভক্ত আছে। যাদের কাছে আপনার এবং আপনার সহকর্ম্মীদের স্থান চিরদিন অটুট থাকবে।

আমার কথার উত্তরে হাসিমুখে তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বারন্দার ওপর কার যেন সুদীর্ঘ কালো ছায়া দেখা গেল; পরক্ষণেই বজ্র-গম্ভীর স্বর ভেসে এলো।

—কেতকী!

চকিত হোয়ে উঠলাম। সারা দেহ রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠল। এ যে বাবার গলা!!

এখানে এমন সময়ে বাবা এসে উপস্থিত হবেন তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। দাঁড়িয়ে উঠলাম। মনীষা দেবী আমার আগেই দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন।

ধীরে ধীরে বাবা আর দুচার পা এগিয়ে এলেন, তাঁর ঋজু দেহ ক্রোধে যেন কঠিন হ'য়ে উঠেছে। দুই চোখ দিয়ে আগুণ বার হ'চ্চে। তাঁর এমন ক্রুদ্ধ বিবর্ণ চেহারা আমি আর কখনো দেখে নি।

তাঁর বজ্র কণ্ঠ আবার গর্জ্জন করে উঠ্‌ল।

—চলে এসো এখুনি এ-বাড়ী ছেড়ে!

মনীষা দেবী এইবার স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বল্লেন—যাবে বৈকি! এ-বাড়ীতে তো ও থাকতে আসে নি। আমি বোধ করি কেতকীর পিতা মিঃ মিত্রের সঙ্গে কথা কইছি?

বাবা তাঁর জলন্ত দৃষ্টি বারেকের জন্য মনীষা দেবীর মুখের পরে ন্যস্ত করলেন। দুজনের দৃষ্টি সম্মিলিত হ'ল।

আমি নির্ব্বাক নয়নে বার বার দু'জনের মুখের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তাঁদের দুজনার সেই অনিমেষ মৌন দৃষ্টির মাঝে কী যেন দুর্ব্বোধ্য ভাষার প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি অসহ্য মৌনতায় অতি-বাহিত হ'ল। ঘরের মধ্যে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, শুধু ওধারের দেওয়াল সংলগ্ন ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ সেই স্তব্ধতার ওপর আঘাত করে চলেছে। বাহিরে দমকা হাওয়ায় গাছগুলো দুলে

উঠ্‌তেই তাদের জল ঝরে পড়ল। একটা চড়ুই ঘরের মধ্যে ঢুকে দুচারবার এদিক ওদিক উড়ে আবার বেরিয়ে গেল। তারপর পুনরায় বাবার কঠিন কণ্ঠস্বরে সেই জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পড়া :

—কেতকী! তুমি আমার কথা কি শুনতে পাও নি?

মনীষা দেবী এইবার আমার পানে তাকিয়ে বল্লেন—যাও! তোমার বাবা ডাকছেন। বাড়ী যাও?

কম্পিত অন্তরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এসে বারান্দা পার হয়ে বাবার পিছনে চলতে লাগলাম।

কিছুদূর এগিয়ে এসে বাবার অজ্ঞাতে নিমিষের জন্য একবার পিছনের পানে তাকিয়ে দেখলাম—মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বারান্দায় ওপর মনীষা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন।

(চলবে)

বিধাতার দান

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরী বড় লোকের মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল, হয় নাই শুধু অমর। মূক বধূকে সে যে স্বেচ্ছায় অতি সানন্দচিত্তে সাদরেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাই তাহার বেদনার ও দুঃখের অভিযোগ কিছু ছিল না। সে দুঃখের ভাবটাও কিন্তু বেশীদিন কাহারও মনে স্থায়ী হইতে পায় নাই, বধূর গুণপনায় সকলই মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

নির্ব্বাক সচল প্রতিমার মত ধীর শান্ত শ্রী মণ্ডিত বধূ ঘর আলো করিয়া থাকিলেও তাহার মুখের কথার ও মিষ্টি হাসির অভাব অনেক সময়েই সকলের প্রাণে নিবিড় বেদনা ও সহানুভূতি জাগাইতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুধা পান সাজিতেছিল। অমর আসিয়া দাঁড়াতেই সুধা মুখ তুলিয়া চাহিল ও ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমর তাহার হাত হইতে পানের ডিবাটী লইয়া ইঙ্গিতে কি জানাইল। সুধাও ইঙ্গিতে উত্তর দিলে অমর বাহির হইয়া গেল। একটু পরে সুধাও তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

অমর একটা দেরাজের সামনে দাঁড়াইয়া দেরাজ খুলিয়া কি দেখিতেছিল। সুধা ধীরপদে গিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। অমর খানিকটা নূতন কাপড় বাহির করিয়া সুধার হাতে দিয়া কি বলিল। সুধা কাপড়টা হাতে লইয়া দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া হাত নাড়িয়া কি উত্তর দিল। অমর তাহা বুঝিল, তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, তা' হ'লে কাল থেকে তুমি শিখতে পারবে কি বল?

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

অমর টেবিলের নিকট গিয়া একখানা কাগজে কি লিখিল, লেখা হইয়া গেলে সুধাকে পড়িতে দিল। সুধা একদৃষ্টে খানিকক্ষণ কাগজের পানে চাহিয়া তাহা পাঠ করিয়া স্বামীর মনোভাব বুঝিয়া লইল। তারপর প্রফুল্ল-মুখে স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে নীরবে ঘাড় নাড়িয়া আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিল।

রাত্রে অমরের কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল। সুধা স্বামীর প্রতীক্ষায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অমর যখন ফিরিল, তখন রাত্রি অনেকখানি হইয়া গিয়াছে—সুধা অকাতরে ঘুমাইতেছে! নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া শয্যায় নিদ্রিতা সুধার মাথার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। একবার তাহার ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। মূক কিশোরীর স্নিগ্ধ সুষমাভরা অনাবিল প্রেম-প্রফুল্ল সুন্দর মুখখানিতে যেন একটা বিষাদ সর্ব্বদাই ফুটিয়া আছে। অমর যতই দেখিয়াছে, ততই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর ভাবিয়াছে, ভগবান বুঝি সব সুখ দেন না, একটা অভাব বুঝি থাকিবেই। হয়ত এই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব। আজও তাহাই ভাবিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে অমর এমনই তন্ময় হইয়া গিয়ছিল যে, খাটের উপর কখন হাত দিয়াছে,খাট নড়িয়া উঠায় সুধার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিছুই জানিতে পারে নাই। সহসা সুধাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সরিয়া সুধার কাছে আসিল। সুধা নামিতে যাইতেই বাধা দিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া সে আদরের সুরে ডাকিল—সুধা!

ইসারা ইঙ্গিতে কথার সম্যক্ অর্থ না বুঝিলেও ভাবার্থ অনেকটাই সে বুঝিয়া লইত। এবং তার শ্রবণ শক্তিও খুব ক্ষীণ ছিল না। তাই স্বামীর আদরপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও মিষ্ট সম্বোধনের উত্তরে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উদ্বেগ ব্যাকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টি দিয়া সে যেন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল, কখন এলে? টাইমপিসটার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমর একটু হাসিল। তাহাদের মধ্যে এই মৌন প্রশ্নোত্তর সর্ব্বদা হইয়া থাকে, তাই আজ অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় অমরও এখন বেশ সহজেই সকল কথা কহিতে ও বুঝিতে পারে।

দুই

অমরের খুবই ইচ্ছা সুধাকে শিক্ষিত করা, তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তোলা। তাহার যে একটা অঙ্গহানি হওয়ার বেদনায় সকলই ব্যথিত, এমন কি সুধা নিজেও সে জন্য সর্ব্বদা কুণ্ঠিত, ইহাতে অমরের প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। তাই আর একটা দিক্ দিয়া সে সুধার অভাবটা পূরণ করিবার জন্য বিবাহের পর হইতেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। সুধাও স্বামীর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়া তাহার মনের মত হইবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিয়াছিল। স্বামীর একান্ত যত্নে ও নিজের চেষ্টায় সে এখন বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে যে তাহার স্বামীকে এটুকু সুখী করিতে পারিয়াছে, ইহাতে তাহার নারী হৃদয়ে একটু শান্তিও আসিয়াছিল। অমরও এই মূক নারীর স্বামিত্বের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিতই মনে করিত এখন তাহা যে অনেকখানিই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে সে বিপুল সুখই অনুভব করিতে লাগিল। এবং যাহারা তাহাকে অসুখী ভাবিয়া খুব সহানুভূতির চক্ষে দেখিত, তাহাদের সে চিন্তা যে একেবারে মিথ্যা হইয়াছে ইহাতে একটু গর্ব্বও অনুভব করিতেছিল। দিন দিন সুধার নারীত্বের বিকাশে তাহার স্বামী হৃদয় আত্মহারা হইয়া তাহার প্রতি গভীরতর স্নেহে প্রেমে আকৃষ্ট হইতেছিল।

সকালে কি প্রয়োজনে অমর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে যাইয়া বাধা পাইল। ঘরের ভিতর সুধা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাতে একটি গোলাপ ফুল। সে আনমনে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার দেখিবার ও দাঁড়াইবার ধরণটি এত সুন্দর যে, অমর একটু না দেখিয়া পারিল না। এমন অনেক সময়েই হইয়া থাকে, যাহাতে অমরকে মুগ্ধ এবং দুঃখিত করিয়া তোলে। এখনো তাহাই হইয়াছিল, সে ভাবিতে লাগিল এর সঙ্গে মাটির পুতুলের প্রভেদ কতটুকু? তার প্রাণ নাই বলিয়া কোন দুঃখ বা অভাব বোধও নাই। আর এর—এর প্রাণ অনুভূতি সমস্ত থাকিয়াও একটির জন্য বিরাট অভাব আর তাহারই জন্য আজীবন বেদনা। কিন্তু তাহা অপেক্ষা এ কত দুঃখ তাহার বুঝিবার শক্তি নাই, কাজেই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মতই আর সব আছে। নাই শুধু ভাষা। মন দিয়া মানুষ নিজের সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনা সব ব্যক্ত করিতে পারে। এ অভাব ত বড় কম নয়, ইহার জন্য সর্ব্বদাই মানুষ ব্যথা অনুভব করে। এত সুখের মধ্যে এত গভীর প্রেমের মধ্যে এ কি বিরাট

দৈন্য! এ কি বিধিলিপি। স্ত্রী স্বামীর নিকট একটী কথাও কহিতে পারিবে না। এ কি সামান্য দুঃখ?

দুঃখের আভাষ মনে আসিতেই অমর ব্যগ্রভাবে ঘরে ঢুকিয়া সুধার হাত ধরিয়া ফেলিল! সুধাও এই আকস্মিক স্পর্শে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। এবং তেমনিভাবেই তাহার মুখের দিকে চাহিল। অমর থতমত খাইয়া বলিল, কি দেখছ এক মনে?

সুধা ফুলটি তুলিয়া দেখাইল। তারপর একখানি কাগজের টুক্‌রা স্বামীর হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল—এই ফুলটি আমার নতুন গোলাপ গাছে প্রথম ফুটে ছিল! তুমি এ'টি নিলে আমার খুব আনন্দ হ'বে। আমি ত তোমায় কিছুই দিই নি। দেবার ত আমার কিছু নেই। তবু তুমি আমায় বড্ড বেশী ভালবাস বলেই অসুখী হও না। আমার মধ্যের এতবড় অভাবও অতি তুচ্ছ বোধ কর। কিন্তু আমি যে তা' মোটেই পারি না। নারী চায় দু'টি মিষ্টি কথায় স্বামীকে ও আত্মীয় প্রিয়জনকে তৃপ্তি দিতে। আর আমার মধ্যে ঐ জিনিষটিরই মস্ত অভাব।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই অমর কাগজখানা ফেলিয়া দিল। তাহার একটু রাগও হইতেছিল। কিন্তু রাগ করিবে সে কাহার উপর? যাহাকে ভগবান অত বড় বেদনা চিরজীবনের মতই দিয়াছেন, তাহারই উপর রাগ কখন কি বুদ্ধিমান মানুষ করিতে পারে? বেদনার উপর বেদনা দেওয়ার ইচ্ছা ও প্রকৃতি তাহার কোনদিনই ছিল না, তাই সুধার উপর রাগ এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যে কখনো করে নাই, আজও করিল না। কিন্তু স্বাভাবিক অভিমান যে মানুষের আসিবেই, তাই অমরের একটু অভিমান হইল। যাহাকে সে ভালবাসে, কেন সে তাহাকে এমন ভুল বুঝিল?

সে টেবিলের নিকট গিয়া একটা কাগজের প্যাড্ টানিয়া লইয়া লিখিল, সুধা, তুমি আমায় ভুল চিনেছ। আমি অসুখী কেমন করে' জানলে তুমি? ভগবানের নামে শপথ করে' বলছি, সত্যিই আমি সুখী। তোমার যা' নেই, তার আশা আমিও কোনদিনই করি না। আমার সাধ্যে যদি হ'ত তা' হ'লে অন্ততঃ একটি ক্ষণের জন্যও একটী কথা শুনতুম। তোমার মুখের ভাষা, তোমার কাছ হ'তে একটি কথা। কিন্তু তা' হবার উপায় যখন মানুষের হাতে নেই, তখন সে দুঃখ করা বৃথা আর তাই আমি করিও না। আমি জানি সুধা, তোমার অন্তরে কত সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ বদ্ধ হয়ে ভেতরটায় জমে রয়েছে, কিন্তু তোমার ও আমার হাতে এর প্রতিকার হবে না, তাই যা' পেয়েছি, তারই এবং যাকে পেয়েছি তাকেই বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ বলে' আমি মনে করি। তিনি এই করুন যেন তাঁর দানের মর্য্যাদা রাখবার শক্তি আমার চিরদিন থাকে।

কাগজখানা সুধার হাতে দিয়া অমর একটা চেয়ারে বসিল। সুধার বোধ হয় খুবই আনন্দ হইয়াছিল, তাই সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। অমর ত্রস্তে পা টানিয়া লইয়া সুধার হাত ধরিয়া উঠাইল। তাহার চোখের জল কাপড় দিয়া সযত্নে মুছাইয়া দিয়া বুকে টানিয়া লইল।

তিন

সুধা পুত্রের জননী হইয়াছে। তাহার শিশু পুত্রটির আজ অন্নপ্রাশন। সেইজন্য আজ প্রভাত হইতেই বাড়ীতে উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। নহবৎ বাজিতেছে, চারিদিকে সকলেই ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

সুধাও আজ সকলের অনুরোধে একটু সাজিয়াছে। উপরের ঘরে থাকাকে সে মনেরমত

করিয়া সাজাইতেছিল ও আদর করিতে-ছিল। শিশুও জননীর এই নীরব আদর হয় ত বুঝিতে পারিতেছিল, তাই শান্ত হইয়া চুপচাপ বসিয়াছিল। কি একটা জিনিষ লইতে অমর সেখানে আসিয়া পড়িল। দূর হইতে মূক মাতা পুত্রের নীরব হৃদয় বিনিময় দেখিয়া সে মুগ্ধ চক্ষে খানিক-ক্ষণ চাহিয়া রহিল।

তারপর সুধাকে বিস্মিত করিবার জন্য এক সময়ে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল নিঃশব্দে। সুধা তাহার পানে চাহিয়া সলজ্জভাবে মুখ নত করিল। অমর দেখিল—তাহার চোখে জল। সে জিজ্ঞাসা করিল, এ শুভদিনে তোমার চোখে জল কেন ?

সুধা টেবিলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া কি বুঝিল। অমর তাহার ইঙ্গিত মত টেবিলের নিকট গিয়া দেখিল—একখানি কাগজে লেখা ছিল—খোকাও যদি আমার মত বোবা হয়, তা' হ'লে মা বলে' ত ডাকতে পারবে না—সে যে আমার বড্ড কষ্ট হবে। অমর চোখ বুলাইয়া কথা কয়টি পড়িয়া লইল। আদর করিয়া সুধাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইল। আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া সুধা বাক্স খুলিয়া একটি সিল্কের কাপড় বাহির করিল। তাহাতে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল—একটি কবিতা। সুধারই রচিত।

অমর পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, সুধা তুমি এত সুন্দর করিয়া লিখতে পার ?

সহসা তাহার এই উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। বাহিরে একসঙ্গে বহু শঙ্খ ধ্বনিত হইল, নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সুধা স্বামীর হাত ছাড়াইয়া খোকাকে কোলে লইয়া ত্রস্তে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার চোখে মুখে বড় আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সুধীনের ঘুম ভেঙে গ্যালো।

মুখের ওপর রোদ এসে পড়েছে। ছেলেটাকে ডেকে জানালাটা বন্ধ করে' দিতে বলে, আরো খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না ভেবে সে ছেলেটা কোথায় গ্যালো ডাকতে গিয়ে ওদিকের আলমারীর মাথায় টাইমপিসটার ওপর নজর পড়লো। আট্‌টা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকী। আর ঘুমোবার অবসর কই। গরমে কাল রাত্রে ভাল করে' ঘুম হয় নি তার ওপর ছারপোকার দংশন. এখনও দেহের শ্রান্তি মেটে নাই। এই তো সকালের দিকে সে একটু ঘুমিয়েছে মাত্র। কিন্তু আফিস যাবার জন্য এখন থেকেই তৈরী না হ'লে চলবে না। কামাই করলে বাজারের যা' অবস্থা, চাকরীটাও তো চলে যেতে পারে।

চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে সুধীন বিছানায় উঠে বসলো। ছেলেটা হাঁ করে জানালার দিকে চেয়ে বসে আছে। সামনে বইগুলো খোলা পড়ে। একেই তো ঠিক মত স্কুলের মাইনে দিতে পারছে না, দু'মাসের মাইনে বাকী পড়েছে, তার উপর ছেলেটা পড়াশুনায় ফাঁকী দিতে সুরু করেছে। ঠাস করে আচমকা ছেলেটার গালে একচড় বসিয়ে দিয়ে সুধীন ধমকে উঠলো—পড়্‌, ওদিকে দেখছিস্‌ কি হাঁ করে!

আচমকা চড় খেয়ে ছেলেটা চমকে উঠলো। কান্নায় তার গলা রুদ্ধ হয়ে এল। চোখ দু'টা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে সে বইয়ের ওপর দৃষ্টি নামালো, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোলো না, রুদ্ধ আবেগে ঠোঁট দু'খান শুধু কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

সুধীন জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটার পানে তাকিয়ে সে গর্জ্জে উঠলো—গলা দিয়ে যে আর 'রা' বেরোয় না। চেঁচা, চেঁচিয়ে পড়্‌।—ওই দেখ ওদের ছেলেটা কেমন পড়ছে!

সামনের বাড়ির যে ছেলেটাকে সুধীন আদর্শ হিসাবে দেখালো, তারই পানে 'নরু' এতক্ষণ চেয়েছিল। এইমাত্র তো সে পড়তে সুরু করেছে এতক্ষণ তো একটা সুতোবাঁধা কাঠের চাকা নিয়ে সে যে লাট্টুর মত ঘোরাচ্ছিল। বাবা ত আর তা' দেখেন নি। নরুর মনে হোল সে কথাটা বাবাকে একবার শুনিয়ে দেয়। কিন্তু ক সে পারলো না, ধরাগলায় মুখস্থ করতে সুরু করলো—

"আমরা হব সেনানায়ক, গড়বো নতুন সৈন্যদল। সত্য ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্য বল।"...

সুধীন আবার সামনের বাড়িটার দিকে মুখ ফেরালো। ছেলেটা অত্যুচ্চস্বরে পড়ছে। টেবিলটার ওপাশে একটা চমৎকার ফুলদানীতে কয়েকটা রক্তগোলাপ সাজানো! ফুলগুলো সম্ভবতঃ কাগজেরই। না হ'লে এ ক'দিনে ওগুলো নিশ্চয়ই শুকিয়ে যেতো। বুক-কেসটাতে বইগুলি কেমন পরিপাটী করে সাজানো। ওদিকের দেওয়ালে একখানি বিবেকানন্দের ছবি! ঘরখানি কেমন তকতক্ ঝকঝক্ করছে, সৌষ্ঠব ও সুরুচির পরিচয়ে

শ্রী-মণ্ডিত। রুচি বলে বিষয়টার সঙ্গে ও বাড়ির বৌটার বিশেষ পরিচয় আছে না হলে কই, সুরমা তো তার ঘরখানিকে এমন করে' সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করে না কোনদিনই। তাও তো বুক-কেস রয়েছে, কিন্তু ভিতরের বইগুলির ধুলোই ঝাড়া হয় নি কোনদিনই, অশান্ত ছেলে দু'টার উৎপাতে কবে তিনখানি কাচ ভেঙে গ্যাছে, আজও সারানো হয় নি। টেবিল-ক্লথের অভাবে টেবিলটার ওপর একখানি কাগজ পাতা, তাও ছিঁড়ে খান খান হয়ে গ্যাছে। বুক-কেসটার মাথায় কি ওই ভাঙা টিনের বাক্সগুলো না রাখলে চলে না? সুরমার রুচি বলে' কিছু নেই। বিছানার চাদরটা যে অত কালো হয়ে গ্যাছে, ধোবা আসে নি বলে' কি তা' পরিষ্কার হবে না। একটু সাবান দিয়ে কেচে ফেলতে কি হয়? ওদিকে বালিস তিনটে তো কেটে তুলো বেরুচ্ছে। সেদিকে সুরমা তো একবারও নজর দেয় না।

এখন সুরমা এসব দিকে নজরই দেয় না, কিন্তু বিয়ের পরে বছর দুয়েক ধরে সে ঘর একটু নোংরা হ'লে রাগ করে', বকে অনর্থ বাধাতো, কিন্তু এখন তার মন থেকে সে সংস্কারটী যেন লুপ্ত হয়ে গ্যাছে। এ যেন সে সুরমা নয়!

সুরমা কি একটা কাজে ঘরে এল। তাকে কাছে পেয়ে সুধীন বললো—বিছানার চাদরখানা আজ একটু সাবানে ফুটিয়ে নিওতো রমা, বালিশ গুলোরও যা' হোক একটা বিহিত করো। ওগুলো যদি সেলাই করা না যায়, না হয় বল, খানিকটা কাপড়ে কিনে আনি বালিশগুলোর জন্যে—

স্বামীর সামর্থ্য ও রুচির অসামঞ্জস্য দেখে সুরমার হাসি পেল, হেসে বললে—তারপর? শেষা মাসের খরচ চলবে কি করে'?

সুধীন প্রথমে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গ্যালো। বাহিরটাকে সুরুচি সঙ্গত করতে হ'লে যে আর্থিক সামর্থ্যটুকুর প্রয়োজন, তা' তার নেই, সে তো তা' ভাল করেই জানে না হ'লে সে এমনি অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করবে কেন। এটুকু আবার তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা কী! সুধীনের মেজাজ রুক্ষ হয়ে গ্যালো, সে জোরগলায় বলে উঠলো—শেষা মাস কি করে' চলবে সে ভাবনা তোমার কেন?—চালাবো তো আমি!

সুরমা একটু যেন নির্লিপ্ত স্বরেই বললো—বেশ, তবে আর আমায় জিগেস করছ কেন? নিজেই কর না—

সুধীন ক্ষেপে গ্যালো, উত্তেজিত স্বরে বললো, করবোই তো আমি নিজেই সব করবো। আজ আফিস থেকে ফিরি, আগে আলমারীর মাথা থেকে ওই ভাঙা টিনের বাক্সগুলো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দোব, তারপর অন্য কথা—

সুরমার দিক থেকে একথার কোন উত্তর এল না। একথা সে আরো কবার শুনেছে। এ ঘরের প্রয়োজন শেষ করে' সে নিজের কাজে অন্যত্র চলে গ্যালো।

স্ত্রীর এই নির্লিপ্ততায় সুধীন আরো চটে গ্যালো। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে বললে, সে হাসে, বলে শেষা মাসে চলবে কেমন করে'। কেন দুটো বালিশ তৈরী করালে কিংবা একখানা চাদর কিনলে সুধীন একেবারে কি ফতুর হয়ে যাবে? সামনের বাড়ির ওদের দেখেও তো সুরমা শেখে না। সুরমার মুখ চেয়ে আর সে বসে' থাকবে না। মতলব যখন ঠিক করেই ফেলেছে, তখন 'শুভস্য শীঘ্রং' শেষ করে' ফেলাই ভালো। মাইনের এখনও তো কয়েকটী টাকা তার হাতে আছে, আফিস থেকে ফেরবার সময় তা' হতে সে চাদর ও 'টিকিন্' কিনে আনবে। কাল রবিবার, কালই ধুনুরী ডেকে বালিশ তৈরী করার ব্যবস্থা করবে। জিনিষ-পত্র ছবি প্রভৃতি সাজিয়ে-

গুছিয়ে ঘরগুলি ফিট্‌ফাট্ করে ফেলবে। এদিকে খরচ-পত্র করলে শেষা মাসে যদি নেহাৎ টাকার সঙ্কুলান না হয়, ক'দিন বাজার খরচ বন্ধ করলেই চলবে। না হলে এ-মাস নয় ও-মাস নয় করে' কোন মাসেই হয়ে উঠবে না। এমনি রুচিহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে করতে সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। গরীবই হয়েছে, কিন্তু তা' বলে' তারই মধ্যে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করলে কি এমন অন্যায় হয়, কেউ তো নিষেধ করে নি।

সুধীন এইসব কথা মনে মনে আলোচনা করছে,হঠাৎ বড় ছেলে জিতু এসে বললো—বাবা, মা বলছে বাজার যাবেন কখন? সাড়ে আট্‌টা যে বেজে গ্যালো।

পুত্রের কথায় সুধীন ঘড়ির পানে তাকালো—ন'টা বাজতে আর মিনিট কুড়ি আছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে স্নান-আহার শেষ করে' আফিসে বেরুতে হবে। আজ আর বাজার যাবার সময় কই? ভালই হোল এমনি করে ক'দিনের বাজারের খরচটা বাঁচিয়ে ফেললে তার এদিক্‌কার টাকার সঙ্কুলান হবে। স্নানের চেষ্টায় উঠে পড়ে সুধীন বললো—আজ আর বাজার যাবার সময় নেই, বলগে যা', বাজার এখন ক'দিন হবে না। আলু পেঁয়াজ পোস্ত তো ঘরেই আছে, তাই রাঁধতে বলগে যা'—

জিতু চলে গ্যালো। দরজার মাথায় ঝুলানো গামছাখানা টেনে নিয়ে সুধীন নীচে নেমে গ্যালো।

স্নান সেরে ওপরে এসে সবে মাত্র চুল আঁচ-ড়াতে সুরু করেছে, এমন সময় সুরমা এসে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—বাজার তো বন্ধ করেছ, শুধু ডাল-ভাত গিলতে পারবে তো?

এমনি ঝঙ্কার শুনে শুনে সুধীরের অভ্যাস হয়ে গ্যাছে। আরসীর ওপর থেকে মুখ না তুলেই সে বললো—কেন আলু পোস্ত তো কেনা আছে?

পোস্ত আর আলুতে ক' গরাস ভাত ওঠে শুনি। তোমার না হয় গোঁ, তুমি ঠিক খাবে; কিন্তু ছেলে দু'টো খায় কেমন ক'রে? ওদের না হয় দু'চারটে পয়সা দাও, দইটই কিনে আনুক, খাবে তো!

সুধীন এবার মুখ তুললো, সুরমার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—ক'টা দিন এমনি করেই কাটিয়ে দাও রমা, ও টাকাটা এবার অন্য দু'-একটা কাজে লাগাই।

স্বামীর অনুরোধ সুরমা গ্রাহ্যই করল না, আগের মতই সে বলে চললো—যত সব অনাছিষ্টি কথা। কি করে' যে চলবে তা' তো বুঝি নে। অন্য দু'একটা কাজে টাকা লাগাই মানে—তোষক তৈরী করাব, বালিসের কাপড়ে কিন্‌বো এই তো। তা' খরচ-খরচা বাদে টাকা যদি বাঁচে,শেষে করো, এখন তার কি? পেটে ভাত না থাকলে সৌখীন বাবুগিরি করে' লাভ কি? পেট [illegible] ভরবে না।

সুরমা কি জোরে জোরে কথা বলে! পাশের বাড়িতেও ওর কথা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে হয়তো। সুধীন রেগে আগুন হয়ে উঠলো, বললো—বেশ, তুমি যাও এখন এঘর থেকে। আমি যা ভাল বুঝি করবো, তোমার কোন উপদেশ আমি চাই নে—

কর গে না তোমার যা' খুসী, উপদেশ দেবার জন্য আমার মাথাব্যথা পড়েছে। সত্যি কথাই বলছি, উপদেশ আবার কি? ছেলেমেয়েগুলো এদিকে পেটের জ্বালায় খাই খাই করবে, আর উনি চাল বজায় করবেন—

সুরমা আরো অনেক কিছুই বলতো হয়তো, কিন্তু এমন কট্‌মট্ করে সুধীন তার মুখের পানে

তাকালো যে, সে হঠাৎ থেমে গ্যালো। সুধীন বললে—বেশ করবো, আমার খুশী, সব টাকা-পয়সা তোমাদের পিছনেই যে খরচ করবো এমনই বা কি কথা আছে। এমাসে আমি আর এক পয়সাও দিতে পারবো না, যাও—

গৃহিণী এবার ফোঁস করে' উঠলেন—কত লাখ-পঞ্চাশ তুমি রোজগার কর যে, বলছ সব টাকা সংসারে দিচ্ছি। মাস্তর তো পঁয়তাল্লিশটা টাকা—

—ফের কথা, যাও তুমি এ ঘর থেকে যাও বলছি। সুধীন ভয়ানক ধমক দিল।

স্বামীর ধমক খেয়ে সুরমা এবার কেঁদে ফেললো। আঁচলে চোখ মুছে ধরাগলায় বললো—আমি কি আর এমন মন্দ কথাটা বলেছি। জিতেন আর নরু কাল তো একগরাসও মুখে করতে পারে নি, খাবেই বা কি দিয়ে?

স্ত্রীর চোখে জল দেখে সুধীনের মনটা নরম হ'য়ে গ্যালো। সত্যই, এদের নিয়েই তো তার সংসার: স্ত্রী-পুত্রদের কষ্ট দিয়ে নিজের সৌখীন হবার সখটাকে চরিতার্থ করে সে কি এমন সার্থকতা লাভ করবে? গলার পৈতা থেকে হাতবাক্সের চাবিটা খুলে নিয়ে সুরমার দিকে ফেলে দিয়ে সুধীন বললো—এই নাও চাবী. পয়সা বার করে' নাওগে—

সুরমা চাবিটা কুড়িয়ে নিল। সুধীনের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। সুরুচি-সঙ্গত ফিটফাট্ হওয়া তার আর হোল না, সুরুতেই তার স্বপ্ন শেষ হয়ে গ্যালো। উৎসুক দৃষ্টিতে সামনে বাড়ির ঘরখানির পানে সে তাকালো। তাদের চেঁচামেচিতে ওবাড়ির বউটী জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তাকাতে দেখে সরে গ্যালো। সুশ্রী সুসজ্জিত ঘরখানির পানে আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সুরমাকে লক্ষ্য করেই যেন সুধীন বলে' উঠলো—মিছে এত ঝগড়া করছিলে রমা, সোজা বললেই হোত বাজারের পয়সা দাও, দিয়ে দিতুম। আমার কাছে যখন যা' থাকে চাইবামাত্রই দি', তবু—

সুধীন মুখ ফেরালো, সুরমা অনেক আগেই সে ঘর থেকে চলে গ্যাছে। সুধীন আবার চুল আঁচড়াতে সুরু করলো।

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪০ | তৃতীয় সংখ্যা

বৌমা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরের হাতে পেটের ছেলে বিলাইয়া দিবার মুহূর্ত্তে লতা প্রতিবেশিনীদের সমবেদনা অপেক্ষা ঠাট্টা-বিদ্রূপের অগ্নিবাণে ঢের বেশী করিয়াই দগ্ধ হইল। বরং ঠিক শুভ-মুহূর্ত্তটীতে তার সভাস্থলে না আসার কৈফিয়তে অনেকের মুখেই সহানুভূতি জাগিয়াছিল, "আহা, মার প্রাণ পারে কি?" "হাজার অভাব অনাটন হ'লেও নাড়িছেঁড়া ধন বিলিয়ে দেওয়া কি সহজ।" "না হয় পেটের দায়ে ননীর পুতুল সব না খেয়ে মরছে দেখে, পুরুষের জেদে মতই দিয়েছে, তা বলে নিজের হাতে পর ক'রে দেওয়া—হ'ক বাপু, মা ত।" "দেখ গো, এতক্ষণ হয়ত অজ্ঞান হয়েই পড়ে' আছে।" ইত্যাদি।

কিন্তু সবার সব কল্পনাকে বিফল করিয়া দিয়া পট্টবস্ত্র ভূষিতা লতা যখন দত্তক দান যজ্ঞে ঠিক স্বামীর পাশটীতে আসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বসিল, তখন অন্যের কথা দূরে থাক, স্বামী জগত-জ্যোতি অবাক-বিস্ময়ে তার মুখের ভাবে মনের গোপন ভাষা পাঠ করিতে চাহিল, বুঝি পত্নীর মস্তিষ্ক ঘটিত গোলমালের কথাটা বার কয়েক তার মনের কোনে উঁকি দিয়া গেল, কিছুকাল পূর্ব্বে যে পত্নী মিনতি ভরাকণ্ঠে অশ্রুর রুদ্ধবাণ সম্বরণে অপারক হইয়া বুককাটা স্বরে বলিয়াছিল, 'বলো না গো, বলো না, আমি পারব না।' সেই লতাই কি?—

পুরোহিত সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিলেও মন্ত্র-পাঠে তার বিঘ্ন ঘটিল। স্খলিত মন্ত্রাংশ লতাই সংশোধন করিয়া দিয়া কুল-পুরোহিতের বিস্ময়-দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিল। পল্লীবৃদ্ধ [illegible]বাবু, শুধু আস-পাশের টিটকারী ব্যঙ্গে যোগদান করিলেন

না, হতাশ ভাবে তিনি কেবল মাথানাড়া দিলেন।

সম্প্রদানের শেষে টাকা ভরা থালাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া লতা যখন গণিয়া গণিয়া স্বামীর সম্মুখে থাক দিয়া রাখিতে লাগিল, তখন সহ্যের অতীত কণ্ঠে জগৎজ্যোতি বলিল, "এখন ওসব কোথাও লুকিয়ে ফেল লতা, হবে তখন, দেখতে পাচ্ছি না।"

বড় নিষ্ঠুর কণ্ঠে লতা বলিল, "না না, কম বেশী যা কিছু এ সময়েই বুঝে নেওয়া ভাল।"

তখন আর একবার টিট্‌কারীর ঢেউ বহিয়া গেল। রামতনুবাবু কিন্তু ধীরপদে নিকটে আসিয়া অশান্ত একখানি হাত তার কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "একজন ডাক্তার ডাকব কি মা?"

সজোরে মাথা নাড়া দিয়া লতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর যৌতুকের টাকাগুলা নিজের বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া লইয়া অটল-চরণে স্বামীর পিছনে পিছনে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

দুই

তিন বছরের ছেলে মা বাপ পর করিয়া দিয়াছে তা বুঝিল না, ছুটিয়া আসিয়া মার আঁচল ধরিয়া বলিল, "মা কোয়ে!"

মা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিল না। পুকুরের সদ্য-তোলা কলমীর শাকগুলার উপর অনর্থক ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি খুঁজিতে লাগিল, বোঝা গেল না। ছেলে হাঁটু পাতিয়া হুমড়ি খাইয়া শাকের উপর পড়িয়া বলিল, "কি হাইয়ে গেছে মা, পয়ছা, খুঁজে দি?"

লতার চ'খের নিয়ের শাকগুলা কেন যে হঠাৎ ভিজিয়া উঠিল, নির্ব্বোধ শিশু তা বুঝিল না, শাক টানিতে টানিতে বলিল, "নেই মা, নেই পয়ছা নেই,—কুটে দি, আমি খাব, তুমি খাবে, বাবা খাবে। জেটিকে দেব না, দুত্ত, আমাকে ধরে রেখে দিছিল, কেমন পালিয়ে এয়েছি, না মা!"

লতা ধরা গলায় মেঘ গর্জ্জনের অনুরূপ স্বরে বলিল, "তুই যা খোকা, ওরা খুঁজছে।

বালক সেকথা কাণে তুলিল না, বলিল, "আমি এব্বাত্তি কোয়ে উঠবো মা, এব্বাত্তি, আর দুত্তমি করব না।"

ছেলের দিকে না চাহিয়া মা মুখে আঁচল চাপা দিয়া ছুটিয়া পালাইল, শয়ন গৃহের ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শাক ফেলিয়া ছেলে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া তার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া তার স্বরে কলরব তুলিল, "ওমা মাগো, আমি যে দাব, দোর দিলে কেন গো!"

সবিতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, "কত্তরাজ্যি খুঁজে এলুম খোকন, আর তুমি এখানে পালিয়ে এয়েছ বাবা!"

মুটো করা হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে খোকা বলিল, "আমি মা কোয়ে দাবো, মা নিয়ে না!"

তারপর ফুলিয়া ফুলিয়া সে কি কান্না!

সবিতা অঞ্চলে তার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিয়া বলিল, "ধিক্ যাই রাক্ষসীকে, পেটের ছেলে ত? একবারটী কোলে নিলে কি গতরে পোঁকা পোকা ধরত! কেঁদ না খোকন, এই ত আমি কোলে নিয়েছি বাবা, ও শত্তেক খোয়ারীর কাছে আর এস না, আমি তোমার মা, ও নয়।"

তিন

সবে গ্রাসটী মুখে তুলিয়াছে, খোকা ছুটিয়া আসিয়া পিঠে পড়িয়া ডাকিল, "আমি খাব মা, ছুত্তি খানি, নতুন মাকে বব্ব না!"

লতা হাত দিয়া তাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "এ থেকে নেই, এ বিষ, বাবা।"

সবিতা খোকনের প্রায় পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "সত্যি ছোট বৌ, তোর এক প্রাণ বটে, ধন্যি! ছাই হ'ক পাঁশ হোক, নিজে ত দিব্যি ঠোঁটের ফাঁকে তুলে দিচ্ছিস্, কচি ছেলের মুখে একদলা দিলে, এমন কিছু ক্ষিধেয় মরতিস না। আর খোকন, পরে তোর থরে থরে খাবার সাজান বাবা, কেন আসিস্ ও আবাগীর কাছে।"

রোরুদ্যমান ছেলেকে টানিয়া লইয়া সবিতা চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ ভাত হাতে কাট হইয়া বসিয়া থাকিয়া ফিকে হাসি হাসিয়া লতা আপন মনে বলিল, "ও কেনর উত্তর খোকা হয়ত দিতে পারবে না দিদি, পারি আমি, আর পারেন অন্তর্যামী, কিন্তু তোমার ভাগ্যগুণে এ দু'জনেই আজ বোবা।"

ভাত লইয়া খানিক নাড়া চাড়া করিয়া হঠাৎ থালা হাতে লতা উঠিয়া পড়িল। পুকুর পাড়ে আসিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া দলার পর দলা দূরে জলে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। মাছের ঝাক কতটা আকুল আগ্রহে কাড়াকাড়ি করিয়া যে সেগুলির সদব্যবহার করিতেছিল, সেদিকে কিন্তু তার লক্ষ্যই রহিল না।

কিছুকাল এই ভাবেই গত হইল। সবিতা ছেলেকে খাওয়াইয়া মুখ হাত ধোয়াইতে ঘাটে আসিয়া এ দৃশ্যে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিল, "তুই কি লা ছোট বৌ, আজকাল মাথায় কিছু ঢুকেছে টুকেছে বলতে পারিস্। ছেলে-টাকেও কাঁদালি, নিজেও খেলি না, বাড়ালক্ষ্মীর একি অপমান, ছিঃ ছিঃ!"

তাড়াতাড়ি হাতের থালা জলে ডুবাইয়া কোন রকমে হাত মুখ ধোয়ার কাজটা সারিয়া লতা দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। যেন কোন একটা গুরুতর ভুলের কথা হঠাৎ স্মরণ হইয়াছে, তাই জায়ের কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিল না।

চার

দীর্ঘ বার বৎসর পরের কথা! ছেলে মাকে ভুলিল। সব কথা বুঝিবার মত বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় স্পষ্টাক্ষরে সে একদিন জন্মদাতাকে প্রকাশ্য হাটের মাঝে অপমান করিয়া বসিল। হাটের একটা পুরুষানুগত বৃত্তি লইয়া এই বচসা। বিত্তিটা উভয় ভ্রাতায় পালা ক্রমে ভোগ করিত। কিন্তু ইদানীং বড়কে চাকরীর অনুরোধে প্রায়ই বিদেশে থাকিতে হওয়ায়, তা'ছাড়া অত ঐশ্বর্য্য মানুষ হইয়া হাত পাতিয়া ভিখারীর মত পরের দান গ্রহণের অপমান তাহার ধাতে সহ্য হইবে না বুঝায়, বিত্তিটা নিঃস্ব ছোট ভাইকেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। নির্ব্বিবাদে ছোট ও সে দান নিজস্ব বলিয়া বৎসরের পর বৎসর গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। আজ কিন্তু প্রথম ব্যাঘাত জন্মাইল তাহারই ঔরস জাত সন্তান।

একজন ব্যাপারী বেশ বড় একটী আম জগত জ্যোতির হাতে তুলিয়া দিলে কোথা হইতে চিলের মত ছুটিয়া আসিয়া অময়কুমার ওরফে খোকা তা ছিনাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে পরুষ ভাষায় বলিল, "লজ্জা করে না চোর, আমার জিনিস হাত পেতে নিতে?"

জগত অবাক-বিস্ময়ে খানিক তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মৃদু হাসিবার চেষ্টা পাইয়া বলিল, "তোর ওটা নেবার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে খোকন, নে না!"

"ইচ্ছে কি, আমার পাওনা। আমি জোর সঙ্গে নেব, তুমি ঠক্, জোচ্চোর, এতদিন ঠকিয়ে খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করেছ, তা আর হ'চ্ছে না। এ আর ভাইকে পাওনি যে কল্পতরু হ'য়ে বিলিয়ে

দেবে, এবার আমার পালা সুঁচের আগের মাটিটি পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ দিয়ে নিতে হবে!"

দশজনের জিজ্ঞাসু চক্ষু তাহার দিকে স্থাপিত অনুভব করিয়া জগতজ্যোতি লজ্জায় যেন মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। কাতর স্বরে বলিল, "সে বোঝাপড়া তোর বাপের সঙ্গে থোকন, তোর সঙ্গে নয়! আসুন দাদা—"

বাধা দিয়া ব্যঙ্গভরাকণ্ঠে পুত্র উত্তর দিল, "যেখানকার যা কিছু ঝেঁটিয়ে নে গিয়ে ঘরে পুরবে—তা আর হ'চ্ছে না, সে রাম রাজত্বের দিন চলে গেছে, এখনকার দিন আইনে চলে. আইনে বলে, আইনে যদি তোমার এ ঠক্‌বাজীর প্রশ্রয় দেয়, পাবে, নইলে জেনো, বার বৎসর তুমি ভোগ করেছ, এবার আমার পালা।"

অধিক কথায় মীমাংসা হইবে না কেবল কথাই বাড়িয়া চলিবে বুঝিয়া পিতা পুত্রের কাছে হার মানিয়া স্থানত্যাগ করিল। দশ জনে অময়কে বুঝাইতে গিয়া তাড়া খাইল। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া অময় উত্তর দিল, "এক কালে বাপ ছিল হয়ত, তার কি? গেল জন্মে আমাদের কে-কে ছিল কে কি ছিল বলে কি এ জন্মে ফকির হ'য়ে বসে থাকব! ও সব চাল সন্ন্যাসীর হ'তে পারে, আমাদের সংসারীর নয়।"

দলের মধ্যে কে একজন বলিল, "তবু জন্মদাতা ত?"

অময় ভ্রুভঙ্গী করিয়া একটা শ্লীলতা বিহীন ভাষা উচ্চারণ করিয়া কহিল, "ওর ওপর মায়া আমি করব কেন? গরু ছাগলের মত যারা আমায় বেচে খেয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে আছে, থেপেছ। সামান্য ক'টা টাকার লোভ সামলাতে পারে নি যারা, তারা আবার মানুষ! কেন সে টাকা কি আমি দিতে পারতুম না। দ্বিগুণ দিতুম, দশগুণ দিতুম, সে অপেক্ষা করেছে কি? কেন দেব, কি দায়!"

স্বামী ও অন্যান্য প্রতিবেশীর মুখে লতা সবই শুনিল, কিন্তু মুখের ভাব সে এতটুকু বিকৃতি করিল না। বরং বেশ প্রফুল্ল মুখেই কথাগুলা হজম করিয়া, সে সমবয়সী বিধুর মার সহিত রঙ্গ রসে মাতিয়া উঠিল।

পাঁচ

তুমি কি এমনি ক'রেই আমায় ফাঁকি দেবে লতা?"

রোগ-পাণ্ডুর মুখে একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল, লতা মাথা তুলিয়া বলিল, "শুনেছ আজ বৌমা এবাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, তাঁর যা কিছু সব দিয়ে দিয়েছি!"

"বেশ করেছ! ওগুলো যেন কণ্টক হয়েছিল, রাখতেও পারি না, খরচ করতেও বুকে বাজে, তার চেয়ে যাদের জিনিষ তাদের হাতে তুলে দেওয়াই ভাল হ'য়েছে।"

লতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা বটে!"

জগত প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বৌমা কিছু বললেন না! আপত্তি করলেন না নিতে?"

"করলে বই কি গো, বললে কি জানো, এ আমার দাবীর জিনিষ, আমাকে দিয়েই ভালই করেছেন মা, কিন্তু এতদিনে তার সুদ বলেও ত কিছু পাওনা হয়েছে, তার কি ব্যবস্থা করছেন বলুন ত?

"তা মা আমার ন্যায্য কথাই বলেছেন লতা, সত্যিই ত সুদ বলে ত একটা কিছু তাঁর পাওনা হ'তে পারে—দিতেই হবে।"

"সে হিসেবী মেয়ের কাছে কি দিতেই হবে বলে রেখেই আছে, আদায় ক'রে নিয়ে তবে সে উঠেছে!"

বিস্ময় ভরে জগত বলিল, "আদায় করে উঠেছে? কোথায় পেলে তুমি টাকা, কম করেও আজ বিশ বছরের হিসেবই যা…"

লতা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "ও সব হিসাবের ...র দিয়েও বেটী যায় নি। তোমার খাওয়া ...তটা পড়েছিল, পপ্ করে বসে পড়ে বল্লে কি ...নো, আমার সুদ হবে এঁর পাতের প্রসাদ! ...ত বল্লুম, ছাড়লে না, জোর করে হাড়ি থেকে ...ব কেড়ে কুড়ে খেয়ে তবে উঠেছে..."

জগতের চোখ দু'টী অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে ...ছল। লতার বুকের ভিতরও কিসের আলোড়ন ...রু হইয়াছে। সে প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে সহসা ...লিয়া উঠিল, "বৌমার কথা মনে হ'লে অমরের ...দাব আর মনেই থাকে না। বল, ওর দেওয়া ...অপমান তুমি ভুল্তে পেরেছ?

স্বামী চঞ্চল হইয়া বলিল, "অপমান, কৈ, ...কসের?"

লতা স্বামীর হাতের উপর নিজের তপ্তহস্ত ...রাখিয়া বলিল, "কেন হাটের—অস্বীকার করে ...মিছে ভোলাবার চেষ্টা কর না। আমি জানি, ...তুমি ভুল্তে পারনি, আর জানি বলেই পুত্রের অকল্যাণ ভয়ে দিন-রাত জলে জলে দগ্ধ হচ্ছি।"

জগত ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে এত ...দিন তুমি অভিনয় করেই এসেছ, প্রাণ ধরে দানের ...মর্য্যাদা রাখতে পারনি?"

লতা কথা কহিল না, দুইহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিল। খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। সহসা মুখ খুলিয়া লতা বলিল, "তুমি আমার গুরু, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। প্রাণ দিয়ে তাকে এ প্রাণ থেকে তফাৎ করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। যত দূরে ঠেলে দিয়েছি তত সে আমার বুক জুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে!"

"কিন্তু কাজটা কি ভাল করেছ লতা, একে ...কি দান বলে?"

"জানি, তুমি এ কথা বলবে, কিন্তু আমি যে মা!"

হঠাৎ ঝড়ের মত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অময় বলিল, "এমন করে অপমান করবার মানে!"

লতার মুখ কঠোর হইয়া উঠিল। জগৎ-জ্যোতির মুখে কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। পত্নীকে নিবৃত্ত করিয়া হাসিয়া বলিল, "মানে ধরেই ত আর সব কাজ হয় না খোকন, কি করেছি বল তবে ত বুঝব?"

লতা স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, তুমি যে এত মহৎ আমি জানতুম না।

অমিয়র কঠোর কণ্ঠ কঠোরতর হইয়া উচ্চারণ করিল, "তোমাদের এসব অভিনয়ে ...রে ভুলতে পারে, কিন্তু আমি নই। মহত্বের মুখোস পরে কত ফন্দি-ফিকির নিয়ে ঘুরছ, অন্যের কাছে অপ্রকাশ থাকলেও আমার কাছে তা' দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট,—হাতিডাঙ্গার জমির ভাগ এত সহজে পাবে না, ওটা আমার বাবার রোজ-গারের টাকার কেনা, আর ময়নাবুড়র খালের অংশ পেটের দায়ে যা ভগবতী দারগাকে বিক্রি করেছ, সেটাও তোমার পৈত্রিক ত নয়ই, একান্নবর্ত্তী সংসার হ'লেও তুমি যে একটা পয়সা তাতে দাওনি তার খুব দামী প্রমাণ আমার হাতে আছে। সে দায়ে বাস্তুভিটে এখন আমার, জানান দিয়ে যাচ্ছি; সাতদিনের মধ্যে এককাপড়ে এ সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, নইলে জোর ক'রে বের করে দিতে আমি পিছুব না।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে যেমন ভাবে আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই হনহন্ করিয়া চলিয়া গেল। লতা স্বামীর দিকে চাহিতে পারিল না, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। হাস্যোজ্জ্বলকণ্ঠে জগতে বলিল, "ছি! ব্যথা পেলে লতা! ছেলের এইটুকু অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না?"

ধরা গলায় লতা বলিল, "না।"

ছয়

অময়ের আদালতের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইল না. জগৎজ্যোতি স্বেচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া পল্লী বৃদ্ধ রতন ঠাকুরদার দেওয়া একটুকরা ফালি জমিতে কোন প্রকারে মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া লইল।

তারপর মাস কয়েক পরের কথা। লতা মুড়ি ভাজে, গরম ফুলুরী বেগুনী ইত্যাদি প্রস্তত করিয়া ধামা বোঝাই করিয়া দেয়, এক ক্রোশ দূরে রেল ষ্টেশনে ছোট ছোট দু'টি ছেলে তাই ফিরিয়া আসে, আজ মাস পাঁচেক হইল, স্বামী চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় গিয়াছে, তার আর কোন উদ্দেশ নাই।

লতার কোলের দু'টি ছেলে যেমন সুন্দর, তেমনই মিষ্টভাষী, দেখিলেই মায়া হয়। যাত্রীদের প্রয়োজন না থাকিলেও কাছে ডাকে। দু-চার পয়সার জিনিষ কিনিয়া লয়। পল্লীতে কেবল তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া নৈশ বিদ্যালয় গড়িয়া তিন উৎসাহী যুবক শিক্ষকতা করে। বিশেষ ভাবে তাঁদের দু'টী ভায়ের যত্ন লয়। পাড়ার অনেকে হয়ত অযাচিত ভাবে অনেক কিছু দান করিতে চায়, কিন্তু লতা তা পছন্দ করে না, তাই দুইভাইকে ডাকিয়া গাছের কলা, পুকুরের মাছ তারা বাড়ীতে ধরিয়া বসাইয়া খাওয়ায়!

সেদিন দুই ভাইরে মিত্রদের বাগানের আনারস আর পেয়ারা বাজারে বিক্রয় করিতে চলিয়াছিল: ক্ষ্যাপা গরু ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে উভয় দিকে হঠাৎ একটা ফেলিয়া দিয়া পলাইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানা চলন্ত মোটর ছুটিয়া আসিতে আসিতে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। পথের ভিড় ভেদ করিয়া যাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য।

অময় রাগিয়া চাবুক হাতে বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল, "এই হটো!

ভিড়ের ভিতর হইতে কে একজন বলিল, "আহা, এরই ভাই!"

নবাগত অন্যজন বিস্ময় ঘেরা নয়ন তুলিয়া বলিল, "তবে এ গুলা মাথায় কেন?"

অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটিল, "আজকালকার ভাইদের দাদা দেখবে কেন!"

এত কেনর উত্তর শুনিবার ধৈর্য্য অময়ের ছিল না, সে দ্রুত এই অপমানের উৎপত্তিস্থল ভাই দুটিতে সাজা দিতে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রেবা গাড়ীতেই ছিল, ছুটিয়া আসিয়া বড়টিকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি একে নিচ্ছি, তুমি ছোট ঠাকুরপোকে নাও, গাড়ী ফেরাও, মাগো, তুমি কি, তবু অমনি করে দাঁড়িয়ে রইলে— সোফার, ছুটে ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে এস।"

সাত

লতা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া বসিয়াছিল। রেবা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল, "বড় ঠাকুর পোর এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে মা, ছোট ঠাকুর পো বার বার তোমায় দেখ্তে চাচ্ছে। আমার জন্যে কোনদিন অনুরোধ করতে সাহস করিনি, কিন্তু এ সময়ও একবার ও বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবে না মা, এখন অভিমান নিয়ে থাকবে?"

একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া লতা বধুর মুখের দিকে জিজ্ঞেসু-নয়নে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "এবার আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বড় প্রয়োজন না, মা? বল, এ প্রাণে এখন অনেক সইবে,আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি।"

রেবা মাথা দোলাইয়া বলিল, "অমন অলুক্ষুণে কথা মনে এনো না মা, সত্যিই ঠাকুরপোরা ভাল হ'য়েছে, কথা কইছে, নইলে আমি উঠে আসি।"

রতন ঠাকুর দা ঠিক এই সময় প্রফুল্লমুখে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "সত্যি লতা, আর অভিমান সাজে না, তোমার এ বৌটী কম নয়, অক্লান্ত সেবা-যত্নে মরণের হাত থেকে শুধুই যে তোমার দু'টী ছেলেকে টেনে এনেছ, তা নয়, আর একটী অবুঝ অবাধ্য পাগল ছেলেকে ভুলিয়ে তোমার কোলে টেনে এনেছে, লজ্জায় বাড়ী ঢুকতে পাচ্ছে না, ওই দাঁদাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে এলুম বুক বেয়ে তার অনুতাপের ঢল নেমে চলেছে। এগিয়ে না দিদি, কোলে তুলে নিগে।"

শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ একত্র গিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল। বধূ হাসিয়া বলিল, "সত্যিই উনি অনুতপ্ত হয়েছেন মা, কিন্তু আমার কথায় নয়, ঠাকুরপোদের মুখে শুনে, তুমি আজো না কি অর্দ্ধেক রাত্রে ওঁর ঘরের দিকে চেয়ে চোখের জলে ভাসো। ষষ্টির দিনে..."

থাম বাপু, বাজে বকিস নি, চল আগে দেখে আসি ওদের।" বলিয়া লতা বধূর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

মাকে দেখিয়া সমীর বলিল, "মিত্তিরদের সব ফল পাকুড় বাজারে ফেলে এসেছি মা, আনবার ফুরসৎ হয় নি।"

অময় চঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "তোর বৌদি তাদের সব দাম চুকিয়ে দিয়েছে ভাই, সে কথা আর ভাবিস নি।—না, অমন ক'রে তোরা আর এখানে সেখানে যেতে পাবি নি। এতে তোদের দাদার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।"

ঠাকুর দা জগতজ্যোতিকে সঙ্গে লইয়া ঠিক সেই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ঠিকই বলেছিস ভাই, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হ'লে রক্তের টানকে উপেক্ষা করা কোন মতেই চলবে না। কই গো দিদি, আর কাকে ধরে এনেছি দেখ, বীরপুরুষ চাকরী যোগাড় করে তবে বাড়ী ফিরেছেন। আমার এবার কিন্তু অর্দ্ধেক রাজ্য আর এক রাজকন্যা চাই নইলে ছাড়ছি না।"

গল্পের টুকরা

শ্রীমাণিক বন্দোপাধ্যায়

গাঁদা ফুলের বাগান

আমার একটা গাঁদা ফুলের বাগান আছে। রোজ গাদা গাদা ফুল ফোটে। ছোট বড় গোল চ্যাপটা লাল হলদে কত রকমের ফুল যে ফোটে তার সংখ্যা নেই। শীতের সকালে যখন অস্পষ্ট কুয়াশা কেটে সোণালী রোদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা হয় তখন আমি বাগানে যাই। চেয়ে দেখি, আর তারিফ করি। প্রত্যেকটি ফুলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আমাকে সত্যি অবাক করে দেয়। একটি গাছের একই শাখায় যে কটি ফুল ফুটেছে তাদের মধ্যেও যেন পার্থক্য আছে, যদি কথা বলতে পারত আমায় যেন তারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলত, যদি কাঁদতে জানত ওদের যে হাসি আমি দেখতে পাচ্ছি সেই হাসির মত ওদের কান্নার সুরে সুরেও যেন মিল থাকত না।

তারপর, শীত ফুরিয়ে যাবার আগেই, এক মেয়ে স্কুলের হেডমিষ্ট্রিসের কাছথেকে নিমন্ত্রণ পেলাম। মেয়েদের সামনে এক বক্তৃতা দিতে হবে।

গেলাম।

হলে ঢুকে দেখি মেয়েরা সারি সারি বসে আছে। আমি একটু চমকে উঠলাম। আমার মনে হল, আমার গাঁদা ফুলের বাগানটাকে কে যেন তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। গাঁদা ফুলেদের কাছে আমি কি বক্তৃতা দেব? আমার প্রত্যেকটি বাক্যের এতগুলি স্বতন্ত্র মানে কি করে সম্ভব হবে?

তফাৎ

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে বাড়ী ফিরতেই পাশে ঘর থেকে গিন্নির গলা পেলাম।

'কে?' বল্লাম 'আমি।'

'ও, আমি ভাবলাম—' বলতে বলতে আমা জামার বোতাম আর জুতোর ফিতে খোলা সাহায্য করতে এ ঘরে এলেন।

প্রশ্ন করলাম 'তুমি কি ভাবলে?'

'কিছুনা। কি ভাবব?'

বড় ছেলেটা আমার সঙ্গেই বাড়ীর বা হয়েছিল। খেলার মাঠে যাবে। তারও ফেরা সময় হয়েছে বটে!

দেরী করে ফেরার জন্য গিন্নি ছেলেকে এক বকলেন। বকুনি অতি সামান্যই, কিন্তু তাতে ছেলে আমার ভাতের ওপর রাগ করে বসল আমি ডাকলাম, গিন্নি তোষামোদ করলেন ছোট মেয়েটা দাদার হাত ধরে কত টানল কিন্তু ছেলের রাগ গেল না।

গিন্নি বল্লেন 'খাবি না তুই?'

'না না না। কতবার বলব?'

বল্লাম 'ভাখো—'

'দেখেছি। দেখে দেখে বুড়ো হয়ে গেলাম এখনো আমার দেখা বাকী আছে নাকি? মরতে বলো নাকি তুমি আমায়? অমন যদি কর তো, সত্যি বলছি, আমি গলায় দড়ি দেব।'

থতমত খেয়ে আমি চুপ করলাম। গিন্নিকে কি বলার জন্য মুখ খুলেছিলাম তাও আর মনে রইল না।

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ

আমার মনে হয়েছিল, বাড়ী ফিরে কোন না কোন সময়ে বাবা আমার বেড়াতে যাবার কথা তুলবেন এবং যে-স্ত্রীলোকটীর বাড়ীর মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর কথাও বলবেন। হয়ত আমাকে বকুনি দিতেও ছাড়বেন না!

কিন্তু তিনি যাই বলুন, মনীষা দেবীকে আমার খুব ভাল লেগেছে! মনে হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত ক'রে, আমার জীবন পুরনো পথ ছেড়ে যেন কোন নূতন তীর্থ-পথের সন্ধান পেয়েছে! এত অল্পসময়ের মধ্যে জীবনে আর কেউ-ই আমায় এতখানি আকৃষ্ট করতে পারেন নি, এমন কি—হাঁ, এমন কি নিশীথবাবুও না।

মনীষা দেবীর কথা সত্যই মনে হ'তে লাগলো, তাই তাঁর প্রতি আমার মন কী এক অনির্ব্বচনীয় রসে অবসিক্ত হ'য়ে পড়তে লাগলো! রমা-পিসির কথাগুলো একেবারে কল্পিত। কোন ভিত্তি নেই তাদের! মনীষা দেবীকে তিনি বা তাঁর দলের মেয়েরা জানে না! তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা যে ভাবতেই পারা যায় না!

তাঁর স্বেচ্ছাধীন জীবনের সহজ সংযত গতি, তাঁর নিরালা ঘরের পবিত্র প্রাণময় বাতাস, তাঁর সুরুচি এবং শিক্ষার অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্য—এই সব কথা যতই মনে পড়তে লাগলো ততই আমার মন শ্রদ্ধায় প্রীতিতে তাঁর প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগলো? জীবনে এমন কারুকে দেখি নি। বোর্ডিংএর মিস্‌ট্রেসদের দেখেছি, ফিরিঙ্গী স্কুলের সিস্‌টারদের দেখেছি; এবং আরও কত শিক্ষিতা স্বাধীনা মহিলার সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু মনীষা দেবীর সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না! তাঁর সঙ্গে আরও নিবিড় ক'রে আমার পরিচয় করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে দিন তাঁর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবার যে মূর্ত্তি দেখেছি তাতে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা তো দূরের কথা, তাঁর বাড়ীতে গিছলাম বলেই বাবা আমার উপর ভীষণ রেগে উঠেছেন এবং তার জন্যে হয়ত আজ আমার তিরস্কার শোনার পালা শীঘ্র শেষ হতে চাইবে না!

কিন্তু না। এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম। পরে যখন বাবার সঙ্গে দেখা হল, তখন তিনি আমার বিকাল-বেলার অভিসারের জন্য কোন কথাই বল্লেন না! সে ঘটনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। বিকালে যে আমি কোথাও গিছলাম, তা পর্য্যন্ত তিনি যেন জানেন না। সমস্তক্ষণ অন্য কথায় ব্যাপৃত রইলেন! মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

রাত্রে আমরা সকলে এক সঙ্গে বসে আহার করি! সে সময়েও বাবার মুখ থেকে কোন কথা শুনতে পেলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। দ্বার বন্ধ করার শব্দ শুনে বুঝলাম—আজ তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া শোনায় মগ্ন থাকবেন। আমরা দুই বোনে নিজেদের ঘরে চলে গেলাম। অন্য দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে ব'সে বাবার কাছে নামা

বিষয়ের যে-সব গল্প শুনি, আজ আর তা শোনা হ'ল না।

শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অতসী ঘুমিয়ে পড়ল। আমার দু'চোখে ঘুম নেই! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, পাশে আমার অতসী ঘুমে একেবারে বিলীন হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে ঘুমের দেবতা যেন চিরদিনের মতো আড়ি করে চলে গেছে!

বাইরে খোলা জানালার নীচে আলোর রেখা এসে পড়েছে। লাইব্রেরী ঘরে আলো জ্বলছে! বাবা কি আজ আর ঘুমোতে যাবেন না?

সকাল বেলারদিকে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে পড়লাম। অতসী আমার আগে উঠে কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে! ঘর থেকে বেরিয়ে বুধুয়াকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবা কোথায়?

বুধুয়া জানালে, কর্ত্তা আজ খুব ভোরে উঠেছেন। বারান্দায় ব'সে তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন!

মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বাবার কাছে এলাম! দেখলাম, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন তাঁর মুখে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে! চিন্তার রেখায় তাঁর কপাল কুঞ্চিত!

অতসীর বদলে সেদিন আমিই তাঁর চা ঢেলে দিলাম। গম্ভীরমুখে তিনি আমার হাত থেকে চায়ের বাটিটা তুলে নিলেন।

অতসী বাগানে ফুল তুলছিল। ফিরে এসে বল্লে—বাবা, একখানা গাড়ী গেল, দেখেছো?

বাবা ঘাড় নেড়ে জানালেন—না। তিনি দেখেন নি।

আমি বল্লাম—দেবদারু গাছগুলোর ওধার দিয়ে একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি গেল বটে! তাতে কি?

অতসী বল্লে—ঐ গাড়ীতে করে লালবাড়ীর স্ত্রীলোকটী গেলেন;—কি নাম তার, মনীষা দেবী না কি,—তিনিই। সঙ্গে অনেক মোট-ঘাট রয়েছে। খুব সম্ভব কলকাতা কিম্বা অন্য কোথাও যাচ্ছেন।

অতসীর কথা শুনে বাবা এবং আমি একসঙ্গে চমকে উঠলাম!

অতসী বলতে লাগল—একেবারে চিরদিনের মতো চলে গেলেই বাঁচতাম। লোকে তার সম্বন্ধে যে সব কথা বলে তার এক কনাও যদি সত্যি হয়, তা'হলে—

নিমেষে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলাম। এমন সুন্দর প্রাতঃকালটি অতসীর কথার ঝাঁঝে যেন এক মুহূর্ত্তে রুক্ষ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তাকে থামিয়ে বল্লাম—লোকের কথায় সব সময় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়! অনেক সময়ই অনেক মিথ্যা কথা তারা ছড়িয়ে বেড়ায়। লোকের কথায় কান দিস না। কাল আমি মনীষা দেবীর বাড়ী গিছলাম এবং অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। তাকে দেখে আমার খুব ভাল বলে মনে হয়েছে! খুব শিক্ষিতা এবং উন্নতমনা মহিলা!

বাবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন; আমার কথায় তার মুখে কি ভাব ফুটে উঠল তা দেখতে পেলাম না; কিন্তু অতসীর মুখে যেন রাজ্যের বিস্ময় এসে জড়ো হয়েছে। দুই ভুরু আকাশের পানে তুলে ধরে বল্লে—সে কি দিদি! তুমি কি বলতে চাও, সত্যি সত্যিই কাল তুমি তার বাড়ী গিছলে।

মাথা নেড়ে জবাব দিলাম—কাল বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম। তিনি আমায় সেই সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে আমাকে যত্ন ক'রে কত কি খাওয়ালেন। ভারী ভালো লেগেছে তাঁকে আমার!

অতসী বল্লে—কিন্তু দিদি, রমা-পিসি তার

সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন, তা তো তুমি জানো।

কি জানি কেন, আজ এমনি ক'রে মনীষা দেবীর পক্ষ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে আমার মন ক্ষণে ক্ষণে সাহসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে। বল্‌লাম—জানি! কিন্তু অন্যের কথায় ভর করে একজনকে মন্দ ভাবা আমি উচিত মনে করি না।

প্রতিক্ষণেই মনে হচ্ছিল, এইবার বাবার কাছ থেকে কঠিন তিরস্কার ছুটে আসবে। বাবার সামনে ব'সে এমন উদ্ধতভাবে জীবনে কখনো কথা বলি নি! মেয়েদের এমনি ধরণের ঔদ্ধত্য তার একেবারে অসহ্য। কিন্তু বাবা যেমন ছিলেন, তেমনি রইলেন। অতসী বল্লে—কিন্তু দিদি এ তুমি নিশ্চয় জানো যে, যিনি বাতাসে পাতা নড়ে না। রমা-পিসি ছাড়াও আরও অনেকে বলেছে। তাদের প্রত্যেকের কথাই মিথ্যে হতে পারে না। এসব জানা সত্ত্বেও তার সঙ্গে আলাপ করা, তোমার মোটেই উচিত হয় নি।

কথায় কথায় আমি তখন বিষম উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছি! মনে হচ্ছে যেন, অতসী এবং বাবার পিছনে বিশ্বশুদ্ধ লোক মনীষা দেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; আর তার পক্ষে আমি—একা! কিন্তু তাঁর পক্ষ নিয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে ভয় করছে না মোটেই! অফুরন্ত সাহস যেন মনের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে—ভয় নেই! ভয় নেই!! বল্লাম—তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমার উচিত কি অনুচিত, সে বিচার করবার ভার আমি পরের হাতে দিতে চাইনে! আজ শুধু তোকে এইটুকু ব'লে রাখি অতসী, জগতের সমস্ত লোক যদি এসে মনীষা দেবীর বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলেও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা একতিলও কম পড়বে না। আশা করি, এর পরেও আর তোমরা ও-কথা নিয়ে বাদানুবাদ করবে না!

আমার কথা শুনে অতসী বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে গেল! স্বভাবত আমি এমন উত্তেজিত হ'য়ে কথাবার্ত্তা বলিনে। আজ সহসা আমার মুখ থেকে এমন কঠিন কথা শুনে তার বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেল! দিদির কাছ থেকে এমন ঘা দেওয়া কথা সে কখনো শোনে নি। ধীরে ধীরে সে সেখান থেকে চলে গেল।

সমস্তক্ষণ বাবা একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না! অতসীর সঙ্গে কথা কইবার ছলে আমি যে বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মনীষা দেবীর সপক্ষে বিবাদ করছিলাম, তা বুঝতে তার বাকী রইল না! কিন্তু তাঁর মুখ থেকে প্রতিবাদের একটি কথাও শোনা গেল না! আমি ইচ্ছা করছিলাম, বাবা আমায় তিরস্কার করুণ; মনীষা দেবীর সপক্ষে হোক, বিপক্ষে হোক তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করুণ; মনীষা দেবী অতিশয় মন্দ স্ত্রীলোক, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলুন—কিন্তু তিনি যে সেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে ব'সে রইলেন, আমাদের কথা বার্ত্তার মধ্যে একবারের জন্যেও আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন না!

অতসী চলে যাবার পর আমি ধীরে ধীরে বাবার কাছে এগিয়ে গেলাম! বল্লাম—আর একটু চা ঢেলে দেবো বাবা?

এ যেন নিতান্তই তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যই প্রশ্ন করলাম। কারণ, বাবা যে কখনো এক কাপের বেশী চা খান না, তা আমরা জানি।

বাবা অন্যমনস্ক হ'য়ে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আমার কথায় চকিত হ'য়ে, মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—না, মা, আর নয়!

তার কণ্ঠস্বর কি করুণ, আর কি কোমল! মনে মনে বিস্মিত হয়ে বল্লাম—আজ বেড়াতে বেরুবে না, বাবা?

—না মা, আজ আর বেরুবো না! কতক-গুলো চিঠি পত্র লিখতে হবে!

এমন সময়ে বুধুয়া এসে সেদিনের ডাক পৌঁছে দিয়ে গেল! একখানা চিঠি আমার নামে; দেখেই বুঝলাম—বোর্ডিংএর বন্ধু বিরজার চিঠি!

অন্য পত্রখানি, বাবার নামে! প্রকাণ্ড বড় নীলাভ খাম! একধারে তার পত্র প্রেরকের নামের আদ্যাক্ষর দুর্বোধ্য রেখায় মুদ্রিত!

সেই চিঠিখানি বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লাম—তোমার চিঠি, বাবা! বোম্বাই থেকে এসেছে!

বাবা চম্‌কে উঠ্‌লেন:

—বোম্বাই থেকে?

হ্যাঁ। এই যে স্পষ্ট ছাপ রয়েছে!

পত্রখানা আমার হাত থেকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে লাগলেন! চিঠিখানি পড়তে পড়তে তাঁর মুখের যে ভাবান্তর ঘটল, তা অবর্ণনীয়! বিস্মিত হ'য়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিলেন। তারপর দু'একবার বারান্দার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত পায়চারী ক'রে বল্লেন —কেতকী! অতসীকে ডাক!

অতসীকে ডেকে আনলাম।

বাবা বল্লেন—অতসী, কুমুদ বাবুর সঙ্গে আজ বিকেলে দেখা ক'রে বোলো, আমাদের মন্দিরের কাজ আরম্ভ করতে একটু দেরী হবে। আমি আজ বিকেলে কলকাতা যাচ্ছি!

—আজই বিকেলে?

—হ্যাঁ। আজই বিকেলে! বিশেষ কাজ আছে। না, তোমরা যা মনে করছ তা নয়—আমাদের সমিতির কোন কাজ নয়—আমার নিজের কাজ!

অতসী বিশেষ বিস্মিত হ'ল না। কিন্তু বিস্ময়ে দুশ্চিন্তায় আমি যেন বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে চিঠি প'ড়ে বাবা অমন ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, এখন সেই চিঠির নির্দ্দেশ অনুসারেই তিনি যে হঠাৎ কলিকাতা যাওয়া মনস্থ করেছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

বাবা বল্লেন—ফিরে আসতে আমার সপ্তাহ-খানেকের বেশী লাগবে না। সুতরাং এ-কদিনে এখানকার কাজের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। কেটি! আমার হাত-ব্যাগটা গুছিয়ে দিও মা! আমি স্নান করতে চল্‌লাম!

এই ব'লে বাবা ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে প্রস্থান করলেন! তিনি যে আজ অপরাহ্নেই কলিকাতা যাত্রা করবেন—সে বিষয়ে আর কোন সংশয় রৈল না। মুখ দেখে বুঝলাম, তিনি স্থির সংকল্প!

গাড়ীতে উঠে আমাদের দুই বোনকে আবশ্যকীয় উপদেশাদি প্রদান ক'রে বাবা আমার দিকে, বিশেষ ক'রে যেন আমারই দিকে তাকিয়ে বল্লেন—কোন চিন্তা কোরো না! আমি আগামী শুক্রবারের ভিতর নিশ্চয়ই ফিরবো; আর এ-ক'দিন এমন কোন কাজ কোরো না যার দ্বারা অতসী কোন অসুবিধায় পড়ে! যেখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়া-গুলো একটু বন্ধ রেখো!

বাবার কথায় কোনরূপ উষ্মা ছিল না; বরং তার মধ্যে যেন অনুরোধের আভাস ধ্বনিত হচ্ছিল! তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে বল্লাম—আমি কি তোমার এমনি অবাধ্য মেয়ে বাবা!

বাবা আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে অস্ফুটে আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে

কিছুক্ষণ আমরা পথের উপর স্তব্ধ হ'

দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর গাড়ীর শব্দ যখন বাতাসে মিলিয়ে গেল, তখন দুই বোনে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ীর দিকে ফিরলাম!

— বাবা হঠাৎ কেন কলকাতা গেলেন, তুমি কিছু জানো দিদি?

বল্লাম—না ভাই। মোটেই জানি নে! আমায় কিছুই বলেন নি।

—কিছু বলেন নি? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল—তুমি হয়ত জানো!

অতসীকে আর আমাকে বাবা যে আলাদা ভাবে দেখেন তা অতসীও জানে, আমিও জানি, তাই অতসীর কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম না। বল্লাম—না। আমাকে কোন কথা বলেন নি। কিন্তু তোর কাছে শুনেছিলাম তো যে, বাহিরে থাকবার সময় বাবা প্রায়ই এই রকম কিছু দিনের জন্য হঠাৎ কলকাতা চলে যান! সেবার যখন দার্জ্জিলিঙে ছিলি তখনো তো তোর চিঠিতে শুনতাম, বাবা মাঝে মাঝে কলকাতা চলে আসতেন!

—হ্যাঁ। তা আসতেন বটে! কিন্তু কেন যে আসতেন, তা কিছুই বুঝতাম না! সমিতির কাজে যে আসতেন না—তা ঠিক; কেন না, তিনি কলকাতায় যাবার পর সেখান থেকে চিঠি আসতো—আপনার সঙ্গে দেখা করতে অমুক লোককে পাঠানো হল। অমুক বিষয়ে কি হ'ল পত্রপাঠ জানাবেন; এমনি কত কি!

বললাম—অর্থাৎ তুই বলতে চাস্, কলকাতায় এসে সমিতির কর্ত্তাদের সঙ্গে বাবা দেখা করতেন না। তিনি যে কলকাতায় এসেছেন তা তারা জানতেও পারত না—এই তো?

অতসী কোন উত্তর দিলে না। বল্লাম—দ্যাখ, মানুষের জীবনে কত কাজ থাকতে পারে? তার সব কথা কি জানা যায়? ও নিয়ে মাথা ঘামাস নে! আয়; আমি একটা নতুন গান শিখেছি, তোকে শোনাই গে!

বাড়ীর ভিতর এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুজনে বসেছি, এমন সময় বুধুয়া এসে বল্লে দিদিমনি! একজন বাবু এসেছে! কর্ত্তাবাবুকে ডাক্‌ছেন!

বল্লাম—বাবু! কে বাবু? বলতে বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম!

অতসী বল্লে—কুমুদবাবু বোধ হয়!

এই বলে সে-ও এগিয়ে এলো!

বারান্দায় গিয়ে দেখলাম—নীচে লাল-কাঁকর বিছানো পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, নিশীথ বাবু!

আমাদের দেখে তিনি অতসীর পানে তাকিয়ে বল্লেন—জগদীশ বাবু বাড়ী আছেন?

অতসী কোন উত্তর দেবার আগেই বল্লাম—নমস্কার, মিষ্টার সেন! ভাল আছেন?

তিনি এইবার মুখ ফিরিয়ে আমার পানে তাকালেন বুঝলাম—ঈষৎ বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন!

—নমস্কার! নমস্কার! আপনার বাবার সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে। দয়া ক'রে যদি একটু খবর দ্যান—

মৃদু হেসে বল্লাম—বাবা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আনন্দিত হতেন; কিন্তু তিনি বাড়ী নেই!

—বাড়ী নেই! বল্‌তে পারেন, কখন ফিরবেন? আমি তাহলে সেই সময় আসবো!

—ঠিক তো বলতে পারি নে! তবে আশা করছি আগামী শুক্রবার তিনি ফিরবেন; কিন্তু কোন সময় ফিরবেন তা বলতে পারি নে!

নিশীথবাবু আমার কথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—আসছে শুক্রবার ফিরবেন!! এখান থেকে দূরে কোথাও গেছেন না কি?

বল্লাম—হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে, এখনো বোধ হয় দশ মিনিটও হয় নি,—তিনি ক'লকাতা

চলে গেলেন। ফিরে এলে তাঁকে কি বলতে হবে ?

নিশিথবাবু আমার কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে না না কাগজ-পত্রের সঙ্গে একখানি টাইম-টেবল বার করে সেখানি খুলে দেখলেন। তারপর সেখানি পকেটে রেখে বললেন—আচ্ছা, তাহলে চল্‌লাম। নমস্কার!

লম্বা পা ফেলে তিনি নিমিষের মধ্যে গেটের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পিছন থেকে ডাক দিলাম - নিশীথবাবু!

আমার আহ্বান শুনে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। পিছন ফিরে আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বললেন—মাপ করবেন। আমার তাড়াতাড়ি আছে।

বল্‌লাম—তাই নাকি! আপনার দেরী করিয়ে দিলাম ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত। পকেট থেকে টাইমটেবিল বার করবার সময় একখানা পত্র আপনার নজর এড়িয়ে প'ড়ে গেছে। সে-কথা আপনাকে জানাবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি!

ক্ষিপ্রপদে নিশীথবাবু আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন :—

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে! কৈ; সেখানা দিন।

এই ব'লে পত্রখানা নেবার জন্যে আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

এক পা পিছিয়ে এসে বল্‌লাম—পত্র বুঝি আমার কাছে? বেশ লোক আপনি! ঐ দেখুন; ঐ হোথায় প'ড়ে রয়েছে!

সেখানে চওড়া একখানা নীলাভ খাম মাটিতে পড়েছিল, সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

তিনি এগিয়ে গিয়ে সেখানি তুলে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আমিও কৌতূহল বশতঃ খামখানা লক্ষ্য ক'রে দেখলাম।

দেখলাম, যা মনে করে'ছিলাম তাই! বিস্ময়ে নিজের অনিচ্ছাসত্বেও মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল! নিশীথবাবু চকিতে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন - কি হল ?

—কিছু নয়? নমস্কার!

এই ব'লে পিছন ফিরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে এলাম।

নিশীথবাবু তখনো দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মুখের অস্পষ্ট উক্তি তাঁকে বিচলিত করেছে! পিছন থেকে বল্‌লেন - আমার মনে হ'ল যেন, আপনি কি একটা কথা আমার উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন। কি বল্‌লেন, তা কি জানতে পারি না?

বল্‌লাম—সে কিছুই নয়। কিন্তু আপনার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি আছে বলছিলেন, না?

এ-কথার পর নিশীথবাবু আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না। ধীরে ধীরে বাগান পার হয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

তিনি চলে যেতেই অতসী আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

—ওই বুঝি তোমার নিশীথবাবু! ভদ্রলোক কি রকমে যেন অদ্ভুত ধরণের,—না দিদি?

তার প্রশ্নের উত্তরে যা হয় একটা কিছু ব'লে তাকে নিরস্ত করলাম। আমার মন তখন অন্য এক চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে! যে পত্রখানি নিশীথবাবুর পকেট থেকে পড়ে গিছল, তার খাম এবং তার হস্তাক্ষর আমি আর একবার আজ সকালে দেখেছি! না, আমার ভুল হয় নি! সেই নীলাভ খাম, সেই হস্তাক্ষর খামের উপর প্রেরকের নামের সেই দুর্বোধ্য লেখা!

যে পত্র প্রেরকের কাছ থেকে বাবা আজ সকালে চিঠি পেয়ে কলিকাতা চলে গেলেন, নিশীথবাবুর চিঠিখানিও যে সেই পত্র প্রেরকের কাছ থেকেই এসেছে, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নেই।

(ক্রমশঃ)

প্রতিশোধ

(গল্প)

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

এদেশে তখন মুসলমান রাজত্ব। নবাধিকৃত রাজপুতনার সীমান্তে সম্রাট আকবরের সৈন্যগণ ঘাটি প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ওদিকে মহারাণা প্রতাপসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। রাজপুতগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও কার্যতঃ বিদ্রোহভাবাপন্ন ছিল এবং তাহাদের অন্তরের নিভৃতকন্দরে পরাধীনতার তীব্র দাবাগ্নি প্রজ্জলিত ছিল।

বলবন্ত সিংহ সাগ্রহে মুসলমান সৈন্যদলকে গৃহাঙ্গনে স্থান দিয়াছিল। মাসাধিক কাল যাবৎ তাহারা এখানে অবস্থান করিতেছিল এবং গিরিবর্ত্মে জঙ্গলে ও প্রান্তরে দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়া রাণা প্রতাপের হঠাৎ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। আশে পাশে কোথাও রাণার দুর্দ্ধর্ষ দলের চিহ্নও ছিল না। কিন্তু তাহা সত্বেও প্রতিরাত্রেই কয়েকজন মুসলমান সৈনিকের খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। রাত্রিকালে দুই তিনজন করিয়া সৈনিক সেই যে পাহারায় বহির্গত হইত আর প্রত্যাগমন করিত না।

এই সমস্ত হতভাগ্য সৈনিকগণকে পরদিবস প্রাতঃকালে প্রান্তরের একটি অগভীর খাদের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাহাদের অশ্বসকলও কর্ত্তিত অবস্থায় অনতিদূরে পড়িয়া থাকিত। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কাহাদের দ্বারা প্রত্যহই সংঘটিত হইত, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও তাহা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই।

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সম্রাট আকবরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি পুনরায় সশঙ্কিত হইলেন। সন্দেহক্রমে রাজপুতনা হইতে কতিপয় রাজপুতকে ধরিয়া আনিয়া কঠোর শাস্তিবিধান করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন প্রভাতে বলবন্ত সিংহকে পশুশালার নিকটে আহত অবস্থায় দেখা গেল। তাহার গণ্ডদেশের গভীর ক্ষতস্থান হইতে অবিরত রুধির নির্গত হইতেছিল। ক্ষতস্থান দর্শনে প্রতিয়মান হয়, কোন শানিত তরবারির আঘাতেই ক্ষত অমন গভীর হইয়াছে। বলবন্ত সিংহের ভবনের অনতিদূরে মুসলমান সৈনিকদ্বয়ের মৃতদেহ পড়িয়াছিল; সৈনিকদ্বয়ের একজনের হস্তে তখনও একখানি রুধিরাক্ত তরবারি আবদ্ধ।

মুসলমান সেনানায়ক বলবন্ত সিংহের ভবনেই সামরিক বিচারসভা গঠিত করিলেন। আহত বলবন্ত সিংহ আহুত হইল।

বলবন্ত সিংহ প্রৌঢ়ত্বের ধাপ পার হইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গঠন। অপলক দৃষ্টি বীরত্বব্যঞ্জক। রাজপুতদিগের মধ্যে সৎসাহসী ব্যক্তি বলিয়া বলবন্তের খ্যাতি ছিল।

বলবন্তকে সশস্ত্র সৈনিকগণ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি সাধারণ টেবিলের চারিধারে সেনানায়ক এবং তাঁহার কয়েকজন অধস্তন

কর্মচারী কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। সকলের দৃষ্টিই বলবন্তের দিকে নিবদ্ধ। সেনানায়ক গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, বলবন্ত। তোমাকে আমরা খুব সংলোক বলে জানতাম। রাণার সহিত তুমি যুদ্ধে যোগদান কর নাই, অধিকন্তু আমাদের সৈনিকদের তোমার গৃহে স্থান দিয়ে অনেক উপকার করেচ। কিন্তু আজ তোমার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগ উপস্থিত। তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে।—অধিকতর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, তোমার গণ্ডদেশে ঐ ক্ষতিচিহ্ন কিসের?

বলবন্ত নিরুত্তরে অবনত মস্তকে রহিল।

সেনানায়ক আবার কহিলেন, নীরব থাকাই কি তোমার অপরাধ প্রমাণ করছে না? কিন্তু তোমাকে উত্তর দিতেই হবে। শুনছ? তোমার গোশালার অনতিদূরে অবস্থিত মৃত সৈনিকদ্বয়ের হত্যাকারী কে?

শান্ত অথচ স্পষ্ট স্বরে বলবন্ত উত্তর করিল, আমি

সেনানায়ক চমকিয়া উঠিলেন। খানিক ক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি ক্রুর দৃষ্টিতে বলবন্তকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বলবন্তও ঋজু হইয়া স্থির দৃষ্টিতে সেনানায়কের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। অনতিদূরে বলবন্তের সমস্ত পরিবার, তাহার পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা ও নবাগত জামাতা স্তব্ধ নেত্রে দণ্ডায়মান। তাহাদের সকলের অন্তরে ঝড় বহিতেছিল।

সেনানায়ক কহিলেন, আচ্ছা, এই যে মাসাধিক কাল যাবত প্রায়ই সৈনিকগণকে হত্যা করা হচ্ছে, তুমি সেই হত্যাকারীদের চেন?

অবিচলিত চিত্তে বলবন্ত কহিল, আমিই তাদের হত্যা করেছি।

—তুমিই সবাইকে হত্যা করেছ?

—হ্যাঁ, আমিই সবাইকে হত্যা করেছি।

—তুমি একা?

—আমি একা।

—স্পষ্ট করে বল, কি উপায়ে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সাধন করেছ?

বলবন্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল।

সেনানায়ক কহিলেন, সমস্ত কথাই স্পষ্ট করে বলতে হবে। সাবধান! কিছু গোপন করো না।

বলবন্ত একবার করুণনেত্রে পশ্চাতে অবস্থিত পরিবারবর্গের দিকে তাকাইল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার সে কি যেন চিন্তা করিল, মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহার নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল।—

"তোমরা যখন প্রথম এসে আমার বাড়ীতে ওঠ, তখন থেকেই একটা ভীষণ দুরভিসন্ধি আমার মনে চিরজাগ্রত ছিল। একদিন সেই ভীষণ দুরভিসন্ধি সাধন করবার সুযোগ মিল্‌ল। সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদেরই একজন অশ্বারোহী সৈনিক অদূরবর্ত্তী প্রান্তরে নামাজ পড়ছিল। তক্ষুনি ঘর থেকে আমি ধারাল কাটারিখানা নিয়ে ছুটে এলাম। সৈনিক তখন আরাধনায় নিমগ্ন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পা' টিপে টিপে পিছন দিক দিয়ে অগ্রসর হলাম; একেবারে নিকটে গিয়ে সজোরে ঘাড়ের উপর এক কোপ বসিয়ে দিলাম। ব্যাস্! এক কোপেই গলা-শুদ্ধ মাথাটি দেহবিচ্ছিন্ন হয়ে সাম্‌নের দিকে ঝুপ্ করে পড়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু আর্ত্তনাদ করবার সুযোগও তাকে দেই নি। তার পর রক্ত! তাজা গরম রক্ত ফিনিক্ দিয়ে ঝরতে লাগ্‌ল। সিঁদুর গোলার মত লাল টকটকে রক্ত! শার্দ্দূল

সিংহের পুকুরে খোঁজ করলে, এখনও বোধ হয় তার মৃতদেহটা মাটীর নীচ থেকে বার' করা যায়। একটা খুন করেই আমার খুনের নেশা চড়ে গেল; আরও খুন করবার মতলব আঁটতে লাগলাম। সেই সৈনিকের সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ আমার গৃহে লুকিয়ে রাখলাম। তার তরোয়ালটি নিজের কাছে রেখে দিলাম।

বলবন্তের কপাল বাহিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। সে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নীরব রহিল। সামরিক বিচার সভার সভ্যবৃন্দ একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তারপর বলবন্ত যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই :—

ঐ হত্যার পর তাহার রক্তপিপাসা কেবলই বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্তও নিবারিত হয় নাই। সর্ব্বদাই সে কেবল 'মুসলমান হত্যার' কল্পনা করিত। আকবরকে সে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ঘৃণা করে। এই আকবরই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, রাজপুত ধমনীতে বিজাতীয় রক্ত প্রবাহিত করাইয়াছে। কোথাকার কোন বিজাতি, তাহারা আসিয়া রাজপুতানা দখল করিল! কি স্পর্দ্ধা! স্বদেশ প্রেরণা তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল।

বাহিরে বাহিরে মুসলমান বিজেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বলবন্তকে কেহ সন্দেহ করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং সে মুসলমান সৈনিকদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া কৌশলে তাহাদের গতিবিধির সংবাদ রাখিত এবং তাহারা যে সমস্ত পথে যাতায়াত করিত সেগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া রাখিত।

একদিন রাত্রে সে মুসলমান সৈনিকের লুকান পোষাক পরিধান করিয়া বাড়ী হইতে সকলের অলক্ষ্যে বাহিরে চলিয়া আসিল। অতঃপর প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী যে রাস্তা দিয়া মুসলমান সৈনিকগণ অশ্ব ছুটাইয়া যায়, তাহারই অনতিদূরে লতাগুল্মাচ্ছাদিত এক কুঞ্জে সে লুক্কায়িত রহিল। গভীর রাত্রে বহুদূর হইতে ধাবমান অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইয়া বলবন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল। অশ্বারোহী কিয়দ্দূর থাকিতেই সে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু অশ্বারোহী যখন একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপর লম্বমান হইয়া পড়িয়া গোঙানীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে আছ, রক্ষা কর।"

অশ্বারোহী তাহাকে কোন আহত সৈনিক ভাবিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকট আগমন করিল। বলবন্তকে মুসলমান সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত দেখিয়া নিঃসন্দেহে অশ্বারোহী অবনত হইয়া যেই মস্তক উত্তোলন করিতে গেল, অমনি শানিত ছুরিকা তাহার বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ হইল। একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া অশ্বারোহী সৈনিক ভূমি চুম্বন করিল। হতভাগ্য সৈনিক একটি আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিল। তারপর সে মৃতদেহটাকে টানিয়া লইয়া পথিপার্শ্বস্থ একটি অগভীর খাদে ফেলিয়া দিল।

বলবন্ত সেই মৃত সৈনিকের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। কিয়ৎকাল পরে সে অনতিদূরে বিপরীত দিক হইতে অপর দুইজন অশ্বারোহীকে আসিতে দেখিল; অমনি সে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈনিকদ্বয় তাহার উভয় পার্শ্বে আসিয়া অশ্ব দাঁড়করাইল, তৎক্ষণাৎ সে বাম দিকের সৈনিকের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া বর্শা এবং ডান দিকের সৈনিকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিল। তন্মুহূর্ত্তেই উভয় সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অতঃপর সে অশ্বদ্বয়ের মস্তকও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল, হউক না পশু, মুসলমানের ত!

এই হত্যাকাণ্ডের পর সে কিছুদিন নীরব ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনরায় এক গভীর

নিশিতে আনুরূপ কৌশলে দুইজন সৈনিককে হত্যা করিল। পরে সে ক্রমাগত প্রতি রাত্রেই মুসলমান সৈনিক হত্যা করিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে সে একটি বলবান অশ্ব ও গোলাবাড়ীর পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে লুকায়িত রাখিয়াছিল। রাত্রে সম্পূর্ণ সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত হইয়া সে ঐ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া ঐরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে অগ্রসর হইত।

গ্রেপ্তার হইবার পূর্বদিন রাত্রে সে পূর্ব্বের মত কৌশলে সেই সৈনিকদ্বয়কে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ একজন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তরবারির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। সেও ঝটিতি স্বীয় তরবারি দ্বারা আঘাত ফিরাইল বটে, কিন্তু ফিরাইতে ফিরাইতেও সৈনিকের তরবারির অগ্রভাগ অকস্মাৎ তাহার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া গেল। অবশেষ সে সৈনিকদ্বয়কে হত্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অত্যাধিক ক্লান্তি বশতঃ এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতে থাকায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রিও তখন অধিক ছিল না, সে তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া বাড়ী আসিয়া, অশ্বটিকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু তাহার দেহ তখন এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যে গৃহসন্নিকটে আসিয়াও ঘরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না. গোশালার নিকটেই জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। কতক্ষণ সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল জানে না, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সৈনিকের আহ্বানে সে উঠিয়াছে।

সেনানায়ক গুম্ফ কুঞ্চন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্দী! তোমার আর কোন বক্তব্য আছে?

—না, আমার আর কোন বক্তব্য নেই। আমি সবশুদ্ধ ষোলজনকে হত্যা করেছি। ব্যস্! আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে!

—তুমি জান, তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই মরতে হবে?

—সে জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

—রাজপুত! তুমি কি সৈনিক ছিলে?

—না, আমি কোনকালে সৈনিক ছিলাম না, কিন্তু তোমরাই আমাকে সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছ। তোমরা সেই মুসলমান, যারা পাণিপথের যুদ্ধে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তোমরা তাদেরি বংশধর যারা হলদিঘাটের যুদ্ধে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করেছে! তোমরা আমার দু'জনকে নিয়েছ, আমি তোমাদের ষোলজনকে নিয়েছি, আটজন আমার পিতার পরিবর্ত্তে, আর আটজন আমার স্নেহের পুত্রের পরিবর্ত্তে।

সেনানায়ক ক্রূর-দৃষ্টিতে বলবন্তের দিকে চাহিলেন।

বলবন্ত বীরদর্পে ঋজু হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমান সেনানায়ক তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত কি যেন পরামর্শ করিলেন। অতঃপর দণ্ডায়মান বলবন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, রাজপুত! তোমার বাঁচবার একমাত্র উপায় আছে; তুমি যদি মুসলমান ধর্ম্ম—

সেনানায়ক আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বলবন্ত অকস্মাৎ লম্ফ প্রদানে তাঁহাকে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত আক্রমণ করিল। অনেক কষ্টে বলবন্তকে ছাড়াইয়া আনা হইল। পরমুহূর্ত্তেই শানিত বর্শার অগ্রভাগ তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইল, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মাত্র সে করুনানেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে তাকাইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।—
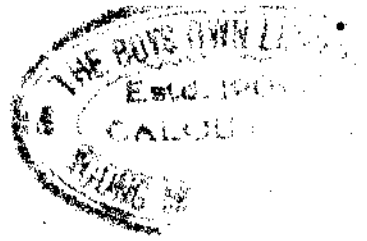
তৃপ্তি

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

হ্যাঁ, ভাগ্যবতী বলিতে হইবে বই কি। না হইলে বাপ-মা-মরা মেয়েটা অমন ঘর অমন বর পায় কখন? পাত্র ধনবান, শুধু ধনবান কেন—রূপবানও। বয়সই বা এমন কি বেশী—চল্লিশ। পুরুষের আবার বয়সের কাল অকাল থাকে! না সে কথা তুলিতে আছে? পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার সহিত দিদিমার মুখেও তাই হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শান্তি কিন্তু এ সৌভাগ্যের সূচনাকে অত্যাচার বলিয়াই ধরিয়া লইল। তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল সেই লোকটীর উপর—তিন তিনটা উপযুক্ত কন্যা বিদ্যমানেও কোন হিসাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন।

রাগ করা চলে, কিন্তু বিবাহ বন্ধ করিবার ক্ষমতা বাঙালীর মেয়ের কুষ্ঠিতে নাই। তাই একটা শুভদিনে শুভবিবাহ হইয়া গেল। মন্ত্র পড়া হইতে কোন নিয়মই বোধ হয় বাদ পড়িল না।

বধূকে শ্বশুর ঘর করিতেও যাইতে হইল।

অপরিচিত সংসারে আসিয়া শান্তির প্রথম প্রথম একটু বাধ বাধ লাগিল, তারপর সহিয়া গেল। সে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে ভাল বাসিতে পারিল না, এমন কি শ্রদ্ধাও করিতে শিখিল না। যখন বৃন্দাবন হাসিয়া তাহাকে আদর করিত, তখন রাগে, দুঃখে, ঘৃণায়, তাহার সর্ব্বশরীর রি-রি করিয়া উঠিত, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিত না—শুধু পাথরের মত সে সব অত্যাচারই মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইত।

কয়দিন লক্ষ্য করিয়া একদিন বৃন্দাবন উদাস কণ্ঠে বলিল—এখানে কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

শান্তি ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—না।

বৃন্দাবন বলিল—তবে অমন করে থাক কেন? না হয় কিছু দিন দিদিমার কাছ থেকে বেড়িয়ে এস।

তাহার সারা অন্তর তো তাহাই চায়। সে তবু কিছু দিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে!

সে কহিল—তাই যাবো।

হয়তো বৃন্দাবনের মন অন্যকিছু শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তাই ক্ষণেক ইতঃস্তত করিয়া কহিল—তা'হলে চল কাল তোমায় দিয়ে আসি, কেমন?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। বৃন্দাবন প্রশ্ন চপল দৃষ্টিতে শান্তির মুখের দিকে চাহিল, তারপর খানিক পরে বলিল—আচ্ছা শান্তি···

কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে চেষ্টা করিয়াও অন্তর ভাষা সরিল না।

শান্তি স্বামীর পানে চাহিল, বলিল—থামলে কেন? আর একজনকে এমনি করে একদিন ভোলাতে চেয়েছিলে তাই মনে পড়ে গেল বুঝি? লজ্জা কি! ও আমি জানি, আমিও যখন মরবো ঠিক এমনি করেই ভবিষ্যতে আর একজনকে ডাকবে। বল কি বলবে?

বৃন্দাবন সেদিকে তাকাইতে পারিল না। তাহার সমস্ত মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

একবার সেদিকে লক্ষ্য করিয়া শান্তির

অন্তরটা যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। যাক, স্বামীর ক্ষতস্থানটিতেই সে ঠিক আঘাত করিয়াছে। এইটুকুই তার সান্ত্বনা।

আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল, তাহার চির-পরিচিত কুটীরে—দিদিমার কাছে। সকল অঙ্গ হীরা মুক্তা খচিত সোনার পাতে মোড়ান। দিদিমা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন—এই তাহার শান্তি। অতি স্নেহে দিদিমা শান্তির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

দিদিমা বলিলেন—হ্যাঁ রে নাতজামাই ভালবাসে, যত্ন করে?

শান্তি উত্তর দিল—খু-উ-ব। জান দিদিমা, এক দণ্ড আমায় চোখের আড়াল করে না।

আনন্দের আবেশে দিদিমার বুকখানা ফুলিয়া উঠিল—মনে মনে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা করিলেন—তাই করো ঠাকুর, শান্তি যেন সুখে থাকে। ও যে আমার...

শান্তি বলিল—ওকি তোমার চোখে জল কেন দিদিমা; না, না, এবার থেকে তোমার কাছ ছাড়া হব না, এইখানেই থাকবো।

দিদিমা হাসিয়া কহিলেন—দূর পাগ্‌লি, ও কথা কি বল্‌তে আছে! জন্ম জন্ম ওই ঘর কর্।

দাওয়ার এক পাশে একখানা প্রকাণ্ড গামলা দেখিয়া শান্তি বলিল—এটা কোত্থেকে এল, দিদিমা?

দিদিমা বলিলেন—ওমা শুনিসনি বুঝি! তুই যাবার পর দিনই তিমিরের বাবা যে হঠাৎ মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ কিন্তু খুব ঘটা করেই করেছিল। আর করবেনাই বা কেন, ভগবান তো ওদের কিছু কম দেন নি।

শান্তি বলিল—তিমির দা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

দিদিমা বলিলেন—হ্যাঁ, সে তো প্রায়ই আসে। সে বল্‌লে, আচ্ছা দিদিমা, শান্তির যে বিয়ে হ'ল আমায় কি একবারও খবর দিতে নেই, এমনই করেই কি পর করে দিতে হয়?

এই কথার ভিতর যে কতখানি বেদনা লুকান ছিল শান্তি তাহা জানে। সে কথা কহিল না। সে যেন কেমন আনমনা হইয়া পড়িয়াছিল।

দিদিমা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বকিয়াই যাইতে লাগিলেন।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া শান্তি নিজেই সব কাজ করিতে আরম্ভ করিল। দিদিমার কোন আপত্তি শুনিল না।

সহসা দ্বার হইতে ডাক আসিল—দিদিমা?—বজ্র পতন হইলে যেমন সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে, শান্তি তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিবারও বুঝি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তিমির ঢুকিয়া দেখিল—শান্তি। নিজের চোখকে সে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না। সে ডাকিল—কে শান্তি নাকি?

শান্তি মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া প্রণাম করিল। তাহার সারা দেহটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তিমির বলিল—কবে এলি?

শান্তি উত্তর দিল—কাল।

শান্তি যেন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়।

তিমির বলিল—দিদিমা কই?

শান্তি নতমুখে উত্তর দিল—আহ্নিক করছেন। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

তিমির হাসিয়া উঠিল, বলিল—কাকে 'আপনি' বল্‌চিস্ রে, আমি যে তোর তিমির দা।

শান্তি উত্তর দিল না, তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দিদিমা আসিয়া বলিলেন—কে রে তিমির নাকি?

তিমির বলিল—শান্তির কথা শোন দিদিমা। আজ কাল আমায় 'আপনি' 'আজ্ঞে' বল্‌তে সুরু করেছে।

দিদিমা বলিলেন—কাল শান্তি তোর কথা জিগেস্ করছিল তিমির।

শান্তি ডাকিল—দিদিমা —

পরক্ষণেই কিন্তু সেখান হইতে সে ধীরে ধীরে মন্ত্রৌষধি ফণিনীর মত সে মাথা নীচু করিয়া সরিয়া গেল। তিমির দিদিমার মুখের পানে বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একদিন ছিল বটে যেদিন তিমিরকে লইয়া দিনের পর দিন সে স্বপ্ন রচনা করিয়া চলিয়াছিল। মনের সমস্ত সৌকুমার্য্য দিয়া তাহাকে সাজাইয়াও তৃপ্তি পাইত না। কল্পনায় আনিয়াছিল—জ্যোৎস্না রাত্রি। বাতাসে দিয়াছিল—ফুলের সৌরভ। বুকে আনিয়াছিল—বসন্ত। আজ সেদিনগুলি কোথায়!

তিমির চলিয়া গেল কলিকাতায় পড়িতে আর শান্তি বসিয়াছিল তাহার ফিরিবার প্রতীক্ষায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিঃশেষে নিজেকে নূতনের হাতে ছাড়িয়া দিয়া পুরাতনের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল কে তাহার হিসাব রাখে? তিমির মাঝে মাঝে আসিত, কিন্তু বেশী দিন থাকিত না—পড়ার ক্ষতি হইতে পারে। শান্তির বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃষ্ণা কিন্তু তাহাতে মিটে নাই বরং বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

কলিকাতায় পড়া শেষ করিয়া তিমির চলিয়া গেল বিলাতে, দীর্ঘ দিনের জন্ম।

শান্তির বয়স বাড়িতে লাগিল। পল্লীর মাঝে কানাঘুষা চলিতে সুরু হইল। আর ত ধরিয়া রাখা যায় না, কিন্তু বাঙ্গালী পল্লী-সমাজ আজও এত উদার হয় নাই, যে বিনাপণে কেহ কোন অনূঢ়াকে গ্রহণ করিবে। অনেক অনুসন্ধানের পর শান্তির বিবাহের পাত্র মিলিল। একটা মন্ত্রমুখর রাত্রে বিবাহের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটীও হইল না। য়ুরোপের কোন একটী রঙীন পল্লীতে বসিয়া তিমির জানিতেও পারিল না যে তাহারই বিহনে একটী পল্লীবালার হৃদয়ে কি ঝড় উঠিয়াছে! শান্তির কল্পনার সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আজ সে সব কথা একে একে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর শান্তি আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন তিমির চলিয়া গিয়াছে। শান্তি কি ইহাই চাহিয়াছিল? সে কথা কে বলিয়া দিবে? কিন্তু, আজ যে ও চিন্তা করাও পাপ! তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া সে তাহার স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সেদিন শান্তি পুকুরে বাসন মাজিতেছিল। তিমির যে সেখানে মাছ ধরিতেছে, দেখে নাই। তিমিরও শান্তিকে দেখে নাই। হঠাৎ তিমিরের চোখ পড়িল শান্তির উপর। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—শান্তি—

শান্তি চমকাইয়া ত্রস্তে গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া তিমিরের দিকে চোখ ফিরাইল।

তিমির বলিল—তুমি যে এখানে আছ তা আমি জান্‌তে পারি নি, আমায় ক্ষমা করো।

শান্তি কিছু বলিল না, সে বাসনই মাজিতে লাগিল।

তিমির বলিল—অন্ধকার হয়ে এলো, একটু বেলাবেলি কাজ সেরে নিও।

শান্তি হাসিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল।

সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল একটা লোকের উপর—সে তাহার স্বামী। এইটাই তাহাদের বাড়ী যাইবার পথ।

তিমির বৃন্দাবনের দিকে পিছনে ফিরিয়া ছিল, সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি গাড়ী যাও, আর দেরী করো না। বলিয়া তিমির সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সহাসা সম্মুখে সাপ দেখিলে পথিক যেমন চমকাইয়া উঠে, বৃন্দাবন তিমিরকে দেখিয়া তেমনই প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য।

সে শান্তির দিকে আগাইয়া আসিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল—এমন সময় গা ধুচ্ছো?

শান্তি বলিল—হ্যাঁ, রাস্তা আগলে অমন করে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা না থাকলেও আমার আছে। পথ ছাড়;—না হয় আমিই যাই।

বৃন্দাবন প্রতিবাদ করিল না, একটু হাসিয়া সরিয়া গেল।

শান্তির অন্তর জ্বলিয়া উঠিল—এ কিসের হাসি? সে মাজা বাসনগুলো টানিয়া লইয়া আবার মাজিতে বসিয়া গেল।

সে দিন রাত্রে তাহাদের কি হইল কে জানে। ভোর না হইতেই বৃন্দাবন কিন্তু সেই যে চলিয়া গেল আর আসিল না, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাঠাইতে লাগিল মাত্র। শান্তি বাঁচিয়া গেল, চিরদিন এখানে থাকিতে পারিলেই সে বর্তিয়া যায়।

অনেক দিন বৃন্দাবনের চিঠি আসে নাই। দিদিমা শান্তিকে বলিলেন—অনেক দিন তো জামাইএর চিঠি এলো না শান্তি, তুই লিখিস তো?

শান্তি কিছু বলিল না। দিদিমা বলিলেন—আজই একখানা চিঠি লিখেদিস্, কে জানে কেমন আছে, যে দিন কাল!

বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া লইলেও দিদিমার 'যে দিন কাল' কথাটা শান্তির অন্তরে গিয়া ধক করিয়া আঘাত করিল। দুপুরের দিকে শান্তি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিয়াছিল—কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। পিওন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। লেখা বৃন্দাবনের না হইলেও তাহারই জবানী বটে। বৃন্দাবন লিখিয়াছে—কয়দিন হইতে সামান্য সামান্য জ্বর হইতেছিল—মনে করিয়াছিলাম এমনই সারিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, আজ ডাক্তার বলিয়া গেলেন—থাক সে কথা। মনে হইতেছে এ সময় যদি অন্ততঃ তোমায় কাছে পাইতাম। আসিতে পারিবে না কি ইত্যাদি—

শান্তির হাত হইতে তাহার অজ্ঞাতে চিঠিখানি মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

দিদিমা সব শুনিয়া বলিলেন, এখনই তোকে যেতে হবে শান্তি, কিন্তু আমি···

বাধা দিয়া শান্তি বলিল—ক'দিন থেকে ত জ্বরে ভুগছ তোমার ভাবতে হবে না তিমিরদাকে নিয়েই আমি যাব'খন। কথাটা বলিয়াই সে দিদিমার মুখের পানে চাহিল। একটা তীব্র বিদ্রূপের আভাষ যেন তাহার সারা মুখে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। দিদিমা কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যও করিলেন না।

শান্তি যখন শশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শান্তিকে দেখিয়া বৃন্দাবনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পিছনে তিমিরকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল—ভাল আছেন, বসুন।

তিমির ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

সেদিন বৃন্দাবনের অবস্থা ভাল ভাবেই কাটিল। কিন্তু পরের দিন আর বুঝি ধরিয়া রাখা যায় না।

সন্ধ্যার দিকে বৃন্দাবন একটু ভালর দিকে আসিতেছিল, সহসা সে বালিশের তলা হইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া শান্তির হাতে দিয়া বলিল—মরতে আমি সত্যিই চাই না, তবু যদি যেতেই হয় তার আগে এ কাজটা সেরে নেওয়া ভাল শান্তি, এগুলো ভাল করে তুলে রাখো—এ উইল, আমার সমস্ত এ সম্পত্তি তোমায় দিয়ে গেলাম!

শান্তি কী বলিতে যাইতেছিল। বাধা দিয়া বৃন্দাবন বলিল—মেয়েদের কথা বল্‌ছো? তাদের তো কোন অভাবই নেই শান্তি, শুধু শুধু তাদের এর মধ্যে জড়াই কেন? এ তোমার, তুমি দান বিক্রি যা খুসী করতে পারো। উইলে সব কথা আমি পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি। এমন কি পাছে পরে কোন গোলমাল ওঠে তাই মেয়েদেরও সই করিয়ে রেখেছি এতে, ওঃ, বড় যন্ত্রণা একটু বুকে হাত বুলিয়ে দেবে শান্তি!

বৃন্দাবন শান্তির দিকে চাহিল—কী ব্যথা কাতর-দৃষ্টি তার। বিবাহিত পত্নীর উপর যেন তাহার কোন দাবীই নাই।

ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া শান্তি বৃন্দাবনের বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

খানিক পরে বৃন্দাবন বলিল—সব বুঝি শান্তি, —আমি সবই জানি। তোমার চোখই সব কথা বলে দেয় আমায়। কিন্তু কি করব, অদৃষ্ট! নইলে এতদিন পরে হঠাৎ আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে তোমার জীবন ব্যর্থ করে দেব কেন! যদি পার, তুমি আমায় ক্ষমা কর। হয় তো আর···

বৃন্দাবন আর বলিতে পারিল না। তাহার কোটর গত চক্ষু দিয়া অশ্রুর বন্যা গড়াইয়া পড়িল।

শান্তির বুকের ভিতরটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তাহার সারা-অন্তর হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এই তার স্বামী, এই তার দেবতা। এত দিন ইহাকে সে চিনে নাই!

শুধু হীন কল্পনার জাল বুনিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, অন্যজনকে করিয়াছে হত্যা। এমনই নীচমনা সে যে স্বামী অফুরন্ত ভালবাসা, অপরিসীম বিশ্বাস লইয়া মৃত্যুদিনেও তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সে কি না তাহাকেই বেদনা দিতে তিমিরকে সঙ্গে আনিয়া আত্মসুখ লাভ করিয়াছে। ছিঃ, ছিঃ, সে কি!

কথা কহিতে না পারিয়া শান্তি বৃন্দাবনের কাছে সরিয়া আসিল। বৃন্দাবন তাহার হাতটা মাথায়, বুকে, ললাটে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

দারুণ উত্তেজনার বেগ, কিন্তু বৃন্দাবনের সহ্য হইল না, হঠাৎ কাশিতে কাশিতে নীল হইয়া সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

শান্তির সমস্ত অন্তরটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অভিমানিনী অনুতপ্তা নারী আজ সর্বপ্রথম বৃন্দাবনের শুষ্ক চর্ম্মসার বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। যে সান্ত্বনা দিতে পারিত, বাধা দিতে পারিত, সে তখন কোন অজানা লোকের যাত্রী হইয়াছে, কে জানে! তাহার এ ব্যাকুল আহ্বান সেই লোকটির কাছে পৌঁছিল কি না তাই বা কে বলিতে পারে?

স্বামী হারা, দিদিমা হারা শান্তি আজ স্বামীর ভিটাটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে। সর্ব্বহারা, রিক্তার এইটুকুই বুঝি সম্বল—আর কিছুই নাই

প্রত্যহ স্বামীর তৈল চিত্র পূজা না করিয়া সে জলগ্রহণ করে ন। আজ সেই রুক্ষ শান্তি কই? পবিত্র স্নিগ্ধতায় আপনাকে ভরিয়া আজ তার এ কিসের হাহাকার? ··

ছয়মাস পরে। মৌন সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভেদ করিয়া তিমির আসিয়া ডাকিল—শান্তি!—

গলবস্ত্র হইয়া শান্তি তখন স্বামীর সুবৃহৎ তৈল চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নয়নজলে ভাসিতেছে! কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া জলভরাদৃষ্টি তুলিয়া সে তিমিরের দিকে চাহিল।

তিমির চমকাইয়া উঠিল! এ কী শুভ্র মূর্তি! হঠাৎ সে শান্তিকে চিনিতেই পারিল না। সেই চুলের বোঝা!—চক্ষের সেই মোহিণী দৃষ্টি আজ গেল কোথায়?...

শুষ্ক স্বর বহু কষ্টে সরল করিয়া অর্ধকণ্ঠে তিমির ডাকিল—শান্তি!—এ কী সাজ তোমার?

দীর্ঘায়ত দৃষ্টি তুলিয়া শান্তি তিমিরের দিকে চাহিল।

সে দীপ্ত-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া তিমির মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন মাথা তুলিল তখন কয়েকজন বিধবা প্রাঙ্গনতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সবারই হাতে চরকা বা এমনই একটা কিছু রহিয়াছে। দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিমির দেখিল লেখা রহিয়াছে'—বিধবা আশ্রম!'

ব্রতচারিণীর মুখের দিকে বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া—তিমির ধীরে ধীরে বাহিরের পানে অগসর হইয়া চলিল!
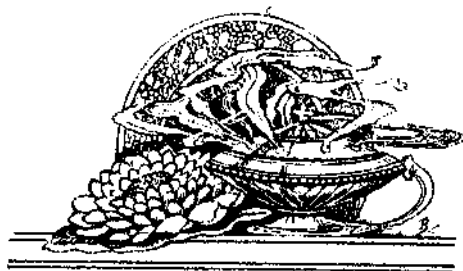
পলাশীর স্মৃতি

ডাক্তার কার্ত্তিক শীল।

বাদল বাউল তার ফুটো একতারাটী নিয়ে সেদিন সকাল থেকেই মেতে উঠেছিল। পথে ঘাটে এক হাঁটু জল জমে গেছে,—যান চলাচল একেবারে বন্ধ বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে এক আধখানা মাল বোঝাই লরী দুরন্ত দৈত্যের মত বিরাট শব্দ তুলে সাঁতার দিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ছেলের দল কাগজের নৌকা ভাসিয়ে মাতন জুড়ে দিয়েছে। মায়ের দলের সাগ্রহ হুঙ্কার সেথা মোটেই কার্য্যকরী হচ্ছে না। একা বসে আছি,—স্নান পর্য্যন্ত হয় নি। বর্ষার সঙ্গে মনটাও কেমন ভিজে ভিজে হ'য়ে পড়েছে, তাই সেটাকে তাজা করবার জন্তে 'খিচুড়ির' সঙ্গে 'পাঁপর ভাজা' এবং আর কি হলে বেশ রসনা পরিতৃপ্তিকর হয়, মনে মনে সেই সব 'প্রোগ্রাম' ভাঁজছি—ডাকপিয়নের কথায় চৈতন্ত হোল—নমস্কার ডাক্তার বাবু!...

চোখ তুলে চাইলেম। খাকি রং এর কোট পাজামা ভিজে কালোবর্ণ ধারণ করেছে, ছাতা চুঁইয়ে জল পড়ে মাথার চুলগুলো সব ভিজে গিয়েছে। মাথা মুছতে মুছতে সযত্ন রক্ষিত চামড়ার ব্যাগটী খুলে খান তিনচার খামে আঁটা চিঠি বার করে পিয়ন বলে উঠল,—দেখুন দেখি, এগুলো আপনার নয়?...

শিরোনামাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিলেম। এই রকম ভীষণ দুর্য্যোগের দিনেও, বাঁধা ধরা নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম না দেখে, সুবন্দোবস্তর তারিফ্ না করে পারলেম না।...প্রায়গুলিই বিদেশী বিজ্ঞাপনের, শুধু একখানি পত্র অপরিচিত হস্তাক্ষরের। ডাকঘরের ছাপ দেখলাম—পলাশী। বিস্ময় লাগল! পলাশী থেকে কে পত্র লিখলো?—কেউ ত নেই সেথায়!...ক্ষিপ্র হস্তে খামটা ছিঁড়ে ফেললেম—স্বাক্ষর দেখি, 'বোধ হয় চিনতে পারবি না—তোর সেই যামিনী।'

...যামিনী?—সেই যামিনী! প্রায় আড়াই যুগ পূর্ব্বেকার বাল্যস্মৃতি মনে প'ড়ে গেল! সেই মাইনর স্কুলে তখন আমরা এক সঙ্গে 'ফার্ষ্ট' ক্লাসে পড়ি। —ও থাকত শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে, আর আমরা শ্রীকৃষ্ণ লেনে। আমরা দুটীতে ছিলেম পরম বন্ধু—আর একদিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দী! দুজনার নাম ঠিক থাকবে আগু পিছু—একে অন্তের ঠিক পরে, না হয় আগে—অর্থাৎ ও যদি হোত 'ফার্ষ্ট', দ্বিতীয় স্থানটী নিশ্চয়ই আমার বাঁধা! 'সামার ভেকেশানের' ছুটী ঘোষিত হবার দিনে মর্ণিং স্কুল' হোত—দুটীতে মিলে চারটে রাতে উঠে ঘোষেদের বাগান থেকে কচি কচি আম চুরি করতেও ছিলেম পরস্পর প্রতিদ্বন্দী!—অর্থাৎ ও যদি পাড়তো পাঁচটা, তা'হলে আমি নিশ্চয়ই চারটে না হয় ছ'টা তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওকে এগিয়ে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল! 'ভেকেশান টাস্ক', করেও ওকে অতিক্রম করে যাবার আমার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে আমার খাতা নিয়ে দেখে বলত, "এঁ্যা, তোরও এতদূর হয়েচে? আমারও কাল ঐ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে!" অর্থাৎ কোন দিক দিয়েই তাকে পেরিয়ে যাবার উপায় আমার ছিল না। ওর বাবা ছিলেন আলিপুরের মুন্‌সেফ—শ্যামবাজারের বাসা বাড়ী

থেকেই কোর্ট করতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই একদিন শুনলেম, ওর বাবা ঢাকায় বদলী হয়ে গেছেন। সেই থেকেই প্রায় দেড় কুড়ি বছর কেটে গেছে আর তার খবর পাই নি—সেও আমার কোন খবর রাখে নি।...

দীর্ঘ দিন পরে ছেলেবেলার মাধুরীভরা সেই নিতান্ত আপনকরে নেওয়া মধুর সংজ্ঞা, 'তোর সেই যামিনী'—বারেকের তরে আমার প্রৌঢ় চিত্তকে আলোড়িত করে তুলল। ভাঁজ খুলে পড়তে সুরু করে দিলেম :

পলাশী

১০ আগষ্ট, রবিবার

ভাই বিনোদ,

চিঠি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবি! তবু দেখ কেমন তোকে মনে রেখেছি, কিন্তু তুই একদম আমায় ভুলে গেছিস্। তবে আমার ভরসা আছে, তোর মন এখনও আমার ভোলেনি নিশ্চয় এবং ভুলতে পারে না কখনই। মস্ত ডাক্তার হয়ে গেছিস্—হয়ত 'সম্বন্ধে' কথা বলতে সাবধান করে দিবি, কিন্তু মনে রাখিস্ এখানে সে অধিকার চলবে না।—এখানে আমরা মাইনর স্কুলের সেই 'মেয়ো' আর 'বিন্থ'—যেন মনে থাকে। তারপরে হাঁ—বলি আছিস কেমন? ডিরেক্টারীতে নামের সঙ্গে ত লম্বা ল্যাজ্ দেখলুম, ডি-টি-এম্, ডি-পি-এচ্, আরো কত কি? বলি উপার টুপার হচ্চে কেমন বল্ দেখি?···

আমার কোন খোঁজ রাখিস নি এবং দরকারও বোধ করিস্‌নি নিশ্চয়ই। অতটা আবোল তাবল লিখেছি, তার ভেতর আমিও ধরা দিইনি—নিশ্চয়ই খুব অবাক্ হয়ে যাচ্ছিস্, নাঃ?

—হাঁ, আমি-ও তোরই মত—বুঝলি? তবে অত বড় বড় ডিগ্রির ভার আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বল দেখি, দুজনেই মানুষ মারবার ফাঁদ পেতেছি!—তুই না হয় রাজধানীতে, আর আমি না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। দুজনের ছেলেবেলায় অত মিল ছিলো, কিন্তু এদিকে মিল হ'য়ে ও এত গরমিল্ হ'ল কি করে বল্ দেখি?

যাক্ অনেক ভূমিকা করলেম, এইবার আসল কথাটাই বলি। এখন অতটা জোর আছে কিনা বুঝতে পারছি না, তাই একটু কুণ্ঠা অনুভব করছি। একটা অনুরোধ আছে, রাখবি কিনা বলতে পারি না। কিন্তু রাখতেই হবে।

...এখানকার একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমি কাজ করছি। পরশু দেশ থেকে চিঠি পেলেম, পরিবার আর মেয়েটার ভারী অসুখ। মেয়েটা বাঁচে কিনা সন্দেহ। তুই ত জানিস্ না, বাবা মা অনেকদিন গতায়ু হয়েছেন। পিসীমা একলা মানুষ, ওদের নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে গেছেন—আমাকে যেতেই হবে।...তাই এক মাসের ছুটী চেয়েছি এবং মঞ্জুর ও হয়েছে, কিন্তু এঁরা পরিবর্ত্তে লোক চাইছেন। সেদিন 'ডিরেক্টারীতে' তোর নামটা হঠাৎ নজরে পড়ে গিয়েছিল। আমার একান্ত ইচ্ছা, এই "লীভ্ ভেকান্সিটা" তোর দ্বারাই পূর্ণ হয়। এমনি ত আর দেখা দিবি না, তবু একবার দেখা হবে। আজ দশ তারিখ, আগামী পনেরই 'জয়েন' করতে হবে মনে থাকে। আশা করি ভালই আছিস্। ইতি

বোধ হয় চিনতে পারবি না

—তোর সেই যামিনী।

সময় বিশেষের জন্য খিচুড়ির চিন্তা মগজ ছেড়ে চলে গেল—মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম! কোথাও কিছু নেই—একেবারে অযাচিত ; কিন্তু কি জানি কেন, এ আহ্বান অবহেলা করতে কিছুতেই যেন মন চাইছে না।

পরদার পাশে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিনতার ছায়া পড়ল। ঘরে আর কেউ নেই স্থির হয়ে পরদা ঠেলে সে-ই নীরবতা ভাঙলো, কি গো আজ আকাশ পানে চেয়ে জলের ঝরঝরানি আর মেঘের কড়কড়ানি শুনলেই পেট ভরবে নাকি? বেলা যে বারটা বেজে গেছে! সে-হুঁস্ আছে? চান টান আর করবে কখন? হঠাৎ টেবিলের উপর উন্মুক্ত পত্রখানি দেখে বলে উঠল,—কি! কবিতা লিখচ নাকি?...খবরদার, খবরদার—তুমি কলম ধরলে কালিদাস বেচারীকে দু'দিনেই পথ ছাড়তে হবে, আর বেচারা 'যক্ষ' ওদিকে বিরহের জ্বালায় হয়ত মারাই পড়বে।—

তাকে বাধা দিয়ে ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে বিস্ময়ের ভাণ করে অভিনয়ের সুরে বুকে হাত দিয়ে হঠাৎ বললেম,—বলো কি? তাহলে উপায়? "'বীণা' 'বিনে' 'বিন্দু' বল থাকে গো কেমনে?" দুটো হাত দিয়ে তার ডান হাতখানা চেপে ধরলেম।

—খুব হয়েছে ছাড়ো—চান করতে যাও দেখি! এতটা বয়েস হোল, লজ্জা সরম যদি একটুও থাকে।

—চান্ করতেই যাব, না আর কোথাও যাব বলো দেখি? বলে বন্ধুবরের চিঠিখানি তার হাতে তুলে দিলেম।

...চিঠি পড়ে বিনতা একটু গম্ভীর হয়ে গেল; —তাহলে যাচ্ছ নাকি? কি ঠিক করলে?

—সে উত্তর ত তোমারই হাতে। বলেই ত দিয়েছি,...'বিন্দু' বলো থাকে গো কেমনে? তোমার সহানুভূতি পেলেই তল্পি-তল্পা বাঁধতে সুরু করি আর কি!

—নাও, নাও; সব তাতেই তোমার ঠাট্টা! কি ঠিক করলে তাই বলো?...তাই ত বলি এত বেলা পর্য্যন্ত বাইরে বসে বসে কি করছে!

—কেন, মন কেমন করছিল নাকি?—না, খিদে পেয়েছে?

ধমকের সুরে উত্তর এলো—আবার?

—আহা চটো কেন? না হয় আর বলবো না! এইবার 'লক্ষ্মী' মেয়েটীর মত তোমার অভিমতটুকু শুনিয়ে ফেল দিকি?

আমার আর অভিমত কি? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই-ই আমার মত!

পরম পুলকিত হ'য়ে হাসতে হাসতে বললেম—এই জন্যেই ত—

রাগের সুরে বিনতা বলল,—ফের, যাও আমি চল্লুম।

—আর বলবো না—আর বোলবো না, দাঁড়াও আমিও যাচ্ছি।...

বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেম না—চব্বিশে তারিখে সন্ধ্যার ট্রেণে পলাশী এসে পৌঁছুলেম, সঙ্গে আর কেউ আসে নি। যামিনীকে আগেই 'তার' করেছিলাম। সে তার যোগী মহলের জনকয়েককে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে আমার সম্বর্দ্ধনা করল—ট্রেণ থেকে নামতেই বুকে চেপে ধরল,—উঃ আজ কতদিন বাদে বিন্দু!

—তা আর বলতে? কিন্তু তুমি ত ভারি বুড়ো হয়ে গেছ যামিনী?

কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই অতগুলো লোকের সামনে বিপুল পিঠ চাপড়ে সে বলে উঠল, পুরোনো সম্পর্ক ভুলে আদিখ্যেতা করছিস? তুই বা বুড়ো হতে বাকী আছিস কি রে?

—আমার না হয় নানারকম ভাবনা চিন্তা! সেই যে বলে না, চিন্তা জ্বর মনুষ্যাণাং! আমার না হয় তাই, কিন্তু তোর ত—

—তুই জানলি কি করে আমার ভাবনা নেই? কে বললে তোকে? তুই কি ভাবিস জঙ্গলেতে বাস করি বলে মনের মধ্যে সদাই মিলিটারি

ব্যাণ্ড বাজছে—আর আনন্দে মেতে আছি ? এই একচল্লিশ বছর বয়সে দিনের ভেতর অন্ততঃ একশ' একচল্লিশ রকম ভাবনা ভাবতে হয়, বুঝলি ?

নানারকম আলোচনা করতে করতে দুজনে চলতে লাগলেম। প্রায় দশ মিনিট হেঁটে এসে সাদা রংএর ছোট্ট একখানি বাংলো দেখিয়ে যামিনী হঠাৎ থেমে দাঁড়াল,—এইটাই হবে তোর 'কোয়ার্টাস' বুঝলি ? আর ও-পাশে পুব সাইডের ঘরখানা হোল ডাক্তারখানা। সামনেই দরাজ মাঠ,—দিব্যি খোলা হাওয়া, চাকর, বামুন কিছুরই অভাব হবে না। হাঁ-হাঁ, 'বাই দি বাই' তুই বিয়ে থা করিস নি ?

—করি নি আবার ? একটা নয় একেবারে একজোড়া !

—এ্যাঁ, কি সব বলছিস ? ঠাট্টা রাখ, বল্‌না সত্যি করে।

—কেন মিথ্যে ভাববার কারণ কি ? আমি দুটো বিয়ে করতে পারি না, না হতে পারে না ? তোর অভিমতটাই শুনি।

—না, না—সত্যিই তোর দুটো বিয়ে ? 'ফার্ষ্ট ওয়াইফ' কদ্দিন হোল মারা গেছে ?

একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম—এই বার কিন্তু চিন্তা বা ভাবনার কথা আসছে। আর তুই আমার বুড়ো হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলি না।

সঙ্গের লোকগুলিকে মোটগুলা ঠিকমত রাখতে নির্দ্দেশ করে একখানা হাতধরে যামিনী বলে উঠল, চল ভেতরে গিয়ে বসা যাক। ওরে তেওয়ারী, একটু চা তৈরী কর বাবা। তুই বড় টায়ার্ড হয়ে পড়েছিস্ না ; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে তারপর কাপড়-চোপড় ছাড়লেই হবে, কেমন ?

স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে বললেম,—যেমন মহাশয়ের অভিরুচি ! এখন আমি ত আপনারই—

আমাকে একখানা আরাম কেদারা দেখিয়ে বসতে বলে, সে একখানা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসল ! বলল, হাঁ, কি হয়েছিল বললি না ত ?

—সে আর শুনে কি হবে ? কেবল মন খারাপ বইত নয়।

আমার পত্নী-প্রীতি লক্ষ্য করে এবং আমি হয়ত প্রাণে ব্যাথা পাচ্ছি অনুভব করে যামিনী বলে উঠল, আচ্ছা না হয় এখন থাক, পরেই শুনবো'খন।

তেওয়ারী দুবাটী চা আর মাখন মাখান চার খানা টোষ্ট রুটী নিয়ে উপস্থিত হোল। ক'ঘণ্টার জার্ণিতে একটু তেষ্টা-ও পেয়েছিল, চাটুকু বেশ লাগল।

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় যখন পাল্টে ফেল্‌লাম, তখন অন্ধকার বেশ খানিকটা গাঢ় হয়ে গেছে। জলভরা কাল রঙএর মেঘের ফাঁক থেকে দ্বাদশীর চাঁদখানা একটা স্নিগ্ধ ম্লান হাসিতে চারদিক মূর্ত্তিমান করে তুলেছে।···বললেম, যামু, চাঁদের অমন ঘোলাটে আলোটুকু বাজে বাজেই নষ্ট হবে ? চল্ না একবার পলাশীর রণক্ষেত্রটা ঘুরে আসা যাক্।

—ওঃ বাবা, সে যে অনেক দূর এখান থেকে !

—অনেক দূর ?

—হাঁ, প্রায় দুমাইল ত বটেই। তোরা ক'লকাতার লোক,—লোক শুধু নয়, ডাক্তার মানুষ !—বাড়ী থেকে গলির মোড় পর্য্যন্ত যেতে যাদের মোটর অভাবে অন্ততঃ একখানা 'রিক্সা' হলে ভাল হয়।—অতদূর যেতে পারবি ?

—নিশ্চয়, খু-উ-ব। তুই ভাবিস্ কি আমাকে ? যাস্ ত চল্—আবার কখন হয়ত বৃষ্টি এসে পড়বে। চাঁদের এই ঝাপ্‌সা আলোটা থাকতে থাকতেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই রণ-ভূমি দেখে আসি।

দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল। সেদিনকার আবহাওয়াটা বড় মধুর ও চমৎকার ছিল। বৃষ্টি ও হয়নি অথচ গুমোট্ ভাব ও নেই। চার দিকেই খোলামাঠ—ভিজে ভিজে হাওয়াটুকু বেশ একটা মাদকতার সৃষ্টি করছিল··· ।

এই সেই পলাশীর বিশাল প্রান্তর! চারি-দিকে মৌনতার স্তব্ধ ছবি! বিগত দিনের ব্যথামাখা ইতিহাস মনে পড়ে মনটা একটু ব্যথিত হয়ে উঠল। কত সহস্র বুকের রক্ত এই পাষাণবক্ষে মিলিয়ে আছে!...

পকেট থেকে রুমাল বার করে বিছিয়ে একটা গাছের নীচে বসা গেল। যামিনীই মৌনতা ভাঙ্গল—জায়গাটা কেমন লাগছে রে?

একটু উদাসস্বরেই বললেম, লাগছে ত বেশ. তবে কি জানি কেন মনটা বড্ড যেন হু-হু করছে।

ব্যঙ্গের সুরে উত্তর হোল, ভাব লেগে গেল নাকি? না, কচি বৌয়ের জন্যে মন কেমন করছে?

বিনতার চিন্তা যে একেবারে মনে উদয় হয়নি, তা বলতে পারি না। তাহলে মিথ্যে বলা হয়। তবু যামিনী পাছে সে কথা বুঝতে পেরে আবার অন্য রকম বিদ্রূপ করে বসে. তাই বলে উঠলাম, তোর খালি ঐ সব কথা!

একটু হেসে যামিনী বলল,—ঠিক 'পয়েন্ট'-এ 'হিট্' করেছি বুঝি? হাঁ হাঁ, তোর প্রথম বৌয়ের কোন কথা বললি না ত?

যামিনীর কাছে কথা লুকোতে ইচ্ছা আমার কোন কালেই ছিল না—এখনও নাই। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেম,—সে আর শুনে কি করবি ভাই?

—বলতেই বিরহ আসছে? তবে কাজ নেই থাক।

—না না শোন্, বলছি। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, কোন প্রতিবাদ করতে পারবি না।

আসনটা বেশ একটু জম্‌কে নিয়ে বসে যামিনী বলে উঠল—'অল্ রাইট্!'

তবে শোন্—বৌ আমার মরেনি। তার—

প্রবলভাবে বাধা দিয়ে যামিনী বলে উঠ্‌ল,—কি বললি? বৌ মরে নি?

একটু হেসে বল্‌লেম, এই তোর প্রতিজ্ঞা? এই না বললি প্রতিবাদ করবি না?

—প্রতিবাদের দরকার হলেই করতে হয়। তুই যে রাতকে দিন বলে চালিয়ে দিবি, জল্ জলে চোখ থাকতে কেমন করে তা বিশ্বাস করি বল দেখি?

তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললেম, তোর প্রতিবাদের মতো, দরকার হলে, এ-ও বিশ্বাস করতে হয় বৈ কি এবং হবে ও।

—বেশ, তবে তুই বলে যা, আর আমি চোখ দুটো বুঁজিয়ে চুপ্‌টী করে শুনে যাই, কেমন?

বলতে লাগলেম: তার সঠিক খবর আমিই জানি না ভাই। সে আজ প্রায় ষোল বছর আগেকার কথা। সেই মাত্র 'প্র্যাকটিস্' করতে নেমেছি। পাটনায় আমার এক খুড়তুতো দাদা কাজ করেন। তাঁর 'রেকমেণ্ডশনে' সেখান থেকে একটা 'কল' পাই—'ক্রনিক কেস।'...দশ পনের দিন চিকিৎসা করে ফেরবার সময় পথেই হঠাৎ আমার উগ্র জ্বর হয়। ভায়ার বাসায় ফিরে যাবার সময় পর্য্যন্ত করে নিতে পারিনি—ষ্টেশনের পথেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। যখন জ্ঞান হোল দেখলুম, একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে আমি শুয়ে আছি, আর মাথার কাছে একটি চোদ্দ-পনের বছরের তরুণী তার দীর্ঘ টানাটানা চোখ মেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।··· ব্যাপারটা অনেকটা স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। চোখ বুঁজিয়ে নিজের কথা ভাববার চেষ্টা করলেম।

তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার কথা মনে পড়ে গেল। তখনকার মত কোন কথা উল্লেখ না করে শুধু বললেম, একটু জল। মেয়েটী একটা এনামেলের গ্লাসে করে একটু একটু জল আমার মুখে ঢেলে দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়ান একটু দুধ নিয়ে আসি।···আমি তাকে বাধা দেব কিনা ভাবছি, মেয়েটী সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে—একটী প্রৌঢ়া ঘরে এসে বলে উঠল, কিলো সুশী, ডাক্তারের জ্ঞান হয়েচে?...বেশ একটু সরল ভঙ্গীতে নিষেধ করে মৃদুস্বরে সে বলে উঠল, হাঁ হয়েচে, চুপ করো। উৎফুল্ল হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে করতে প্রৌঢ়া বলে উঠল, আজকালকার ছেলে বাপু তোমরা, শরীরের ওপর একটুও যত্ন-আত্তি করো না। সর্ব্বরক্ষে, পাশের খানাটাতে পড়ে যাওনি।—তাহলে কি আর বাঁচতে বাছা? এমন জ্বর—একেবারে তিনদিন তিনরাত বেহুঁস্ অচৈতন্থি! ভাগ্যে সুশী, গোয়াল থেকে দেখতে পেয়েছিল! ···তা বলি, এখন কেমন বুঝছ' বাবা? আমি ত ভয়েই মরি! ও-ই পকেট থেকে খাতা, নলচে টলচে দেখে বললে, মা ইনি একজন ক'লকাতার ডাক্তার।···তা দেখ' বাবা, কেউ যদি তোমায় বাঁচিয়ে থাকে, তাহলে ঐ সুশী। তুমি আসার পরথেকে, ও বোধ হয় একদণ্ডও চোখের দুটী পাতা এক করেনি!···গরম দুধের বাটী হাতে সুশীলা এসে প্রবেশ করল। ঈষৎ ধমকের সুরে মা'কে বলে উঠল, কি সব আবোল তাবোল বকছ মা? ওঁর জন্তে কি-আর আমরা করেছি? ও-রকম পরস্পর না করলে সংসার চলে কি করে?···তারপর আমার উদ্দেশ্তে নিতান্ত সরল-কণ্ঠে বলল, ওঁর কথা কিছু শুনবেন না আপনি। এই দুধটুকুন্ খেয়ে ফেলুন ত! উঠতে পারবেন? না কাপে করে খাইয়ে দেব?··· তার ব্যবহারটুকু ভারী মিষ্টি লাগল। বললেম, না আমিই খাচ্চি, দিন। হাত বাড়ালেম, কিন্তু কাঁপতে লাগল।...মৃদু হেসে সুশীলা বলল, না না আপনি শুয়ে থাকুন, আমিই দিচ্চি।

জ্ঞান হয়েচে বটে, কিন্তু তখনো আমার বেশ জ্বর রয়েছে বুঝতে পারলেম। থার্ম্মোমিটার দিয়ে তাপ দেখে সুশীলা বলে উঠল, কি করি বলুন দেখি, পিসেমশাইও এখানে নেই, ডাক্তারও সেই সহরে থাকে। আপনাকে ফেলে যাই-ই বা কি করে?

একবার ইচ্ছা হোল বলি আমার ভায়ার কথা কিন্তু কিজানি কি ভেবে বলে উঠলাম, ওরকম আমার হয়, ও-জন্যে ভাববার কিছু নেই। ও দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তার মোহন হাতের সেবাটুকুর লোভ ছাড়তে পারলেম না।···

হোল ও তাই। সাতদিনের দিন আমার জ্বর ছেড়ে গেল। দুদিন বাদ দিয়ে পথ্যও করলেম। বিদায় নেবার সময় এলো। ক'দিন একত্র থাকবার ফলে কেমন একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। আমার বিদায় নেবার কথা শুনে সুশীলারও চোখ দুটো ভারী বলে বোধ হোল—যেন একটু বেশী রাঙা!

বিদায় বেলায় সুশীলার মাকে প্রণাম করে বললেম, আপনাদের ঋণ জীবনে শুধতে পারবো কিনা জানি না। বিশেষ করে সুশীলার।

প্রৌঢ়া তাঁর স্তিমিত নয়ন বিস্তার করে একটু রহস্যের সুরে বলে উঠলেন, কেন বাবা, সুশীকে নিজের মানুষ করে নিলে ঋণ ত তুমি অনায়াসেই শুধতে পারো! তুমিও ত আমাদেরই কায়েত শুনলেম! এই ত বয়েস, বিয়েও নিশ্চয় হয়নি।

আমার মুখখানা লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল বোধ হয়। পাশের ঘর থেকে সুশীলা চীৎকার করে উঠল,—মা!

ফল হোল এই, সুশীলা তার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আর আমার সামনে আসতে পারল না। কি রকম একটা রোখের সুরে একটু পরে

বলে ফেললেম, আচ্ছা মা, আপনার কথাই আমি রাখতে চেষ্টা করব, প্রতিজ্ঞা করলেম।…

ষ্টেশনে পৌঁছে শুনলেম, প্রায় দশ মিনিট আগে গাড়ী চলে গেছে। দাদার কাছে ফিরে যাব?—না সুশীলাদের—। অনেক চিন্তার পর শেষে কখন এসে সুশীলাদের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল ছিল না। সুশীলার মা ই দ্বার খুলে আবিষ্কার করিলেন, এ কি! আবার ফিরে এলে?

বিনীত কণ্ঠে বললেম, গাড়ী 'ফেল্' হয়ে গেছি।

প্রৌঢ়া আমার বিদায়কালের প্রতিজ্ঞায় একটু বেশ খুসী হয়েছিলেন মনে হোল—প্রফুল্ল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, ওলো সুশী, কে এসেচে দেখবি আয়! মাতার আহ্বানে সুশীলা এসে আমাকে দেখে থমকে গেল—একি ফিরে এলেন যে! স্পষ্ট দেখলেম, তার হাত পা গুলো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

একটু অন্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে মৃদু হেসে বললেম,—কেন আপত্তি আছে না কি? চলে যেতে বলছেন?…

সুশীলা কিছু না বললেও প্রৌঢ়া বাধা দিয়ে উঠলেন, তোমার এক অনাসৃষ্টি কথা বাপু! সে আবার কেউ বলে নাকি? কার বাড়ীতে কে আসে গা? সে ত' ভাগ্যির কথা!

মনে মনে একটু হাসি পেল। ভিখিরী-গুলোকে এরকম সুচক্ষে দেখলে বেচারীরা অনেকটা বর্তে যেত!…

অবশেষে ঐখানেই আস্তানা পাতা গেল। পরের দিন সকালে উঠে চা খাচ্চি, বাহির থেকে ঘুরে এসে তুলসীকাঠের মালাগাছি নাড়তে নাড়তে প্রৌঢ়া বললেন, এই যে উঠেচ বাবা! তা, আমি বলছিলুম কি, আজই ত একটা বিয়ের দিন আছে—ভট্‌চাযিকেও জিগেস করলুম—সন্ধ্যের মধ্যেই লগ্ন! মনে করছি নারায়ণের সামনে দুটো হাত আজই এক করিয়ে দি'—তারপর তুমি গিয়ে তোমার বাপ মাকে বলো, ওঁরা দেখে শুনে ঘটা করে বৌ নিয়ে যাবেন। আমাদের গরীবের ঘর বাবা—গরীবের ঘরে আইবুড়ো মেয়ে রাখা যে কিরকম ঝক্‌মারি তা ত' তুমি বোঝ? তার ওপর এদ্দিন—। আমি যা বলছি, এটা হয়ে থাকলে, তবু শত্তুরের মুখ চাপা থাকবে।…

প্রৌঢ়ার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে আমার বাকী রইল না—তিনি আমায় সন্দেহ করছেন—মুখের কথার আবার মূল্য কি? মন এক একবার বিদ্রোহী হলেও, কি জানি কেন কোন প্রকার আপত্তি করলেম না—ইচ্ছাই হোল না।

'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' এই চরম নীতির অনুসরণ করে সত্যিই দেখি যথাসময়ে খবর পেয়ে সন্ধ্যে বেলা ভট্‌চায তাঁর ছোট্ট নারায়ণ শিলাটীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেই শিলাটীর সামনে কি সব বলালেন বুঝে উঠতে না পারলেও, বুঝলেম সুশীলার ভার আজ থেকে আজীবন আমাকেই বইতে হবে।…

বাড়ী ফিরে মা'কে সব কথা বললেম—উনি আবার বাবাকে বললেন। বাবা ত চটে আগুন! সেই কথাই বলো, ও-সব অসুখ বিসুখ সব ভণ্ডামি! কার না কার মেয়েকে দেখে ভুলে গিয়েছিল, এখন ঐসব আবোল তাবোল কথার অবতারণা করছে। ও-সব মোটেই আমি পছন্দ করিনে।…ছেলেকে ডাক্তার করেছ, এখন তার ঠেলা সামলাও!

মা জিগেস করলেন, হাঁরে তোর শ্বশুরের নাম কি?

আমি ত মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম! কৈ]

একবারও ত ও-কথা আমার মনেই হয়নি! মহাসমস্যা। মা বললেন, সে কি রে, বিয়ে হোয়ে গেল, কারুর নাম জানিস্ নে?

অপরাধীর মত বললেম, শ্বশুর জীবিত নেই শুনেছি মা, নাম ত জিগেস করিনি! তবে ওরা কুলীন তা শুনেছি এবং তাকে দেখলে তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে দেখো মা।

নিজের কথাতে নিজেই লজ্জিত হলেম,—মা বললেন, তা বুঝেছি।

বাবা ঘোরতর অমত করলেন। কে-না-কে ঠিক নেই, বিয়ে বললেই বিয়ে হোল? ও-বউ আমি কিছুতেই বাড়ী আনতে দেব না!

মা বললেন,—সে কি হয়? বিনু ত বলছে কুলীন কায়েত—তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের পাল্‌টি ঘর হবে। তাতে আর তোমার আপত্তিই বা কি? ছেলেমানুষ,—না হয় একটা অন্যায়ই করে ফেলেছে!

—অন্যায়? একি সোজা কথা? পাশেই ত অবনী ছিল, তাকেও ত একটা খবর দিতে পারত! এ-সব সেই মেয়ের মা'র যত কীর্ত্তি আমি বুঝতে পারছি! তা, যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল-ভুগুক্, ঠিক হয়ে যাবে!

বাবা ত কিছুতেই রাজী হলেন না। অগত্যা আমাদের হার মানতেই হোল। মা বললেন, যা ভাল বোঝ করো।

পৌঁছেই খবরাখবর করব বলে আসলেও প্রৌঢ়ার সন্দেহ ক্রমে বাস্তবে পরিণত হতে চল্‌ল।...

প্রায় দেড় বৎসর হয়ে গেছে, সুশীলাদের কোন সংবাদ-ই জানিনে। তাঁরাও আমার কোথায় বাড়ী, কি ঠিকানা কিছুই জানতেন না। বাবার নায়টা ভট্‌চাযকে একবার বলেছিলেম বলে মনে হয়।

এই সময় হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে বাবা মারা গেলেন। মা ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন—আমার অবস্থাও হোল সাংঘাতিক! বাড়ীখানা যেন বন্দীশালা বলে মনে হতে লাগল। প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠতে লাগল।

মা বললেন,—আমাকে পাটনায় অবুর কাছে রেখে আসবি চল্—এখানে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তাঁর আন্তরিক উদ্দেশ্য কি ছিল বলতে পারি না এবং আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হলেও প্রকাশ করতে সাহস পাই নি। তিনিই বলে উঠলেন,—হাঁরে, বৌমাদের বাড়ী পাটনায় কোন্ জায়গায়? অবুর বাসা থেকে কতদূরে?

লজ্জিত-কণ্ঠে বললেম,—সে অনেক দূর মা, বোধ হয় এক কোশ হবে।

—তা হোক্ গে; অবুর ওখানে যাবার আগে একবার আমায় সেখানে নিয়ে চল দেখি—বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ করে আসবো—আর বেটী যদি অভিমান ভুলে অধিকার দেয়, তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

অপূর্ব্ব পুলকে প্রাণটা লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগল। দয়াময়! সন্তানকে তুষ্ট করতে মা'র প্রাণে এ কী করুণার ধারা সদা সঞ্চারিত রেখেছ প্রভু!

...সুশীলাদের বাড়ীর কাছে এসে প্রাণটা আঁৎকে উঠ্‌ল! একি! মহাশ্মশান! চারদিক ধূ-ধূ করছে! সেই নিপুণ হস্তে সজ্জিত পরিপাটী ক্ষুদ্র কুটীরখানি গেল কোথায়?... সেই খেজুর গাছ! রাস্তার ওধারে সেই সব বস্তি! সবই ত আছে! আমার অস্ফুট যৌবনের তীর্থক্ষেত্র—সেই মনোরম ঘরখানি শুধু আজ গেল কোথায়? বিহ্বল-স্বরে মা'কে বললেম,—এই ত সেই জায়গা মা,—এইখানেই ত বাড়ী ছিল! কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না!

পল্লীবাসিদের জিগেস করলেম। তারা যা বলল, তাতে পাষাণও বুঝি বা দ্রব হয়ে যায়!

—ঠিক ত বলতে পারি না মশাই, তারা বেঁচে আছে কি মরেছে! প্রায় দেড়মাস হোল, বাড়ী-খানা পুড়ে গেছে। আগুন লাগার আগের দিনে ললিতবাবুর কোন্ দেশে যেন চলে যাবার কথা ছিল, গিয়েছেন কিনা বলতে পারি না। কেউ বলেন চলে গেছে, আবার কেউ বলেন যেতে পারে নি, বাড়ী শুদ্ধ সকলে পুড়ে মরেছে। ঠিক খবর আমরাই জানি নে।

—ললিতবাবুটী কে?

একটী বৃদ্ধা অগ্রসর হয়ে বলে উঠল,—সেই তিনিরই ত বাড়ী গো!

আমি বললেম,—বোধ হয় তার পিসে-মশায়ের নাম। মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিগেস করলেন,—আচ্ছা বাছা, সুশীলা বলে যে মেয়েটী ছিল?—

আক্ষেপের সুরে বৃদ্ধা বলে উঠল,—হাঁ, হাঁ সুশু-সুশু! আহা! তিনিও ওইখানেই থাকতেন গো। মেয়েটীর বরাত বড় মন্দ মা! শুনি ক'লকাতার এক ডাক্তার ব্যামো হয়ে এসে ওর যত্নে ভাল হয়ে, ওকে বিয়ে করে। ক'লকাতায় পৌঁছে তার বাপ-মা'কে ব'লে তাকে নিয়ে যাবে বলে আর পাত্তাটী দেয় নি। ক'লকাতার লোক-গুলো ঐ রকম 'ঠগ্'ই হয় গো! আহা! সুশুর মা'র সে কী কান্না! দু'টী মাস গেল নি—কেঁদে কেঁদে বুড়ি শেষ অবধি মারাই পড়ে গেল।...

মোটামুটী যা সংবাদ সংগ্রহ করা গেল, তাতে মন আরো বেশী রকম বিরূপ হয়ে উঠ্ল। মা'র মুখপানে চেয়ে দেখি, তাঁর চোখ দু'টী জলে ভরে উঠেছে। বললেন,—খুব শাস্তি দিয়ে বেটী ফাঁকি দিয়েছে—আমায় ক'লকাতাতেই নিয়ে চল বিনু, এখানে আমার মন টেঁক্‌বে না। অগত্যা ক'লকাতাতেই ফিরে গেলাম। * *

খুব বড় গোছের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যামিনী বলে উঠল,— "রোমান্টিক এবং "প্যাথেটিক্"—দুই-ই। সত্যিই বড় দুঃখের!

আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেম,—ওহে চলো চলো ফিরে চলো। খিদে পেয়ে গেছে—রাতও অনেক হয়ে গেছে। আচ্ছা গল্প জুড়ে দেওয়া গিয়েছিল যা'হোক্!

যাবার জন্যে দু'জনেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেম। যামিনী বলল,—তারপর 'সেকেণ্ড এডিসনের' কথা?

হেসে বললেম,—সে শুনতে গেলে ভোর হয়ে যাবে!

—এ্যাঁ, এ-ও খুব রোমান্টিক্ নাকি? বেশ রোমান্স্ নিয়েই আছিস্ যাহোক! আচ্ছা চল, চলতে চলতেই শোনা যাবে।

স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেম,—এতে আর তেমন রোমান্স্ নেই। ঐ ঘটনার পরে বিয়ে আর করবই না ঠিক ছিল। বছর ছয়েক আগে, মা'র একবার কঠিন অসুখ হোল। রোগশয্যায় আমায় ডেকে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে শপথ ক'রিয়ে নিলেন, আমাকে ঐ রকম সন্ন্যাসী দেখলে মরেও উনি তৃপ্তি পাবেন না—সুশীলার কথা ভুলে আমাকে বিয়ে করতেই হবে। হোল-ও তাই। বিনতাকে দেখে পছন্দ করে এনে দিয়ে উনি চিরবিদায় নিয়েছেন।

উদাস-স্বরে যামিনী বলে উঠ্ল, তাইত! তোর-ও ত চিন্তা তাহলে বড় কম নয় বিনু? সুশীলা বেঁচে আছে, কি মরেছে সেই-ত এক বিষম সমস্যা!

বললেম,—কি জানি ভাই, আমার কিন্তু একবারও মনে হয় না সে মরেছে। মন যেন কেবলি বলে, সে আছে—আছে!

যামিনীকে 'সীঅফ্' দিয়ে এলেম। ফিরে এসে কিন্তু বড্ড ফাঁকা ঠেকতে লাগল—সহরে

প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে! 'কোয়াটার্সে' মাত্র পাঁচখানা ঘর—একটায় ঠাকুর, চাকর এরা থাকত এবং একটায় রান্না হোত—বাকী তিন-খানা ঘরই যেন গো-গ্রাসে আমায় গিলতে চায়! যামিনীর অনুপস্থিতি বড় বাধিত করে তুলল।

এইভাবে পাঁচ ছ'দিন কাটিয়ে দিলেম। এখন আমার 'রুটিন' হয়েচে বেশ! ঘুম থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে বসলেই চাকরে এনে চা-রুটী সামনে ধরে—খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। তারপর স্নান করে অল্প জলটল খেয়ে ডাক্তারখানা—নানাবিধ রোগীর আর্ত্তনাদ, অনুযোগ!—শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়। এই ভাবেই কোন দিন একটা দেড়টা বেজে যায়—খেতে দেতে আড়াইটা তিনটা। বিকেলে অবশ্য কাজ বিশেষ কিছু থাকে না। এক আধ দিন কেউ হয়ত এসে ওষুধটা 'রিপিট' করিয়ে নিয়ে গেল—এই রকম।

যামিনী চলে যাবার পর নিজেই বেড়াতে যেতাম। পলাশীর বিশাল প্রান্তরে সেই বেদীমূলে চুপটী করে বসে থাকতেম--তারপর রাতটা বেশ একটু গভীর হলে ফিরে আসতেম। এই হয়েছিল "ডেলি রুটীন্"।

রোগী মহলের প্রায়গুলিই মুসলমান—ঠিকমত পরিচয় হতেই ক'দিন কেটে গেল। এইবার একটু একটু করে উপঢৌকন আসতে সুরু হোল—কেউবা পুকুরের টাট্‌কা রুই একটা—কারুর বা জমির পাকা কলা একছড়া—এই ভাবের। ঠাকুর, চাকরের-ই বেশ সুবিধা হোত তাতে!

আরো ক'টা দিন কেটে গেছে! রাত বোধ হয় এগারটা কিংবা আরো কিছু বেশী। সবাই শুয়ে পড়েছে, সারা গাঁ-খানা ছম্ ছম্ করছে। একটা হ্যারিকেন জলছে—একখানা বই দেখছি, দ্বারে মৃদু করাঘাত শুনলেম,—ডাক্তারবাবু!...

স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে প্রথমে বিশ্বাসই হোল না। তার ওপর তেওয়ারীর সতর্কবাণী,—খুব চেনা আদ্‌মি না হলে কিছুতেই দেউরি খুলবেন না, এখানে বড় ডাকাতের উৎ-পাত,—মনে পড়ে একটু চমকে উঠলেম। ফের শব্দ হোল, ডাক্তারবাবু শুয়ে পড়েছেন?

ভদ্রলোকের কণ্ঠ অনুভব করে হ্যারিকেন নিয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেম। ফের শব্দ—ডাক্তারবাবু!

দ্বার খুলতেই এক ঝলক টর্চ্চের তীক্ষ্ণ আলোক চোখে পড়ল। আমাকে দেখে নমস্কার করে একটী বয়স্থ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, এখুনি ত একবার আমাদের ওখানে যেতে হচ্চে আপনাকে! একটী মেয়ে 'ফিট্' হয়েছে—'দাঁতি' লেগে গেছে। যামিনীবাবুই দেখাশোনা করতেন, তাঁর সঙ্গেই আলাপ পরিচয় আছে। আপনাকে ত—'

মৃদু হেসে বললেম,—তাতে আর হয়েচে কি? এই ত আমার সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল! তা, মেয়েটী কি এই প্রথম 'ফিট্' হয়েছেন?—বয়স কত?

—আজ্ঞে না, এই রকম প্রায় পনর ষোল বছর চলছে—প্রায়ই 'ফিট' হয়। বয়স?—তা হবে বৈকি—'এবাউট থার্টি' ত বটেই!

—মেয়েটী আপনারই—

—আজ্ঞে না, আমার বড় সম্বন্ধির মেয়ে। বাপ মা কেউ নেই, আমার কাছেই থাকে।

—ওঃ। তাঁকে বসিয়ে একটা জামা গায়ে দিয়ে তৈরী হয়ে বললেম, চলুন।—আপনাদের বাসাটা?

—এই ত পাশেই—এখানথেকে মিনিট দু'য়েকএর রাস্তা! আমাদের ওপরের ঘর থেকে আপনার ডাক্তারখানার সব দেখা যায়।...

কথা বলতে বলতে এসে পৌঁছে গেলাম। দাঁতিটা ছাড়িয়ে দিয়ে, মাথায় ঠাণ্ডা জল প্রভৃতি

দিতে বলে দিলেম—মাঝে মাঝে স্মেলিংসল্টের ও ব্যবস্থা দেওয়া গেল। বললেম, চলুন একটা ওষুধ দিয়ে দিইগে ভাববার কিছু নেই। ওঁর ত এ অসুখ আগেথেকেই আছে বলেছেন। এর পরে অবসরমত 'কমপ্লিট্‌ হিষ্ট্রী' নিয়ে একটা ওষুধ ঠিক করে দেব।

'হিষ্ট্রি' শুনে মাথা ঘুরে গেল।—তখন আমারা পাটনাতে! আমার বৌদি অর্থাৎ শালাজটী ছেলে খেলা করে কোন্‌ একটী ডাক্তারের সঙ্গে ওর নাকি বিয়ে—বিয়ে বলব? —না কি বলবেন?—পুরুতমশায়কে ডেকে ঠাকুরের সামনে প্রতিজ্ঞা, না কি যেন করিয়ে নেন—এই গোছের। ডাক্তার ত ফিরে গিয়ে উধাও! তারা মশাই ক'লকাতার লোক—এ সব কথায় ভুলবে কেন? বৌদি বল্‌তেন, সে নিশ্চয়ই আসবে। যখন এই সব ঘটে তখন আমি আবার বাড়ী ছিলেম না প্রয়াগে গিয়েছিলেম।··· আমি ফিরে বৌদিকে ঠাট্টা করতেম, খবর পেলুম আপনার জামাই উড়োজাহাজে করে আসছে, জমি টমি চোস্ত করে জায়গা করে রাখুন। অনেকদিন কেটে গেল এলো না, গভীর দুঃখ পেয়ে ভেবে ভেবে বৌদি মারাই গেলেন। ওর বিয়ে দেবার জন্যে ঢের চেষ্টা করেছি, কিছুতেই রাজি নয়। বলে, বে আবার কবার হয়? সেই তার পরথেকেই 'ফিট' হতে সুরু হয়েছে।··· অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিছুতেই কিছু নয়। যামিনীবাবুর মুখে আপনার কথা শুনেছি— আপনারা ত বড় "ফিল্ডে" থাকেন, দেখুন দেখি কিছু করতে পারেন নাকি?

কথা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল—মুখ শুখিয়ে উঠতে লাগল। অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার ক'রে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলেম, —যামিনীবাবু এঁর সম্বন্ধে কি 'ডায়োগনাইজ' করেছেন?

—কি আর?—'মেণ্টাল শক্‌'-ই যত বিভ্রাট আনছে—এই আর কি!

একটু চিন্তার ভাণ করে সামলে নিয়ে বলে উঠলেম,—সেই ডাক্তারের কোন পাত্তা করে উঠতে পারেন নি?—তার নামটী কি? কোথায় থাকেন?

ঈষৎ হেসে ভদ্রলোক বললেন,—সেইটাই ত মজার কথা! সে'টী আমার বৌদিও বলতে পারেন নি, নাম বলতেন বিনোদ। কোথায় বাড়ী তা জানতেন না। কত বিনোদ আছে, ঠিকানা না জানলে পাত্তা পাই কি করে বলুন ত?

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেম, আচ্ছা, আপনি ও-বেলায় আসবেন, ওষুধ ঠিক করে রাখব।

* * দুপুর ভোর চিন্তা করেছি—কিছুই ঠিক করতে পারলেম না!—সেই সুশীলা?—এ কী পরিবর্ত্তন!—সেই সোনার মত রং-ই বা গেল কোথায়—আর কোথায় সেই মুখশ্রী!—যেন আগুনে পুড়ে ঝল্‌সে গেছে!—তার এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে?—আমি?—না বাবা?—না তার মা?—না সে নিজে?···

চিন্তার জাল ছিন্ন করে ঘরে ঢুকল একটী বছর আষ্টেকের মেয়ে—ডাক্তারবাবু দাদু ডাকছেন আপনাকে—এক্ষুনি আসতে বললেন— পিসীমা 'ফিট' হয়েছেন।...বুঝতে বাকী রইল না —প্রস্তুত হয়ে রওনা হলেম। মনে স্থির বিশ্বাস হোল, এতদিন পরে আমিই তাকে চিনে উঠতে পারিনি, আর সে দেখেই আমাকে চিনে ফেলবে?—অসম্ভব!—বিশেষ তখন আমার এ-রকম 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি ছিল না।

···ঘরে পা দিয়ে দেখি রোগিনীর জ্ঞান হয়েছে—চোখ মেলে দ্বারের দিকে চেয়ে আছে।

ললিতবাবু জোরে জোরে মাথায় বাতাস দিচ্ছেন। আমায় দেখে বলে উঠলেন,—এই যে আসুন ডাক্তারবাবু !—এই মাত্র জ্ঞান হোল। আজ আর দাঁতি লাগেনি !

চোখে চোখে মিলতেই বিসদৃশভাবে চমকে উঠলেম,—সে-ও যেন একটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে আমার পানে চেয়ে রইল—চোখের পাতা নড়ে না ! প্রায় দু'মিনিট পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে চোখ মুদ্রিত করল। বেশ খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে চেয়ারখানা দখল করে বললেম,—দেখি হাতখানা !...সঙ্গেই ওষুধ ছিল। নানাবিধ পরীক্ষা করে মুখে খানিকটা ঢেলে দিলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যায় ললিতবাবু বিশেষ করে অনুরোধ করলেন,—সকলের ইচ্ছে, আপনি প্রত্যহ একবার করে 'সুশু'কে দেখে আসেন। আপনার এ-ওষুধটা বেশ কাজ করেছে মনে হচ্ছে !—এখন সে বেশ 'জলি'-ই আছে।

মৃদু হেসে সম্মতি দিলেম, তা আর হয়েচে কি ? বিকেলের চা'টা না হয় আপনার ওখানেই—

—বিলক্ষণ। আমরাই সাহস করে বলতে পারিনা—এত সুখের কথা !

আরো কিছুদিন কেটে গেছে। যামিনী ফিরে এসে তার চার্জ্জ নিতে আর হপ্তাখানেক বাকী। বলা বাহুল্য ললিতবাবুর পরিবারে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। সুশীলারও আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হয়েছে—এই কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে আর একবারও তার 'ফিট' হয় নি। সকলার প্রশংসা শুনে শুনে কাণ পর্য্যন্ত আকুল হয়ে উঠেছে। ...কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, সুশীলা কি আমায় চিনে ফেলেছে ? নিশ্চয়ই নয়—তাহলে এরকম সরলতার সহিত সে কথা বলত না। অবশ্য আমিও সাহস করে তার সঙ্গে বেশী কথা বলতেম না ! কি জানি ?

...যামিনী এসে চার্জ্জ নিল। নানবিধ আকর্ষণে মনটা দুলে উঠল। ললিতবাবুর নাতনী অরুণা কান্নাকাটি যুড়ে দিল,—না কিছুতেই যেতে দেব না আপনাকে !—আপনি চলে গেলে পিসিমাকে দেখবে কে ?...ছেলে বুড়ো সকলেরই ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পিসীমা অর্থাৎ সুশীলার অসুখ দেখতে একমাত্র আমারই অধিকার আছে।...মন অধীর হলেও সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—কেন ? তোমাদের পুরাণো ডাক্তারবাবু ত এয়েছেন। শিশুচিত্ত কিছুতেই মানতে চায় না।

এক পক্ষেরও অধিক হয়ে গেছে ফিরে এসেছি, কিন্তু সুশীলার চিন্তার হাত থেকে এখনো অব্যাহতি পাই নি। একটু ফাঁক পেলেই তার চিন্তা আমার মনের উপর সহস্র জাল বিস্তার করে প্রলয় নাচন সুরু করে দেয়। বিনতা আমার এই পরিবর্ত্তন দেখে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে জর্জ্জরিত করে তোলে—কিন্তু কোন সদুত্তর পায় না। এসব কথা কাকে কি বলবো ? থাকতেন যদি মা আজ ! —তাই বা কি হোত ?...

আরো কিছু দিন চলে গেছে। বিনতার সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, চাকর এসে একখানা টেলিগ্রাম এনে হাতে দিল। সন্ত্রস্ত করে খামটা ছিড়ে ফেললেম। পলাশী থেকে যামিনী 'তার' করেছে—

'কাম শার্প—সুশীলা হোপ্‌লেশ'—অর্থাৎ সুশীলার অবস্থা সাংঘাতিক, পত্র পাঠ চলে এসো।

ত্রিভুবন জ্বলে উঠল—দিশেহারা হয়ে পড়লেম। আমার অবস্থা দেখে বিনতা ভয় পেয়ে গেল—ওকি! অমন করছ কেন? সামলে নিয়ে বললেম,—কৈ না, কিছু ত নয়!

আবার প্রশ্ন হোল,—সুশীলা কে?

—কে আবার? একটি রুগী—বোধ হয় খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ওখানে আমি চিকিৎসা করেছিলাম কি না।...

সন্ধ্যের কিছু আগেই একখানা 'লোকাল' ছাড়ে। মোট ঘাট বেঁধে তৈরী হতে আরম্ভ করলেম। বিনতা বায়না ধরল,—আমিও যাব। ঠাকুর পো রয়েছেন, অত বড় বাড়ী বলো—কি আর? মাঠটা একবার দেখে আসা যাক।

জোর করে বাধা দিতে সাহস হয় না—যদি কিছু অন্যরকম মনে করে!

রাত ন'টা নাগাত দরজা ঠেলে যামিনীর ঘরে প্রবেশ করতেই সে চমকে উঠল,—এঁ্যা, 'হোয়াট এ ফরচুন্'! একেবারে জোড়ে!...সত্যি ভারী আনন্দ হচ্ছে।

বিনতা তাকে প্রণাম করল।

যামিনীই আরম্ভ করল, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে, ললিতবাবু এই যাচ্ছেন—উনিও 'এক্সপেক্ট' করছিলেন—এই গাড়ীতেই নিশ্চয়ই আসবি।

জিজ্ঞাসা করলেম,—ব্যাপার কি বল দেখি? আবার বুঝি ফিট হচ্ছিল?

—কৈ না! ক'দিন আগে 'প্লেগ ফিভারের' মত হয়েছিল। সে ত ওষুধ প্রভৃতি দিয়েছিলুম, কিছু কমে গিয়েছিল জানি। কাল গিয়ে দেখি একেবারে 'হাই টেম্পারেচার'—ঠিক 'হার্টের' ওপরে বুকে একটা টাকার সাইজের গভীর ঘা হয়েছে—একথা কাউকে এ পর্য্যন্ত জানায় নি। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে আমিই আবিষ্কার করলুম। ওষুধও সব রকম দিয়েছি—আজ নাকি অবস্থা আরও খারাপ, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। সকালে ললিতবাবুকে তোর নাম লিখে নাকি ডাকতে বলেছে—তাছাড়া ওদের-ও খুব ইচ্ছে।

একটা গভীর শ্বাস রোধ করতে পারলেম না—বিদ্রোহীর মত বেগে বেরিয়ে গেল। বললেম, চল্ তবে যাওয়া যাক্, 'রেষ্ট' পরে নিলেই হবে। বিনতা তুমি-ও চলো, ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বিনতা চাইল, কিছু বলতে সাহস পেল না বা বলল না।

...তিন জনে ঘরে প্রবেশ করলেম। ললিতবাবু বিনতাকে একখানা আসন দেখিয়ে দিলেন। একটী শীর্ণ ছবির মতো সুশীলা শুয়ে রয়েছে। আজ একটা বৈলক্ষণ্য দেখলেম, আমরা প্রবেশ করতেই শীর্ণ কম্পিত হাতখানি মেলে সে মাথার কাপড়টা টেনে দিল। পরীক্ষা করবার জন্য আমি তার পাশে গিয়ে বসলেম। বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে করুণ একটু হাসির রেখা মিলিয়ে গেল। হাত নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে আমায় সেইখানেই বসতে ইঙ্গিত করল। তারপর ললিতবাবুকে ইসারা করে কি যেন বলল। তিনি বললেন, আমাদের চলে যেতে বলছ? সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

সবাই চলে গেলেন—মাত্র আমরা তিনজন; বিনতা, যামিনী আর আমি। ধীরে ধীরে বালিসের তলা থেকে সযত্নে ভাঁজকরা একখানি কাগজ বার করে সুশীলা আমার হাতে দিল! কালচে লাল অক্ষরে লেখা,—দেখলে আতঙ্ক হয়!

...হঠাৎ একটা ঘোর স্পন্দন এসে তাকে ছেয়ে ফেলল—তার শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হোল।

ধড়মড় করে উঠে একখানা হাত চেপে ধরলেম—শীলা!

আমার হাতে হাত রেখেই বারেকের তরে কটমট্ করে চেয়ে সে থেমে গেল। যামিনীর চীৎকারে ললিতবাবু ছুটে এলেন, কি ব্যাপার? কি হোল?—চীৎকার করে উনি কেঁদে উঠলেন। যামিনী শুদ্ধ রুমাল বার করে চোখে চাপা দিল।...কিন্তু আশ্চর্য, আমার চোখে আজ যেন অশ্রুর উৎস শুখিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!...আমিই প্রবোধ দিলেম, অমন করে কর্ত্তব্য ভুললে চলবে না ললিতবাবু। বিনতা, উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে এইখানে বোস।...সেই কাগজখানি খুলে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেম:

প্রিয়তম,—

ভেবেছিলে চোখকে আমার বড্ড ফাঁকি দিয়েছ, না? কেমন ধরে ফেলেছি বলো দিকি! এ লুকোচুরি খেললে কেন? ওগো এ ছলনা করতে কে তোমায় বলেছিল?—মুখ ফুটে বললে না কেন, ভুলে যাও! পুরুষ জাত এত নিষ্ঠুর? আমরা কি তোমাদের খেলার সামগ্রী? যে ইচ্ছে হলেই ভেঙে ফেলবে, না হয় তুলে রাখবে? ...মাত্র ক'দিনের দেখায় আমায় কেড়ে নিয়েছিলে কেন? যদি ইচ্ছেই ছিলো না, অমন করে লোভ দেখিয়ে আমাদের মজিয়েছিলে কেন? দীর্ঘ একযুগ নিস্ফল অন্বেষণ করে বাধ্য হয়ে শেষে বিধবার সাজ পরেছিলুম। যদি বিশ্বাস করো তাহলে বলি কিন্তু প্রাণ তা চায়নি—সে জেনেছিল তুমি আসবেই আসবে।

চরম সময়ে যে তোমার দেখা পাব, তা-ও জানি। তাই আজ আমি ধন্য। আর বিরক্ত করবো না—শেষ মিনতি, মাথায় পায়ের ধুলো দিও—সিঁদুরের দাগ যে নিজের হাতে মুছে ফেলেছি!...বুকের রক্ত দিয়ে লেখা এই কথাগুলি পালন কোরো এই আমার অনুরোধ।

—তোমার আদরের 'শীলা'।

টপ্ টপ্ করে ক'ফোঁটা জল চিঠির ওপর পড়ে রক্তের রেখা কতক কতক ধুয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছে ললিতবাবুর হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিলেম,—একটু সিঁদুর, আলতা, আর লাল পেড়ে একখানা শাড়ী আনিয়ে দিন পিসেমশাই!...মুগ্ধ বিস্ময়ে উনি আমার পানে তাকালেন।

তোমার দিদির পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আলতা পরিয়ে দাও, বীণ', আমি সিঁদুর দিয়ে দিচ্ছি।...

নারীর দাবী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

দ্বিপ্রহরে আহার শেষ করিয়া স্বামী আচমনের জন্য উঠিয়া গেলে মহালক্ষ্মী সেই থালায় নিজের জন্য অন্নব্যঞ্জন রাখিতে রাখিতে শুনিতে পাইল, কলতলা হইতে তপোধন চীৎকার করিতেছে—"আমার চটি।"

তপোধনের চটি জোড়াটা ছিল দ্বিতলের বারাণ্ডায়।

স্বামীর ডাক শুনিয়া মহালক্ষ্মী প্রথমটা হতভম্বের মত হইয়া গেলেও শেষে তাহার আদেশ পালন করিল, কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্তে নয়, তাহার মনের কবাটে বার বার কেবল এই কথাটাই ধাক্কা মারিতে লাগিল, এই তাহার স্বামীর রূপ! ...স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক এখানে নাই,·· সে তাহার স্বামীর চক্ষে হয়ত বা দাসী বা বাঁদী বা এই রকমের একটা কিছু, কিন্তু ..."

পুনরায় উপর হইতে আহ্বান আসিল—"তামাক সেজে দাও."

মহালক্ষ্মী বলিল—"আমি খেতে বসেছি।"

উত্তর আসিল—"দিয়ে খেতে ব'স···"

মহালক্ষ্মীর সারা দেহে ক্রোধের মাতন সুরু হইল। একবার মনে করিল যাইবে না।··· স্বামীর ঘরে আজ প্রথম আসিয়া তাহার যে ব্যবহার দেখিতে পাইল, তাহাতে বুঝিল তাহার হুকুম এমনি ভাবে নানাদিক দিয়াই বাড়িয়া চলিবে।...কিন্তু তখনই আবার কি ভাবিয়া সে তামাক সাজিতে গেল।

গড়গড়ার নলে কলিকা বসাইয়া দিয়া মহালক্ষ্মী যখন চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিল, তপোধন তখন বলিয়া উঠিল—"একটুক্‌রো টিকের আগুন দিলেই ত হ'লনা, হাওয়া দিয়ে এগুলো ভাল করে ধরিয়ে দাও।"

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর ফেলিয়া মহালক্ষ্মী বলিল—"এতখানি অলস যে, তার এমন নেশা না করাই ভালো।"

মহালক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল।

তপোধন গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

আহারাদি শেষ করিয়া মহালক্ষ্মী ঘরে আসিলে গম্ভীর ভাবে তপোধন বলিল—"দেখ লক্ষ্মী, তোমায় আমি বিয়ে করেছি একটু আরামের জন্যে, একটু সুখ-শান্তি ভোগ করব বলে।"

সহজভাবেই মহালক্ষ্মী বলিল—"স্বামীর সুখ-শান্তির জন্যে প্রত্যেক স্ত্রীই তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত করে, আমিও করব।···কিন্তু যদি দাসী বা বাঁদীর মত মনে করতে চাও আমি নারাজ।"

আর কোনও কথা না বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গম্ভীর ভাবে তপোধন বলিল—"থাক থাক, ওসব দাসী-বাঁদীর কাজ।···"

স্মিত হাস্যে মহালক্ষ্মী বলিল—এগুলো আমাদের কর্তব্য। এটা আমার স্বেচ্ছায় করা, কাজে কাজেই অমনটা ভাববার তোমার দরকার নেই।···

তপোধন আর কোনও কথা না বলিয়া গড়গড়ার নলে টান দিতে লাগিল।···

মহালক্ষ্মী বলিল—"বেলা দু'টো পর্য্যন্ত বাইরে

কর কি ! কাল থেকে এগারটার সময় তোমায় খেতে হ'বে জানলে, অতখানি বেলা পর্য্যন্ত পেটে কিছু না পড়লে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে।..."

উদাস ভাবেই তপোধন বলিল—"আমায় সুখ অসুখের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক বল ?..."

তেমনই হাসিয়া মহালক্ষ্মী বলিল—"ছিঃ ও কথা বলতে নেই।"

দুই

কিছুদিন কাটিল...মহালক্ষ্মীর শত অনুরোধেও তপোধন তাহার চলাপথ হইতে ফিরিয়া আসিল না।...

সেদিন তপোধন অন্য দিন অপেক্ষা একটু সকালেই বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে আজ একটু অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য সে'টা নিজের ইচ্ছায় নয়, মহালক্ষ্মীর অনুরোধ।

কিন্তু দশটা বাজিয়া গেলেও তপোধন ফিরিয়া আসিল না। মহালক্ষ্মীর অন্তরটা কেমন যেন উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। এ দিককার কাজ তাহার সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাতও নামিয়া গিয়াছে, বাজার আসিলে তবে ওর যাহা হয় রান্না হইবে।...কিন্তু কোথায় কে ?...

এই সৃষ্টিছাড়া আত্মসুখসর্ব্বস্ব লোকটাকে আর পাঁচ জনের মত গড়িয়া তুলিবার জন্য সে এত চেষ্টা করিয়াও নিজের অলসতার জন্য ক্রোধটা গিয়া পড়িল তপোধনের উপর।

পাকশাল তাহার ভাল লাগিল না।...স্থান ত্যাগ করিয়া সে উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়িতে পা দিতেই পাশের বাড়ীর একটী মেয়ে আসিয়া বলিল—"বৌদি, খানকতক ঘুঁটে দেবে ? আমরা আঁচ দিতে পাচ্ছি না।"

এক মুহূর্ত্ত মহালক্ষ্মী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার স্বামীর ব্যবহার সে জানে, এই সামান্য সাহায্যের জন্য হয়ত তাহার নিকট তিরস্কার লাভ করিবে।...তবুও কি একটু ভাবিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে এস।..."

ঘুঁটে লইয়া মেয়েটা চলিয়া গেল।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় মহালক্ষ্মী বসিয়া দারুণ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।...

অবশেষে ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যখন বারটার ঘরে আর বড় কাঁটাটা দুইটার ঘরে যাইয়া পৌছিল, ঠিক সেই সময়ে তপোধন বাজার লইয়া উপস্থিত হইল।...

মহালক্ষ্মী প্রথমটা গম্ভীর ভাবে থাকিলেও, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই জিজ্ঞাসা করিল—"আজও সেই দেরী করলে ?"

তপোধন উত্তর করিল—"কি করব ? ছাতুবাবুর বাজারে শাক সস্তা সেখান হ'তে শাক কিনে গেলুম হাতি বাগানের বাজারে। সেখানে মাছ কিছু সস্তা, এই অতগুলো চিংড়ি এর দাম দু'পয়সা। অন্য বাজারে ঐ দামে এর অর্দ্ধেক। কিন্তু আলু মাগ্যি কাজেই নতুন বাজার ছুটতে হ'ল সেখান হ'তে আলু কিনে—"

বিরক্ত কণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"শোভা বাজারে বেগুন সস্তা যেখান হ'তে বেগুন কিনে...কিন্তু তোমার জানা উচিত—তুমি আড্ডায় তামাক আর চায়ে পেট ভরালেও আর একজনের ক্ষিধে তেষ্টা আছে।..."

স্বাভাবিক সুরেই তপোধন বলিল—"কেন ? তোমাকেও ত আমি জলখাবারের পয়সা দিয়ে গিয়েছি।"

মহালক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"পয়সা দেখলে যদি ক্ষিধে মিটতো তাহ'লে তোমাকে বাজার করবার জন্য ছুটতে হ'ত না, আর জগতটা কাটাকাটি মারামারি করে মরত না।...দু'টো চারটে পয়সা—

বাধা দিয়া অতিষ্ঠভাবেই তপোধন বলিয়া [illegible]—"দেখ লক্ষ্মী, বড্ড বেশী কড়াকড়ি আমি

কোনও দিনই পছন্দ করি নি, তুমি যেমন তোমার তেমনই থাকাই উচিত, মেয়েমানুষের পরামর্শ নিয়ে চলতে বাবাও কোনও দিন শেখান নি, আমিও কোনও দিন শিখি নি।···

স্বামীর এই উত্তরের পর মহালক্ষ্মীর অন্তরের মধ্যে ক্রোধের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহার লোহিত বর্ণের হল্‌কা যেন তাহার সমস্ত মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। উত্তেজনার আধিক্যে প্রথমটা মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "তা' যদি না শিখে থাকো, তা' হ'লে তোমার বিয়ে না করে অন্য ব্যবস্থা করাই উচিত ছিলো।···যে স্বামী স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখতে পারে না তার—তার—"

মহালক্ষ্মীর চক্ষের দুই কোণ দিয়া হু-হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে আর কিছু না বলিয়া সেইস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

তিন

মহালক্ষ্মীর ব্যবহার তপোধনের চক্ষে ক্রমশঃই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।...স্ত্রী সব সময়েই তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে, সংসারে কাজ করিবে দাসীর মত, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। এবং এই ধারণাটাকেই সত্য মনে করিয়া সে বিবাহ করিয়াছে একরূপ ভিখারীর কন্যাকেই।...মহালক্ষ্মীও তাহা জানে, কিন্তু জানিয়াও সেখানে তাহার উপর কৃতজ্ঞ হইবে, দেবতার মত ভক্তি করিবে, না, একেবারে কল্পনায় বিপরীত ব্যবহার ?···

আহারাদির পর তপোধন গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে স্থির করিল—লক্ষ্মীকে আজ স্পষ্টই বলিয়া দিবে তাহার এই ঔদ্ধত্য সে আর বরদাস্ত করিবে না। বরং তাহাকে নিজের মনের মত করিতে যদি ইতরোচিত ব্যবহারও করিতে হয় তাহা করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না।

কিন্তু এই কথাটা শুনিবার জন্য মহালক্ষ্মী আজ আর তাহার নিকট আসিল না।...সে তখন গৃহান্তরে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল।...সংসারের বাস্তব ক্ষেত্রে স্বামীর এই হৃদয়হীন ব্যবহারের প্রতিঘটনাটি তাহাকে যেন কোন এক ধ্বংসপুরীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই টানিয়া লইতেছিল, ..উৎসাহ আনন্দ চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া গেল। . ধ্বংস যেন রুদ্র হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। তবুও সে তপোধনের স্ত্রী।···

কিন্তু স্ত্রীর মর্য্যাদা মহালক্ষ্মী যদি স্বামীর নিকট হইতে না-ই পাইল, তবে কি সার্থকতা তাহার জীবনে ?···এমন ভাবেই তাহাকে তাহার জীবনের বাকী দিনগুলা কাটাইয়া দিতে হইবে ঠিক বেতনভোগী দাসীর মত ?...কেন ? স্বামী পায়ের তলায় দাবাইয়া রাখিতে চায়, তবু সে তাহা সহ্য করিবে কেন ?...স্বামীও যেমন তাহাকে শিখাইতে চায়, তাহার পক্ষেও স্বামীকে শিক্ষা দিবার যথেষ্ট কিছু আছে। নারীত্বের অবমাননা সে সহ্য করিবে না কিছুতেই।...

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহালক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কি একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেই তপোধন বলিয়া উঠিল—"আমি বাইরে বেরুবো, আমার জুতা জোড়াটা বুরুশ করে দাও দেখি।···"

গম্ভীরভাবে মহালক্ষ্মী বলিল—"তার জন্যে মুচি আছে, তারা জুতো বুরুশ করে। কিন্তু আমার একটা বলবার আছে।

তপোধন তাহার মুখের দিকে চাহিতেই মহালক্ষ্মী বলিল—"দিন কতক বাপের—"

অবশিষ্ট কথা না শুনিয়াই তপোধন বলিল—"মুচিকে দিয়েই আমি জুতা ব্রুশ করিয়ে নেবো, তুমি

যখন অপমানই বোধ কর তখন আর তোমায় বলব না, কিন্তু বারাণ্ডার এই রেলিং আর লোহা গুলোতে কত ধুলো জমে রয়েছে, বালতি করে জল তুলে এনে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সব পরিষ্কার করে রাখো, এসে যেন আমি দেখতে পাই।…

তপোধন আর কোনও কথা বলিল না, স্ত্রীর নিকট হইতে কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষাও করিল না, জুতাজোড়াটা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।…

চার

রাত্রে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মহালক্ষ্মী যখন অন্য দিনের মত স্বামীর পদসেবা করিল না বা একটা কথাও বলিল না, তপোধনের অন্তর তখন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, ডাকিল—"লক্ষ্মী ?"

মহালক্ষ্মী স্বামীর ডাকের উত্তর দিল না। যেমন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, তেমনিই রহিল।…

তপোধন পুনরায় ডাকিল—"লক্ষ্মী।"

কণ্ঠে ঔদাসীন্যতা মাখাইয়া মহালক্ষ্মী বলিল—"কেন ?"

তপোধন বলি..—"আজ যে কথা বলছ না তুমি ?"

স্বামীর কথায় মহালক্ষ্মীর অন্তরের মধ্যে কান্না গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। সে তাহা। কথার উত্তর দিল না।

লক্ষ্মীকে বুকের কাছে টানিতে টানিতে তপো-ধন বলিল—"রাগ করেছ লক্ষ্মী, ছিঃ!"

তপোধনের কণ্ঠস্বর রুক্ষ নয়, মিষ্টতা ভরা।…

স্বামীর এই আদরে মহালক্ষ্মীর বুকের মধ্যে অভিমানের সপ্তসমুদ্র উথলিয়া উঠিল।..কান্না তখন কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। অশ্রুতা। চারিদিক ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে।…কথা বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তখন তাহার ছিল না।

..র চক্ষের জল তপোধনের অন্তরকেও মুষড়াইয়া দিল, আবেশপ্লুতকণ্ঠে বলিল—"কাঁদছ কেন লক্ষ্মী!…"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিল, "পায়ের জুতো যে, তার সেই রকম থাকাই ভাল। মেয়েমানুষের আবার সাধ-আহ্লাদ! তা'র আবার কথা!"

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তপোধন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। লক্ষ্মীকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উদাসভাবেই পড়িয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার কোন্ ব্যবহারে লক্ষ্মী এতখানি আঘাত পাইয়াছে। অন্ততঃ সেই সময়টার জন্য সে ভুলিয়া গেল, মহালক্ষ্মীর সহিত সে কিরূপ ব্যবহার করে। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল: "আমার স্বভাবই ত ঐ রকম তুমি জান; তার জন্যে কি দুঃখ করতে আছে ?"

মহালক্ষ্মীর হিয়ার পরতে পরতে অভিমানের ছাপ আরো চাপিয়া বসিয়া গেল।…

তপোধন পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমার স্বভাবটাকে যে আমি কোনও দিক দিয়েই বদ-লাতে পারছি না লক্ষ্মী, তোমার কথা মত আমি চেষ্টা করি, সময় মত সব করবার জন্যে, তোমার মনের মত হ'বার জন্যে, কিন্তু এতদিনের অভ্যাস দু'এক মাসেই কি বদলাতে পারব ?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমায় অপমান কর কেন ?"

"অপমান…কৈ না ত ?" বলিয়া তপোধন বলিতে লাগিল—"কিছু মনে করো না লক্ষ্মী তোমাকে অপমান করবার জন্যে নয়, আমার স্বভাব, হয় ত ভাল কথা বলতে জানি না,—গলার স্বর কর্কশ, তাই হয় ত তোমার বুকে লাগে কিন

এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও, আমাকে বোঝবার চেষ্টা করলে না তুমি, এ দুঃখটাও আমার কম নয় লক্ষ্মী!

তপোধন মহালক্ষ্মীকে নিবিড়ভাবে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিল।

মহালক্ষ্মীর অভিমান ঘুচিয়া গিয়া তাহাকে এক পুলকের ঝরণায় স্নান করাইয়া দিল, স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—আমার অন্যায় হয়েছে—মাপ কর।...

তাহার অধরে সোহাগের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া তপোধন বলিল—"দেখ দেখি লক্ষ্মী, আকাশের গায়ে কেমন চাঁদ হাসছে।..."

উন্মুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া চাঁদ দেখিতে দেখিতে মহালক্ষ্মীর মুখের উপরে হাসির লহর খেলিয়া গেল।

পাঁচ

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডার রেলিং পূর্ব্বের মতই ধুলি মলিন দেখিয়া মহালক্ষ্মীকে তপোধন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ গুলো কাল পরিষ্কার কর নি?"

সহজভাবেই মহালক্ষ্মী বলিল—"পরিষ্কার করবার মত মনের অবস্থা কাল ছিলো না।"

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তপোধন বলিল—"আজ কর, দেখ দেখি কত ময়লা জমে রয়েছে।...

মহালক্ষ্মীর অন্তরে গত কল্য পর্য্যন্ত যত খানি কালির দাগ পড়িয়াছিল, গত নিশার স্বামীর আদরে তাহা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, স্বামীর কথায় পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিল—"তুমি জল তুলে দাও আমি পরিষ্কার করি, কেমন?..."

তপোধন অন্তরের অন্তর বোধহয় নরম সুরেই বাঁধা ছিল, তাই স্মিত হাস্যে বলিল—"তা'কি আমি পারি না মনে কর না কি?"

উজ্জ্বল-দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর ফেলিয়া সহাস্য কণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিল—"তাই নাকি?... আমি ত জানি, মশাই একজন কুঁড়ের বাদশা, তামাক খাওয়া, আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ জানা আছে বলে আমার ত মনে হয় না।..

কিসের একটা আগুন আজ তপোধনের দেহের অনুপরমাণুতে খেলিয়া গেল, সে বলিল—"বেশ! আমি জল আনছি, তুমি ততক্ষণ কতকটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এসো।..."

তপোধন বাল্‌তি ভরিয়া জল আনিয়া রেলিং এর উপর ঢালিতে লাগিল; আর মহালক্ষ্মী ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড জলে ডুবাইয়া রেলিংএ সন্নিবিষ্ট ধুলি মাটী পরিষ্কার করিতে লাগিল।...

রেলিং-এ জল দিতে দিতে তপোধন এক অঞ্জলি জল লক্ষ্মীর মুখের উপর ছিটাইয়া দিতেই স্নিগ্ধ হাস্যে সে বলিয়া উঠিল,—"আর কাজ নেই খুব হয়েছে। তুমি দাঁড়াও আমিই পরিষ্কার করছি।..."

শুষ্ক গামছার দ্বারা স্বামীর আর্দ্রদেহ মুছাইতে মুছাইতে লক্ষ্মী বলিল—"কাপড়ও ভিজে গেছে দেখছি যে।...এস তেল মাখিয়ে দিই, একেবারে স্নান করে ফেল।..."

লক্ষ্মীর ব্যবহারে তপোধনের অন্তর আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। এতখানি আনন্দ বোধ করি আর সে কোনও দিন পায় নাই, চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটাইয়া বলিল—"বেশ ত!"

মহালক্ষ্মী স্বামীকে তেল মাখাইয়া তাহার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়া বলিল—"যাও, স্নান করে এসো। না, আমিই স্নান করিয়ে দেবো।..."

স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া তপোধন বলিল—"আজ কার মুখ দেখে উঠেছি লক্ষ্মী?"

স্বামীর গণ্ডদেশে আঙুলের চাপ দিয়া মহালক্ষ্মী বলিল—"রোজ যার দেখে ওঠ!...চল তুমি, আমি বারান্দাটা মুছে যাচ্ছি।"

অন্তরে একরাশ আনন্দ লইয়া তপোধন নীচে নামিয়া গেল।

কিন্তু তাহার এই আনন্দ নীচে নামিতেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।...একরাশ অস্বচ্ছন্দতা লইয়া ডাকিল—

উপর হইতেই মহালক্ষ্মী বলিল—"যাচ্ছি"।...

আজ আনন্দ তাহার অন্তরের কানায় কানায়, প্রাতঃকালটী স্বামী-স্ত্রীর যেভাবে কাটিতেছে এইটাই ত সে চাহিয়া আসিয়াছে। এমনই হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া দুইজনে একটী সম্পূর্ণ সত্বা হইয়াই সে দিন কাটাইতে চায়।...পায় নাই বলিয়াই ত' তাহার দুঃখ।...উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সে নামিতে নামিতে স্বামীকে গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ?...চল—"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তপোধন জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তিনদিন ঘুঁটে কেনা হয়েছে, আজই প্রায়শেষ হয়ে গেল?...

সহজভাবেই মহালক্ষ্মী বলিল—"ও বাড়ীর কাল ঘুঁটে ছিল না, তাই খানকতক তাদের দিয়েছি।..."

তপোধনের প্রাতঃকালের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"এমন ভাবে দান করবার তোমার কি অধিকার আছে,... তোমার জানা উচিত তোমার মাথার ওপর একজন লোক আছে, যার পয়সায় এই সব কেনা হয় —আমার শ্বশুরের পয়সায় নয়।...

মহালক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহাকে তপোধন যতখানি অপমানিত করিয়াছে তাহা তাহার সহ্যের বাহিরে হইলেও সে বাধ্য হইয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই সামান্য স্বাধীনতায় তাহার পিতাকে পর্য্যন্ত যেভাবে টানিয়া আনিল, তাহাতে সে একটা কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ করিল, ঠোঁটটাকে দাঁতে কামড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত পর মহালক্ষ্মী বলিল—"কাজটা আমার অন্যায় হয়েছে।"

সেইস্থানে আর না দাঁড়াইয়া মহালক্ষ্মী উপরে উঠিয়া গেল। সেই দিন দ্বিপ্রহরে স্বামীকে আহার করাইয়া মহালক্ষ্মী বলিল—এখানে "এতখানি হীনভাবে থাকা আমার চল্‌বে না। আমি বাবার কাছে চল্‌লুম..."

তপোধনের মুখ দিয়া "হঁ।" কি "না" কোনও কথাই বাহির হইল না। মহালক্ষ্মী নীচে নামিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল।...

ছয়

সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মহালক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পিতা-মাতা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি লক্ষ্মী?...কোন খবর নেই, কিছু নেই, হঠাৎ এমনই ভাবে একা চলে এলি?—জামাই কোথা?..."

কান্নার মত করুণ হাসিয়া মহালক্ষ্মী বলিল—"তোমাদের দেখতে এলুম বাবা—অনেক দিন দেখি নি, মনটা কেমন করছিল।"

"কাজটা বড় ভাল করিস নি মা," বলিয়া প্রতাপ বাবু বলিতে লাগিলেন—"নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোনও স্ত্রীলোকেরই বাইরে বেরোনো উচিত নয়,... তা তুই যে এলি, বাবাজী তা' জানে?..."

তেমনই হাসিয়াই মহালক্ষ্মী বলিল—"তাকে বলেই এসেছি।"

প্রতাপ বাবু আর কোনও কথা বলিলেন না, কিন্তু মহালক্ষ্মীর মাতা বলিতে লাগিলেন—"হাঁ রে! জামাই এলো না কেন?..."

অপ্রসন্ন মুখে মহালক্ষ্মী বলিল—"আসবে'খন।"

জননীর প্রাণ কিন্তু কন্যার এই উত্তরে পরি-

তৃপ্ত হইল না। তিনি বলিলেন—"ঝগড়া করে এসেছিস না কি বল দেখি, জামাই যে একলা এমনি ভাবে ছেড়ে দিয়েছে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না মা, আমাকে সব কথা খুলে বল।"

মাতার পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্নে মহালক্ষ্মী ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া উঠিলেও বাহিরে সেটা প্রকাশ না করিয়া সহাস্য মুখে বলিল—"এলুম মা তোমাদের দেখতে, ভাইগুলিকে নিয়ে কোথায় একটু খেলা করব, তা নয়, তোমার জিজ্ঞাসার বহরে আমাকে এখুনি চলে যেতে হ'বে দেখছি।..."

মা-ও আর কোনও কথা বলিলেন না।

সে-যাত্রা মহালক্ষ্মী অব্যাহতি পাইল।...

দুই একদিন পরে আহারাদির পর প্রতাপবাবু বলিলেন—"চল লক্ষ্মী, আজ আমি তোকে রেখে আসি।..."

আর্তকণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিল—"আমি কি তোমার বড্ড বেশী ভার হয়ে পড়েছি বাবা!"

শান্ত শীতলকণ্ঠে প্রতাপবাবু বলিলেন—"এত বড়টা করলুম, তখন ভার বোধ হয় নি আর আজ হবে? তা নয় মা, তবে কাজটা বড্ড খারাপ করেছিস তুই! সে যেমনই হোক এমন ভাবে চ'লে আসা তোর উচিত হয়নি!...আমি সবই শুনেছি লক্ষ্মী,...বোকামী ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনিস নি... চল্ মা, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।..."

মহালক্ষ্মীর পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন দুলিয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল—"তোমার অবাধ্য আমি হব না বাবা, একান্তই যদি নিয়ে যেতে চাও যাবো, কিন্তু আমার পথ আমাকে দেখে নিতে হবে।...

প্রতাপবাবু স্তব্ধ হইয়া গেলেন।...এই সেই লক্ষ্মী!...সে লক্ষ্মী ত এমন ছিল না, সে যে ছিল সদানন্দময়ী, ধরিয়া প্রহার করিলেও যাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইত না, তাহার মুখ দিয়া আজ যে কথা বাহির হইল, তাহা কতখানি না মর্ম্মান্তিক! ভবিষ্যৎ আশঙ্কার একটা কালো ছায়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, তবুও বলিলেন—"কী যে একটা—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"একটা নয় বাবা! প্রত্যেকটা, তুমি যাবার কথা আমাকে বলছ, আমি যাবো।...কিন্তু যতক্ষণ না সে আমাকে নিজে নিতে আসে বা ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করবার প্রতিজ্ঞা না করে ততদিন—।" কথা সমাপ্ত না করিয়াই সে থামিয়া গেল।

একথার পর প্রতাপবাবু আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তরের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন সুরু হইল।...কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া এইটাই স্থির করিলেন, লক্ষ্মীকে এখন না লইয়া গিয়া জামাতাকেই আজ সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারা তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

সঙ্কল্প মত প্রতাপবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

তপোধন কিন্তু আসিল না।...প্রতাপবাবুর বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।...

ইহারই চার পাঁচ মাস পরে অন্তরে একরাশ চাঞ্চল্য লইয়া প্রতাপবাবু গৃহিণীকে একদিন উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"দেখ গিন্নি, লক্ষ্মীকে মত করিয়ে যদি পাঠাতে পার, অন্যের কাছে খবর পেলুম বাড়ী ঘর বিক্রি করে বাবাজী কাশী বাস করবে।..."

গৃহিণীকে কোনও কথাই বলিতে হইল না, মহালক্ষ্মী সেইস্থানেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া উঠিল—"তার মত লোকের কাশীবাস করাই উচিত বাবা, সমাজে বাস করা তার চলে না!..."

তোমরা আমাকে যাবার কথা যতই ব'ল, নিজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করে যদি সে কোনও দিন আমাকে নিতে আসে তবেই যাবো,—তা' না'হলে নয়।..."

বলিয়াই সে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

—সাত—

আরও কিছুদিন কাটিল।

তপোধন কিন্তু কাশীবাস করিতেও গেল না, বা শ্বশুরবাড়ী একটা দিনের জন্যও আসিলনা।...

তাহার জন্য মহালক্ষ্মীর অন্তরে অশান্তির ভাব না জাগিলেও কোনও কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না।...পিতামাতার দুঃখ,সঙ্গিনীদের টিট্‌কারী তাহাকে যেন উদাসীনতায় ভরাইয়া তুলিতে লাগিল।...আকাশের চাঁদ, গাছের ফুল তাহার প্রাণে পুলক ছড়াইয়া দিতে পারিল না, বসন্তের মলয় বা কোকিলের মিষ্ট স্বর তাহার প্রাণের মধ্যে বিশেষ কিছু আলোড়ন তুলিতে পারিল না।...বসুন্ধরার বুকে সে বাস করিতে লাগিল, বাস করিতে হয় বলিয়াই।... ছোট ছোট ভাইগুলির সঙ্গে খেলা করে, সংসারের কাজ কর্ম্মেও অবহেলা করে না, সখিদিগের সহিত হাসি তামাসাও রীতিমত চলে, কিন্তু একটার মধ্যেও প্রাণ নাই—

মহালক্ষ্মীর দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল এমনিভাবেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়া গেল।...দুইটা বৈশাখ পার হইয়া আষাঢ় আসিয়া দেখা দিল।...

সেদিন রাত্রির অহারাদির পর মহালক্ষ্মী কি একটা কাজের জন্য পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে আর প্রবেশ করিতে পারিল না। দাওয়া হইতে শুনিতে পাইল—প্রতাপবাবু গৃহিনীকে বলিতেছেন—"তপোধনের অসুখটা বড় শক্ত হয়ে উঠেছে গিন্নি; অথচ তাকে দেখবার আর কেউ নেই যাবে কাল? এসময় আমাদের একবার সেখানে যাওয়া উচিত..."

অবশিষ্ট কথা শুনিবার মত শক্তি মহালক্ষ্মী হারাইয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল কে যেন তাহার পৃষ্ঠে সপাং করিয়া একঘা চাবুক বসাইয়া দিয়াছে।...

সে তাড়াতাড়ি আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিল। তাহার দুই চক্ষুর কোণ দিয়া অভিমানের উৎস ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, ইহারা তাহাকে এতখানিই হীন ভাবে, যে, তাঁহার এত বড় অসুখের কথাটাও বাবা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে ঘৃণা বোধ করেন।...

করুন, কিন্তু তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য করিতেই হইবে। সে যে আয় আয় বলিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে!...

রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় সে স্বপন দেখিল—তপোধন যেন তাহাকে তাহার অবাধ্যতার জন্য বেতের আগা দিয়া প্রহার করিতেছে। কর্কশ কণ্ঠে বলিতেছে—কোন্ অধিকারে তুমি আমার জিনিষ এমনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছ?... জান, মাথার উপর একজন আছে যার পয়সায় এইসব কেনা হয়?

মহালক্ষ্মীর নিদ্রা টুটিয়া গেল।...

পৃথিবীর বুক হইতে রাত্রি তখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল—প্রতাপবাবু দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন।...

ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া লজ্জাতুরকণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিল—"আমায় আজ রেখে আসবে বাবা?...

উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রতাপবাবু বলিলেন—"এসময়ে তোর-ই ত যাওয়া উচিত!...তাই চ' মা!

রাজরাণী

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে নিত্যনিয়মিত তাসের আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

হাতের তাসগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ প্রকাশ চৌধুরী উৎকর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওপাড়ার দিকে কি যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না মুখুয্যে মশাই? যেন একটা কান্নাকাটির আওয়াজ।"

তাসের খেলোয়াড়গণ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সত্য সত্যই একটা কান্নার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল বটে।

কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। নিতাই বৈরাগী তাহার দোকান বন্ধ করিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করিয়া সেই পথে নিজের বাড়ী যাইতেছিল, চণ্ডীমণ্ডপে ইঁহাদের দেখিতে পাইয়া বলিল, "আহা মুখুয্যে-মশাই, একটা সংসারের মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। মধু ভট্‌চায্যি মশাই মারা গেলেন।"

"এ্যাঁ, মধু ভট্‌চায্যি মারা গেল? বল কি নিতাই? শুনে এলে, না দেখে এলে?"

"আজ্ঞে স্বচক্ষে দেখে এলাম। মেয়েটা আছাড়ী পাছাড়ী খাচ্ছে, পরিবারটা ভিরমি গিয়েছে, আহা, এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়!"

নিতাই চলিয়া গেল।

দুই এক জন প্রায় সমস্বরেই বলিল, "আহা!"

কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় ওরফে রতন মুখুয্যে বলিলেন, "এতে আর দুঃখু করবার কি আছে?"

প্রকাশ চৌধুরী বলিলেন, "আহা, নিজে তো গেলই, একটা সংসারকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটা ছেলেটা আর পরিবারটার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন দিকি মুখুয্যে মশাই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটু শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "দেখছি বই কি ভেবে। তোমার বেশী ভাবনা হয়ে থাকে যাও না হে প্রকাশ, তাদের ভার নাও গে।"

ইঙ্গিতটা প্রকাশ চৌধুরী বুঝিলেন। মুখোপাধ্যায়ের কথার প্রতিবাদ করা নানা কারণে সুবিধাজনক নয় তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "বলি ভুলে গেলে নাকি হে, সেবারের ঘটনাটা। তার প্রতিফল পাবে না? কি করে যে মধু ভটচায্যির সৎকার হয় তাই আমি একবার দেখবো।"

এই কথায় তাসের খেলোয়াড়গণের উৎসাহ যেন হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মধু ভট্টাচার্য্য কবে কি করিয়াছিলেন, এবং সে-সকল যে কত-দূর অন্যায় কার্য্য—গ্রামের এই সব মহাপুরুষেরা যে তাঁহার কত শত গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় চণ্ডীমণ্ডপ অতি অল্প সময় মধ্যেই বিলক্ষণ সরগরম হইয়া উঠিল।

অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে মধুভট্টাচার্য্য যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন যথেষ্ট সহ্য করা গিয়াছে, এখন আর তাঁহারা কোন ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে প্রস্তুত ন'ন। সুতরাং কিরূপে যে মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় তাহা তাঁহারা দেখিয়া লইবেন।

দুই

বছরখানেক পূর্ব্বের কথা।

বাংলাদেশের অবস্থাহীন লোকেদের ম্যালেরিয়া একটা নম্বের সামিল। বৎসরের পর বৎসর তাহারা বর্ষার পরে পেটজোড়া প্লীহা লইয়া এই ব্যাধিটীর করতলগত হয় এবং পোষ্টাফিসের সস্তা কুইনাইন ক্রমাগত সেবন করিয়া কয়েক বৎসর পরে যখন রোগটা কালাজ্বরে দাঁড়ায়, তখন কেহ কেহ হয় ত, জেলার হাঁসপাতালে যাইয়া ইনজেকসন লইয়া পরমায়ুর জোরে বাঁচিয়া উঠে, কেহ কেহ বা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এমনি বরাবরই হইয়া আসিতেছে, ইহা নূতনও নয় অথচ সত্য সত্য ইহার প্রতিকার হয়, এমন উপায়ও এই সব হতভাগ্য গ্রামবাসিদের নাই।

রতন মুখোপাধ্যায়ের পেশা ছিল ডাক্তারী। পশার ছিল না এমন নয়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী প্রভৃতি সবগুলি প্রক্রিয়ার কোনটাই তিনি প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ উপায়ান্তর না থাকায় লোকে তাঁহারই কাছে ঔষধ লইতে আসিত।

ঠিক ওপারেই রাজগঞ্জ গ্রামখানি। এই সময়ে সেখানকার মল্লিক বাবুরা একজন নূতন পাশকরা ডাক্তার আনিয়া ঠিক নদীর ধারেই একটা ঘর তুলিয়া একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় খুলিলেন। ডাক্তারবাবুটী ছেলেমানুষ, কিন্তু অল্প দিনেই একটু সুনাম করিয়া লইলেন। রোগী দেখিতে কাহারও বাড়ীতে গেলে আট আনা কিম্বা এক টাকা দর্শনী লইতেন, কিন্তু ঔষধটা বিনামূল্যেই পাওয়া যাইত।

একে পাশকরা ডাক্তার, তাহাতে বিনামূল্যে ঔষধ, কাজেই রতন মুখোপাধ্যায় প্রমাদ গণিলেন। অথচ এই ডাক্তারটীর অনিষ্ট করিবার কোন সুযোগ না পাইয়া বড়ই গাত্রদাহ অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদিন সকালবেলায় মধুভট্টাচার্য্য আসিয়া রতনকে বলিলেন, "পদ্মর জ্বরটা তো আজ সকাল থেকে একেবারেই ছাড়লো না রতন, কি রকম যেন অঘোর-অজ্ঞান হয়ে রয়েছে, কি করি বল দিকিনি, তোমার এবারকার ফিবার মিকশ্চারটার তো কিছু হোল না, নইলে তোমার ওষুধ ত ডেকে কথা কয়—"

রতন মুখোপাধ্যায়ের মেজাজটা তখন বড়ই তিক্ত। একটা রোগীর মৃত্যু হইয়াছে, ঔষধ ও ভিজিটের দাম বাবদ তাহার নিকট সাড়ে চারি টাকা পাওনা। তাহার পুত্র আসিয়া বলিতেছিল, যে নগদ টাকা দেওয়া তাহাদের সাধ্যের অতীত, এক কলসী গুড় ও আধ কাহন বিচালি লইয়া তাহাকে অব্যাহতি না দিলে আর উপায় নাই।

মধুসূদনের কথা শুনিয়া রতন একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার কাছে কত পাওনা তা মনে আছে? কালকের ওষুধটার দাম ধরে তিন টাকা বারো আনা। দাও দিকিনি সেই বাকীটা মিটিয়ে।"

মধুসূদন বলিল, "এখন আমি তিনটাকা বারো আনা কোথায় পাব? দিনকতক পরে বরং—"

রতন কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করছো?

ঔষধ এবং তাহার মূল্যের হিসাবের সহিত এই কথার কি সম্বন্ধ তাহা মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আর বিয়ে! দাঁড়াও, আগে শরীর-ই সারুক, তার পরে সে-চেষ্টা হবে। এবার কি ভোগাটাই ভুগছে মেয়েটা।"

রতন বলিল, "ম্যালেরিয়া জ্বর, আজ হয়েছে কাল সেরে যাবে, সেজন্যে ভাববার কিছু দেখতে পাইনে।"

মধুসূদন এবার যেন একটু কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন. "কেন, সন্ধানে কোন ছেলে আছে নাকি? আমার তো অবস্থা সবই জানো রতন!"

"জানি বলেই তো বলছি। একটী পয়সাও যাতে তোমার না খরচ হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো।"

আরও কতকগুলি ভূমিকা করিয়া রতন জানাইলেন যে বছর পাঁচেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এতদিন আর সংসার করেন নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে আর সংসারী না হওয়া বড়ই অসুবিধার ব্যাপার,—এই সব কারণে—মধুসূদনের যদি মত হয়. তাহা হইলে তিনি মুখোপাধ্যায় নিজেই মেয়েটীকে বিবাহ করিতে পারেন।

মধুসূদন কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া এমন কতকগুলি কড়া কথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন, যে রতনের মন তাহাতে বিরূপ হইয়া উঠিল।

(৩)

জিদের বশে মধুসূদন তৎক্ষণাৎ রাজগঞ্জের ডাক্তারবাবুটীকে ডাকিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু তিনি আসিবার পর মনে পড়িল যে, ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও তাঁহার ভিজিটের একটী টাকা তো দিতেই হইবে। কিন্তু সে টাকাটাও তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করা একটা মস্ত সমস্যার ব্যাপার।

গৃহিণীর হাতের বাঁধানো শাঁখ একগাছি বাঁধা দিয়া গোটা দুই টাকা পাওয়া যায় কি না, ইহারই আলোচনা ঘরের বাহিরের বারান্দায় মধুসূদন স্ত্রীর সঙ্গে করিতেছিলেন। ছিটে বেড়ার দেওয়াল ভেদ করিয়া এই গুপ্ত পরামর্শের কোন কথাটাই ডাক্তারের কিন্তু শুনিতে বাকী রহিল না।

সংসারের কুটবুদ্ধির মধ্যে তখনও প্রবেশ করিবার সুযোগ এ ভদ্রলোকটী পান নাই। তাই এই দরিদ্র পরিবারের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার মনে কেমন একটা করুণার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার পর স্বামী স্ত্রীর নেপথ্য কথোপকথন কাণে আসিতেই তিনি মধুসূদনকে ডাকিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "আমার ফি দেবার জন্তে আপনারা আড়ালে যা বলাবলি করছিলেন, তা আমি শুনেছি। বাংলা দেশে তো শোনে পোনেরো আনা মধ্যবিত্ত লোকেরই এই অবস্থা, কিন্তু তাই বলে আপনি যে আমার ভিজিট দেবার জন্তে মায়ের হাতের শাঁখা খুলে নিয়ে বাঁধা দেবেন, সেটা সহ্য করবার মত পাষণ্ড আমি এখনো হই নি।"

কথাটায় মধুসূদন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কতকটা বিহ্বলভাবে বলিলেন, "তবে, তা হলে—"

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমাকে আপনার ছেলের মতই মনে করবেন। যে ক'দিন আপনার মেয়েটীর অসুখ না সারে, আমি রোজ এসে দেখে যাবো, ওষুধও আমার ওখান থেকেই পাঠিয়ে দেবো।"

কথাগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্ট লাগিল। মধুসূদনের স্ত্রীর চোখে জল ঝরিয়া পড়িল। স্নেহের চোখে অসম্ভব জিনিষেরও একটা নূতন মূর্ত্তি দেখা যায়, মধুসূদনের স্ত্রীর মনে হইল, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার যে ছেলেটী কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো এতদিনে এরই মত হইত। ডাক্তার জাতিতে নাকি বাহিষ্য—তা হোক, কিন্তু মুখখানি যেন ঠিক তারই মত, ঠোটের ফাঁকে ওই যে হাসিটুকু, তাও যেন সেই তারই কচি মুখের স্মৃতিটী বহন করিয়া আনে।

পদ্মমুখীর জ্বর সারিয়া গেল, কিন্তু ডাক্তার এ বাড়ীর একজন পরম আত্মীয় হইয়া উঠিলেন।

হাটের দিন সমাগত রোগিদের নিকট মাছ ও তরিতরকারী নেহাৎ অল্প পরিমাণে ডাক্তারের পাওনা হইত না। হাটের শেষে রোগিদের বিদায় দিয়া ডাক্তার নিজের দ্বারে না যাইয়া এ বাড়ীর দরজায় আসিয়া ডাকিতেন, "মা কই গো?"

গৃহিণী বলিতেন, "তুমি কি পাগল হলে বাবা, এত তরকারী, এত মাছ আমি কি করবো বল তো?

ডাক্তারের দিক হইতে জবাব আসিত "আমিই বা কাকে খাওয়াবো মা? আমার ওখানেই বা আছে কে?"

গৃহিণী বেশ একটু ব্যথিতকণ্ঠে বলিতেন, "তা বটে, তা তুমি বাবা কষ্ট করে আর ওখানে থেকো না। মল্লিকদের ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ খেয়ে কখনও মানুষে বেঁচে থাকতে পারে? তোমার কিন্তু এখন থেকে আমার এখানেই শাক ভাত যা হোক দুটী খেতে হবে তা বলে রাখছি। একটা ছেলের জন্য দুমুঠো চাল ফুটিয়ে দিতে যদি না পারি, তবে মা হয়েছি কেন বল তো বাবা?"

ডাক্তার বলিত, "ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ কি নিন্দের বস্তু মা? বেশ ত, যেদিন মুখ বদলাবার দরকার হবে, সেদিন নিজেই ছুটে মায়ের কাছে আসবো কেমন?"

অসম্বদ্ধ কথাগুলি,—কোনও মানে হয় না, কিন্তু বাৎসল্য রসে ভরপুর। মায়েরও চোখে জল আসে, ছেলেরও চোখ শুষ্ক থাকে না।

কিন্তু রতন মুখুয্যের মনে প্রতিহিংসার যে আগুন ধূমায়িত হইতেছিল, সেটা একদিন হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ঘোষেদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে ও-অঞ্চলে খুব ঘটা হয়। মহাষ্টমীর দিন ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা। সেদিন সভার মধ্যে হঠাৎ রতন মুখোপাধ্যায় বলিয়া উঠিলেন, মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই।

ডাক্তারের কথা লইয়া একটু আন্দোলন ভিতরে ভিতরে যে না হইতেছিল এমন নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে এ কদিন কেহই কিছু বলিতে পারে নাই। এতদিন পরে যখন আগুনটা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহাতে ইন্ধন দিবার সুযোগটা বড় কেহ ছাড়িল না। মধুসূদন চোখ-ভরা জল লইয়া বাড়ী ফিরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমন অপমান তাঁহার এতখানি বয়সের মধ্যে হয় নাই।

সমাজে একঘরে হইবার দু তিন দিনের মধ্যেই দোকানের চাকরিটী গেল, যজমানেরা জানাইয়া গেল যে তাহারা অন্য পুরোহিত ব্যবস্থা করিয়াছে। অভাব ও দুশ্চিন্তায় মধুসূদন সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, প্রায় ছয় সাত মাস ভুগিয়া একেবারে চিরদিনের মত সকল দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

(৪)

মধুসূদনের সদ্য প্রাণহীন দেহটীর পাশে বসিয়া স্ত্রী ও কন্যা কাঁদিতেছিল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, তখনও মৃতদেহের সৎকারের কোন আয়োজনই হয় নাই। পাড়ার একটী লোককেও ডাকিয়া পাওয়া যায় নাই। ছোট ছেলে পিন্টু ওপাড়ায় গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত অবসন্নভাবে বলিল, "কেউ এলো না মা।"

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এত বেলা পর্য্যন্ত মৃতদেহ বাড়ীতে পড়িয়া রহিল, এ কি সর্ব্বনাশ হইল। বলিলেন, "পদ্মা তুই থাকতে পারবি, পিন্টুকে নিয়ে। আমি যাই একবার ওপারে রাজগঞ্জে।"

"তুমি একলা কি করে যাবে মা?"

"এত বড় সর্ব্বনাশে কি লজ্জা সরম করবার সময় আছে মা ? আমি চল্লাম।"

দিন তিনেক পূর্ব্বে ঔষধ কিনিবার জন্ম ডাক্তার কলিকাতায় গিয়াছিলেন। পদ্ম বলিল, "যদি তিনি না এসে থাকেন মা। যদি এসে আমাদের এই কথা শুনতে পেতেন, তা হলে কি আর—"

পদ্মর মা বলিলেন, "তবু একটীবার গিয়ে দেখি মা। সে যদি না ফিরে এসে থাকে, তাহলে তো আর সর্ব্বনাশের কথা ভাবতে পাচ্ছিনে পদ্ম।"

ডাক্তার এগারোটার ট্রেণে ফিরিয়া সবেমাত্র কাপড় চোপড় ছাড়িয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পদ্মর মা যাইয়া

···সন্ধ্যার মধ্যেই মধুসূদনের দেহের সৎকার হইয়া গেল বটে, কিন্তু শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণের শব বহন করানো হইয়াছে, এই ব্যাপার লইয়া সারা গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারাদিন যাঁহাদের দর্শন মিলে নাই, তাঁহারা সকলেই তারস্বরে চীৎকার করিয়া জানাইলেন যে মধু ভট্টাচার্য্য মরিলেও তাঁহারা এখনও মরেন নাই, সুতরাং এতখানি অধর্ম্মাচরণের প্রতিফল তাঁহারা ভাল করিয়াই দিবেন।

(৫)

যেমন তেমন একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া নিজেদের শুদ্ধ হইতে হইবে, এই একটা মস্ত দুশ্চিন্তায় মধুসূদনের স্ত্রী আবার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পদ্মর মা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বাহির হইতে আওয়াজ আসিল, "পিণ্টুর মা, আছ না কি ?"

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি রতন মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ এই অসময়ে রতনের আগমনের উদ্দেশ্যটা বুঝিতে না পারিয়া পদ্মর মা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন।

দাওয়ার এক প্রান্তে একখানি কম্বল টানিয়া লইয়া রতন বলিলেন, পিণ্টুর মা, শেষটা বেঁচে থেকে এই সব দেখতে হোল ? মধু ভটচাযি্য আমাদের গাঁয়ের একটা মাথা বললেই হয়, সে মরে গেল, আর তার দেহ কাঁধে করে নিয়ে গেল কি না এক বেটা গয়লা। গয়লা হয়ে বামুনের মড়া ছুঁতে সাহস করে! কি অবিচার বল দিকিনি—

সদযুক্তির অবতারণাকারী এই লোকটীর দ্বারাই যে এ সংসারের কতখানি সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা মধুসূদনের স্ত্রীর অজানা ছিল না। তবুও আজ ইহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। অথচ প্রতিবাদ করিতে গেলে পাছে আরো কিছু নূতন অনিষ্ট করিয়া বসে এই আশঙ্কায় কিছু বলিতেও পারিলেন না।

রতন বলিতে লাগিলেন, "সেদিন হঠাৎ মাথাটা এমনি ধরে উঠলো, সেই যে বিছানায় শুতে হোল, আর উঠতে পারলাম না। তা নইলে, আমি সুস্থ থাকলে কি মধু ভটচাযি্যর মড়া অন্য জাতে ছুঁতে সাহস করে ? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা একবার দেখে নিতাম না ?"

স্বামীর মৃত্যুর দিনে তাঁহার শবদেহ লইয়া যে কতখানি বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, এবং সারা গ্রামের একটী লোকও এদিকে আসে নাই, সে কথাটাও ভুলিবার নয়। মধুসূদনের স্ত্রী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কোন উত্তর না পাইয়াও রতন বলিতে লাগিলেন, "কাল আমার ওখানে কথা হচ্ছিল কি না, যে মধু ভটচাযি্য তো মারা গেল, এখন সংসার চলার উপায় কি ? শ্রাদ্ধশান্তি যা হয় একটা

কিছু ত করতে হবে, তা ছাড়া অতবড় আইবুড়ো মেয়ে—।" আমি হেসে উঠেই বললাম, —"তিনি না হয় মারা গিয়েছেন, কিন্তু আমি তো এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি! কেন ভাবছো তোমরা? অতবড় মেয়ে নিয়ে কি অনাথা বিধবা এখন লোকের দোরে ঘুরে বেড়াবে? কখন-ই নয়! এই দেখ না কেন, আমার তো সংসার করতে আর ইচ্ছেই নাই, কিন্তু পাকে চক্রে হয়ে যায় আর কি!—এইতেই বুঝতে হবে যে ভগবানেরই ব্যবস্থা যে আমিই পদ্মকে বিয়ে করি,—শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে বৈকি।"

মধুসূদনের স্ত্রীর মুখের ভাবান্তর একবার আড়চোখে লক্ষ্য করিয়া রতন আবার বলিতে লাগিলেন, "আজ সেইজন্তেই এলাম। দশদিনের দিন পাঁচেক তো হয়ে গেল. এখন যা হোক একটা কিছু করে শুদ্ধ তো হতে হবে! তাই বলছিলাম পিণ্টুর মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ওখানেই থাক না কেন। যা-কিছু করবার বাড়ী থেকেই হবে'খন, তার পর পদ্মকে আমার হাতে দিয়ে আমারই সংসারের ভার নিয়ে থাক ভালই, না হয় কাশী হোক, বৃন্দাবন হোক, যেখানে বাস করতে চাও তাতে কোনও—"

মধুসূদনের স্ত্রী এবার একটু কঠিনভাবে বলিলেন, "তাঁর শেষ কাজ আমি এই বাড়ীথেকেই করবো। এখান থেকে আমি কোথাও নড়বো না।"

রতন কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো তাই হোক, আমি যখন সব ভার নিচ্ছি, তখন আর এবাড়ী ওবাড়ী কি? সেদিন মিত্তির গিন্নী বলছিলেন কিনা, বাবা রতন, এতবড় সংসারটা খাঁখাঁ করছে, এগুলো একটু সাজিয়ে গুজিয়ে নিতে—। আমি স্পষ্টই বললাম. মিত্তির খুড়ী, পদ্মকে আগে রাজরাণী করে নিয়ে আসি, তার পরে যা কিছু সাজানো গোজানো সব সেই এসে করবে।

রতনের প্রতি কথাটী যেন মধুসূদনের স্ত্রীর গায়ে ছুঁচ বিঁধিতেছিল। অথচ প্রতিবাদ করিবারও দুঃসাহস ছিল না।

ডাক্তার বলিতেছিলেন, "এই ছেলের উপর যদি এতটুকু ভরসা আর বিশ্বাস থাকে, তা হলে স্বামীর ভিটের মায়া ত্যাগ করে চল মা তুমি আমার সঙ্গে। এই শত্রুপুরীর বাইরে কোনও একটা তীর্থস্থানে কিম্বা অন্য যে কোনও জায়গায়! আমার নিজের মাকে কবে হারিয়েছি তা মনে পড়ে না, কিন্তু এতকাল পরে যখন ভগবান মা মিলিয়েই দিয়েছেন, তখন তোমার ছোট্ট সংসারটুকুর সব ভার দাও না এই ছেলেটার ঘাড়ে ফেলে?"

পদ্মর মার চোখে জল আসিয়াছিল। বলিলেন, 'ওরে পাগল, আমার কি ঝাড়া হাত পা রে বাবা,—"

"পদ্ম আর পিণ্টুর কথা বলছো মা?" ভাইবোনেদের বাদ দিয়ে আমি বুঝি শুধু মাকেই দাবী করছি, এই তোমার বিশ্বাস হোল? আমার নিজের অবস্থামত গরীব গেরস্থর একটী ভাল ছেলে দেখে তার হাতে পদ্মকে দিয়ে তার পর পিন্টুর ভার ঘাড়ে নেওয়া বড় বেশী কথা নয়—"

কথাটা আর শেষ হইল না। রতন মুখুয্যে ও পাড়ার আরও দু'এক জন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রতন বলিলেন, "সব পরামর্শটাই কানে গিয়েছে পিনটুর মা। গাঁয়ের পাঁচজন এখনও মরে নি, এটা জেনো। মধুভটচায্যির সংসারে ঐ গোয়ালা ডাক্তার ছোঁড়া এসে মুরুব্বি করবে সেটা দেখবার আগে ঐ ডাক্তারের মুণ্ডুটা এখানে গড়াগড়ি যাবে না! আচ্ছা, দেখি কে

তোমাদের বাঁচায়। এর যে কি বিহিত হয় তা পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে তবে ছাড়বো।"

তার পর যাহা হইল সে একটা লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপার। কিন্তু রতন মুখুয্যে সত্য সত্যই বিহিত করিলেন। পদ্মকে তিনিই বিবাহ করিয়া সমাজ এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। পদ্মর মা ছেলেটীকে লইয়া কাশী যাইবার নাম করিয়া যে কোথায় গেলেন, তাহা এ গ্রামের কেহই এখনও বলিতে পারে না।

ডাক্তারের নামে এমন কতকগুলি রিপোর্ট এবং তাহার এমন সুন্দর তদ্বির হইল যে, মাসখানেকের মধ্যেই রাজগঞ্জের ডাক্তারখানাটী উঠিয়া গেল।

রতন মুখুয্যের দোতলার ছাদে উঠিলেই দেখা যায় ক্ষুদ্র নদীটীর ওপারেই রাজগঞ্জের ডাক্তারখানার সেই ঘরখানি। মাটীর ঘর, চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে, দেওয়ালের এক পাশ একেবারে বর্ষায় ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সামনে কতকগুলি দেশী ফুলের গাছের চারিদিকে অযত্নবর্দ্ধিত জঙ্গল। গ্রামের কতকগুলি ছাগল, কুকুর, শেয়াল সময়ে সময়ে সেখানে আশ্রয় লয়।...

সেই ঘরখানির দিকে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া থাকিতে একটী ব্যথিতা নারীকে প্রায় সময়ই দেখা যায়।...মাঝে মাঝে পদ্মর মুখ হইতে বাহির হয়, হাঁ রাজরাণীই বটে!

অবশেষে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

এক

অমন স্থির হ'য়ে কি দেখছ, নীলা?—সন্ধ্যা বেলা জোছনাতে সুবর্ণরেখা কেমন দেখায়?

এ্যাঃ,—করুণা বাবু! আসুন।

ওকি, চ'মকে উঠলে যে? কি চিন্তা ক'রছিলে, নীলা?

না, অমনি ব'সে ছিলাম! সন্ধ্যে বেলা ঐ নদীটা বড় ভাল লাগে আমার। কিসের একটা ছায়াতে যেন মনটা আমার ভ'রে দেয় এমনি জোছনায়।

রমেশ কোথায়? উপরে আছে কি?

না—তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আচ্ছা, তবে আসি এখন।

কেন? বসুন না! ফিরে আসবেন এক্ষুনি—শরীরটা বেশ ভাল না।

রমেশ তা' হ'লে কবে যাচ্ছে?

কোথায়?

কেন, ক'লকাতায়! ওর যে যাবার কথা আছে কি একটা সভার সভাপতি হ'য়ে!

না, তা' তো জানি না কিছু!

তুমি জান নিশ্চয়! দেখ নীলা, উচ্চ শিক্ষার ফলে তুমি বড় অন্যায় রকম সংযত হ'য়ে প'ড়েছ। এ কথা আমায় গোপন ক'রে লাভ? তুমি মনে কর একটা বিষয়ে একমত নয় ব'লে আমাদের দু-জনকার বন্ধুত্ব লোপ পেয়ে যাবে? তা যদি তুমি মনে ক'রে থাক, তবে তুমি ভুল বুঝেছ। তা' হ'লে আমি ব'লব তোমার শিক্ষা শুধু পুঁথিগত; তোমার এ উচ্চ শিক্ষার আমি প্রশংসা ক'রতে পারছি না।

সত্যি, করুণাবাবু, আমি এ কথা কিছু শুনি নি। আপনি না হয় রমেশবাবু এলে জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন।

তুমি কি মনে কর, আমি আবার এই নিয়ে সত্য মিথ্যা প্রমাণের জন্য সাক্ষী মানতে যাব?

ছিঃ, আমি কি তাই ব'লছি করুণাবাবু? আপনি আমার কথা বিশ্বাস ক'রছিলেন না, তাই—ঐ তো রমেশবাবু ফিরে এসেছেন!

কি হে রমেশ! এমন জোছনা রাতে এত শীগ্‌গির ফিরে এলে যে?

এ-কি! করুণাকান্ত যে? কখন এলে? আমি আরো মনে ক'রছিলাম তুমিও বুঝি আমার সঙ্গ ছাড়লে!

না, তা' আর পেরে উঠছি কই?

তারপর—কেমন আছ? কি মনে ক'রে?

কি আর মনে ক'রে? অমনি। তোমায় তো আজকাল পাওয়াই ভার। আজকাল তুমি সমাজ-সংস্কারের একজন এত বড় চাঁই; কাগজে কাগজে তোমার প্রবন্ধ বেরোয়—আসতে তো ভয়-ই হয়, কি জানি যদি পাত্তা না দাও!

না হয় একটা নূতন আদর্শ নিয়ে কাজে হাত দিয়েছি, তাই ব'লে এত ঠাট্টা কর কেন, করুণা? ...আমি ভাবছিলাম বোধ হয় তুমিও অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় ছেড়ে গিয়েছ।

অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছি সত্যি; তবে তোমায় ছাড়তে পারি নি।

কিন্তু কই, আমি একা থাকি ভেবে এত দিনের মধ্যে একবারও তো এলে না ?

একা কোথায় ? তোমার পাশে তো সকল সময়েই তোমার প্রিয়তম বন্ধু রয়েছে ! তবে আর একা ব'লছ কেন ?

কে ? নীলা ? নীলা সত্যিই আমার বন্ধু ; নীলার কাছেই আমি এই নূতন আদর্শের সন্ধান পেয়েছি। সেইজন্য ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে ছেড়ে চ'লতে তো চাইনি কোন দিন !

তা'—

দেখুন করুণা বাবু, আপনি আমায় কেন অমন ক'রে বলেন ? আমি তো দিন দুই মাত্র রমেশবাবুর আশ্রয়ে এসেছি। অবশ্য আমি আমার আদর্শ, আমার চিন্তাধারা নিয়ে রমেশ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করি। কিন্তু আমি তো—

আমি তো তা'ই বলছি, নীলা ! তোমার সেই আদর্শই তো রমেশ নিজের ক'রে নিয়েছে।

দেখ করুণা, আমার বুদ্ধি বিবেক দিয়ে আমি যে'টা ভাল মনে ক'রেছি তা'ই গ্রহণ ক'রেছি। তোমরাও আমার বিরুদ্ধে কাগজে কম আন্দোলন ক'রছ না ! তোমাদেরই তো দেখছি দল বেশী ভারী !

যাক্ গে, নীলাকে ও কথাগুলি বলা আমার উচিত হয় নি—অবশ্য আমি কিছু 'কিন্তু' ক'রে বলি নি, রমেশ !

না, না, ছিঃ ! এ উচিত অনুচিতের কথা কিছু নয়, করুণাবাবু। প্রত্যেকেই যে যা'র আপনার বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে কাজ ক'রে যাবে। তারপর প্রতিষ্ঠা—তা' প্রত্যেকের আদর্শের সারবত্তার উপর নির্ভর করে। আপনাদের মত ভিন্ন হ'তে পারে ; তাই ব'লে দুই বন্ধুতে কেন মন কষাকষি ক'রছেন ! বরং খোলাখুলিভাবে আলোচনা ক'রে মিটিয়ে ফেলা ভাল।

তুমি যা'ই বল, করুণা, আমি আমার আদর্শ নিয়েই চ'লব এবং প্রতিষ্ঠিত ও ক'রব— এ কথা আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি।

তা তুমি কর,—বেশ ভাল কথা। কিন্তু—

কিন্তু রমেশবাবু, আপনি বড় ভুল ক'রছেন। কাজ আপনি ক'রে যাবেন—সফল হওয়া না হওয়া সে পরের কথা। কি বলেন ? না, করুণা বাবু ?

'ফলেন পরিচীয়তে।'

হাঁ, আমিও তা'ই ব'লছি। কাজ ক'রে যেতে হবে আগে।......কে ও ?

আমি সুহাসিনী, দিদি !

কেন ? এস, এখানে আসতে আবার তোমার অমন লজ্জা হ'ল কবে থেকে ? কি ? এস, ব'লে যাও।

না দিদি, লজ্জা কেন গো ? তোমরা কথা কইছিলে, তাই।

আচ্ছা বল, কি ?

বাবুর তো খাওয়ার সময় হ'ল।

হাঁ, তা দাও গে।

আচ্ছা, আমি তবে আসি এখন, রমেশ !

করুণাবাবু, উপস্থিত মত নেমতন্ন ক'রছি, কিছু মনে ক'রবেন না।

না, নীলা, সে জন্তে কি ? তবে আজ আর না।

বুঝছ না, নীলা, আমি সমাজচ্যুত ; আমার বাড়ীতে খেতে যদি করুণার আপত্তি থাকে !

কিন্তু, রমেশ, তুমি কি আমাকে কেবল ব্যথা দিতেই চাও ? সমাজ হিসেবে আমি অবশ্য খেতে পারব না, তুমি বন্ধু—বন্ধুর বাড়ীতে খেতে আমার একবিন্দু সঙ্কোচ নেই।

আমিও তাই বলি করুণা। মতের অমিল যতই হউক আমিও বন্ধুকে হারাতে চাই না,।... তবে চল, করুণা, আজ এখানে খাবে।

দুই

উঃ সমস্ত দিন ধ'রে কি হাওয়াই বইছে! ধুলো বালিতে জিনিস পত্রের উপরে একেবারে আধ ইঞ্চি পুরু হ'য়ে উঠেছে!

দিদি—ও দিদি—

এটা কিন্তু দোষ সুহাসিনী, কি দিন রাত কেবল দিদি, দিদি! দু'দিন ধ'রে তোমার কি হ'য়েছে?

ঐ যে, ঐ দেখ বাবু আসছেন।

তা' আসুন না—কি হ'য়েছে? বেলা প'ড়ে এল—যাও খাবারটা নিয়ে এস গিয়ে।

কি নীলা! এই হাওয়ার মুখে জানালাতে কি দেখছ? এই ধুলো, চোখ কাণা হ'য়ে যাবে যে!

অত সহজেই যদি চোখ কাণা হ'ত রমেশ বাবু তা হ'লে পৃথিবীটা একটা অন্ধের রাজত্ব হ'য়ে দাঁড়াত!

আচ্ছা, তা' না হ'ক্। কি ভাবছিলে ব'সে?

কিছু না। কত দিন তো ব'লেছি, ঐ নদীটা আমার বড় ভাল লাগে চেয়ে থাকতে।

কেন, নীলা, নদীটার দিকে চেয়ে তুমি কি ভাব?

কই? কিছুই তো ভাবি না!

দেখ নীলা, ঐ একই তোমার নিত্যকার উত্তর। কিন্তু আমি খুব লক্ষ্য ক'রে দেখেছি তুমি ভাব। কিসের যেন একটা বেদনায় তোমার মুখখানি কালো হ'য়ে যায়! তুমি 'না' ব'ললে আমি শুনব না। আজকে তোমায় ব'লতেই হবে তোমার এত কিসের ভাবনা। আমি তো জেনে শুনে ব্যবহারের কোন ত্রুটী করি নি!

ছিঃ! ও কথা কেন ব'লছেন রমেশবাবু? পরের ঘরে এমন সর্ব্বময় কর্ত্রীত্ব আমি কোথায় পেতাম রমেশবাবু? ভাবি আমি কে—কোথেকে এসেছি ভাসতে ভাসতে আপনার আশ্রয়ে, আর আপনি এত আদরে আমায় রেখেছেন। কিন্তু আমি তা'র প্রতিদান কি দিতে পারছি, কি ক'রতে পারছি আপনার? ভাবি এ ঋণ—

কেন, নীলা, তোমার বন্ধুত্বই যে আমায় মস্ত বড় দান। কিন্তু তা' নয়। তুমি ভাব অন্য কিছু। আজ আমাকে তোমার সে কথা ব'লতেই হবে। এস, বস দেখি এই চেয়ারখানাতে। আজ তোমায় ছাড়ছি না; তোমায় ব'লতেই হবে।

কি ব'লব?

তুমি কি ভাব ঐ দিকে—ঐ নদীটার দিকে চেয়ে।

ভাবি—কিন্তু তা' শুনে কি হবে রমেশবাবু?

না, তোমায় আজ খুলে বলতেই হবে, নীলা!

আচ্ছা ব'লছি। আপনি হাত ছাড়ুন তবে।

তা' দিচ্ছি ছেড়ে, কিন্তু বল।

সত্যি ব'লছি, রমেশবাবু, ভাবি আমি গীতার কথা। ঐ নদীটার দিকে চাইলেই যেন আমার গীতার স্মৃতিতে মনটা ভ'রে ওঠে।

গীতা! গীতার কথা? আচ্ছা নীলা, গীতার কথা তুমি এত ভাব কেন?

ভাবি? কেন ভাবি? তা' এখন আর ব'লব না।

আচ্ছা থাক্। কিন্তু গীতা? গীতা একটা—

না, রমেশবাবু, ও আপনার ভুল।

তবে গীতা কেন—

গীতার মনে বুঝি আমি সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছিলাম, রমেশবাবু!

না, নীলা, না। এ কখনও হ'তে পারে না। গীতা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসত!

হুঁ!

বাবু, একজন বাবু এসেছে।

কই, কি নাম?

নাম ব'ললেন বেন্দাবন।

বৃন্দাবন ?...ও! আমার ছোটবেলাকার মাষ্টারমশাই! বাবুকে উপরে নিয়ে আয়, বসন্ত।

ইনিই বুঝি নীলা দেবী, না রমেশ ?

আজ্ঞে হাঁ।

নমস্কার।

নমস্কার, বসুন মাষ্টারমশাই।

আপনি কি ক'রে জানলেন আমি রমেশের মাষ্টার ?

রমেশবাবুর কাছে শুনেছি। আপনিই বা কার কাছে শুনলেন আমি—

ও, তা ইন্দ্র ডাক্তার আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম। তখন তিনি আপনার কথা সব ব'লেছিলেন। ও কি, আপনি ও রকম ক'রছেন কেন ?

না, ও কিছু নয়—কয়েকদিন ধ'রে আমার শরীরটা ভাল নয়।

তুমি একটু বিশ্রাম করগে, নীলা। আমি মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে ততক্ষণ কথা বলি।

থাক্, আমি এই ইজি চেয়ারটাতে বসি। আমি এখানে থাকলে আপনার কোন অসুবিধা হবে কি, মাষ্টারমশাই ?

না, কিছু না। আপনি বসুন না। তারপর রমেশ! তুমি দেখছি সমাজের মধ্যে একটা ওলট-পালটের বন্দোবস্ত ক'রছ। তোমার সঙ্গে আমিও একমত। তাই এলাম যদি তোমার কোন কাজে আসি। আমি একবার ক'লকাতায় যাব ইচ্ছা আছে—এই ব্যাপার নিয়েই যাব। কিন্তু টাকা কড়ির বড় অভাব, তাই ভাবছি—

আচ্ছা, মাষ্টারমশাই, রমেশবাবুর হ'য়ে আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি,—নিতে আপনার কিছু আপত্তি আছে কি ?

কিছু না। আপনার দয়ার অন্ত নেই।

এই নিন!

ধন্যবাদ। দেখ রমেশ, নীলা শিক্ষিতা মেয়ে—সকল ব্যাপারেরই গুরুত্ব বোঝে।

আজ্ঞে হাঁ।

আচ্ছা আসি তবে। ক'লকাতা থেকে ঘুরে এসে একবার দেখা ক'রব।

রমেশ বাড়ী আছ হে ?

কে ? করুণা ? এস ভাই উপরে উঠে এস।

আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি রমেশ।

আচ্ছা, নমস্কার।

কি হে করুণা, অমন ক'রে ভদ্রলোকের দিকে চেয়েছিলে যে ?

না, অমনি। তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে।

তা' বেশ, বল।

কি করুণাবাবু, ইতস্ততঃ ক'রছেন যে ? আমি এখানে থাকলে অসুবিধা হবে ?

না, তেমন কিছু নয়। তবু শুধু রমেশকে ছাড়া আর কাউকে শোনাতে চাই না।

বেশ তো, আমি যাচ্ছি।

কিছু মনে ক'র না, নীলা!

কি যে বলেন।

তিন

নীলা!

কেন।

ওকি, তুমি এখানেই ছিলে ?...চুপ ক'রে রইলে কেন, নীলা ? তা'তে তো তুমি কিছু অন্যায় ক'রেছ ব'লে মনে করি না!

হাঁ আমি পর্দ্দার ও-পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সব শুনেছ ?

হাঁ, শুনেছি।

করুণা সেই মাষ্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছে, জান ?

জানি।

তুমি দাঁড়াতে পারছ না; পড়ে যাবে, ব'স। 'তোমায় আমি একটা কথা ব'লতে চাই, নীলা।

বলুন।

আমি চাই গীতার শূন্য স্থান পূরণ ক'রে নিতে। আমার গীতার যায়গায় তোমাকেই মানাবে ভাল—তুমিই তার যোগ্য।…ও কি? অমন মাথা গুঁজে রইলে কেন, নীলা?

আজ আবার এ নূতন কথা কেন রমেশবাবু?

তোমার কাছে অবশ্য আজ এই কথা নূতনই বটে। অনেক দিন ধ'রেই ভাবছি ব'লব, কিন্তু হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না, নীলা!

কিন্তু রমেশবাবু, তা'র আগে করুণাবাবুর কথায় সত্য-মিথ্যা আমার কাছ থেকে আপনার জেনে নেওয়া উচিত নয় কি?

নিষ্প্রয়োজন।

কেন রমেশবাবু, নিষ্প্রয়োজন কেন?

তা' জেনে তোমার লাভ? যদি দরকার মনে ক'রতাম, তবে আমি নিজেই তা' আগে জিজ্ঞেস করে নিতাম।

কিন্তু তা'হ'লেও রমেশবাবু, সমাজ?

না, না, না নীলা, সমাজ আমার প্রভু নয়। যা'রা নিজেদের খেয়ালের উপর লোককে যাচাই ক'রে দেখে এই সমাজ তা'দের জন্যই উন্মুক্ত থাক।

কেন নীলা অনর্থক তুমি ও সব মিথ্যা তর্ক তুলছ? আমার কথার উত্তর দাও।

কি কথা?

উঃ, নীলা, তুমি আমাকে এত বড় ব্যথা দেওয়ার জন্যই বুঝি গীতার অভাব, গীতার ব্যথা আমার মন থেকে অমন ক'রে মুছে নিয়েছিলে? তুমি জান না নীলা, গীতা—গীতা আমার কতখানি ছিল!

জানি।

তবে, নীলা,—সে ব্যথা সে, স্থানটি কেন এমন করে পূর্ণ ক'রে রাখলে এতদিন?

শুধু আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

না, নীলা, না। আমাকে শান্তির মাঝখানে থেকে টেনে এনে ভবিষ্যতে পুড়ে মারবার জন্যে।

না—

তবে, তবে নীলা, বল সত্যি বল।

কি ব'লব?

'আমি যা' চাই তা' দিতে পার কি না?

আমায় ক্ষমা ক'রবেন, রমেশবাবু?

নীলা, নীলা—

বলুন।

না, যাও, রাত হ'য়ে গেছে।

আপনি খেতে যান।

আমি খাব না আজ, শরীরটা ভাল নয়।

তবে শোবেন চলুন।

যাচ্ছি, একটু পরে।…কোথায় যাচ্ছ, নীলা? খেতে যাও।

যাই, বিছানটা একবার ঝেড়ে রেখে যাই।

থাক, সে আমিই ঝেড়ে নেব 'খন।…কি নীলা, দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? বিছানাটার যা' ক'রবার ক'রে রেখে খেতে যাও। আমি শোব, আর ব'সতে পারছি না।

চার

একি নীলা! এ'সব বাক্স বিছানা কার?

আমার।

বাঁধা ছাঁদা সব এখানে প'ড়ে কেন?

আমি রাত্রি এগারোটার ষ্টীমারে উঠব।

কেন? কোথায় যাবে?

কল'কাতায়।

তবে কি করুণার কথাই সত্য, নীলা? তা' হোক, তবু তোমায় যেতে হবে না।

না, করুণাবাবু যা' শুনেছেন তা' ঠিক নয়। কিন্তু আর তো থাকতে পারি না!

নীলা, তুমি যেতে চাও আমি আর বারণ ক'রব না। কিন্তু আমায় এমনি সন্দেহের মাঝে ফেলে রেখে গেলে—আমি, আমি,—নীলা—

বলুন।

ইন্দ্রবাবু তোমার কে হন?

কে! ইন্দ্র ডাক্তার আমার কেউ নন তোমার বন্ধু ছিলেন, আমার তাও নয়।

তবে তোমার বাবার নাম কি?

স্বামী বিমলানন্দ।

ইন্দ্রবাবু তোমাকে কি ক'রে পেলেন?

বাবা যখন গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে যান. তখন ক'লকাতায় ইন্দ্রবাবু আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন। আমার তখন আট বছর বয়স। ইন্দ্রবাবু মাকে আর আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

তারপর?

তারপর কয়েক বছর পরে তিনি আমার মাকে তাঁর রক্ষিতা ব'লে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন; আর নানা রকম অত্যাচার ক'রতে চেষ্টাও করেন। মা একদিন গঙ্গা স্নানে যান, আর ফিরে এলেন না।

তুমি?

আমি ইন্দ্রবাবুর আশ্রয়েই থেকে গেলাম।

তুমি কি ক'রে রইলে অমন লোকের কাছে?

আমার উপর তিনি কেন সদয় ছিলেন জানি না; আমার সঙ্গে কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি। বরং যাতে লেখাপড়া শিখতে পারি তা'র জন্যই চেষ্টা করেছেন।

শিখেছও তাঁরই জন্য।

তা' সত্যি।

তবে ইন্দ্রবাবুর কাছ থেকে স'রে প'ড়লে কেন এত চেষ্টা ক'রে?

তিনি আমার জন্য যথেষ্ট ক'রেছেন; তা'র জন্য চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু তবু আমার মনে সকল সময়েই যেন একটা কিসের ভয় ছিল!

আমার এখানে তোমার কোন ভয় নাই?

না।

তবে চ'লে যেতে চাও কেন?

আমি জানতাম না, কোনদিন ভাবিও নি যে তোমার এতখানি আমি জুড়ে ব'সেছি; কোনদিন নিজেকেও বুঝতে পারি নি যে বন্ধুত্বের পেছনে অন্তর আমার শুধু তোমার আসনই রচনা করে চলেছে।

তবে আর দুঃখ কিসের, নীলা? তবে কেন পালাচ্ছ?

পালাচ্ছি? সমাজ কেন আমার কথা বিশ্বাস ক'রবে?

আবার সেই কথা! কিন্তু কেন? তুমি না নূতন আদর্শে সমাজকে গ'ড়ে তুলতে আমায় শিক্ষা দিয়েছ! তবে আবার এ' সমাজ মান কেন?

তোমার জন্য!

উঃ কি ভীষণ ঝড় উঠেছে, নীলা!

যাবে আমার সঙ্গে?

চল নীলা, তাই চল। এখন দুজেই আমরা চ'লে যাই।

চল তবে।

এই ঝড় বাদলায়—এখন কোথা যাবে, নীলা?

মনে পড়ে? এমনি আকাশে-বাতাসে সেই দিন তুমুল কাণ্ড বেধেছিল, যেই দিন—

কোনদিন, নীলা?

যে' দিন গীতা—ঐ নদীর ধারে—উঃ!

মনে পড়ে।

তবে চল—

প্রেমের কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু একটা ভারি দুষ্ট বুদ্ধি এই প্রসঙ্গে রেণুকার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। ভাবিল, কথাটা অবশ্য এখন সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না। আগুন লইয়া খেলা ত' সে অনেক খেলিয়াছে, আবার একবার খেলিয়া দেখিবে।

রাত্রে সে হাসিতে হাসিতে প্রতুলকে বলিল, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি কথা বল।'

রেণুকা বলিল 'যে সে কথা নয়। বড় ভীষণ কথা। আমার জীবন-মরণ সমস্যা।'

প্রতুল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

'অমন করে তাকিয়ে রইলে যে?'

প্রতুল বলিল, 'ভাবছি তোমাদের এই নারী জাতটার কথা। তোমাদের মধ্যে বিধাতা যাদের সৌন্দর্য্য দিয়েছেন তাদের শুধু সৌন্দর্য্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অদ্ভুত মন তাদের দিয়েছেন—যার কোনও হদিশ পাবার উপায় নেই, আমাদের মত পুরুষের পক্ষে যার লীলা বুঝা ভার!'

রেণুকা বলিল, 'তোমায় আর এত কবিত্ব করতে হবে না, তুমি শোনো।'

'শোনবার জন্যে এ অধীন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বলতে আজ্ঞা হোক্!'

এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া প্রতুল সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

রেণুকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'হাসিয়ো না বাপু, শোনো। আমি একটি কাগজে একটি কথা লিখে তোমায় রাখতে দেবো। কাগজের লেখাটি কিন্তু তুমি পড়তে পাবে না। তারপর আমি যখন বলব তখন তুমি খুলে পড়ো। বল তুমি এ বিশ্বাস রাখবে?'

প্রতুল বলিল, কেন রাখব না?'

'কেন রাখ্‌ব না নয়। যার শপথ তোমার অন্তরের কাছে খুব বড় শপথ, আজ তোমায় সেই তার নামে শপথ করে' বলতে হবে। বিশ্বাস যদি তুমি রাখতে পার ত' বল, আমি তোমায় বিশ্বাস করে' লেখাটি লিখে দিই।'

প্রতুল বলিল, 'তোমার বিশ্বাস আমি রাখব এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করে' তুমি লিখে দাও। বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না।'

রেণুকা তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল। এবং লেখা শেষ করিয়া কাগজখানি একটি খামে মুড়িয়া বন্ধ করিয়া খামের মুখটি গালা দিয়া সযত্নে শীল্ করিয়া দিল।

বলিল, 'এই নাও। খুললে কিন্তু আমি বুঝতে পারব। তা যদি বুঝতে পারি ত' সেই

দিন থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। বুঝলে ?'

প্রতুল খামখানি হাতে লইয়া তাহার নিজের আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার জন্ম উঠিয়া গেল। বলিল, 'এত কিছু বলবার প্রয়োজন নেই রেণুকা, আমি খুলব না, খুলব না, খুলব না—হলো ত ?'

রেণুকা হাসিয়া বলিল, 'হ'লো।'

তাহার পর সে সম্বন্ধে কেহ কোনও কথাই উত্থাপন করে নাই। প্রতুলের শুধু মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে এই রহস্যজনক গোপনীয় লেখাটুকুর অর্থই বা কি এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি ছিল! কিন্তু ভাবিয়া সে তাহার সমাধান করিতে কিছুতেই পারে না। অথচ কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কৌতূহল দমন করিবারও কোনও উপায় নাই। সুতরাং ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত এমন যে একটা মজার ব্যাপার তাহাদের জীবনে ঘটিয়াছে সেটাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে!

দিনকতক পার হইতে না হইতে — সে বায়ও।

আজকাল রেণুকা প্রায়ই তাহাকে তাহার ভালবাসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।

প্রতুল বলে, 'এখনও সেই এক কথা রেণুকা ? আমার ভালবাসা সত্যি কিনা এখনও সেই এক প্রশ্ন ?'

রেণুকা হাসিয়া বলে, 'কি জানি বাপু, আমার মনে হয়' নিজের মনে পাপ আছে, বারে বারে তাই আমি শুধু সেই এক কথাই বলি।'

'কিন্তু আমার মন একেবারে নিষ্পাপ রেণুকা, আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি। তোমার এই ধন-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য্যকে নয়,—তোমাকে। এই যে আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, এই পরমা সুন্দরী রেণুকাকে।'

রেণুকা বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বিশ্বাস হয় না।'

প্রতুল বলিল, 'পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার।'

'পরীক্ষা করবার মত বুদ্ধি যদি আমার না থাকে ?'

প্রতুল হাসিল। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেণুকা বলিল, 'হাসছ যে ?'

প্রতুল বলিল, 'হাসছি তোমার কথা শুনে। পৃথিবীতে আর সবই আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি, শুধু এই একটি কথা ছাড়া।'

'কি কথা ?'

'আমার রেণুকা নির্ব্বোধ। একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

রেণুকা আবার হাসিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ!'

হেমেন্দ্রনাথ ঠিক সময় বুঝিয়াই আসে।

আসে ঠিক তেমনি সময়, যে সময় প্রতুল বাড়ী থাকে না।

আসিয়াই বলে, 'প্রতুলের সঙ্গে একদিনও আমার দেখা হচ্ছে না, ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি ?'

রেণুকা বলে, 'দেখা করবার ইচ্ছে না থাকলে এমনিই হয়।'

'তাহ'লে কি বলতে চান দেখা করবার ইচ্ছে আমার নেই ?'

'দেখে ত তাই মনে হয়।'

'তার কি এমন কারণ থাকতে পারে বলুন ত ?'

কারণ—আপনি আসেন দেখা করতে আমার সঙ্গে, আপনার বন্ধুর সঙ্গে নয়।'

হেমেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।—'বেশ ত', তাহ'লে ত' সব গোলমালই চুকেই গেল। আপনার সঙ্গে দেখা করাই যখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন প্রতুলের সঙ্গে দেখা যে আমায় করতেই হবে তারও ত' কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

হেমেনের দেওয়া সে দিনের সেই বই দু'খানা টেবিলের উপর তখনও তেমনি পড়িয়াছিল। হাত বাড়াইয়া রেণুকা সেই দুখানি টানিয়া আনিয়া উপহার পৃষ্ঠাটি খুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'আচ্ছা, এই যে লিখেছেন,—এই লেখা দেখে আপনার বন্ধু যদি ভাবেন, আপনার মনের মধ্যে পাপ আছে, এবং সেই কারণে এ-বাড়ী আসা আপনার যদি তিনি বন্ধ করে' দিতে চান তাহ'লে আপনি কি করেন ?'

হেমেন জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কখ্খনো না। প্রতুল কখনও আমার আসা বন্ধ করতে পারে না।'

রেণুকা হাসিতে লাগিল। বলিল, 'বুঝেছি! আপনার বন্ধুর দুর্ব্বলতা আপনি জানেন। আপনি সেই দুর্ব্বলতারই সুযোগ নিচ্ছেন।'

হেমেন কিয়ৎক্ষণ হেঁটমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল, রেণুকার কথায় যেন সে আহত হইয়াছে।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'হঠাৎ এমন চুপ হয়ে গেলেন যে ?'

মুখ তুলিয়া হেমেন বলিল, 'ভাবছি—কাল থেকে সত্যিই আমার আর আসা উচিত কিনা।'

রেণুকা বলিল, 'মনে যদি সত্যিই আপনার কোনও দুরভিসন্ধি থাকে তাহ'লে দয়া করে না আসাই উচিত।'

হেমেনের মুখ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

রেণুকাও চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহারই সেই বই দু'খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসি।'

'আজ এমন তাড়াতাড়ি উঠলেন যে ?'

হেমেন বলিল, 'আপনার কথা শুনে আরও আগেই ওঠা আমার উচিত ছিল। উঠতে পারিনি শুধু লজ্জায়।'

এই বলিয়া পিছন ফিরিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত যখন সে চলিয়া গেছে, রেণুকা ডাকিল, 'শুনুন!'

হেমেন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রেণুকা বলিল, 'আপনি আসতে পারেন।'

'কেন ?'

আপনার বন্ধু আমায় পরিত্যাগ করে, আবার একটা বিয়ে করবেন।'

কথাটা শুনিয়া বিস্ময়ে হেমেন একেবারে যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল 'মিথ্যা কথা।'

রেণুকা বলিল, 'মিথ্যে নয়। আপনার বন্ধুর বিমাতা তাঁকে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ দিতে রাজি হয়েছেন। রাজী হয়েছিল অবশ্য এই সর্ত্তে যে তাঁর সুন্দরী ভাইঝি আছে তাকে বিয়ে করতে হবে।'

হেমেন বলিল, কখ্খনো না। বিষয়-সম্পত্তির অংশের জন্যে প্রতুল এই কাজ করবে আপনি বলতে চান ?'

রেণুকা হাসিতে লাগিল। বলিল, 'বাঃ' কেন করবে না ? আপনি তাঁর চরিত্রের যে বর্ণনা আমায় দিয়েছেন তাতে ত' একাজ করা তাঁর পক্ষে খুব বেশী কষ্টকর নয়।'

হেমেন আর একটুখানি কাছে আগাইয়া

গিয়া বলিল, 'তবু একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না রেণুকা।'

রেণুকা বলিল, 'অবিশ্বাসের ত' কিছু নেই।'

হেমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটী কি আপনার চেয়েও সুন্দরী?'

রেণুকা বলিল, 'আপনি লেখক মানুষ, সুন্দরী অসুন্দরীর ওপর ভালবাসা নির্ভর করে না, সেটুকু বুঝা আপনার উচিত।'

'আপনার কি মনে হয়, প্রতুল আপনাকে ভালবাসে না?'

'যদি বলি, না—বাসে না।'

'কি জানি কেন, আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রেণুকা দেবী, আজ আমায় কথাটা একবার ভেবে দেখতে দিন।'

এই বলিয়া এবার আর সে অপেক্ষা না করিয়া পিছন ফিরিয়া তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া চলিয়া গেল।

রেণুকা সেইখান হইতেই জোরে জোরে বলিল, 'কাল আবার আসবেন ত'?'

হেমেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কি জানি, ঠিক বলতে পারছি না।'

রেণুকা একাকিনী বসিয়া বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

উদয়ন (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ)

ইহা একখানি নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র। বইখানির কলেবর সত্যই আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া প্রচ্ছদ পটখানির পরিকল্পনা অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে।—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, বৈশাখ সংখ্যা হইতে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উদয়ন রচনা গৌরবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। উত্তরোত্তর রচনা গৌরবে ইহা উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০

জগা খিচুড়ী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বইখানি উপন্যাস না হইলেও উপন্যাসের ধরণে লেখা এবং বহু চরিত্র চিত্রাঙ্কনে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভবিষ্যতে আমরা আশুবাবুর লেখনী হইতে এমনই সরস রচনা পাইবার ভরসা রাখি মূল্য এক টাকা মাত্র

বিষের নেশা—কার্ত্তিক শীল

বিষের নেশা বইখানি এক কথায় বলা চলে সুন্দর হইয়াছে। লেখকের রচনা ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা মুন্সীয়ানা আছে। এবং চরিত্র সমাবেশেও ইনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি বইখানি উপন্যাস প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ভাল লাগিবে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

জয়শ্রী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

একখানি নাটক। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা সুখ্যাতির সহিত রংমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। লেখক নাটক রচনায় প্রথম ব্রতী হইলেও লেখা মন্দ হয় নাই। সুক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বেশ সুন্দর ভাবেই লেখক নাটকের পরিসমাপ্তি টানিয়া আনিয়াছেন। মূল্য এক টাকা মাত্র।

"লক্ষ্যহারা"—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা বইখানির আগাগোড়া পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। নামকরণের দিক দিয়া বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে, কারণ যে কয়জন নায়ক নায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে, প্রায় প্রত্যেকেই লক্ষ্যহারা, ভাষা সুললিত। বইখানি অল্পদিনেই বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে। মূল্য দেড় টাকা।

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। কতকগুলি বাছাই কবিতা নাকি বইখানিতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের তুলনায় মূল্য বড় বেশী মনে হয়। বিশেষ এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে। কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, তবে অধিকাংশ রচনাতেই কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের লেখার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪০ | চতুর্থ সংখ্যা

অলঙ্ঘ্য

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম-এ, ডি-লিট্

"জায়গাটা ভারী চমৎকার! আপনি বেশ সুখেই আছেন ঘোষ ঠাকুর।"

মেঘলা আকাশের ম্লান ছায়া গঙ্গার বুকের উপর একটা কালো পর্দ্দা টেনে দিয়েছিল। সেই দিকে চেয়ে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে ঘোষ ঠাকুর বল্লেন: হাঁ, স্থানটা খুবই ভাল, মহাপ্রভুর লীলা ভূমি; এর প্রতি ধূলিকনায় প্রেমের অশ্রু মাখানো রয়েছে, এখানে এলে সুখ-দুঃখের কথাটাকে যেন নেহাৎ ছোট বলেই মনে হয়। তবে কি জানো ভাই, আমরা হলাম মহাপাতকী, তাই এমন জায়গায় বাস করেও আমার মনে শান্তি নেই।

কথা হইতেছিল আমার ও ঘোষ ঠাকুরের মধ্যে।

ঘোষ ঠাকুর আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। সেবার নবদ্বীপে এসে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়।

বয়সের তফাৎ দু'জনকার মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের। তা সত্বেও ঘোষ ঠাকুর আমাকে নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গ্রহণ করেছিলেন।

ঘোষ ঠাকুর পরম বৈষ্ণব।

কর্ম্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি সস্ত্রীক নবদ্বীপে বাস করছিলেন। নূতন

চরের উপর ছোট ছোট-গাছ-পালায় ঘেরা তাঁর সুন্দর বাড়ীখানি! সামনেই গঙ্গা। ও পারে মায়াপুরের মন্দিরের চূড়া আঙিনায় বসেই দেখা যায়।

খড়ে ছাওয়া তিনখানি ছোট কুটীর। একখানিতে ঘোষ ঠাকুর আর তাঁর স্ত্রী বাস করেন। তারই একপাশে একখানি ছোট চালা দেওয়া, সেখানে রান্না হয়। অপর ঘর দু'খানির একখানিতে একটা গরু থাকে—আর সামনের সব চেয়ে সুন্দর ঘরখানিতে থাকেন ঘোষ ঠাকুরের নিত্য সেবিত বিগ্রহ—রাধা ও মাধব।

ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় বসে আমাদের দু'জনকার কথাবার্ত্তা চলছিল।

ঘোষ ঠাকুর ভারী আমুদে লোক। কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটান,—মুখে "জয় রাধামাধব" লেগেই আছে! অত্যন্ত ভক্তলোক। গৌরদাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীর অনেক বৈষ্ণব সাধক প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে ভক্তি-ভজন সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসেন।

এ দু'দিন ঘোষ ঠাকুরের আনন্দময় মূর্ত্তিই দেখেছি। আজ বিকালের পর থেকে, মনে হচ্ছে, তিনি যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন।

আমার কথার উত্তরে তিনি যা বললেন, তাতে মনটার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো।

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর ফেলতে, তিনি যেন আমার মনের কথা টের পেলেন: আজ বিকালে পেন্‌সনের টাকাটা পেয়েছি। মাসের প্রথমে যখন এই টাকাটা আমার হাতে আসে—তখন মনটা ভারী খারাপ হয়ে পড়ে।—মনে পড়ে, আমার সেই পিছনে ফেলে আসা কর্ম্মজীবনের কথা,—আর ভাবি, এ যেন আমার ছদ্মবেশ,—আমার খাঁটী পরিচয় "ঘোষ ঠাকুর" নয়, আমি আজও সেই "মৃত্যুঞ্জয় দারোগা"।

হেসে ব'ললাম 'অর্থম্ অনর্থম্' বলে নাকি? কিন্তু এই "অনর্থ" ছাড়া কারও এক পা চলবার জো নেই—এমন কি সাধন-ভজনের পথেও। জানেন ত, "শ্রীহরি ভজনে যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগ হয় ভুল"—ও একেবারে বিষয়-ত্যাগী খাঁটী বৈষ্ণব মহান্তের বাণী।

"না, না, ভাই সে সব কিছু নয়"—ঘোষ-ঠাকুরের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর বেজে উঠ্‌লো—"টাকাটা হাতে পেলে পুলিশ বিভাগে চাকুরীর কথাটাই আমার মনে পড়ে, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যত পাপ, যত গ্লানি—সেখানে সঞ্চয় করে এসেছি। অবশ্য সবাই যে সেখানে আমার মত, এমন কথা আমি বলি না।

পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না—তাই দু'হাত দিয়ে পয়সা রোজগারের লোভে পুলিশে ঢুকে ছিলুম—এবং পয়সাও লুটতুম দুই হাত দিয়ে—অনেক সময়ে চোখ বুজেও,—অর্থাৎ বিবেক বলে কোনো উপসর্গের বালাই আমার ছিল না। শান্তি-শৃঙ্খলার নামে কত নিরীহের উপর যে কত অত্যাচার করেছি,—শাসনের অজুহাতে যে-ভাবে শোষণ করেছি—তা বলতে গেলে একখানা বিরাট পুঁথি হ'য়ে পড়ে।

সন্তানাদি হ'লো না। লোকে বলতো,—পাপের ফলে, অধর্ম্মের জন্যে বংশ রইলো না। আজও মনে ভাবি, যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাকতো হ'য়ত তার মুখ চেয়ে, অত্যাচারের মাত্রাটা একটু কমিয়ে দিতে পারতুম। তোমার দিদিকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে দেখছ ত! একেবারে মাটীর মানুষ। রক্তমাংস দিয়ে ওকে গড়া বলে ত আমার মনে হয় না! একদিনের জন্যেও আমার কোন কথার ও একটুও প্রতিবাদ করে নি—কোন কাজে এতটুকু বাধা দ্যায় নি। কোনো দিকে আমার কোনো বন্ধন ছিল না—তাই যা খুসী তা' করে দিন কাটিয়েছি।

আমি বললাম: সে সব পুরাণো কথা ভেবে

মনে কষ্ট পান কেন? গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন ত রাধামাধবই আপনার মন জুড়ে বসে আছেন।

একটুখানি ম্লান-হাসি হেসে ঘোষ ঠাকুর বললেন: রাধা-মাধব সব সময়ে এই পাপীর মনে থাকেন কই? তাই ত পূর্ব্ব স্মৃতিকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। কেবলই মনে পড়ে —যার স্মৃতি আমার সকল আনন্দকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার করে দায়, সেই কথাটা আজ তোমায় বলছি:—শোনো।

খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে দাকুপী বলে একটা থানা আছে। এ থানার এলাকায় ভদ্রলোকের বাস খুব কম,—বেশীর ভাগ লোকই চাষী ও দরিদ্র। আমি অল্পদিন আগে বদলী হয়ে ও-খানকার বড় দারগা হয়ে গিয়েছি। নিরক্ষর চাষাদের মধ্যে ধান কাটা, নদীর মাছ ধরা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি প্রায়ই লেগে আছে। সুতরাং পুলিশের লোকের ও-খানে দু'পয়সা রোজগারের বেশ সুবিধা আছে।

একদিন সকাল বেলায় থানার বারান্দায় বসে একখানা পুরাণো পুলিশ গেজেটের পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় একটা লোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো।

চোখ প্রায় না তুলেই বললুম:—কে তুই? কি চাস্?

লোকটা আর একটা সেলাম ঠুকে উত্তর দিল:—হুজুর, আমি শামুক ভাঙার কোরবান্ চৌকিদার। কাল রাতে তেকড়ি পানার ছেলে কাঠির ঘায়ে মারা গেছে। তদন্ত না হলে লাস্ জলে দিতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে বললুম্: কিসে মারা গেছে বললি?

কোরবান্ উত্তর দিলে: আজ্ঞে, কাঠির ঘায়ে সাপের কামড়ে। একজন সেপাইকে আমার সঙ্গে যেতে হুকুম দিন।

ক'দিন থেকে হাতে বিশেষ কাজ ছিল না। বসে বসে আর ভালও লাগছিল না।

লোকটাকে বললাম: রাস্তার ওপারে আমার সহিস ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাকে গিয়ে বল্—চট্ করে ঘোড়া সাজিয়ে আনুক।

লোকটা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে: কেস্ অতি সামান্য। হুজুর কষ্ট করে এত দূর যাবেন কেন? না হয় জমাদারবাবুকে তদন্তে পাঠান।

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে ধমকে উঠ্লুম:—কী করি না করি সে মুরুব্বিয়ানা তোকে করতে হবে না। তোকে যা হুকুম দিলাম, তাই কর গিয়ে।

ভয়ে ভয়ে লোকটা আর একটা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

তেকড়ির বাড়ীর সামনে ঘোড়া থেকে যখন নামলাম বেলা তখন প্রায় এগারটা। মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছি।

তেকড়ির বাড়ীতে দু'তিনখানা টিনের চাল দেওয়া ঘর। উঠানের একপাশে তিন চারিটা ধানের গোলা। বুঝলুম লোকটার দুপয়সা আছে।

একখানা জলচৌকীর উপর বসতে একটা লোক একখানা হাত পাখা এনে হাওয়া করতে লাগলো। একটা আন্-কোরা নতুন হুঁকায় জল পুরে আর একটা লোক তামাক সেজে নিয়ে এল।

খিড়কির দিক দিয়ে চাপা কান্নার সুর এসে কানে পৌঁছুতে লাগলো।

জেরা করে জানলাম—সে ছেলেটা তেকড়ির

প্রথম পক্ষের। ছেলেটির মা নাই। সংসারেও দু' তিনটি ছেলে মেয়ে—কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ছেলেটিকে নাকি খুব ভালবাসে। কাল রাতে যখন ঘুমুতে ঘুমুতে ছেলেটা 'মাগো মলেম' বলে চীৎকার করে উঠে, তখন তেকড়ির বউ আলো জ্বেলে তাড়াতাড়ি দেখে যে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা সাপ পালিয়ে যাচ্ছে। তেকড়ি বারান্দায় শুয়ে ছিল চীৎকার শুনে সেও উঠে আসে এবং প্রদীপের আলোয় দেখতে পায় যে ছেলেটির সমস্ত গায়ে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লবণচোরার সনাতন রোজা এসে হাজির হয়—কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সনাতন বলে—একেবারে জাতসাপ, ধন্বন্তরিরও অসাধ্য।

"ওরে আমার কেষ্টধনরে! তুই কি করে গেলি" বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে তেকড়ি আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। তেকড়ির বউয়ের চাপা কান্না ও দারুণ আর্ত্তনাদে পরিণত হ'লো।

যে লোকটা আমায় হাওয়া করছিল চোখ মুছতে মুছতে বললে, হুজুর অনুমতি করুন, শবটা গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

ছেলেটির বিবর্ণ দেহ বারান্দার এক কোণে একখানা কাঁথা দিয়ে ঢাকা পড়েছিল।

সেই দিকে চেয়ে আমি বললুম, গাঙে ফেলবে কি? লাস সদরে চালান দিতে হবে। এই চৌকিদার একখানা ডিঙির বন্দোবস্ত কর।

পাথরের মত নিশ্চল চোখ দু'টি আমার মুখের উপর রেখে তেকড়ি বললে, কেন হুজুর! আপনি ত নিজের চোখেই সব দেখলেন। সদরে চালান দিতে হবে কেন?

একটা তীব্র হাসির বিষ ছড়িয়ে বললুম, কে নিজের চোখে দেখেছে যে ওকে সাপে কামড়েছে? আমার ত সন্দেহ হয় যে বিষ খাইয়ে ওকে মারা হয়েছে।

যারা উপস্থিত ছিল, আমার কথা শুনে তাদের মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল, তা লক্ষ্য করবার মত ক্ষমতা আমার মনের ছিল না।

কিছুক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সেখানে ঘোরাল হয়ে উঠলো।

"ওকে বিষ খাওয়াবে কে হুজুর?" তেকড়ির কণ্ঠস্বর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠ্লো—"ও যে বাড়ীর সবাকারই ভালবাসার ধন ছিল!"

ব্যঙ্গের সুরে বললুম, বাকা! কে বিষ খাওয়াবে? কেন ওর সৎমা? এই সেপাই তেকড়ির বৌকে সদরে নিয়ে চল। ডাক্তার আগে লাস কেটে পরীক্ষা করুক তারপর অন্য ব্যবস্থা হবে।

হুকুম দিয়েই বাইরের দিকে চলে আসছিলাম, উন্মাদিনীর মত একটা স্ত্রীলোক এসে আমার পথরোধ করে বললে, যাচ্ছ কেন দারোগা বাবু? চল, আমায় সদরে নিয়ে চল, আমি আমার কেষ্ট ধনকে বিষ খাইয়েছি? তুমি ভদ্রলোকের ছেলে? মানুষ? না?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে স্ত্রীলোকটী মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়লো।

শামুকভাঙা থেকে যখন ফিরি তখন প্রায় সন্ধ্যা। কি করে তেকড়ি দেড়শ টাকা জোগাড় করেছিল তা জানি না। তবে সে দিন সমস্ত দিনের মধ্যে কয়েকটি ডাব ছাড়া আমার আর কিছু আহার জোটে নি—আর তেকড়ির বাড়ীর সকলেই যে অনাহারে ছিল তা ত নিজের চোখেই দেখেছিলাম।

টাকাটা পেয়ে না খেয়ে থাকার কষ্টটা আর মনে ছিল না।

ঘোড়ার উপর উঠে চাবুক মারতে যাব -এমন

সময় ছেলেটীকে আমার সামনে দিয়ে নদীর দিকে নিয়ে গেল। বারো-তেরো বছরের ফুটফুটে ছেলে—বিষে সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেছে—হঠাৎ আমার মনে হ'লো ওর বুকের উপর যেন কী একটা দুলছে—সাপ নয় ত ?

ঘোড়াটা ছুটবার জন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। বলগায় ঢিলা দিতে যাবো এমন সময় একটা কথা এসে কাণে পৌঁছুল,—যাচ্ছ, যাও! কিন্তু ভগবান যদি থাকেন, তবে এর ফল একদিন পাবে।

মুখ ফিরিয়ে দেখি বাঁশের আগড়ের পাশে দাঁড়িয়ে তেকড়ির বউ।

.........ঘোষ ঠাকুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। আমার মনটাও ভার হয়ে উঠলো—ভাবলাম, আজকের যে এই পরম বৈষ্ণব, তারও অতীত পরিচয় এই। কে যে সাধু আর কে যে পাপী—তা জানা মানুষের অসাধ্য।

মৃদু হাসির সঙ্গে ঘোষ ঠাকুর বললেন, আমার উপর খুব ঘৃণা হচ্ছে না ?

আমি বললাম, না, না, ঘৃণা কেন হবে ? মানুষের বিচার করতে হবে তার বর্ত্তমান নিয়ে, অতীতের গলিত শব দেহকে টেনে আনবার কোন আবশ্যক আছে বল আমি মনে করি না।

ঘোষ ঠাকুর বললেন, "তুমি মনে না করলে কি হবে ? কিন্তু যার অতীত সে যে কিছুতেই তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। অতীত যে মাঝে মাঝে তার কাছে বর্ত্তমানের চেয়েও সত্যরূপ ধরে দেখা দ্যায়। আমার সব চেয়ে শাস্তি কী জানো ভাই ? আমি যতক্ষণ মানুষের কাছে থাকি বেশ থাকি। কিন্তু নিরালা হ'লেই আমার সাধন-ভজনে আর মন বসে না—অতীতের যত দুষ্কৃতি রূপ ধরে আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়! সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে তেকড়ির বউয়ের সেই উদাস-দৃষ্টি। আর আমার মনে হয় আমার চারিদিকে অসংখ্য সাপ কিল্ বিল্ করে বেড়াচ্ছে—বাতাসে গাছের পাতা শির শির করে উঠলে আমার বুক কাঁপতে থাকে—রাত্রের অন্ধকারে আমার স্ত্রী যখন ঘুমুতে ঘুমুতে নিঃশ্বাস ফেলে আমি এক একদিন হুড়মুড় করে জেগে উঠি—মনে হয় ও ত নিঃশ্বাসের শব্দ নয়, ও যেন বিষধর সর্পের ফোঁস ফোঁসানি।

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ ঠাকুর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমার হাতখানা সজোরে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, আরও শুনবে ? পাপের শাস্তি কি করে আমি ভোগ করছি, শুনবে ?

—আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঘোষ ঠাকুর বলে চললেন এক এক দিন কি হয়, জানো ভাই! নাম জপ করতে করতে শিউরে উঠি, হাতের মালাকে সাপ মনে করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দি'।

ঘোষ ঠাকুরকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

আমি বললুম, থাক্ আর শুনতে চাইনে। রাধামাধবের চরণে আপনি আত্মসমর্পণ করে-ছেন। রাধামাধব আপনার মনের অশান্তি দূর করবে।

ঘোষ ঠাকুর প্রতিবাদ করে উঠ্লেন ; মিথ্যা কথা রাধামাধবকে আমি আত্মসমর্পণ করতে পারি নি। আমার পূর্ব্ব পাপ এসে আমায় বাধা দিচ্ছে। আমি মহা পাতকী—ঠাকুর তাই আমায় দয়া করছেন না। তুমি শুনবে অজিত, আমার আরও শাস্তির কথা ? এক একদিন আরতির সময় পাখার হাওয়ায় আমার মাধবের মাথার শিখি-পুচ্ছ দুলে দুলে উঠে—আর আমি ভয়ে আরতি ছেড়ে পালিয়ে আসি—আমার মনে হয় ও ময়ূর পুচ্ছ নয়—কাল সাপ এসে আমার ঠাকুরের মাথায় তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। সে যে কি শাস্তি, কি মহা যন্ত্রণা, তুমি কি করে তা বুঝবে ভাই ?"

—সেই রাত্রির ট্রেনে আমার ক'লকাতায় ফিরবার কথা। ঘোষ-ঠাকুরকে বললাম, আমার যাবার সময় হয়ে এলো, আবার যখন আসবো—আবার তখন দেখা করবো। আপনি মন খারাপ করবেন না।

আবেগের সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরে ঘোষ ঠাকুর বললেন: তাই এসো ভাই, তোমায় দেখলে আমার ভারী আনন্দ হয়। রাধামাধব তোমার মঙ্গল করুন।

দিন পনেরো পরের কথা। একটা মুসলমানী-পরব উপলক্ষে দুইদিন আফিস ছুটী ছিল।

মনে করলুম, ঘোষ ঠাকুরের সঙ্গে আর এক বার দেখা করে আসি। ভদ্রলোক বাস্তবিকই আমার অত্যন্ত স্নেহ করেন।

গৌরদাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীর সামনে আসতেই একটী বর্ষিয়সী বৈষ্ণবী বললেন: বাবা তুমি কি ললিতাকুঞ্জে যাচ্ছ? আর সেখানে গিয়ে কি করবে? মহাপ্রভুর যে কি ইচ্ছে, তা তিনিই বলতে পারেন। নইলে এত বড় ভক্ত বৈষ্ণবকে আমাদের মাঝ থেকে টেনে নেবেন কেন?

মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল হয়ে উঠলো।

বললুম:—এ কথা বলছেন কেন? ঘোষ-ঠাকুরের কিছু হয়েছে কি?

চোখ মুছতে মুছতে বৈষ্ণবী বললেন: কাল রাত্রে ঘোষ ঠাকুর দেহত্যাগ করেছেন।

বিস্মিত হয়ে বললুম, তাঁর কি অসুখ করে ছিল?

বৈষ্ণবী উত্তর দিলেন, অসুখ কিছুই নয় বাবা, রাত্রে সাধন ভজনের পর ঘুমুচ্ছিলেন; হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "সাপে কামড়ালো, সাপে কামড়ালো!" ললিতা দিদি তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখেন, একটা কেউটে সাপ দোরের ফাঁক দিয়ে পালাচ্ছে। সমাজ বাড়ীর বড় গোঁসাই গিয়ে কত ঝাড়-ফুঁক করলেন,—কিছুতে কিছু হলো না। তারা সবাই ঘোষ-ঠাকুরের শবদেহ নিয়ে মাধাইএর ঘাটে গঙ্গায় দিতে গেছেন। ললিতা দিদিও সঙ্গে গেছেন। তুমি না হয় এই সমাজ বাড়ীতেই এসে বসো বাবা!

শ্রাবণের আকাশ আসন্ন বর্ষণের আভাষ জানাচ্ছিল। চারদিকেই একটা থমথমে ভাব—আমার মনে হলো সন্ধ্যার অন্ধকার বুঝি এখনই ঘনিয়ে আসছে—চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠলো,—ঘোড়ার উপর চেপে ঘোষঠাকুর, পরণে পুলিশের পোষাক— ওপাশে দাঁড়িয়ে একটী স্ত্রীলোক,—তার মাথায় অবগুণ্ঠন নেই, এলো চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে—চোখের দৃষ্টি একাগ্র—কণ্ঠে তার অস্পষ্ট বাণী ফুটে উঠছে; "এর ফল একদিন পাবে!"
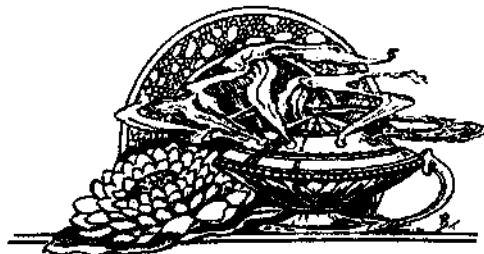
ডাক্তারের ভিজিট

অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

এম-এ

আমার ডাক্তারী ব্যবসার অবলম্বন করার একটা পূর্ব্ব ইতিহাস ছিল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ মাকে হারাইয়া, "হিসেবী" ঠাকুরদাদার কাছে মানুষ হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেমনি ভালবাসিতেন, তেমনি তাঁর কঠোর শাসনেরও সীমা ছিল না, এবং সর্ব্বদাই জীবনে "টাকা"র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর কাছে উপদেশ শুনিতে হইত। তিনি নাকি একবার তাঁহার দুঃখের দিনে কোনও ধনী বন্ধুর নিকট টাকা ধার করিতে গিয়া, টাকার বদলে গুটীকতক মিষ্ট কথা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার দ্বারে চোখের জল ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি টাকাকে সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন, দুঃখের দিনে ভগবানের চেয়ে টাকাই বড় বন্ধু, ইহাই তাঁহার চিরদিনের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার শিক্ষার গুণে স্থির করিয়াছিলাম যে হয় বড় ব্যবসায়ী না হয় বড় উকিল হইব, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া মানবজীবন সার্থক করিব। একদিন ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াইয়া গেল।

আমি তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। মর্ণিং স্কুল। মর্ণিং স্কুলের নেশা বোধ হয় একদিন না একদিন সকলকেই অভিভূত করিয়া তুলে। অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া বই বগলে স্কুলের দিকে চলিলাম। সেদিন ইন্‌স্পেক্টার আসিবার কথা। বৃদ্ধ "দাদু" একবার নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকাল সকাল স্কুল যাইতেছ কেন, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার আসিবার কথা বলিতেই তিনি নিরুদ্বেগে পাশ ফিরিয়া আবার নিদ্রিত হইলেন। স্কুল আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় একঘণ্টায় পথ। সেদিন যেন সকালের বাতাসটা বেশ প্রীতিকর মনে হইতেছিল, ফুলের একটা পাতলা গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে আসিতেছিল—মাঝে মাঝে আসিতেছিল বলিয়াই যেন বেশী মিষ্ট। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে স্কুলের কাছাকাছি হইয়াছি, এমন সময়ে হঠাৎ নিকটের এক কৃষক-পল্লী হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। চম্‌কিয়া তাকাইলাম। একটী চার-পাঁচ বছর বয়সের রুগ্ন ছেলেকে লইয়া এক কৃষক বধূকে প্রায়ই একটী কুটীরের রোয়াকে বসিতে দেখিতাম। শুনিলাম সেই ছেলেটী তখনই মারা গিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে কলরব ও করুণ রোদনধ্বনি। সেই পল্লীর ভিতর গিয়া স্কুলে যাইবার সহজ পথ। কিন্তু সেদিন ঘুরিয়া অন্যদিক দিয়া স্কুলে গিয়া পৌছিলাম। স্কুল বসিতে তখন দেরী ছিল, অন্য ছেলেরা হাডুডু খেলিতেছিল। আমাকেও ডাকিল কিন্তু সেদিন খেলিতে ইচ্ছা করিল না।

ইন্‌স্পেক্টর বাঙ্গালী ভদ্রলোক, নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। সৌম্যমূর্ত্তি, গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় দেখিলেই মনে যেন শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমাদের শ্রেণীতে ঢুকিয়াই ছেলেদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় হইয়া কে কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। এমন সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন কোনও ইন্‌স্পেক্টর করেন কি না জানি না, আমরা

কিন্তু ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সংস্কৃতের মৃগ-শূকরব্যাধের গল্প, ইতিহাসের মারাঠাজাতির অভ্যুদয়, ইংরাজী "Moral courage" সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া গিয়াছিলাম, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মাত্র উদ্গীরণ করিব। কিন্তু প্রশ্ন অদ্ভুত হইল, উত্তর ত আর মুখস্থ নাই। কোনও ছাত্র একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, ওকালতি করিবে, দু'একজন বলিল চাকরী, একটী ফাজিল ছাত্র "স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর হইব বলিয়া হেড মাষ্টার মহাশয় ও ইন্‌স্পেক্টর উভয়কেই হাসাইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম ডাক্তার হইব। সম্ভবতঃ কিয়ৎকাল পূর্ব্বের দৃশ্যটী আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই মুখ দিয়া ও কথা বাহির হইয়া গেল। কেন ডাক্তার হইব জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, ছোট ছেলেদের অসুখ করিলে ভাল করিব। কোন কথাই ভাবিয়া বলি নাই, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর বাবু আমার কথা শুনিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তা হ'লে আপনার আর আমার মত বুড়োদের কোন আশা নেই, চলুন, এখন অন্য ক্লাসে যাই।" বাড়ি আসিয়া "দাদু"র প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত বলিলাম। দাদু তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "ছোট ছেলেদের ভালর কথা ভাবিতে হইবে না, নিজের ভালর কথা ভাবিলেই যথেষ্ট হইবে।"

তারপর প্রায় আটচল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ যে কথা না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাই জীবনে সত্য হইয়া গিয়াছে, নিজের চেষ্টায় নয়, অদৃষ্টের স্রোতে পড়িয়া ডাক্তারী করিতেছি, কিন্তু দাদুর কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়াছি,— "নিজের ভালর কথা ভাবিলেই যথেষ্ট হইবে।" দাদু অনেকদিন চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছা আমার জীবনে সফল হইয়াছে, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, দাদুর মন্ত্র নিত্য জপ করিয়াছি—"নিজের ভালর কথা ভাবিলেই যথেষ্ট হইবে।"

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া হঠাৎ সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

তখন বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলন প্রবলবেগে আরম্ভ হইয়াছে। সকালে ডাক্তারখানায় আসিয়া বসিয়াছি মাত্র, প্রায় পাঁচমাইল দূর নবগ্রাম হইতে একটা "কল্" পাইলাম—বড় জরুরি ব্যাপার, তখনই যাইতে হইবে। এক কৃষকের হাতে একখানি চিঠি, লেখাটা মেয়েমানুষের হাতের লেখার মত। অন্ততঃ কুড়ি টাকা ভিজিটের কম তখনই যাইতে পারিব না বলিলাম। পত্রবাহক অতটাকা ভিজিট্ স্বীকার করিতে ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিল। "তেনারা কি অত টাকা দিতে পার্ব্বে" বলিয়া কি রকম একটা চাহনিতে আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, কুড়ি টাকার এক পয়সা কমেও আমি যাইব না। তারপর অন্য কার্য্যে মন দিলাম। কখন যে সেই কৃষক চলিয়া গেল তাহা লক্ষ্য করাও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। বেলা প্রায় তিনটার সময় সেই পত্র-বাহক পুনরায় একখানি পত্র লইয়া শুষ্ক মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, কুড়ি টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে। আমি গোটাকতক ঔষধ গুছাইয়া লইবার জন্য পাশের ঘরে যাইতেই আমার পুরাতন "বেয়ারা" শশী পত্রবাহককে বলিল, "সেই যদি দরকার, তবে সকালে ফিরে গেলে কেন!" অপর কক্ষ হইতে উত্তর শুনিলাম "তেনারা যে অত টাকা দেবে তা কি জানি, আমার আজ নাওয়া-খাওয়াও হ'ল না, কাঠা দুই জমি পড়ে র'য়েছে তাতে হাল দিতে

পারলাম না,—কি ক'র্ব্ব, বাবুর অবস্থা খারাপ, বাঁচে কি না বাঁচে, তাই আস্‌তে হ'ল।" আমি মনে মনে ভাবিলাম বাঙলার এই কৃষকজাতি এখনও নিজের ভালর কথা বুঝিতে শিখে নাই, পরের ব্যাপার খাটিয়াই মরে, ইহাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

রোগী দেখিলাম। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামে এক রাজনৈতিক সভা হইয়াছিল। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত সভাসমিতি বে-আইনী ঘোষনা করা সত্বেও রোগী সেই সভার সভাপতি হইয়াছিল। পুলিশ আসিয়া তাড়া দিতেই ভিড়ের মধ্যে চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছে। তখন হইতেই রোগী অচৈতন্ত অবস্থায় রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে ভুল বকিতেছেন। রোগীর বাড়িতে এক রুগ্না স্ত্রী এবং এক কিশোরী বিধবা কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। গ্রামের লোক অনেকেই দেখিতে আসিয়াছিল। আমি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, বিশেষ সাবধানতার সহিত রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য বিধবা কন্যাকে উপদেশ দিয়া, কুড়ি টাকা ভিজিট লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার দুইদিন পরে পুনরায় নবগ্রাম হইতে 'কল' আসিল। গিয়া দেখিলাম রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিলাম। ভিজিট দিবার সময় গ্রামবাসী একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমার কাছে আসিয়া অনেক ভণিতার পর পনরটী টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, রোগী অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়, ইহার অধিক দিবার শক্তি তাহাদের নাই। আমি বুঝিলাম যে ইহারা একটা ষড়যন্ত্র করিয়া আমার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ রোগীর বিছানার উপর রাখিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে তাহাদের এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিকারগ্রস্ত রোগী ঠিক্ সেই সময় যন্ত্রণায় কাতর হইয়া একটা অবক্ত শব্দ করিল। এমন সময়ে বিধবা মেয়েটী ঘরে আসিয়া আমাকে বলিল যে এখনই সম্পূর্ণ টাকা সে আমাকে দিতেছে, কেবল কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি সম্মত হইয়া নিকটের চেয়ারটীতে বসিলাম। মেয়েটী চলিয়া গেল; তাহার মুখ যেন অস্বাভাবিক ম্লান, অস্বাভাবিক বিবর্ণ। অনেক কিশোরী হিন্দু বিধবা দেখিয়াছি, এ যেন কি রকম মুখ, কি রকম চোখ, কি এক রকমের চেহারা!

টাকা আসিতে দেরী হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর হইতে একে একে সমস্ত গ্রামবাসী চলিয়া গিয়াছিল! রোগীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলাম যে অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণজাল শিয়রের জানালা দিয়া মুখে আসিয়া পড়ায় তাহার মুখটী অস্বাভাবিক লাল দেখাইতেছিল। হঠাৎ রোগী চাহিল, চোখ দুটী রক্তবর্ণ, বিকার কাটে নাই। কত মরণোন্মুখ রোগী দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার সহিত চোখোচোখি হইতেই আমার ভিতরটা যেন শিহরিয়া উঠিল। এমন সময়ে সেই মেয়েটী আসিয়া কম্পিত হস্তে আরও পাঁচটী টাকা আমাকে দিল। আমি ভিজিট লইয়া চলিয়া আসিলাম। পথের অন্ধকারে দুইটী মুখ কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, রোগীর অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ মুখ, বিধবার অস্বাভাবিক বিবর্ণতা।

কিছুদিন ধরিয়া আমার ছোট মেয়ে রমা দুইগাছি সোনার রুলির জন্য আবদার করিতেছিল, গৃহিণীরও তাগাদার সীমা ছিল না। নবগ্রামে চল্লিশটী টাকা পাইয়া রমার জন্য রুলি গড়াইতে দিয়া তাগাদা ও আবদারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

প্রায় তিনচার দিন আর কোনও সংবাদ পাই নাই। একদিন সন্ধ্যার পর নবগ্রাম হইতে অন্য একটী রোগী দেখিবার জন্য 'কল' পাইলাম। বৃদ্ধ হরিসাহা আমার বহুদিনের পরিচিত, তাহার বাড়ীতে অনেকবার চিকিৎসার জন্য গিয়াছি। হরিসাহার নাতির জ্বর ও কাশি, তখনই যাইতে হইবে। হরি টাকা ধার দিয়া এবং গহনার দোকান করিয়া অনেক টাকা করিয়াছিল। টাকার মর্য্যাদা সে জানে, সুতরাং সহজে আমাকে 'কল্' দিত না। তিন চার দিন জ্বরের পর সেদিন সন্ধ্যা বেলা নাতিটী কি রকম করিতেছিল দেখিয়া ভয় পাইয়া হরি আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল। গাঢ় অন্ধকার, বোধ হয় অমাবস্যা। গ্রামটীর ভিতর যখন উপস্থিত হইলাম তখন সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল চারিদিক হইতে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ও পাশে কোন কোন বনে বন্য জীবজন্তুর চলাফেরার শব্দ। হরির নাতিটীকে দেখিলাম, নিউমোনিয়া হইয়াছে; হরি এই রকম একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থা না হইলে আমাকে ডাকে না। রোগী দেখা শেষ করিয়া হরির বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় নবগ্রামের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত কৃষক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। এবং হরির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে একগাছি সোণার রুলি দেখাইয়া দুইটী টাকা ধার চাহিল। হরিসাহা প্রথমতঃ টাকা দিতে অস্বীকার করিল,—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে অসুখ, রোজ রোজ টাকা ধার সে দিবে না, শোধ হইবে কোথা হইতে, ইত্যাদি অনেক অজুহাত করিল। কিন্তু কৃষকের কাকুতি মিনতি অবশেষে তাহার হৃদয়-টাকে বোধ হয় স্পর্শ করিল। সে রুলিটী রাখিয়া দুইটী টাকা আনিয়া দিল। কৃষকটী চলিয়া যাইবার সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বাবুটী কেমন আছে। সংক্ষেপে সে বলিল, "আমার যাবার পর দিন একটু ভাল হ'য়েছিল, তারপর দিদি মণির ওপর রাগ করে কিছু খেলে না, মাথায় রক্ত উঠে সেইদিনই সন্ধ্যা বেলা মারা গেছে।"

কৃষকটীর সমস্ত কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, হরিসাহার দিকে তাকাইতেই সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল।

সেই রোগীর নাম গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্ণৌ সহরে ইংরাজীর অধ্যাপকের কার্য্য করার সময়, বে-আইনি জনতা করার অপরাধে দুইবার তাহার জেল হয়। চাকুরীটি হারাইয়া সে জন্মভূমি নবগ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। অনেক-দিন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিল, কিন্তু সঞ্চয় কিছুই করিতে পারে নাই। যাহা উপার্জ্জন করিত, গরিব ছেলেদের খাওয়ান ও মাহিনা দিতেই সব নিঃশেষ হইয়া যাইত। একমাত্র কন্যা প্রভাকে অবস্থাপন্ন গৃহেই বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু তাহা নিজের অর্থবল অথবা চেষ্টার জন্য হয় নাই, প্রভার প্রভাই পাত্রপক্ষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিবাহের ছয় মাস পরেই কন্যা বিধবা হইয়া পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেয়ের মা দুঃখের ভারে পূর্ব্বেই শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, এখন কন্যার উপরই গৃহকর্ত্রীর ভার পড়িল। মেয়ে বাড়ীতে বসিয়া চরকায় সূতা কাটে, এক একবার পিতার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকায়, মার সেবা করে, এবং পিতা-মাতার অজ্ঞাতে এক একখানি গহনা হরিসাহার নিকট বাঁধা দিয়া সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। যখন তাহার গহনা বাঁধা দিবার কথা সংসারে জানাজানি হয়, সেদিন বড়ই অশান্তি উপস্থিত হয়। বাপ তখনই খবরের কাগজ দেখিয়া চাকুরীর জন্য চতুর্দ্দিকে দরখাস্ত করে। দুই একবার ইংরাজী স্কুলে মাষ্টারীর চাকুরি হইয়া-

ছিল, কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জেলের কথা শুনিয়া তাহারা নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করে। হরিসাহা কতবার গোপালবাবুকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে, বিধবা মেয়ের গহনা বাঁধা রাখিয়া বাপ কিরূপে স্বচ্ছন্দে বাড়ি বসিয়া দুইবেলা উদরপূরণ করে সে ভাবিয়া পায় না। 'মুরুথ্‌খু' হরিও দু'পয়সা রোজগার করে, আর সে অতো বিদ্বান্ হইয়াও কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন না! গোপালবাবু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিত "ও আমার মেয়ে নয়, মা; মার দেওয়া ভাত খাবো তাতে আর লজ্জা কি?" কিন্তু বাড়ী আসিয়া মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিত, ভাল করিয়া ভাত খাইত না, চতুর্দ্দিকে চাকুরীর দরখাস্ত করিত। এইরূপে দিন কাটিতেছিল। তারপর সেদিনকার মাথার আঘাতের পর অজ্ঞান পিতার চিকিৎসার জন্য আমার ডাক পড়িলে প্রথমদিন একজোড়া বালা হরির নিকট বাঁধা রাখিয়া প্রভা পঁয়ত্রিশ টাকা ধার লইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন ভিজিট দিবার সময় তাহার পিতৃদত্ত দুইটী ইয়ারিং বাঁধা রাখিয়া আবার পাঁচ টাকা ধার করে। সেই ইয়ারিং দুটী শৈশবে তাহার বাপ মেয়েকে দিয়াছিল। সেই পুরাতন ইয়ারিং দুটাই প্রভার কাছে পিতৃস্নেহের মূল্যবান্ নিদর্শন—সে দুটীকে কখনও বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিত না। পরদিন গোপালবাবুর জ্ঞান হইলে সেই কৃষক ইয়ারিং ও বালা বাঁধা দিয়া হরিসাহার নিকট টাকা ধার করার কথা সমস্ত বলে। বাপ মেয়েকে ডাকে, উভয়ে নীরবে অনেক অশ্রুবিসর্জ্জন করে। মেয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়, বাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেইদিনই জ্বর বাড়িয়া আবার বিকার উপস্থিত হয় এবং সন্ধ্যার সময় গোপালবাবুর স্বাধীন আত্মা, দেহমুক্ত হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। আজিকার দুই টাকা ধার তাহার মার চিকিৎসার জন্য। নবগ্রামের নিকটেই এক কম্পাউণ্ডার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে ডাক্তার হইয়াছিল। তাঁহার ভিজিট এক টাকা। তাহাকেই 'কল্' দিবার জন্য, তাহার স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন, সোনা দিয়া মোড়া সেই লৌহকঙ্কণটী বাঁধা দিয়া দুইটী টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমি হরিসাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। তন্দ্রা আসে, আর গোপালবাবুর রক্তিম মুখ ও তাঁহার মেয়ের পাংশুবর্ণ দেহ কেবলই মনে পড়ে। আমাদের ডাক্তারী মতে সুস্থ ও সবল লোকের শরীর হইতে দুর্ব্বল রোগীর দেহে রক্তসঞ্চালন করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রভা ডাক্তারের উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই কি অভূতপূর্ব্ব উপায়ে তাহার বাপের দেহে রক্তসঞ্চালন করিতেছিল, তাই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। সেই জন্যই কি মেয়ের মুখ পাংশুবর্ণ, বাপের মুখ অস্বাভাবিক রক্তিম?

পরদিন সকাল হইতেই হরিসাহার নিকট চিঠি লিখিয়া পঁয়তাল্লিশটী টাকা দিয়া সেই গহনা কয়খানি আনিবার জন্য একটী লোক পাঠাইলাম। গহনা কয়খানি আসিল, অতি পুরাতন, বিধবা বালিকারই মত ম্লান ও নিষ্প্রভ। গহনাগুলি নবগ্রামে প্রভার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। বাহক গহনাগুলি ফিরাইয়া আনিল, সঙ্গে আনিল প্রভার হাতের লেখা একখানি চিঠি, সে লিখিয়াছে।

"শ্রীচরণ কমলেষু,

গহনাগুলিতে আর আমার প্রয়োজন নাই। যত্ন করিয়া এতদিন রাখিয়াছিলাম, এখন আর

উহাদের দিকে তাকাইতে পারি না। আপনি রাখিয়া দিবেন, আপনার মেয়ে পরিলে সুখী হইব। প্রণাম জানিবেন। ইতি

হতভাগিণী
"প্রভা"

সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, পরদিন দ্বিপ্রহরের পর নবগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রভাদের বাড়ি তালাবন্ধ। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা প্রভার মার মৃত্যু হইয়াছিল, রাত্রিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া অতি প্রত্যূষে প্রভা সেই কৃষককে সঙ্গে লইয়া কোনও দূরসম্পর্কীয়া কাশিবাসিনী পিসিমার আশ্রয়ের আশায় কাশী যাত্রা করিয়াছে।

দুইটী মহাপ্রাণের মৃত্যুচ্ছায়ায় বিবর্ণ সেই বালা, ইয়ারিং ও লৌহকঙ্কণ এখনও আমার কাছে আছে।

জীবনের সন্ধ্যাবেলায় দাদুর মন্ত্র গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু নূতন মন্ত্র শিখিবার সময় আজ আর কই ?

আকস্মিক

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

রেষ্টলজ
এলাহাবাদ
১০ই ফাল্গুন, ১৩ ২

বৌদি !

আজ হঠাৎ তোমায় চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লাম। দীর্ঘ পাঁচ বছরের পর আজকেই বা হঠাৎ লিখ্‌ছি কেন,—সে আমি নিজেও জানি না, আর তোমার কাছ হতে এতদিন কেন চিঠি পাই নি, এ কথা লিখেও নিজের মূর্খতা প্রমাণ করবো না।

...আজও আমি অবিবাহিত, এখনও তেমনি আপন ভোলা হয়ে কবিতা লিখি, কিন্তু ছাপাই না, শুধু খাতা বোঝাই করি। কাউকে পড়ে শোনাইনি আজও; তুমি কাছে থাক্‌লে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। মনে আছে বৌদি, রাঁচীতে আমরা যেবার বেড়াতে যাই, সেখানে কতদিন তুমি আমার চা নিয়ে বসে থেকে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে এসে দেখ্‌তে আমি একমনে কবিতা লিখে যাচ্ছি,—চা জুড়িয়ে যেত—আর তুমি গরম করে করে হয়রাণ হয়ে যেতে।

তুমি হয়তো ভাব্‌ছো যে আমি এতদিন কি করে তোমায় চিঠি না লিখে স্থির হয়ে আছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার চিঠি এতদিন না পেয়ে আর আমাকে কোনও চিঠি না লিখে তুমিই বা কি করে স্থির হয়ে বসে আছ,—একথা ভেবে আমি কিন্তু মোটে বিস্মিত হচ্ছি না বৌদি।

ছ' বছর আগে সেই দিনকার কথাটা এখনও আমার সময়ে অসময়ে মনে পড়ে যায় নানা কাজের ফাঁকে,—এলাহাবাদে আমায় যেতে হবে, চিঠি এসেছে,—আসবার দিন তোমার সে কি কান্না, তোমাকে থামাতে গিয়ে আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম। তারপর তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে আসি যে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তোমাকে একখানি করে চিঠি দেব, তুমিও তার উত্তর দেবে বলেছিলে। প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যে খুব চিঠি লেখা লেখি চলে ছিল,—তারপর একটু একটু করে এখন কেমন করে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আচ্ছা বৌদি বলতে পার;—কে আগে চিঠি বন্ধ করলে? তুমি না আমি?

জানি না কবে কোন সনাতন যুগে এই পত্র লেখার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনে হয় নর ও নারীর ভাব প্রবণতা সেইদিন হতেই বেশী করে বাড়্‌তে লাগ্‌লো। সকলে বলে এই পত্র লেখার সৃষ্টিতে নাকি মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নিগ্ধ পরিচয় সুনিবিড় করে, কিন্তু আমি বলি উল্টো, আমার মনে হয় চিঠি লেখা লেখিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদই হয় বেশী, অভিমান হয় গাঢ়। সকলে বলে চিঠি লেখাতে মানুষকে মানুষ স্মরণ রাখে অনেক দিন। আমি বলি মানুষকে ভুলে যাওয়ার জন্য এ যেন একটা বিরাট আয়োজন। স্মরণের যে, সে কখনও চিঠির আশা করে না, তাই তার তোয়াক্কাও রাখে না!

তুমি হয়তো মনে করছো কি সব পাগলের মত লিখ্‌লাম! অনুরোধ—এই যা লিখ্‌লাম তা একবার ভাল করে ভেবে দেখ।...মামুলী কথায় চিঠিখানি না ভরিয়ে কয়েকটা নতুন কথা তোমাকে জানিয়ে দিই।

সবিতা বলে একটী মেয়ে আমার এখানে আসে, তার কাছে আমি ছবি আঁকা শিখি আর আমি শেখাই তাকে গান। মেয়েটীর বাপ অন্নদা-বাবু জয়পুর হতে আমাদের অফিসে বদলী হয়ে এসেছেন। আমার বাংলোর ঠিক সামনেই ওঁদের বাংলো।...

সবিতা জয়পুর আর্ট কলেজ হতে প্রথম স্থান অধিকার করে সোণার পদক পেয়েছে। বিকালে দু'জনে মিলে বেড়াতে যাই, এক একদিন আমি নিই বাঁশী আর ও নেয় ছবি আঁকার সরঞ্জাম। কোনও দিন যাই ক্যানিং পার্কের পাশ দিয়ে এক বিরাট সমতল মাঠে, কোন দিন যাই নদীর ধারে, কোনও দিন বা গিয়ে বসি অশোক-স্মৃতি-স্তম্ভের কাছে। ও ছ'বি আঁকতে সুরু করে দেয়, আর আমি বাজাই বাঁশী।

কি ভাবছো বৌদি! ভাবছো বোধ হয় ও এক মেয়ের সঙ্গে দারুণ প্রেম করতে সুরু করেছে, নয়? প্রেম করছি কি না তা আমি জানি না তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে না এলে আমার মনে দারুণ অস্বস্তিতে ভরে উঠে।

সে যেন আমার চোখে এক সুন্দর স্বপ্ন।

সেদিন সবিতার আসতে দেরী দেখে আমি ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠ্ছিলাম। অর্গাণের চাবী টিপ্তে গিয়ে দেখ্লাম সেটা যেন বড় বেয়াড়া ভাবে চীৎকার করে উঠ্লো। বাঁশী বাজাতে গিয়ে নিজের দোষে অপ্রতিভ হলাম। আর বসে থাক্তে না পেরে তাড়াতাড়ি সবিতার বাড়ী অর্থাৎ একেবারে তার ড্রয়িংরুমে ঢুকে গেলাম, গিয়ে দেখি সে পিয়ানো বাজিয়ে গাইছে,—

Under the green wood tree
Who loves to lie with me.

ততক্ষণে তার গান ও শেষ হয়ে গেছে।

সামনের চেয়ারটীতে বসে বললাম,—এত বাঙলা তোমাকে শেখালাম আর তুমি কিনা গাইছো ইংরাজী গান। সেক্সপীয়ারের ও গান তোমায় শেখালো কে?"

সে বল্লো,—নীরেন বাবুর বাড়ী সেদিন সকালে আমি আর মা বেড়াতে গেছ্লাম। চা খাওয়ার পর মা নীরেন বাবুকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কতকগুলি বাঙ্লা গান গাইবার পর তিনি ওই গানটা গাইতে আমার শেখবার জন্যে খুব ইচ্ছে হলো; তাই আমি শিখ্লাম।"

তারপর সবিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম।...

সবিতা বললো,—দেখুন, আজ আমরা মাঠ বেড়িয়ে আরও কিছুদূরে যাব। চাঁদ উঠেছে, রাত হ'লেও বিশেষ কিছুই ক্ষতি নেই।"

তার কথামত ডুরাণ্ডা বনের পাশ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে নদীর পোলটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। অস্ফুট চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বল্লাম,—সবিতা, একটা গান গাও।

সবিতা আরম্ভ করল,—
চাঁদের আলো লাগিছে ভালো
লাগিছে ভাল নদীর ধার,
আজিকে রাতে ঘুম ভাঙ্গাতে
উঠিছে বাজি বীণার তার...

সেদিনকার আবহাওয়ার সবিতার পাশে বসে তার গান যে আমার কত ভাল লাগ্ছিলো তা তোমায় আমার এই সামান্য পত্রে কি করে জানাবো। দূরে মাঠের উপর ইউক্যালিপটাস্ গাছের উপর নদীর বুকে জ্যোৎস্না যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।...

তারই মুখের দিকে চেয়ে আমি তন্ময় হয়ে রয়েছি।

সে তখনও গাইছে,—

আকাশে চাঁদ নিদ্রাহারা
পাগল ধরা বাঁধন ছাড়া
মাঠে মাঠে আলোর রেণু
জাগ লো ক্ষ্যাপা ডাকেতে কার
বনের পাশে নদীর বুকে
জ্যোৎস্না রাণী ঘুমায় সুখে
এই রাতেতে ডাকুক পাখী
নিদ্রা টুটি আজ সবার।"

তারপর অনেক রাত্রে আমরা বাড়ী ফিরি।...

আজ এই পর্য্যন্ত থাক বৌদি। উত্তর দিও, পরে আবার চিঠি দেব।

প্রণাম নিও, ছোটদের স্নেহাশীষ জানিও।

ইতি
স্নেহাধীন •

এলাহাবাদ
২৪ ফাল্গুন, ১৩৩২

বৌদি,

কাল সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি।...

আমার চিঠি পেয়ে তোমরা যে পাত্রী অনুসন্ধান করতে লেগে যাবে এ আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি।...

তুমি লিখেছ যে আমার নাকি সবিতার সঙ্গে বেশী মেশা উচিত নয়। কেন? কারণটা লিখ্‌লে খুব ভাল করতে। তুমি তো জান না ওই মেয়েটী আমার জীবন মধুর সঙ্গীতে সুন্দর স্বপ্নে পূর্ণ করে রেখেছে। কি স্বপ্ন, কি সঙ্গীত— তা আজও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

যাক্ মাঝে তো পাঁচ বছর আমাদের মধ্যে চিঠি পত্র বন্ধ ছিল, আশা করি এবার তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দেবে; তার পরে নয়তো আবার কিছুদিন চিঠি দেওয়া বন্ধ থাক্‌বে।...

তুমি আমায় এতদিন চিঠি দিতে পারনি তার জন্যে অনেক ওজর কিংবা কারণ দেখিয়েছ, দেখানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না—আমি তো ওসব তোমার কাছ হ'তে জানতে চাইনি, তা ছাড়া ওই ওজর-আপত্তি গুলোর উপর চটা আমি চিরকাল, এতো তুমি জান।

সবিতার সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা জানতে চেয়েছ, তাই অনেকগুলি প্রশ্নও করে বসেছ।...

হ্যাঁ সে আমাদেরই স্বজাতি, গাঁই গোত্র মিলিয়ে দেখি নি, দরকারও নেই বলে; তুমি মনে করেছ যে আমি বোধ হয় তাকে বিয়ে কর্‌বো, নয়?...

কতবড় ভুল ধারণা যে করেছ তা তুমি বুঝতে পার নি, তোমাকে তা বোঝানও যাবে না।

মোট কথা এক বারশোটাকা মাইনের চাকুরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে দুঃসাহস এই পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরাণীর কখনও হয় নি। একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে ঠাঁই দিয়ে তোমাদের মেয়েজাতটাকে কষ্ট পেতে আমি বরাবরই দেখেছি।...

কেন রাঁচীতে আমার সঙ্গে যে মেয়েটীর আলাপ হয়েছিল—এক সঙ্গে বেড়ানো, চা খাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়া, সময় সময় তুমিও তো সঙ্গে থাক্‌তে, তাকে আমি বিয়ে কর্‌বো এমন আভাষ কি আমার মধ্যে দেখেছিলে?

একটী ছেলের সঙ্গে একটী মেয়ের পরিচয়— দয়া করে এ জিনিষটা তোমরা খারাপ চোখে দেখ না। এই পরিচয়ের মধ্যে কতটা পবিত্র ভাবও থাক্‌তে পারে সেটা কি মাথা ঘামিয়ে দেখেছ? আমাদের সন্দিহান দৃষ্টি মানুষকে খারাপ পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার ইন্ধন যোগায়, এর চেয়ে

আমাদের জাতির এত কলঙ্ক আর কিছু থাক্‌তে পারে না।...

একটী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলেই যে তার সঙ্গে প্রেম কর্‌তে হবে, তাকে মানস প্রিয়ারূপে হৃদয় পটে আঁকতে হবে—এরও কোন মানে নেই, আমি তা সমর্থনও করি না। আমি ভাবি বাঙ্‌লা দেশের নারী,—তারা আমার মা, তারা আমার বোন।...

যাক্ অনেক বাজে কথাই হয়তো এতক্ষণ লেখা হলো। আমার একমাত্র বোন অণিমা মারা যাওয়ার পর আমি পাগলের মত হয়ে গেছলাম—এতদিন পরে অণিমা যেন সবিতার রূপে আমার কাছে ফিরে এসেছে।...

সেদিন সবিতার জন্মদিনে ওদের বাড়ী গেলাম।...

গিয়ে দেখি সবিতার পরণে ফিরোজা রঙের একখানি শাড়ী, গায়ে ফিকে নীল রঙের জ্যাকেট আর পায়ে হরিণ চামড়ার সুন্দর চটী।

দিল্লী থেকে ওর কাকা ওকে এনে দিয়েছে।

আষাঢ়ের বারি বর্ষণ বাহিরে অবিরাম ভাবেই চলেছিলো।

ড্রয়িংরুমে সবুজরঙের তেলের ঝাড় দু'টী জ্বলছিলো।...

আমি তার জন্মদিনে যে কবিতাটী লিখেছিলুম সকলের অনুরোধে আমায় সেটী পড়্‌তে হ'ল।

পাঠ করে বল্‌লাম,—"অনেকেই অনেক কিছু তোমাকে দিয়েছেন সবিতা। আমার তোমায় দেবার মধ্যে শুধু এই কবিতাটী।"

সবিতা তখনই বলে উঠ্‌লো,—'যথেষ্টই দিয়েছেন। আপনার চেয়ে বড় দেওয়া আর কেউ দেন্‌নি।'

নীরেন বাবু গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন,—"তার মানে সবিতা দেবী? কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না, বুঝিয়ে দিতে পারেন কি দয়া করে?"

সবিতা নির্ব্বিকারভাবে বলে উঠলো,—"কই আমার কথার মধ্যে এমন কিছু ফিলজফি নেই বোধ হয়, যে আপনার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয় এ সব জিনিষের থেকে ওঁর কবিতাটাই সকলের চেয়ে বড়, তাই এ সবের চেয়ে ওইটাই আমার আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।"

নীরেন বাবু বল্‌লেন,—"স্মরণীয় দিনের যে কোনও উপহারই মূল্যবান, এই আমার মত, তা সে কবিতাই হোক, আর যে কোনও জিনিষই হোক। উনি কবি, তাই আপনাকে কবিতা উপহার দিয়েছেন। আমরা কবি নই বলে কি আমাদের এই সাদর উপহারগুলি আপনার কাছে তুচ্ছ?"

সবিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"তুচ্ছ তো আমি বল্‌ছি না, আপনাদের সাদর উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি, তবে এর মধ্যে আমার কোনটী সব চেয়ে প্রিয়, এই কথা বলায় আমি কি কিছু অপরাধ করে ফেলেছি?"

ধীরেন বাবু কি বল্‌তে যাবেন এমন সময় নীরেন বাবু তখনই তাঁহাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌লেন,—"আপনি অপরাধ করেছেন কি না করেছেন এমন কথা তো আমি বা আমরা কিছু বল্‌ছি না, তবে,—

'তবে'র পর আর কিছু নীরেন বাবুকে বল্‌তে হল না, রামহরি বাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন,—"যাক্, চুলোয় যাক ওসব বাজে কথা, আজ এমন আনন্দের দিনটা দেখ্‌ছি নীরেন বাবু নষ্ট করে দিতে চান। সবিতা দেবী,একটা গান শুনিয়ে ঝড়টা থামিয়ে দিন ত।"

আমিও অনুরোধ কর্‌লাম।...

সবিতাও গাইতে সুরু করল,—

—"যে কটা দিন আছি বেঁচে
গান গেয়ে নাও গান,
এক সাথে সব মিলে মিশে
ভরাও সবার প্রাণ।
মিছামিছি দ্বন্দ্ব ভুলে
রইবি তোরা কদিন ভুলে
মিল্‌তে হবে একই কূলে
সবার হাতে হাত দিয়ে তোল্‌
একই সুরের তান…"

সুর ঝঙ্কার সকলকে উদ্ভ্রান্ত করে তুল্‌লো। গান শেষ হতেই সবিতা আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বল্‌লো,—"এই গানটী এঁর লেখা।"

সকলের সুরে সুর মিলিয়ে নীরেন বাবু বল্‌লেন,—"গানটী রচনা চমৎকার, আর গাওয়াও হয়েছে সুন্দর।"

আমাদের সকলের অনুরোধে এইবার নীরেন বাবু গাইতে আরম্ভ করলেন।

বিরক্তি বোধ করায় তাড়াতাড়ি একখানি বই টিপয়রে উপর হতে তুলে পড়্‌তে সুরু করে দিলাম!

গান শেষ হলে আহারের ডাক পড়্‌ল।

পাশের ঘরে শাদা মার্ব্বেল পাথরের টেবিলে সকলকার জায়গা করা হয়েছে খাবারও দেওয়া হয়েছে সকলকার কেবল একজনের বাদ।

সবিতা বল্‌লো,—আপনি এখন খাবেন না।

আজ আমরা দুই ভাই বোনে একসঙ্গে মিলে খাব, কেমন আমিও সম্মতি জানাই।…

সকলে বিদায় নিলে সবিতা আর আমি খেতে বস্‌লাম।…

সবিতা বলে,—আচ্ছা নীরেন বাবু আজ হঠাৎ অত চটে উঠ্‌লেন কেন? আপনি কিছু বুঝ্‌লেন।

ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা সত্ত্বেও আমাকে তার সবটাই সবিতার কাছে গোপন রাখ্‌তে হল।

বৃষ্টি ও মেঘ কেটে গিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যেতেই সবিতার কথা মত ছাদের উপর আমরা দু'জনে বেড়াতে লাগ্‌লাম। সেই সময় আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছিলো বৌদি।…

অনিমাকে অমনই জ্যোৎস্নালোকিত রাতে ছাদের উপর বসে কত গল্প বলেছি, কতদিন সে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে …

আজ আসি প্রণাম নাও। ইতি—

* * *

এলাহাবাদ
৫ই চৈত্র ১৩৩২

বৌদি!

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি।

তোমার চিঠির মধ্যে দেখলাম তুমি নীরেন বাবুকে খাড়া করে অনেকগুলি প্রশ্নই করেছ। সমস্ত প্রশ্নগুলিই আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। তোমাদের জাতটা বড় সেয়ানা, তাই তুমি একটা মস্তবড় জিনিষ ধরে ফেলেছ।

হাঁ, নীরেন বাবু ধনীর ছেলে আর সে সত্যই সবিতাকে ভালবাসে, তবে সবিতা তাঁকে ভালবাসে এ আভাস বা পরিচয় আমি পাই নি। তুমি তো জান সবিতার জন্মদিনে সে নীরেন বাবুর উপর অসন্তুষ্টই হয়েছিল।…

মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা তোমাকে জানালে তুমি বুঝ্‌তে পারবে যে নীরেন বাবুর প্রতি সবিতা কতটা প্রসন্ন।…

সেদিন নদীর ধারে বিকালে আমরা বন-ভোজন করতে গিয়েছিলাম। দলে ছিলাম—আমি, সবিতা, সবিতার মা, নীরেনবাবু ও তাঁর পরম বন্ধু বীরেনবাবু। আমি আমার চিরসাথী কবিতার খাতা ও বাঁশীটী সঙ্গে নিয়েছিলেম।…

বনভোজনের নিয়মানুসারে প্রত্যেকেই এক একটা জিনিষ রাঁধবার ভার নিলাম আমি চা, সবিতা টোষ্ট, সবিতার মা মাংসের চপ, নীরেন বাবু ও বীরেন বাবু এই দু'জনে করবেন ডিমের দম।...

আমার কাজটা ছিল সকলকার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর। চা তৈরী হ'তেই ভোজন সুরু হ'ল, সঙ্গে নানারূপ মন্তব্য ও আরম্ভ ও হলো।

নীরেন বাবু বললেন হয়েছে ভাল চপ আর টোষ্ট আর সব রাবিশ। চা ভাল হয়নি, যেন ঠিক নর্দ্দমার জল, কি বল বীরেন?"

বীরেনবাবু মুখের ভিতর অতিরিক্ত আহার্য্য বস্তু থাকার দরুণ উত্তর দেবার শক্তি তাঁর ছিল না, তাই তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে পরে নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলে নিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বল্লেন,—"তা যা বলেছ নীরেন।'

সবিতা দুষ্টমির হাসি হেসে বল্লো,—চা আর চপ এই দুটোই ভাল হয়েছে, আর সব রাম! রাম! একেবারে খাওয়ার অযোগ্য।"

আমি ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্লাম,—"তা যা বলেছ সবিতা।"

সঙ্গে সঙ্গে সবিতা ও তার মা হো-হো করে হেসে উঠ্তে স্পষ্টই বুঝ্লাম নীরেন বাবু ও বীরেন বাবু বিলক্ষণ চটেছেন।

তারপরে তাঁরা দুই বন্ধুতে মিলে কিছুক্ষণ মৌন থাকবার পরে সবিতার মার সঙ্গে গল্প সুরু করেছিলেন। যত সব আজগুবি গল্প. কেমন করে তাঁরা দুই বন্ধুতে বনে গিয়ে দুই বাঘ শীকার করে নিয়ে এসেছিলেন—এই সব।...

সেই সুযোগে আমি আর সবিতা দু'জনে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে ভুরাগুাবনের সীমানা ছাড়িয়ে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসলুম।

সবিতার কথায় বাঁশী বাজাতে হ'ল। সবিতার উৎপাতে কবিতা আর লেখা হয় না। আমার ভাণ্ডারে যতগুলি সুর ছিল সবগুলিই তাকে শুনিয়ে দিলুম।

সে তন্ময়তার ঘোরে আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।...

শেষে সবিতা কে উঠিয়ে আবার ফিরে গেলুম, চল্‌তে চল্‌তে সে আমার কথামত গাইতে লাগল।

"মনের কোণে রইবে জমে
একটী দিনের দাম,
একটী দিনের হাসি গানে
থাকবে সবার নাম।
একই হাতে হাত দিয়ে এই
আপন ভেবে ডাকা,
অনেক দিনের অনেক স্মৃতি
রইবে মনে আঁকা।
জানবে সবে পরিচয়ে
আপন করিলাম।"

আসল কথা তোমায় জানাতে গিয়ে বৌদি অনেক বাজে কথা লিখে বস্‌লাম। এইবারে জানাই কেন সেদিন সবিতার অপ্রসন্নতা লাভ করলেন, আমাদের বেচারী নীরেন বাবু।...

আমরা ফিরতে নীরেনবাবু বেশ গম্ভীর ভাবেই বলে উঠ্‌লেন,—দেখুন সবিতা দেবী, হঠাৎ দল থেকে আপনাদের চলে যাওয়াটা 'এটিকেট্' বিরুদ্ধ হয়েছে।'

সবিতা বল্লো,—"এটিকেট্' আমি জানি না। আমরা দু'জনে যখন যাই তখন আপনারাও ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারতেন।"

নীরেনবাবু বল্লেন, – "আপনাদের ডাকাটাও কি উচিৎ ছিল না?"

সবিতা বাধ্য হয়েই বলে,—"না, যেহেতু আপনারা মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। সে সময় আপনাদের বিরক্ত করলে কি এটিকেট্ বিরুদ্ধ হতো না?"

নীরেন বাবু শ্লেষের স্বরে বলে উঠ্‌লেন,—"যাক্‌ ও নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু দুঃখ করবার নেই, কারণ…।"

করণটা উহ্য থেকে গেল অন্য সব অবান্তর কথায় চাপে পড়ে।

কারণ বলে থেমে যাওয়া,—সবিতা কিন্তু ভুল্‌তে পারলো না. বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ ছাড়া অন্য কোনও কথায় আর নীরেন বাবুর সঙ্গে সে যোগ দিলে না।

এইবার বুঝেছ বৌদি, কত নীচ অন্তঃকরণের মানুষও এই পৃথিবীতে থাকে। আমি সবিতাকে আমার ছোট বোনটীর মত দেখি, সেও ঠিক আমাকে বড় ভায়ের মতই ভক্তি করে, ভাল বাসে—নীরেন বাবুর দল সেটাকে কি ভীষণ কদর্য্য ভাবেই না দেখেছেন।…

সবিতা দুঃখ করে আমাকে অনেক কথাই বলেছে।

আমি বলি তাকে,—"এসব উপভোগ করবার জিনিষ সবিতা। ওদের দেখে একটা আনন্দ আমরা পাই এই ভেবে যে, আমরা এখনও ওদের চেয়ে নিজেদের মনকে কত পবিত্র রাখ্‌তে পেরেছি। একটা মজা দেখেছ, নিজেদের ওই মন দিয়ে অপরের মন বিচার করতে যাওয়ার বোকামী ওদের প্রচুর পরিমাণেই আছে। সেটুকু অন্ততঃ আমার হাসির খোরাক যুগিয়ে যায়। তুমি তাতে অত বিরক্ত হও কেন?"

সবিতা বল্‌লো,—"সে ভাল, তবে দুঃখের বিষয় এই যে আপনার মত অত সহ্য করবার শক্তি আমার নেই। নীরেন বাবুর মত লোক এখনও আমাদের নারীজাতিটাকে চিন্‌তে পারে নি। আমরা পুরুষদের মত অত শস্তা নয়, অত খেলো নয়। পুরুষরা নারীর কাছে নিজেদের পদমর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য অতি সহজেই হারিয়ে ফেলে, আমরা তা ফেলি না। আমরা সরল বটে তবে পুরুষদের মত পাগল নই। নীরেন বাবু নিজেকে ভাল ভাবে জাহির করতে অকারণ সম্মান আদায় করতে চান সকলের কাছে। লক্ষ্য করে দেখছি বিশেষ করে আমার কাছে তিনি নিজেকে খুব প্রমিনেণ্ট করতে চান উনি কি জানেন না যে ওঁর ওই অপটু কায়দ কৌশল আমার চোখ এড়ায় নি।

কথা শেষ হতে আমি চোখ মেলে দেখি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নীরেন বাবু। স্পষ্ট বুঝ্‌লাম, আমাদের সমস্ত কথাই তিনি শুনেছেন।

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, সবিতা কিন্তু নির্ব্বিকার।…

চেয়ারের উপর বসে নীরেন বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"তোমার কথাগুলোর উত্তর দেওয়া বড় প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। তোমাদের নারী জাতটাকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি, আমি ভুল করেছি এই যে তোমাকে সমস্ত থেকে স্বতন্ত্র বলেই স্থির করেছিলাম। কিন্তু আজকের কথায় আর সেদিনকার ব্যবহারে আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝেছি—যে তুমি একজন সাধারণ নারীর মতনই বাচাল। নিজেকে মহামাননীয়া জ্ঞান করে মস্তিষ্ক বিকারের পরিচয় দাও তোমরা, আমরা নই। তোমাদের কাছে আমরা আমাদের অস্তিত্ব নিজ হতে আগে হারাই না, তোমরা তোমাদের অস্তিত্বের জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের বেশ ভূষায় ও নানারূপ ললিত কলায় আমাদের মন হরণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর বলেই আমরা তোমাদের করুণা করে একটু ভালবাসি মাত্র, খেলো বা সস্তা করি না। আমি তোমার কাছে নিজেকে প্রমিনেণ্ট করবার জন্যে কতকগুলো অপটু কায়দা কৌশল অবলম্বন করি, —এই ভুল ধারণা তোমাকে যাতে আর বেশী দিন কষ্ট না দিতে পারে সেই জন্যে আজকেই তোমাদের কাছ হতে বিদায় নিলাম।"

কথাটী বলেই নীরেন বাবু কালবিলম্ব না করেই চলে গেলেন।...

তারপর অনেক দিনই নীরেন বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

একদিন সবিতার অসুখ থলে আমি একলাই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি নীরেন বাবু একলা চুপ চাপ নদীর ধারে বসে আছেন।... আমাকে দেখেই তিনি ডাকলেন। তাঁর পাশে গিয়ে বস্‌লাম।...

অনেকক্ষণ বসেই আছি, কোনও কিছুই তিনি বলেন না শুধু নিরর্থক ভাবে কখনও আমার দিকে কখনও নদীর দিকে চেয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে নীরেন বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, —"দেখ্‌লেন সেদিনকার সবিতা দেবীর ব্যবহারটা। আমরা ওঁদের বাড়ী যাই বলেই কি অত অপমান করতে হয়! স্পষ্ট বলে দিলেই তো পার্‌তেন আমাদের যাওয়ায় ওঁদের আপত্তি আছে।"

আমি তাঁকে বুঝাতে গেলাম, তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেন,—থাক মশাই সবই বুঝতে পারছি, মেয়েদের বেশী আস্পর্দ্ধা দিলে যা বিষময় পরিণাম দাঁড়ায় তাই দাঁড়িয়েছে। আপনি যাই বলুন না কেন আপনাকে একটা ভবিষ্যদ্বাণী বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে দেখবেন,—সবিতা দেবী লোক মোটেই ভালো নন্। আমি নেহাৎ ভাগ্যবান তাই বেলাবেলি সরে পড়তে পেরেছি। আপনাকে বিশেষ ভাবেই ভুগতে হবে। এখন হাসলেও পরে আমার কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে বল্‌বেন,—হ্যাঁ নীরেন বাবু ঠিক বলেছেন বটে।"

আর কোনও প্রসঙ্গ আসবার আগে আমি সেখান হতে চলে আসি।

হাঁ বৌদি, আমার দিক্ দিয়ে একটা দুঃসংবাদ তোমায় জানিয়ে দিই,—সবিতারা দিল্লী চলে যাচ্ছে মাসখানেক পরে। ওর বাপ এখান হতে হেড অফিসে বদলী হওয়ার চিঠি পেয়েছেন। আজ এই থাক, প্রণাম নিও। ইতি—

* * *

এলাহাবাদ

১৭ই মাঘ ১৩৩৫

বৌদি।

তিন বছর তোমায় চিঠি লিখিনি।...

তুমি বার বার আমায় চিঠি দিয়ে, আমার কাছ হতে কোনও উত্তর না পেয়ে শেষে হয়রান হয়ে চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছ।...

তাই তোমাকে দোষ দিই না, দোষ আমার।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ীর সবাই কেমন আছে জানিও।...

যাক্,—অনেক কিছু ঘটে গেল এই তিন বছরে, তোমাকে জানিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

সবিতারা দিল্লী গেছে আজ তিন বছর হতে চল্‌লো। চিঠি প্রথম প্রথম দুখানা তিনখানা এসেছিল, তারপর থেকে একেবারে বন্ধ।...

বছর খানেক হল নীরেন বাবুও দিল্লীতে বদলী হয়ে গেলেন।...

দিন চার হল আমার মাহিনা পঁচাত্তর থেকে একশ টাকায় পরিণত হয়েছে।..

তুমি বোধ হয় জাননা অকারণ আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে এখন মানুষের বিচিত্র মনস্তত্ব নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

এইতো গেল এতগুলো পরিবর্ত্তন।

এবারে তোমায় আসল একটা ঘটনা জানিয়ে দিই, হয়তো তুমি বিশ্বাস করবেনা। প্রথমটা আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, কিন্তু এখন ভাব্‌ছি, জগতের এই নিয়ম।...

সেদিন বড় দিনের ছুটীতে বেড়াতে যাবার

জন্যে 'দিল্লী'র একখানা টিকিট কিনে দিল্লী একস্‌প্রেসে উঠ্‌লাম।...

বিকালের দিকে শীত পাচ্ছিল, নিদ্রা বোধ হওয়ায় ব্যাঙ্কের উপর উঠে গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে ছিলাম।...

ট্রেণ তখন "আগ্রাফোর্ট" ষ্টেশনে এসে থেমেছে।

কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রাজড়িত চোখে দেখ্‌লাম সবিতা ও নীরেন বাবু আমার কামরায় উঠ্‌লেন।...

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।...

দেখলাম—সবিতার সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় কাপড়। দুজনে পাশা পাশি বসে উচ্ছ্বসিত হাসি গল্পে মগ্ন।...

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের উপর হতে নেমে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"এই যে সবিতা কেমন আছো? তোমার বিয়ে কবে হ'ল, কার সঙ্গে?

সবিতার হয়ে নীরেন বাবু কথাটার উত্তর দেন, বলেন—"কিছু মনে করবেন না, সবিতা যদি সত্যিই আপনার বোন হয়, তাহলে অনেক দিনই আপনি আমার 'শালা' সম্পর্ক হয়ে আছেন।"

তখনই আমি সেখানে হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়্‌লাম। যা কখনও আমি কল্পনাই করিনি সেই নীরেন বাবুর সঙ্গে কিনা সবিতার বিয়ে হল!

মাথা ঘুরে উঠ্‌লো। মনে হল এই বিশাল ট্রেণখানি যেন আমাদের কামরাখানি নিয়ে ঘুর্ণির মতন কেবলই ঘুরছে।...

দিল্লী বেড়িয়ে বাড়ী ফিরি, তবু মানসিক অশান্তি যায় না। আবার আত্মগ্লানি আসে এই ভেবে, নীরেন বাবুর সঙ্গে সবিতার বিয়ে হয়েছে তাতে আমার অশান্তির বা রাগের কি কারণ থাকতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর তাই ঘৃণাও হয় খুব বেশী। ইতি—

রাত দুপুরে

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

মেঘনাদ বার দুই ম্যাট্রিক দিয়াও যখন পাশ করিতে পারিল না, তখন সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কথাটা গোপন রহিল না; পাড়ার অনেকেই জানিয়া ফেলিল। বাস্ আর কোথা যায় সে! সমস্ত বিবাহে পদ্য লিখিবার ভার পড়িতে লাগিল তাহার উপরে। শীঘ্রই তাহার কবি খ্যাতি চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল।

সেদিন দুপুর বেলা।

চারিদিকে রোদ খাঁ-খাঁ করিতেছে।

তাহাদের সামনের বাড়ীর ছাদে একটি তরুণী আচার শুখাইতে দিয়া তাহা পাহারা দিতেছিল।

মেঘনাদ অলস-মধ্যাহ্নে তাহার ঘরে বসিয়া কবিতার মিল খুঁজিতেছিল। সহসা তাহার শ্যেন দৃষ্টি পড়িল সেই তরুণীর উপরে। তাহার কবি-চিত্ত উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল; চোখে-মুখে সে কি পুলকের হিল্লোল!

তাড়াতাড়ি কলম লইয়া সে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আজ আর তাহার মিল খুঁজিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। তুফান মেলের মতই দ্রুত গতিতে তাহার কলম ছুটিয়া চলিল। এক এক লাইন লিখিয়া সে তরুণীর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

চোখে চোখে 'কলিশন' হইয়া যাইতেই তরুণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া এক পাশে আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার অদর্শনে মেঘনাদের সমস্ত ভাব একেবারে মাটি হইয়া গেল। তাহার লোলুপ দৃষ্টি বার বার চেষ্টা করিয়াও তরুণীর আর কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। সে একটা বুককাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার অর্দ্ধ সমাপ্ত লেখাটি পড়িতে লাগিল:—

ঐ কে দূরে দাঁড়িয়ে বালা?
চক্ষে বিপুল মদির ঢালা
সোহাগ ভরে দেয় যদি সে
কণ্ঠে আমার পরিয়ে মালা!
কেমন করে জানি না হায়,
করলে সে মোর প্রাণ চুরি,
গোঁত্তা খেয়ে পড়্‌ল ছাতে,
শেষে আমার মন-ঘুড়ি।

আর একবার তাহাকে দেখিবার জন্য সে তন্ময় ভাবে পলক-হীন দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চাহিয়া ছিল। কখন যে তাহার পিতা সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। তিনি পুত্রের অর্দ্ধ সমাপ্ত কবিতাটি পড়িয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া গেলেন।

তরুণী তখন আবার সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অধর কোণে হাসির রেখা।

পুত্রের লক্ষ্যের দিকে চাহিয়াই পিতা একেবারে দপ্ করিয়া বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার রাগ আর সামলাইতে পারিলেন না, ঠাস্ করিয়া গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন: 'শুয়ার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তোমার এই হচ্ছে? যাও এক্ষুণি এ' বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মত কুলাঙ্গারের এখানে স্থান হবে না।' রাগে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

আকস্মিক এই ব্যাপারে মেঘনাদ একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল; তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া তরুণী কোন্ ফাঁকে ছাদ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।

গৃহকর্ত্তার চীৎকারে মেঘনাদের মাতার দিবা-নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তিনি সশঙ্কিত চিত্তে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাপারটা অনেকটা অনুমান করিয়া বলিলেন; 'আয় মেঘু, তুই বাইরে বেড়িয়ে আয়।'

তাহার পিতা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন; 'কোন কথা নয়, ও এখুনি এখান থেকে বিদায় হোক্, নইলে পাজীকে জুতো মেরে তাড়াব!' জুতা মারিতে হইল না। মেঘনাদ উঠিয়া পিতার দিকে একবার তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া হন্ হন্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তাহার ছোট বোন শ্রীলেখা নীচে সিঁড়ির কাছে বসিয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে দিয়া মেঘনাদ তাহার জামা ও জুতা আনাইয়া দ্রুত-বেগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

মেঘনাদ তাহার বন্ধু বনমালীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করিয়া বলিল; 'আমি আর কিছুতে বাড়ী যাব না ভাই। এমন করে যখন বাবা আমায় অপমান করেছে, তখন আমি চাই না তার কাছে থাকতে। এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ঢের ভাল।'

বনমালীও তাহা সমর্থন করিয়া কহিল; 'নিশ্চয়। ও রকম বদমেজাজী বাপের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি হলে একবার দেখে নিতুম!'

দুই বন্ধুতে অনেক পরামর্শ হইল।

বনমালী বলিল; তুইও যাস্ নে, দেখ্ না শেষে ডেকে নিতে পথ পাবে না। তুই যদি একটু শক্ত হয়ে থাক্‌তে পারিস্ ত দেখ্‌বি তোর বাবা কেমন জব্দ হয়ে যাবে। জীবনে আর কখনও কিছু বল্‌তে সাহস করবে না!'

মেঘনাদ তাহার কথায় রাজী হইল।

বনমালী বলিল; কাশীতে আমার এক পিসিমা থাকেন, সম্প্রতি তিনি এখানে বাবাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন, কালই চলে যাবেন। তুই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে দিন কতক সেখানে থাক্‌গে, পরে আমার চিঠি পেলে চলে আস্‌বি।'

মেঘনাদ মনে মনে খুব খুসী হইয়া বলিল; 'আচ্ছা।' এতবড় একটা সুযোগ যে, এমন করিয়া ঘটিয়া যাইবে ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

* * *

কাশীতে আসিয়া মেঘনাদের চিত্ত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। গৃহত্যাগের জন্য কোন গ্লানিই আর মনে রহিল না।

বনমালীর পিসিমার বয়স প্রায় ষাট্ হইয়াছে। তিনি গণেশ মহল্লায় ত্রিতল একটি বাড়ীর নীচের তলায় থাকেন। বাড়ীওয়ালার উপরের ঘর-গুলি সব তালা বন্ধ থাকে। কেহ সেখানে বাস করে না। পিসিমা প্রত্যূষে গঙ্গা-স্নান সারিয়া একেবারে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া আসেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিকালের দিকে ঠাকুর বাড়ী ঘুরিয়া কোথাও কীর্ত্তন কিম্বা কথকতা হইলে শুনিয়া রাত্রে ঘরে ফিরেন।

বৃদ্ধা বাড়ী পৌঁছিয়াই মেঘনাদকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—সে যেন কখনও উপরে না যায়।

মেঘনাদ মুখে কিছু না বলিলেও ভাবিল, এমন কি কারণ থাকিতে পারে?

তিন

সে দিন দুপুর বেলা পিসিমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মেঘনাদ পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল।

তাহার ঘরের জানালার সম্মুখেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। মেঘনাদের মনে হইল—যেন সিঁড়ির উপরে কেহ দাঁড়াইয়া আছে। সে ঘাড়টা একটু তুলিয়া চাহিতেই স্পষ্ট দেখিতে পাইল—লাল পাড় একখানা শাড়ী পরিয়া একটী সুন্দরী তরুণী তাহারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মেঘনাদের মনে হইল—সেকি স্বপ্ন দেখিতেছে? সে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—স্বপ্ন নহে, ইহা একেবারে বাস্তব। তরুণীর চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে। মেঘনাদ একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে দ্বার খোলার শব্দ শোনা গেল। তরুণী ইঙ্গিতে তাহাকে কি ইসারা করিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মেঘনাদ মনে মনে হাসিল। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না; এই জন্যই বুঝি পিসিমা তাহাকে উপরে উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন। এত বড় একটা আবিষ্কারে তাহার সারা অন্তর খুসীতে ভরিয়া গেল।

পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন! 'এই যে উঠেছিস্। ঘুমুচ্ছিস দেখে তোকে আর ডাকলুম না। বাইরে কুলুপ লাগিয়ে সন্তদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম; তোকে আটকে রেখেছি বলে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।'

মেঘনাদ হাসিল। মনে মনে বলিল—না এলেই কিন্তু ছিল ভাল।

*　　*　　*

সে'দিন সন্ধ্যার পর পিসিমা মেঘনাদকে বলিল: 'আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে নে বাবা! দুর্গাবাড়ীতে 'নিমাই সন্যাস' হবে শুনতে যাবো। তুই দরজা দিয়ে শুয়ে থাকিস্। সারা-রাত্রি গান হবে, আমি আজ আর ফিরব না।'

পিসিমা বাহির হইয়া যাইতেই মেঘনাদ সদর দরজায় খিল্ দিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় পড়িয়া একখানা অতি পুরাতন রামায়ণের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল।

তখন বোধ হয় তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। হঠাৎ জানালার কাছে খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীর শব্দ শোনা গেল।

মেঘনাদের ঘোর কাটিয়া গেল। তাহার প্রেচ্ছন্ন মন একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিল। সে লালসা ভরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার অনুমান মিথ্যা নহে; সত্যই সেই তরুণী।

আনন্দের আতিশয্যে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

তরুণীর চক্ষে প্রণয়-কটাক্ষ, অধর কোণে মন ভুলানো প্রাণ গলান মধুর হাসি! মেঘনাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে অপলক দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তরুণী মেঘনাদের দিকে তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া ধরিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিল।

মেঘনাদ একেবারে গলিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া তাহার অনুসরণে তাড়াতাড়ি ঘরের

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণী আড়চোখে কটাক্ষ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে লাগিল। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠিয়া তরুণী পিছন ফিরিয়া দেখিল—মেঘনাদ ঠিক আসিতেছে কি না।

তরুণী উপরে উঠিয়া সম্মুখের বড় ঘরখানিতে ঢুকিয়া পড়িল; কম্পিত পদে মেঘনাদও প্রবেশ করিল।

টেবিলের উপর একটা ছোট ল্যাম্প জ্বলিতে-ছিল; তাহার ক্ষীণ আলোক-ধারা সমস্ত ঘরটা-কেই অস্পষ্ট সবুজে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সর্ব্বত্র কেমন একটা থমথমে ভাব; কাহারও মুখে কোন কথা নাই, যেন দুইটি ছায়ামূর্ত্তি। তরুণী ইসারা করিয়া মেঘনাদকে চেয়ারে বসিতে বলিল। মেঘনাদ বসিলে, তরুণী চায়ের ডিসে করিয়া কয়েকটা পান আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মেঘনাদ একটা পান লইয়া মুখে দিল। কি চমৎকার, সে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'ভারি চমৎকার ত! পান যে এমন সুন্দর করে সাজা যায় আমি জানতুম না। সত্যি আপনাকে বড় ভাল লেগেছে আমার, ভারি সুন্দর আপনি!

তরুণীর চোখে লালসাভরা দৃষ্টি, মুখে চপল হাসি সে আরও অগ্রসর হইয়া টেবিলের কাছে মেঘনাদের গা' ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

চার

মেঘনাদ তাহার ব্যগ্র বাহু দিয়া তরুণীকে সহসা নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিল। তরুণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কি বিকট সে হাসি! মেঘনাদ শিহরিয়া উঠিল, তাহার বাহুডোর শিথিল হইয়া গেল।

ঘরের সবুজ আলোটা যেন ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

মেঘনাদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তরু-ণীকে কিন্তু দেখিতে পাইল না। তাহার অদর্শনে সে অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আলোটা একেবারে নিবিয়া গেল। চারি-দিকে ঘন অন্ধকার, নিজেকে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যায় না। মেঘনাদের বুকের ভিতরটা কি এক রকম করিতেছিল। তরুণী হাসিয়া বলিল, ভয় পেয়েছ ত? বেশ হয়েছে। তোমাদের পুরুষ জাতের আবার ভালবাসা? আমি অনেক ঠকে শিখেছি। আর নয়, ফিরে যাও!

ভরসা পাইয়া মেঘনাদ কাতর ভাবে কহিল, এ তোমার অন্যায় ধারণা মনি, দু'একজন দোষ করেছে বলে সবাই যে সেই দোষ করবে এর ত কোন মানে নেই, এস, কাছে এস, জীবনে আমি তোমায় ভুলতে পারব না।

অন্ধকার ধীরে ধীরে পাতলা হইয়া গেল। সামনের অস্পষ্ট আলো ভেদ করিয়া তরুণী একেবারে মেঘনাদের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, সত্যি!

তরুণীর হাত দু'টা 'খপ' করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মেঘনাদ বলিল, সত্যি, সত্যি, সত্যি, হ'ল ত? বাবা, এত পার যা হ'ক!

তরুণী হাসিয়া বলিল, না আর ভয় পাব না, কি জান, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই চমকে ওঠে ....কিন্তু.........

তরুণীর মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। মেঘনাদ অস্বস্তির সহিত বলিল, আবার কি হ'ল?—

কিছু না।

কিছু না ত মুখে হাসি নেই কেন? কি হয়েছে বল, চুপ করে থাকলে চলবে না।

তরুণী হাসিল। তারপর মস্তক নত করিয়া

কহিল, তুমি না হয় ভালবাস্‌লে! কিন্তু তোমার বাড়ীর লোক, পিসিমা......

হো-হো শব্দে মেঘনাদ হাসিয়া উঠিল, বলিল, সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। বাড়ী আমার নেই, থাকলেও আর সেখানে আমি জীবনে ফিরব না। পিসিমার কথা ভাবছ? তিনি বুড়া মানুষ, রাত দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়েন, তারপর......যাই বল বুড়ি আচ্ছা ঝানু বটে! আমায় কি বলত জান, ওদিকে যাসনি বাবা, বিপদ হবে। ও রে—বুড়ি, এমন বিপদ যেন জন্ম-জন্ম হয়!

তরুণী উল্লসিত হইয়া বলিল, সেই ভাল, বেশ হবে, রাত যখন বারটা হবে তখন তুমি রোজ এস, কেমন?

মেঘনাদ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা!

খানিকক্ষণ সব চুপ চাপ। সহসা মেঘনাদ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সারাদিন তোমায় বন্ধ করে রাখে কেন? লোকে তোমার কষ্ট বোঝে না?

বুঝলে আর তোমাকে এত করে ডাকৃছি! একদিন নয়, দু'দিন নয় এমনই করে পঞ্চাশ বছর —বলিতে বলিতে তরুণী থামিয়া গেল।

তাহার মুখ যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, ভয় নেই, চোখে চশমা নিয়েছি সত্যি, কিন্তু এখন এতটা দৃষ্টি খারাপ হয়নি যে তোমাকে বুড়ি ধরে নেব?

তরুণী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, তা ঠিক, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খাওয়া যাক কি বল? বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং চক্ষের নিমেষেই একখানা থালায় কতকগুলা মিষ্টান্ন অন্তপাত্রে আম ও গোলাপ-জাম লইয়া আসিয়া মেঘনাদের সামনে ধরিল।

মেঘনাদ বিস্ময়ভরে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, অসময়ে এসব কোথায় পেলে তুমি?

তরুণী হাসিয়া বলিল, তোমায় যখন পেয়েছি তখনই ত অসময় আমার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। আজ আমাদের সুসময়, বুঝেছ?

মেঘনাদ বলিল—তা বটে!

ভোর তখন হয় নাই, তবে আকাশের এখানে-ওখানে দু'একটা 'কাক' সবে কা—কা করিতে শুরু করিয়াছে।

তরুণী বলিল, ভোরের দেরী নেই এইবার তুমি নীচে গিয়ে শুয়ে পড়, কেমন?

মেঘনাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না?

মেঘনাদের গালে ছোট একটা চড় মারিয়া তরুণী বলিল, লোভী দুষ্টু কোথাকার! ক'ঘণ্টা আর সবুর সয় না! আচ্ছা, যাও যদি সময় করতে পারি, দিনের বেলাই দেখা করব'খন কিন্তু সাবধান!—একটী কথা কইলে আমি আর বাঁচব না। কি দশা হবে দেখবে—বলিয়া সে পিঠের কাপড়টা সরাইতেই মেঘনাদ শিহরিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিল, —এ কি—এ যে চাবুকের দাগ, ঘা হ'য়ে দগ দগ করছে। কে এমন করে মারলে তোমায়?—

তরুণী হাসিয়া কপালে হাত দিয়া দেখাইল—অদৃষ্ট!

মেঘনাদের চক্ষে জল আসিয়া পড়িয়াছিল—'খপ' করিয়া পুনরায় তরুণীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, বল্‌তেই হবে কে এমন দশা করলে তোমার?

তরুণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল!—মুখের কাছে মুখটী লইয়া গিয়া বলিল, কে আবার,—হিন্দুর মেয়েকে সাজা দেবার অধিকার যার আছে সেই, স্বামী। হ'ল ত?

ঘাড় নাড়িয়া মেঘনাদ বলিল, হ'ল না। কেন তাই বলতে হবে তোমায়।

বলব'খন আজ আর নয় কাল– এখন যাও, যাও বল্‌ছি, লক্ষীটী, এখনই পিসিমা এসে পড়বেন !

আচ্ছা সেই হবে, বলিয়া মেঘনাদ নীচে নামিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিতেই সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল : মেঘনাদ ও মেঘনাদ ?

চোখ দু'টিকে ভাল করিয়া কচলাইয়া রাঙা করিয়া মেঘনাদ নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

পিসি বলিলেন, কি রে ঘুমুস্‌নি না কি সারা রাত ? চেহারা দেখে যে কান্না পায় ?

মেঘনাদ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, নিমাইসন্ন্যাস দেখে সারা রাতই ত কেঁদে এসেছ, বাড়ীতে আরও একটু কাঁদলেই না হয়, ক্ষতি কি ? বাবা, ঘুমুতে কি পারি—বুড় মানুষ বাইরে রয়েছ। এই বুঝি ডেকে ফিরে গেলে। ওই বুঝি কড়া নড়ল বলে উঠি আর শুই। শেষ কালে ভাবলুম —যাক গে ছাই, জেগেই থাকি আজকের রাতটা !

পিসীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ধন্যি ছেলে বাবা। বল্‌লুম আমার সঙ্গে গেলেই ত পারতিস্‌ ! আজও হবে। চ'না বাবা, পেহ্লাদ চরিত।

মনে মনে পেহ্লাদ চরিত্তির না তোমার মাথা, বলিয়া মেঘনাদ নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মুখে বলিল, একটু ঘুমিয়ে নি, পরে যা হয় হবে। কেমন ?

সমস্ত দিনটা যে মেঘনাদের কেমন করিয়া কাটিল তাহা এক মেঘনাদই বলিতে পারে। পিসির হাতের রান্না কয়দিন তাহাকে যেমন প্রচুর আনন্দ দিয়াছিল, আজ তাহাকে দিল তেমনই বিতৃষ্ণা ! ভাত লইয়া নাড়া চাড়া করিতে দেখিয়া পিসিমা বলিলেন, কি হ'ল বল ত, শরীর ভাল নেই বুঝি ? ভাত যে আর উঠছেই। তুকো ভালবাসিস্‌—অত করে রাঁধলুম খানা একটু বাবা ?

মেঘনাদ বলিল, সত্যি আজ শরীরটা তত সুবিধার নয় পিসিমা ! এবেলা খেতে না বস্‌লেই ভাল করতুম।

তবে থাক বাবা অনিচ্ছেয় জোর করে খেয়ে কি অসুখে পড়্‌বি !

মেঘনাদ ত ইহাই চায়। কতকগুলা আবর্জনার—স্তূপে পেট ভরাইয়া মরা হইতে সেই অসম্ভাবিক আহার্য্য সম্ভার, বিশেষ করিয়া—তরুণীর উন্মুখ হৃদয়ের অননুকরণীয় সেবা-যত্ন কোন বুদ্ধিমানেই বা উপেক্ষা করিতে পারে !—সে উঠিয়া পড়িল। রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লান্তিতে পিসিমার চোখ দু'টি ঢুলিয়া পড়িতেছিল। যা হোক করিয়া দু'টী নাকে মুখে গুঁজিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। মেঘনাদের কিন্তু উত্তেজিত মস্তিষ্কে ঘুমের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। বিছানায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল—আবার কখন রাত বারটা হইবে। আবার কখন তরুণী আসিয়া তাহার পাশটীতে বসিবে। আবল-তাবল চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা খুট্‌ করিয়া শব্দ হইতেই সে চাহিয়া দেখিল—তাহার ধ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কি বলিতে যাইতেছিল।

তরুণী মুখে আঙুল দিয়া ইসারা করিল—চুপ !

মেঘনাদ সেই দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই চমক ভাঙিয়া গেল। কোথায় কে ! তাহার দুর্ব্বল মন এতক্ষণ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল মাত্র। চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া সে আবার চিন্তা করিতে লাগিল। এখন সবে মাত্র একটা —একটা দুইটা করিয়া বারটা গুনিতেই ক্লান্তিতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অতক্ষণ সময় সে কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে !

হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল, কোথায় যেন সে পড়িয়াছে না শুনিয়াছে—এক ঋষি-কুমার প্রয়োজন-মুহূর্ত্তে রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নকে অবলীলাক্রমে মধ্যরাত্রে পরিণত করিয়াছিল। আজ যদি তাহার সে ক্ষমতা থাকিত! সে রাত বারটাকেই বাঁধিয়া রাখিত তেইশ ঘণ্টাকে বাদ দিয়া।

কিন্তু তাহার বাঁধা বাঁধির প্রয়োজন হইল না। নির্দ্ধারিত সময়ে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—পিসীমা বলিলেন, মেঘনাদ, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে চল এখুনি যেতে হবে।

মেঘনাদ যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, বেরুতে হবে? কোথায়?

ও মা বলিস কি, পেহ্লাদ চরিত হচ্ছে, সকাল থেকে বল্‌ছি, শুনতেই পাস নি না কি? হ'ল কিরে তোর?

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া মেঘনাথ বলিল, শুনব না কেন, কিন্তু আমার ত যাওয়া হবে না পিসিমা, সকালে দেখেইছ ত খেতে পারিনি। বিকেল থেকে এমনই পেট মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছে কি বলব?

ও মা বলিস্ কি, তবে আমিই বা যাই কেমন করে বল, ও বই আর দেখা হ'ল না—বলিয়া পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মেঘনাদের রক্ত তখন হীম হইতে সুরু করিয়াছে। সে বাধা দিয়া বলিল, বল কি পিসিমা, অমন ধর্ম্ম কর্ম্মে হব আমি বাধা! না, প্রাণ থাকতে পারব না। চল, মরে মরেই আমি যাই। ভাবলুম পড়ে ঘুমুলে অনেকটা সাম্‌লে নেব তা' থাক গে—

পিসীমা বলিলেন, সে কি, কষ্ট করে যাবি কেন?

যাব না নইলে অমন পেহ্লাদ চরিত্তির তুমি দেখ্‌বে না—আমার ঘাড়ে ভগবান দোষ টুকে রাখুন আর কি।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, বাবুর ধর্ম্মের ভয়ও আছে দেখছি। বেশ বাবু, আমিই চল্লুম, তোকে আর যেতে হবে না। কিন্তু সাবধানে থাকিস্। আর ভোর না হ'লে ত আসছি না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুস। কেমন? না হয় চাবিই দিয়ে যাই সদর দরজার, কি বল?

সুবোধ বালকটীর মত মেঘনাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাই যাও, আমি তবু নিশ্চিন্তে ঘুমুই। বলিয়া শুইয়া পড়িয়া সত্য সত্যই সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে ঘুম বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিসি রাস্তা পার হইতে না হইতেই সে উঠিয়া গিয়া সদর দরজায় ভিতর হইতে খিল আঁটিয়া দিল। তারপর তড়্‌তড়্ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ডাকিল: শুন্‌ছ?—

খটাং করিয়া খিল্ খুলিয়া গেল। মেঘনাদ চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, কেমন যেন তাহার গাটা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। সে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল—পিছন হইতে কে তাহার হাত ধরিয়া টানিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে?

ভূত, আবার কে! বলিয়া তরুণী হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মেঘনাদের বুকের ভিতরটা তখনও দপদপ করিতেছিল। তরুণী হাসিয়া বলিল, বাবা, এই তোমার ভালবাসা! ভূত বলেছি তাতেই এত, ভূত হ'লে ত দেখছি সাম্‌নের ধার দিয়েও যাবে না।

ভালবাসার কথায় মেঘনাদের মনে যেন সাহস ফিরিয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল, সত্যি ভয় হয়েছিল, একটা আলোও জেলে রাখ নি কেন?

আমি রয়েছি তবু ভয়, বেশ আলোই চাও, আলো জ্বালি বলিয়া সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াই আলো জ্বালিয়া দিল। মেঘনাদ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—গতকল্য হইতে আজ তরুণী যেন আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। একখানি সবুজ

রঙের রেড়িও সাড়ী পরিয়াছে। গহনার বাহুল্য নাই, তবু যে ক'খানি তাহার অঙ্গে বিরাজ করিতেছে, তাহা যেন নিতান্ত প্রয়োজনেই।

তাহাকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে দেখিয়া তরুণী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কি দেখছ ভূত কি না। না বাবু, এত খোসামোদ পারি না। বিশ্বাস না হয়, যাও, তখনই ত বলেছিলুম, তোমাদের আবার ভালবাসা!

আগাইয়া গিয়া মেঘনাদ তরুণীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, শুধু দোষই ধর্‌ত শিখেছ। ভূত দেখছিলুম না, দেখছিলুম ও চোখ দুটো কেটে নিতে পারি কি না। মনে হচ্ছিল কি জান মণি—সমুদ্রের কূল ছাড়ান প্রশান্ত মুর্ত্তি দেখে যারা স্তব্ধ-বিস্ময়ে ভগবানের ধ্যান করেছে, তাদের জোর করে ধরে এনে দেখিয়ে দি' অসীমের রূপের কল্পনার চেয়ে সীমার মধ্যে ঘেরা ও চোখ দু'টীতে যে অনন্ত প্রসারি সমুদ্রের আভাষ পাচ্ছি তা কত বড়, কত মহৎ।

তরুণী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ব্যাজস্তুতি করতে পুরুষের মত আর কেউ পারে না। এ আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি, অমনই করে আর একজন বল ত বটে!

বাধা দিয়া মেঘনাদ বলিল, একজন নয় মণি, পৃথিবীর সমস্ত মহাজনকে তোমার দ্বারে এসে মাথা নত করে যেতে হবে।

তরুণীর দু'টী ঠোঁটে হাসি ফুটিতে গিয়া ম্লান হইয়া গেল।

মেঘনাদের দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না। সে বলিল, তুমি হাসলে যে!—ও, আমি বুঝেছি। কিন্তু কেন এমন হ'ল বলত? আজ তুমি বল্‌বে বলেছ, বল মণি, তোমার স্বামী রোজ রাত্রে কোথায় থাকেন—কেনই বা তোমার এত দুঃখ! এত শাস্তি!—

তরুণীর মুখের মধ্যে যেন একটা কিসের আভাষ দেখা যাইতেছিল। সে হাসিয়া বলিল, সব কেনরই উত্তর ওই দু'টো চোখ, কিন্তু গল্প হবে'খন পরে, রাত ত পড়েই রইল। সারাদিন কিছু খাওনি এখন খেতে দি' আগে।

মেঘনাদ বিস্ময় ভরে বলিল, সারাদিন কিছু খাইনি এ কথা তোমার কে বললে?

তোমার মুখ। বাবা, উকিল বাড়ীর জেরারও বাড়া করে তুল্‌লে দেখছি। কথা দিয়ে ছিলুম, দেখা করব, ভাবলুম যাই দেখে আসি। ওমা, জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি বাবু ভাত নিয়ে নাড়া চাড়া করতেই ব্যস্ত, ঠায় আধঘণ্টা যে দাঁড়িয়ে রইলুম তা একবার টেরও পেলেন না।

মেঘনাদের বুকটা যেন হাল্কা হইয়া গেল। বলিল, সত্যি তোমার হাতের খাওয়ার পর ও সব আর মুখেই লাগে না! কে জানে এ সুখ আমার কতদিন থাকবে? কিন্তু খাওয়া থাক, বল, তোমার কথা না শুনে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। বল শুনি, কোথায় তোমার স্বামী!

তরুণী হাসিয়া বলিল, এই যে সাম্‌নে বসে। হ'ল ত, বলিয়া ফাগ-মাখা মুখে মেঘনাদের বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

মেঘনাদের অন্তরে যেন কিসের ঝড় বহিতে সরু করিয়াছে। কথা কহিতে না পারিয়া তাহার মাথার কোকড়ান চুলগুলার মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল।

তরুণী কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, গল্পটা শুনবেই, না? তবে শোন:—বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম ছোট বনের বিয়েয়। ফিরে এসে দেখলুম—স্বামীর যা' পরিবর্ত্তন হয়েছে তা' গল্প-উপন্যাসের মতই অদ্ভুত, অলৌকিক! যার জীবনের কাম্য ছিল ডন-বৈঠক, পালওয়ানী গুঁতা-গুতি, তার মধ্যে এসেছে কবিতার ছন্দ। তিনি

আপতে কথা বলেন, মিষ্টি করে হাসেন—আমার মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখেন।

বললুম—কি হ'ল গো তোমার?

তিনি হেসে বললেন, তোমাকে বলা হয় নি আরতি, গুরুদেবের কৃপায় আমার জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু হয়েছে।

গুরুদেব!

হাঁ, তিনি এখনই আসবেন, তাঁকে প্রণাম ক'র, সাবধানে কথাবার্ত্তা বলো, দেখো, যেন তার সম্ভ্রমের হানি না হয়।

মাথা নেড়ে বললুম, না বাপু, তোমার গুরুদেবকে নিয়ে তুমিই থাক! বেরুতে-টেরুতে পারব না। শেষে কোন সময় অপমান করে বসব!

তিনি সাগ্রহে বললেন, না না, ওকথা বলতে নেই তি, আজ যে তোমার সঙ্গেই তার পরিচয় করিয়ে দেব বলে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। বুঝেছি কেন তুমি ভয় পাচ্ছ। এবার নিশ্চিন্ত থেকো, কোন কথা উঠবে না।

তথাস্তু!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গুরুদেব এসে হাজির। প্রথম দৃষ্টিতে লোকটীকে দেখলে কুৎসিত বলেই মনে হয়। কিন্তু ক্রমে সে ভাবটা কমে আসে। কথাবার্ত্তার মধ্যে কিন্তু একটা আকর্ষণী আছে। যা' একেবারে উপেক্ষনীয় নয়।

তিনি বললেন, আজ আমার পক্ষে গৌরবের দিন কেন না তোমার মত শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ ঘটল। কথা কও!

কথা! কি কথা বলব? মানুষের দুর্ব্বলতার সন্ধান লোকটী এমনই আয়ত্ত করে নিয়েছে যে শত্রুকেও বশ করে নিতে পারে দেখছি। আত্মপ্রশংসা কে না চায়—আকণ্ঠ নিজের সুখ্যাতির হলাহল পান করে বিভোর হয়ে উঠলুম। তিনি চলে গেলে ওর সঙ্গে তাঁরই কথা দিনে রাত কাটিয়ে দিলুম—শুধু সেদিন নয়, অনেক দিন!

তিনি হেসে বললেন, কেমন? বলি নি ঠিক?

হাঁ, ওঁকে হাত তুলে প্রণাম করলে তৃপ্তি পাই না, মনে হয় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দি' কি বল?

আমারও!

তরুণী মেঘনাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেমন লাগছে?

মন্দ কি?—জমে উঠেছে এরি মধ্যে। শুধু মনে একটা প্রশ্ন জাগছে—গেরুয়াটা কটন সিল্কের না আদ্দি·····

হো-হো শব্দে তরুণী হাসিয়া উঠিল, ও তোমায় বলি নি বুঝি? গুরুজী আধুনিক, ও সব গেরুয়া-টেরুয়ার ধার ধারেন না—এমনই মিলের ধুতি আর ডোরা কাটা পাঞ্জাবী, না না, সেটা পরেই পরতেন, আগে লঙক্লথের পাঞ্জাবী পরেই আসতেন!

বেশ, গল্পের ক্রমবিকাশ আছে, চলতে থাকুক—

হাঁ, এমনই করে ক'টা মাস মন্দ কাটছিল না। এরই মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি—তবে ক'দিন যে পায়ের ধূলা নেওয়ার ধুম পড়ে গিয়াছিল, তা আপনিই শেষ হয়ে গেছে।

গুরুজীর মাঝে মাঝে আসাটা দৈনিকে পরিণত হয়েছে। উনি বললেন, তোমার বাহাদুরী আছে তি, নইলে অমন লোককেও বেঁধে রাখা যায়! এই জন্যেই ত তোমায় ভালবাসি!

আমারও নিঃসংশয়ে তাই মত! তারপর?

পোড়া চোখ দু'টার ওপর কিন্তু গুরুজীর দুর্জ্জয় লোভ, হাঁ লোভ বই কি নইলে মানুষ অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারে!

উনি লক্ষ্য করে হাসেন, মাঝে মাঝে বলেন, গুরুজী ঠিকই বলেন তি' তোমার চোখ দু'টির

মধ্যে সমুদ্রের আভাস খেলা করে। এতদিন আমার চোখে এই মহামূল্য জিনিষটা কেমন করে এড়িয়ে গিয়েছিল তাই ভাবি।

আত্ম-প্রশংসায় মন ভারি হয়ে ওঠে, হাসিতে বুক ভরে যায় বলি, তবু ভাল, গুরুজীর দয়ায় তোমার দৃষ্টিলাভ হ'ল।

লক্ষ্য করে দেখলুম, গুরুজীর আসা-যাওয়ার মধ্যেও বৈচিত্র্যে এসে জুটেছে। তিনি যেন তাঁর প্রিয় শিষ্যটিকে উপেক্ষা করে শিষ্যাণীর সেবাতেই পরিতুষ্ট। এবং কাজের গতিকে শিষ্যবাড়ী না থাকার সময়টাই প্রায় তিনি আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ন।

সে দিনের কথা মনে আছে। বেশ এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশটা যেন নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছে। ঘরে বসে একখানা বই পড়ছি। হঠাৎ গুরুজীর শুভাগমন হ'ল।

বাড়ীতে কেউ নেই, যাব কি যাবনা ভাবছি দেখি জুতার শব্দ ক্রমশঃ আমারই ঘরের দিকে এগিয়ে আস্ছে। কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে টপ করে বইখানা মুড়ে ঘুমানর ভাণ করে পড়ে রইলুম। গুরুজী বললেন—সত্যজিত বাড়ী নেই তবে এখন আসি!

তিনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন কি না দেখবার ধৈর্য্য হ'ল না, তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে বললুম, কে? ও আপনি! আসুন!

না না, সত্যজিত নেই।

তাতে কি, তাঁকে আপনি হয় ত এখন ততটা চেনেন নি, আমি ত জানি—বসুন!

তখন কে জানত, আমার এই গর্ব্বিত উক্তিই একদিন আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত করবে!

গুরুজীর আজ যেন কি হয়েছে! তিনি তার বিগত-জীবনের যত কিছু পঙ্কিল-ঘটনা আমার কাছে ব্যক্ত করে চলেছেন। কখন অনুতাপে তার মুখ কালো হয়ে উঠছে, কখন সহানুভূতির আশায় তিনি উন্মুখ হয়ে পড়ছেন।

বললুম, পুরাতনের কোটায় আপনি গিয়ে যা' পৌঁছেছে, তাকে নূতন করে স্মরণ করে এনে কি ফল গুরুদেব!

গুরুদেব চমক-ভাঙা হয়ে বললেন, তা তুমি ঠিকই বলেছ তি, ও দিনগুলো আমায় ভুলতেই হবে। কিন্তু যখনই তোমাদের শ্রদ্ধা পাই তখনই মনে হয় এ চুরী আমার একান্ত অন্যায়।

রাত্রে ওর কাছে সব কথা বলতে সুরু করলুম। সহানুভূতির বেদনায় চোখে পর্য্যন্ত জল এসে গিয়াছিল। উনি হেসে বললেন, ও সব মিথ্যে কথায় তুমি কাণ দিও না তি, উনি তোমার মন পরীক্ষা করতে চেয়েছেন।

মনে মনে বললুম, ওগো, তাই যেন হয়।

চমৎকার, একস্যান শুরু হয়েছে। তারপর?

সন্ধ্যার বৈঠকটা শেষে রাত বারটার কাঁটায় গিয়ে দাঁড়াল। উনি হঠাৎ একদিন বললেন, এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, গুরুদেবের কাজ ক্ষতি করিয়ে এখানে টেনে রাখা স্বার্থপরতারই লক্ষণ। কি বল তি।

বললুম, না না, উনি কাজ ক্ষতি করে আসবেন কেন? তাছাড়া ওকথা কি আমাদের বলা চলে!

তা বটে!

দিন দুই পরে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, ভক্তের আনুকূল্যে ঘর ভরে উঠেছে। ওর পিসতুতো বোনের মাসতুতো ভাইয়ের শালার ছেলে নিবারণ এসে গুরুজীর পাশটাকে এমন করে আঁকড়ে ধরলে যে বাধ্য হয়ে আমাকেই দূর সরে যেতে হ'ল। সে আতিশয্য কিন্তু স্থায়ী হ'ল না, দেখলুম, গুরুজীর আসার আগে আসার সময় এবং আসার পরেও দুইভাইয়ে জগতের কোন দুরূহ সাধন-ভজনের

উদ্দেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ছেন। বললুম—এ কি করছ তুমি?

কোথায়!

মাথাটা দেখিয়ে দিয়ে বললুম, এইখানে! যদি বাড়ী থাকবে না ওঁকে বলে দিলেই পার। মিছি মিছি—

তা কি হয়, ওঁকি কি মনে করবেন! তা ছাড়া—

যাক বলতে হবে না আর, বলে সামনে থেকে সরে গেলুম। সেদিন সন্ধ্যার পর উনি নিবারণের হাত ধরে হাসতে হাসতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলুম। মনে মনে ঠিক করলুম, আজ আর কোন মতেই সাড়া দেব না। ডেকে ডেকে ঘর অন্ধকার দেখে উনি ফিরে যান।—এত বড় অপমান যাঁর বোঝবার শক্তি নেই, তার...

অন্ধকার কিন্তু তাঁকে দমাতে পারল না। নির্দ্ধারিত সময়ে জুতার শব্দে পূর্ব্বদিনেরই মত ঠক ঠক্ করে এগিয়ে আসতে লাগল আমার ঘরের দিকে। কেমন বুঝছ?

মারভ্যালাস! একেবারে ক্লাইমেক্সে গিয়ে উঠেছে। জুতোর শব্দ এরই মধ্যে থামলে চলবে না। চলুক যতক্ষণ পারে।

মনে করেছিলুম যা সহজ, কার্য্যক্ষেত্র দেখলুম, তা ত নয়, ঘরে শুয়ে থাকার হীনতা বুকের মধ্যে খঁচ্ খঁচ করে বিঁধতে লাগল। তা হ'লে ওঁতে আর আমাতে তফাৎ রইল কোথায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললুম—শুনুন!

বারান্দার একটা ধারে নিয়ে গিয়ে বললুম, এ বাড়ীতে আসার দিন যে আপনার কবে শেষ হয়ে গেছে, তাকি এখন বোঝেন নি আপনি! কেন আসেন অপমান নিতে!

অপমান!

হাঁ হাঁ, জীবনে আর এখানে কখন কোন দিন আসবেন না। তার মুখের মূর্ত্তি দেখবার শক্তি ছিল না বলেই আলোটা জ্বালাই নি—নিজের টা দেখানিও বুঝি তখন সহজ ছিল না।

অশ্রুমুখী হয়ে উঠেছে! বুঝেছি, বলে যাও।

পিছন ফিরে দেখি চোর যেমন সন্তর্পণে গৃহীর বাড়ী ঢোকে চুরী করতে, তেমনই করে উনি ফিরে এসেছেন। বললেন, আলোটা জ্বালতে পার নি, কোন ক্ষতি ছিল না কি! কয়েক মিনিট আগে অন্ধকারে আলোর অভাবে তোমার মুখের বিভৎস-মূর্ত্তি দেখে সেদিনের কথা আজ দপ করে মনে পড়ে গেল। তবে তফাৎ এই, সেদিন ভয় ছিল দিন মানুষের, আজ ভূতের!

তরুণী নীরব হইল।

মেঘনাদ বলিল, তারপর?

তরুণী হাসিয়া বলিল, এখনও তারপর আছে না কি?

নিবারণ বললে, ওটা আবার মানুষ, ওর মনুষত্ব আছে!

উনি মাথা নীচু করে যেন শুনতেই পেলেন না।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখলুম—ঘরময় কৌতুকের চাপা হাসি খেলা করে বেড়াচ্ছে। নিবারণ বললে, বাবা এ বড় শক্ত ঠাঁই, সত্যজিত সরল বিশ্বাসী এককথায় একটু বোকা তাই বাছাধন এতটা বাড়ীয়ে তুলেছিল। আমাকে দেখেই গুটি গুটি সরে পড়েছে। মেয়েদের কাছে আবার নিজের পাপ জানিয়ে বাবু 'ফ্রেন্ড' করতে সুরু করেছিল। একটী টোপ ফেলতেই বুঝে নিয়েছি বাছাধনের আশা কতখানি!

বাহিরে পূর্ব্বদিনেরই মত ক-কা করিয়া কাকা ডাকিয়া উঠিল। তরুণী বলিল, হ'ল ত এইবার আসি!

মেঘনাদ চঞ্চল হইয়া, কহিল, না না, তারপর, তারপর কি হ'ল বল্?

তারপরই ত গল্প, আবার কাল দেখা হবে ব্যস্ত হও না বলিয়া তরুণী কোথায় মিলাইয়া গেল।

যেও না,যেও না, শোন শোন বলিয়া তরুণীকে ধরিতে গিয়া মেঘনাদ দেওয়ালে আঘাত পাইয়া সেইখানেই হতচেতন হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

*   *   *

ভোরবেলা পিসীমা আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া যখন কোন মতেই দরজা খুলাইতে পারিলেন না, তখন ভয়ে বিদ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তখনই লোক ডাকাইয়া দরজা ভাঙাইয়া ফেলিলেন, ঘরে গিয়া দেখিলেন—কোথায় মেঘনাদ! সর্বনাশ হতভাগা ভূতের হাতে পড়েছে দেখছি! ওমা তাই পিসীর ওপর দয়া এত কলির অবতার!—তাড়াতাড়ি লোকজন লইয়া তিনি যখন উপরে উঠিলেন—মেঘনাদ তখন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে!—যেও না, যেও না শোন, ওই শোন বাজছে এক, দুই, তিন, চার...বারটা এস, কাছে এস!

ওরে সর্ব্বনেশে বলছিস্—

মেঘনাদ মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, দূর দূর তোরই ভয়ে ত ধরতে ব'ল—যা, সরে যা, নইলে ভাল হবে না। দরদ কত ও দিকে পাস্‌নি কেন, এত সোহাগ কেন তোর!

তখনই ওঝা ডাকান হইল। মেঘনাদের দেশেও টেলিগ্রাফ গেল, অবিলম্বে তাহাদের আসিবার জন্ম।

ওঝা দেখিয়াই বলিল, বড় শক্ত মেয়েমানুষ বাবু—বেচে থেকে সাতকুল জালিয়ে খেয়েছে, মরেও নিস্তার নেই।

তবে রে, মুখ পোড়া, কাকে কবে জালিয়ে খেয়েছি বলত শুনি। তেমন মেয়ে পাস্‌নি আমায়। আমার স্বামীকে আমি দেখ না ত কি ধরব তোকে। আক্কেল খেকো বুড় জমের অরুচি! বেঁচে থাক্‌তে কোথা থেকে এলো হতভাগা অনামুখো গুরুদেব। আমাকে মেরে ছাড়লে। এখন এসেছিস তুই। বেশ, দেখি কি করতে পারিস্! যদি কায় মনে সতী হই তোর সাদ্ধিও নেই যে আমার একচুল ছুঁস্—

ওঝা হাসিয়া বলিল, বেশ ত দেখনা কি হয়! মন্ত্র পড়িয়া সে সরিষা পড়া বার বার মেঘনাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

ওঝা মাথা চুলকাইয়া বলিল, তাই ত?

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, তাই ত কেন! চলুক।

পিসীমা পাশেই গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, বলিলেন, ওতে কিছু হবে না ওঝা, বেটী জাগ্রত সতী, হিন্দুর মেয়ে সতীত্বের নাম নিয়ে শফৎ করেছে, সর, আমিই দেখি যদি বুঝিয়ে কিছু করতে পারি!—হাঁ মা, তুমি না হিন্দুর মেয়ে?

হাঁ, তা কি হবে!

হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে কেউ স্বামীকে কষ্ট দেয়? ছি ছি!

বুঝেছি, তুমি আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ—কিন্তু তা হবে না। ওই বুঝি আমার কম কষ্ট দিয়েছে! অপঘাত মৃত্যুতে যে অবস্থাতে আমি আছি,—যে কষ্ট আমি পাচ্ছি, তা যদি জানতে ওকথা মুখেও আনতে না।

পিসীমা বলিলেন, ছি, মা, ও কথা মুখে এন না। হিন্দুর ঘরে স্বামী কাকে না কষ্ট দেয় তা ছাড়া কর্ম্মফল অনুযায়ী-ত মানুষকে ভোগ করতে

হবে। গীতার কথা মনে কর, নিমিত্ত মাত্রকে দোষ দিলে চলবে কেন? তুমি যেমন সতীত্বের গর্ব্ব করে বলেছ আমিও তেমনি বলি যদি তুমি যথার্থ সতী হও, তবে এখনই তোমার স্বামীকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে—আর কখন আস্‌বে না।

মেঘনাদ শিহরিয়া উঠিল—ও কথা বল না, তোমায় পায়ে পড়ি, আমি ওঁকে ছেড়ে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে সুধু পথে-পথে কেঁদে ফিরছি। যদি পেলুম অমন করে আমায় তাড়িও না।

পিসীমা বলিলেন, আনন্দ ভোগে নেই মা, আনন্দ ত্যাগে! তোমায় কথা রাখ্‌তেই হবে।—যাও মা, যাও—নইলে সতী নামের—

যাই—যাই—যদি পার গয়ার পিণ্ডি—

মেঘনাদ ফ্যাল ফ্যাল চোখ মিলিয়া চাহিল। ওঝা বলিল, তোমার বাহাদুরী আছে পিসীমা! এ ওর পুনর্জন্ম!—

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, হিন্দুর মেয়ের জোরে এমনই করেই স্বামীরা চিরদিন পুনর্জন্ম পাচ্ছে বাবা!

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ছয়

বাবা কলকাতায় চ'লে যাবার পরের বৃহস্পতিবার দিন সহসা রমাপিসির কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণ এসে হাজির—এখুনি আসতে হবে! বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি এসেছেন ; তার মধ্যে একজন আছেন যাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্ নাকি কোটী টাকার ওপর! এবং তাঁর জন্তেই বিশেষ ক'রে আমাকে আবাহন করা হয়েছে!

পত্রে রমাপিসি লিখেছেন :

"জনকয়েক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে চা-খাবার নিমন্ত্রণ করেছি! তাদের মধ্য নতুন একটি ভদ্রলোক আছেন। তোমাদের পিসা-মশায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, সেই সূত্রে তিনি আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক—এ আমার একান্ত ইচ্ছা ! তোমার কোন ওজর-আপত্তি শুনবো না। পত্র পাঠ কাপড় বদ্‌লিয়ে চ'লে এসো। গাড়ী পাঠিয়ে দিলাম!"

উপায় নেই। যেতেই হবে। না গেলে রমাপিসি আস্ত রাখবেন না। একটু আধটু বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে, তৈরী হয়ে নিলাম। রমাপিসির চিঠি প'ড়ে মনে মনে ভারী হাসি পাচ্ছিল। তাঁর ঘটকালীর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত! সেই কথা স্মরণ করেই হাসি পাচ্ছিল! একবার যখন লক্ষ্য স্থাপন করেছেন তখন তিনি যে সহজে নিরস্ত হবেন—এ আশা ছিল না! কত বিবাহযোগ্যা মেয়ের মাকে যে তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন তা হিসেব করে শেষ করা যায় না। আমার মা নেই। আমার ক্ষেত্রে পিসি শুধু নিজের অঘটন-ঘটন পটীয়সী ক্ষমতাকে আর একবার প্রতিভাত ক'রে অন্ত বর্ষিয়সী মহিলাদের অভিভূত ক'রে দেবেন—এই আনন্দেই বোধ করি তিনি আমাকে নির্ব্বাচন করেছেন! কিন্তু আরও তো কতজন রয়েছে; প্রতিভা রয়েছে; মৈত্রেয়ী রয়েছে; অপর্ণা রয়েছে; তাদের সবাইকে ছেড়ে আমাকে কেন? মনে মনে বিরক্তও হয়ে উঠ্‌লাম কম না!

তাঁর বাড়ীতে পৌছতেই রমাপিসি স-কলরবে এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন :

—এসো, এসো! কতক্ষণ ধ'রে তোমার জন্তে যে অপেক্ষা করছি তার ঠিক নেই!

এই বলে পরম সমাদরে আমার হাত ধ'রে আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন!

অভ্যর্থনার ঘটা দেখে অবাক হোয়ে গেলাম! আরও কতবারই না তাঁর বাড়ীতে এমনি-তর চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছি, কিন্তু কখনই তো এমন ক'রে আমার সমাদর করেন নি; বরং আমাকে বাড়ীর মেয়ের মতো এটা-ওটা-সেটা আনতে বা কোন কাজ করতে হুকুম করেছেন। কিন্তু আজ এ কি! আজ যেন আমি দূর কুটুম্বের মতো এসেছি!

রমাপিসির আচরণে যারপর নাই লজ্জিত হয়ে পড়লাম!

সহসা চকিত হয়ে দেখি, রমাপিসি কার সঙ্গে যেন আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন :

—বিজয় বাবু; এই হচ্ছে কেতকী—যার কথা আপনাকে তখন বলছিলাম। কেতকী ইনি হলেন বিজয় বাবু! শ্রীযুক্ত বিজয় লাল দত্ত! আমাদের নতুন এবং বিশেষ সম্মানার্হ অতিথি! তুমি দেখো, যেন এঁর অতিথি সৎকারে কোন ত্রুটি না হয়, আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিতে বলি গে!

এই ব'লে রমাপিসি ক্ষিপ্রপদে বোধ করি জলখাবার পাঠিয়ে দেবার জন্যেই প্রস্থান করলেন! এ-রকম অবস্থার পক্ষে একেবারে যে অনভ্যস্ত তা নই! কিন্তু আজ যেন অতিশয় অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম! বাক্‌পটু ব'লে আমার নাম ছিল; (সুনাম এবং দুর্ণাম দুই-ই) কিন্তু এখন একটি কথাও মুখ দিয়ে যেন বার হ'তে চাইছে না! ধীরে ধীরে লোকটির সুমুখে একটু দূরে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। নমস্কারের পর্ব্বটা রমাপিসির উপস্থিতিতেই সাধিত হয়েছিল!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমিই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—পিসিমা বলছিলেন —বিদেশে জগৎপতি বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়। আপনি বুঝি সম্প্রতি বাঙ্‌লা দেশে এসেছেন?

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে স্মিতমুখে উত্তর দিলেন —হ্যাঁ। তিন দিন হ'ল এসেছি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বল্‌লেন— কলকাতায় পৌঁছে হঠাৎ জগত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তার পর তাঁরই অনুরোধে এখানে এলাম।

—তিনি বুঝি আপনার অনেক দিনের বন্ধু?

—না। অনেক দিনের নয়। তা ছাড়া, বন্ধু ঠিক নন। ওঁর চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোট! জগৎবাবুর সঙ্গে আমার বোম্বাই-এ আলাপ হয়েছিল!

প্রশ্ন করলাম—কোথায় আলাপ হয়েছিল বল্লেন?

—বোম্বাই সহরে! বম্বের নাম শোনেন নি?

মুখ তুলে তাঁর পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। দেখলাম, তিনিও নির্নিমেষ-নয়নে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন। সহসা আমার অন্তর দ্রুততর তালে স্পন্দিত হোতে লাগ্‌ল। মনের মধ্যে কি এক অস্পষ্ট অনুভূতির ছায়া!

আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বিজয়বাবু বলতে লাগলেন—অনেক দিন ধ'রে সেখানে ছিলাম। বিদেশের প্রতি বিরক্ত ধ'রে গেছে। নিজের দেশে ফিরে কত যে আনন্দ এবং তৃপ্তি বোধ করছি তা আপনাকে ব'লে শেষ করতে পারব না, মিস মিত্র।

বললাম—আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে তো?

—আবার! আর যাচ্ছি নে। সেখান-কার পালা শেষ ক'রে দিয়ে এসেছি! সেখানে গিয়েছিলাম—টাকা রোজগার করতে! ভগবানের কৃপায় টাকা কিছু পেয়েছি! এখন নিজের দেশে বাস কোরে তাকে ভোগ করতে চাই— বাউণ্ডুলের মতো বিদেশের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এখন নিজের দেশে একখানি নির্জ্জন বাড়ীতে আমি সংসার রচনা করতে চাই!

তার উজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি আমার মুখের পানে সঞ্চারিত! মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়-লাম! বোধ হ'ল যেন, অন্তরের লজ্জা আমার মুখের ওপর ফুটে উঠ্‌ল! রমাপিসির ওপর ভীষণ রাগ হ'ল। হয়ত তিনি এই অভব্য লোকটার কাছে আমার সম্বন্ধে যা-তা বলেছেন এবং লোক-টাও সেই সব শুনে আনন্দে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েছে!

বিজয়বাবুর আবেগময় উচ্ছ্বাসের উত্তরে

বললাম—আপনার মনের ইচ্ছাটি সে বিশেষ সদিচ্ছা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! প্রার্থনা করি, আপনার বাসনা পূর্ণ হোক!

তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন—ধন্যবাদ! অনেক সময়ে মানুষের শুভ কামনার মূল্য অনেক! আমার প্রতি আপনার শুভেচ্ছার জন্যে আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

নীরস কণ্ঠে বল্লাম—কিন্তু মুখে শুভেচ্ছা জানাতে তো পয়সা খরচ হয় না। তাই মনে হয়, আমার কথার বিশেষ মূল্য নেই! আচ্ছা, আপনি কি অনেকদিন বিদেশে ছিলেন?

একটু ইতঃস্তত ক'রে তিনি বল্লেন—হ্যাঁ। অনেক দিন!

বল্লাম—বড় আশ্চর্য্য লাগছে এই ভেবে যে এতদিন বাদে নিজের দেশে ফিরে কোন আত্মীয় বা কুটুম্বের সঙ্গে আপনার দেখা হোল না! একজন অল্প পরিচিত বন্ধুর বাড়ী এসে আপনাকে উঠ্‌তে হ'ল! আপনার কি কোন পুরাণো বন্ধু বা আত্মীয় নেই?

বিচিত্র মৃদু হাসিতে বিজয়বাবুর মুখ রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

শান্ত কণ্ঠে বল্লেন—হ্যাঁ আছে! আমার কয়েকজন পুরণো বন্ধু আছেন। আমি জানি না আমার আগমনে তাঁরা খুসী হয়েছেন কি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এখনো জানি না বটে, কিন্তু তাঁদের মনোভাব আমি শীঘ্রই জান্‌তে পারবো! তাঁরা নিকটেই আছেন।

প্রশ্ন করলাম—আপনি ফিরে এসেছেন, তা কি তারা জানেন?

—কি জানি। বলতে পারিনে! তবে একজন জানেন না, তা জানি। যাঁর সঙ্গে আমার বন্ধন সব চেয়ে বেশী, তিনি জানেন না যে, আমি এখানে এসেছি!

বল্লাম—তাহ'লে হঠাৎ দেখা দিয়ে ভদ্রলোককে আশ্চর্য্য ক'রে দেবেন, বলুন?

বিজয়বাবু আমার উক্তির ভ্রমসংশোধন ক'রে বল্লেন—ভদ্রলোক না, ভদ্র মহিলা! হ্যাঁ; তিনি হঠাৎ আমায় দেখে অবাক হয়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ নেই!

নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি নীরন্ধ্র স্তব্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হ'ল! মনে আর সংশয় নেই। আমি নিশ্চয় কোরে বুঝতে পেরেছি—আমার সুমুখে যে লোকটি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে, তারই কাছ থেকে পত্র পেয়ে বাবা কলকাতা রওনা হ'য়েছেন! হয়ত বিজয়বাবুর সঙ্গে বাবার দেখা হয় নি! হয়নি, তাই বা কে বল্লে?

ক্ষণেক পরে আবার কথাবার্ত্তা সুরু হল!

বিজয় বাবু বল্লেন—বন্ধুরা ছাড়া আমার একটী ভগ্নী আছে! সে শিলং-এর এক মেয়ে-স্কুলের হেড্‌-মিস্‌ট্রেস্‌! এখনো বিবাহ করে নি! তাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি! সংসারে সেই আমার একমাত্র আত্মীয়। কলকাতায় আমার কাছে আসবার জন্যে তাকে চিঠি লিখে দিয়েছি!

আমি তাঁকে অন্য প্রশ্ন করলাম। বল্লাম—আচ্ছা, যে সব বন্ধুদের কথা আপনি বল্লেন তাঁদের মধ্যে কারুকে আমি কি চিনি?

সহসা আমার এই বিচিত্র প্রশ্ন শুনে বিজয় বাবু বিস্মিত এবং স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে গম্ভীর-নম্র কণ্ঠে বল্লেন—বোধ হয় জানেন! আচ্ছা বলুন তো, আপনার বাবা কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? (তাঁর কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর আরও নিম্নখাদে নেমে এলো) আমায় কোন কথা বলবার জন্যে আপনি কি এখানে এসেছেন? যদি আপনার বাবা কোন কথা আমায় বলবার জন্যে বলে থাকেন—শীঘ্র

বলুন। এরপর এখানে হয়ত অন্য লোক এসে পড়বে!

নিজেকে সংযত করতে সময় লাগ্‌লো!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লাম—বাবা কলকাতায় গেছেন! আপনার চিঠি যেদিন পেয়েছেন, সেই দিনই গেছেন!

আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠে বিজয় বাবুর প্রশ্ন করলেন—কবে ফিরবেন?

—বোধ হয় শুক্রবার! ঠিক বলতে পারিনে; তবে রবিবারের মধ্যে নিশ্চয় আসবেন!

নিমিষের জন্য বিজয়বাবুর মুখের ওপর দিয়ে কি এক বিচিত্র অভিব্যক্তির ছায়া খেলে গেল! তাঁর মুখের সে ছবি আমার ভাল লাগল না। বল্লাম—কল্‌কাতায় তাঁর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয় নি?

—নিশ্চয় না! কল্‌কাতায় আমি কারুর সঙ্গেই দেখা করি নি! সেখানে পৌঁছবার পরের দিনই তো এখানে চলে এসেছি! যাই হোক, আশা করছি, রবিবার দিন আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য লাভ করব!

সহসা প্রশ্ন করলাম—নিশীথ বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন না?

প্রশ্ন শুনে বিজয় বাবু চকিত হয়ে উঠ্‌লেন। কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের পানে সন্দেহ-কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—যেন জানতে চাইছেন, অতীত ঘটনার কতখানি আমি জানি।

কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে বল্লেন—নিশীথ বাবু! অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি! শুনেছি—এই কয়েক বছরে তার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসেছে! আপনার কি মনে হয়?

—আমি! আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় এখনো এক সপ্তাহের বেশী হয় নি! সুতরাং আমি কেমন ক'রে বলব?

আমার কথা তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না; এমনভাবে আমার পানে তাকালেন যে আমার কথা তিনি বুঝতেই পারেন নি!

ক্ষণকাল নীরব থেকে বল্‌লেন—মাত্র এক সপ্তাহের পরিচয়! অথচ তার সঙ্গে আমার যে চেনা আছে, তা' অবধি জানেন! আশ্চর্য্য তো!

—আপনার সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় আছে, সে কথাটা হঠাৎ ঘটনাচক্রে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল।

খুব সম্ভব বিজয়বাবু আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে আমি প্রশ্ন করলাম—মনীষা দেবীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?

কেন যে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, তা নিজেই জানিনা! কেন যেন মনে হ'ল—মনীষা দেবীর সঙ্গে বিজয় বাবুর আলাপ থাকা আশ্চর্য্য নয়। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম—আমার অনুমান কি নিদারুণ সত্য!

আমার প্রশ্ন শুনে বিজয়বাবুর মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেল! দুই চোখে তাঁর অধীর আগ্রহ এবং আকুলতা ফুটে উঠ্‌লো। মুখের ওপর একটি করুণ কোমল ছায়া!

ঈষৎ কম্পান্বিত কণ্ঠে বল্লেন—না; এখনো দেখা হয় নি! সে কোথায় আছে সে খবর আমি পেয়েছি—কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে সাহস হচ্ছে না!

বিজয় বাবুর কথার ধরণে বিস্ময়ের অন্ত রৈল না। দেখ্‌লাম—তাঁর দুই চোখ কিসের প্রত্যাশায় যেন উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে। সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত্তে নীরব থেকে সহসা অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় ব'লে উঠ্‌লেন—তার কথা মনে পড়লে অন্য সমস্ত কথা—সমস্ত বিশ্বসংসার—আমি এক

মুহূর্ত্তে ভুলে যাই। আমার সারা জীবনকে সে এমনি করেই আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে!

ভয়ে ভয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লাম—আস্তে কথা বলুন! পাশের লোকজন শুনতে পাবে যে!

গম্ভীর বজ্রস্বরে তিনি বলতে লাগলেন—আমি জানতে চাই—এবং শীঘ্রই আমি জানতে পারবো—এই ক'বছরে আমার প্রতি তার নির্ম্মম মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে কি না! আমি জান্‌তে চাই—তার মুখের কথায় আমি জান্‌তে চাই—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, যাকে এতদিন ধ'রে বুকের মধ্যে পোষণ করেছি—সে স্বপ্ন আমার কি সফল হবে না—কিছুতেই না?

আমার বিবর্ণ বিহ্বল মুখের পানে তাকিয়ে স্বর নামিয়ে তিনি বল্‌তে লাগলেন—আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন! কিন্তু এ আমার অন্তরের কথা! জানুক সবাই; আপনি জানুন; আপনার বাবা জানুক; নিশীথ জানুক—সমস্ত জগৎ জানুক। ভয় করি নে! আমি তাকে ভালবাসি—একথা বল্‌তে আমি ভয় করিনে! হয় আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো; নয় আমার জীবনের শেষ হবে! এর জন্যে কোন বাধা আমি মান্‌বো না; প্রয়োজন হ'লে এর জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমি ক্ষান্ত হব না। আমি তাকে চাই! তার সামনে গিয়ে বল্‌বো—আমায় এত গুলো জীবনের প্রত্যেকটি দিন তোমার চিন্তায় যাপিত হয়েছে; আমার মাথার এই রুক্ষ বিপর্য্যস্ত চুলের প্রত্যেকটির মধ্যে তোমার কথাই গুঞ্জরিত হয়েছে! আমার সারা প্রাণ তোমার আশায় অহরহ উৎসুক হ'য়ে আছে! তুমি ফিরে চল!

আমার চোখের সুমুখে তখন সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য্য রুক্ষ দগ্ধ হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কে যেন পাথর ভাঙ্‌ছে! সুমুখে আমার যে লোকটি ব'সে কথা বলছে—প্রেতের মতো সে যেন কুৎসিত, কদাকার!

বিজয় বাবু আমায় উদ্দেশ ক'রে কি যেন ব'লে উঠলেন। প্রথমটা তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না। তারপর শুনলাম, তিনি বলছেন:

দেখুন, আপনার সামনে অসংযত হ'য়ে অনেক কথাই ব'লে ফেল্লাম! আপনাকে আমি আমার অন্তরের কথাগুলি বিশ্বাস ক'রেই বলেছি! আশা করি আপনি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না?

মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম! বিজয়বাবু বোধ হয় খুসী হলেন না; বল্লেন—আপনাকে একটি অঙ্গীকার করতে হবে?

অঙ্গীকার! কি অঙ্গীকার?

আপনাকে এই শপথ করতে হবে যে, আমি যে এখানে এসেছি, এ কথা আপনি মনীষাকে বলবেন না! দু'-একদিনের মধ্যেই আমাদের দেখা হবে! ইতিমধ্যে আমি ইচ্ছে করি না যে সে আমার এখানে উপস্থিতির কথা জান্‌তে পারুক!

এই কথা! এ আর বেশী কথা কি! কথা দিলাম! তারপর বল্লাম—কিন্তু বাবা কিম্বা নিশীথ বাবু কি তাঁকে আপনার কথা বলবেন না?

—বোধ হয় না। এমন কতকগুলি কারণ আছে যার জন্যে, আমার মনে হয় নিশীথ বলবে না।

আমার বাবা?

পুনরায় বিজয় বাবুর মুখের ওপর এক বিচিত্র ছায়াপাত হ'ল। কেন জানি না, মনের মধ্যে অস্পষ্ট শঙ্কা অনুভব করলাম। বাবার কথা উল্লেখ করা হ'তেই কেন যে বিজয়বাবুর মুখের ভাব এমন ক'রে বদ্‌লে যায়—তার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না।

—আমায় বোধ হয় (আমার প্রশ্নের উত্তরে বিজয় বাবু বল্লেন) আপনার বাবা কিছু বলবেন

না! না; আমি নিজেই তার কাছে আমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করব! (বিজয় বাবু যখনই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন তখনই তাঁর বাচন-ভঙ্গী অতিশয় নাটকীয় হ'য়ে ওঠে) অতর্কিতে আমি একেবারে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াবো—আশে পাশে তখন আর কেউ থাকবে না, জনপ্রাণী না! সেই নির্জ্জনতার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করব! পরীক্ষা করব! সেই হবে আমার জীবনের চরম পরীক্ষার দিন!

সেই সময় সহসা যদি না রমাপিসি আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'তেন তাহলে হয়ত বিজয় বাবুর বাধা বন্ধহীন উচ্ছাস থামতে চাইতো না! রমাপিসি আমাদের কাছে এসে বারেকের জন্য আমাদের উভয়ের মুখের পানে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন—তোমরা দুটিতে তো বেশ গল্প করছিলে—তোমাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালাম ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করছি! স্যার অতুলের স্ত্রী প্রমদা চলে যাচ্ছেন। যাবার আগে তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন! একবারটি আসবে?

—নিশ্চয়; বলে উঠে দাঁড়ালাম! আমিও এইবার বাড়ী যাব। নমস্কার, বিজয়বাবু; চল্লাম।

বিজয় বাবু দুই হাত তুলে বল্লেন—নমস্কার! নমস্কার! আবার কবে দেখা হবে?

—তা ঠিক বলতে পারিনে!

কিছু দূর এগিয়ে এসে মনের আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। রমাপিসিকে প্রশ্ন করলাম —ও-লোকটা কে পিসিমা? ওর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

রমাপিসি হেসে বল্লেন—আমি আর বেশী কি জানবো! কিন্তু তোমরা দু'জনে এমন ভাবে আলাপ করছিলে, দেখে মনে হচ্ছিল তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কথা বলা হতে বাকী নেই! লজ্জিত হোসনে। এতো ভালই! কিন্তু মেয়ে, আমি তো বিজয়বাবুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে; আর, উনিও যে বিশেষ জানেন—তাও মনে হয় না। বোম্বাই সহরে কার্য্যসূত্রে আলাপ হয়েছিল—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু কেন বল্‌তো—এত খোঁজ? লোকটি তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই ভদ্র ব্যবহার করেছিল?

বল্লাম—অন্তত কোন অভদ্র আচারণ যে করেন নি, এটুকু অনায়াসে বলতে পারি!

রমাপিসি আমার কথা শুনে অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠ্‌লেন! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজয় বাবুর ভদ্রতা শিক্ষা এবং সর্ব্বোপরি তাঁর বিপুল বিত্তের কথাটা আমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগ্‌লেন!

হায়! রমাপিসি!

আমি তখন ভাবছিলাম—বিজয়বাবু লোকটি কে? তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় আমায় কে দেবে?

চল্‌বে

ভোগের মালিক

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি আর বৃষ্টি, কি বিশ্রী! এমন বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না।

সকালবেলার দিকে একবার থামিয়াছিল বটে, অনেকখানি আশাই তাতে করা গিয়াছিল; সে থামা যে নূতন করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আসিবার জন্য তা কে জানিত। আশা-ভরসা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া আবার এমন জলই নামিল, এ যেন আর থামিবে না। আকাশ জোড়া ধূসর-মেঘের গুমরানি শুনিয়া মনে হয়, ও যেন মনে মনে ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে, এবং সেই ঝালটাই মিটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

আকাশের কোন্‌খানটা ভাঙিয়া গেল নাকি!

মানকচুগাছটার কি দুর্দ্দশা, বিশেষ করিয়া তার মস্ত বড় ওই পাতাটির, ওর উপর সারাক্ষণ ধরিয়া ঘরের চালের কোণ হইতে মোটা জলের ধারাটা ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া পড়িতেছে আশ্চর্য্য, পাতাটা এখন ফুটা হইয়া যাইতেছে না; কিন্তু আর একটু হইলেই ফুটা হইয়া একেবারে চৌচির হইয়া যাইবে।

ঝিঙেপাতাটা আর পারিতেছে না, এবার বোধ হয় হাত পা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে।

হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা!

চক্রোর্ত্তিবাড়ীর সাম্‌নের ভিটিটাতে জল জমিয়া ঘাসগুলি প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। এ দুর্য্যোগে সেখানে কালো একটি গরুর দড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেছিলেন সতীশ চক্রোর্ত্তির মা; বয়স সত্তরের কাছাকাছি।

নূতন করিয়া আবার জল আসিবে জানিলে তিনি কক্ষণো গরুটাকে বাহিরে আনিয়া বাঁধিতেন না।

এই ঝড়জলে খোলামাঠে গরুটি কিসের আকর্ষণ পাইয়াছে, কে জানে, কিছুতেই নড়িতে চাহে না। নেহাৎ গরু না হইলে এমন জলে ঘরের বাহিরে থাকিতেই বা চায় কে!

সামনের দিক দিয়া টানা যখন বিফল হইল, বৃদ্ধা তখন গরুর পিছনে গিয়া দড়ির আগার খুঁটা দিয়া মারিলেন এক ঘা। তাতে গরুটি শুধু পিঠটাকে একবার বেঁকাইয়াই আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পাও নড়িল না।

দুঃখে বৃদ্ধার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল, কি যে বরাত করিয়া আসিয়াছিলেন! কিন্তু বরাতের কথা ভাবিবার সময় তখন সেই ঝম্‌ঝমানি বৃষ্টি ধারার মাঝখানে নয়।

রাগে গরুর পাছার উপর ঘায়ের পর ঘা মারিতে লাগিলেন, গরু কিন্তু অনড়-অচল, সামনের দুইখানি পা কাদার ভিতর গাড়িয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর মারিতেও ইচ্ছা হয় না। হাড় কয়খানি ছাড়া গরুর আর আছেই বা কি? কাল রাত্রে মনে করিয়া তাকে দু'টি ঘাসও কেহ দেয় নাই। দিবেই বা কে? বুড়ীরও মরণ দশা, সাঁজ না হইতে গা ভাঙিয়া আসিল, পড়িয়া রহিলেন কাঁথা-মুড়ি দিয়া। আর মণি, সংসারে তাঁর সুখ-দুঃখ বুঝিবার যদি কেহ থাকে তো ওই

নাত্‌নিটি। নয় বছরের মেয়ে, তারই বা কত মনে থাকে! আর মনে থাকিলেও, ফাঁক পাইলে তবে তো! সারাদিন তো খাটুনি আর খাটুনি, হয় তো একটু সকাল সকালই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাপড়খানা বৃদ্ধার গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টাইয়া গিয়াছে। আর ভিজাও উচিত নয়, রোজই তো সন্ধ্যা হইতেই একটু জ্বর হয়; আর যখন তখন কাঁপাইয়া জ্বর আসা, সে তো লাগিয়াই আছে।

কিছুতেই না পারিয়া তিনি গরুর পিছন হইতে সবটুকু শক্তিতে মারিলেন এক ঠেলা। ফলে সেই জলে কাদায় গরু শুইয়া পড়িল।

এবার কাঁদিয়াই ফেলিলেন। অসহায় কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন,—মণি! মণি রে!

ভাঙা একটা ছাতা মাথায় দিয়া অপরাধীর মত এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বড় ঘরের পাশ দিয়া মণি বাহির হইয়া আসিল; বেশ টুকটুকে সুন্দর মেয়েটি!

ঠাকুরমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বাতাসে ছাতা উল্টাইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া ছাতাটি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

ঠাকুরমা হা-হা করিয়া উঠিলেন,—ভিজিস নে, ভিজিস্ নে মণি! আ-হা-হাঃ, ডেকেছি বলেই অমনি ছুটে আস্‌তে হয়? ভাঙা ছাতিটে শেষে নিয়ে এলি কেন?

এসব কথার কোনো সাড়া না দিয়া মণি গরুর ল্যাজটি ধরিয়া মোচ্‌ড়াইয়া দিল। অব্যর্থ ফল, গরু উঠিয়া দাঁড়াইল।

পুনরায় সেই অনুষ্ঠানেরই ফলে গরু চলিতেও আরম্ভ করিল। প্রক্রিয়াটি মাঠের চাষীদের দেখিয়া শেখা।

খুশীতে ঠাকুরমার মুখে হাসি ফুটিল, দন্তহীন মাড়ি দুইটি বাহির হইয়া পড়িল,—অত কি আমি জানি বাপু? এই বয়সেই দিদির আমার বুদ্ধি খুব।

সন্ত্রস্ত চোখে চাহিয়া মণি বলিল,—কথা কোয়ো না ঠাকুমা, আমি ভিজ্‌ছি জান্‌তে পারলে বাবা যে মেরে ফেল্‌বেন। জানো না যেন কিছু!

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই নাকি সন্ধ্যা হয়

ভিজিতে ভিজিতে আগে আগে আসিতেছিল মণি, আর পিছনে গরু লইয়া ঠাকুর-মা।

সতীশ চক্রোর্ত্তি মাষ্টারী করে গ্রামের মাইনর স্কুলটিতে। খাইয়া দাইয়া দুগ্‌গা-শ্রীহরি বলিয়া বাহিরে আসিতেই মণিকে ভিজিতে দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। ধম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ভিজ্‌ছিস্ যে?

ভিজিবার কৈফিয়ৎ দেওয়ার আগেই মণির গালে পড়িল বিষম এক চড়। দাঁড়াইয়া থাকিলে আরেক চড় খাইবার নিতান্তই সম্ভাবনা, কাজেই টুঁ-শব্দটি না করিয়া মণি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পুত্রের অগ্নিদৃষ্টি যে নিজেরই উপর নিপতিত এটা মাতা অনুমান করিতে পারিলেন; সেই দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই হঠাৎ নিতান্ত ঘাসবিহীন জায়গায় তাঁর পায়ে জোঁকেই বা বুঝি ধরিল বলিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

"কেন, গরু ঘরে আনবার কি আর লোক নেই? অতটুকু মেয়েকে ভিজিয়ে মারা কেন? এতই দরদ যদি—" বকর-বকর করিতে করিতে সতীশ চলিয়া গেল।

উনুনের ধারে বসিয়া ঠাকুরমা গা শুকাইতেছিলেন। বাঁশের খুঁটিটিতে হেলান দিয়া মণি

তাঁরই দিকে এতক্ষণ চাহিয়া ছিল, বলিল,—তোমার চোখ যে লাল হয়ে উঠ্‌ল ঠাক্‌মা, জ্বর আস্‌বে নাকি ?

চোখ বুঁজিয়া শরীরের ভাবটা মিনিটখানিক পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন,—দুটো 'কুইন্নালের' বড়ি এনে দিবি দিদি ?

মণি হাসিয়া উঠিল,—ফের বলে কুইন্নাল, কতবার করে ব'লে দিয়েছি, কুইন্নাল নয়, কুইনিন —কুইনিন—কুইনিন, তবু বলে কুইন্নাল, বুড়ীকে নিয়ে আর পারলুম না।

মণি কুইনাইন আনিতে গেল।

কুইন্নাল আর কুইন্নাল, আর খাওয়া যায় না, কি ছাই উপকার হয় ওতে ? ওতো রোজই খাওয়া হয়, জ্বরও রোজই আসে, লাভের মধ্যে দিন-রাত চব্বিশঘণ্টা শুধু কাণের ভিতর ভোঁ-ভোঁ করে, মাথার ভিতর ঝিমঝিম্ করে। তবু ও যেন এক সংস্কার হইয়া গিয়াছে, জ্বর আসিবার সম্ভাবনা দেখিলেই কুইনাইন খাইতে হইবে।

বৃষ্টি আর থামে না। বেলা হইয়া গেল কত ! গরুটা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সাম্‌নে এক-গাছাও ঘাস নাই। বাহিরে আনিয়া বাধাও এ বৃষ্টিতে যায় না।

একবার আকাশের পানে চাহিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া মস্ত বড় একটা মানকচুপাতা কাটিয়া তাই দিয়া মাথা ঢাকিয়া গোয়াল-ঘরে আসিলেন। ঘাস তুলিবার লোহার কুরুকিখানা লইয়া পুকুরধারে উঁচু ঢিপিটার উপর ঘাস তুলিতে লাগিলেন।

অদৃষ্ট আর কাহাকে বলে ! সকলেই যেমন করে, সতীশের উপরে তার মাও তেমনই কিছু আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁর কোন্ কথাটি সে রাখিয়াছে ?

মায়ের ইচ্ছা ছিল, তাঁদেরই সমশ্রেণীর ঘরের ভাল একটি মেয়ে দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিবেন এবং দুই একটি মেয়ে পছন্দও করিয়াছিলেন।

কিন্তু সতীশ বিবাহ করিল খাদিরপুরের কুলীন মুখুয্যেদের মেয়ে। কি দরকার ছিল বাপু কুলীনের ? এইজন্তেই না বুড়ীর এত দুর্দ্দশা !

পুত্রবধূ সত্ত্বেও, কোনো ছোট কাজ তাকে দিয়া করানো অসম্ভব, সতীশের শালা অম্বিকা, সে এখানেই থাকে, পড়ে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সকালবেলা ঘণ্টা দুই পড়িয়া আসে, বাকী বাইশ ঘণ্টাই সে পড়িয়া থাকে বাড়ীতে। সে যদি কোন দিন দেখে তার কুলীন দিদি গরুর ঘাস তুলিতেছে বা উঠান ঝাঁট দিতেছে, অথবা এমনি ধরণের কোনো ছোটো কাজ করিতেছে, তবে সে মনে করিবে কি ? খাদিরপুরে যাইয়া নিশ্চয়ই সে এসব কথা বলিয়া দিবে। তখন ? তখন, শ্বশুরবাড়ীতে যাইয়া সতীশ মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া !

এই জন্যই পত্নীকে গরু সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বাবধান করিতে বারণ করিয়া সতীশ বলিয়াছে,—কেন, গরুটাকে দেখবার কি আর লোক নেই, বাড়ীর লোক সবাই কি মরেছে ?

কচুপাতাটিকে মাথার উপর ঠিক করিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা ঘাসগুলির গোড়ার মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এ কয়টি ঘাসে কি হইবে ? আরো অনেক দরকার ; গরুর পেট যে একেবারে খালি পড়িয়া আছে।

সতীশ তো চাকুরীই করে। সংসারের কাজ করার তার সময় কোথায় ?

মণি অতটুকু মেয়ে, সে আর গরুর সেবা করিবে কি ? মায়ের কাজে সাহায্য করিতেই তার সারাদিন কাটিয়া যায়। তবু যতটুকু তার

শক্তিতে কুলায় গরুটার দিকে সেই যা হোক একটু চাহিয়া দেখে।

বাড়ীতে আর লোক কে? দুই বছরের খোকা।

আয় কম, কাজেই চাকর রাখাও অসম্ভব। সংসারের স্থায্য খরচ চলাই দায়।

সতীশের বিবাহের আগে তো এ সংসারে এমন অভাব ছিল না। চাষের জমিটুকু ছিল, বছরের চাল-ডাল, তরি-তরকারী তা হ'তেই পাওয়া যাইত। চাষের জন্য একজন চাকরও থাকিত, সেই গরু-বাছুরের খবরদারি করিত।

এ বরপণের দিনে সতীশ কি না তার বিবাহে দিল কন্যাপণ। একটা হাজার টাকা দিয়া সে কুলীনের কন্যারত্ন গৃহে আনিয়াছে। বিবাহে খরচ গিয়াছে পাঁচশ।" এই দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছিল চাষের জমিটুকু বন্ধক রাখিয়া।

বিবাহের পর সতীশ বলিয়াছিল বটে যে, চাকরী করিয়া তিনবছরের মধ্যেই কর্জ্জ শোধ করিয়া বন্ধকী জমি সে ছাড়াইয়া লইবে।

বিবাহের তিনবছর পরে হইল মণি, তার বয়স হইল নয় বছর, তার পরে দুইটি ছেলে হইয়া মারা গেল, খোকা হইল, তারো বয়স হইল দুই বছর, কর্জ্জের টাকা কিন্তু আর শোধ করা হইল না। টাকা শোধের মেয়াদ ফুরাইতে চিরদিনের মত সে জমি হইয়া গেল মহাজনের। পায়ে ঠেলা লক্ষ্মী আর হাতে আসিল কই?

বাসগুলি ঝাড়িয়া লইয়া পুকুরে ধুইতে নামিতেই অম্বিকার গলা শুনা গেল,—ওরে মণি, তোর ঠাকুমা কোথায়, বল, বাছুর ছাড়া পেয়ে দুধ খেয়ে ফেল্‌ছে যে।

দুধ খাইয়া ফেলিতেছে তা দেখিয়া নিজেই দুই পা আগাইয়া বাছুরটাকে বাঁধিয়া রাখিলে তার কুলীনত্ব কি জরিয়া যায়? এর জন্য মণিকে ডাকিয়া আবার ঠাকুরমার উপর বরাদ্দ না ফেলিলে কি হয় না?

তাই বা হয় কেমন করিয়া? অকুলীন ভগ্নী-পতির অন্নগ্রহণ করিয়া তার বাড়ীতে বাস করিয়াই সতীশ এবং তার গোষ্ঠীকে—চৌদ্দ পুরুষকে অম্বিকা ভীষণ ধন্য করিয়া দিয়াছে, সে আবার কাজ করিবে কি!

উনিশ কুড়ি বছর বয়স, ওই হাতীর মত ছেলেটাকে দেখিলেই যেন গা জ্বালা করে। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া কিছু কাজই কি আর করিতে নাই! অন্নদাতার এতটুকু উপকার করিতে কি তার কুলীনত্বায় মানা করিয়াছে? সতীশ না হয় বারণই করিয়াছে, তাই বলিয়া কি নিজের একটু আক্কেল থাকিতে নাই!

কিছু তো বলিবার উপায় নাই, কথায় কথায় সুপুত্রের মুখের অসংখ্য গলিগালাজ বুড়া মা তো পেট ভরিয়াই খাইতেছেন। ভয় হয়, এ বয়সে প্রহারটাও পাছে বাকী না থাকে।

মাঝ আকাশ ছাড়াইয়া সূর্য্য তখন অনেক-খানিটা নীচের দিকে নামিয়াছে, এটা বুঝা গেল মেঘে ঢাকা আকাশের একটু জায়গার উজ্জ্বলতা দেখিয়া।

বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর আর সকলের খাওয়া-দাওয়াও হইয়া গিয়াছে।

মণি আসিয়া দেখিল, চিরকালের ছেঁড়া-ময়লা, মোটা কাঁথাখানি দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া ঠাকুরমা জ্বরে হি হি করিয়া কাঁপিতেছেন।

কাছে বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাত খেয়েই জ্বর এল বুঝি?

ঠাকুরমা কথা বলিতে পারিলেন না, ইঙ্গিতে জানাইলেন, খাওয়া হয় নাই।

জানা কথা। কতদিন মণি দেখিয়াছে, এ বয়সে হাত পুড়াইয়া রান্না করিয়া শেষে জ্বর আসে, ও ওর আর হয় না। মণি যদি পারিত ঠাকুরমাকে রান্না করিয়া দিত! কিই বা আর রান্না, শুধু ভাতে-ভাত, এ মণি অনায়াসেই পারে; কিন্তু মায়ের জন্ম কি কিছু করিবার উপায় আছে? সারাদিন শুধু, 'ও মণি কুটনা কুটে দে', 'মণি, বাটনা বেটে দে' 'হ্যান কর, ত্যান কর, খোকাকে রাখ!' ফাই ফরমাস যেন আর ফুরায় না, যত করে ততই নূতন নূতন কাজ যেন গজাইয়া উঠে।

দুই ঘরের রান্না। বেশ তো, আমিষ ঘরের রান্না মা করুক। আর নিরামিষ ঘরের রান্না করুক মণি, ব্যস্। কিন্তু তা হইবার জো নাই ভারী রাগ হয় মণির।

নিরামিষ রান্নাঘরে যাইয়া সে দেখিল, ঠাকুরমার হাতে মাখা কাঁচকলা ভাতের দলাটি শাদা মেনিটা পরম তৃপ্তিতে খাইতেছে। লাথি মারিয়া বিড়ালটাকে তাড়াইয়া সে ভাত তরকারী সব ঢাকিয়া রাখিল।

ঠাকুরমার কাছে আসিয়া সে পাকা গলায় তিরস্কার আরম্ভ করিল,—এত করে বলি, বৃষ্টিতে ভিজো না, তবু ভিজবে। গরু তোমার ছাদে পিণ্ডি দেবে, না? দেখব তখন। কেন তুমি ওই গরু নিয়ে খালি খালি মরতে যাও বলতো?

কেন মরিতে যায়, সে কথা মণির অজানা নয়। নাতি নাতনি একটু দুধ খাইবে, শুধু এইটকু স্বার্থের জন্যই বুড়ীর এত কষ্ট।

কাঁথার তলা হইতে মুখ বাহির করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন,—গরুটাকে ঘরের দরজায় নিয়ে এসে বাধতে পারিস মণি? অতখানি গিয়ে আজ আর দুইতে পারব না।

ঝাঁজালো গলায় মণি বলিয়া উঠিল,—হাঁ দুইবে বৈ কি, ও জ্বর নিয়ে আজ আর গরু দোওয়া চলবে না।

কিন্তু 'চলবে না' বলিয়া ঠাকুরমার কোনো কাজই অচল রাখিতে পারিব না। জানে, সে না আসিলে বুড়ী যেমন করিয়াই হউক গোয়ালে যাইয়া দুহিবে। তাই বলিল,—এখনো তো বেলা রয়েছে অনেক, জ্বরটা এসে একটু ঠাই নিক না, দুইও তখন।

ঠাকুরমা বলিলেন,—তবে এক কাজ কর, গরুটাকে ততক্ষণ একটু ঘাসে বেঁধে আয়, দু'কামড় খাক। ওর পেটে আজ পড়েনি রে কিছু।

মণি উঠিয়া তাদের ঘরে গিয়া ভাল করিয়া দেখিল, মা ঘুমাইয়াছে তো ঘুমাইয়াছে, নাক ডাকাইবার ও উপক্রম।

নিঃশঙ্কায় সে গরু বাঁধিতে চলিয়া গেল।

কি দস্যি বাছুরটা! এমনি তো ঠেঙাইলেও এক পা নড়ে না, আর একটুখানি ছাড়া পাইয়া কোথায় যে উধাও হইয়াছে, এত খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না।

গরু দোওয়া হইয়া যাওয়ার পর, রোজকার মত আজও বাছুরটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে দুধ খাইবার জন্ম। কে জানে, সে এমন করিবে? এখন খুঁজিবে কে? মণি তো তার মায়ের কাছে রান্না ঘরে মাছ কুটিতেছে।

বুড়ী নিজেই উঠিয়া লাঠিতে ভর দিয়া নামিয়া আসিলেন। পচা ম্যালেরিয়া তার চিরদিনের নিয়মানুসারে ঘণ্টা দুই বেশ পীড়া দিয়া—কে জানে কতক্ষণের জন্ম একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেহের দুর্ব্বলতা কিন্তু এখনো কমে নাই। কিন্তু দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া পড়িয়া থাকিলে— এ ভর সন্ধ্যাবেলা—বাছুরটা হয়তো শিয়ালের পেটেই যাইবে।

বাঁ-হাতে বাছুর-বাঁধার দড়ি আর ডান হাতে লাঠি লইয়া বৃদ্ধা ধীরে-ধীরে এদিকে ওদিকে খোঁজ করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর উপরে সম্ভব-অসম্ভব কোন জায়গায় যখন সন্ধান মিলিল না, তখন ঢুকিতে হইল পিছনের পুকুরের ওধারের বাগানে।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ; আর বেশী খুঁজিবার মত শক্তিও নাই। হতাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, করবী গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বাছুরটা ড্যাবডেবে চোখে এদিকে-ওদিকে চাহিতেছে অথচ এই জায়গাটিতেও তখন বহুবার খোঁজ করা হইয়াছে। কখন যে ওখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কে জানে!

গরুবাছুর বাঁধিয়া ঘরে আসিয়া বৃদ্ধা যখন বিছানা লইলেন, সাঁঝ তখন উৎরাইয়া গিয়াছে।

আর কাজ নাই। কালই গরুটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। কত আর শরীরে সয়। সেখগাঁয়ের ছাবিদমিয়াঁ তো বাইশটাকা দর করিয়া কত সাধাসাধি সেদিন করিল। তাকেই ডাকিয়া গরুটা এবার বেচিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু তাঁর মণি আর খোকা? গরু বেচিয়া ফেলিলে ওদের বাপ ওদের কি দুধ কিনিয়া খাওয়াইবে! সে ভাগ্য ওদের থাকিলে আর বুড়ীকে এমন করিয়া মজিতে হইবে কেন?

অম্বিকা খাইতে বসিয়াছে।

পাশের গ্রামে সতীশ একটি ছেলে পড়ায়, সেখান হইতে এখনো ফিরিয়া আসে নাই। ভগ্নিপতির জন্ম অতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার মত ধৈর্য্য অম্বিকার নাই।

বহুক্ষণ ধরিয়া চোয়ালের ব্যায়াম করিয়া সে যখন হাত তুলিয়া নির্ব্বিকার বসিয়া রহিল, তখনও তার থালায় ভাত রহিয়াছে নেহাৎ অল্প কয়টি নয়। সেগুলি ধ্বংস করার জন্ম কোনো তরকারী আসার শব্দটিও কিন্তু উনানের দিক হইতে আসিল না।

সরযূ উঠিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল দুধে ভরা বাটি হাতে করিয়া এবং সে বাটি রাখিয়া দিল ভ্রাতার থালার কাছে।

দুধের দিকে চাহিয়া অম্বিকার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কহিল,—তোর কি আক্কেল বল্‌তো দিদি? অতটুকু দুধ দিয়ে অতগুলো ভাত খাব কেমন ক'রে?

আশ্চর্য্য এই যে, এই দুধটা ওর জন্ম কেনাও নয়, স্বতন্ত্র কোনো গরুরও নয়। যে গরুটি লইয়া সারাটি দিন ধরিয়া সত্তর বছরের ওই বৃদ্ধা খাটুনিতে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছেন, ও দুধ সেই গরুরই।

ভগ্নীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। বলিল —যেমন আমার পোড়া কপাল, একটু দুধ যে তোকে মনের মত ক'রে খাওয়াব সে অদৃষ্টে—

কথা শেষ হওয়ার আগেই টপ্ করিয়া তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

অম্বিকা রাগিয়া উঠিল,—দরকার নেই আমার দুধে! দিদি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—লক্ষ্মীটি ওটুকু খেয়ে ফেল্, ফেলিস্ নে!

সে কিছুতেই খাইবে না।

এতক্ষণ একপাশে বসিয়া মণি ব্যাপার দেখিতেছিল, বলিল,—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি আর একটুখানি দুধ আন্‌তে পারি কি না।

ঘরে গিয়া নিজের ভাগের দুধটুকু সে মামার জন্ম লইয়া আসিল।

খোকা তো দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কখন। মামা তো দুধ খাইয়াছেনই। বাকী দুধটুকু মণি ভাগ করিয়া বাটি দু'টিতে ঢালিয়া রাখিল। এক বাটীতে মায়ের জন্ম, আরেক

বাটিতে ঠাকুরমার। নিজেরটুকু তো মামাকেই দিয়াছে। দুধ খাইলে বাবার পেটের অসুখ করে।

যেদিন এমনি করিয়া নিজে দুধ ভাগ করিয়া ঢালিয়া না রাখিয়া সে-ভার মায়ের উপর ছাড়িয়া দেয়, সেদিন, সে জানে, ঠাকুরমার জন্ম দুধ আর থাকে না। কাজের চাপে দুধটুকু এমনি করিয়া নিজে হাতে ঢালিয়া সাজাইয়া রাখিবার অবকাশ সে সবদিন পায়ও না। কাজেই মাসের মধ্যে কুড়িদিন ঠাকুরমার ভাগ্যে দুধ জুটে না। অথচ খোকার পরেই এ বাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে দুধের প্রয়োজন তাঁরই, একে বৃদ্ধ বয়স তার উপর কুইনাইন খান।

দুই বছরের খোকা এখনো মায়ের দুধ খায়। তাকে সুস্থ রাখিতে হইলে সরযূর ও নিতান্ত দুধ খাওয়া দরকার। কিন্তু কি মুস্কিল! দুধ সে খাইতে পারে না। কারণ সরযূ বলে, দুধে নাকি, তার মনে হয় কি রকম বিচ্ছিরি গন্ধ। অথচ খোকার স্বাস্থের খাতিরে না খাইয়া উপায় নাই। তাই রোজগার মত আজও সে দুই আঙুলে বেশ করিয়া দুইহাতে নাক টিপিয়া ধরিয়া 'ঢক্' করিয়া দুধটুকু খাইয়া ফেলিল!

সতীশ খাইতে বসিল। থালা প্রায় উজাড় করিয়া হঠাৎ সে ঘরের চালের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া বিমর্ষ মুখে কহিল,—কি বর্ষাই না আরম্ভ হয়েছে! তরকারী কিচ্ছুই যে জুটছে না। মুখে অরুচি ধ'রে গেল।

একটু থামিয়া বলিল,—পেটটা আজ যেন একটু ভাল আছে। একটু দুধ যদি হয় তো ভাতকটি খেয়ে ফেলা যায়।

সরযূ ঘরে গেল। শাশুড়ীর জন্ম রাখিয়া দেওয়া দুধটুকু স্বামীকে আনিয়া দিল।

সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

মণি আসিয়া ঠাকুরমাকে জাগাইল, বলিল,—একটুখানি দুধ রেখে দিয়েছি ঠাক্‌মা, খেয়ে ফেলো, এনে দিই।

দুধ আনিতে যাইয়া দেখিল, কোথায় দুধ? একটি বাটিও যে নাই!

মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানিতে পারিল, দুধ তার বাবাকে দেওয়া হইয়াছে।

এখন মণি ঠাকুরমাকে কি বলিবে? কত আশা করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। তার ভারী রাগ হইল,বাবার এটা অন্যায় নয়? পেটের অসুখ বলিয়া দুধ না খাওয়ার ভাণ করা, অথচ মাসে কুড়িদিনই দুধ খাওয়া, এসব কি? কেন, বলিলেই তো হয়, 'আমিও দুধ খাব', তা হলেই তাঁরও জন্ম দুধ রাখিয়া দেওয়া যায়।

ঠাকুরমার কাছে যাইয়া অত্যন্ত বিপন্নভাবে কথাটা বলিল। খুসী হইয়া তিনি কহিলেন,—ওকেও একটু দুধ রোজ তোর নিজে হাতে নিয়ে দিস্ মণি। তুই খেয়েছিস তো দুধ?

অবিচলিতকণ্ঠে মণি কহিল,—খেয়েছি।

কাঁথা মুড়ি দিয়া ঠাকুরমা আবার শুইয়া পড়িলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

কুমারী লাবণ্য মজুমদার

মলিনা তাহার ক্ষুদ্র দাওয়ার উপর বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। অতীতের কত কথাই না আজ তাহার হৃদয়ে উদিত হইতেছিল। বার বৎসর বয়সে সে এই ভিটাতে পদার্পন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মাতৃহারা এক বৎসরের শিশুটীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিল সে কত আদরে, কত সোহাগে—

ওঃ, কে জানিত সেই ছেলেটা এমনি করিয়াই তাহার বুক ভাঙ্গিয়া দিবে? সে যখন বিধবা হইল, মণির বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর!

তাহার বাঁচিবার কি প্রয়োজন ছিল? শুধু এই ছেলেটার জন্যেই তো! তাহা না হইলে, সে আত্মহত্যা করিয়াই এ ব্যর্থ জীবনের শেষ করিত।

মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর সেই শেষ করুন অনুরোধ,—

"মলিনা, যেমন কোরে হোক মনিকে মানুষ কোরো। আমার এই বংশের শেষ প্রদীপটুকু রেখে যাচ্ছি, দেখো, যেন তার কোনো অনাদর না হয়।"

মলিনা তো তাহার—

—"মা, এই অন্ধকারে বসে কি করছ?

তবে ধীরু সকালে যা বলে গেল, তাকি সবই মিথ্যা?

এইতো তাহার মণি, মা বলিয়া ডাকিয়া তাহার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে।

"ওমা, এই হিমে বসে কি করছ? —আমি এসেছি, তাকি তুমি দেখতে পাচ্ছনা?"

এই বলিয়া বিংশতিবর্ষীয় যুবক মণি শিশুর ন্যায় মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল। মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"না রে পাগলা, তাকি আর দেখতে পাচ্ছি? বিকেল বেলায় ছেলের আসবার কথা, আর এলেন কি না রাত্রিতে! আমি ভেবে মরি। হাঁ রে, কাল থেকে তো তোর কলেজের ছুটি হয়েছে, তবে আসতে এত দেরী হোলো কেন? এত বড় হলি তবু মার প্রাণ বুঝলি না?"

হাসিয়া পুত্র কহিল—পরখ করে দেখ্‌ছিলাম মা, আমার আসতে দেরী হলে তুমি কি রকম ভাব।"

"তুই ছেলে, মাকে ভাবিয়ে বুঝি খুব সুখ পাস?"

—"না মা। আজ তোমার ভাবনা দেখে আমার জ্ঞান হয়েছে। —আর কখনও তোমাকে ভাবাবো না।"

মা হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, এখন ঘরে আয় খেতে দি।"

মা উঠিয়া ঘরে ঢুকিলেন, পুত্র তাঁহার অনুসরণ করিল।

দুই

শয্যায় শায়িত পুত্রের মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে মলিনা কহিল—হাঁ রে মণি"

—"কি মা? ওহো বুঝেছি, তোমার হাত ব্যথা করছে, না?"

—"তুই আর জ্বালাস নি বাপু। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গেলুম, তা সব গোলমাল করে দিলি।"

—"ওঃ, তোমার সেই রোজকার একটা কথা, ধীরুদার মাসতুতো বোন সেই দিনের

বেলা—না রাত্রির বেলা, কি নামটা যে ছাই তার। সেই তাকে বিয়ে করবার কথা তো? উ-হুঁ এ শর্ম্মা বি এ পাশ না করে, বিয়ে করছেন না।"

মা হাসিয়া কহিলেন—"না রে বাপু, আমি দিবাকে বিয়ে করবার কথা বলছি না।"

—"তবে?"

মা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"আমি শুনলুম, তুমি নাকি কোল্‌কাতার কোন এক ব্যারিষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করে বিলেত যাচ্ছ?"

উত্তেজিত মণিদেব শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "পুজোর ছুটিতে রমেন আমাকে তাদের দেশে বেড়াতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার পরদিনই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম। তাকি ভুলে গেছ মা?"

মা তাঁহার ব্যাগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া অভিমানী পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন: "মণি, বাপ আমার আশীর্ব্বাদ করি,—তোর যেন চিরদিনই এমনি স্বভাব থাকে। কিন্তু মণি, একথা কেন রট্‌লো?"

"জান না মা, ধীরুদার স্বভাবই হচ্ছে তিলকে তাল করা। এক ব্যারিষ্টারের মেয়ে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়্‌ছিল, তাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছিলুম বলে মেয়েটীর বাবা কিছুতেই শুনলেন না বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়লেন। ব্যাপারটা তো আসলে এই!—তার উপরে ধীরুদার মত কারিকর বেশ একটু রঙ ফলিয়েছেন।

তিন

অদৃষ্টের পরিহাসে মণিদেবের মাতার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে!—

ব্যারিষ্টার মোহন রায় সজোরে সিগারেটে একটা টান দিয়া কহিলেন—"কি বল মণিদেব, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত তো?"

—কুণ্ঠিতস্বরে মণিদেব কহিল—"আজ্ঞে, দেশে আমার মা আছেন—"

বাধা দিয়া মোহন রায় কহিলেন—"বেশ তো, বিবাহের পর ইরাকে একবার দেশে নিয়ে গিয়ে, তোমার মাকে দেখিয়ে নিয়ে এস, তুমি অতি মেধাবী ছাত্র মণিদেব, তুমি যদি আমার ইরাকে বিবাহ করে, বিলেত গিয়ে কোন বিষয় শিক্ষা কর, তা'হলে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করতে পারবে। এবং আমার ইরাকে তুমি নিশ্চয় সুখী করতে পারবে। কি বল?"

—"আমাকে এ বিষয়ে ভাল করে ভাব্‌বার সময় দিন।"

—"আচ্ছা, বেশ। এ বিষয়ে তুমি ভেবেচিন্তেই উত্তর দিও।" সিগারেট টানিতে টানিতে মোহন রায় তাঁহার ড্রয়িংরুম ত্যাগ করিলেন। একাকী ড্রয়িংরুমে বসিয়া মণিদেব ভাবিতে লাগিল, না, এ হ'তেই পারে না। তার চির-স্নেহময়ী জননীকে না জানিয়ে সে এ বিবাহ করতেই পারে না। ধনীপুত্রী ইরা যে তার গ্রামবাসিনী মার নিকট বাস করবে না, তা সে ভালরূপই জানে।

কিন্তু সে যদি ইরাকে বিবাহ করে বিলেত যায়, তা'হ'লে ফিরে এসে সে নিশ্চয়ই তার মাকে সুখী করতে পারবে।

ইরা যদি পাড়াগাঁয়ে যেতে সম্মত না হয়, তা'হলে সে কল্‌কাতায় একখানি বাড়ী ভাড়া করে, ইরাকে ও মাকে নিয়ে আসবে,—কিন্তু মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে কি দূর প্রবাসে যেতে অনুমতি দেবেন? না না, মণিদেব আর ভাবতে পারে না! —অস্ফুটস্বরে মণিদেব ডাকিল—"মা মা—"

অকস্মাৎ উচ্চ-হাসির হিল্লোল তুলিয়া, ব্যারিষ্টার দুহিতা ইরা, একটী সাহেবী পোষাক পরিহিত যুবকের সহিত ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

যুবকটী ইরার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তা'হ'লে আমি এখন চল্লাম ইরা।"—

ইরা হাসিয়া কহিল—"তাও কি হয় মিষ্টার চৌধুরী? বাবার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবেন?"

মণিদেব অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল—"নমস্কার ইরা দেবী।"

—"কে? ও মিষ্টার বোস। নমস্কার।

—আপনাকে দেখতে পাইনি ক্ষমা করবেন। মিঃ বোস, আপনি যে ড্রয়িংরুমে বসে আছেন? বাবা কি বেরিয়ে গেছেন?"

—"না। তিনি ভেতরে গেলেন।"

মিঃ চৌধুরী ইরার দিকে চাহিলেন, ইরা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও আপনি বুঝি মিঃ বোসকে চেনেন না? আসুন, মিঃ বোসের সঙ্গে আপনাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দি, মিঃ বোস ফোর্থ ইয়ার ষ্টুডেন্ট, ইনিই একদিন আমার জীবন রক্ষা করেন। আর মিঃ চৌধুরী, বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার।"

—"ধন্যবাদ মিঃ বোস, আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম।"

—"ধন্যবাদ। আমি ও তাই।"

—"ইরা, আমি চল্লাম তা হ'লে।—মিঃ রায়ের সঙ্গে আর একদিন দেখা করবো। গুড্ নাইট্ মিঃ বোস। গুড্ নাইট্ ইরা—"

মিঃ চৌধুরী প্রস্থান করিলেন।

—"মিঃ বোস—"

—"বলুন?"

—"আজ কি বাবা আপনাকে—"ইরার সুগৌর মুখমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল।

তাহা লক্ষ্য করিয় মণিদেব কহিল—"হ্যাঁ ইরা দেবী আপনার ধারণা সত্য। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি আজ আমার মতামত জিজ্ঞেস করছিলেন।"

কুণ্ঠিতস্বরে ইরা কহিল—"আপনি কি বল্লেন?"

—"আপনার বাবাকে আমি এখনও মতামত জানাতে পারি নি, দু'একদিন সময় চেয়েছি।"

মণিদেব কয়েক মিনিট নিঃস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ডাকিল—"ইরা—"

ইরা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

—"তুমি কি বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলবে?"

ইরা নিজমনে ঈষৎ হাসিল, কি বলিবে সে? সকালেই বাবা তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন "—দেখ ইরা, আমি মণিদেবের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। সন্ধ্যা বেলায় সে এলে আমি তার মতামত জিজ্ঞাসা কর্‌বো।—আর দেখ, চৌধুরী ছোকরাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। তুমি তার সঙ্গে বেশী মেশামেশী কর, তাও আমার ইচ্ছা নয়।" ইরার সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা থাকিলেও গম্ভীর প্রকৃতি সল্পভাষী পিতার আদেশ অবহেলা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

—"এই যে ইরা, তুমি বোধ হয় চৌধুরীর সঙ্গে বাড়ী ফির্‌লে?"

পুনরায় ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া মোহন রায় কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন।

—"হ্যাঁ বাবা।"

গম্ভীর স্বরে মোহন রায় কহিলেন, "হু। মণিদেব, তুমি কি আমার কথার উত্তর এখন দিতে পার না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। কিন্তু কাল একবার আমার মার মত নিয়ে আসবো?"

"আর তোমার মায়ের যদি মত না হয়?"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মা আমার স্নেহময়ী।"

"মণিদেব আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।"

"আজ তা হ'লে আমি এখন চল্লাম।"

"আচ্ছা, মণিদেব চলিয়া গেলে মোহন রায়

ইরার দিকে চাহিয়া কোমলস্বরে কহিলেন—"ইরা এদিকে আর তো মা।"

মাতার মৃত্যুর পর হইতে বহুদিন ইরা পিতার এরূপ কোমল স্বর শুনে নাই। সস্নেহে ইরার মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে মোহন রায় কহিলেন, "ইরা, তুই তোর বাবাকে বড় কঠিন ভাবিস না রে?"

ইরা সজোরে মস্তক নাড়িয়া কহিল, "মোটেই নয়, বাবা।"

"আমাকে ছেড়ে যেতে তোর বড় কষ্ট হবে মা?"

"তবে কেন আমার বিয়ে দিচ্ছেন বাবা?"

"কি করবো মা? এ যে চিরন্তন প্রথা।"

চার

হ্যাঁ দিদি।"

মলিনা তখন সন্ধ্যা দীপ জ্বালিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়া তুলসী তলায় সন্তানের মঙ্গল কামনায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় প্রতিবেশিনী নির্ম্মলা আসিয়া ডাকিলেন, "হ্যাঁ দিদি।"

মলিনা প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল, "বসো ভাই যাচ্ছি।"

"বস্‌ছি। শুনলুম নাকি কাল মণি এসেছিল কল্‌কাতার সেই খ্রীষ্টান মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে তোমার মত নিতে?"

"হাঁ, ভাই।"

"তুমি মত দিলে?"

"দিলুম বই কি, ছেলে যদি তাতে সুখী হয় আমি কি বারণ করতে পারি?"

গালে হাত দিয়া নির্ম্মলা কহিল "অবাক কর্‌লি! এত সহজে সেই খ্রীষ্টানী মেয়েটাকে—"

মৃদু হাসিয়া মলিনা কহিল, খ্রীষ্টান নয়, আমাদের মতই হিন্দু। কিন্তু চাল-চলন সব । তা হ'ক গে, ছেলে যদি আমার তাতে সুখী হয়, আমি আর ক'দিন যে আমার হিঁদুয়ানীর জন্যে তার মনে দুঃখ দেব? তা ছাড়া, তাঁর শেষ ইচ্ছা মণিকে যেমন করে হক্ মানুষ করা।" এতে যদি মণি মানুষ হয় ও তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয় তা হ'লে কি আমি বাধা দিতে পারি?"

মলিনার কথা শুনিয়া নির্ম্মলার দুই চক্ষু কপালে উঠিল।

পাঁচ

সদ্য কোর্ট হইতে ফিরিয়া নবীন ব্যারিষ্টার মণিদেব তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ইরা—ইরা।"

দুই বৎসর হইল মণিদেব বিলাত হইতে ফিরিয়াছে!

বালীগঞ্জে একটী সুদৃশ্য ভবন ভাড়া করিয়া সে ইরাকে লইয়া তথায় বাস করিতেছিল। ঈষৎ বিরক্তি পূর্ণ স্বরে মণিদেব কহিল, আশ্চর্য্য, একদিনও কোর্ট থেকে ফিরে ইরাকে দেখতে পাই না! ঈষৎ উচ্চস্বরে মণিদেব ভৃত্যকে ডাকিল, "রামসিং, রামসিং।

"হুজুর?"

"মেমসাব কাঁহা?"

"চৌধুরী সাবকা সাথ বাহার গিয়া। আপ্‌কো ওয়াস্তে এক ঠো চিঠি হ্যায়।"

মণিদেব খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি পড়িল :—

"কল্যাণীয় মণি, তোমার মা মরণাপন্ন। তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়াছেন। শীঘ্র এস।

নির্ম্মলা।"

"ওঃ, মা মা, এমনি করেই কি আমার অপরাধের শাস্তি দেবে! না না, তোমার অভয়-কোল পেতে রাখ মা, আমি যাচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে এসে এ বিবাহ করে আমি সুখী হতে পারিনি। মাগো, আমাকে মাতৃহীন কোর না। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া মণিদেব কয়েক মিনিট শয্যার

উপর নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে শয্যা হইতে উঠিয়া টেলিফোনে সে তাহার প্রিয়বন্ধু ডাঃ অমল ব্যানার্জ্জিকে তাহার মাতার কঠিন পীড়া ও দেশের ঠিকানা জানাইয়া কহিল—সে এই ট্রেণে যাইতেছে। অমল যেন আর একজন ডাক্তার লইয়া পরের ট্রেণে যায়। তারপর সে ইরার নামে একখানি পত্র লিখিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিল।

ছয়

"উঃ নির্ম্মলা একটু জল"—শয্যার উপর ছটফট করিতে করিতে মলিনা পার্শ্বে উপবিষ্টা, নির্ম্মলার নিকট জল চাহিল। মণিদের চলিয়া যাইবার পর বহুবৎসর অতীত হইয়াছে। অভাগিনী মাতা প্রথম প্রথম তাহার নিকট হইতে দু'একখানি পত্র পাইয়াছিল। তাহার পর আর কোন সংবাদই পায় নাই! তাহার সেই মণি, জগতে যে 'মা' ভিন্ন জানিত না, সেই মণিও তাহার পর হইয়া গেল! ওঃ! এ বেদনা জানাইবার স্থান যে মলিনার ছিল না, তাই বুঝি সে ধীরে ধীরে মৃত্যু-পথে অগ্রসর হইতেছিল! মলিনাকে জল খাওয়াইয়া নির্ম্মলা কহিল—"বাবাঃ, কি ছেলেই ভাই তোর! মা মরেছে কি বেঁচে আছে, একটা খবরও নেয় না।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মলিনা কহিল—"না রে ভাই, সে আমার এমন ছেলে নয়, বিলেত থেকে এখানে চিঠি লিখে পাঠানো কি সহজ কথা? সে অনেক খরচ, কোথায় পাবে ভাই?"

"কোথায় পাবে, কেন এত বড় লোক শ্বশুর! তা বাপু, বিলেত থেকে না দিলি, না দিলি, এখন তো ফিরে এসেছিস্, এখন দিতে পারিস্ না? না, একবার এসে দেখে যেতে পারিস না?"

"তার যে অনেক কাজ ভাই, কি করে আসবে? তবে বড় ইচ্ছা ছিল, একবার বউয়ের মুখ দেখ্‌বার।"

পুত্র স্নেহে অন্ধ জননীকে পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ বৃথা জানিয়া নির্ম্মলা চুপ করিয়া রহিল।

—"নির্ম্মলা, দেখ্‌তো ভাই দরজাটা খুলে, কে যেন ঠেলছে।"

—"কৈ, কেউ তো নয়।"

—"কেউ নয়?" কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া মলিনা আবার কহিল—"দেখ্ না ভাই দরজা খুলে, কে যেন মা বলে ডাক্‌ছে!"

—"আচ্ছা দেখ্‌ছি।" নির্ম্মলা উঠিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"কেউ তো নয়।"

"ও।" বলিয়া মলিনা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সাত

বহুদিন পরে মণিদেব দেশে ফিরিল। চির পরিচিত পথগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়া সে তাহার গৃহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শত আশঙ্কায় হৃদয় তাহার গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের চির-নিঃস্তব্ধ গৃহপ্রাঙ্গন হইতে ঈষৎ কোলাহল শুনা যাইতেছিল। স্তব্ধ চরণদ্বয় কোন মতে টানিয়া লইয়া মণিদেব গৃহে প্রবেশ করিল। প্রাঙ্গণে সাত আট জন প্রতিবেশী চড়া গলায় কোন বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। মণিদেবের কর্ণে তাহার একবর্ণও প্রবেশ করিল না, সে টলিতে টলিতে একজন প্রতিবেশীর সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"হরি কাকা—"

প্রতিবেশী তাঁহার হুঁকাটীতে একটা টান দিয়া কহিলেন—"কে? ও মণি! আর এ শেষ সময় টুকু না এলে পারতে বাবা।" বলিয়া তিনি আবার তাঁহার হুঁকাটীতে মনোযোগ দিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে মণি কহিল—"হরিশ কাকা! আমার মা—"

হরিশ কাকা কোনো উত্তর না দিয়া, ইসারায় কহিলেন, ঐ ঘরে যাও। কম্পিত-চরণে মণিদেব কক্ষে ঢুকিল। স্তব্ধ হইয়া নির্ম্মলা মলিনার মস্তকের নিকট বসিয়াছিল।

—"মা—মা " আর্ত্ত হৃদয়ে মণিদেব মাতার মুখের উপর মুখ রাখিয়া ডাকিল—"মা—মা,—ও মা—"

কে উত্তর দিবে? অসহ্য যন্ত্রণায় মলিনা জ্ঞান হারাইয়াছিল। সেই সময়ে, অমল একজন ডাক্তার লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া মণিদেব ডাক্তারের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "ডাক্তার বাবু, আমার মাকে বাঁচান—"

ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া কহিলেন—"আঃ, কি করছেন? আপনার মা বাঁচবে বৈকি। চলুন, দেখি—"

আট

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে পিতাপুত্রীতে কথা হইতেছিল,—"ইরা, তুমি তার সঙ্গে অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করেছ। আমি আশা করিনি যে, তুমি আমার কন্যা হয়ে এতখানি ধন-গর্ব্বিতা হবে! তুমি বোধহয় জাননা ইরা, আমি যখন তোমার মাকে বিয়ে করে নিয়ে আসি, তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিন্তু তোমার মা ধনী কন্যা হ'লেও, আমার সেই কুঁড়ে ঘরখানি অট্টালিকা মনে করে হাসি মুখে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁরই কন্যা হ'য়ে—" অতীতের শতস্মৃতি জাগ্রত হইয়া তাঁহার বাক্য রোধ করিল।

—"আমাকে ক্ষমা করুণ বাবা। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।"

—"তুমি তো আমার কাছে অপরাধিণী নয় মা। তুমি যার কাছে অপরাধিণী, সেই মণিদেবের কাছে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।"

রুদ্ধ কণ্ঠে ইরা কহিল—"আমি তো জানিনা বাবা, তিনি কোথায় আছেন।"

ঈষৎ ম্লান হাসিয়া মোহন রায় কহিলেন—"তুমি তার এমনই স্ত্রী ইরা, যে সে কোথায় আছে তাও তুমি জান না! কিন্তু আমি সব খবর রাখি মা,—আমি জানি সে কোথায় আছে। আজ মাস চারেক হ'ল সে তার মাকে নিয়ে বউবাজারে থাকে, ও সেখান থেকেই প্র্যাক্‌টিস করে। আমি আজ সেখানে যাব ভাব্‌ছি। তুমি যদি যেতে চাও ইরা, তো আমার সঙ্গে চল!"

—"আমি যাব বাবা।"

নয়

"এঃ যাঃ আঙুল কেটে গেল তো? বল্লুম তুমি সর মা, আমি কুটনো কুটে দিচ্ছি, তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না।"

"তুই কি কুট্‌নো কুট্‌তে জানিস্?

"জানি না আচ্ছা, সব দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি বুঝি মনে কর মা, খালি তুমিই কুট্‌নো কুট্‌তে জান, আর কেউ জানে না?"

মা হাসিয়া কহিলেন "নাঃ বাপু, তোর সঙ্গে পার্‌বার যো নেই। কোট তবে কুট্‌নো।"

দাঁড়াও আগে তোমার আঙুলটা ভিজে কাপড় দিয়ে বেঁধে দি। মণিদেব মাতার কর্ত্তিত আঙুল ভিজা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিয়া কুট্‌না কুটিতে বসিল।

—"দেখছ মা, কি চমৎকার কুটনো কুটছি! তোমার চেয়ে ঢের ভাল হচ্ছে, না?"

যদিও অপটু হস্তে কুটনো ভাল কোটা হইতেছিল না, তথাপি মা হাসিয়া—"হঁ।" বলিয়া লুচি ভাজিবার জন্য ঘিয়ের কড়াটা উনানে চাপাইলেন।

"মণি, এইবার বৌমাকে আন বাবা।"

মণি একটু বিষাদের হাসি হাসিল। মা তো জানে না, তাঁহার বৌমাকে এখানে আনা কতদূর অসম্ভব।

"কিরে চুপ করে রইলি যে?" মা তাঁহার পুত্রকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রের সে সরলতাটুকু আর ফিরিয়া পান নাই। কি যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা মণিদেবের হৃদয় দ্বারে আঘাত করিত। মণিদেব তাহা মাতার নিকট লুকাইয়া রাখিতে চাহিলেও সন্তানের ব্যথা বুঝিতে মাতার বিলম্ব হয় নাই।

"তা হয় না, মা।"

কেন হয় না শুনি? আমি আর কতদিন এখানে থাকবো? কতদিন ভিটেতে সন্ধ্যে জ্বালিনি। তুই বৌমাকে নিয়ে আয় বাবা, আমি এই বার যাই।"

'তুমি জান না মা, সে কত অসম্ভব। আমি আনতে গেলে ও সে আসবে না। কেন মা এই তো আমারা মায়ে-ছেলের বেশ আছি। আবার সে কোলাহল এনে আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে চাই না।"

—"বউ আনলে কোলাহল হয়? শান্তি ভঙ্গ হয়? যা খুসী কর বাবা। তুই যে আমার কথা শুনবি না, সে আমি জানি। না হ'লে কবে থেকে বলছি বৌমাকে আনতে, আনবার হ'লে এতদিন আনতিস।"

মাতাকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে মণিদেব কহিল—"উঃ, বড় খিদে পেয়েছে মা। তোমার লুচি ভাজা হোলো?"

শশব্যস্তে মা কহিলেন—"এই যে হোলো বাবা, বস।"

"আর বসতে পারিনা মা। তুমি একখানা একখান করে ভেজে আমার হাতে দাও। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাব।"

"আচ্ছা বাপু, তাই।"

—মণিদেব একখানি লুচি মুখে পুরিয়া,—আর একখানি পুরিতে যাইতেই মলিনা কহিল —"মণি, আমাদের বাড়ীর সামনে যেন একটা মোটর দাঁড়ালো বলে মনে হোলো না?"

তাচ্ছিল্য ভঙ্গীতে মণি কহিল—"হ্যাঃ, আমাদের বাড়ীতে আর মোটরে করে কে আসবে? পাশের বাড়ীতে বোধ হয়—"

মণিদেবের বাক্য অসমাপ্ত রহিল! —সে বিস্মিত নয়নে দেখিল,—কে একজন নারী দ্রুতপদে মার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে! সে সরিয়া দাঁড়াইল। মোহন রায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন: এই যে মণি, কেমন আছ?"

ওদিকে ইরা মলিনার পদতলে নতজানু হইয়া বলিয়া উঠিল—"অপরাধিণী মেয়েকে ক্ষমা করুন, মা।"

মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, দুই হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন "—পাগল মেয়ে, বুড়ো মা'কে ফেলে এমনি করে দূরে থাকতে হয়? ওরে মনু, বেয়াইকে একখানা আসন পেতে দে'না বাবা!"

—— ——

ভাল লাগা না-লাগা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অতি আধুনিক প্রেমকাহিনী।

ডবল ডেকার বাসের দোতালা। প্রায় খালি বললেই হয়। শুধু সামনের দিকের মুখোমুখী দুটী সিট্ দখল করে দু'টী তরুণ তরুণী বসে। হাওয়ার ধাক্কায় তাদের চুলের বিন্যাস নষ্ট হ'য়ে গেছে কাপড়জামাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের চাপে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই মাত্র বায়স্কোপের সামনে থেকে বাসে উঠেছে, সদ্য দেখা ছবিটির পুনরাবৃত্তি চলছে তখনও তাদের মনে মনে।

ক'মিনিট কথা বলার কোন আগ্রহ-ই তাদের মধ্যে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ বাদে তরুণীই কথা বললে প্রথম।

বললে—সত্যিকারের ভালোবাসা অমনিই, মেয়েটিকে পাবার জন্য ছেলেটী শেষপর্য্যন্ত জীবন পণ করলে।

ছেলেটী এবার হাসলে।

বললে—অমন যদি না হয় তাহ'লে ভালোবাসাটা মিথ্যা হবে বলতে চাও?

—না, আমি সে কথা বলছি না, আমার মনে হয় ওই আত্মত্যাগের একটা বিশেষ মূল্য থাকবে ওদের জীবনে। ওই ত্যাগের ভিত্তির ওপর পরস্পরের ভালবাসা অটুট হবে।

ছেলেটী এবার সোজা হয়ে বসলো, এলো-মেলো চুলগুলোর ওপর দিয়ে একবার হাত চালিয়ে ঠিক করে দিতে দিতে বললে, ভাখো রেখা, ওসব কথার কথা, একজনকে পাবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না, কারণও নেই কিছু। কেন না ভালো লাগার ভিত্তি কোন দিনই অটুট নয়। আজ তোমার আমার ভালো লেগেছে, কাল আরেক জনকে ভালো লাগতে পারে।

রেখা নিজের কথাটাতেই আরো জোর দিলে, বললে—আত্মত্যাগের মধ্যেই কিন্তু প্রেমের স্বার্থকতা রবীন বাবু -

রবীনের হাসি ঠোঁটের কোনে আবার প্রকাশ পেলে, দেহটাকে একটু ঢিলে করে অলসভাবে বললে—সে কথা আমি অস্বীকার করি না, জীবনে বেঁচে থাকতে হলে কম বেশী ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। স্বামী দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিস করে, বায়স্কোপে না গিয়ে ছেলের জন্য হরলিকস্ কিনে আনে। কলম পিষে পিষে কুঁজো হয়ে যায়, চোখে চশমা নিতে হয় তবু অফিস যাওয়ার বিরাম নেই। শুধু স্ত্রীপুত্রকে সুখী ও নিশ্চিন্ত রাখার জন্য স্বামীর পক্ষে এতো কম ত্যাগ স্বীকার নয়!

রেখা বললে—স্ত্রীই বা কম কিসে! বিয়ের পর থেকে সে বাইরের জগৎটাকেই ভুলে যায়, স্বামী-পুত্রকে সুখী রাখার জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করে, কষ্টকে কষ্ট বলেই জ্ঞান করে না। কিন্তু এটুকু আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাধারণ পরস্পরের চিত্তজয়ের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

অর্থাৎ পরস্পরের চিত্ত জয় করতে হ'লে কোন একটা অ্যাডভেঞ্চার দেখিয়ে জীবনটাকে বিপন্ন করে একটা চমক লাগিয়ে দিতে হবে এই ত'?

কিন্তু এ একটা সস্তা দরের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু আমায় পেতে হ'লে আমার মনকে জয় করতে হবে এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

রবীন হাসলে, বললে,—কিন্তু তোমায় যে পেতেই হবে এমন কোন কথা তো আমার জীবনের চরম সত্য না'ও হতে পারে।

রেখার বড় বড় চোখ দু'টী রবীনের মুখের উপর নিবদ্ধ হোল, তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি অস্বাভাবিক দৃপ্ত হয়ে উঠলো, জ্যোৎস্নাবিধৌত আধ-আলোছায়া-ঘেরা রহস্যময় বনানীর বুকে দাবাগ্নি যেমন অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করে। কতক্ষণ সে তাকিয়ে রইল রবীনের মুখের পানে, রবীনের একটী কথায় রেখার মন তখন সন্দেহে ভরে উঠেছে।

কতক্ষণ পরে রেখা দৃষ্টি ফেরাল সামনের রাজপথের দিকে। দীর্ঘ প্রশান্ত দীপালোকিত রাজপথ একটী সরল রেখায় দু'সারি বাড়ীকে ভাগ করে দিয়েছে, তারই পিচ্‌ঢালা বুকের উপর দিয়া তাদের বাসখানি ছুটেছে।

কতক্ষণ বাদে বাস এসে থামলো, জগুবাবুর বাজারের সামনে।

দু'জনেই নামলো।

খানিকটা গিয়ে রেখাদের বাড়ী। ওকে পৌঁছে দিয়ে রবীন ফিরে যাবে।

খানিকটা পথ দু'জনেই এগিয়ে চললো চুপ করে। রবীনের মনে হোল কেমন যেন একটা গুমোট-আবহাওয়া তাদের চারিপাশে এসে জমা হচ্ছে। এই আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে তাদের আবার কথাবার্ত্তা জমিয়ে তুলতে হবে! আগের কথার রেশ ধরে রবীন সুরু করলে—তুমি যে আত্মত্যাগের কথা বলছ, সকলের জীবনে তা না'ও ঘটতে পারে। তোমায় আমি ভালবাসি, তা বলে তোমায় পাবার জন্য অমন য়্যাডভেঞ্চারের আমার দরকার হবে না নিশ্চয়ই?

—হয়তো হতেও পারে। আমি যদি দেখতে চাই তুমি আমার জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পার, তা হলেই হবে।

—অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে তুমি পরীক্ষা করতে চাও, এই তো?

—হাঁ, আমি দেখতে চাই, যে আমায় সত্যিকারের ভালোবাসে, আমার একটী কথার ওপর নির্ভর করে সে তার জীবনকে বিপন্ন করতে পারে কি না।

বেশ আইডিয়া, কবিত্ব আছে!

রবীন একটু মিষ্টি হাসলে।

রেখা সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গ্যালো। বাকী পথটুকু আর একটী কথাও হোল না তাদের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রবীন রেখাদের বাড়ী দিকে ফিরছিল। মনটা তার ভালো নেই। বিয়ের প্রস্তাবে রেখা আজ বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সেই যে এক গোঁ ধরেছে, তা আর ছাড়তে চায় না, বললে—আমায় পাবার জন্যে তুমি কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পার আগে দেখি, তারপর। নাহলে রেখার মায়ের তো কোন আপত্তিই নেই। তার মত একজন এম-এ ডিগ্রিধারী সুপাত্র কি এতই সুলভ। মেয়েটা ভেবেছে কি। তবু যদি আরো সুন্দরী হোত, কি মস্ত বড়লোকের ঘরে জন্মাতো! যাক্‌ দুএকদিনের মধ্যেই এর একটা হেস্তনেস্ত সে করে ফেলবে, না হলে রেখাকে আর প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি, তার চেয়ে লেকের ধারে ঘোরা-ফেরা করবে নতুন কোন প্রেমে পড়ার চেষ্টায়।

কি রে রবী আর যে দেখেও দেখিস না?

সঙ্গে সঙ্গে রবীনের কাঁধের উপর স্নেহসূচক এমন একটা চাপড় এসে পড়লো যে রবীনের মনে হোল কাঁধে যেটুকু রক্ত ছিল তাও যেন পায়ের দিকে ঝন ঝন শব্দে নেবে যাচ্ছে।

অন্য সময় হ'লে রবীন রাগ করতো, এখন কিন্তু বন্ধুর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলে গ্যালো, সে বললে—তোর কথাই ভাবছিলুম সুরেশ।

—একেবারে আমারই কথা? কেন বল দেখি?

—একটু বিপদে পড়েছি ভাই, একটা মতলব দিতে পারবি?

—মতলব চাই বললেই কি পাওয়া যায় নাকি? আগে ব্যাপারটা বল্, বুঝি, বিচার করি, তবে তো মতলব!

—সে অনেক কথা, এখানে বলার সুবিধে হবে না, একটু চল্, হরিশপার্কে বসে কথা হবে'খন।

—বেশ চল।

দুজনে গ্যালো হরিশপার্কে।

একটু ফাঁকা দেখে ঘাসের ওপর বসে রবীনের প্রেমকাহিনী সুরু হোল। গোড়ার দিকে কয়েকটি দীর্ঘ নিশ্বাস দিয়ে আরম্ভ, শেষের দিকেও কয়েকটা। অকস্মাৎ কি করে রেখার সঙ্গে রবীনের একদিন পরিচয় হোল। ধীরে ধীরে সে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে রেখার ধারণা পরিবর্ত্তনের কথাও রবীন বল্‌লে, বাদ দিলে না কিছুই।

কাহিনী শেষ করে শেষে রবীন বল্‌লে—এখন ভাই কি করবো বল দেখি, একটা যুক্তি দে!

এসব দিকে সুরেশের মাথা খুব ধারালো। মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ সে শুনছিল, এবার বল্‌লে—হুঁ, দেখ সত্যিকারের য়্যাডভেঞ্চার কিছু না করতে পারলেও, মেকী একটা য়্যাডভেঞ্চার দেখিয়ে ওকে মুগ্ধ করতে হবে। আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে, যদি করতে পারিস্, তাতেই হবে—

সুরেশের ফন্দীটা কি জানার জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রবীন তার মুখের পানে তাকালে।

সুরেশ বল্‌লে—সাঁতার জানিস?

—হ্যাঁ।

—তবে শোন, বলে সুরেশ সুরু করলে তার বুদ্ধির কথা। আলোচনা চললো কতক্ষণ।

শেষে, মতলব ঠিক করে রাত ন'টার সময় পার্ক থেকে দু'জনে বেরিয়ে এল।

কদিনের মধ্যেই রেখার সঙ্গে রবীনের ঘনিষ্ঠতা আগের চেয়েও নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

বিকালে রবীনকে না পেলে রেখার বেড়ান হয় না।

রবীনের কথাতেই শনিরবিবারের প্রোগ্রাম ঠিক হয়।

সেদিন বিকালে এসে রবীন কথা তুললে—কদিন ধরে মনে করছি রোয়িং করতে যাব, তা আর হচ্ছে না।

কথাটা রেখা যেন লুফে নিলে, উৎসুকদৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলে—কোথায়? লেকে?

—না আমি ভাবছি ইডেন গার্ডেনে।

—বেশ তাই চলুন, আমি রাজী।

চেয়ার ছেড়ে রেখা ওঠে আর কি। রোয়িংয়ের নামে তার ভারী আনন্দ। নৌকায় গিয়ে বসলে বাড়ি ফেরার কথা তার আর মনেই থাকে না। সাঁতার সে জানে না, আর জানেনা বলেই যেন নৌকা চড়ে জলে ভাসার আনন্দ তার অপরিসীম।

ইডেন গার্ডেনে এসে যখন তারা ঢুকলো, তখনো সন্ধ্যার অনেক দেরী। নৌকা ভাড়া

নিয়ে দুজনে উঠে বসলো। রবীন দাঁড় ধরলে, রেখা ধরলে হাল, নৌকা চললো।

ছোট্ট পুলটার নীচে দিয়ে যেতে যেতে এক পাশে দাঁড়ের ধাক্কা লেগে নৌকাখানায় একটা ঝাঁকানি লাগলো। রবীন বললে—আচ্ছা নৌকাখানা যদি উল্টে যায়, কি করবে বল দেখি ?

রেখা খিল খিল করে হেসে উঠলো বললে—এখানে আবার নৌকো ওলটানোর ভয়! জল আছে কতটুকু!

—ধরো, যদি ওল্টায় ?

—নেহাৎ যদি ওল্টায় তুমি তো আছ, তুলবে।

একটু চুপ করে থেকে রবীন বললে—আমি সাঁতার জানিনে।

—সাঁতার জানো না ?

রেখার কথায় অবজ্ঞার আভাষ ছিল, দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের রেশ একেবারে ছিল না বলা যায় না।

সংক্ষেপে রবীন উত্তর দিলে—না।

জলের ধার দিয়ে একটী লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গ্যালো। রবীনের চঞ্চল দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই উজ্জল হয়ে উঠলো—সুরেশ তাহ'লে এসে পড়েছে।

মুখ ফিরিয়ে রেখার মুখের পানে রবীন তাকালে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে সুরু করলে—সূর্য্যের লাল রোদটা পড়ে তোমায় চমৎকার দেখাচ্ছে রেখা ?

—সত্যি ?

রেখা মৃদু হাসলে।

—সত্যি! তোমার পানে তাকিয়ে থাকতে আমার বড় ভালো লাগে। তোমায় পাবার জন্ম আমার কত আগ্রহ কিন্তু তুমি তো রাজী হ'লে না। ফিল্মের আদর্শটাই তোমার কাছে সত্যি হোল, আমার আগ্রহ-অনুরাগ হোল মিথ্যে।

শেষের দিকে রবীনের গলার স্বর ভারী হয়ে গ্যালো, একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দও যেন রেখা শুনলে, একটী তরুণের এমন ধারা আত্মনিবেদনে সব মেয়েরই খুসী হওয়া স্বাভাবিক, রেখাই বা হবে না কেন। তার মুখের মৃদু হাসিটী আগের চেয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো, সে বললে—সত্যি তুমি আমায় ভালবাস ?

—এখনও তোমার সত্যি মিথ্যের বিচার? প্রমাণ করার সুবিধা থাকলে প্রমাণ দিতুম। কি না আমি করতে পারি তোমার জন্য। পরীক্ষা করতে চাও, বল, তোমার একটী কথায় আমি জলে লাফিয়ে পড়তে পারি। সাতার জানি না, নাই বা জানলুম—তোমার জন্ম সবই আমি করতে পারি রেখা!

—পারবে ? বেশ পড়তো দেখি লাফিয়ে, কেমন পার দেখি ?

—তোমায় পাবার জন্ম আমি সব করতে পারি, জীবনের মায়াও করি না। তুমি কথা দাও শুধু, এখুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছি—

রবীন জামা খুলে ফেলার উপক্রম করলে।

রেখাও পিছু হটার পাত্রী নয়, বেশ, কথা দিলুম।

রবীন আর দেরী করতে পারলো না, জামা-কাপড় খুলে গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়্যার শুদ্ধ নৌকো থেকে জলে লাফিয়ে পড়লো। ক'বার ডুবলো, ভাসলো, শেষে হাত-পা ছুড়তে লাগলো, যেন এই ডুবলো বলে।

রবীন যে সাঁতার জানতো না তা নয়, তবে রেখাকে রাজী করার জন্ম সুরেশের সঙ্গে পরামর্শ করে এই চালটী সে চাললে।

এদিকে রেখা তো স্তম্ভিত হয়ে গ্যালো।

ব্যাপার দেখে চোখ দুটী বড় বড় হয়ে উঠলো। ওদিকে লোকও জমে গ্যালো ক'জন। কি যে করবে রেখা কিছুই বুঝলে না। তার একটী কথায় যে অমন অনর্থ ঘটতে পারে সে অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

ওদিকে সুরেশ তৈরীই ছিল। ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল। জামা-কাপড়টা খুলে জলে লাফিয়ে পড়লো। সাঁতরে রবীনের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে টেনে আনলে। তীরে এসেই রবীন ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো। হয়তো বা এখুনি জ্ঞান হারাবে। সুরেশ তার বুকটা খানিক ডলে দিতে তবে সে উঠে বসে।

এদিকে রেখা ততক্ষণে একা একা দাঁড় টেনে নৌকা ডাঙ্গায় ভিড়িয়েছে।

কাপড় জামা পরে নিতে বেশীক্ষণ লাগলো না।

ভিজে পরিধেয়গুলো একটা রুমালে বেঁধে নিয়ে সুরেশ যাবার উদ্যোগ করে বললে—নৌকাখানা মালির জিম্মায় দিয়ে, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন, নাহলে এখুনি হয়তো পুলিশ এসে পড়বে, কৈফিয়তের তখন আর শেষ থাকবে না, থানাতেও নিয়ে যেতে পারে।

রেখা বললে—আপনি চলুন একটু আমাদের সঙ্গে এতটা করলেন, আর একটু···

—বেশ চলুন, আমার কোন আপত্তি নেই।

পুলিশ আসার নামে রেখা একটু ভয় পেয়েছিল, বল্লে—নৌকা এখানেই থাক, জমা দেবার হাঙ্গামায় আর দরকার নেই, মালী ঠিক খুঁজে নেবে এখন।

—বেশ, সেই ভালো।

তিনজনে বাগানের বাইরে এল।

রেখা বললে—একখানা ট্যাকসি করবো রবীনবাবু?

রবীন মনে মনে হাসলে, বললে—না, ট্যাক্‌সির দরকার নেই, এটুকু পথ আমি হাঁটতে পারবো, ওই মোড় থেকে বাস্ ধরলেই চলবে।

সুরেশ তার কথায় সায় দিয়ে বললে—আর এখন খানিকটা হেঁটে যাওয়াই আপনার দরকার। ডুবে জলটল খাওয়ার পর খানিকটা বেড়ানো আপনার পক্ষে ওষুধের কাজ করবে।

রেখা বললে—বেশ, তবে তাই চলুন।

যেতে যেতে সুরেশ রবীনকে প্রশ্ন করলে—আপনি কি খুব দুর্ব্বলতা বোধ করছেন? পেটের মধ্যে জল ঢক্ ঢক্ করছে বলে মনে হচ্ছে?

—না, তেমন তো কিছু এখনও বুঝতে পারছি নে।

—তাহলে আপনার কিছুই হয়নি, বাড়ি গিয়ে একটু ব্রাণ্ডি খেয়ে শুয়ে পড়বেন, কাল সকালে উঠে দেখবেন একেবারে চাঙ্গা হয়ে গ্যাছেন!

রেখা বললে—আপনি না সাহায্য করলে কি হোত বলুন দেখি! আপনি না লাফিয়ে পড়লে রবীনবাবুকে আজ ডুবে মরতে হোত। আপনি কি উপকার যে করেছেন কি বলবো!

রেখা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। একটা লোককে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেও একটা প্রশংসার দাবী করে না, প্রশংসা করলেও লজ্জিত হয়, এই তো সত্যিকারের মানুষ। না হলে অতলোক তো দাঁড়িয়ে দেখছিল, কেউ তো জলে লাফিয়ে পড়লো না। তাদের মধ্যে একা সেই শুধু মজা দেখতে আসেন, সত্যিকারের মনুষ্যত্ব আছে তারই মধ্যে।

রবীন আর সুরেশ পাশাপাশি চলছিল, একেবারে অপরিচিতের মত, কোনদিনই যেন পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

চৌরঙ্গীর কাছাকাছি এসে সুরেশ বললে—

এবার বোধ আপনারা যেতে পারেন, বলেন তো আমি ফিরি—

রেখা বললে—তা কি হয় কখনো, আপনাকে অত সহজে আমরা ছাড়তে পারবো না, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—

—আপনাদের বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—না না, তা হয় না, এ আপনার বাড়াবাড়ি।

—বাড়াবাড়ি কিছু না, চলুন তো এখন, আপনাকে অত সহজে আমরা ছাড়ছি নে।

এখানে কোন আপত্তিই টিকবে না দেখে সুরেশ চুপ করলে। তিনজনে ডবল ডেকারে গিয়ে উঠলো।

একমাস পরের কথা।

এ'ক' দিন রেখাকে নিয়ে সুরেশ আর রবীনের মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার চলছিল।

রবীনের ভরসা ছিল, রেখার আত্মত্যাগের পরীক্ষায় রবীন যে ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাতে রেখা তাকেই পছন্দ করে রেখেছে, তা সুরেশ তার কাছে কতই যাতায়াত করুক না কেন। কিন্তু সেদিন রেখাদের বাড়িতে ঢুকেই সে দেখলে ড্রয়িংরুমের ভেতর সুরেশ এবং রেখা পরস্পর প্রায় মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। দুজনের চোখেই মোহের আবেশ। তার একখানা হাত ধরে সুরেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অস্পষ্ট শব্দে সচকিত হয়ে মুখ ফেরালে!

জানালা দিয়ে এ ব্যাপার দেখে আর অগ্রসর না হয়ে রবীন সরাসরি ফিরে গেল। মুখে একটাও শব্দ করল না বটে, কিন্তু তার মগজের ভেতর রক্ত চন্ বন্ করে উঠল।

মস্তিষ্ক স্থির হলে রবীন ঠিক করল, সে নিজেই এ বিভ্রাটের জন্ত দায়ী, কেন না চোরকে দরজা সেই-ই দেখিয়ে দিয়েছে, একটু বাহবা পাবার লোভে। উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। রেখাদের ওখানে আর কখনো যাবে না, শেষ পর্য্যন্ত এই হোল তার সিদ্ধান্ত।

এজন্ত রেখা দুঃখিত হয়েছিল কি না কে বলতে পারে?

প্রেমের কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রেণুকা সেদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কই গো, সেই যে সেদিন তুমি বললে, তোমার মার একটি ভাইঝি আছে, তাকে বিয়ে করলে রাজ-কন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে তার কি হ'লো ?'

প্রতুল বলিল, 'হবে আবার কি ! তিনি বলছিলেন, সেই কথাই তোমায় এসে বললাম।'

রেণুকা বলিল, বা-রে ! তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসে...তুমি ত' বেশ মানুষ !'

প্রতুল একবার রেণুকার মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইল। তাকাইয়া বলিল, 'প্রতিশ্রুতি ত' দিইনি। আর কেনই বা দিতে যাব ? আমি কি খেতে পাচ্ছি না, না আমার স্ত্রী নেই যে, আবার আর-একটা বিয়ে করতে হবে ?'

রেণুকা বলিল, 'আজ না হয় তোমার খাবার-পরবার অভাব নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ত' বলা যায় না, ধরো—তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হ'লো, আমি হয়ত রেগে তোমায় বলে' বসলাম—আমার সম্পত্তিতে বাবুগিরি তোমার চলবে না, তুমি আপনার পথ ছাখো। তখন কি করবে ?'

প্রতুল তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কী যে তুমি পাগলের মত বল রেণুকা, আমি এ সবের মানে কিছু বুঝতে পারি না। এই শক্ত শক্ত কথাগুলো আমায় তুমি মাঝে মাঝে কি জন্যে শোনাও বলত' ?

রেণুকা বলিল, ভবিষ্যতের জন্যে আমার ভাবনা হয় বলেই শোনাই। কত বিয়ে-করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ঝগড়া হয়েছে শুনেছি যে, তাই থেকে তাদের একেবারে চিরজীবনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আর আমাদের না হয়েছে বিয়ে, না হয়েছে কিছু, তা ছাড়া আমার বংশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার ওপর হঠাৎ একদিন তোমার বিতৃষ্ণা আসতে পারে ত ?

প্রতুল তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

'অমন করে তাকাচ্ছ যে ?'

প্রতুল বলিল, 'বল বল, বলে যাও, থামলে কেন ?'

রেণুকা বলিল, না না, হাসির কথা নয়, আমি সত্যি বলছি। শেষ জীবনে এমনি একটা কিছু হওয়ার চেয়ে আগে থেকেই সাবধান হয়ে থাকা ভালো। তার চেয়ে বেশ ত' হাতের পাঁচ আমি ত' রয়েইছি, তার ওপর আর একটা বিয়েও করে' রাখলে, বিষয়-সম্পত্তিও পেলে, বাস্, আমার

সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি যেদিন হ'লো সেই দিনই তুমি চলে গেলে তার কাছে…

প্রতুল বোধকরি রহস্য করিয়াই তাহার বাকি কথাটা শেষ করিয়া দিল। বলিল, 'আর তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের সুনাম বজায় রাখবার জন্যে মায়ের পন্থা অনুসরণ করলে! কেমন? এই ত?'

রেণুকা বলিল, 'সে আমি তখন যাই করি না, তোমার ত' কিছু দেখবার দরকার হবে না। বিয়ে করা স্ত্রীও নই যে তোমার সম্মানের হানি হবে।'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু তোমার বলবার আছে?'

রেণুকা হেঁটমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতুল বলিল, 'তাহ'লে আমার কথা শোনো। তুমি আমার বিয়ে-করা স্ত্রী নও, তোমার বংশপরিচয় আমি জানি, তুমি অতি নীচ, তুমি ঘৃণ্য, তুমি অস্পৃশ্য, তুমি—তুমি যা কিছু সব, কিন্তু তবু তুমি আমার—তুমি আমার কী তা আমি তোমায় মুখের কথায় কেমন করে' বোঝাব রেণুকা!'

এই বলিয়া তাহাকে সে তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার সুচারু দুই ওষ্ঠপুটে, আরক্তিম গণ্ডে এবং তাহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র বারম্বার চুম্বন করিয়া করিয়া তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমায় আমি বহুবার বলেছি, আবার আজও বলছি রাণী, তোমার সন্দেহ বৃথা, তোমায় আমি চিরদিনই ঠিক এমনি ভালই বাসব।'

তাহার পর রেণুকার মুখখানি প্রতুল তাহার দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকপানে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া আবার বলিল, 'এ মুখ আমার কাছে জীবনে কখখনও পুরণো হবে না রেণু। তোমার এই মুখখানির পানে দিবারাত্রি একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।''

রেণুকা ঈষৎ হাসিল। সে বড় সুন্দর হাসি। যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝাইবার উপায় নাই। বলিল, 'আমার এ মুখ-এমনটি চিরকাল থাকবে না গো!'

প্রতুল বলিল, 'না থাক্, তবু আমার ভালবাসা থাকবে।'

'যদি না থাকে?'

বারম্বার শুধু সেই এক প্রশ্ন! প্রতুল বোধ করি মনে মনে একটুখানি রাগ করিল। বলিল 'দ্যাখো, আমার ভালবাসার ওপর তোমার এত বেশি সন্দেহ যে, শুনে শুনে তোমারই ভালবাসার ওপর আমার কেমন যেন সন্দেহ জন্মে যাচ্ছে।'

রেণুকা বলিল, 'আচ্ছা তাই যদি হয় তাহ'লে কি করবে?'

'কি করব তা ঠিক জানিনে। তবে'—প্রতুল বলিল, 'তোমার ভালবাসা না পেলে সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন আর আমি বেঁচে থেকে কোনও সুখ পাব না। কি জানি হয়ত আত্মহত্যা করে' বসতে পারি।'

আত্মহত্যা!

রেণুকা হাসিতে হাসিতে কেমন যেন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলিল, 'যাঃও! সামান্য একটা মেয়ের জন্যে—তুমি পুরুষ মানুষ ··ছি! আমার মত এমন কত পাবে।'

হেমেন আবার আসিল। যাইবার সময় সে যাহাই বলিয়া যাক্, রেণুকা জানিত—সে আসিবে,

এবং ঠিক সেই সময় আসিবে যে সময় প্রতুল বেড়াইতে বাহির হয়। বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া থাকে কিনা তাই বা কে জানে!

রেণুকা তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

তাহার এই হাসি দেখিয়া হেমেন্দ্রনাথ প্রথমে একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, পরে অতি কষ্টে তাহার সে অপ্রস্তুতের ভাবটা জোর করিয়া কাটাইয়া রেণুকার কাছে একটুখানি আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'হাসছো যে?'

'আপনি' না বলিয়া তাহার এই 'তুমি' বলাটা রেণুকা যে লক্ষ্য করিল না তাহা নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়াই আঙুল বাড়াইয়া চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'বসুন।'

হেমেন কিন্তু বসিল না, রেণুকার আরও কাছে আগাইয়া গিয়া একেবারে তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন হাসছ বল আগে, তারপর বসব।'

রেণুকা সরিয়া দাঁড়াইল না। হাসি তখন তাহার থামিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই সুন্দর মুখের উপর হাসির আভা তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। বলিল, 'বলছি, বসুন না!'

হেমেন্দ্রনাথ, কি সাহসে জানি না, হাত বাড়াইয়া রেণুকার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'না, কেন হাসছিলে বল আগে।'

এবার রেণুকা তাহার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া নিজেও সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হাসছিলাম আপনার কাণ্ড দেখে।'

হেমেনের মুখখানি হঠাৎ যেন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, 'কি কাণ্ড দেখলেন? কই, কিছুই ত' আমি করিনি।'

'তুমি' ছাড়িয়া আবার 'আপনি'! রেণুকা মনে-মনে একটুখানি না হাসিয়া পারিল না। বলিল, 'কাণ্ড এমন বিশেষ কিছুই নয়। কাল যাবার সময় বলে গেলেন—আর আসব না, আজ আবার এলেন। এই!'

হেমেন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, 'ও, এই! এরই জন্যে এত হাসি! কিন্তু কই, আমি ত' আসব না বলিনি। বলেছিলাম, নাও আসতে পারি।'

রেণুকা বলিল, 'একই কথা।'

হেমেন বসিয়া বসিয়াই দুই হাত দিয়া চেয়ারটিকে রেণুকার দিকে অনেকখানি সরাইয়া আনিয়া মুখ বাড়াইয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত হাসিয়া চোখ দুইটার সে এক অদ্ভুত রকমের চেহারা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমি না এলে কি সুখী হতে রেণুকা?'

তাহার বলিবার ভঙ্গী, তাহার এই 'তুমি' সম্বোধন এবং নাম ধরিয়া ডাকা রেণুকার কাছে নিতান্ত অশোভন বলিয়াই বোধ হইল, কিন্তু তথাপি সে তাহার কোনোরূপ প্রতিবাদ না করিয়াই বলিল, 'না না সুখী নয়, না এলে বরং বরং দুঃখিতই হই।'

হেমেন্দ্রনাথ একগাল হাসিয়া বলিল, 'তা আমি জানি।'

বলিয়াই বেশ একটু গম্ভীরভাবে জাল করিয়া একবার চাপিয়া বসিয়া বলিল, 'মানুষের মনের কথা বোঝবার এক-আধটু ক্ষমতা ভগবান আমাদের দিয়েছেন রেণুকা, তাই সেটা বুঝতে আর বিশেষ কষ্টবোধ হয় না।

রেণুকা হাসিল না, প্রতিবাদও বরং তাহার সেই কথাটাকেই যেন সমর্থন করিতেছে এমন

ভাণ করিয়া হেঁটমুখে নিজের পায়ের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেমেন সাহস পাইয়া এইবার আবার একবার রেণুকার দিকে হাত বাড়াইল এবং নিতান্ত অতর্কিতে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের দুর্দ্দনীয় আবেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

রেণুকা মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা দ্বারপ্রান্তে তাহার নজর পড়িতেই দেখিল সেখানে প্রতুল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেণুকার হাতখানা সজোরে নিজের দিকে টানিয়া হেমেন বোধকরি তাহাকে জড়াইয়াই ধরিতে গেল, কিন্তু পশ্চাতে সহসা প্রতুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আচম্‌কা চমকাইয়া সে রেণুকার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি তখন তাহার শুকাইয়া গেছে, আপাদমস্তক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, কথা বলিতে গিয়া দেখে, গলাটি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে।

হেমেনের দোষ কি! প্রতুলকে সে একেবারেই দেখিতে পায় নাই।

ক্রমশঃ

পারের বাঁশী—

পঞ্চপুষ্পের সৌজন্যে

JUNO PRINTING WORK

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪০ | পঞ্চম সংখ্যা

বিশ্বম্ভর

ডাক্তার কার্ত্তিক শীল

চেহারাখানা জাঁদরেল গোছের—দেখিলে ভক্তির উদ্রেক হয়। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্বম্ভর বটব্যাল ঝিমিয়ে-পড়া লোহার দোকান খানি তুলিয়া দিয়া ডাক্তারী সুরু করিয়াছেন। ডাক্তার হইবার আশা তাঁর কোন দিনই ছিল না—তবে ভাগ্যলিপি নাকি এড়ানো যায় না, তাই এই দুর্গ্রহের সৃষ্টি! বিশ্বম্ভরের হঠাৎ এই দীক্ষার একটু ইতিহাস আছে, সেই কথাটাই বলি।.........

চৈত্রের উদাসী মধ্যা[illegible] একটু গরম পড়িয়াছে। একটু বিশ্র[illegible] বিশ্বম্ভর সবেমাত্র ভারী দেহখানি [illegible]য়াছেন, একটী উনিশ কুড়ি বছরের [illegible]কানের ভিতর অগ্র বাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ মশাই এখানে বেড়া দেওয়ার জাল পাওয়া যাবে? বলিতে বলিতে ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রুমালে মুখ মুছিতে লাগিল,—উঃ কি গরম পড়ে গ্যাছে! হাতে তার দুখানি বই ও একটী খাতা।

সুবৃহৎ বপুখানি ঈষৎ নাড়িয়া ত্রস্ততার সহিত উঠিয়া বিশ্বম্ভর তাহার বসিবার একটু ঠাঁই করিয়া দিলেন, হঁঃ বসুন, কি রকম সাইজের চাই আপনার?...খরিদ্দার শূন্যতার অঙ্ক নিঃশেষে খালি থাকিবেনা অনুভব করিয়া ঠোঁটের আগায় তাঁর প্রসন্নতার মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

—আর সাইজ? যাহোক্ একটা হলেই হলো মশাই। বড়ো বেটার যত ফন্দি! এই

প্রথমে কি এসব পারা যায় ? আপনি-ই বলুন্ না ?

যদি বা জুটিল আবার বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায় ভাবিয়া তাঁর গোলগাল মুখে বিষণ্ণ একটু হাসির রেখা টানিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, আমি আর কি বলবো বলুন ? বুড়োটী আপনার ?... মুখে তাঁর জিজ্ঞাসার চিহ্ন !

—কে আর ? বলেন কেন মশাই ? বেটা আমার শ্বশুরগিরি ফলাচ্ছেন ! তোমার কন্যাদায় উদ্ধার করে দিয়েছি আবার কি বাবা ? আমার 'ডিউটি' ত ঐখানেই 'ফিনিশ্'!—না এটা করো —ওটা করো—ওখানে যাও—এটা আনো ! আরে বাবা, আমি কি তোর মাইনে করা চাকর, আপনিই বলুন না, বাজে সময় নষ্ট করা উচিত ? এই দেখুন না, কম্পাউণ্ডারীটা প্রায় শিখে এনেছি—আর পরীক্ষার সময় ব্যাটার হুকুমজারি চলতে লাগল ! কি বলতে হয় ?

মৃদু হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, এতে আর বলবো কি বলুন ? তবে একটা জিনিষ, আমি দেখচি আপনি সম্পর্কটা আশ্চর্য্যি সড়গড় করে নিয়েছেন ! দোষের কিছুই নয়—বাপ ত ছেলেকে আদর করেই 'বাবা' বলেন ?...আজ অনেকদিনের পুরোনো একটা কথা মনে পড়ে গেল, কিছু মনে করবেন না। তখন আমরা বোধ হয় আপনাদেরই মত,— আমাদের গলিটায় একটা ক্যাম্বিসের বল নিয়ে ক'টী বন্ধুতে মিলে খেলা করছি—ভরা দুপুর—ভট্‌চায্যি মশাই সরু দাওয়া টুকুনে বসে আরাম করে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ তামাক টানছেন, এমন সময়ে বছর চব্বিশের তাঁরই ছেলে—বেশ ফিট্‌ফাট্ সাজ—দিব্যি 'তয়ের' হয়ে এসে বাপের মুখখানা হুঁকো থেকে সরিয়ে চিবুকটা ধরে বলে উঠল,—কি বাবা চাঁদ, বসে বসে তোয়াজ করচ ? ভট্‌চায্যি ত চটে খুন ! এতগুলো ছোট ছোট ছেলের সামনে এই কাণ্ড ! বিষম চীৎকার করে বলে উঠলেন,—উঃ, মুখ দিয়ে বিষ্ঠার গন্ধ বেরুচ্ছে ! হতভাগা কুলাঙ্গার, দূর হ' আমার সামনে থেকে—দূর হয়ে যা !

গুণধর পুত্র বিকৃতস্বরে হাত নেড়ে হেঁকে উঠল, চুপ্ রও বেটা—খেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ মাৎ ! তুমি আর ক'দিন বাপধন ? দুদিন বাদে চোখটী বুঁজুলে সব আমারই ত মাণিক !...

বুড়ো লজ্জায় কথা বলতে না পেরে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। মদের মুখেই হোক্ আর যাই হোক্, সেই তার দেখে'ছলেম তেজস্বিতা, আর বহুদিন পরে আজ দেখলেম আপনার ! একদম 'স্মুথ্লি' চলে যায়—একটুও বাধে না !

বিজ্ঞের মত হাসিতে হাসিতে কিশোরটী কহিল,—ব্যাটার বুদ্ধি যে আর হবে কবে, তাই ভাবি।

—তা ভাববার কথা বৈকি ! তাঁরা বোধ হয় আপনাদের মত 'এডুকেটেড' পড়েন নি !

প্রীতহাস্যকণ্ঠে যুবক কহিল, সে বা বলেছেন ! শুনেছি ত 'ফিপ্‌থো কেলাস্,' তারপর—

বিস্ময়ের সুরে বিশ্বম্ভর কহিলেন, এর ভেতর আবার তারপর আছে নাকি ? আচ্ছা, আপনাদের ঐ ডাক্তারী শিখতে ক'টা পাশের দরকার হয় মশাই ?

—সে, যে যেমন পড়ে। কেউবা দুটো পাশ করে শেখে, কেউবা আবার বি এস্-সি পাশ করে-ও যায়।

—তাহ'লে আপনি— !

—আজ্ঞে, আমি ম্যাট্রিক ষ্টাণ্ডার্ড অবধি।

—ওঃ, টেষ্ট দিয়ে ইচ্ছে করেই আর 'এ্যাপিয়ার' হয়নি বুঝি ?

ঈষৎ লজ্জামাখাকণ্ঠে উত্তর হইল, না, ফোর্থ-ক্লাসে পরীক্ষার সময় আমার টাইফয়েডের মত

উগ্র জ্বর হোল, কিছুতেই উঠতে পারলেম না! ছেলেরা বলে সে বছর আমারই 'ষ্ট্যাণ্ড' করবার কথা! সে যাক্, সবই বরাত মশাই, য-ই বলুন।

একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, দুচারটে 'পাশে'র নাম শুনেই ভড়কে গিয়েছিলেম, এখন দেখচি ত'হলে আমাদেরও আশা আছে! কি বলুন?

—কি? আপনি ও ডাক্তারী শিখতে চান নাকি? তাহ'লে এই দোকান?

—বাধা-ই বা আছে কি? আপনিই যদি অনুগ্রহ করে হপ্তায় দু এক দিন—। দোকানও এদিকে চলুক না! ··

মিনতির ভাণ করিয়া যুক্তহস্তে যুবকটী কহিল,—না মশাই, আমায় মাপ করবেন আমার 'টাইম' ভারী 'শর্ট'। ইচ্ছে থাকলে, ও আপনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন।

—নিজেই পারবো? কিন্তু পরীক্ষার সময়?

মৃদু হাসিয়া কিশোরটী কহিল, ক'লকাতায় টাকা ফেললে কি-না হয় মশাই? ও সব—

পরম পুলকিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, এঁ্যা! বলেন কি? একদম না পড়েই ডাক্তার?···এঁ্যা!...বলি শেষ অবধি হাতে দড়ি পড়বার সম্ভাবনা নাই ত?...

• • দীর্ঘ পাঁচটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর অনেকগুলি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া বিশ্বম্ভরের জীবন জগতে! তিনমাস যাইতে না যাইতে উত্তরোত্তর দোকানের অবনতি দেখিয়া একদিন সত্যই তিনি একটী কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে একখানি বই লইয়া উপস্থিত হইলেন। ছবিগুলি দেখিতে মন্দ লাগিল না কিন্তু যত মুস্কিল হইল বিদ্‌কুটে নামগুলি লইয়া, উচ্চারণ করাই দুরূহ! কী অদ্ভুত বানান!···

হঠাৎ একদিন তাঁর নিয়মিত তাম্রকুট সেবনের খরিদ্দার কালাচাঁদ অসময়ে আসিয়া পুস্তক সমেত হাতখানি ধরিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা ডুবে ডুবে জল খাওয়া? কেবল নভেল চালাচ্ছ? এতে আর উন্নতি হবে কোত্থেকে!...

তাহাকে বাধা দিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, শেষে কি এটাকে নভেল্ ঠাওরালে নাকি? দেখ' দিকি? একটী পেট ডিসেকসান্ করা ছবি বাহির করিয়া দেখাইলেন।

ঈষৎ নাড়াচাড়া করিয়া বিস্ময়ের সুরে কালাচাঁদ বলিল,—এঁ্যা, এ যে দেখচি মড়ার মাথা! তুমি কি ডাক্তারী শিখচ নাকি?... বিশ্বম্ভরের ওষ্ঠে প্রসন্নতার হাসি!

—তা ভাল, কিন্তু তা এতে বড় ই হাঙ্গাম— ওষুধের ডোজ একটু এদিক ওদিক হলে রোগ রুগী দুই-ই সাবাড় হয়ে যাবে; তার চাইতে বাবা হোমিওপ্যাথি শেখো। দিব্যি ফোঁটা ফোঁটা চালাও—লম্বা লম্বা লেক্‌চার মারো—আর আলমারী কে আলমারী ফাঁক্ করিয়ে দাও, কিছুই হবে না।

হিতোপদেশ দিয়া কালাচাঁদ চলিয়া গেল।

...হইল ও তাহাই। এইঘটনার পরে আরো বৎসর খানেক চলিয়া গিয়াছে। 'কম্পাউণ্ডারী শিক্ষার' সাহায্যে বিশ্বম্ভর অবসর পাইলে দরিদ্র বেচারাদের এখন কষ্ট মোচন করিয়া থাকেন।

রামের কোলের ছেলে খাঁদা আজ কয়দিন কোষ্ঠবদ্ধতায় বড় কষ্ট পাইতেছে। বিশ্বম্ভর তৈল মর্দ্দনে ব্যস্ত। একটী পাঁইট বোতল হাতে করিয়া রামের পরিবার নীরোদা সুন্দরী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল,—দাদাঠাকুর, খোকাটা ক'দিন বড় কান্‌ছে!

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,— বাহ্যে হয়নি বুঝি?

নীরোদা ত অবাক্। উঃ! ডাক্তারের কি

আশ্চর্য্য ক্ষমতা! এমন গুণী পাশে থাকিতে সে তাঁহার কদর বুঝে নাই! গলবস্ত্র হইয়া তৈল-সিঞ্চিত বিরাট পা দুখানির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিল,—এজ্ঞে না দেখেই যা ধরেচ দা'ঠাকুর! আজ ছদিন মোটে বাহ্যি করেনি।

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বিজয়গর্ব্বের প্রফুল্ল হাসিতে মুখ ভরিয়া ঠাকুর কহিলেন, হুঁ-হুঁ! আচ্ছা যা, বামুনীর কাছ থেকে দোক্ত কলমটা নি' আয়। প্রেসক্রপসান লিখে দিচ্ছি।

দুই আনার-ও কম দরের 'প্রেসক্রপসন্' করিলে ইজ্জত থাকিবে না অনুভব করিয়া গোটা গোটা অক্ষরে মাত্র দু আনার 'ম্যাগ সালফের' ব্যবস্থা দিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, সবটা জলে গুলে আধ ঘণ্টা অন্তর আধ পোয়া-টাক্ করে খাওয়াবি। খানিকটা ঝেড়ে বাহ্যে হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু মল জমেছে।

এত অল্পে কাজ মিটিল দেখিয়া নারোদার ভারী স্ফূর্ত্তি! হাঁ, ডাক্তার ত আমাদের দাদাঠাকুর!—যেমন দেবতাদের মত 'ভারিক্কি' চেহারা! তেমনি সস্তা বাস্তা!—

···কিন্তু এক ডোজ ঔষধের পরেই যখন খাঁদা দুই মিনিট অন্তর পায়খানার শরণাপন্ন হইতে চাহিল, তখন নারোদা মনে মনে বিষম ভীতা হইল। বার দশেক দাস্তের পর আর তাহার নড়িবার শক্তি রহিল না।···

বিশ্বম্ভর তখন খাইতে বসিয়াছেন, নারোদা আসিয়া উপস্থিত,—দা'ঠাকুর, ও যে হরদম্ বাহ্যি করছে—এখন বন্ধ না করলে যে মারা পড়বে!

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোদের সব তাতেই বাপু তাড়া। তখন বাহ্যে হচ্ছিল না, ওষুধ দাও, এখন বাহ্যে হচ্ছে, তবু ওষুধ দাও। ওষুধ ত আর ছিপি নয়, যে টুক্ করে একটা দিয়ে দেব, গিয়ে এঁটে দিবি? বলি, পেট বেশ ঝেড়ে সাফ হয়ে গেছে ত?

—আজ্ঞে তা ত—, তবে একেবারে শুয়ে পড়েছে।

—শুয়ে পড়বে না ত' অসুখে তোর ছেলে লাফাবে নাকি?

না: লাফাবে কেন!—কথা ত বলবে?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া ব্যস্ত কণ্ঠে বিশ্বম্ভর কহিলেন, বলি ফি'টি দিতে পারবি ত? চল্ একবার নাড়ীটা দেখেই আসি। এই গমনে কিন্তু দুটো টাকা দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি!

অনেক কাকুতির পরে আট আনায় রফা করিয়া নারোদা প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বিশ্বম্ভরকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞান, মুমূর্ষু অবস্থায় খাঁদা মল, মূত্র এবং রক্তে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিশ্বম্ভর প্রমাদ গণিলেন। চিকিৎসাযজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াই এত বড় বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইবে, তিনি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, হুঁ, পাকস্থলীতে এই বদরক্তগুলো জমছিল; সব বেরিয়ে গেছে দেখচি। আচ্ছা চটপট্ চল, একটা প্রেসক্রিপ্সান্ করে দিই গে।···কোন প্রকার অজুহাত করিয়া পলাইয়া তিনি স্বস্তি অনুভব করিলেন—যাকগে না হয় আটগণ্ডা পয়সা!···

কিন্তু জননী হৃদয়! পুত্রকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে নারোদার মন সরিল না! প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তার শত আহ্বান, অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া খাঁদা চিরতরে থামিয়া গেল।

** সেইদিন হইতে বিশ্বম্ভর হোমিওপ্যাথির গোঁড়া ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাবা, কাজ নেই ঐ সর্ব্বনেশে চিকিৎসা করে!

কিন্তু ইহাতে-ও সুবিধা হইল না। একেই নূতন ডাক্তার, তাহার উপর বাজারে বহুদিন পর্য্যন্ত "লোহার দোকানের বিশুঠাকুর" নামে পরিচিত থাকায়, তাঁহার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। লোহার দোকান হইতে দিনান্তে যাহা বা দুইচার আনা আসিত, এখন তাহা ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গৃহিনী বিনোদিনীর সহিত এই লইয়া নিত্য কলহ বাধে, তাহ'লে আমরা চুরি ক'রব নাকি?

শেষে বিনোদিনীই সদ্যুক্তি দিলেন। এখানে এ-সব বুজরুকি চলবে না বাপু, ক'লকাতার লোক বাজিয়ে পয়সা দেয়। তার চাইতে চল' দেশে। ক'লকাতার ডাক্তার ব'লে একটা খাতির ও হবে, বিদ্যের দৌড়ও কেউ জানবে না! আর খাবার দাবারের কষ্টটা মূল্যেটার অভাব হবে না। মাস মাস পনর টাকা ক'রে বাড়ী ভাড়াটা ও ত বাঁচবে?...দশ বছরের মেয়ে গলায়; ওটাকে-ও ত পার করতে হবে?...ডাক্তারের মেয়ে ব'লে, পল্লীগ্রামে ওর ও একটা কদর হবে।...

প্রায় পনর বৎসরের সহর প্রীতি ত্যাগ করিয়া একটি শুভ দিনে সস্ত্রীক বিশ্বম্ভর নিজগ্রাম বারুই-পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন নিজ দেশের ফলে বাসাবাটীখানি একেবারে জরাজীর্ণ হইয়াছিল, নগদ পাঁচটী টাকা খরচ করিয়া তাহা নূতন করিয়া ছাওয়াইয়া লইলেন।

বিনোদিনীর কথাই বর্ণে বর্ণে ফলিতে লাগিল। কলিকাতার ডাক্তার, আসিয়াই বিশ্বম্ভর অনেক গুলি ঘর কায়েমি করিয়া লইলেন। কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু কিছু উপায়-ও হইতে লাগিল।

এই ভাবে আরো কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দশবৎসরের কন্যা শান্তি এখন চতুর্দ্দশে পা দিয়াছে—সারা অঙ্গে তার যৌবনের উন্মেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বম্ভর প্রথম প্রথম কিছু উপায় করিলে ও, অল্প বিদ্যা বা হাত যশের অভাব যে কোন কারণে হোক, শীঘ্রই পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার উপর ইদানীং বাসুলডাঙ্গা হইতে একটা গোসাই আসিয়া পাশের গ্রামে ভৌতিক পদ্ধতিতে জল পড়া ইত্যাদি দিয়া বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা সুরু করিয়া দিয়াছে। কাজেই এখন, দুচার ঘর গোয়ালা কৈবর্ত্ত ছাড়া আর কেউ বড় একটা চিকিৎসার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হয় না। তাহাদের নিকট হইতে গাছের দু'একটা টাটকা লাউ কিংবা এক আধখানা দই এইভাবের ছাড়া পারিশ্রমিক ও পাওয়া যায় না। কন্যা বড় হইতেছে—আর রাখা যায় না, এই লইয়া গৃহিণীর সহিত নিত্য বচসা হয়।

দেশে আসিয়া বিশ্বম্ভরের আর একটী উপসর্গ জুটিয়াছে—বাগদী পাড়ার মন্মথ। ডাক্তার মশায়কে নানাপ্রকার অকাট্য যুক্তির দ্বারা সে বুঝাইয়া দিয়াছে, ঠিকমত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে বা মাথা সাফ্ রাখিতে হইলে শুধু তামাকে সুবিধা হয় না—দিনে অন্ততঃ দুইবার 'বড় তামাক' সেবন করা প্রয়োজন।

শুনিতে শুনিতে শুনিতে এবং চিকিৎসা বাজারে ক্রমান্বয়ে অবনতি লক্ষ্য করিয়া শেষে সত্য সত্যই মন্মথকে লইয়া মাথা সাফ্ রাখিতে তিনি 'রাজা তামাকের' দিকে মনোযোগ দিলেন।

পয়সা লইতে গিয়া একদিন বিনোদিনী পকেট হইতে কালরং-এর ছোট কলকাটী আবিষ্কার করিয়া স্বামীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্যা সংবাদ দিল, বাহিরের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া পিতা মন্মথ কাকার সহিত কথা

কহিতে যাও। অতিষ্ঠ হইয়া বিনোদিনী রণাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন, বেলা দেড়টা বাজে, এখনো নাইবার খাবার সময় হয়নি?

আরো দশ পনর মিনিট পরে দ্বার খুলিতেই একরাশ ধোঁয়া দেখিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া মাথা চাপড়াইতে সুরু করিলেন,—এঁ্যা এই সব ছাই পাঁশ খেয়েচ? মন্মথ মহা অপ্রস্তুত হইয়া পলাইবার জন্য ফাঁক খুঁজিতে লাগিল।

স্বামীই শান্ত করিলেন—না গো না, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, আজ সকালে শিবের পুজো দিয়ে এসেচে, তাই একটু—। এখন পরামর্শ হচ্ছিল. কিভাবে 'প্র্যাকটিসটা' জোর করা যেতে পারে —ও'দিকে শান্তুকেও একটা পাত্রস্থ ত করতে হবে?

বিনোদিনী কহিলেন,—কি ঠিক হোল?

একটু হাসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিলেন,—দেখ না একটা ঢিলে দুটো পাখীই মারছি।—গোঁসায়েরও ফাঁকিবাজী ভাঙবো, মেয়েটারও একটা বড় পাত্রে বিয়ে দেব।

—সে কি গো?—সে কি করে হবে?

—হবে হবে। শুধু দেখে যাও।

মন্মথদের অবিনাশ আজ কয়দিন জোরকণ্ঠে প্রচার করিতেছে ললিত গোঁসাই: মানুষ নয় —দত্যির অংশে ওর জন্ম। তাই শুধু ঝাড়ফুঁক দিয়েই রোগ আরাম করে!

এদিকে বিশ্বম্ভর এক জমিদার পুত্রের সহিত শান্তির বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছেন। জনরব নগদ পাঁচ হাজার টাকা, দু সেট গহনা, রৌপ্যপাত্র দান সামগ্রী এবং উচ্চ দরের খাট বিছানা শয্যাদ্রব্য উপঢৌকন দিতে তিনি নাকি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পাত্রের পিতা দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। ভাবী বৈবাহিকের নিষ্ঠা, এবং গুরুগম্ভীর আকৃতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে ততোধিক। তিনি আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন।...

সারা গ্রাম জুড়িয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—এঁ্যা, ডাক্তার ভেতরে ভেতরে এত টাকা করে ফেলেছে! পাত্তার ঘরে বাস করে ডাকাতকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়েছে!...উঃ, এ কি কম পাত্তর?...

আজ শান্তির বিবাহ। সকলেই আশা করিয়াছিল, এক সপ্তাহ ব্যাপী ডাক্তার বাড়ীতে ভোজ বাঁধা হইবে। কিন্তু রসুনচৌকির পর্য্যন্ত কোন সাড়া না পাইয়া সকলেই অল্প বিস্তর আশ্চর্য্য হইয়া গেল; মন্মথ, অবিনাশ ইত্যাদি জন কয়েককে লইয়া শুধু 'কমিটী' চলিতে দেখিয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল,—ডাক্তার চাপা মানুষ, এবার বোধ হয় নেমন্তন্নর 'লিষ্টি' তৈরী কচ্ছে।...

সকলকে শুনাইয়া অবিনাশ কহিল, তাহলে আমি চ'ললুম ডাক্তারবাবু, এর মধ্যেই ত জোগাড় করে ফেলতে হবে? আপনি ও তাড়াতাড়ি আসুন সকলের স্থির ধারণা হইল, বাজার পাট এইবার সুরু হইল।

বেলা দুইটায় একখানি টেলিগ্রাম লইয়া বিশ্বম্ভর, ও-পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ প্রতুল ভট্টাচার্য্যের প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখা দিলেন, ভায়া কি করি বলো দেখি? এ আমার পুরোণো ঘর, এতবড় একটা 'কেস্', না গেলেই নয়। এদিকে শান্তির আজ রাত ৯টার মধ্যে বিয়ের সব ঠিকঠাক্!

প্রতুলচন্দ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—আমায় কি করতে বলেন?

—কি আর? আমি যাবো আর আসবো। আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে একটা দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। বরযাত্রীদের একটু আদর আপ্যায়ন—বাজনাদারদের একটু বসবার যায়গা —এই আর কি!—আমি থাকলেও আমার কুঁড়েঘরে ওদের বসাতেম কোথায়? সেই এখানে আসতেই হোত। তাই-ই করবে আর কি!—সব জোগাড় করা থাকবে; মন্মথ, হরিপদ, গোবিন্দ ওরা সবাই রইল—ওরাই সব দেখে শুনে নেবে'খন। আর হাঁ, বলা ত যায় না!—যদিই কোন গতিকে সাতটার গাড়ী 'মিস' করি, তাহলে তোমার এখান থেকেই শুভ কাজটকু সম্পন্ন করে দিও। আমি যত শীগগির পারি চলে আসব। অস্থির হইয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন।

প্রতুলচন্দ্র কহিলেন,—আচ্ছা, তা না হয় হবে,—কিন্তু সম্প্রদানটা?

—হেঁ, হেঁ, তুমিও ত শাস্তর কাকা হও—

প্রসন্নকণ্ঠে প্রতুল কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা—আপনি কিন্তু খুব শীগ্গির চলে আসবেন!

একগাল হাসিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন,—সে আবার বলতে? একি সেই যার বিয়ে তার হুঁস নেই? হেঁ—হেঁ—হেঁ!

সত্বরপদে বাটীতে আসিয়া গৃহিণীকে চুপি চুপি কি বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মন্মথ বাহিরের ঘরে দ্বারবন্ধ করিয়া দম শুষিয়া শিবের উপাসনা সুরু করিয়া দিল।

সন্ধ্যা ছটার বর আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশনে মন্মথ ও প্রতুলবাবু যাইয়া বরপক্ষকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং হঠাৎ জরুরী 'কলে' চলিয়া যাওয়ার জন্য বৈবাহিক মহাশয়ের অনুপস্থিতির কারণও বলিলেন। বিশ্বম্ভরের অনুরোধমত আগন্তুকদিগকে বাটীতে আনিয়া যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। এমন সময়ে আজানু ধূলামণ্ডিত নগ্নপদে একটী প্রৌঢ় আসিয়া অঞ্চল হইতে চারিটী বন্ধন খুলিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া প্রতুলের হাতে দিল।

ভাই প্রতুল বাবু,

লোকে আমাদের স্বাধীন বলে কিন্তু আমরা যে কত পরাধীন তা আমরাই বলতে পারি। তোমার ওপর এই জুলুমের জন্তে আমায় ক্ষমা কোরো আর আমার অনুরোধ বেইমশাইকে এই পত্রখানি দেখিও।

যে কেসে এসেচি সেটী বড় সিরিয়াস্—এখনো রোগীর জ্ঞান হয় নি; হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা, কেবল গোঁয়াচ্ছে। ললিত গোঁসাই জলপড়া ইত্যাদি দিয়েছিল, কিছুই হয়নি। আমি ওষুধ দিয়েছি। আমার অনুরোধ, তুমি আমার জামিন্ হয়ে দুটী হাত এক করে দিও। সময়ের অনটনে শয্যাদ্রব্য দান সামগ্রী কিছুই কিনতে পারিনি। ভেবেছিলাম নগদ ধরে দেব। টাকা এবং গহনা সব মজুত আছে, চিন্তা নাই। কাল অতি প্রত্যুষে কিংবা আজই শেষরাত্রে পৌঁছে সব ব্যবস্থা করে দেব। বেহাইমশাইকে বুঝিয়ে বোল, উনি কিছু যেন মনে না করেন।

একান্ত বশম্বদ বিশু ডাক্তার।

পুঃ—

মন্মথ একলা মানুষ, তুমি ভাই একটু দেখে শুনে খাবারের যোগাড় করে নিও। যা খরচ লাগে সব আমি দেব।

* * অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই নাই! এই কেস্ যদি তাঁহার বাটীতে হইত?…অনেক কিছু চিন্তা করিয়া প্রতুলচন্দ্র নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে

ব্যস্ত হইলেন এবং হরদয়ালকে পত্রখানি দেখা'লেন।

প্রায় শতাবধি লোকের আয়োজন করিতে হইবে। মন্মথ বলিল, সের পাঁচেক গোল আলু আর দশ সের ময়দা ছটো বগী পরশু নিয়ে গেছে, মজুত আছে। ডাক্তার বাবু এসে টাটকা দাওদা করবেন বলে কিছু কেনা হয় নি।

প্রভুলাল নির্ব্বাক্! এ্যা বলো কি? এতগুলি ভদ্রলোককে বাটীতে ডাকাইয়া এভাবে অপমানিত করিতে তাঁহার মন সরিল না। নিজে চাকর, দরোয়ান ও অন্যান্য কয়েকজনের সাহায্য লইয়া তাহাদের পরিতৃপ্তি সহকারে সকলকে ভোজন করাইলেন।...

পরদিন সকাল গেল, দুপুরও উত্তীর্ণ হয়, এখনো ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন না। বেলা সাড়ে তিনটার পর বারবেলা পড়িবে, তাহার পূর্ব্বেই যাত্রা করিতে হইবে, হরদয়াল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নগদ টাকা বা গহনা পত্র এখনো কিছুই পান্ নাই, শুধু দুগাছি শাঁখা হাতে দিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

তিনটা বাজিতে দশমিনিট বাকী—ডাকপিয়ন একটী 'তার' আনিয়া হরদয়ালের খোঁজ করিল। দস্তখত করিয়া তিনি কাগজখানি লইলেন:

'আমার বেয়াদবী মাপ করিবেন। এই অল্পক্ষণ হইল রোগীর জ্ঞান হইয়াছে। আজ শনিবার, রাত্রি বারোটার পূর্ব্বে ফিরিবার গাড়ী নাই, থাকিলে এখনই রওনা হইতাম।'

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে না পারিলেও মাঝে মাঝে মনে দ্বিধার উদ্রেক হইতে লাগিল। বহু চিন্তা করিয়া হরদয়াল প্রভুলবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর কিছু গহনা মাত্র একটী দিনের জন্য চাহিয়া লইলেন। বারবেলার পূর্ব্বেই তাঁহারা রওনা হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে অবিনাশকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভর যখন বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি ফিরিয়াছেন শুনিয়া প্রতুলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...কিভাবে কি সংঘটিত হইল কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বিশ্বম্ভর কহিলেন, কোন গোলমাল হয়নি ত? সব দেখ শুনলাম মাঝে মিটে গেছে? তা, ভায়া যখন আছো, হেঁ-হেঁ-হেঁ।...

বেলা তিনটার সময় প্রতুলবাবুর গহনা ফেরৎ দিতে এবং নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে হরদয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাক্তারখানা ঘরে বসাইয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, এই যে বেইমশাই আসুন, আসুন! প্রতুল ভায়া যে, এসো, এসো; ভালই হয়েছে, বোস।...তারপর বেইমশাই, কাল নিশ্চয়ই কোন ক্রটী হয়নি! আমার কোন অপরাধ নেবেন না কিন্তু! গলবস্ত্র হইয়া দৈবাগিকের উদ্দেশ্যে তিনি প্রণাম করিলেন।

দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর হঠাৎ উঠিয়া তিনি অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানি 'জর্ম্মান সিলভারের' রেকাবীতে নগদ পঞ্চাশটী টাকা এবং বিনোদিনীর বিবাহকালের নৎটী একটুকরা রঙিন্ সিল্কের কাপড়ে জড়াইয়া আনিয়া তাঁদের সম্মুখে রাখিলেন। হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমায় অনেক মাপ করেছেন আপনারা, আরো কিছু মাপ করতে হবে। খরচা খরচ বাদে বাহার বছরে এই পুঁজি জমিয়েচি—এই নিয়েই আমায় রেহাই দিতে হবে বেইমশাই! আজকালকার প্রগতির যুগে বরপণের বাহুল্য বর্জ্জন করাই ভাল। হেঁ-হেঁ-হেঁ!...

হরদয়াল ও প্রতুল চন্দ্র নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! এ বলে কি?...পরমুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষম ক্রোধভরে হরদয়াল কহিলেন, এ সব জোচ্চুরি কাণ্ড! জান, এই চিঠি দেখিয়ে তোমায় আমি জেলে পুরতে পারি?...প্রতুলকে লিখিত চিঠি খানি বাহির করিয়া তিনি দেখাইলেন।

গলদেশের কাপড়খানি ধরিয়া নম্রকণ্ঠে বিশ্বম্ভর কহিলেন, কিন্তু তাতে ত আপনার সম্মান বাড়বে না! কি করি বলুন, অভাবে স্বভাব নষ্ট, আর আমার 'শাস্তির' এই-ই বোধহয় ভাগ্য লিপি! নৈলে এমন ঘরে জন্মে আপনার বৌমা হয় কি করে?

ধমকের সুরে হরদয়াল কহিলেন, খুব ভনিতা হয়েচে থামো!—হিন্দু 'ল,' ত্যাগ করবার নয় তাই, তবে জেনে রাখো আজ থেকে জীবনে আর মেয়ের মুখ-ও দেখতে পাবে না।...রাগ ভরে তিনি বাহির হইবার জন্ম উঠিয়া পড়িলেন।

রেকাবিখানা কোলের দিকে টানিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে বিশ্বম্ভর কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি সে সুখী হোক্।...চোখের কোল দুটা ঈষৎ সিক্ত হইয়া উঠিল।...

কিছুক্ষণ পরে প্রতুলচন্দ্র মৌনতা ভঙ্গ করিলেন, তাহলে ডাক্তারবাবু, ওসব 'কল্' টল্ সবই বাজে, বলুন?

—না ভায়া, একদম বাজে নয়, তবে—

—কি রকম? আগ্রহের সহিত প্রতুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠে বিশ্বম্ভর কহিলেন, রকম আর এই পাপমুখে কি বলবো? ভেতর বাড়ীতে মন্মথ আছে, তার যুক্তি—তাকেই জিজ্ঞাসা করো।...

মন্মথ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞে, ও-আর কি শুনবেন? ললিত গোঁসাই-এর জলপড়ার বুজরুকি ভাঙবার জন্তে মন্মথদের অবিনাশকে একটা 'বোতলে'র লোভ দেখিয়ে ঠিক করেছিলুম। ওদের দেশের বাড়ীতে গোঁসাই-ই আজকাল 'খাড়কুক্' করছে কিনা? ঠিক হয়, 'মাথাটা কেমন করছে, একবার বিশু ডাক্তারকে দেখালে হোত' বলে সে ইচ্ছে করে অজ্ঞানের ভাণ করে শুয়ে গোঁঙাতে থাকবে। গোঁসায়ের জলপড়া খেয়ে তার গোঁঙানি আরো যাবে বেড়ে। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে ডাকা হবে এবং উনি গিয়ে শিশি থেকে দুফোঁটা জল খাইয়ে দেবেন, তাতেই অবিনাশ উঠে বসবে। তারপর মাথার কাছে গোঁসাইকে দেখে বলে উঠবে, এই সেই দত্যি! তোমার পাপেই।—' ভাড়া করা জনতা এই শুনে গোঁসাইকে মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার সুনাম আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ইত্যবসরে বিয়ের আয়োজন সম্বন্ধে যা করা হয়েছিল—আপনারা ত সবই জানেন! মাঝ থেকে ফাঁকতালে অতিথি নারায়ণের সেবা করে প্রতুলবাবু কিছু পুণ্যি সঞ্চয় করে নিলেন।

...মন্মথ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

তাহার কথা শুনিয়া চোখ কপালে তুলিয়া প্রতুলচন্দ্র ও হরদয়াল বিহ্বল দৃষ্টিতে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন,—এ্যাঁ, তোমরা বলো কি? তোমরা মানুষ? না ডাকাত!

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মন্মথ কহিল, আজ্ঞে, সে আপনাদের যা খুসী বলতে পারেন! তাইত দা'ঠাকুরকে বলি, একটু মাথাটা চড়িয়ে মাথাটা সাফ্ রাখা দরকার!...ঈষৎ থামিয়া বিশ্বম্ভরের দিকে ফিরিয়া একটু চাপাগলায় বলিল, —গোঁসাই-ও বিদি হয়েচে, বিয়ে-ও হয়ে গেচে! আজ কিন্তু নগদ দু'আনা দিতে হচ্চে, এতে আর আপত্তি করলে শুনবো না, হাঁ!

প্রেমের কাহিনী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

হেমেন্দ্রনাথের নিজের আচরণের জন্য তাহার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথমতঃ সে ভাবিল, প্রতুল কিছুই বুঝিতে পারে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতি প্রতুলের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই জানে। তাই সে ঠিক অকুতোভয় শয়তানের মতই নিতান্ত ভাল মানুষের ভাণ করিয়া প্রতুলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে একেবারে ডুমুর ফুল হয়ে পড়েছ প্রতুল! তোমার ত' দেখাই পাবার জো নেই।'

হেমেনের সঙ্গে তাহার আজ কয়েকদিন পরে দেখা, অন্য সময় হইলে তাহাকে হয়ত সে বুকে জড়াইয়া ধরিত কিম্বা হয়ত তাহাদের কথা-বার্ত্তা গল্প আর শেষই হইতে চাহিত না, অথচ প্রতুল সেদিন কি ভাবিয়া যেন নিজেই নির্ব্বিবাদে বলিয়া বসিল, 'হ্যাঁ ভাই, কয়েকদিন ধরে' ভারি একটা গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।'

বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে-ছিল, আবার কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রেণুকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমার সেই জিনিসটা,—তুমি একবার আসতে পারো রেণুকা?'

তাহার এই ঔদাসীন্য হেমেন যে লক্ষ্য করিল না তাহা নয়। এবং লক্ষ্য করিয়াই বোধ করি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আজ আসি তাহ'লে।'

প্রতুল বলিল, 'আচ্ছা।'

হেমেন্দ্রনাথ মুখে তাহার শুষ্ক একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া রেণুকাকে একটি নমস্কার করিয়া যাইতেছিল।

প্রতুলের দিকে না তাকাইয়া রেণুকা বলিল, 'শুনুন!'

হেমেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ আপনাকেই।' বলিয়া রেণুকা আর প্রতুলের দিকে না চাহিয়াই বলিল,—'কাল রাত্রে এখানে আপনি খাবেন, নিমন্ত্রণ রইলো, বুঝলেন?'

হেমেন্দ্রনাথ একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া এই রহস্যময়ী নারীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে? আমায় এখানে খেতে হবে? কেন?'

রেণুকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! হাসিতে হাসিতে বলিল, 'খেতে হবে মানে খেতে হবে। কেন খেতে হবে সেকথা আপনি জানেন।'

'বেশ।' বলিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া হেমেন বাহির হইয়া গেল।

হেমেন চলিয়া গেলে রেণুকা প্রতুলের মুখের পানে তাকাইল। দেখিল, মুখখানা গম্ভীর। মনে হইল যেন ঝড় উঠিয়াছে। রেণুকা মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। সে তাহাই চাহিয়াছে।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকে নিমন্ত্রণ করলে?'

ঠোঁট দুইটা চাপিয়া হাসি বন্ধ করিয়া রেণুকা

বলিল,—'হ্যাঁ। কেন? কিছু অন্যায় হলো নাকি?'

প্রতুল তাহার মনের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'না, অন্যায় আর কি! অন্যায় কেন হবে? তবে তুমিই আগে বলতে—হেমেন তেমন ভাল মানুষ নয়। আমার কথায় ত' তুমি প্রতিবাদ করতে।'

রেণুকা বলিল, 'এখন যদি আবার সেই কথাটারই প্রতিবাদ করি! এখন যদি বলি —না, তোমার কথাই ঠিক। আমিই ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম,—তাহ'লে?'

প্রতুল চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছ? বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে এলে যে? কী তখন আমায় বলবে বলছিলে না?'

ঘাড় নাড়িয়া তেমনি গম্ভীরভাবেই প্রতুল বলিল, 'না কিছু বলিনি।'

প্রতুল সেদিন আর বাড়ী হইতে বাহির হইল না। মুখখানি অসম্ভব রকম গম্ভীর। মনে হইল কিসের যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

চিন্তাটা যে কিসের রেণুকা তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। বার-কতক সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছ?' কিন্তু প্রতুলের কাছ হইতে ভাল করিয়া তাহার জবাব না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রতুল তাহার লিখিবার টেবিলের কাছে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হেঁটমুখে চস্ চস্ করিয়া কি যে লিখিল, তাহার পর একটা বই খুলিয়া সে পড়িতে বসিল।

রেণুকাও একটা বাংলা নভেল লইয়া তাহার খাটের উপর শুইয়া পড়িল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই! নীরব নিস্তব্ধ সেই সুসজ্জিত গৃহাভ্যন্তরে দুই স্বামী স্ত্রী দুদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বই খুলিয়া বসিয়া আছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নরত এই দুই দম্পতীকে দেখিলে হাসি পায়। প্রতুল তাহার মুখের সামনে ইংরেজি বইখানি খুলিয়া ধরিয়াছে মাত্র, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া যাইতেছে, অথচ একটি পৃষ্ঠাও সে উল্‌টাইতেছে না।

ওদিকে রেণুকার অবস্থাও ঠিক তাই। প্রতুল সেদিকে একবার তাকাইলেই দেখিতে পাইত বইখানির মলাটের উপর সোনার জলে হেমেন্দ্রনাথের নাম লেখা। তাহারই রচিত সেই উপহার দেওয়া উপন্যাসখানি! রেণুকা বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই হেমেনের নাম-লেখা সেই ঝক্‌মকে মলাটের দিকটা প্রতুলের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। বইখানি পড়িবার কোন লক্ষণই তাহার নাই। বইএর পাতা সে-ও উল্‌টাইতেছে না। প্রতুল যদি বা একদৃষ্টে শুধু বইএর দিকেই তাকাইয়া আছে, রেণুকার দৃষ্টি কিন্তু চঞ্চল। বইএর পাতার আড়ালে মুখখানি লুকাইয়া সে শুধু ঘন ঘন প্রতুলের দিকে চুরি করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

এমনি নীরবে তাহাদের বহুক্ষণ কাটিল। চাকর আসিয়া খাবারের কথা বলিয়া গেল তবু তাহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

অবশেষে রেণুকাই হঠাৎ একসময় উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাবে? না আজ এমনি মন-ভারি করে' বসে বসেই রাত কাটাবে?'

প্রতুল তাহার হাত হইতে বইখানা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'হ্যাঁ দাও।'

খাবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য রেণুকা উঠিয়া গেল!

প্রতুলকে খাইতে বসাইয়া রেণুকা অন্যদিন তাহার সুমুখে বসিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন সে

অন্যদিনের মত তাহার সুমুখেও বসিল না, প্রতুল কি খাইতেছে না খাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানও করিল না। খাবারের ঘরে প্রতুলের ঠাঁই করিয়া দিয়াছিল চাকরে, রাঁধুনী আসিয়া খাবার ধরিয়া দিয়া গেল, প্রতুল খাইতে বসিল এবং তাহাকে বসাইয়া দিয়াই রেণুকা বলিল, 'আমার একটু-খানি কাজ আছে। আসছি।'

বলিয়া সে আবার তাহাদের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। প্রতুল ততক্ষণ তাহার টেবিলের কাছে বসিয়া বসিয়া কি যেন লিখিতেছিল। কি লিখিতেছিল তাহাই দেখিবার জন্য রেণুকা সেই টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এদিক ওদিক কাগজপত্রগুলা উল্‌টাইয়া পালটাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল--একখানি চিঠি ;—ঠিকানা লেখা খামের ভিতর বন্ধ। তাড়া-তাড়ি খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি সে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে চাপা হাসিতে মুখখানি তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিল চিঠি খানি প্রতুল লিখিয়াছে তাহার বিমাতা রমাসুন্দরীকে।

লিখিয়াছে, তাঁহার ভাইঝিকে বিবাহ করিবার কথা সে ভাবিয়া দেখিয়াছে। তাহাকে বিবাহ সে ঠিক করিবে কিনা সেকথা এখনও সে স্থির নিশ্চিত কিছুই বলিতে পারে না। তবে এইটুকুই শুধু সে জানিতে চায়—তাঁহার ভাইঝিকে বিবাহ যদি সে না করে তাহা হইলে তাহার পিতার সম্পত্তি হইতে এমন কিছু সে পাইবে কিনা যাহা পাইলে এই কলিকাতা সহরে কোনরকমে সে খাইতে পরিতে পায়। এবং উপরের ঠিকানায় দু'একদিনের মধ্যেই এই চিঠির সে জবাবের প্রত্যাশা করিবে।

চিঠি খানি রেণুকা খাম সমেত তৎক্ষণাৎ তাহার জ্যাকেটের নীচে বুকের তলায় লুকাইয়া রাখিল। এবং হাসিতে হাসিতে সেঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চিঠির খোঁজ পড়িল পরদিন রাত্রে। দিনের বেলাটা কোনোরকমে কাটিল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় প্রতুল যেন তাহার বেশী আর বাক্যব্যয় করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

বৈকালে প্রতুল অন্যদিন বেড়াইতে বাহির হয়, সেদিন তাহাও গেল না। রেণুকা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিল না, মনে মনে একটুখানি হাসিল মাত্র।

রাত্রি ক্রমশ অধিক হইতেছে, অথচ আজ যে একজনের এখানে আহারের নিমন্ত্রণ সেকথা যেন রেণুকার মনেই নাই।

প্রতুলই সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। বলিল, 'হেমেনকে আজ যে এখানে খাবার নিমন্ত্রণ করেছ সেকথা কি তুমি ভুলে গেলে নাকি ?'

রেণুকার যেন চমক ভাঙ্গিল। এমনি ভাণ করিয়া একবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাইত, ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে, আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম।'

প্রতুল বলিল, খাবারের বন্দোবস্ত বোধহয় কিছুই করনি। এবার ত' সে এলো বলে'।

রেণুকা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কতক্ষণই বা লাগবে। উনি ত' বিয়ে থা করেন নি। বাড়ী ফিরতে রাত্রি হ'লেও বৌ বকবে না। বেশি রাত্রি হলে না হয় এইখানেই রাত্রিবাস করবেন, —আমাদের ঘরের ত' অভাব নেই, না কি বল ?'

প্রতুলের মুখখানা সহসা কেমন যেন হইয়া গেল। কথাটির সে জবাব দিতে পারিল না। হেঁটমুখে টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আমার চিঠি ?'

রেণুকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'খামে মোড়া একখান চিঠি ত? ওপরে একটি মেয়ের নাম লেখা?'

'হাঁ' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল হাত পাতিল। বলিল, 'দাও। সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। চিঠিপত্র—'

কথাটা তখনও তাহার শেষ হয় নাই। রেণুকা বলিল, 'চিঠি তোমার আমি পড়িনি। না পড়েই ডাকে দিয়ে দিয়েছি।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, ডাকে কেন দিয়েছ? টিকিট বসিয়ে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, টিকিট বসিয়ে। বিয়ারিং হবে না। সে ভাবনা নেই। কিন্তু সে ভদ্র মহিলাটি কে শুনি?'

প্রতুল বলিল, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই, তুমি যাও তাড়াতাড়ি হেমেনের খাবার ঠিক করগে।'

রেণুকা বলিল, 'তা বেশ ত', বলতে না চাও, জোর করে' আমিও শুনতে চাইনে।'

বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, প্রতুল বলিল, 'নামটা বোধ হয় শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ছিল। তোমার বোধ হয় মনে আছে।'

কথাটা রেণুকা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। পরে বুঝিল সে চিঠির কথাই বলিতেছে। বলিল, 'হাঁ মনে আছে।'

প্রতুল বলিল, 'রমাসুন্দরী আমার মা'র নাম। ভদ্রমহিলা আমার মা হ'ন। তোমার সন্দেহ বৃথা।'

এমন সময় দেখা গেল, হেমেন ঘরে ঢুকিতেছে।

প্রতুল বলিল, 'এই নাও, তোমার 'গেষ্ট' এসে গেছে। অথচ এখনও তোমার—'

হাসিয়া দাঁত বাহির করিয়া রেণুকার মুখের পানে তাকাইয়া হেমেন বলিল,—'তাতে আর কি হয়েছে! হোক্ না, হোক্ না! দেরিতে খাওয়াই আমার অভ্যেস। মেসে থাই বুঝতেই ত' পারছেন!'

এই বলিয়া টানিয়া টানিয়া সে যেন জোর করিয়াই হাসিতে লাগিল।

রেণুকা ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার কি ভাবিয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'এতক্ষণ আমাদের সেই কথাই হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, আপনি মেসে থাকেন, দেরী হলেও বলবার কেউ নেই। বৌ থাকলে হয়ত বকুনি খেতেন। খুব যদি দেরী হয় ত' এক কাজ করতে পারেন আপনি এইখানেই শুয়ে পড়তে পারেন। আর, একটা লোকের শোবার জায়গা এখানে অনায়াসেই হবে।'

প্রতুলের মুখ দেখিয়া মনে হইল এবার যেন সে রাগিয়া উঠিয়াছে। রেণুকার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আঃ, সে এখন হবে গো হবে। আগে খাওয়া হোক, তারপর শোবার ব্যবস্থা! তার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যাও, তুমি আগে ওর খাবার ব্যবস্থাটাই ক'রে এসো।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, 'হচ্ছে হচ্ছে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন প্রতুল। পথ ত' উনি আগেই মেরে রাখলেন! একান্তই যদি দেরি হয় ত' আমি এখানে রাত্রিটা কাটিয়েও ত' যেতে পারি।'

প্রতুল বলিল, না তুমি জানো না হেমেন, তোমায় যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সে কথা ওর মনেই ছিল না, এইমাত্র মনে পড়লো।

ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া একটুখানি রসিকতা করিবার সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া হেমেন্দ্রনাথ রেণুকার মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইল। হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, অতিথিকে আসতে বলে, নিজে

একেবারে ভুলেই বসে আছেন ? মন্দ নয় ! বাঃ !'

রেণুকা এতক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার ওদিকের একটা সোফার উপর ভাল করিয়া চাপিয়া ব'সল। বলিল, 'নিন তাহ'লে আর রান্নাঘরের দিকে যাবই না। ভাল করেই ভুলে গেলাম।' বলিয়া মুখখানির সে এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া নীরবেই হাসিতে লাগিল।

প্রতুল তখন রাগিয়া একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। হেমেনকে দেখিয়া সে যেন আর নড়িতে চায় না ! ছি ছি, এ কি অভদ্র আচরণ রেণুকার !

প্রতুল বলিল, 'ভাল ! এমনি রসিকতা করলেই ও আজ খেয়েছে !'

হেমেন্দ্রনাথের এ'সময় হাসিবার কোনও কারণ ছিল না। তবু সে অকারণেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রেণুকা বলিল, 'দ্রৌপদীর কথা জানেন ত' ? এমনি অপ্রস্তুত অবস্থায় অনেক অতিথিকে সে খাওয়াতে পারতো।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্রৌপদীর সখা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই তার দ্বারা সবই সম্ভব হ'তো !'

রেণুকা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণ যে আমার সখা নয় তাই-বা কেমন করে' জানলেন ?'

হেমেন্দ্রনাথ আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল,—'অবিশ্বাসের কিছু নেই। আপনি ত' মানবী ন'ন। সে-কথা আমি ত' অনেক আগেই বলে দিয়েছি।'

প্রতুল বলিল, 'হ্যাঁ, এই বলেই ত' ওর মাথাটি খেয়েছ।'

রেণুকা বুঝিল, প্রতুল অত্যন্ত রাগিয়াছে। হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমি কি দ্রৌপদী হ'তে পারি না মনে করেছ ?'

প্রতুল বলিল, 'কেন পারবে না ? ওই দ্রৌপদীই তোমার উপযুক্ত খেতাব্।'

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথাটা রেণুকা এতক্ষণ ভাবিয়া দেখে নাই। অথচ প্রতুল ঠিক সেই ইঙ্গিতই করিয়াছে।

রেণুকা এইবার একটুখানি লজ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল,—'ওগো থামো, আর উপহাস কোরো না। ওদিককার সব ব্যবস্থাই আমি করেছি। এত বোকা আমি নই।'

প্রতুল এতক্ষণে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল,—'তাই বল !'

হেমেন হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সে আমি আগেই বুঝেছি।'

এইবার খাইবার পালা।

রেণুকা সব ব্যবস্থাই করিয়াছিল। এতটুকু ত্রুটি কোথাও হয় নাই।

কিন্তু ত্রুটি হইলেই প্রতুল বোধকরি সুখী হইত বেশি। কারণ একটার পর একটা ক্রমাগত নূতন খাবার আনিয়া রাঁধুনী যতই হেমেনের থালার উপর ধরিয়া দিতে লাগিল, ততই তাহার এই অকৃত্রিম বন্ধুর প্রতি তাহারই প্রিয়তমা পত্নীর এই অসাধারণ অনুরাগের কথা স্মরণ করিয়া মুখখানি তাহার বিষণ্ণ ম্লান হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রতুল যে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল না তাহা নয়, কিন্তু নানান্ কথা বলিয়া যতই সে তাহার তাহার মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করে, রেণুকার কাছে ততই যেন তাহা প্রকট হইয়া উঠে।

হেমেনের খাওয়া যেই শেষ হইয়া গেছে, দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া রেণুকা বলিল, 'ইস্, বারোটা বেজে গেল ? থাক, তা'হলে আজ আর আপনার মেসে গিয়ে কাজ

নেই। এইখানেই আমাদের ওই পাশের ঘরে...

কথাটা তাহার শেষ না হইতেই প্রতুল বলিয়া উঠিল,—'বা রে! ওর 'মেস' বলেই বুঝি অরাজকের পুরী? সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে ওকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?'

হেমেন বলিল, 'হেঃ! আমাদের আবার মেস! তার আবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট! হেঃ! কৈফিয়ৎ না আরও কিছু!'

ইহার পর আর কিছু বলা চলে না। বলিতে গেলেই প্রতুলকে ধরা পড়িতে হয়।—মনের ভাব তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। অথচ গত কাল হইতে হেমেনের উপর রেণুকার যে প্রীতি সে লক্ষ্য করিতেছে তাহার পরেও তাহাদেরই পাশের ঘরে হেমেনকে রাত্রিবাস করিতে দিবার ইচ্ছা প্রতুলের নাই। তাই সে এইবার যেন একেবারে মরীয়া হইয়াই রেণুকার দিকে তাকাইয়া হেমেনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—'না না এত রাত এখনও হয়নি যে ওকে মেসে ফেরা বন্ধ করতে হবে। কলকাতা সহরে বারোটা রাত্রি আবার রাত্রি নাকি? আর তা ছাড়া—'

বলিয়া হেমেনের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে প্রতুল বলিল, 'তাছাড়া আমি জানি ত' একটা রাত্রি বাইরে কাটালে মেসের ছোক্‌রারা কিরকম করতে থাকে! কত কি সন্দেহ করে, কত কি বলে, তার চেয়ে কাজ নেই বাপু, চল—চল, তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসি—চল।'

যাইবার ইচ্ছা হেমেন্দ্রনাথের একেবারেই ছিল না। এ যেন জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া! কি আর করিবে, প্রতুলের টানাটানিতে তাহাকে যাইতে হইল। দরজার কাছ হইতে পিছন ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রেণুকার মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিয়া গেল—'আসি তাহ'লে। নমস্কার।'

রেণুকাও হাসিয়া তাহার হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—'নমস্কার!'

প্রতুল তাহা লক্ষ্য করিল। মনে হইল, চোখে যদি আগুন থাকিত এবং সে আগুনে যদি কোনও কাজ হইত তাহা হইলে আজ হয়ত রেণুকাকে সে এই চোখের আগুনে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া যাইত!

যাই হোক, মাঝরাস্তায় হেমেনকে ছাড়িয়া দিয়া প্রতুল বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়াই দেখে, ঘরে আলো জ্বালিয়া গম্ভীর মুখে সোফার উপর রেণুকারাণী একাকিনী বসিয়া আছে। ইহারই মধ্যে কখন্ সে একখানি ভাল শাড়ী পরিয়াছে, চমৎকার একখানি জামা গায়ে দিয়াছে, গায়ে দু'একখানি গহনা পরিয়াছে,—সুনিপুণ প্রসাধনে নিজেকে সুসজ্জিতা করিয়া সেএক অপরূপ মূর্তিতে তাহার সেই আয়ত দুইটী চক্ষু প্রসারিত করিয়া মনে হইল, কি যেন ভাবিতেছে।

প্রতুল ভাবিল, রহস্যময়ী নারীর ইহাও একটা ছল, ইহাও চাতুরী! সরাসর সে তাহার কাছে গিয়া সজোরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা আছে রেণুকা!'

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'কি কথা বল।'

কথাটি বলিতে বোধকরি প্রতুলের কোথায় যেন বাধিতেছিল। বলিল, 'তুমি কি এখনও তা বুঝতে পারনি রেণুকা? আমাকেই বলতে হবে?'

রেণুকা সহসা সেই নিস্তব্ধ গৃহ মুখরিত করিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রতুল বলিল, 'হাসছে যে?'

রেণুকা তেমনি হাসিতে হাসিতে একেবারে

যেন ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, 'দিয়ে এলে ত' বন্ধুকে তাড়িয়ে ?'

প্রতুল বলিল, 'দেবো না ? যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ তুমি !'

রেণুকার হাসি তখনও থামে নাই। জোর করিয়া হাসি থামাইয়া বলিল, 'তোমার অসহ্য মনে হয়েছে, না ? বন্ধুর ওপর ঈর্ষ্যা হচ্ছিল ত ?'

প্রতুল বলিল, 'হবে না ? কাল থেকে তোমায় আমি আর কারও সুমুখে বেরোতে দেবো না।'

'ঘরের মধ্যে বন্ধ করে' রাখবে ?'

'হাঁ—রাখব। কোথাও যেতে দেবো না। কাউকে তোমার মুখ দেখতে দেবো না।'

রেণুকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক্, এতদিন পরে তাহ'লে আমি বাঁচলাম।'

প্রতুল বলিল, 'তোমার এ হেঁয়ালী আমি কিছু বুঝতে পারছি না রেণুকা।'

'বুঝতে পারছ না ? আচ্ছা, তোমার কাছে একদিন একটা কাগজ আমি রাখতে দিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ?

'কেন থাকবে না ? তার সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ ?'

রেণুকা বলিল, 'তুমি নিয়ে এসো সেই কাগজখানা একটিবার, আমি দেখি।'

প্রতুল উঠিয়া গেল এবং পাশের ঘরে লোহার সিন্দুক খুলিয়া খামে মোড়া সেই কাগজখানি আনিয়া রেণুকার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও তোমার সেই কাগজ।'

রেণুকা বলিল, 'তুমি খোল। খুলে পড়।'

প্রতুল খামখানি খুলিয়া পড়িল।

তাহাতে লেখা ছিল—

প্রিয়তম—

তুমি আমাকে সত্যই ভালবাসো কিনা একবার আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। তোমাকে নয়—তোমার ভালবাসাকে। শুনিয়াছি—ভালবাসায় ঈর্ষ্যা যদি না থাকে তাহা হইলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। তাই একবার দেখিতে চাই—তোমার ভালবাসায় ঈর্ষ্যা আছে কি না। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে চাই তোমার বন্ধু হেমেন্দ্রনাথকে। হেমেন্দ্রনাথকে আমি চিনিতে পারি নাই বলিয়া তুমি সেদিন আমাকে তিরস্কার করিয়াছ। তুমি বলিয়াছ—তোমার বন্ধু হেমেন্দ্রনাথ অতি সৎ, অতি মহৎ, এবং সচ্চরিত্র। আমি বলিতেছি, সে মহৎ নয়, সৎ নয় এবং সচ্চরিত্রও নয়। সে বিশ্বাসঘাতক, সে পশু, সে নরাধম। আমি এই সঙ্গে একবার তাহাকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিব!

আগুন লইয়া খেলা করিতেছি। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে জানি না। তাই এই পত্রখানি লিখিয়া তোমারই কাছে রাখিয়া দিলাম। ইতি—

তোমারই

রেণুকা

চিঠিখানি পড়িয়া প্রতুল একবার রেণুকার মুখের পানে তাকাইল। দেখিল, রেণুকার দুচোখ বাহিয়া তখন অশ্রু গড়াইতেছে। প্রতুল তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'তোমার এ অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি রেণুকা, আমায় ক্ষমা কর।'

রেণুকা তাহার কোলের উপর কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

পিতা-পুত্র

শ্রীঅমিয় কুমার ঘোষ

সেদিন সকালে কাজ সারিয়া চৌধুরীদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার সময় চৌধুরী গৃহিণী বলিলেন—হাঁ রে রাঙাবউ যা শুনচি তা'কি সত্যি ?…

কমলা দাঁড়াইয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁটটি হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে ধীর কণ্ঠে বলিল —কি শুনেচেন ?

—"শুন্‌চি নব্‌নে নাকি তোর গায়ে হাত তোলে ?"

এইবার কমলার মধ্যে যেন বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল! সে আয়ত নেত্রে একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া দৃষ্টিপথ মাটির দিকে নামাইয়া ফেলিল। চৌধুরী গৃহিণী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তা হলে সত্যি ? যা শুনছি তা সত্যি ? বলিস কি রে সেই নব্‌নে ? সে আজকাল অমনি হোল ? শুধু কি তাই ? সেদিন আমাদের সতু কি বলছিল জানিস ? বলছিল—সেবার পাশের গাঁয়ে যে ডাকাতিটা হয়ে গেল তার দলের ভেতর নব্‌নে ছিল। পুলিশ খুব খোঁজা খুঁজি করছে। নেহাৎ গ্রামের লোক বলে আর কেউ উচ্চবাচ্য করচে না।—

কমলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ইহা সমস্তই সত্য। সে তাহা জানে। কিন্তু কি করিবে সে!

দুর্দ্দান্ত স্বামীর নিকট তাহার সমস্ত কাকুতি-মিনতি অসহায় ভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে আর তাহার সহিত পারিয়া উঠে না! জমি-জমা যাহা কিছু ছিল তাহা সমস্ত খাজ্‌না না দেওয়ার কারণ জমিদারের হস্তান্তরিত হইয়াছে। স্বামী সংসারে কিছুই দেয় না,সে এ-বাড়ী ও-বাড়ী গৃহ-কর্ম্মে সহায়তা করিয়া যাহা আনিতে পারে তাহাতে কোন রকম করিয়া নিজের শিশু পুত্রটীর ভরণ-পোষণ চালাইয়া দেয়। চৌধুরী গৃহিণীকে এই কথাটাই কমলা সাশ্রুনয়নে জানাইল।

তিনি শুনিয়া বলিলেন—সত্যি রাঙাবউ তোর কষ্টে কুকুর-বেড়াল কাঁদে। আহা তোর ছেলে বরুণ যেন বেঁচে থাকে। সে তোকে সুখী ক'রবে।

এই কথা বলিয়া তিনি হাতের ইসারায় তাহাকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

একটু পরে তিনি একটী চুপ্‌ড়ি করিয়া শশা, করলা, বেগুণ প্রভৃতি আনিয়া তাহার কোঁচড়ে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন—নিয়ে যা রাঙা বউ, তোর ছেলে খাবে।

কমলা তাঁহার দিকে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে লঘুপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

কমলা ঘরে ফিরিয়া দীপ জালিয়া সন্ধ্যা দিয়া উনান ধরাইতে বসিল! আজ একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে এখনই বরুণ খেলিয়া আসিয়া ভাত খাইতে চাহিবে!

কমলা ক্ষিপ্র হস্তে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

এইবার আমরা এ পরিবারটীর কুটীরখানি দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইলাম। ঘর বলিতে একটী গোল পাতার ছাউনি। তাহারই পাশে তদ্রূপ রান্নার একটী চালা। উঠানের মাঝে চার পাঁচটী ধানের মরাই ; কিন্তু সব কয়টীই ভগ্নপ্রায় —বার্দ্ধক্যে অস্থিসার হইয়া অতীতকে বিদ্রূপ হানিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহারি এককোণে একটী পুঁই মাচা—তাহার নিচে কতকগুলি বন-বাদাড়—কাহার পরওয়ানা লইয়া মাথা উঁচাইয়া-আছে, কে জানে!···

এইবার সহসা খানিকটা সরগোল করিয়া বরণ আসিয়া গেল। ছোট্ট ছয় সাত বছরের ছেলেটী! চোখে-মুখে বয়সসুলভ অকৃত্রিম সরলতা। আসিয়াই প্রথমে মা-র কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কমলা বলিল—আঃ, ছাড় বরণ, আর কি পারি? এখন কতো বড়ো হয়ে গেছিস। নাব্ শিগ্‌গির!

বরণ বলিল···নাঃ নাব্‌বো না আগে আমার জন্যে কি রেখেছিস্ বল?

কমলা বলিল—আচ্ছা দিচ্ছি তুই আগে নাব্।

সে নামিল। কমলা উঠিয়া গিয়া শিকা হইতে একটুকরা আমসত্ত্ব আনিয়া তাহার হাতে দিল।

এটী সে দত্ত বাড়ীর ছোট বৌ-এর চুল বাঁধিয়া দিবার বিনিময়ে পাইয়াছে। এমনি করিয়াই সে আরও অনেক জিনিষ পায়।

বরণকে এইবার শান্ত করিয়া সে রান্নায় বসিয়া গেল। সত্যই এই ছেলেটীর মুখের দিকে চাহিয়া, এত কষ্ট সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া আছে। সেই মনে পড়ে—আট-দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। লোকের মুখে ভাল পাত্র শুনিয়া তাহার পিতা নবীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলা বাড়ী আসিয়া স্বামীর যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করিল। দেখিল লোকটী ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় যেমনি রূঢ়, ব্যক্তিগত জীবন যাত্রার পথও তাহার তেমনি কদর্য্য, তেমনি পঙ্কিল।...এই লোকটীর হিংস্র প্রকৃতির নিকট তাহাকে ভীত মেষশাবকের ন্যায় অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে—তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার তাহার না ছিল একটু শক্তি, না ছিল অনুচ্চ একটু অভিযোগের ভাষা!

কিন্তু যাহা বলিতে ছিলাম! এই ছেলেটীর মমতাময় মুখের দিকে তাকাইয়া সে স্বামীর অজস্র নির্য্যাতনের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার আশা ছিল, ছেলেটী বড় হইয়া তাহার পিতার মত আর বিপথে চলিয়া যাইবে না বরং সৎকার্য্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া তাহাকে সুখী করিবে। এই কথাই ছিল তাহার পক্ষে মস্ত অনুপ্রেরণা! স্বামীর উৎপীড়নে বিধ্বস্ত হইয়া জীবনকে গলিত রুধিরের মত পলে পলে নিস্রাব করিয়া দিয়াও এই চিন্তাটী আপনার মনে মনে লালন করিয়া সে বাঁচিয়া ছিল।

হয়তো এমনিভাবে, প্রত্যেক দুঃখিনী জননী বাঁচিয়া থাকে!

রান্না করিতে করিতে কমলার সহিত বরণের কত আজগুবি গল্প চলে। কমলা বলে—হ্যাঁ রে বরণ, তুই-ও তো বড় হয়ে আমায় আর খেতে দিবিনি—মার ধোর করবি তো?

বরণ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলে—না মা! তুই দেখিস, আমি লেখাপড়া শিখে বড়ো হ'ব। চৌধুরীদের মত কোঠা বাড়ীতে থাকব। তোকে আর খাটতে হবে না।

কমলা বলে—ইস্! তখন কি আর মা-কে মনে থাকবে নাকি?

বরণ বলে—দেখিস তুই ! আমি তখন কতো বড়ো হয়ে যাবো, কতো কাজ করে পয়সা আনব। তখন আর তোকে খাটতে হবে না। ..

এইরূপে অবকাশ সময়টাতে তাহারা আপন মনে কত আশার দেউল গড়ে ভাঙে। শেষে ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িয়া যায়। ভাত খাইয়া বরণ শুইয়া পড়ে। কমলা একটী থালায় করিয়া ভাত খাইবার জন্য বাড়িয়া রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া মাটিতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। নিজে আর খাইল না—কারণ স্বামী কোন কোন দিন রাত্রে আসিয়া খাইবার দাবী করে—যেদিন তিনি খান না সেদিন সে সেগুলি নিজেই খায়। সেদিনও সে সেইরূপ ভাবে ভাত রাখিয়া দিয়া

গভীর রাত্রে স্বামী দেবতার দারুণ চাৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বার খুলিয়া দিতেই শ্রীকণ্ঠের মধুর ভাষণ নিঃসৃত হইতে লাগিল—"বাব চৌধুরী বাড়ীতে আমার নামে লাগিয়ে আসা হয়েছে। আমি চোর, আমি ডাকাত ? বটে ; আমার খাও আর আমার সর্ব্বনাশ কর' দাঁড়াও—"

ইহার পর যাহা হয় তাহাতে আর ছোট ছেলেটাকে ঘুমাইয়া থাকিতে হয় না। সে হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হইয়া মা-কে অসহায় ভাবে আক্রান্ত দেখিয়া তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি তুলিয়া ছুটিতে-ছুটিতে প্রতিবেশীর দ্বারে সাহায্যের জন্য করাঘাত না করিলে উপায় থাকে না।

ইহার পর যখন গল্পের যবনিকা তুলিলাম তখন সুদীর্ঘ দ্বাদশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়েকটী বৎসরের মধ্যে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কাহিনী না জানাইবার কারণ এই যে তাহার মধ্যে আর কোন বৈচিত্র্য নাই। দুঃখিনী কমলার বেদনাহত জীবন যাত্রার দিনগুলি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় এক-ই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। সংসার-বন্যার একবুক জল হইতে কোন রকমে আপনাকে বাঁচাইয়া সে টিকিয়া আছে, কিন্তু তাহার যে থাকার আর কোন সার্থকতা নাই। ঝড়-বিক্ষুব্ধ নাবিকের ন্যায় তাহারও জীবনের শেষ আনন্দ-শিখাটুকু একটী বায়ুর ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।—

পূর্ব্বে বরণকে আমরা যেরূপ ভাবে দেখিয়াছি, এখন আর আমরা তাহাকে সেইরূপ ভাবে দেখিতে পাইব না। দীর্ঘ দ্বাদশটী বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বহুবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দৈহিক আকারে অনেক পার্থক্য আসিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে যাহা ছিল এখন যেন তাহা হইতে সে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে।

সেও পিতার মত বিশৃঙ্খলভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে। তাহার আর দুঃখিনী জননীর মিনতি-করুণ সজল চোখ দুটীর দিকে তাকাইয়া মমতার উদ্রেগ হয় না, বরং সে তাঁহার কথা অবহেলা করিয়া দিন দিন দুর্গতির অতল সলিলে আকণ্ঠ ডুবিয়া যাইতেছিল।

কমলার শেষ সম্বল যে দু'একখানি গহনা ছিল তাহা যখন একদিন রাত্রে বরণ সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল, তখন সে সারা পৃথিবীর বুকে আপনাকে নিতান্ত নিঃসম্বল বলিয়া মনে করিল। কিন্তু পুত্রের নিকট এই পরাজয়ের অনুচ্চারণীয় কাহিনী কাহাকেই বা শুনাইবে ? কেই বা তাহার শোকে সস্নেহ সহানুভূতি জানাইবে।

গ্রামে যাহারা ছিলেন তাঁহারা অনেকে আর নাই ! যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিকট কমলার বেদনার কাহিনী নিত্য শুনিয়া শুনিয়া নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ ঘটনা আর প্রতিবেশীদের চোখে এক ফোঁটা অশ্রুরও আবেগ আনিতে পারে না ! চৌধুরী

পৃথিবী আজ পরপারে। বিরাট বিস্তীর্ণ সসাগরা পৃথিবীর বুকে, তাহার দরদী বলিতে আর কেহ নাই।

নবীন বহুদিন গৃহছাড়া হইয়া কোথায় গিয়া কাটাইতেছিল, কে জানে! বরণও চার পাঁচদিন গৃহে ছিল না। হঠাৎ সেদিন কমলা দেখিল বরণ কোথা হইতে আসিয়া হাজির! সে তাহাকে কিছু বলিল না।

সন্ধ্যার সময় কমলা বাটীর বাহির হইয়া কালীতলায় কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় আর সন্ধ্যার সুখস্বপ্ন রচনার দিন তাহার নাই! এখন সে সন্ধ্যার পর অধিকাংশ সময় কলিকাতার কীর্ত্তন শুনিয়াই কাটাইয়া দেয়।

সেদিন সে সেখানে গিয়া জানিল যে কীর্ত্তন হইবে না। তাই সে পুরোহিত ঠাকুরের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল। বাড়ী তাহার কালি-মন্দির হইতে নিকটেই। পথের পাশে রায়েদের দীঘি পড়ে, সেখানটা বরাবর আসিয়া পড়িতে দেখিতে পাইল, কাহারা লণ্ঠন হাতে করিয়া হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে।

সে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—"কে বরণের মা না? দাঁড়াও আমরা তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম। বিশেষ দরকার। তুমি একবার বাড়ী ফিরে চল।"

কমলা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই, বলিল, "চলুন যাচ্ছি।"

আসন্ন কোন বিপদের কথা ভাবিয়া তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া যাইতেছিল। লণ্ঠনের স্বল্প আলোকে ইহাদের সে অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল লাল পাগড়ীধারী একদল পুলিশ আসিয়া তাহার বাড়ীর আনাচে কানাচে ছাইয়া ফেলিয়াছে। শুনিল, তাহারা বরণদাসকে ধরিতে আসিয়াছে। সে একটি হত্যাপরাধে জড়িত আসামী! পুলিশ আসার সংবাদ সে পাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় তাহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব দেখিয়া কমলা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পুলিশ বরণকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বরণের বিচারের দিন আসিল।

কমলা যে সেইদিন হইতে বিছানায় পড়িয়াছিল আর সে উঠিতে পারে নাই। গ্রামের চৌধুরীদের ছেলেরা কলিকাতায় থাকিত, বিচারের ক'দিন আদালতে উপস্থিত থাকিয়া বিচার শুনিতেছিল। পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া বিচার হইবার পর বিচারক বরণের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর কারাবাসের আদেশ দিলেন।

কমলার অবস্থা দিনের পর দিন ক্রমশঃ কাহিল হইয়া আসিতেছিল। অনাহারে অশান্তিপূর্ণ জীবন লইয়া আর সে কয়দিন টিকিবে? কয়দিন হইল পাড়ার লোক গিয়া কোথা হইতে নবীনকে ধরিয়া আনিয়াছে।

কিন্তু কমলা আর টিকিতে পারিল না। একদিন বর্ষার একটী অশ্রুমতী সন্ধ্যায় সে স্বামীর পদধূলি লইয়া পৃথিবীর মেয়াদ শেষ করিয়া গেল।...

পাড়ার লোকে সাহায্য করিয়া কমলার সৎকার করিয়া আসিল।

চৌধুরীদের একটী ছেলে বরুণ দাসের সহিত জেলে দেখা করিতে গিয়াছিল। তাঁহারই জন্ত কাঁদিয়া কাটিয়া মা আজ বিশেষ-ভাবে পীড়িত হইয়াছে, শুনিয়া সত্যই তাহার মনে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল…ছেলেবেলার সেই দিনগুলির কথা, তাহার পিতার সেই অসহ্য অত্যাচারের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেমন করিয়া তাহার মা তাহাকে বড় করিল— নিজেরপ্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আপনি গিয়ে মা-কে বলবেন আমি এবার ভাল হয়ে যাব। আর দুষ্ট-সঙ্গে মিশব না। জেল থেকে ফিরে এসে আবার তাঁকে সেবা যত্ন করব— সুখী করবো।

কিন্তু হায়, সে কি তখন জানিত যে তাহার মা পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙলা দেশ হইতে বহুদূরে! একটী দ্বীপের প্রান্তে একটি লোক পুলিশ প্রহরীর অধীনে থাকিয়া বসিয়া সাগরের কল্লোল শুনিতেছিল। দূর হইতে তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় বৃদ্ধ, কিন্তু একটু নিকটে আসিলে দেখা যায় সে মুখ বয়সে নয়, বেদনায় রেখাঙ্কিত! দূরে, বহুদূরে নৃত্যশীলা ঊর্ম্মিমালার দিকে আকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে আপন মনে কী ভাবিতেছিল, কে জানে …

হঠাৎ প্রহরী আসিয়া জানায় তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইবে—সময় হইয়াছে।

আস্তে আস্তে উঠিয়া সে তাহার অনুসরণ করে।

সন্ধ্যা হয়। কয়েদীরা যে যার ওয়ার্ডে ফিরিয়া আসে। তারপর গল্প গুজব ঠাট্টা ইয়ারকি, হল্লায়, চারিদিক মুখর হইয়া ওঠে! সে কিন্তু সবার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া একান্তে বসিয়া বিরস ভাবে ভাবিতে লাগিল।

সাগরের অবিশ্রাম গর্জ্জন তখনও চলে। বছরের পর বছর নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন হুড় হুড় শব্দ শুনিয়া তাহার কানে তালা লাগিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। সারা দেহে তার অপরিমিত অবসন্নতা, মনে করুণ ক্লান্তি। বসিয়া বসিয়া তাহারও অন্তরে কান্নার কল্লোল ফেনাইয়া উঠে। তৃষাতুর দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে চাহিয়া সে কত কি-ই ভাবে। …

…বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গমালার পর-পারে—দূরে, বহু যোজন দূরে একটী পল্লীর মৃদু দীপ শিখাটীর সহিত মনে পড়ে তাহার মা-র মমতাময়ী মুখখানি! সেই ছেলে বেলাকার কত সহস্র ছোট খাট ঘটনা! এবং তাহার পর তাহার মনে হয় কেমন করিয়া সে সেই সমস্ত ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িল।—

ইহারপর তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। আবার তাহার কানে সমুদ্রের অবিশ্রাম হুড় হুড় গর্জ্জন বাজিয়া উঠিয়া তাহার দেহ-মন আবিষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার মনে হয় তাহার চারিপার্শ্বে কেবল জল আর জল, ঢেউয়ের আকুল আর্ত্তনাদ, নিরন্তর ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ। অস্ফুট একটু আওয়াজ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে।……

পার্শ্ব হইতে কে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ডাকে। দেখে বৃদ্ধ। তাহারই সমব্যথী কেউ হইবে হয়তো—

চোখের কোণ হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িয়া তাহারও কাপড়খানি ভিজিয়া গিয়াছে।

বরণ দাস জেলে চলিয়া যাইবার পর হইতে আর কেহ তাহার নিকট হ তে কোন পত্রাদি পায় নাই এবং বোধ হয় সেই কা লে সবাই তাহাকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল।

ঠিক দশ বৎসর পরে একদিন সত্যই তাহার খালাস হইল। সরকারী শান্তি রক্ষক আসিয়া তাহাকে গ্রামের সীমানায় ছাড়িয়া দিয়া গেল, কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার সমস্তই নূতন, বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সে হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া রাস্তার একটী চৌমাথার কাছে দাঁড়াইল। এখানে একটু দাঁড়াইতেই দেখিল হঠাৎ কি একটা গাড়ী, গরু নাই ঘোড়া নাই অথচ আপনাআপনি হুস্ হুস্ করিয়া চলিয়া গেল। সে অবাক হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল যে এইরূপ গাড়ী কলিকাতায় যখন গিয়াছিল তখন দেখিয়াছিল বটে; কিন্তু গ্রামের মধ্যে ইহা আসিল কিরূপে? আর একটু অগ্রসর হইলেই দেখিল একস্থানে সারি সারি বহু দোকান। কত রঙ বেরঙের জিনিষ সাজান। তাহাদের ভিতর হইতে এক ঝলক উগ্র আলো আসিয়া তাহার চোখ ঝল্সাইয়া দিল।

সে আরও খানিকটা হাঁটিয়া চলিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেলেও যে একটু অস্পষ্ট দিবালোক ছিল তাহাতে পথ ঘাট চিনিতে পারা যায়। সে আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিল। একটু গিয়াই বাম দিকের বাগানটীর একটী জামরুল গাছ দেখিয়া তাহার মনে হইল যে এই দিকেই তাহাদের বাড়ী ছিল। একটু পরেই তাহাদের কুটীর-টী যেখানে ছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাদের সে কুটীর-টী তো আর নাই! তাহার পরিবর্ত্তে সেখানে একটী পাকা তিতল বাটী দেখিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বুঝিতে পারিল তাহাদের পর্ণ কুটীর-টী নষ্ট হয় নাই—আছে। কিন্তু তাহা ভগ্নপ্রায় বলিয়া মানুষের আর কোন কাজে লাগে না। ইহা গরু বাছুরের গোয়ালঘর রূপে পরিণত হইয়াছে। সে আর এই দিকে চাহিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। অতীতের স্মৃতিভারে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

সে আস্তে আস্তে সেই স্থান হইতে হাঁটিয়া চলিল। খানিক পথ যাইতে তাহার পাশ দিয়া যে লোকটী চলিয়া গেল সে তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল যে সেই ব্যক্তি কালিমন্দিরের পুরহিত তর্করত্নের ভ্রাতা। কিন্তু সে লোকটী তাহাকে মোটেই চিনিতে পারিল না—হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। আর একটু গিয়া সে দেখিতে পাইল স্বল্প জ্যোৎস্নালোকে দীর্ঘিকার ধারে কে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। লোকটী যে বৃদ্ধ তাহা দূর হইতে দেখিলেই বোঝা যায়। হাতে একটী বাঁশের লাঠী লইয়া সে সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল।

বরণ ভাবিল এই লোকটীর নিকট সে তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধ লোক—নিশ্চয়ই সে তাহাদের জানে। একটু অগ্রসর হইতেই তাহার মনে হইল লোকটীকে চিনি, কিন্তু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ঠিক যে কে তাহা সে স্থির করিতে পারিতেছিল না।

সে লোকটীর আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই লোকটী হঠাৎ লাঠি দিয়া তাহার পায়ে আঘাত করিয়া বলিল—"হট্ যাও!"

হঠাৎ এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া সে মার উদ্দেশে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। বহুদিন পরে আবার তাহার রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে আর বরদাস্ত করিতে পারিল না।

"তবে রে!" বলিয়া সে তাহার টুঁটী টিপিয়া ধরিল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, যেহেতু মুখ ভঙ্গী এবং মাথার পাশে কাটা দাগ দেখিয়া সে চিনিতে পারিয়াছে এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, তাহারই অত্যাচারী, দুর্দ্ধর্ষ পিতা নবীন দাস! সে হাত ছাড়িয়া দিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

কিন্তু তাহার কঠিন হস্তের নিষ্পেষণে নবীন দাসের গলার একটী শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধ সেই যে গোঁ-গোঁ করিতে করিতে মাটীতে মুখ গুঁজিয়া পড়িল, আর উঠিল না।

মুহূর্ত্তের অপরাধ আজ বরণ দাসের জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিল।

বছরের পর বছর ঘুরিয়া যায়। শীত আসে, শীত যায়। বসন্ত আসে—তাহাও চলিয়া যায়। শাখায় শাখায় কত ফুল ফোটে—কত বা ঝরিয়া যায়। যাহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহারা আর নাই। গ্রামে প্রায় সবাই নূতন। কিন্তু এখনও প্রবীনের মধ্যে কেউ কেউ জানেন ঐ যে সাধু-চরিত্রের নিরীহ লোকটী কালিমন্দিরের বাগানে মালীর কাজ করে সে আর কেহ নয়, আমাদের বরণদাস—সেই পিতৃঘাতী ফেরৎ আসামী! *

---

* এই কাহিনীর কঙ্কাল বিদেশী
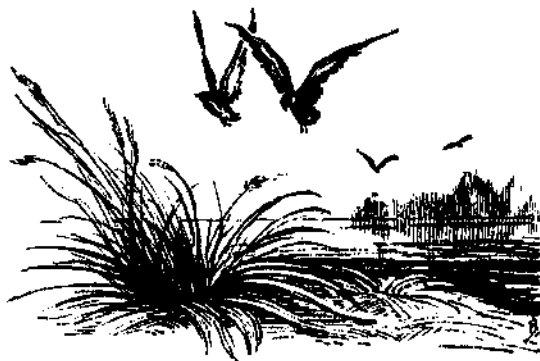
প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্

অখিল মুখুয্যে আজ নয় বৎসর পরে বাড়ী ফিরিতেছে। চিঠি আসিয়াছে।

বাড়ীতে দুইটী প্রাণী। স্ত্রী সাবিত্রী ও কন্যা সরযূ।

সাবিত্রী সেলায়ের কলে একটা জামা সেলাই করিতেছিল। কন্যা সরযূ চিঠিখানি পড়িয়া মাকে বলিল "এবার বাবা নিশ্চয়ই আসবেন, কি বল মা?"

সাবিত্রী কল হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল— "কি জানি মা, চিঠি তো লেখেন। আসেন কৈ?"

সরযূ আবার জোর করিয়াই বলিল "এবার নিশ্চয়ই আসবেন। আমি বলছি তুমি দেখো।"

সাবিত্রী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ন'বছর হলো, এই শ্রাবণে। তখন তোর বয়স সাত কিম্বা আট। সেই তিনি গেছেন, তারপর মাঝে মাঝে এক আধ খানা চিঠি ছাড়া আর কোন খবরই তো তাঁর পাই না।"

সাবিত্রীর চোখ জলে ভরিয়া গেল। জোর করিয়া কল চালাইয়া দেয়—ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্।...

সন্ধ্যা বেলা।

তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়া সরযূ সবে মাত্র নীচে আসিয়াছে। সদরে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল।

ছুটিয়া গিয়া সরযূ দেখে পিতা আসিয়াছে। গলায় আঁচল দিয়া পিতার পায়ের ধূলা নেয়।

সাবিত্রীও আসিল। সরযূকে দেখাইয়া সাবিত্রী অখিলকে জিজ্ঞাসা করিল "চিনতে পারো ওকে?"

গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া অখিল বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল "না পারবারই কথা বটে।"

সাবিত্রী আগে আগে চলিল, অখিল ও সরযূ পিছন পিছন গিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। সরযূ পিতার পায়ের জুতা ও জামার বোতাম খুলিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল "তোমার শরীর তো খুব ভালো বোধ হচ্ছে না। অসুখ বিসুখ হয়েছিলো নাকি?"

অখিল বলিল "অসুখ বিসুখ ঠিক হয় নি বটে, তবে শরীরটা বিশেষ ভালোও ছিল না। তা ছাড়া পাওনাদারদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ালে শরীর কি ভালো থাকে ছাই।"

বলিয়া অখিল একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সাবিত্রী বলিল "শরীর যখন খারাপ বোধ হচ্ছিল তখন ফিরে এলে না কেন?"

হাসিয়া অখিল উত্তর দিল "তুমি তো সোজা কথা বল, তারপর পাওনাদারদের—"

ইহার জবাব সাবিত্রী দিতে পারিল না।

অন্য কথা পাড়িবার জন্য সাবিত্রী বলিল— "সরযূ যা মা তুই উনানে আগুন দিগে যা। আমি খানকতক লুচির মত ময়দা মাখিগে।"

বাধা দিয়া অখিল বলিল—"না না, আর লুচি ভাজতে হবে না। একেবারেই ভাত খাবো। ষ্টেশনে জল খেয়েছি।"

সরযূ কিছু বলিল না। মার পিছু পিছু রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অখিল একাকী জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

জানালাটি ভালো করিয়া খুলিয়া দিতে এক ঝলক চাঁদের আলো আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। নয় বৎসর আগে এমনি এক রাতে সে দেশত্যাগী হইয়াছিল। সেদিনও মাথার উপর ঠিক এমনি চাঁদ হাসিতেছিল।

তাহার মনে পড়িল নয় বৎসর আগেকার কথা।...

সকালে গিয়া অফিসে শুনিল তাহার জবাব হইয়া গিয়াছে। কাজের লোক খাটিতে কসুর করে না, সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান সব কিছুই সার্টিফিকেটে লেখা হইল কিন্তু চাকুরী রহিল না।

ম্যানেজার বলিল, "বাবু তোমাকে রাখতে পারলাম না। বড় দুঃখিত।"

আফিস হইতে চলিয়া আসিয়া অখিল পথে ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে! ব্যবসায় লোকসান দিয়া অনেক টাকা দেনা করিয়া ফেলিয়াছিল। পেট চলে না। বড় ভাই নিখিলকে লিখিতে সে অনেক কষ্টে এই চাকরী করিয়া দিয়াছিল। তাও আজ গেল!

সব চেয়ে বেশী ভাবনা তাহার স্ত্রী সাবিত্রী ও কন্যা সরযূকে লইয়া। নিখিলের অমতে অখিল সাবিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। নিখিল বলিত "তালপাতার চাকরী ভরসা করে সংসার পাতা। ভুগবে পরে।"

নিখিলের কথা অখিল এতদিন অনেকটা উপেক্ষা করিয়া আসিলেও আজ আর উপেক্ষা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অখিল পোষ্ট আফিসে গিয়া একখানা চিঠি নিখিলকে লিখিয়া ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া জবাবের প্রতীক্ষায় রইল।

কিন্তু জবাব আসিল না।

অখিল ভাবিল জবাব না আসে না আসুক সে নিজেই দাদার কাছে যাইবে। তাহাতে তাহার লজ্জা নাই। তা ছাড়া গরজ তো তাহারই।

অখিল নিখিলের কাছে গেল।

নিখিল বলিল "তোমার চিঠি পেয়েছি বটে, কিন্তু কিছু উপায় নেই। চাকরী তো আর গাছের ফল নয় যে দরকার হলেই পেড়ে দেবো।

অখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কথার মর্ম্মই উপলব্ধি করে।

নিখিল বলিল "তুমি একা হলেও বা হতো। যাহোক টানতে পারতাম। কিন্তু তোমার এমন সংসার তো আমরা টান্‌তে পারবো না। তখন বলেছিলাম তাল পাতার চাকরী—"

রাগে দুঃখে অভিমানে অখিলের স্বর বন্ধ হইয়া যায়। বলে "সে কথা এখন থাকনা দাদা। সংসার যখন পেতেছি তখন তো আর ইচ্ছে করে তুলে দিতে পারি না।— তা যাক তুমি নাচার বলছো, তখন আর কি বলবো।"

এত কষ্টে পড়িয়াও কনিষ্ঠ যে তাহার ভুল বুঝিতে পারে নাই ইহা দেখিয়া নিখিলের রাগ বাড়িয়া গেল,— বলিল "না, আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। অখিল সোজা চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিলে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল—কি গো, কি বললেন?"

উদাস-দৃষ্টিতে অখিল জবাব দিল "গরীবের হাতে যখন পড়েছো তখন অনেক কষ্টই সইতে হবে। এত শীগ্‌গির কি আর কিছু হবে?..."

তাহার পর আনন্দ সম্ভার লইয়া শারদীয়ার আগমন হইল।

সকলের ছেলেদের নূতন জামা কাপড় হইল—খালি হইল না সরযূর।

ছোট মেয়ে সরযূ—বাপমা'র সংসারের অভাব অভিযোগ সে জানে না। বায়না ধরে রংকরা জামার জন্ত। পায় না, কাঁদে।

অখিল বলে "যাই একটা জামা না হয় ধারেই নিয়ে আসি, বছরকার দিন।"

সাবিত্রী বলে "রক্ষা করো, আর ধারের কথা মুখে এনো না। ঘরে একটা পুরোনো সিল্কের চাদর আছে—পোকার কাটা, সেইটে কেটে একটা ছোট জামা বেশ হবে'খন।"

তাহার পরও আরও বছর খানেক কাটে।

বেকারের সংসার। ধার ছাড়া উপায় নেই। তাহাও যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাওনা-দারের তাগাদায় অখিল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কি করিবে?

খবর পাইল কোথায় কোন্ চা বাগানে চাকরী খালি আছে। অনেক দূর। মাহিনাও অত্যন্ত কম। কিন্তু তাই বলিয়া উপায় কি?

সাবিত্রীকে বলিল "যাচ্ছি সুবু, কিন্তু কোথায় যাবো আপাততঃ তোমায় বলবো না! তবে ভেবো না—মাঝে মাঝে চিঠি পাবে।"

সাবিত্রী সজল চোখে অখিলের বিদায় ব্যথাকে ঘনাইয়া তুলিল। কথা বলিল না।

অখিল বলিল "যেমন স্বামীর হাতে পড়েছো—তাই এত দুর্দশা। সরযূ রইলো, দেখো। আর কি বলবো?"

জামার হাতায় চোখ পুঁছিয়া অখিল আবার বলিল ভগবান যদি থাকেন, তো আবার দেখা হবে।—"

তাহার পর অখিল রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

সেও আজ নয় বৎসর হইতে চলিল…

সাবিত্রী লুচি ভাজিয়া আনিলে অখিল মুখ হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে গল্প জুড়িল। বলিল "যাক ভগবানের ইচ্ছায় এতদিনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দেনাটা অনেকটা পাতলা করে এনেছি। তবে খাটতে হয়েছিল বটে। দিন রাত যে সব কোথা দিয়ে কেটেছে টের পাইনি। তাতে শরীরটা এতটা ভেঙে পড়েছে।—কিন্তু যাই বলো আমি তোমাদের কেউ নই। টাকা রোজগার করে শুধু পাওনা-দারদের হিসেব মিটিয়েছি, তোমাদের যে এখানে কোন সংস্থান করে যাই নি তা মোটেই ভাবি নি।"

কথায় বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল "কেন তুমি 'কিন্তু' হচ্ছো। ভগবান তো আমাদের একরকম চালিয়ে দিয়েছেন।"

কথা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর দৃষ্টি পড়িল অখিলের বাঁ হাতের একটা আঙুলের উপর। অখিল সেটার অর্দ্ধাংশ কাটিয়া গিয়াছে। শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ও আঙুলটা কাটলো কিসে গা?"

লুচি চিবাইতে চিবাইতে অখিল বলিল "ওটা কলেতে কেটে গেছে। দিন কয়েক কলেতেও কাজ করেছিলাম কি না।"

ডাগর চোখ দুটি বড় করিয়া কন্যা সরযূ বলিল "ভাগ্যি সমস্তটা কাটে নি বাবা!"

একটু হাসিয়া অখিল বলিল "কাটলেই বা মার কি করতাম মা? সেখানে তোর বুড়ো ছেলেকে যত্ন করবার আর কে ছিল বল?"

মা ও মেয়ে দুইজনাই চুপ। কাহারও মুখে কথা নাই।

খাইতে খাইতে অখিল আবার কথা পাড়িল "এখন ভাবি ন'টা বছর কি করে কেটে গেল! মনে হচ্ছে এ যেন সেদিনকার কথা, না?"

সাবিত্রী তখন ও কলে কাটা অখিলের আঙুলটার কথাই বোধ করি ভাবিতেছিল।

সে আনমনেই উত্তর দিল "তা হবে।"

লতিকা, পাশাপাশি বাড়ী, একসঙ্গে কিছুদিন পড়িয়াছে বৈ তো নয়! তবুও তো এই লোক-টাকে একটা দিনও একটু সেবা-যত্ন করা যাইবে। ঠাকুরের রান্না, চাকরের সেবাই ভগবান যার ভাগ্যে লিখিয়াছেন, একটি দিনও যদি তাহাকে একটু আনন্দ দেওয়া যায় ক্ষতিই বা কি তাহাতে?

চা তৈরী শেষ হইলে ছায়া কহিল, যান্ আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।

আমিও একটু সাহায্য করি, বলিয়া নরেন বিস্কুটের প্লেট্ কয়টা হাতে তুলিয়া লইয়া চলিল।

চা বিস্কুট পাইয়া অমরবাবু পরম আনন্দে সোজা হইয়া বসিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া কহিল, আপনি চা খেলেন না?

—আমি তো চা খাইনে।

—তবে কেন মিছে আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন বলুন তো, এ আপনার ভারী অন্যায় হ'ল কিন্তু!...

অমরবাবু কহিলেন, অন্যায় কিছু হয় নি নরেন, তুমি আমার মা-কে চেনো না, ও এক-বারে সেকেলে, এই সবই ও ভালবাসে।

বেশ বেশ বড়ই সুখী হলুম, সেকাল আর একালের সামঞ্জস্যটা আমার কাছে ত বড় মধুর ঠেকে, বলিয়া মমতায়-ভরা দুই চোখ তুলিয়া ছায়ার পানে চাহিয়া নরেন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতটুকু প্রশংসাবাদেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

চায়ের বাটী নিঃশেষ করিয়া অমরবাবু সামনের দেয়ালের ঝুলানো বড় দুইখানা ছবি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিলেন, হয়েন দার ফটোখানা তো খুব সুন্দর হয়েছে। এ রকম এন্‌লার্জমেন্ট বড় একটা দেখাই যায় না। ছায়ার দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমি তো এদের কাউকে দেখনি ছায়া, এরকম দু'টি মানুষ সংসারে খুব কম হয়। আমি আর দাদা প্রায়ই হাজারিবাগ থেকে এখানে বেড়াতে আসতুম, এমন মিষ্টভাষী সাধু পুরুষ সংসারে বিরল, তেমনি ছিলেন বৌঠান্, এমন ঝক্কি পোয়াতে কোন মেয়েছেলেই আজকাল চাইবে না।

ছায়া বুঝিল ইহারাই নরেনের পিতা মাতা, কি শান্ত সংযত উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিলেই মনে ভক্তি হয়। সে উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে তাহার সঙ্গে আনা মালা দুইগাছি দুই-খানা ফটোর উপর দিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া বসিল।

নরেন উঠিয়া গিয়া ক্ষণকাল পিতামাতার প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া আপনার জায়গায় বসিল। অমরবাবু হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, মালা দুটো তোমার আনা সার্থক হ'লো মা!

ইতিমধ্যে বাড়ীর চাকর ও ঠাকুর আসিয়া হাজির হইলে নরেন কহিল, বাবুদের বেড়ান শেষ হল, এখন চট্‌পট্ করে রান্নার যোগাড় দেখো!

ছায়া কহিল, ওরা যোগাড় করে দিক, আমি রাঁধবো।

সে কি, না না, সে হবে না, আপনি ও রকম কর্লে আমি ভারী দুঃখিত হ'ব, বলিয়া নরেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

"বেশ, তা হলে আমি খাব ও না, বলিয়া ছায়া নরেনের মুখের পানে চাহিল, সে চাহনিতে হয়তো কিছু ছিল, নরেন কি একটা বলিয়া আপত্তি করিতে যাইতেছিল, তাহা মুখেই রহিয়া গেল।

ছায়াই রাঁধুক না- ওর এতে কোন কষ্ট নেই নরেন, ওসব পারে, আমার বুড়ো বয়সের মা

কিনা বলিয়া বোধ করি বা আপনার রসিকতায় অমরবাবু আপনি হাসিয়া উঠিলেন।

মাঝের হল ঘরটায় যাইয়া ছায়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকাণ্ড দুইটা খাট একত্র জুড়িয়া তাহার উপর ছোট বড় তিনটা বিছানা করা রহিয়াছে, ওপাশে জানালার ধারে একখানি ছোট খাটে একটা বিছানা, পাশের জানালাটা খুলিলেই সামনের বাগানটার সব খানি চোখে পড়ে, বোধ করি ওখানটায় শিউলী শুইত। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই সব ছোট বড় নানা রকমের শয্যা প্রতিদিন রচনা করিয়া তাহারই একটা পাশে নরেন শুইয়া থাকে, সেখানে শুইয়া আর যাহাই হ'ক, সুনিদ্রা হওয়া যে সম্ভব নয় তাহা ছায়ার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু এই সব ছাড়িয়া অন্য ব্যবস্থা করিলেও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া তো মনে হয় না। বাড়ী জুড়িয়া ছোট বড় ছয় সাতটা ঘর, ইহারই এক প্রান্তে ছোট একটি ঘর দখল করিয়া ঠাকুর চাকর থাকে, আর অবশিষ্ট কয়খানি মৃত্যুশাসিত চির নির্জ্জন কক্ষ জুড়িয়া এই একটি প্রাণীর স্নেহের পরশ দিবানিশি একভাবে জাগ্রত হইয়া আছে, অথচ, ইহার অংশ লইবার দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নাই। হল ঘরটা ছাড়িয়া পাশের ছোট ঘরটিতে যাইতেই বোধ করি আলোর জ্যোতিতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়াই পাশের ঘর হইতে ময়নাটা করুণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, সুরেন!

ডাক শুনিয়া ছায়ার বুকের ভিতরটা যেন নাড়া দিয়া উঠিল। পাখীটাই আজ নরেনের দুঃখের বন্ধু। এ আজও তার শিশু পরিচর্য্যাকারী বন্ধুর দুঃখ ভুলে নাই, হয়তো এখনও অবধি তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকে।

নরেন কহিল, শুনলেন?

ছায়া কোন জবাব দিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন কহিল, ও আগে অনেক কথা বলতো, এখন কেবল ঐ একটি বুলি ওর মুখে আছে, আর সব ভুলে গেছে, আজ দু'বছর তো ওকে আর পড়ান হয় না। পড়াতে ইচ্ছেও হয় না, ভাবি কবে ও এ বুলিটাও ভুলবে। এক এক দিন মধ্যরাতে বা দুপুর বেলা, যখন কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই ও সুরেন সুরেন বলে এমনি চেঁচিয়ে ওঠে যে চম্‌কে উঠে ছুটে আসি, অমনি সব চুপ, ও কেবল চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতে থাকে। ভাবি কি জানি, হয়তো ওর সঙ্গে দেখা করতে সে এখনও ছায়ামূর্ত্তিতে আসে, মানুষের সাড়া পেয়েই হয়তো মিলিয়ে যায়, আচ্ছা, আমি এলেই পালায় কেন বলুন তো?

ছায়া ইহার কি জবাব দিবে? সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক এই শোক তাপদগ্ধ স্নেহময় লোকটী যে সব সম্ভব অসম্ভব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু পুরীতে জীবিত আছে, কোন কথা কহিয়াও তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে ছায়ার সাহস হইল না। সে সজল-চোখে ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ছোট দুইখানা তক্তপোষ একত্র জোড়া রহিয়াছে, তাহার উপর মাদুর পাতা, ছবি-লতা-পাতা-ভরা ছেলেমেয়েদের কত-গল্পের বই, শ্লেট-পেন্সিল দোয়াত-কলম নীচের দিককার দুই একখানা ইংরেজী বই এই সব ছড়ান, টেবিলের উপর একটি সেজ, তাহার পাশে একখানা বই খোলা রহিয়াছে, মনে হয় এইমাত্র ছেলেমেয়েদের দল পড়া ছাড়িয়া মায়ের ডাকে কলরব করিতে করিতে যেমন কার যে বই তেমনি ফেলিয়াই যে যার মত ছুট দিয়াছে। শ্লেটখানার হিজিবিজি কতকি লেখা প্রায় মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া যাইবার মতো হইয়াছে, বিশেষ নজর করিয়া দেখিলে দুই একটা কথা এখনো বুঝা যায়, লোভী বামুন ও বুড়া বাঘের গল্পের কয়েক লাইন সেটায় লিখিবার চেষ্টা কে যেন করিয়াছিল।…

কোন ফল নেই! আমার মনে হয়েছিল, তিনি তাঁর বোম্বাইএর পত্র লেখকের সঙ্গে দেখা করবার জন্তেই কলকাতায় গেছেন। কিন্তু বিজয় বাবু বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কলকাতায় বাবার সাক্ষাৎ হয় নি। সত্যি কথা কিনা কে জানে!

অতসী আগামী কালের উপাসনার জন্তেই বেশী উদ্বিগ্ন! আমার আশঙ্কার কথা, ও কি বুঝবে! একবার মনে হল, সব কথা ওকে বলি; পরক্ষণে ভাব্‌লাম, না থাক! এ সব কথা শুনে অতসী কি মনে করবে, কে জানে! কাজ নেই ওকে এ সব কথা শুনিয়ে!

কিন্তু এমন ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা অসহ্য লাগছে! বাবার খোঁজ করতেই হবে! তাঁর সম্বন্ধে একটি লোক সব জানে। অন্ততঃ যে চিঠি প'ড়ে বাবা ব্যস্ত হোয়ে কলকাতা চলে গেলেন, সে চিঠিখানা যে কার কাছ থেকে এসেছে তা নিশীথবাবু নিশ্চয় জানেন! মনে মনে স্থির করলাম, তাঁর কাছে গিয়ে খবর নেব!

বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে যখন বেরুলাম, তখনো সন্ধ্যা হ'তে কিছু বিলম্ব আছে! সূর্য্য অস্তে গেছে বটে কিন্তু তখনো সুমুখের দিগন্তপ্রসারি মাঠের উপর থেকে তার শেষ রক্ত ছটা বিলীন হ'য়ে যায় নি! কাজ শেষ ক'রে চাষীরা ঘরে ফিরছে। মাঠের উপর দিয়ে যে আঁকা-বাঁকা পথ গ্রামের মধ্যে গিয়ে মিশেছে, সেই পথ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম! মাঠের শেষে নিশীথ বাবুর বাড়ী!

অতদূর যেতে হ'ল না। অদূরেই মনীষা দেবীর লাল ইটের বাড়ীখানি দাঁড়িয়ে আছে। ঠাহর ক'রে দেখলাম, তার চওড়া বারান্দার উপর নিশীথ বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

রুদ্ধ নিশ্বাস আমি তখন গতি ফিরিয়ে লাল বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

নিশীথ বাবু বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করলেন। খুব সম্ভব আমাকে দেখতে পান নি!

বাড়ীর নিকটে এসে কাছাকাছি কারুকে দেখতে পেলাম না। সুমুখের ঘরেও কেউ নেই। নিশীথ বাবু কোথায় গেলেন? বাধ্য হ'য়ে সুমুখের দরজার কড়া নেড়ে শব্দ করলাম।

কিছুক্ষণ পরে হাতে আলো নিয়ে মনীষা-দেবীর দাসী রাধা এসে উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা হয়েছে ব'লে সে ঘরে ঘরে আলো দিচ্ছে! আমাকে সুমুখে দেখে প্রথমটা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারপর আমাকে সুমুখের চেয়ারে বসিয়ে বল্‌লে—আপনি বসুন, আমি মাকে খবর দিচ্ছি!

একটু পরেই ফিরে এসে সে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল! দাসী নির্দ্দেশ মতো যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম, দেখলাম, তার মধ্যে একখানি সোফার উপর নিশীথ বাবু ব'সে কি একটা বইএর পাতা উল্টোচ্ছিলেন, আমাকে দেখে অতিমাত্রায় বিস্ময়ান্বিত হোয়ে উঠে দাঁড়ালেন! তাঁর আচরণে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আমার আগমন তাঁর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত!

আমার পিছনে মনীষা দেবী এসে দাঁড়ালেন!

বল্‌লেন—কাপড় বদ্‌লাতে দেরী হ'য়ে গেল! তোমরা বোসো! দাঁড়িয়ে আছো কেন?

নিশীথ বাবু আমার পানে চেয়ে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—মিস মিত্র! ব্যাপার কি? হঠাৎ এ সময়ে!

কি কথা দিয়ে আমার বক্তব্য আরম্ভ করব, তা ঠিক করতে পারছিনে! আমার মনে হচ্ছে, আমার পরে মনীষা দেবী এবং নিশীথ বাবুর মনোভাব আজ যেন বিশেষ প্রসন্ন নয়। আমার এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁরা কেউই খুসী হ'য়ে ওঠেন নি!

মনীষা দেবীর শান্ত আয়ত চোখের দিকে

তাকিয়ে দেখলাম, এতটুকুও প্রীতির চিহ্ন সেখানে ফুটে উঠছে না! কিন্তু কেন? কিসের জন্তে তাঁর ব্যবহারে এ পরিবর্ত্তন এলো? আবার তাঁর মুখের পানে তাকালাম। না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না! আমার উপর তিনি বিরূপতার ভাণ করছেন! নিশ্চয়!

একটু ইতঃস্তত ক'রে বললাম—আমি নিশীথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি! ওঁর বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু দেখলাম, উনি এখানে রয়েছেন। তাই এখানে এলাম! আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়েছি! তাই আমি ওঁকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই!

নিশীথবাবু জবাব দিলেন—মাপ করবেন, মিস মিত্র! আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারবো না! সুতরাং আমাকে কোন প্রশ্ন না করাই ভাল!

তিনি যে এমনি তর একটা কিছু বলবেন, তা আমি তাঁর ভাব দেখে অনুমান করেছিলাম। তাঁর কথার উত্তরে অবিচলিত কণ্ঠে বললাম— আমার একটি মাত্র কথার উত্তর দিয়ে আপনি আমার অসীম উপকার করতে পারেন! গত বুধবার দিন আপনি আমাদের বাড়ী গিছলেন; সেইখানে আপনার পকেট থেকে একখানি চিঠি মাটিতে প'ড়ে যায় এবং আমি তা আপনাকে কুড়িয়ে দিই। এ সব কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে। আমায় বলুন, সে চিঠিখানি কে পাঠিয়েছিল?

আমার পাশ থেকে একটা অর্দ্ধস্ফুট বিস্ময়োক্তি শোনা গেল। পরক্ষণেই কাচের বাসন মাটিতে প'ড়ে চূর্ণ হওয়ার শব্দ! চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, মনীষা দেবী পাশের কোয়াটনট থেকে একটি চীনা মাটির পুতুল হাতে তুলে নিয়ে দেখছিলেন, সেটি তাঁর হাত থেকে খ'সে মেজের প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেছে! মনীষা দেবীর দুই চোখে ভয় এবং উত্তেজনার চিহ্ন!

গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে নিশীথ বাবু বললেন:

—আমার পকেটে অনেকগুলো চিঠি ছিল; আপনি কোনখানার কথা বলছেন তা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আর তা ছাড়া, সে পত্র-লেখকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? আমায় যাঁরা পত্র লেখেন তাঁরা আপনার পরিচিত না হওয়াই সম্ভব; সুতরাং আমায় চিঠির সঙ্গে আপনার বর্ত্তমান বিপদের যে যোগ কোথায় তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব'লে আমায় মাপ করবেন। সে চিঠির জন্তে আপনার ব্যস্ততা কি কারণ?

বললাম—কারণ সে একেবারে নেই তা নয়! মঙ্গলবার দিন সকালে বাবা একখানা পত্র পান! তার বিষয়বস্তু কি তা আমি জানি না বটে কিন্তু সে পত্র তাঁকে যে কলিকাতায় যাবার জন্তে আহ্বান করা হয়েছিল, তা ঠিক! কাল তাঁর কলিকাতা থেকে ফেরবার কথা ছিল কিন্তু তিনি ফেরেন নি, এবং কোন সংবাদও পাঠান নি! আজ সমস্ত দিনের মধ্যেও তাঁর কাছ থেকে কোন চিঠি বা তার না পেয়ে আমরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠেছি! কলকাতা থেকে এখানে আসবার শেষ ট্রেণ এই মাত্র চলে গেল কিন্তু তিনি ফেরেন নি! কোথায় গেছেন, কী অবস্থায় আছেন—সে সব কোন খবরই আমরা পাই নি। কাল এখানকার মন্দিরে উপাসনা আছে, সে সবের জন্তেও আমাদের ভাবনা হয়েছে। অতসী, অতসী আমার ছোট বোন, অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে, তার ধারণা কলকাতায় নিশ্চয় বাবার কোন বিপদ ঘটেছে!

নিশীথবাবু পূর্ব্বের মতো নিস্পৃহ, ধীর কণ্ঠে বললেন—আপনার কথা শুনে বুঝলাম, আপনার এবং আপনার ভগ্নীর উদ্বেগ অকারণ নয়। শুনে

খুব দুঃখিত হলাম! এ বিষয়ে আপনাদের কোন রূপ সাহায্য করতে পারলে আমি বিশেষ আনন্দিত হতাম, কিন্তু আপনি কেন যে—

তাঁহার অসমাপ্ত কথা শুনে মুখ তুলে তাঁর পানে তাকালাম! সমস্ত কথা জেনেও তিনি যে আমার সুমুখে অভিনয় ক'রে চলেছেন, এ সত্য তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কাছে গোপন করতে পারছেন না!

বল্লাম—আমি কেন যে আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি, তার কারণ বলছি! আমার বাবা যে পত্রখানা প'ড়ে ত্রস্ত হ'য়ে সেইদিনই কলকাতা রওনা হলেন, সেই একই হাতের লেখা আর একখানা পত্র আমি আপনার কাছে দেখতে পাই!

আমার কথা শুনে নিশীথ বাবু নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কোন উত্তর জোগালো না! দেখলাম, মনীষা দেবী আমার অলক্ষ্যে নিশীথ বাবুর পানে তাকিয়ে ইঙ্গিতে কি যেন বল্লেন! নিশীথ বাবু নিঃশব্দে ঘরের প্রান্তে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে তিনজনেই কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম! নিশীথ বাবুকে আমি কোন প্রশ্ন করি নি বটে, কিন্তু আমি কি জানতে চাইছি তা তিনি এবং মনীষা দেবী বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন; বুঝতে পেরেছেন যে, ঐ কথার মধ্যে দিয়ে আসল সত্য কথাটাই আমি জানতে চাই!

তাঁদের নীরবতায় অধীর হয়ে উঠ্লাম। বললাম—দয়া ক'রে উত্তর দিন! কে আপনাকে সে চিঠি লিখেছিল?

তথাপি কোন উত্তর এল না। উদভ্রান্ত হ'য়ে উঠ্লাম। রমাপিসির বাড়ীতে সেই লোকটির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা বিস্মৃত হলাম। সম্মুখের দুজনকার নির্ম্মম নিষ্ঠুর নীরবতাকে বিদ্ধ করা ছাড়া আমার যেন আর কোন কাজ ছিল না; উত্তপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্লাম:

—বেশ; আপনারা না বলুন, আমিই বলছি, কে সেই চিঠি লিখেছিল। তার নাম—বিজয় দত্ত! সে এখন রমা পিসির বাড়ী ব'সে আছে! আপনারা না বলেন, আমি তার কাছেই যাবো! হয়ত সেখানে সব কথা জানতে পারবো!

আমার কথা শুনে নিশীথবাবু ভৎসনা-পূর্ণ দীপ্ত নেত্রে আমার পানে তাকালেন! মনে হল তিনি যেন এখুনি আমায় কঠিন তিরস্কার করবেন। কিন্তু মনীষা দেবীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন! মৃতের মুখের মতো সে মুখ মলীন বিবর্ণ হয়ে গেছে! আমার কথা শুনে মনে হ'ল যেন তিনি কঠিন আঘাত পেয়েছেন। বুঝলাম, বিজয় বাবুর কথা নিশীথ বাবু আগেই জানতেন কিন্তু মনীষা দেবী এই মাত্র আমার মুখ থেকে তার কথা শুনলেন; তিনি জানতেন না যে, বিজয় বাবু এখানে এসেছে!

নিশীথবাবু কঠিন কণ্ঠে বললেন—যখন এতই জানেন তখন বাকী খবরের জন্যে তার কাছে যাওয়াই ভাল! নিশ্চয়ই সে-লোকটি আপনাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাবে এবং আপনাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেবে! যান, আপনি তার কাছেই যান।

না। না!

আর্ত্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মনীষা দেবী বলে উঠ্লেন—কখনো না! কেতকী, কখনো তুমি তার কাছে যাবে না।

চকিত হয়ে তাঁর পানে তাকালাম। দেখলাম মনীষা দেবীর দুই চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে! নিমেষের মধ্যে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন; তারপর তাঁর কম্পিত ডান হাতখানি আমার কাঁধের উপর স্থাপন করলেন। তাঁর মুখ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে

গেলাম, ক্ষণকাল পূর্ব্বের নিজ্জহ কঠিন মুখ বেদনায় মমতায় অপরূপ করুণ হ'য়ে উঠেছে !

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্লেন—একটুতেই অত অধীর হোয়ে পড়ে কি ! বিশেষ ভাবনা কোরো না ! আমার বিশ্বাস, তোমার বাবা ভালই আছেন ! আমার বিশ্বাস, কালকের উপাসনার সময় তিনি নিশ্চয় উপস্থিত হবেন। তিনি কোথায় আছেন, তা আমারা জানি না। অবিশ্যি আমরা কয়েকটা কথা জানি—কিন্তু সে কথা শুনে তোমার কোন লাভ নেই ! তুমি এইমাত্র যে-লোকটির কথা উল্লেখ করলে তাকে অন্বেষণ করতেই তিনি কলকাতা গেছেন। কিন্তু তিনি তাকে সেখানে খুঁজে পাবেন না। তা না পেলেও, তিনি নিরস্ত হবেন না ; জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাকে খুঁজবেন ! কিন্তু, মেয়ে, তুমি আর যাই কর, বিজয় দত্তের সংস্পর্শ বিষের মতো পরিহার কোরো, তোমার বাবা এবং বিজয় পরস্পর ভীষণ শত্রু ! বিজয়ের কাছে কখনো যেও না ! তোমার বাবাকে বোলো না যে, সে এসে এইখানে কাছাকাছি আছে ! হয়ত তাঁদের এইখানেই দেখা হবে ; কিন্তু ভগবান করুণ যেন, সাক্ষাৎ না-ই হয় !

কী সব ভীষণ আতঙ্ক দায়ক কথা !! শুনতে বার বার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হোয়ে আসতে লাগলো ! ভীত-কণ্ঠে বল্লাম- এই বিজয় দত্ত কে, মনীষা দেবী ?

—সে কথা আমি তোমায় বলতে পারবো না। সেকথা না জানাই ভালো !

আবার চুপচাপ। কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু বাবার সম্বন্ধে তো কোন খবর পেলাম না ! মনীষা দেবীর কথার পর আর বিজয় বাবুর কাছে যাবার সাহস হ'ল না ! তার সম্বন্ধে মনে একটা আতঙ্কের উদয় হ'ল। কী উদয় হ'ল ! কী জানি, যদি ইতিমধ্যে বাবার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে ! লোকটার সেই ক্রুর হাস্য রঞ্জিত মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো ! সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠ্‌লাম ! মুখ দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা অপরিস্ফুট ভয়ার্ত্ত শব্দ বার হল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাল নিশীথ বাবু কখন এসে আমার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়িয়েছেন এবং একদৃষ্টে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দুই চোখের সেই নূতন দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝতে পারলেম ন ; মনের মধ্যে অস্পষ্ট শিহরণ অনুভব করলাম !

নিশীথবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—মিস মিত্র, আপনি যদি জানলার কাছে আসেন তাহ'লে আমি আপনাকে এমন একটি জিনিষ দেখাতে পারি, যা দেখে আপনার মনের দুশ্চিন্তা অনেক খানি কমবে।

ত্বরিৎ পদে তাঁর সাঙ্গ জান্‌লার ধার গিয়ে দাঁড়ালাম ! দেখলাম, অদূরবর্ত্তী পথের উপর দিয়ে একটী লোক মন্থর গমনে আমাদের বাড়ীর অভিমুখে চলেছে ! তাঁর দুই কাঁধ সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুকে পড়েছে, তাঁর চলার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি অত্যন্ত শ্রা ন্ত এবং অবসন্ন !

মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্‌তে পারলাম এবং হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লাম—বাবা !

বাবা ফিরে এসেছেন !

চলবে

নেশা

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়

কর্ম্মস্থল আসাম হইতে কলিকাতা ফিরিতেছি, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কুলী, ধাঙ্গড়, খোট্টা ও মাড়য়ারী ব্যবসায়ীর দল বেশ করিয়া কামরাটী দখল করিয়া আছে।

এমন একখানি গাড়ী পাইলাম না, যেখানে এই কুলী ধাঙ্গড়েরা নাই। ইঞ্জিন হইতে গার্ডের গাড়ী পর্য্যন্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। পকেটের অবস্থাও সুবিধা নয় যে, তৃতীয় শ্রেণী বদল করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে যাইব। নেহাত বাধ্য হইয়া তাই কোনমতে উদ্গত অন্নপ্রাশনের অন্ন রোধ করিয়া, ইঞ্জিনের কয়লা সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ট্রেণে যখন চাপি তখন বেলা আটটা, এখন প্রায় সন্ধ্যা। ক্ষুধা রীতিমত পাইয়াছে। খাবারও সঙ্গে আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আর সেগুলি বাহির করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। জানালাতে মাথা লাগাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম আরও কতক্ষণ ঘুম হইত জানি না, হঠাৎ সমবেতকণ্ঠের বিরাট এক "হো রামা, রামা হো" শব্দ হইতে আচম্‌কা জাগিয়া দেখি—সহযাত্রীরা মাদল, করতাল প্রভৃতি লইয়া স্ত্রীপুরুষে রাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। একে ত' গাত্রগন্ধে প্রাণ যায় যায়, তাহার উপর রাবণ কীর্ত্তন—ব্যাকুল হইয়া আশ্রয় আশায় চতুর্দ্দিকে তাকাইতেই দেখি—আশ্চর্য্য! আমারই মত একজন বাঙ্গালী এক কোনে বসিয়া আমার দিকে জুল জুল করিয়া চাহিয়া আছেন। ইহাদের প্রবল চীৎকারের উপর গলা ছাড়িয়া ডাকিলাম—"দাদা, এইদিকে আসুন।" রাম-কীর্ত্তন সহসা আসিয়া গেল। আবার ডাকিলাম—"দাদা, এইদিকে আসুন।" উত্তর আসিল—"জিনিষ আছে যে, যাই কেমন ক'রে!" আমি বলিলাম—"ড্যাম্ জিনিষ! আপনি আসুন না!" ভদ্রলোকটি কোনমতে ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসিবার স্থান করিয়া দিয়া আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথা যাবেন, আসছেন কোত্থেকে, নিবাস কোথায়" ইত্যাদি। ভদ্রলোকও পাল্টা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আলাপ জমিয়া উঠিল।

বলিলাম—'আর দাদা, সেই সকালে গাড়ীতে চেপেছি, এতক্ষণ অবধি বাঙ্গালীর মুখ দেখলুম না। প্রাণ যে কি ক'রছিল, তা' আর বোঝাব কেমন করে?"

"আর বলেন কেন? এ ব্যাটাদের জালায় কি আর কারুর যাতায়াত করবার উপায় আছে। আমি মশাই ত্রিশ বছর ধরে এ লাইনে যাতায়াত করছি, কিন্তু একটি দিনও গাড়ীতে চেপে শান্তি পাই নি!"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি করা হয় আপনার?"

"এই গেঞ্জি, মোজা, সার্ট, কাপড় শাড়ী—এই সব চা-বাগানে বিক্রী সিক্রী ক'রে কোনোমতে মশাই পেটের ভাত ক'রে খাচ্ছি। যা, দিনকাল পড়েছে, একদম বিক্রী নেই! আ রে বাবা পয়সা না দিলে কি পয়সা আসে, কি

বলেন ? তাতো কেউ বুঝবে না, যত সব হুঁ! তা' আপনার কি করা হয় ?',

"ফ্রি প্রেসের রিপোর্টার !''

"তার মানে ?''

"মানে, এই খবরের কাগজে কর্ম্ম করা হয় আর কি !''

"ও, খবরের কাগজ, তাই বলুন ! বেশ, বেশ! কোন্ কাগজ—'হিতবাদী' ?"

"আজ্ঞে না !''

"কিন্তু যাই বলুন, বেড়ে কাগজখানা মশাই ! এই দেখুন না আজকের কাগজ, পড়েছেন আপনি —বলিয়া ভদ্রলোক ব্যাগ খুললেন। খুলিয়াই তাঁহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল। ফিরিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ দেখুন, কমলানেবু খাবেন ? আজ খাড়িবাড়ী চা-বাগানে গেছলুম। সেখান কার বড়বাবু নেবুগুলো দিলেন। ভারী মিষ্টি নেবু কিন্তু। আসুন না, খাওয়া যাক্ !''

ভদ্রলোক নেবু লইয়া যাইতেছেন, গ্রহণ করিতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ হইল। আপত্তি জানাইয়া বলিলাম—"না থাক্ ! নেবু আমি বড় পছন্দ করি নে। তা' ছাড়া শরীরও—

"আ রে মশাই, দু'টো নেবু খাবেন, তা'তে শরীরট কি ?—আসুন খাওয়া যাক্ !"

ভদ্রলোকের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্য্যন্ত নেবু গ্রহণ করিতে হইল। খাইয়া দেখিলাম ভদ্রলোক সত্যই বলিয়াছেন, এমন মিষ্টি নেবু অনেকদিন খাই নাই। নেবু খাইতে খাইতে ভদ্রলোক 'হিতবাদী' খুলিলেন। একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখছেন মশাই কি ব্যাপার ! কলকাতায় নাকি বাণ ডেকেছে। কোলকাতা কেমন জায়গা, সেখানে যদি বাণ হয়, তবে কি আর রক্ষে আছে, সব অথৈ জলে ডুবে গেছে ! ভাগ্যিস্ আমার বাড়ী নদীর ধারে নয়, হ'লে কি আর এতক্ষণ থাকত' মশাই ; হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার বাড়ী যেন কোথায় বল্লেন ?"

"বরিশাল।"

জিহ্বা ও তালুর সংযোগে প্রবল এক শব্দ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—"বরিশাল ! তবেই হয়েছে ! সে ত' মশাই, বে অফ্ বেঙ্গলের ধারে ! সে কি আর এতক্ষণ আছে ? বাড়ীর খবর পেয়েছেন ?"

"আজ্ঞে না।"

"পাবেন কেমন ক'রে মশাই ! সেখানে কেউ থাকলে ত' খবর দেবে ! সব যে মশাই রসাতলে গেছে ! ও কি খাচ্ছেন না কেন, খান, খান, এই যে দিচ্ছি !" বলিয়া ভদ্রলোক আবার ব্যাগ খুলিলেন। খুলিয়াই আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম গল্প করিতে করিতে সব কয়টি নেবুই শেষ হইয়াছে। এইবার আমার পালা। টিফিন কেরিয়ার খুলিয়া লুচী তরকারী বাহির করিয়া বলিলাম—"আসুন।"

"ওঃ, আপনার সঙ্গে খাবার আছে যে দেখ্ছি ! বেশ, বেশ, খিদেও পেয়েছে !"

লুচী ও তরকারী ভাগাভাগি করিয়া খাইতে খাইতে বলিলাম,—"আপনার বাড়ীর জন্যে নেবুগুলো—"

"আ রে, তা তে কি মশাই ! আবার আনা যাবে ! আমার যাওয়া ত' আর কামাই নেই, আর নেবুও ফুরিয়ে যাচ্ছে না ! উঃ, তরকারীটা ত' বড্ড বিষম ঝাল।"

"ঝাল ! আহা হা, আচ্ছা, এই নিন কিছু মিষ্টি খান। ভাল সন্দেশ আছে, এই নিন !" বলিয়া কিছু মিষ্টি তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম।

সহসা ভাবান্তর ঘটিল, রূঢ় স্বরে ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আজ্ঞে না, মাপ ক'রবেন !"

হাস্যচপল লোকটীর এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন!"

"আমি মিষ্টি খাই নে।"

"মিষ্টি খান না, সে কি! এই ত' নেবু খেলেন, আর এ…এ-ও ত' মিষ্টি!"

"এ মিষ্টি খাই নে।"

"কেন? অম্বলের ব্যারাম কিছু আছে না কি?"

"আজ্ঞে না!"

"তবে!"

"কারণ আছে।"

অসুখ নাই, তবুও মিষ্টি না খাইবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি কারণ, শুনতে পাই নে!"

ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলেন। একটি প্রান্তরের মধ্য দিয়া পূর্ণবেগে ট্রেন চলিয়াছে। দূরে, বহুদূরে দুই একটি আলো মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। অতি ক্ষীণ। এত ক্ষীণ আলো পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। অবিশ্রান্ত রেলের ঘরঘরানি। মাঝে মাঝে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ, বেশ কতক্ষণ অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ শোনা যায়, তারপরেই আবার নিস্তব্ধ। আবার ঘরঘরানি। দুইজনে কতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলাম জানি না। সহসা ভদ্রলোকটি আমার পানে চাহিলেন। তাঁহার তখনকার চাহনি আমি ভুলিব না। বহু লোকের বহু চাহনি দেখিয়াছি। কিন্তু এমন আর কখনও দেখি নাই। নয়নের প্রতিটি কোণে যেন বিষাদের ছাপ।

ভগ্নকণ্ঠে হাসিতে চাহিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন,—একান্তই ছাড়বেন না যখন তখন বলি :—

আমার বয়েস তখন বাইশ। বাবা ছিলেন সাব্-রেজিষ্ট্রার। মফঃস্বলের এক গণ্ডগ্রামে সেবার তিনি বদলী হ'লেন। আমরা চিরদিনই বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছি, এবারও গেলুম। সঙ্গে বহু জায়গাতেই ঘুরেছি, কিন্তু অমন অভিশপ্ত জায়গায় আর কখনও যাই নি। কেন অভিশপ্ত, তাই বলি।

যাবার কয়েকদিন পরেই আমরা সবাই জ্বরে পড়লুম। কি ভীষণ জ্বর! অমন জ্বর আর কখনও আমাদের হয় নি। সবারই জ্বর। পথ্য দেবার, মুখে জল দেবার লোকটি নেই। চিকিৎসা কিছু হ'ল না। বাড়ীর আশ পাশে ভদ্রলোক বলতে কেউ নেই। কয় ঘর চাষা-ভূষার বাস। তারা আমাদের দিকে মোটেই ঘেঁষত না। রেজিষ্ট্রি অফিসের পিওনের মুখে জানা গেল পাঁচ মাইল দূরে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁকেও না কি পাওয়া যাবে না। কারণ কয়েকদিন ধরে জল হওয়ায় মেঠো পথ একেবারে ডুবে আছে। কাদা ভেঙ্গে আসতে না কি ডাক্তার বাবুর আপত্তি। যাহোক্, দিন দশেক পর বিনা চিকিৎসাতেই সবাই একে একে ভাল হ'য়ে উঠ্‌লুম। আমার একটী বিধবা বোন ছিল। দিন দুই পরে সে আবার যে জ্বরে পড়ল আর তাকে উঠ্‌তে হ'ল না। তিন দিনের দিন বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে চ'খের ওপর চিরদিনের মত সে নীরব হ'য়ে গেল। বাবা জীবনে অনেক শোক সয়েছেন কিন্তু এতবড় কষ্ট সামলান তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একদিন বিকেলে কাঁপতে কাঁপতে তিনি শয্যা নিলেন। সেই রাতে তাঁর প্রবল জ্বর। জ্বরের ঘোরে সারারাত কেবল প্রলাপ ব'কলেন। পরদিন তাঁর অবস্থা দেখে ভাল মনে হ'ল না। ডাকালুম সেই ডাক্তারকে। ডাক্তার দেখে বললেন, 'ডবল নিউমোনিয়া'। আমি ত' চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলুম। আমাদের যা' কিছু আয় সবই বাবার চাকরীর উপর নির্ভর।

জোত-জমী কিছু নেই। আমি তখন বেকার। বাবার কিছু হ'লে এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যে কোথায় দাঁড়াব, খেতেই বা দেব কি—ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় পাগলের মত হ'য়ে গেলুম। ঠিক্ ক'রলুম বাবাকে বাঁচাতেই হবে! সম্বল মাত্র একশতটি টাকা—বাবার সেই মাসের মাইনে। এই একশতটি টাকা দিয়ে বাবাকে বাঁচাতে হবে। আর টাকা পাওয়া যাবে না, এখানে সাহায্যও পাওয়া য'বে না কার কাছে। ডাক্তারকে ভিজিট দিলুম। রোজ আসতে বলে দিলুম। ওষুধ আনতে সহরে লোক পাঠিয়ে দিলুম। শুশ্রূষার জন্যে একজন লোক ঠিক্ করলুম। রাতদিন সে থাকবে।

তিন দিন পরের কথা। সেদিন সকালে ডাক্তার বল্লেন, "রোগীর বাঁচবার আশা খুবই কম।" অকস্মাৎ এই কথা শুনে আশঙ্কায় মন এতটা মুষড়ে পড়ল যে, কিছুতেই মনকে সুস্থির ক'রে বাবার শুশ্রূষার মধ্যে ডুবিয়ে রা'খতে পারছিলুম না। বিপদের উপর বিপদ। মা হঠাৎ ফিট হ'য়ে পড়লেন। কোন্ অবসরে তিনি ডাক্তারের কথাগুলো শুনেছিলেন! ডাক্তারের কথা তাঁর প্রাণে এতই আঘাত করে যে, আর তিনি আপনাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারলেন না। আরও বিপদ ছোট দুগ্ধপোষ্য ভাইটি আবার জ্বরে পড়ল! তাকেও দেখে ডাক্তার নিউমোনিয়া বলে সন্দেহ ক'রল।

আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন বোধ হয়! একে ডাক্তারের প্রাণান্তকর কথা তার উপর মা অজ্ঞান, ছোট ভাইটিরও আবার নিউমোনিয়া। সামান্য কয়টি টাকা মাত্র সম্বল। এ দিয়ে ডাক্তারের দর্শনী চালাতে হ'বে, ওষুদ পথ্যের খরচ কুলোতে হ'বে, সংসারও দেখ্‌তে হ'বে। একে ত' বাবার জীবন সংশয় অবস্থা, প্রাণে রাতদিন আগুন জ্বালছিল, তার ওপর এই সব অশান্তি আমাকে প্রায় পাগলের মত করে তুলল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল। শুশ্রূষাকারীকে বাবাকে দেখ্‌তে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

অনতিদূরে ছোট একটি বাজারের মত ছিল। খানকয়েক মুদীর দোকান, একটা মিষ্টির দোকান, একটা কাপড়ের দোকান, একটা দর্জ্জীর দোকান—এইগুলো মিলে বেশ ছোট একটা বাজারের মত হয়েছিল। তরী তরকারীও সেখানে পাওয়া যেত। ঘুরতে ঘুরতে আমি সেইখানে এসে দাঁড়ালুম। কয়েকদিন ধরে অবিরাম রাত-জাগার ফলে সমস্ত শরীরটা যেন ভেঙ্গে আস্‌ছিল। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়াটা গায়ে লেগে বেশ ঘুম আস্‌ছিল! গত রাতে কিছুই খাওয়া হয় নি। সম্মুখে খাবারের দোকান দেখে খিদে যেন আরও বেড়ে গেল। কিছুতেই লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না। দোকানে ঢুকে চার আনার মিষ্টি কিনে বসে খেতে লাগ্‌লুম। খেতে খেতে হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলুম ছি ছি, এ আমি কি ক'রছি! বাড়ীতে বাবা মৃত্যুশয্যায়, অর্থাভাবে ভালমত চিকিৎসা হচ্ছে না, কাল রাতে কারোর পেটে অন্ন যায় নি, ছোট বোন গুলি খিদেয় কাঁদ্‌ছে, আর এদিকে আমি বসে আনন্দে সন্দেশ খাচ্ছি! সন্দেশ খেতে লাগলুম বটে, কিন্তু তার মধুরতা যেন কোথায় হারিয়ে গেল! মনে হ'ল যেন বিষাক্ত কিছু খাচ্ছি! তাড়াতাড়ি দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলুম। প্রতিজ্ঞা ক'রলুম, আর কখনও সন্দেশ খাব না। বেলা তখন আটটা।

বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি, এত বৃষ্টি বহুকাল হয় নি। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অনবরত খালি ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ছে। আকাশ অন্ধকার। পশু পক্ষীর কারোর সাড়া নেই। বৃষ্টির সঙ্গে

সঙ্গে বাবার অস্থিরতা বেড়ে গেল। খালি অ্যান্টিফ্লোজিষ্টিন গরম করতে লাগলুম। ভাঙ্গা ঘর দিয়ে জল ঘরে ঢুকে সব ভিজিয়ে দিতে লাগল। একবার জল নিকোই, একবার বাবাকে অ্যান্টিফ্লোজিষ্টিন মালিশ করি, আর একবার ভয়ার্ত্ত বোনদের সান্ত্বনা দিই। এমনি ক'রে সন্ধ্যা হ'ল। রাত্রি এল, রাত্রি কেটে গেল। কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল জানতে পারলুম না। আবার ভোর হল। তখন জল থেমে গেছে। কিছু তরকারী কেনবার উদ্দেশ্যে দোকানের দিকে অগ্রসর হলুম। খাবারের দোকানের দিকে নজর যেতেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। অভাব-অনটন ভুলে গেলুম, সব ভুলে গিয়ে আবার সেখানে ঢুকে সন্দেশ খেতে বসলুম। সেদিনও নিজেকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়ে বাসায় ফিরলুম। ফিরে দেখি ডাক্তার এসেছে। অনু-পস্থিত দেখে ডাক্তার একটু অনুযোগ করে বল-লেন—"আজ ক্রাইসিস্ ডে, বাসাতেই থাকবেন। নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস্ ডে আছে জানেন ত'। তিনদিন, সাতদিন, ন'দিন—এমনি সব দিনকে বলে ক্রাইসিস্ ডে। ঐদিন রোগীর অবস্থা খারাপ হয়। ডাক্তারের কথা শুনে মন আরও খারাপ হ'ল। সন্দেশ খেয়ে পয়সা নষ্ট করার জন্য নিজেকে যথেষ্ট ধিক্কার দিলুম। ডাক্তার বলে গেলেন,—সাবধান থাকবেন। যে কোন মুহূর্ত্তে কোলাপ্স হয়ে রোগী মারা যেতে পারে সর্ব্বদা জল গরম ক'রবেন। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দেখলেই বোতলে করে গরম জল নিয়ে হাতে পায়ে সেক দেবেন!"

ডাক্তার চলে যাবার ঘণ্টাখানেক,কি সওয়া ঘণ্টা বাদেই দেখা গেল বাবার হাত-পা' ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। অমনি সকলে মিলে গরম জল দিয়ে হাতে পায়ে সেক দিতে লাগলুম। জীবন্ত মানুষের হাত পা যে অত ঠাণ্ডা হ'তে পারে, এ আমি কখনও কল্পনা করি নি। দেখলুম ক্রমেই যেন আরও ঠাণ্ডা হচ্ছে। কমা দূরে থাকুক, মিনিটের পর মিনিট যেন বেড়েই চলেছে। একটি মাত্র ষ্টোভ। কত বা জল গরম হবে তাতে! যাহোক্ সেবারকার 'কোলাপসিং ষ্টেজ' কোনমতে কেটে গেল। তখন থেকে সর্ব্বদাই আমরা জল নিয়ে ঘরেই বসে রইলুম কখন কি হয়, বলা ত' যায় না। সেদিন আরও দু'বার ঐরকম অবস্থা হ'ল। খাওয়া দাওয়া কারোর আর সেদিন হ'ল না। সন্ধ্যা এল। আবার সেদিনকার মত আকাশ ভেঙ্গে জল। আচ্ছা মশাই, কোন ঘন-দুর্য্যোগ রাতে এ রকম কোন রোগীর শুশ্রূষা করেছেন আপনি! বিশেষ ক'রে কোন পাড়াগাঁয়ে, যেখানে গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রলেও সাহায্যের জন্য একজন লোকও বেরোবে না! করেন নি, না! করতেন ত বুঝতে পারতেন কি রকম উদ্বেগের মধ্যে সে রাতটা আমরা কাটাচ্ছিলুম। রাতে আরও বার তিনেক ঐ রকম 'কোলাপসিং' ষ্টেজ এল। কোনমতে সেগুলো কেটে গেল।

ভোর হ'ল। বাবার অবস্থা তখনও ভাল নয় বৃষ্টি রাত থেকে সমানভাবে পড়ছে। একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও থামে নি।

মা বললেন—"দোকান থেকে চট্ ক'রে চার পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনে নিয়ে আয়। ওরা না খেয়ে আছে। শীগ্গীর আসিস। দেরী হয় না যেন!"

বাইরে প্রবলবেগে তখন বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা খুলে ভিজতে ভিজতে কোনমতে দোকানে উপস্থিত হলাম। চার পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনে তখনই বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। যেতেই সামনে সেই খাবারের দোকান। কাঁচের ভেতর থেকে নানা রকম সন্দেশ যেন আমার হাত ছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। খাবারওয়ালা আমার দিকে একবার চাইল। তার চাহনিটা যেন

আমায় কেমন করে তুল্‌ল। বাড়ীর কথা মনে হ'ল। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবা অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন, ভাইটা আর একটা বিছানায় শুয়ে ধুঁক্‌ছে, ছোট বোনগুলো খিদেয় অস্থির হ'য়ে ঘরের চারপাশে ঘুরছে, মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারছে না, একবার মার মুখের দিকে আর একবার বাবার দিকে আকুল-নয়নে চেয়ে দেখ্‌ছে, কিছুই বল্‌তে পারছে না; শুশ্রূষা-কারী সেই নিদ্রাক্লিষ্ট লোকটির বিশুষ্ক মুখখানা ভেসে উঠল, কেমন স্থির চোখে সে বাবার দিকে চেয়ে বাতাস ক'রছে; মার ব্যাকুল মুখ কেমন একবার বাবার দিকে, একবার ভাইটির দিকে, একবার বোনগুলির দিকে ফিরে ফিরে চাইছে তাও ভেসে উঠল। আমার বুক ঠেলে অশ্রু আস্‌তে লাগল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা' বাড়ালুম। কিন্তু এ কি, যেতে পারি না কেন, পা' যেন কে ধরে রেখেছে, যতই যেতে চেষ্টা করি ততই যেন কে খাবারের দোকানের দিকে ঠেলে দেয়। সুদৃশ্য সন্দেশগুলোর মায়া কিছুতেই যেন কাটাতে পারছি না, মুহূর্তের জন্য বাড়ীর কথা ভুলে গেলুম। বিপদ, অর্থাভাব, দুশ্চিন্তা, ঘন-দুর্যোগ-অনাহারী শিশু—সব। আচ্ছন্নের মত দোকানে ঢুকে বল্‌লুম—"দাও চারআনার সন্দেশ।" বেশ তৈরী করেছিল সন্দেশগুলো। সব খেয়ে ফেল্‌লুম। উঠছি না দেখে লোকটি বল্‌ল—"দেব বাবু আর এক পো।" মোহাচ্ছন্নের মত বল্‌লুম—"দাও।" সেগুলোও শেষ হয়ে গেল। আমার তখন যেন বহুদিনকার সন্দেশ খাবার প্রবৃত্তি হঠাৎ জেগে উঠেছে। ভীষণ রোখ চেপে গেল, ঘোড়দৌড়ের সময় যেমন লোকের রোখ চাপে, তেমনি। বিকৃত স্বরে বল্‌লুম—"দাও আরও আধসের।" এই দুর্যোগের দিনে সে বেচারীর বিক্রয়ের আশা ছিল না, আমাকে পেয়ে সে যেন বর্তে গেল। মুহূর্ত মধ্যে আমার শূন্য কলাপাতে সে আবার সন্দেশে ভরিয়ে দিল। দীর্ঘকাল অনাহারীর মত সন্দেশগুলো আমি গোগ্রাসে খেতে লাগ্‌লুম। সন্দেশের মিষ্টত্ব, আস্বাদ—তখন আমার লক্ষ্য নয়, কেবল পেট ভরান—সন্দেশ দিয়ে পেট ভরান। হঠাৎ যেন কার আর্ত্তনাদ কানে এল। চম্‌কে দোকানদারকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"ও কি, অঁা!" "কিছু না বাবু, শেয়াল টেয়াল হবে হয় ত'! খান না আপনি ঠাণ্ডা হয়ে. কোন ভয় নেই!" তার কথায় সুস্থির হয়ে ধীরে ধীরে খেতে লাগ্‌লুম। কিন্তু থেকে থেকে যেন মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষের দুটা সন্দেশ খেতে পারলুম না। পেট ভরে গিয়েছিল। সন্দেশ দু'টি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। ধীরে ধীরে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে একটা বিড়ি ধরালুম। বিড়িটা দোকানেই বসে শেষ করলুম। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম।

বাড়ীর সদর দরজায় ছাতাটা আট্‌কে গেল। ছাতা ছাড়াতে গিয়ে মুড়ি-মুড়কিগুলো কাপড়ের খুঁট খুলে সব কাদায় পড়ে গেল। আমার এমন আপ্‌শোষ হতে লাগ্‌ল। হায় হায়, এরা না রাত থেকে না খেয়ে আছে, এতক্ষণ ধরে খিদেয় না জানি কতই কষ্ট পাচ্ছে! নিজের পেট পূজা করতে গিয়ে একে ত' কতই দেরী করলুম, তার উপর মুড়ি-মুড়কীও এনে দিতে পারলুম না। ছাতাটা ছাড়িয়ে ভাবলুম—'যাই এক দৌড়ে আবার কিনে আনি।' যাবার জন্য পা' বাড়াতেই কানে এল ছোট একটি বোনের কান্না! কান্না শুনে মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারী খিদেয় না জানি কতই কষ্ট পাচ্ছে! ভাবলুম, ওকে কোলে করেই দোকানে যাই। ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লুম "কাঁদে না দিদি, ছি, চল আমি খাবার নিয়ে আস্‌ছি!" আমাকে দেখেই বোন দু'টি এক-সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বলল—"দাদা, মা!" আমি

বললুম, "কি হয়েছে মা ?" তারা শুধু আঙুল দিয়ে আবার বিছানা দেখিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি ওদিকে এগিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি শুশ্রূষাকারী সে লোকটি নেই, শুধু মা বাবার ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। তাড়াতাড়ি মাকে টেনে নীচে নামাতেই হঠাৎ বাবার গায়ে হাত ত লেগে গেল। উঃ, কি ঠাণ্ডা! এ যে একেবারে বরফ। মাকে নীচে নামিয়েই ষ্টোভের দিকে ছুট্‌লুম। হঠাৎ মনে একটা সন্দেহ হওয়ায় আবার ছুটে বাবার কাছে এসে বাবার পা ধরে নাড়া দিয়ে ডাকলুম—'বাবা! বাবা!' উত্তর নাই। বুকে হাত দিয়ে দেখলুম একটুও স্পন্দন নাই। গায়ে, পিটে, কপালে, তলপেটে সব জায়গায় হাত দিয়ে দেখলুম, কোথাও এতটুকু গরম নেই। সব হিমের মত ঠাণ্ডা! আবার ডাকলুম—"বাবা! বাবা!" উত্তর নাই। মাথাটা সরিয়ে দিতে গেলুম, মাথা ঢুলে পড়ল। হাত তুলে ধরলুম। হাত গড়িয়ে গেল। আবার পাগলের মত তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে চীৎকার ক'রে ডাকলুম, 'বাবা বাবা! কোন উত্তর নাই! কোন সাড়া নাই। বুঝ্‌তে পারলুম। সব বুঝতে পারলুম। বিকট এক আর্ত্তনাদ ক'রে বাবার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে ডাকলুম,—"বাবা! বাবা! বাবা!"

ক্লিকেটি ক্ল্যাক! ক্লিকেটি ক্ল্যাক্! রেলের একটানা অবিশ্রাম আওয়াজ কেবলই হইতেছে। কোথাও কোন সাড়া নাই। খোঁট্টা সহযাত্রিগুলি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বোধ করি একটি কথাও উহাদের কানে যায় নাই। বাহিরে ঘোর অন্ধকার। কেবল গাড়ীর আলো পড়িয়া দুইধারে অনতিপরিসর স্থান আলোকিত হইয়াছে। আর কোথাও আলো নাই। ভদ্রলোকটির দিকে একবার চাহিলাম। তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। এই রহস্যপ্রিয় ক্যান্‌ভাসার—ইহার মধ্যে এত দুঃখ।

ধীরে ধীরে গাড়ীর-বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। একটি ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের সবুজ আলো দূরে দেখা যাইতে লাগিল। মন্থর গতিতে গাড়ী ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। উপরে কেবিন হইতে একটি পোর্টার হাঁকিল—"লালমণি জান্‌সন। লালমণির হাট!" পার্শ্বের কামরা হইতে কে একজন প্রশ্ন করিল—কায় বাজা ভেইয়া।" ষ্টেসন হইতে কে একজন উত্তর দিল —"তিন বাজা!" সহসা কে একজন অন্ধকার হইতে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে হাঁকিল—"এই যে খাবার সন্দেশ, পানতুয়া, রসগোল্লা! এই যে ভাল খা-বা-র!"

সহসা ভদ্রলোকটির যেন চমকিয়া উঠিলেন। উন্মাদের মত চক্ষুর দৃষ্টি। যেন সম্মুখে কোন বিভীষিকা দেখিয়াছেন। এক ঝটকায় ব্যাগটি লইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,"—আমি যাই!" "ভদ্রলোকটির গন্তব্য স্থান ত এখানে নয়! বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম,—"সে কি, এখানে!" সংক্ষিপ্ত অথচ গম্ভীর উত্তর আসিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানেই।" বাধা দিলাম না। ভদ্রলোক নামিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন।

অতি মৃদু একটি হুইসেল দিয়া ট্রেণ আবার চলিতে শুরু করিল।

আট পৌরে

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

অতি সতর্কতার মাঝেও কথাটা রাষ্ট্র হইল—রমেশ বাসা করিবে। বেঁটে গদাই শুধু উস্‌খুস্ করে; কথাটা বলিয়াই ফেলিল, শ্রীমতীর বয়েস কত ?

মেসের ম্যানেজার বাবুটি একটু রসিক। বলিলেন, কেন হে, শ্রীমতীর বয়েস নিয়ে তোমার প্রশ্ন কেন ?

মেসের সকলেই হাসিয়া উঠিল।

'না, বাবাজীকে নিরাশ করবো না; সখ হয়েছে করুক। তবে, আস্‌তেই হবে শেষে এই মেসে—এ ত তোমাকে ব'লে রাখলাম বাবাজি! বলিয়া বেঁটে গদাই দাঁত বাহির করিল।

ম্যানেজার বাবু এবার একটু বিশেষ করিয়াই হাসিলেন। বৃদ্ধ যোগীনবাবু আজ চল্লিশ বছর মেসে আছেন, এই সবে বাটে পড়িয়াছেন। তিনি একগাল হাসিয়া বলিলেন, মেস্ লাইফের মত কি আর লাইফ আছে রে দাদ!

কথাটা ইহার বেশী আর পরিষ্কার হইল না। কিন্তু রমেশ বাসা করিবেই। ম্যানেজার বলিলেন, আমাদের একেবারে ভুলে মেরে দিও না রমেশ!

বেঁটে গদাই এবার সব কটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, যাক্, তবু আমাদের একটি গৃহ হ'লো।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

'আপনারা হাস্‌ছেন কি মশাই! সব শনিবার তো আর বাড়ী যাওয়া হয় না। রমেশ রইল, রোববারের বাড়ীর খাওয়া আমাদের মারে কে? বলিয়া গদাই ভাল হইয়া বসিল।

রমেশ আজ দশ বছর মেসে আছে, পাঁচ বছর হইল বিবাহ করিয়াছে। এই পাঁচটি বছরের বহু অভিজ্ঞতার ফলে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, একটা বাসা না করিলে শরীর মন কিছুই টিকিবে না। তাই শরীর ও মনকে টেঁকসই করিবার জন্ত আরো চার ঘণ্টার উপরি চাকরি যোগাড় করিয়া আজ তিন বৎসর ধরিয়া সে পয়সা সঞ্চয় করিতেছে। এতদিনে শরীর ও মনের একটা কিনারা হইল।

বাসা আর কি? একখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দার কিয়দংশ রান্নার জন্ত। রমেশের মতে ইহা প্রাসাদ! গৃহ বলিতে সে এতদিন এইটুকুই চাহিয়াছে—মাথা রাখিবার একটুখানি ছাদ এবং পাশে গৃহিণী। তা মিলিল, এবং ভাল ঘরই মিলিল।

বেঁটে গদাই বলিল, বাবাজি, আমার উপদেশটা নিও, অফিস ফেরতা কোথাও দাঁড়িও না, সোজা নিজের ঘরে গিয়ে উঠো।

সকলে হাসিল।

সাতদিন ধরিয়া রমেশ শুধু বাজারই করিতেছে। নূতন সংসার। গদাই বলিল, 'ওহে বাবাজি সবই তো কিনেছো দেখছি; কিন্তু তোমার সংসারে হাঁড়ি কই ?'

'কেন হাঁড়ি কি হবে ?'

'আচ্ছা বাবাজি!' বলিয়া গদাই হাসিতে লাগিল।

কিন্তু কথা তখনো তার শেষ হয়নি। বলিল, 'আমি যখন বাসা তুলি, তোমায় বলবো কি বাবাজি, ঠিক পঁচিশ গণ্ডা হাঁড়ি আমার ঘর

থেকে বেরুলো! একবার মনেও হয়েছিলো, হাঁড়ির একটা দোকান করি।

সকলের উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া উঠিল।

তবু রমেশ দমিল না। সকলের হাস্য পরিহাসকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া একদিন সে নূতন গৃহে গিয়া উঠিল।

পল্লীবধূর আনন্দ আর ধরে না। স্বামীর সান্নিধ্য যার পরম বাঞ্ছনীয়, তার কাছে ছোটখাটো ত্রুটীও পরম কৌতুকের হইয়া দাঁড়ায়। রমেশ অসুবিধার কথাই বার বার উচ্চারণ করে; কিন্তু বধূর দিক হইতে সেই একই উত্তর আসে, দুটো মানুষ তার আবার কত দরকার হয় গো!

রমেশ খুসীই হয়। কে না হয়? এমন অল্পে সন্তুষ্ট স্ত্রী, ভাগ্যের কথা! সাতচল্লিশ টাকার কেরাণীর এই তো উপযুক্ত স্ত্রী!

রমেশ তাহাকে রাণী বলিয়া ডাকে। স্ত্রীকে কে না ডাকে? কিন্তু রাণী বাঁকিয়া বসে। বলে, ধোৎ, আমার কি নাম নাই? ..

নামটাই চলিল দু'একদিন। তারপর সেই সনাতন 'ওগো'তে আসিয়া ঠেকে। রমেশের তখন নিবৃত্তি মার্গের অবস্থা।

বেঁটে গদাই মেসে আসিয়া সোরগোল তুলিল,—এইমাত্র সে একটা দুরূহ আবিষ্কার করিয়া ফিরিতেছে। গদাই রমেশের বাড়ীর নম্বর দেখিয়া আসিয়াছে।

ম্যানেজার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, বেঁচে থাক গদাই!

'কিন্তু রমেশ একখানা ছেলে বটে ম্যানেজার মশায়! বেছে বেছে বাড়ী নিলে তেতাল্লিশ-টু-বাই-থ্রি-বাই-এক্! সাতবার দেখে এলেও বাড়ী ভুল হবে। ওকে মনে করতাম, ভাল মানুষ—ও আমার চেয়েও চালাক! সে থাকে কোথায় জানেন? বাড়ীর দরজায় বজ্রপাত হ'লেও সে শুনতে পাবে না,—এমনি পিছনের ঘরে!

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কথাটা সত্যই। রমেশকে পিছনের ঘর লইতে হইয়াছে; সামনের ঘরে আরো দু'টাকা বেশী দিতে হইত। অথচ এই দু'টাকা বাঁচাইতে পারিলে, সে ঐ টাকায় কী না করিতে পারে? এমন কি ভবিষ্যতে একদিন তাহার স্ত্রীর—

গহনা হয়ত হইত।—কারণ রমেশ খুব হিসেবী।

রমেশ—থাক, সে কথা পরে বলিতেছি।

সেদিন রবিবার। রমেশ একটু ভাল করিয়াই বাজার করিতেছে। সাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ পূর্ণ বিশ্রাম। মনে করিতে করিতেই চলিয়াছে—বাজারটা ফেলিয়া দিয়া সে একটু শুইবে। তারপর এগারটা—বারটা, বৌ ডাকিয়া তুলিবে,—স্নান করিয়া খাইবে—আবার শুইবে। ঘুমাইতে না পাইয়াই তো তার শরীর খারাপ হইয়া গেল!

মাছের মুড়াটা হাতে ঝুলাইয়া রমেশ যখন রাস্তায় নামিয়াছে, অমনি বেঁটে গদাইয়ের সঙ্গে দেখা।

'কি হে, খাওয়াবে না কি?'—গদাই সব ক'টি দাঁত মেলিয়া ধরিল।

রমেশ হাসিল।

'তারপর?'

'তারপর আর কি?'

'তারপর আর কিছু নাই! সে কি হে! সে উদ্যম গেল কোথা—'

'যা', যাব একবার।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে রমেশ পাশ কাটাইল।

বাজার ন্যামাইয়া দিয়া রমেশ যখন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়াছে, অমনি স্ত্রী আসিয়া জানাইল,—তেল বোধ হয় একটু কম পড়বে।

'পড়ুক ; কোন রকমে চালিয়ে নাও !'

'ওবেলা সেই তো আনতেই হবে—'

রমেশ বিছানা ছাড়িয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে উঠিল।

"পান্তা আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্তা।" ঠিক হইলও তাহাই। তেল আনিতে লবণ ফুরাইল ! রমেশের ঘুম আর হইল না ! আজ অনেকদিন পরে তাহার মেসের ছোট্ট ঘরখানি মনে পড়িল।

স্বামীর ছুটিতে স্ত্রীর আনন্দ—এ তার নিরবিচ্ছিন্ন মিলনের আনন্দ। কথা বলিয়া কথা শুনিয়া সে তার ঐ চব্বিশ ঘণ্টাকে কাজে লাগাইতে চায়। সাতদিন যে তাহার কি করিয়া কাটে সে তো জানে ! রমেশ ন'টায় বাহির হইয়া যায়, রাত্রি দশটায় বাড়ী ফেরে। এই অপরিহার্য্য নিঃসঙ্গতাকে সে আনন্দের মতই গ্রহণ করিয়াছে ; নইলে বাসা রাখা চলে না। স্বামীর কাছে থাকিতে পাওয়া মেয়ে মানুষের তো কম সৌভাগ্য নয়। কিন্তু তবু—দীর্ঘ সাতদিনের পর সে মাত্র ঐ একটি দিনকেই বা ছাড়িবে কেন ? সে চায় ঐ একটি দিনকে পুরাপুরি দখল করিয়া বসিতে। কিন্তু রবিবার তাহার স্বামীর ঘুমাইয়া কাটে ! কতদিন মনে হইয়াছে ; এর চেয়ে সে পূর্ব্বেই ছিলো ভাল। শনিবার রাত্রে তাহার স্বামী বাড়ী যাইত, সে রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পাইত না !

ছি ছি কী ভাবিতেছে ? তাহার স্বামী যে তাহাকেই কাছে রাখিবার জন্ত এই বিপুল পরিশ্রম করিতেছে ! রবিবারের অবসরটুকু তো তাহার ঘুম আসিবারই কথা !

কিন্তু মনকে বুঝাইয়া বেশীদিন চলিল না। রমেশ সত্যই একদিন নূতন সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। ইহা এত বেশী স্পষ্ট যে কোন প্রবোধই আর দেওয়া চলিল না !

পরিশ্রম ? তাহার স্বামী কি একাই পরিশ্রম করিতেছে ? সে করে না ? সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া সেও তো দিনান্তে ঐ রাত্রটুকুই অবসর পায় ! তবে কী ?—বধূ রাত্রিদিন এই কথাই আলোচনা করে।

তারপর পল্লীবধূর সহজ ভীতি এই বধূটিকেও পাইয়া বসিল, স্বামী অন্য কাহাকেও ভাল বাসে। নিশ্চয় ভালবাসে। সুতরাং অশান্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে।

রমেশ স্থির করিল বাসা তুলিয়া দিবে। কারণ বাসা রাখিবার কোন যুক্তিই আর সে এখন খুঁজিয়া পায় না ! শরীর ভাল করিবার কথা মনে হইলে, আজ নিজেরই হাসি পায়। তবু দেহ ও মনের প্রতি এত বড় অত্যাচারের এইখানেই সে যবনিকা টানিয়া দিবে।

ঝগড়াটা একদিন পষ্টাস্পষ্টি হইয়া গেল। যেটুকু দুর্ব্বোধ্য ছিল, তাহাও আর রহিল না।

রমেশের ঘুম নাকি খুব বেশী। রাত্রের আহার শেষ করিয়া রমেশ সেই যে চোখ বুঁজিত, ন'টার আগে সে চোখ আর খুলিত না ! খোলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াই সেদিন এই বিরোধ।

রমেশ ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, তোমার রস কি দিন দিন বাড়ছে ? তারপর রসনা ছুটিল রস যা বহিল,—তা তিক্ত।

রমেশ আজকাল মেসের স্বপ্ন দেখিতেছে। আর কি সে তাহার সেই ছোট্ট ঘরখানিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে ? কী নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন

বিশ্রাম! সেই বেঁটে গদাই, যোগীন্ বাবু, সেই ম্যানেজার বাবু! আর মেসের সেই উড়ে বামুন। কী বিরক্তিশূন্য তার সহিষ্ণুতা! রাত্রি একটার সময় ছুটি মিলিলেও অনুযোগ নাই!

ঠাণ্ডা ভাতও রমেশ রাত্রে তখন খুসী উঠিয়া খাইয়াছে। কেহ তাড়া দিবার নাই; স্বাধীন—উদাসীন—উচ্ছৃঙ্খল।

বৃদ্ধ যোগীনবাবু একদিন বলিয়াছিলেন, মেস লাইফের মত কি আর লাইফ্ আছে রে দাদা! আজ এতদিন পরে তাহার সেই কথা মনে পড়িল।

রমেশ একটা কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, স্ত্রীকে তাহার আটপৌরে করা চলিবে না। কেরাণী জীবনে রোমান্স যদি কোথাও থাকে, তবে সপ্তাহের ঐ একটি দিন—শনিবার। প্রবাসীর সে তো গৃহ নয়,—সুখনীড়; স্ত্রী নয়, চির প্রিয়া!

অবশ্য মেসে রমেশের কোন আকর্ষণই ছিল না। তার পৃথিবী সঙ্কীর্ণ, চাহিদা অল্প। অফিস ফেরতা তার সেই অল্প-পরিসর বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া সে দুনিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছে। তার গল্প হাস্য পরিহাস যা কিছু, তা ঐ বিছানায় চোখ বুজিয়াই! কেহ ঠাট্টা করিত না, তিরস্কার করিত না, অযথা উপদেশও কেহ দিত না। এমনি নিরঙ্কুশ সুখ শয্যা!

সেই সুখশয্যাই রমেশকে নিরন্তর চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতে লাগিল!

আবার একদিন সকলকে বিস্মিত করিয়া রমেশ মেসে আসিয়া উঠিল। বেঁটে গদাই দাঁত বাহির করিল। মেসে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ম্যানেজার মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর তোমার সারলো রমেশ?

'এবার সারবে; গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে পুরী যাচ্ছি।' বলিয়া রমেশ বিছানা পাতিল।

ধর্ম্মের কল

শ্রীঅসিতকুমার সেন

আষাঢ়ের মাঝামাঝি। ভীষণ বর্ষা নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য। প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার মধ্যে আমরা ঘরে মজলিস জমিয়ে বসেছি। লোক অবশ্য বেশী নয়—আমার বন্ধু নীতিশ, আর তার স্ত্রী আর একজন, যাকে আমি আগে চিনতুম না আজই তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমার কিন্তু এ লোকটিকে কেমন ভাল লাগছিল না। এক একজনের ওপর প্রথম দর্শনেই কেমন যেন এক রকম বিতৃষ্ণা বা বিরাগ আসে। ভদ্রলোকের নাম সুদর্শনবাবু। বাস্তবিকই সুপুরুষ। পোষাক-পরিচ্ছদও বেশ ফিটফাট, দেখলেই পয়সাওয়ালা লোক বলে মনে হয়। নীতিশের সমব্যবসায়ী—পাটের কারবারের কথা বলতে তিনি এসেছেন। আজ এখানেই থাকবেন। দেখলাম ভদ্রলোকের এ বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত আছে। তাঁর আচরণে একটা জিনিষ বড় বিসদৃশ ঠেকলো—তাঁর নীতিশের স্ত্রী অপর্ণার সঙ্গে রসিকতার প্রচেষ্টা এবং তাঁর চোখের চাউনী। সত্যি বলছি সে সব দেখে আমার গা জ্বালা করছিল।

আমি একজন পুলিশ কর্ম্মচারী। এসেছিলাম পূর্ব্ববঙ্গে একটা খুনের তদন্ত করতে—পথে বন্ধুর বাড়ী পড়াতে বাধ্য হয়ে এবং দায়ে পড়েও বলা যেতে পারে, নীতিশের কাছে আশ্রয় নিয়েছি।

যাহোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা গল্প করছিলাম। আধঘণ্টা পরে অপর্ণা 'শুভরাত্রি' জানিয়ে আমাদের কাছে বিদায় নিল। আমরা চুরুট, সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারগুলি কাছাকাছি টেনে নিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জ্জন ও ঝড়ের মাতন সমভাবেই চলেছে।

গল্প চলেছে। এই জায়গায় দেখলাম—সুদর্শনবাবুর কেরামতি। আমি বা নীতিশ যে ধরণেরই গল্প বলি না কেন, সুদর্শনবাবু তার চেয়ে দু-এক ডিগ্রি বেশী রঙদার বা রোমাঞ্চকর ঘটনা বেশ কায়দা করে গুছিয়ে বলছেন। আমরা সাধাসিধে ভাবে গল্প বলে যাই, কিন্তু বাহাদুরী আছে সুদর্শনবাবুর। পুঁটিমাছ ধরে তাকে কাৎলা বলে দেন, বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে—তার জন্তে অপ্রস্তুতের কোন ভাব প্রকাশ পায় না।

রাত দশটা বেজে গেল। সারাদিন ট্রেণ ভ্রমণের ক্লান্তিতে চোখ দুটি বুজেই এসেছিল বোধ হয়—হঠাৎ অদূরে বাজ পড়ার ভীষণ শব্দে চমকে চেয়ার ছেড়ে একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। বন্ধুরা আমার অবস্থা দেখে 'হো-হো' করে হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে কাটল। তারপর নীতিশ বলল—"ঠিক এমনই দুর্য্যোগের রাতে আমি বাঘাকে পাই। সে এক রহস্য। তখন আমি খুলনায়।"

সুদর্শনবাবু প্রশ্ন করলেন "বাঘা কে?"

নীতিশ উত্তর দিল—"বাঘা একটা কুকুর।"

বেশ লক্ষ্য করলাম উত্তরটা শুনে সুদর্শনবাবু কাঁধ ঝাকানি দিয়ে নেড়েচেড়ে বসলেন। তারপর বললেন, "মাপ করবেন, আমি ঐ কুকুরগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারি না।"

শুনে নীতিশ তাঁর দিকে স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। আমি জানতাম নীতিশ খুব

প্রাণীদের কত ভালবাসে। নীতিশ উত্তর দিল, "ও: আপনি বোধ হয় ওদের সঙ্গে মেশবার তেমন সুযোগ পাননি। বাস্তবিক ওদের কাছ থেকে অনেক শেখবার আছে—"

সুদর্শনবাবু মুখ বাঁকালেন দেখে নীতিশ যোগ দিল—"অবশ্য যার যা পছন্দ। আমি কিন্তু বাঘাকে অতিরিক্ত ভালবাসি—তার সঙ্গে যে রহস্য জড়িত আছে তা ভেবে ঠিক করতে পারি না।"

দুচারবার নীতিশের সেই গল্প শোনা স্বত্তেও তাকে গল্পটা আবার বলবার জন্তে অনুরোধ করলাম।

নীতিশ বলে যেতে লাগল—"শুনবে সে কথা। বাঘা যে ভাল জাতের 'হাউণ্ড' কুকুর তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। এখন সে বাস্তবিকই কদাকার। তাকে দেখলে ভয় হয়, তার ওপর অনুকম্পা আসে। তার মুখের প্রায় অর্দ্ধেকটা গুলিতে কে উড়িয়ে দিয়েছে। আধ অন্ধকারে হঠাৎ তাকে দেখলে আৎকে উঠতে হয়। কিন্তু তার মত প্রভুভক্ত বা বুদ্ধিশালী কুকুর এ অঞ্চলে আছে কিনা সন্দেহ। উপরন্ত সে আমাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করেছে। সেই তো সেবার, আমি আর আমার স্ত্রী দুজনে সান্ধ্য-সমীর উপভোগ করছি—নদীর ধারে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হঠাৎ একটা গর্জ্জন শুনে চেয়ে দেখি, পিছনে একটা নেকড়ে আমাদের দিকে চেয়ে ওৎ পেতেছে—লাফাল বলে।—ভয়ে তো যাকে বলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ দেখলাম, বাঘা তার ওপর লাফিয়ে পড়েছে। তারপর ভীষণ যুদ্ধ। বাঘাটা জয়ী হ'ত—কিন্তু তার ক্ষতচিহ্ন আরও বেড়ে গেল। যাক কেমনভাবে তাকে পেলাম বলি। সে রাত্তে কিছুদূর পিছলাম ঘোড়ার চড়ে ফিরছি, খুব জ্রুত চলেছি। ভীষণ দুর্য্যোগের রাত তুমুল ঝড় বৃষ্টি। হঠাৎ কাণে এল কিসের এক চীৎকার। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে আপন খুশীতে বাড়ীমুখো চলছিল, কয়েক হাত গিয়ে সে থেমে পড়ল। আবার সেই চীৎকার-কাতর কিন্তু ভীষণ। লাগাম টেনে নিলাম ঘোড়াটাকে মারলাম এক ঘা। সে কিন্তু নড়তে চায় না। ভাবলাম—এ কি মুস্কিল। অশরীরি কোন কিছুর হাতে পড়লাম না কি। শুনেছি জন্তুরা তাদের উপস্থিতি চট করে বুঝতে পারে। ঘোড়ার পেট জোরে এক গুঁতো দিলাম। ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে আবার সেই কাতর গোঙানির শব্দ। পর-মুহূর্ত্তেই আমার পায়ে লোমশ গরম কিসের স্পর্শ অনুভব করলাম। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে রইলাম বুদ্ধিলোপ পেয়েছিল। তারপর জোর করে মনে সাহস সঞ্চয় করে টর্চ্চ জ্বাললাম। সেই সূচীভেদ্য বর্ষাপ্লাত অন্ধকারের মধ্যে টর্চ্চের আলোতে দেখলাম, দুটো চোখ। তারপর দেখলাম, সে একটা কুকুর—তার মুখ রক্তে ভরা, আমার পায়ে তারই রক্তধারা। স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা নেই—জীবনে ও রকম ভয় কখনই পাইনি সেই ভীতির কারণ একটা কুকুর দেখে মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হ'ল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে তাকে দেখলাম। পকেট থেকে দুটো রুমাল নিয়ে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে কুকুরটাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে তাকে শীস্ দিলাম, উঠবার জন্তে। সে উঠবার অনেক চেষ্টা করল, পারল না। মনে হল দিই একটা গুলিতে ওর কষ্টের জীবন শেষ করে। পকেটে হাত দিলাম—এই প্রথম মনে হ'ল আমার কাছে পিস্তল আছে। আগে কিছুই মনে হচ্ছিল না—ভয়ে বিপদে মানুষের অমনই হয়। টোটাভরা পিস্তল তুলেছি —মনে হ'ল 'নাঃ একে বাড়ী নিয়ে যাই, যদি

বেচারা বাঁচে। তাকে ঘোড়ায় তুলে উঠে বসেছি সে সামনের ছুটো থাবা দিয়ে আমার কোল আঁচড়াতে লাগল, আর অদূরে বনের মধ্যে চাইতে লাগল। বুঝলাম সে কিছু বোঝাতে চায়। ঘোড়া থেকে নেমে তাকে কোলে করে ছ'একবার এদিক ওদিক করাতে সে ডেকে ওঠাতে বুঝলাম সেথায় নয়। তারপর একদিক এগোতেই সে চুপ করল। বুঝলাম সেই দিকেই যেতে বলছে। টর্চ জ্বালিয়ে চলেছি। আন্দাজ ছ'শো গজ দূরে এসে দেখি—একটি লোকের মৃত দেহ। কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই সে সেই মৃত-দেহের মুখ চাটতে লাগল, আর যেন কাঁদতে লাগল। সে তখন ভীষণ হাঁফাচ্ছে। রক্তক্ষয়ে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। দেখে মনে হ'ল ঘণ্টাদুয়েক আগে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে। মুখ দেখে সনাক্ত করবার উপায় নেই। মুখের কোন অংশই অক্ষত নেই—সবটা থেৎলে গেছে। পকেট থেকে কিছুই পেলাম না, পেলাম মাত্র একটা অদ্ভুত ধরণের লকেট গলায় হার বা ঘড়িতে যে রকম থাকে। বৃষ্টিতে পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে—পোষাক পরিচ্ছদ রক্ত ও কর্দ্দ-মাক্ত। আমি কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। ও ব্যাপার সম্বন্ধে চুপ করে গেলাম। ভেবে-ছিলাম, নিজে বিপদে পড়ব। মৃত ব্যক্তির সনাক্ত হয়নি। কুকুরটাকে তো আমি সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলাম ঐ ঘটনার পরদিন। সেবা শুশ্রূষাতে কুকুরটার ক্ষত শুকাল, কিন্তু চিহ্ন চিরস্থায়ী রইল। সে তার হৃদয়ের সব ভাল বাসা আমার জন্ত উজাড় করে দিল। তার সেই ভক্তি ভালবাসার জন্তে আমি যদি তাকে মহামূল্যবান মনে করি, তাহলে বোধ হয় আমার তত দোষ হয় না।"

নীতিশ থামল। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ক্লক ঘড়ির টক্‌ টক্‌ আওয়াজ, বাইরের ঝুপঝাপ বারিপতন ও বাতাস বইবার সোঁ-সোঁ শব্দের সঙ্গে বেশ তাল দিচ্ছিল। দরজার বাইরে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। নীতিশ বল্‌ল 'ঐ বাঘা এসেছে'।—বলে উঠে দরজা খুলে দিতেই কুকুরটা লাফিয়ে নীতিশের কোমরে উঠ্‌ল। নীতিশ তার মাথা চাপড়ে দিতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বাঘা নাক উঁচু করে বাতাসে কী যেন শুঁকতে লাগল—তারপর তার চোখ পড়ল সুদর্শন বাবুর ওপর। বাঘা স্থির-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল—তারপরই ভীষণ গর্জ্জন করে লাফিয়ে সুদর্শন বাবুর উপর পড়ল। তিনি তাকে ঝাপটা মেরে ফেলে দিলেন। সে আবার তার বুকে উঠবার চেষ্টা করল এবং নীতিশ তার বগলস ধরবার আগেই সে সুদর্শন বাবুর ডান হাতের দিকের কোট ও সার্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। বাঘাকে ধরে রাখা তখন নীতিশেরও অসাধ্য। বাঘা তখন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

নীতিশ বল্‌ল "মাপ করবেন সুদর্শন বাবু, আমি ক্ষমা চাইছি। আশ্চর্য্য, ওর এ রকম অভদ্র ব্যবহার তো কখনও দেখিনি—বলে সে বাঘাকে দু'চার ঘা মারল! বাঘার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সুদর্শন বাবুর দিকে যাবার জন্তে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

সুদর্শনবাবু তখন বেশ চটে গেছেন, বল্‌লেন—"রাখুন মশাই আপনার 'কাষ্ঠ-ভদ্রতা'। যথেষ্ট হয়েছে। আমি বেশ বুঝেছি আমাকে অপমান করবারই ইচ্ছা আপনার। আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার বাড়ী ত্যাগ করছি—"বলে চলে যাবার জন্তে তিনি দরজা খুলবেন দেখে, বাঘা চীৎকার করে ঝাকানি দিয়ে নীতিশের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুদর্শন বাবুর বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে—তাঁর ডান হাতটা কামড়ে ধরে।

হঠাৎ যেন চোখের সামনে যবনিকা উঠে

গেল। যেন দেখলাম, ভীষণ রাত্রি। একটা কুকুর নীতিশকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—সামনেই একটা মৃতদেহ।—নীতিশের গল্প বলবার সময় সুদর্শনবাবুর অস্বস্তিভাব যদি লক্ষ্য না করে থাকি তো বৃথাই এতদিন ধরে গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছি। মনে হ'ল, সে দৃশ্যের সঙ্গে এর কি কোন যোগসূত্র আছে। কিন্তু আমার সন্দেহকে কথায় প্রকাশ করবার আগেই নীতিশ বল্‌ল—এক মিনিট. আমাকে আর একবার মাপ করবেন সুদর্শন বাবু। আপনি অনুগ্রহ করে এধারে আসুন—বলে সুদর্শন বাবু ও তাঁর গললগ্ন বাঘাকে টেবিলের কাছে নিয়ে এসে বল্‌ল "কেন আপনি একটা সামান্য কুকুরকে অত ভয় পান। আপনি ত—

সুদর্শন বাবু এদিকে পিস্তল বাগিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। নীতিশের কথা শেষ হতে না হতেই লাফিয়ে উঠে টেবিলস্থিত রুলটা দিয়ে আঘাত করে সুদর্শন বাবুর হাতের পিস্তলটি ফেলে দিলাম এবং যুযুৎসুর একটা প্যাঁচ কষে সুদর্শনবাবুকে কায়দা করে ধরলাম এবং নিজের পিস্তল তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ধরে নীতিশকে পুলিশে খবর দিতে বল্‌লাম।

নীতিশ চাকরকে থানায় পাঠিয়ে আবার ফিরে এল এবং সুদর্শনবাবুকে সম্বোধন করে বল্‌ল, "দেখুন, কিছু বুঝাতে না পারলেও আমার মন বলছে আপনি অপরাধী।"

বেশ শান্তভাবেই সুদর্শনবাবু বললেন, "তার মানে? জানেন এই রকম নাকাল করার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে কেস্ করতে পারি।" তাঁর দৃষ্টি কিন্তু বাঘার দিকে। বাঘাকে তখন নীতিশ টেবিলক্লথ দিয়ে বেশ করে বেঁধে ফেলেছে কিন্তু তার গর্জ্জন ও চাঞ্চল্য তখনও থামে নি।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর বাইরে মোটর সাইকেলের আওয়াজ হতেই নীতিশ বেরিয়ে গেল এবং থানার ইন্‌স্পেক্টরকে নিয়ে ঘরে এল। ইনি এখানে কয়েকদিন হ'ল বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি ভিতরে এসে সুদর্শনবাবুকে দেখে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর বল্লেন—এঁ্যা! সুলোচনবাবু যে। তারপর কি? ঘরের চার দিকে নজর করতেই বাঘাকে দেখে বল্লেন—"বা, রে। এ যে 'তারা'!—নিরঞ্জন বাবুর কুকুর। তারা, তারা?—বাঘা ডাক শুনে কাণ খাড়া করে ল্যাজ নাড়তে লাগল এবং আনন্দ সূচক আওয়াজ করতে লাগল।

আমি প্রশ্ন করলাম "কুকুরটাকে আপনি চেনেন নাকি?" নীতিশ আমার পরিচয় দিতে ইনস্পেক্টার বল্লেন "ও, আপনি, নমস্কার, আমরা ভাবলাম আপনি বুঝি আজ এলেন না। হাঁ, আমি কুকুরটাকে চিনি বৈকি। ওটাতো আমাদের কুকুরেরই বাচ্চা, আমিই তো নিরঞ্জন বাবুকে ওটা দিই। ওর ঘাড়ের কাছে ডানদিকে একটা কাল তারার মত দাগ আছে—তাইতেই তো ওর নাম দেওয়া হয় 'তারা'। তারপর সুলোচন বাবু, নিরঞ্জনবাবু কোথায়? তিনি কি বেঁচে আছেন এখনও?"

নীতিশ এই সময়ে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সেই লকেটটা ইনস্পেক্টরের সামনে রেখে দিয়ে বল্‌লে—"আমার দোষ হয়েছে এটা পুলিশে না দেওয়া। ভেবেছিলাম দিলে আবার হাঙ্গামায় পড়ব। আমি বুঝতে পারিনি তাহলে সেই সময় মৃতদেহ সনাক্ত হয়ে যেত!—এটা আমি সেই মৃতদেহ থেকে পাই।

ইনস্পেক্টর এক সেকেণ্ড মাত্র তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপরই তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ধরা গলায় তিনি বল্লেন—হাঁ এটা আমার বোন, নিরঞ্জন বাবুকে উপহার দেয়। এই দেখুন এন, আর লেখা তার মধ্যে জড়িয়ে লেখা লীলা। আমরা ব্রাহ্ম জানেন ত?

বিষের আগের দিন অর্থাৎ যে দিন থেকে নিরঞ্জন বাবুর খোঁজ পাওয়া যায় নি তার আগের দিন সে এটা নিরঞ্জন বাবুকে উপহার দেয়। আহা লীলা নিরঞ্জন বাবুর খবর না পেয়ে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। তাঁর গলে বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তাঁর শোকে আমরাও মুহ্যমান হয়েছিলাম। তবুও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আমাকে চারিদিকে লক্ষ্য রাখতে শিখিয়েছিল। দেখলাম সুদর্শনবাবু এই অবসরে নিজের পকেটে হাত পুরে হাতটা মুখের মধ্যে দিলেন—এক সেকেণ্ড বোধ হয় দেরী হয়েছিল—আমি তাঁর হাতে আঘাত করলাম। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হলেন। তাঁর হাতের মুঠো খুলে দেখি কোকোনের পুরিয়ার সামান্য গুঁড়া কাগজে লেগে রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ডাক্তার আনতে কিন্তু ডাক্তার আসবার আগেই বিষের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল এবং সুদর্শন বাবু মারা গেলেন। মরবার আগে তিনি নিজ দোষ স্বীকার করলেন, বল্লেন—"দিবারাত্র ধরা পড়বার চিন্তায় পাগল হয়ে গেছি। সব দিকেই নিশ্চিন্ত, বিরুদ্ধ প্রমাণ নেই তবুও রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে গা হিম হয়ে যেত। তার মুখ সর্ব্বদাই চোখে ভাসছে—উঃ, কি ভীষণ রক্তাক্ত তার মুখ, বাপ্‌, বাপ্‌, আমি তাকে কি রকম ঘৃণা করতাম তা আপনারা বুঝবেন না। জীবনের চলতি পথে সব বিষয়েই সে বিজয়ী ছিল আমি ছিলাম পরাজিত। কিন্তু শেষ যখন দেখলাম আমি যাকে বিবাহ করব ভেবেছিলাম সেখানে এসেও সে জয়ী হ'ল, আর সহ্য করতে পারলাম না। সে আমার দুর্ব্বলতা—আমি ভগবানের কাছে মাপ চাই না। যদি দোষ করে থাকি তার শাস্তিই চাই।" বলতে বলতে সুদর্শনবাবু ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

আপনারা বলবেন পুলিশের কি বাহাদুরী হল এতে। কথায় বলে 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' আর আমরা বলি, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

নবজীবন

শ্রীপ্রমথনাথ দে

দেবী মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত স্বপ্নেও ভাবে নি, আজ তাকে এমন কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

ঘটনাটী সামান্য। দুইদিন আগে, যখন দামোদরের প্রবল বন্যা চারিদিকে সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসের মত তাণ্ডবলীলায় উদ্দাম নৃত্য করছিল, তখন এই পূজারী ব্রাহ্মণ একটী নিঃসহায়া জলমগ্না বালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন, দেবী মন্দিরের উচ্চ আঙ্গিনাতলে। সেইখানেই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এই মৃত্যুমুখী প্রতিমাটীর জ্ঞানশূন্য দেহে সেবা-শুশ্রূষায় জীবন সঞ্চার করতে—কারণ তার বসতবাটী হতে সমস্ত স্থানগুলিই তখন জলমগ্ন।

পরদিন প্রভাতে, বানের জল হ্রাস হলে ব্রাহ্মণ দেখলেন—অঙ্গে, পদে, পোষাক পরিচ্ছদে পলি কাদার ছিটা বেঁধে, বহু লোকজন তার সন্ধ্যাগ্রস্ত চত্বরটী পূর্ণ করে তুলেচে।

তাদের মধ্যে যুবক জমীদার মহিম, তার পাশে বাল্য সহচর, শাস্ত্রাভিমানী হিন্দুশিরোমণি মুরলিধর ও সমাজের চাঁইমশাইকে দেখে পুরোহিতের পুলকস্ফীত মহান হৃদয়টা এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

গোঁড়াহিন্দু মুরলিধর নাতিদীর্ঘ টিকিটী ঈষৎ নেড়ে, শামুকের খোল হতে একটিপ নস্য নিয়ে বললেন, "কি পুরুত মশাই, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মটা কি একেবারে লোপ পেয়েচে নাকি?"

সমাজের চাঁই, চুপ করে থাকাটা অশোভন বলে বলে উঠলেন, "ছিঃ ছিঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে—অর্থাৎ—এর মানে কি—ছিঃ ছিঃ, কাজটা বড়ই গর্হিত হয়েচে, পুরুত মশাই!"

ব্রাহ্মণ শান্ত মধুর স্বরে বললেন, "মূর্খ আমি, তর্কের স্পর্দ্ধা রাখি না। বিবেক বুদ্ধিতে যা ভাল বুঝি. করে থাকি মাত্র।"

এক বৃদ্ধ বললেন, "গতস্য শোচনা নাস্তি। উপস্থিত মন্দিরের সংস্কার, আর পূজারীর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।"

মুরলিধর হাতে তোলা নস্যটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ঊর্দ্ধচোখে রুক্ষ মুখে রুক্ষ স্বরে বললেন, "প্রায়শ্চিত্ত কি! এরূপ অধর্ম্মচারীকে সমাজে স্থান দিলে, আমরা কি আর মুখ দেখাতে পারব?" তারপর স্বরটা নিম্ন করে বল্লেন, "একটা মেয়ে মানুষ জলে ডুবে মরছিল—তার নিয়তিই এই। তুমি একজন নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ হয়ে, আগে জাতি নির্ণয় না করে, কি না একটা মুচির মেয়েকে সজ্ঞানে স্পর্শ করে, বুকে করে নিয়ে এলে কোথায়, না এই জাগ্রত দেবীমন্দিরে!"

নির্ভীকচিত্তে ব্রাহ্মণ বললেন, "মায়ের কাছে সকল সন্তান ত সমান ভাই!"

মুক্ত রোষটা রুদ্ধ রেখে নাসিকায় নস্য দিতে দিতে মুরলিধর বললেন, "তা তা বেশ, মহিমের দেবালয়, আর সেও একজন সমাজের মাথা, সেই বিচার করুক! কি বল ভটচায্ খুড়ো?"

মহিম বল্লে "পুরুত মশাই, হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী যা, তা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যাই হ'ক আপনি ঐ বালিকাটীকে মন্দির হতে বার করে দিন।"

মর্ম্মন্তদ বেদনাদগ্ধ বালিকাটী তার জীবন

রক্ষকের লাঞ্ছনা দেখে, নিজেই অন্তরাল হতে জনসঙ্ঘের সামনে এসে দাঁড়াল নতমুখে।

যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ এসে উপস্থিত হ'ল। এই সুললিতা লাবণ্যময়ী তরুণীকে দেখে সকলেই নির্ব্বাক, চারিদিক স্তব্ধ। হতবুদ্ধি মুরলিধরের হাতের নস্য নাসিকানিয়ে স্থগিত হয়ে রইল। তার চক্ষুদু'টী এক অব্যক্ত ভাষাহীন গোপন ইঙ্গিত কি জানিয়ে দিলে, তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের ভিতর।

অঙ্গের অশ্রুত পরামর্শে, মুরলিধরও সমাজের চাঁইমশায়ের বিচারে, পুরোহিত পদচ্যুত ও সেই মুহূর্ত্তেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য আদিষ্ট হলেন। আর বালিকাটী এক বৈষ্ণবীর আশ্রয়ে অর্পিত হল।

মহেন্দ্রের মুখ দিয়ে একটী প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারিত হল না।

দুই

অন্ধকার রাত্রি—যেন এক বিরাট কৃষ্ণরূপ বিশ্বের কোল হতে আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘগুলির সঙ্গে কোলাকুলি করছে। পল্লীর কর্ম্মকোলাহল অবসাদ গ্রহণ করেছে। মহেন্দ্রর বাগান বাটীটী কিন্তু তখনও জাগ্রত।

অন্য দিনের মত আজ ও সেখানে বন্ধুদের আবির্ভাব হয়েছে!

অন্যদিনের মত আজও সেখানে এমন একটী জিনিষ চলছিল, যা, মুরলীধরও চাঁইমশায়ের মতে দেবভোগ্য সোমরস, চলতি কথায় সুরা নামে অভিহিত।

তাদের কৌতুকহাস্যে আজ কিন্তু মহেন্দ্রের যোগ নাই। বুঝি বা, তার মাত্রাটা, এদেরি ইচ্ছাকৃত অনুরোধে আজ বেশী হয়ে পড়েছিল, তাই সে একটী ইজিচেয়ারে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে—কক্ষেরই এক কোণে।

যথাসময়ে নির্দ্দেশমত বৈষ্ণবীর আবির্ভাব,সঙ্গে তার সেই জলমগ্না বালিকা।

দরজা অর্গলাবদ্ধ হয়ে গেল।

বালিকাটী একবার চারিদিকে চেয়ে নিল—দীপালোকিত রমণীয় কক্ষের বিচিত্র শোভায় তার চক্ষু যেন জ্বলে যেতে লাগল। নম্রস্বরে বললে, "আপনারা আমায় এখানে আনলেন কেন?"

মুরলীধর আপ্যায়িত করে বললেন, "সুন্দরী, দৈব আজ অনুকূল—ঐশ্বর্য্য দিয়াছি খুলি তব দু'খভরা জীবনের দীনতার মাঝে।"

বালিকা শঙ্কিতমনে বললে, "এসব কি বলছেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—"

চাঁই মশাই মৃদু হাস্যে বললেন "কথাটা এই—অর্থাৎ, এর মানে কি, মহেন্দ্রকে অনেক কষ্টে রাজী করেছি গো—অর্থাৎ—তোমায় আমাদের পদসেবা করতে হবে।"

বালিকা সমস্তই বুঝতে পারলে। মিনতি করে বল্লে,"আপনারা দেবতারূপী ব্রাহ্মণ। আমি অস্পৃশ্যা মুচির মেয়ে, আমার বাতাসে চারিধার অপবিত্র হয়ে যায়—আমি আপনাদের শরনাপন্ন—আমায় ছে'ড়ে দিন।"

সে দরজার নিকট গিয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু উত্তেজিত মুরলিধর দ্বার অবরোধ করে দাঁড়ালেন—বললেন"মধুর কখন কি অপবিত্র হয়? আমাদের স্পর্শে তুমি মাধুর্য্যময়ী হয়ে উঠবে। তুমি এখানে রাজার হালে থাকবে।"

বালিকা জালবদ্ধা ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় উপায়-হীনা হয়ে চারিদিকে চাইতে লাগল। মাথা হতে শ্লথ কাপড় খসে পড়ে গেল চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে আর্ত্তনাদ করে উঠল—সেই ক্রন্দন কাতরতা বিলাস কক্ষের ইটের গড়া কঠিন প্রাচীর ভেদ করতে না পেরে নিভৃত কোণে কোণে হাহাকার করতে লাগল।

হঠাৎ ভূমিকম্পের ন্যায় দরজাটা সশব্দে কেঁপে উঠল। পরমুহূর্ত্তে খিল ভেঙ্গে দরজাটী

উন্মুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চকিতের ন্যায় মন্দিরের বিতাড়িত পুরোহিত বীরবিক্রমে কক্ষতলে এসে দাঁড়ালেন। সেই পলিতকেশ বৃদ্ধের লোলচর্ম্মের ভিতর কি দীপ্তি! স্তিমিত নেত্র দুটীতে নক্ষত্রের মত কি ঝিকি মিকি! কপালের রেখাগুলির কি স্ফীতি! কি ঘন ঘন শ্বাস!!

প্রকৃতিস্থ হবার পূর্ব্বেই মুরলিধর নাসিকার উপর প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত পেলেন—চাঁই মশাই প্রবল পদাঘাতে মহেন্দ্রর উপর ছিটকে পড়লেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধোন্মত স্বরে বললেন, পাজী শয়তান, তোরাই করবি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার? ছি!

মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে বালিকা দৌড়ে এসে "বাবা বাবা" বলে ব্রাহ্মণকে আঁকড়ে ধরলে।

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে ব্রাহ্মণ বালিকাটীর হাত ধরে বললেন, "আয় মা, শীগ্‌গির, এ নরকপুরী ছেড়ে চলে আয়।"

বাধা দিয়ে বালিকা বললে "বাবা, একটু অপেক্ষা করুন। আমার গলায় যে স্বর্ণপদকটী ছিল, এইখানে কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গেছে। সেটী আমার রক্ষা কবচ। মা আমায় যত্ন করে রাখতে বলেছিলেন।"

ব্রাহ্মণ মৃদু আকর্ষণে ঈষৎ হাস্যে বলতে লাগলেন, "পদক খোঁজবার আর দরকার নাই মা। রক্ষা কবচ অপেক্ষা যা দুষ্প্রাপ্য, যক্ষের ধন অপেক্ষা যা মহার্ঘ্য সেই সতীত্ব মহিমাকে রেখে চলে আয় মা।"

ব্রাহ্মণ বালিকার হাত ধরে, সেই প্রলয়ঙ্কর বর্ষণোন্মুখ গম্ভীর নিশার গাঢ়-অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

মহেন্দ্রের নেশা ধীরে ধীরে কেটে গিয়েছিল—সকলে বাইরে এসে দেখলেন "প্রবল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে—প্রচণ্ড বাতাসের কি হুঙ্কার! বিদ্যুৎশিখার কি তাণ্ডব নৃত্য। তার একটী শুভ্রবর্ণ ঝলক তার চোখের সামনে ছিটকে পড়ল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন বিকট শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল, তারাও সে মূর্চ্ছাতুরের মত সেইখানে বসে পড়ল।

সকালে সকালে দেখলে বজ্রপাতে দেবী মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ। ভগ্ন ইষ্টক স্তূপের ভিতর দেবীমূর্ত্তি ধূলিলুণ্ঠিত।

তিন

তিন বৎসর পরের কথা।

কয়েক দিন হল, বুড়া মা, তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে এসেচে, ছেলেকে নিয়ে—পূর্ব্বেরই মত আবার একবার ডাক্তার দেখাতে।

এবারকার ডাক্তার বিলাতের পাশ করা, তাঁর ছেলেরই স্কুলে পড়া বন্ধু। নাম মিষ্টার নরেশ।

পেশাদার ডাক্তারদের তৈরী স্তোক বাক্যে তাঁরা অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে বটে, কিন্তু এর কাছে স্বার্থহীন উপদেশ ও সারবান সযত্ন চিকিৎসায় প্রত্যাশায়, নিজের বাড়ীতে ডেকে এনেচেন।

নরেশ বললেন, "তারপর কি হ'ল মা?"

বৃদ্ধা বললেন, "তারপর বাবা, মালি পদকটী কুড়িয়ে পেয়ে আমার ছেলে মাহেন্দ্রকে দেয়। সে সেটি নাড়া চাড়া করতে করতে তার মধ্য হতে একখানি পত্র বার করে। এই সেই পত্র বাবা।"

উৎসুক নেত্রে নরেশ পত্রখানি পড়তে লাগলেন।

"এই পদকধারী দুঃখিনী বালিকাটীর আমি প্রতিপালক। ভোর রাত্রে ভাসমান পানসীতে তার জ্ঞানহারা মায়ের কোলে সাত আট মাসের শিশুরূপে তাকে পেয়েছিনু। তার মা তখন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। বাড়ীতে এনে চিকিৎসা করলাম বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ হ'ল। রোগ কঠিন, নিমোনিয়া তার উপরে মস্তিষ্ক বিকার। যে সময়টুকু জ্ঞান হয়েছিল, তখন জানলুম তিনি

চন্দ্র ঘরের মেয়ে নাম নীহার বালা। তাঁর উভয় কুলই ধবনী। গর্ভাবস্থা থেকে পিত্রালয়ে ছিলেন। একদিন সেখানে ডাকাতি হয়। তাদের হাত হতে বাচবার জন্ত একটী খালে, তাদেরি বাঁধা পানসীতে চেপে পড়েন। কিন্তু এমনি দুরদৃষ্ট; প্রবল বেগে জল এল। পানসিটী অনির্দ্দিষ্ট পথে ভেসে গেল। রাত্রের ঠাণ্ডায় তার ক্ষীণ দেহটী জ্ঞানশূন্ত হয়ে যায়। তিনি তার স্বামীর ও পিতার নাম বলেছিলেন, বাকী আর বলতে পারেন নি বোধ করি বলে ও থাকবেন, বুঝা যায় নাই। নিঃসন্তান ছিলাম আমরা—এই পর্য্যন্ত পড়ে নরেশ বললেন "তবে ত মা. সেই মেয়েটী মুচির কন্তা নয়। "আচ্ছা, নীহার বালাটী কে মা?"

চক্ষু মার্জ্জনা করে, কম্পিত ক্ষীণ স্বরে বৃদ্ধা বললেন "সে অভাগিনী আমার পুত্রবধূ বাবা।"

নরেশ চমকে উঠল তার হাত হতে পত্রখানি করতলে পড়ে গেল।

(৪)

এক সপ্তাহ চিকিৎসা চলল, কিন্তু মহেন্দ্র তবু অপ্রকৃতিস্থ। চক্ষু রক্ত বর্ণ, দৃষ্টি-পলক হীন জ্ঞান বিবেক শূন্ত ঘোর উন্মাদ।

কঠোর নৈরাশ্রে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসু নেত্রে নরেশের মুখের দিকে চাইলেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাতে চাই। নরেশ বলিলেন "বিলাত ফেরৎ বলে, আশ্চর্য্য হচ্ছেন মা? স্ত্রীর পরামর্শে আমি একবার বেশ ফল পেয়েছি ওতে।

বৃদ্ধা বললেন, তোমার যে মত পাবো সত্যই ভাবিনি। তোমাদের ভরসাতেই ত এ কাজে হাত দিতে সাহস করবো।

কয়েকদিন পরে।

নরেশ ইচ্ছা করেই যজ্ঞস্থান দেখতে এসেছিলেন। স্বস্ত্যয়নের হোমাগ্নিধূম যেন আকাশের বুক চিরে উর্দ্ধে কাতর প্রার্থনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হোতা একজন সংসারত্যাগী তেজস্বী সন্ন্যাসী। নরেশের পরিচিত।

সন্ন্যাসী মধুর স্বরে ডাকলেন, "নরেশ।"

নগ্ন পদে নরেশ চৌকাটের উপর দাঁড়লেন। মাথাটী নুইয়ে প্রণাম করতে যাবে,—তাতে অনভ্যস্ত কাজেই হল না।

একি দৃশ্য! কি ভয়ঙ্কর! কি হৃদিবিদারক! রক্ত যেন শিরায় শিরায় জমে যায়!

ঘোর কম্পিত স্বরে তিনি শুধু ডাকলেন "মায়া—"

তার স্ত্রী মায়ার রাঙা মুখখানি ফোটা ফুলের মত ফুটে উঠল। কি সুন্দর মানালো তাকে!

মায়াও কি উন্মাদিনী হ'ল? তা না হোলে ঐ পাগলটার কোলে বসে কেন?

সন্ন্যাসী মধুর হাস্যে ক্রোধ কম্পিত নরেশের মাথায় হাতের পরশ দিয়া বললেন. "বাবা, চটচ কেন? সবই ত শুনেচ তুমি। আমিই সেই বিতাড়িত পূজারী ব্রাহ্মণ, আর পছন্দ করে যাকে বিয়ে করেচ, সেই তোমাদের মহেন্দ্রের কন্যা।

নরেশ স্থির—নির্ব্বাক! যেন প্রাণ শূন্য পাথরের জীবন্ত মূর্ত্তি!

মায়াকে ছেড়ে মহেন্দ্র সংসারের মোহ কাটিয়েছিল, তাকে পেয়ে আবার সংসারে বদ্ধ হ'ল, নবজীবন লাভ করে!

বন্যা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

এক

নবযৌবনা তরুণীর মতই বর্ষাসিঞ্চিত জলধারা গৌরবে গৌরবময়ী দুকুলপ্লাবী সুসতানদী তরঙ্গভঙ্গিমায় নাচিয়া চলিয়াছে। তীরে বর্ষাবায়ু-হিল্লোলে তেমনই করিয়াই কম্পিত হইতেছিল নবজলধারাপুষ্ট সুশ্যামল শস্য এবং শষ্পরাজী। পরপারে বনরাজীলীলা প্রান্তর দিকচক্রবালের অঙ্গে ঘন মসীলেখার মত নিলীন্ হইয়া আছে। মনে হয় না উহা জীবন্ত, বোধ হয় চিত্রিত ছবিখানি।

এপারে বন্যা আসিতেছে বলিয়া অদূরবর্ত্তী কুটীরবাসীদিগের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সকলেই ক্ষণে ক্ষণে চকিত চমকে বারেবারেই নদীবক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। গোলা মরাই ছোটখাট যেটুকু যার সঞ্চয় আছে, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়; অথচ, তার উপায় খুঁজিয়া পায় না, এমনই তা'রা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে! তবু যতটা পারে হাতে মাথায় বহিয়া কমদামে বেচিয়া আসিতেছে। যা'দের সঞ্চয়ের বালাই নাই, এরই মধ্যে তা'রা আড়াই মাইল পথ হাঁটিয়া ভিক্ষা করিতে সহরে আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। শেষবেলায় বাড়ী ফিরিয়া চালের সঙ্গে মেশান ভুট্টার দানা না বাছিয়াই খড়কুটার আগুণে সিদ্ধ করিতে বসিয়া যায়; সারাদিনের ক্ষুৎ-পিপাসা আর বাছ-বিচারের অপেক্ষা করিতে রাজী হয় না।

নদীর জল এতগুলি লোক-লোচনের ভয়ার্ত্ত-কাতর-দৃষ্টির অভিঘাতেও কিছুমাত্র বাধা মানিতে প্রস্তুত হয় না—দিনের পর দিন সে বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেন শুক্লপক্ষের শশিকলা—যেন নূতন জন্মান তরুলতা, অথবা বাড়ন্ত একটী দামাল শিশু। কোনদিকে দিক্‌পাত নাই, আপনার মনেই হাসিয়া খেলিয়া উদ্দাম চাপল্যে নৃত্য করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যের সতেজ বৃদ্ধিতে তর্‌তর্ করিয়া বাড়িতেছে। তটের

উপর যখন-তখন ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, ছলাৎছল ছলাৎছল! মধ্যে মধ্যে ঘন ঘন আঘাতের ব্যথায় ক্ষীণ মধ্যতটভূমি অস্ফুট আর্ত্তনাদে তাহার বক্ষের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে—নদী সেই ফাঁকে আর একটুখানি স্থান দখল করিয়া লইয়া আর একটুখানি অগ্রসর হইতেছে। এমনি করিয়াই কত স্থল, কত ভূমি, কত দেশ, কত মহাদেশকেও সে আপনার জঠর মধ্যে স্থানদান করিয়া থাকে—আবার উল্টাদিকে কত নূতন প্রদেশকে রচনা করিয়া দেয়; পুরাতন গত হয়, নূতনের উদ্ভব হইতে থাকে। আবার একদা হয় ত সেই বিগতই নবাবিষ্কারের নূতন বিস্ময়ে মানব সমাজকে চমকিত করিয়া দিয়া অকস্মাৎ নূতন হইয়া দেখা দেয়। এই রকম লুকোচুরি খেলাটাই পুরাতনে এবং নূতনে চিরদিন ধরিয়া চলিতে থাকে।

বর্ষার আকাশে এক পশলা জলের পর মেঘগুলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তা'দের ব্যবধান পথের ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ পীতাভ শরৎ রৌদ্রের সূচনা দেখা দিয়াছিল। সেই রৌদ্ররঞ্জিত পুঞ্জিত মেঘস্তর আকাশের গায়ে নানামূর্ত্তিতে ও নানাআকারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন একটা বিচিত্র-তর শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। তা'দের কোনটার রূপ ধবলগিরির মত, কোনটার কালো রং পৌরা-নিক মৈনাক পাহাড়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। তা' ছাড়া, অধিকাংশই যেন শুঁড়তোলা নমস্ত হস্তি, তা' সাদাও আছে, কালোও আছে।

বিপিন 'হাঁ' করিয়া ঐ গুলিকে দেখিতেছিল। ওর ঐ রকম মেঘ দেখা একটা সখ। নানারকম কল্পনা করিয়া ওরই ভিতর বাড়ী, পাহাড়, উট এবং মানুষ এমন কি মেয়েমানুষের মুখও দেখিতে পায়। একদিন একটি সাদা মেঘের ছোট্ট টুকরার ভিতর সে গৌরবীর মুখের ছাঁচ আবিষ্কার করিয়া ছিল। সেই কথা সে তাহাকে খুব উৎসাহ করিয়া বলিতে গেলে গৌরবীর গর্ব্বিত ঠোঁটের পাশে এতটুকু একটুখানি অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার কঠিন মুখখানাকে কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছিল। সে খুব সংক্ষেপে মাত্র উত্তর দিয়াছিল, "তুই পাগল হয়ে যাবি।"

বিপিন ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই, বিস্ময়লেশহীন প্রশান্তকণ্ঠে সেও প্রত্যুত্তর করে, "যাবো কি? হয়েইছি।" তারপর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে, "কিন্তু তুই-ই আমায় পাগল করেছিস গৌরব! তুই যদি অমন না হ'তিস্, আমি পাগল হতুম না।"

গৌরব ইহারও উত্তরে তার কঠিন হাসি হাসিয়া বলে, "আমি তোকে পাগল না করি, তুই-ই আমায় পাগল করে' ছাড়বি! এমন বদ্ধ পাগল তো কোথাও দেখি নি!"

এরপর সে দৃঢ় করিয়া পা ফেলিয়া তা'দের বাড়ীর পথে চলিয়া যায়, পিছন হইতে যে দুইটি হতাশ-কাতর চোখের দৃষ্টি তাহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিতে থাকে, তা'র খবরটুকুও সে পায় না। তা' এমন ঘটনা তো আর ঐ একটিবারই ঘটে নাই। কতবারই না উহার পুনরাভিনয় হইয়াছে এবং হইতেছে। গৌরবী যখন নেহাৎ ছোট ছিল, তখন হইতেই তো বিপিনের সে খেলার সাথী। দু'জনার মধ্যে ভালবাসারও তো কোনদিন কমই ছিল না। এদের চালচলন দেখিয়া এদের দু'জন-কার মা-ই তো ঠিক করিয়াছিল,—বড় হইলে এ দু'জন স্বামী স্ত্রী হইয়া ঘরকরণা পাতাইয়া বসিবে। ওরাও মনে মনে তাই জানিত। বিপিন আজও সেই স্বপ্ন দেখে; কিন্তু গৌরবীর মনের সে স্বপ্ন-দেখা ঘুচিয়া গিয়াছে। আর সেই লইয়াই তো আজ যত কিছু বাদানুবাদ।

দুই

সেদিনকার মেঘের স্তরে অনেক কিছুই ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গৌরবীর মুখ আর কিছুতেই ফোটাইতে পারা গেল না। বিরক্ত হইয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর আলস্যে গা ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া কাস্তেখানা কুড়াইয়া লইল। গরুর জন্য এক বোঝা ঘাস কাটিয়া না লইয়া গেলেই নয়। ঘরে আজ মা নাই—বৎসর ঘুরিতে যায়, অনাথ ছেলেকে সম্পূর্ণরূপেই অনাথ করিয়া দিয়া সে নিজের দুঃখের জীবন শেষ করিয়া গিয়াছে! বিপিনের ছন্নছাড়া সংসারের ভার লইবার কেহই নাই—ঘর-দুয়ার শ্রীহীন, গোলা মরাই খসিয়া পড়িতেছে, রান্না তার প্রায়ই চড়ে না, ভাজাভুজি খাইয়া কোনমতে দিনটা কাটাইয়া দেয়। থাকার মধ্যে আছে তার একটা বাঁশের বাঁশী আর একটা দুগ্ধবতী গাভী। গরুটাকে সে হেনস্থা করে না, যত্ন করিয়াই সেবা করে। দুধ যেদিন ইচ্ছা হয় দোয়, নয় তো কাঁচাই খাইয়া ফেলে। সবদিন আবার তাও ভাল লাগে না, তাই বাচ্ছাটাকে খাইতে ছাড়িয়া দেয়। শুধু গৌরবীই নয়, অনেকেই তাকে পাগল বলে—পাগলের মতই তার রকম সকম।

কলসী লইয়া গৌরবী জল লইতে এই সময়েই আসে। তার সঙ্গে আরও একজনকে দেখা যায়—তাকে দেখিলেই বিপিনের গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়, সে মতি! মতি এ গাঁয়ের লোক নয়; সহরে। সেখানে সে কিসের একটা দোকানে না কোথায় কি যেন একটা চাকরী করে। চাকরে বলিয়া তা'র সবখানেই একটা খাতির আছে।

মাথায় ভুরভুরে লেবুর তেলের গন্ধেভরা চুকচুকে চুলে সোজা সিঁথি কাটা, গায়ে জালিদার গেঞ্জির উপর হাঁটুঝুলের পাতলা পাঞ্জাবী, পায়ে স্থঁড়তোলা লপেটা জুতা, হাতে পীচের পালিশ করা ছড়ি, যখন-তখন শিষ্ দিয়া গ্রামোফোনের গান গায়—

"এমন বাদলে তুমি কোথা?"—আবার গৌরবী কাছে আসিলে হাসিয়া গানের সুর ও কথা বদলায়—

"কি রূপ দেখনু যমুনা কি বাট!
এ কি নাগিনী যোগিনী কামিনীয়া?
এ কি মথুরাবাসিনী গোয়ালিনী,—"

গৌরবী হাসিয়া বলে, "থাম্ থাম্, লোকে শুনলে বলবে কি? রূপই বা আমার কোথায়, আমি তো কালো গো!"

মতি ঘাড় দুলাইয়া চোখ ঠারিয়া গান ধরে—

"কালোরূপে মজেছে এ মন!"

সে বোধ করি বা গ্রামোফোনের দোকানেই কাজ করে। নহিলে কথায় কথায় গান গায় কেমন করিয়া? লেখাপড়া তো আর জানে না।

তা' গৌরবীর মায়ের মন ছিল না; কিন্তু মেয়ের একান্ত জিদ, ধন্না দিয়া দু'দিন নিরম্বু পড়িয়া রহিল। বেচারা মা আর কি করিবে? মতি তা'কে বিয়ে করিয়া সহরে লইয়া যাইবে, ছোট্ট ছেলেটাকে লইয়া একাই সারদা এই কুঁড়েখানায় পড়িয়া থাকিবে। তার রোগ-ব্যায়ারাম আছে

আপদ-আর্ত্তি আছে ; বিপিন জামাই হইলে দেখাশুনা করিত। মেয়ে যখন মায়ের এমন যুক্তি-যুক্ত কথাতেও নিজের গোঁ ছাড়িল না, উল্টিয়া বলিয়া বসিল,

"তাই বলে আমায় কি চিরকালটা ধরে' এই পচাপড়া গাঁয়ের মধ্যে বসে' থাকতে হবে।" মা তখন মেয়ের উপর অভিমান করিয়াই এ বিবাহে সম্মতি দান করিল।

সেদিন হইতে বিপিনের বাঁশের বাঁশী গভীর বিনিদ্র রাত্রে করুণ বেদনার রাগিনীতে শ্রোতার চোখে না-জানা অশ্রুর বান ডাকায়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে, কেহ তার পাত্তাও পায় না ; হঠাৎ কোন সময় দেখা যায় নদীর কাছের কোন্ একটা কসাড়ের ঝোপের ধারে আকাশের দিকে চাহিয়া বালুকা শয্যায় শুইয়া আছে। দেহ তার দিনে দিনে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতেছিল। গাই দুহিতেও তা'র মনে পড়ে না, রান্নার পাঠ তো উঠিয়াই গিয়াছে। গৌরবীর মা সব খবরই পায়। মেয়েকে অনুযোগ করিয়া বলিতে গেল, "দেখ্ দেখি, তোর জন্যে প্রাণটা দিতে বসেচে, আর তুই—"

গৌরবী মায়ের কথা শেষ করিতে না দিয়াই ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "কেউ যদি ইচ্ছে সাধে প্রাণ দেয়, তার আমি কি করতে পারি ? আমি কি ওকে প্রাণ দিতে বলেছি ?—"

একটা আনন্দেভরা উচ্চ কলহাস্যের অতর্কিত আঘাতে অকস্মাৎ বিপিনের নিরানন্দ চিত্তের চিন্তাজাল খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। তা'র সমস্ত শরীর তা'র অজ্ঞাতেই যেন একবার গভীর পুলকে এবং তার পরক্ষণেই সুগভীর ব্যথায় শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরিয়া দেখিবে না, সঙ্কল্প সে প্রাণপণে করিতে থাকিলেও কে যেন জোর করিয়াই মুখখানাকে টান মারিয়া তার পিছন দিকে ফিরাইয়া দিল। সে দেখিল,—যা' দেখিল তা' তা'র জানাই ছিল। মতির সঙ্গে তা'র হাত ধরিয়া গৌরবী জল ভরিতে আসিয়াছে। তা'দেরই হাসি-কথার কলোচ্ছ্বাস ঢেউ তুলিয়া বাতাসের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতে পড়িতে অভাগা বিপিনেরও কাণের তারে আঘাত করিতেছিল। গৌরবীর পরণে রাঙ্গাপাড়ের হলদে ডুরে, নিশ্চয়ই মতি আনিয়া দিয়াছে। তা'র উঁচু খোঁপার উপর দিকে কতকগুলি সেলুলয়েডের গোলাপীফুল কাঁটা দিয়া গোঁজা—সেও ওই মতির হাতের দান। কলসীকে বেড়িয়া-ধরা হাতখানাতে একগোছা কাঁচের চুড়ি ; হাসির হিল্লোলে অঙ্গ-দোলানীর সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বসান কাঁচের আয়নাগুলো রোদ লাগিয়া চক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। কপালে পাথুরে পোকার টিপ্। বিপিনের বুকের ভিতরটা কেমন একরকম করিয়া উঠিল। তা'র মনে পড়িল—ঐ পাথুরে পোকা কত করিয়াই সে ওর জন্য খুঁজিয়া আনিয়াছিল। আজ মতির দেওয়া অনেক কিছুর সঙ্গে তা'র ঐ অকিঞ্চিৎকর দানটুকুকে যে সে তুচ্ছ না করিয়া ফেলিয়া না দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এও তার দুঃখের ভিতরকার এক ফোঁটা গোপন আনন্দ।

ভাবিতে গিয়া তা'র চোখে জল আসিয়া পড়িল। পাছে উহারা দেখে, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া আকাশের মেঘস্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আসন্নবর্ষণের আগ্রহে তখন তাহারা ব্যস্তত্রস্ত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গদের জমা করিয়া ফেলিতেছে ; সেখান হইতে আশ্বাসের কি তিরস্কারের জানি না একটা গুরুগম্ভীর নিনাদ আসিল, গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্!—বিপিনের চোখ দু'টী দিয়া দু'টী ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

বেশী দূরে নয়, একখানা ছোট্ট মকাই ক্ষেতের ওপারেই নদী-চলার পথ। গৌরবীর গলার স্বর খুব স্পষ্ট হইয়াই কাণে ভাসিয়া আসে, "হ্যাঁ দেখ, জল যেন নাপিয়ে নাপিয়ে ছুট্‌চে গো! কি টান রে

বাবা! একবার যদি ওর মধ্যে কেউ পড়ে! উঃ, কিসের শব্দ হলো? মাটী খসে পড়লো,—ঐ যা, অতবড় বাবলাগাছটাও শেকড় ছিঁড়ে পড়েছে দেখ।"

—"বন্যে না এসে দেখ্‌চি ছাড়বে না। তাই জন্যেই তো বল্‌ছি তোকে গৌরমণি! মাকে ধরে' পরশু রাতে বে-টা সেরে নিয়ে ঘরে চল; এখানে কখন যে কি হয়, তার কিছু ঠিকানা আছে।"

গৌরবী হাসিভরা চপল চোখে চাহিয়া বলিল, "আমার যেন তাতে বড্ডই অসাধ! মা বেটীর যে কি ঝোঁক চেপেছে, সেই যে কি শুভক্ষণ আছে ছাব্বিশে শ্রাবণে, সে নইলে তার মন সুস্থ হবে না।"

মতি ফস্ করিয়া তার দাড়ী ধরিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিল, তারপর সুর করিয়া গাইয়া উঠিল—

"আমার প্রেম করা হ'ল দায়;

ঘরে পরে বাদি সবাই, বাদি তা'তে বিধাতায়।—"

গৌরবী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া মতির মুখের কাছে মুখ তুলিয়া সানন্দ এবং সপ্রেম কণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঐ গুণেই তো তোমার পায়ে বিকিয়ে গেছি গো! এমন কথায় কথায় কবিতা কইতে বড় বড় বাবুভায়ারাও যে পারে না—মতি! মতি! মা গো গেলুম!—"

ঝপাৎ করিয়া একটা মস্তবড় শব্দ হইল সঙ্গে সঙ্গে আল্‌গা মাটীর 'ধস্' ভাঙ্গিয়া লতাগুল্ম ঘাস জমির সঙ্গে গৌরবীও সেই বর্ষার জলস্রোত-তাড়িত নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। এত অতর্কিতে এ ঘটনা ঘটিল যে, মতি হতভম্ব হইয়া অবাক্ চক্ষে চাহিয়া যতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তা'র ভিতর গৌরবীকে স্রোতের টান অনেকখানি দূরেই টানিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রাণপণে স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মতি!"

মতি নড়িল না। কেমন করিয়া ঐ উন্মত্ত জলস্রোতের মধ্যে সে আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়া দু'দিনের খেয়ালের সাথীকে উদ্ধার করিতে ছুটিবে? মানুষে পারে?

কিন্তু মানুষেই তা' পারিল। বিপিন দূরে থাকিয়াই শব্দটা পাইয়াছিল; চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইতেই আসল ব্যাপারটা এক লহমার ভেতর বুঝিতে পারিল। যেদিকে স্রোতের টান, সে ছিল অনেকখানি সেই দিকেই; এক মুহূর্তে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ছুটিয়া গিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গৌরবী তখনও একেবারে অবসন্ন হয় নাই—সাঁতরাইয়া ভাসিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। বিপিন তাকে এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া সাঁতারাইয়া তীরের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল। ততক্ষণে ভয়ে এবং ক্লান্তিতে গৌরবীর সমস্ত দেহ গভীর অবসাদে ঢলিয়া পড়িয়াছে। "বিপিন! শেষে তুই আমায় বাঁচালি!—" এইটুকু কথা বলিয়াই সে একেবারে মূর্চ্ছাবসন্ন হইয়া পড়িল।

গৌরবী যখন চোখ চাহিল, তখন দেখিল তার মুখের উপর পড়িয়া তা'র মা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে, ছোট ভাইটা 'দিদি, দিদি' করিয়া ডাক ছাড়িতেছে, চারিপাশে রাজ্যের লোক জড় হইয়া নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। তাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মতি অনেক ছন্দোবন্ধে অনেকখানি রসান দিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ব্যাপারটাকে খুব জমকালো করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল। গৌরবী তা'র দিকে এক লহমার জন্য গভীর বিতৃষ্ণার সহিত চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল। তখন তা'র অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি হঠাৎ মিলিত হইয়া গেল তার সম্মুখবর্ত্তী, অথচ অনেকখানি দূরে একান্তে অব-

স্থিত বিপিনের সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত। তা'র কাপড় তখনও ভিজা, ঝাঁকড়া চুল দিয়া জল ঝরিতেছে, কিন্তু শুষ্ক শীর্ণমুখে একটা গভীর আনন্দের ছায়া যেন বর্ষাদিনের রামধনুর মতই দীপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরবী স্থির-অপলক-নেত্রে কিছুক্ষণ তা'র মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল; তারপর নিজের হু'হাত খালি করিয়া কাঁচের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"কাপড়খানা বদলিয়ে দিয়ে ওকে এইসব ফিরিয়ে দে? আর তাকের ওপর কাকুঁই আয়না ও তেল আছে, সেইগুলো পেড়ে দিয়ে দে, আর বল্, ও যেন কখন আর আমার সাম্‌নে মুখ দেখাতে আসে না।"

কথাটা সমবেত সকলেই শুনিতে পাইয়াছিল। একটা মুখ চাওয়া-চাওয়ির ধূম পড়িয়া গেল। মতি রাগে অপমানে গোঁজ হইয়া রহিল।

গৌরবী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই বিপিনকে হাতের ইসারা করিয়া কাছে ডাকিল। বিস্মিত ও শুম্ভিতভাবে সে ধীরে ধীরে কাছে আসিলে, বিনম্র ও সলজ্জভাবে ঈষৎ স্বর নামাইয়া সে তাহাকে বলিল, "যাও, কাপড় ছাড় গে। রান্না না করো নাই করলে, এইখানেই মায়ের কাছেই হু'টী খেয়ে নিও। কাল থেকে আমিই তোমায় বেঁধে দিতে আরম্ভ করবো—নৈলে ছাব্বিশে আসতে আসতে তোমার দেহে আর কিছুই যে বাকি থাকবে না!"

বিপিন যেন কচিছেলের মতই হু'হাতে মুখটা ঢাকা দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। তার বোধ হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে!
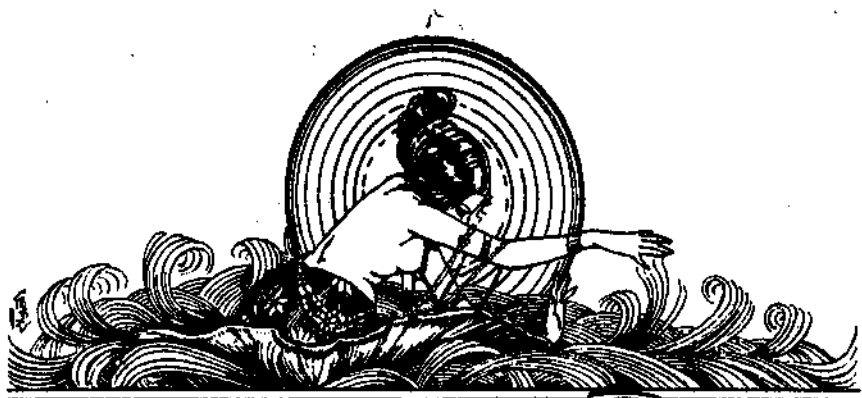
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪০ | ষষ্ঠ সংখ্যা।

বহ্বারম্ভে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অত্যন্ত রাগের মাথায় হরেকৃষ্ণ যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, স্ত্রী সুধামুখী তখন সত্যই মনে করিতে পারে নাই, স্বামীর যে কথা সেই কাজ,—হরেকৃষ্ণ সত্যই বাড়ী ফিরিবে না।

সারাটা দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিল আবার গতও হইয়া গেল, হরেকৃষ্ণ ফিরিল না।

ভাবনা সত্যই একটু হইয়াছিল বই কি।

আজ তের বৎসর বিবাহ হইয়াছে।

সুধা প্রথম যখন এ সংসারে আসিয়াছিল তাহার বয়স তখন তের, এখন ছাব্বিশ।

আশ্চর্য্য এই—পাড়ার লোকে তাহাদের ঝগড়া-বিবাদের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিত— ইহারা নিজেরাও নিত্য উপবাস দিত, ঘণ্টাকতক কেহ কাহারও সহিত কথা বলিত না, দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া যাইত—তবু এই দীর্ঘ দিনে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই।

অনেক দিন অনেক মেয়ে ঘাটে সুধাকে উপদেশ দিয়াছে—"কেন বাপু ও-লোকের ঘর করা, দিন রাত ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি করবার দরকার কি? বাপের বাড়ী তো আছে চলে যাওনা কেন সেখানে? এই নিত্য খাওয়া হয় না, মুখ দেখাদেখি নেই—এর চেয়ে বাপের বাড়ী যাওয়াও তো ভালো।"

সুধা অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িত— "কেন গা, বাপের বাড়ী যাব কেন—কি দুঃখে বাপের বাড়ী যাব? ঝগড়াঝাঁটিই তোমরা

দেখে থাক কি না—মন যাদের যেদিকে তারা আর কি দেখতে পাবে? শকুন যত ওপরেই উঠুক না, তাদের নজর যে মড়ার দিকেই থাকবে তা জানি।"

তীক্ষ্ন কর্কশ কথাগুলি সকলের মনেই জ্বালা ধরাইয়া দিত, তথাপি কেহ একটী কথাও বলিতে পারিত না। তাহাকে কথা বলাও তো বড় মুখের কথা নয়, একটা কথা বলিলে সে দশটা কথা শুনাইয়া দিবে।

তের বৎসর ধরিয়া এই ব্যবহার চলিতেছে, লোকের প্রথমে অসহ্য বোধ হইত, আজকাল বেশ সহিয়া গিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া কেহ এখন ছুটিয়া আসে না, দূর হইতে নির্লিপ্তভাবে শুনিয়াই যায় মাত্র।

যেদিন হরেকৃষ্ণ অদৃশ্য হইয়া গেল, সেদিন সকালেও লোকে শুনিয়াছে—"ফের চোপা করছিস পোড়ারমুখী,—দেখবি তবে—দেখবি•?"

সঙ্গে সঙ্গে কাংস কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল,—"মারবি কাকে পোড়ারমুখো,—বড় যে এগিয়ে আসছিস্? আয় না, এই দু'হাত মেপে গণ্ডী দিলুম,—এর মধ্যে পা বাড়াবি কি এই বঁটি দিয়ে নাক-কান কেটে দেব?"

সম্ভবতঃ নাক কান কাটবার ভয়েই শীর্ণাকৃতি হরেকৃষ্ণ আর অগ্রসর হয় নাই, সময়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেও মুখের জোর তাহার যায় নাই। বাহির বাড়ীতে আসিয়া সে হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল, "নেহাৎ মেয়েমানুষ বলেই গায়ে হাত দিলুম না, হতিস যদি পুরুষ মানুষ তোকে একচোট দেখে নিতুম। আচ্ছা থাক তুই; তোকে যদি জব্দ করতে না পারি—আমার নাম হরেকৃষ্ণ সাধুখাঁ নয়।"

কেবলমাত্র তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই হরেকৃষ্ণ দেশ ছাড়িয়া গেল।

দেশের লোক বিশেষ করিয়া বাড়ীর পাশের লোকেরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

রাত্রিটা তাহারা নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিবে। প্রতিদিন হরেকৃষ্ণ ও পাড়ার আখড়া হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসে প্রায় এগারটা বারটার সময়, সুধা দরজায় ডবল খিল আঁটিয়া পড়িয়া ঘুমাইত।

হরেকৃষ্ণের সে রাত্রে কি চীৎকার! এক একদিন গালাগালির চোটে পাশের বাড়ীর লোকেরা অস্থির হইয়া উঠিত। অভয়দাস দরজা খুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিত—"বলি, আজ কি রাত্রে কাউকে ঘুমোতে দেবে না সাধুখাঁ?

সাধুখাঁ বিকৃত মুখে বলিত, "কি করি বল দাসের পো। মাগী যেন মরণ ঘুম ঘুমিয়েছে, বেঁচে আছে কি সত্যই মরেছে কে জানে! পাড়াগাঁ যায়গা রাতও হয়ে গেছে অনেক, বন-জঙ্গলে সাপখোপের তো অভাব নেই।

শেষের দিকটায় সত্যই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিত।

অভয় দাস যখন বলিত, "রোস, আমি যাচ্ছি।"

ঠিক সেই সময়েই দরজা খুলিয়া যাইত।

তখন আবার একচোট বিবাদ বাধিত, দুই পক্ষ প্রথমটায় 'সমন' চলিত, শেষটায় জয়লাভ করিত সুধা। তাহার কাংস্য কণ্ঠস্বরে, অতি দ্রুত ভাষণে বেচারা হরেকৃষ্ণ আর একটী কথাও বলিতে পারিত না।

হরেকৃষ্ণ অদৃশ্য হইলে পাড়াটা একেবারে নিঝুম হইয়া গেল।

কেহ কেহ বলিল, "আর যতই অসুবিধা হোক—চোর ডাকাতের ভয় ছিল না বাপু, এ কথা বলতেই হবে। পাড়াটা খাসা জমজমাট রেখেছিল,কারও মাথা গলাবার যো-টি ছিল না।"

দিন যেন আর কাটিতে চায় না।

তেরটা বৎসর এক আধ দিন তো নয়। অন্য সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত তাহারা চুপচাপ শান্তিময়, বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন তো করে নাই। তাহাদের দিন ছিল প্রতিদিন নূতন। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া সুধা মনে করিত আজ সে বেশ ভালো ভাবেই দিন কাটাইবে, ঝগড়া করিবে না, কিন্তু কার্য্যকালে ঘটিয়া যাইত অন্য রকম।

ঝগড়ার সূত্র কেমন আপনিই বাহির হইয়া পড়িত, এবং তাহাই গড়াইয়া যাইত একেবারে সপ্তমে,—শেষটায় মারামারির উপক্রম।

সেই ঝগড়াটে লোকটা বাড়ী নাই, ঝগড়াটি সুধার মুখে কে যেন সিমেণ্ট দিয়া দিয়াছে।

সমস্ত দিন সে উঠে নাই, রাঁধে নাই, খায়ও নাই।

হরেকৃষ্ণ রাত্রে নিশ্চয়ই আসিবে জানিয়া সে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিল, ভাত রাঁধিল এবং হরেকৃষ্ণের পরম প্রিয় তরকারী মোচার ঘণ্ট পর্য্যন্ত বহুযত্নে তৈয়ারী করিল।

রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ভাত বাড়িয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঝিমাইতে ঝিমাইতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা সে জানে না। মধ্য রাত্রে ঘরের পাশে প্রকাণ্ড বড় নারিকেল গাছটার উপর বড় একটা পেঁচা গম্ভীরভাবে ডাকিয়া উঠিল, তাহারই বীভৎস গম্ভীর আওয়াজে সুধার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেছে, কত রাত তখন কে জানে!

সুধা আবার প্রদীপ জ্বালিল।

কে জানে সে আসিয়াছিল কি না। কিন্তু তাই কি হইতে পারে,—সে আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে, এ যে তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রম।

শুধু কি এই এক রাত্রি?

দিনের পর কত দিন আসিল, কত রাত আসিল, আবার কাটিয়াও গেল, হরেকৃষ্ণ আসিল না। সে যে সত্যই জব্দ করিবার মতলবে চলিয়া গিয়াছে তাহা সুধা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ডবল খিল আঁটিয়া দিয় নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিল।

এক ঘাট লোকের সামনে বিন্দুর মা সেদিন বলিতেছিল, "মিনসে গেছে না তোর হাড় জুড়িয়েছে সুধা; মাগো, দিনরাত সে কি দন্ত কচকচি, যেন কেউ কাকে চিবিয়ে খায়। ধন্যি স্বামী ভাগ্যও করেছিলি বাছা, একটা দিন সুখী হতে পারিস নি।"

সম্পর্কে সে সুধার মাসীমা, তাহার ভালমন্দ কিছু হইলে মাসীরও ভাবনা হয় বই কি। মাসীও মাঝে মাঝে উপদেশ দিত বড় কম নয়।

সুধা নিঃশব্দে তাহার কথা শুনিয়া গেল, ঘাটের জলের সঙ্গে তাহার চোখের জল মিলাইয়া গেল কেহই তাহা জানিতেও পারে নাই।

মাসী বলিল, "শান্তিতে থাকবি বাছা,—দু'বেলা মাছ ভাত খেতে পাবি, হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর তোর অক্ষয় হোক, সে দূরে দূরেই থাক। অমন মুখপোড়ার মুখে মারি সাত ঘা' ঝাঁটার বাড়ি, মিনসের যেমন চেহারা কালো ভূতের মত, মনটাও কি তেমনি কালকূটে ভরা গা? যাক্, তোকে ত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না সুধা—জমি-জমা যা আছে আমার সন্তুই সব দেখবে শুনবে।

সুধা ফোঁস করিয়া উঠিল—

"তা বই কি মাসী, কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস, এ হয়েছে ঠিক তাই। ঘুঁটে কুড়ুনীর

মেয়ে—হয়েছি রাজার রাণী। যে আমায় এনে রাণী করলে আজ সে আমারই জিভের জ্বালায় ছটফট করে বেরিয়েছে, হয় তো খেতে পাচ্ছে, নয় তো উপোষ করে তার দিন কাটছে। তার জমি-জমার আমার অধিকার কিসের গা, সে এসে নিজের সব নেবে, পরকে আমি ডাকব কেন ?"

মাসী একেবারে স্তম্ভিত—

শেষটায় বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া গেল, "দুনিয়ায় কেউ যেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। বলি তোর জন্যেই না বলছিলুম সুধা, তুই কি না উল্টো প্যাঁচ কষালি, যা বাপু, তুই যা খুসী কর গিয়ে; আর কোন দিন যদি তোকে একটা কথা বলি আমি বেন্দাবনের মেয়ে নই এই বলে গেলুম।"

অথচ তার পরদিনই সাতু ওরফে সাতকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল—

একটী কথা না বলিতেই সে জানাইল, "লাল বাড়ীর পাঁচ বিঘা জমিতে ভয়ানক ধান হইয়াছে আর চাঁচুড়ের ওদিকটায়—"

মৃদুকণ্ঠে সুধা বলিল, "থাক থাক, যার জিনিষ সেই এসে সব বুঝে সুঝে নেবে সাতু, আমার ওসব দেখাশোনা করবার কি দরকার, ধান পাকুক, তলায় বিছিয়ে পড়ুক—আমার তাতে কি ?"

সাতু অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "তুমি কিছু দেখবে না, ব্যবস্থা করবে না ?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া সুধা বলিল, "না—"

তবু আরও কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাতু বলিল—"বেশ—"

তাহার পর সে ফিরিয়া গেল, আর আসিল না, সুধাও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হরেকৃষ্ণ ফিরিল।

দীর্ঘ তিনটী বৎসর তখন কাটিয়া গিয়াছে।

ফিরিল অপরূপ বেশে

তাহার গলায় কণ্ঠি, হাতে হরিনামের মালা ও ঝোলা, নাকে কপালে তিলক, মুখে সর্ব্বদাই উচ্চারিত হইতেছে—হরে কৃষ্ণ, রাধে গোবিন্দ, রাধে শ্যাম।

মাথার চুলগুলো ভক্তের উপযোগী ঝাঁকড়া ভাবে ঘাড়ের নীচে পিঠের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, পরণে গেরুয়া রংএর কাপড়।

সে একা আসিল না, সঙ্গে আসিল একটী মেয়ে নাম তাহার মালতী।

এ রত্নটীকে সে কোথায় পাইয়াছে কে জানে। মালতীর বয়স কুড়ি-বাইশ হইতে পারে। নিটোল নধর দেহখানি, গায়ের রং কালো, কিন্তু কালো বলিয়াই বড় বড় দুইটী চোখ—নাক মুখ হয় ত অত ভালো হইয়াছে। মাথার একরাশ চুল যখন পিছনে এলাইয়া দেয় তখন বাস্তবিকই লোকে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া থাকে।

শুনা গেল হরেকৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়া এতদিন ছিল এবং সেখানেই সে মনের দুঃখে এই মেয়েটীর সহিত কণ্ঠি-বদল করিয়াছে।

শ্রীদাম ঘোষ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "কাজটা ভালো করনি ঠাকুর, মা লক্ষ্মী ঘরেই রয়েছেন আবার একটী অ-লক্ষ্মীকে আনার কি দরকার ছিল ?"

হরেকৃষ্ণ বিকৃত মুখে বলিল, "ঝাঁটা মারি তোমার মা লক্ষ্মীর মুখে,—আমার অমন লক্ষ্মীতে দরকার নেই অ-লক্ষ্মীই ভালো। যাহোক শান্তিতে দিন রাতটা কাটাতে পারি, দু'দণ্ড ভগবানের নামও করতে পারি, দুবেলা দুটো ভাতও খেতে পাই। তোমাদের মা লক্ষ্মী যে একদিন মহাকালী হয়ে আমার মাথায় নেচে

ছিলেন সে কথা তো কোন দিন ভুলতে পারব না বাপু।"

শ্রীদাম মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তবুও বলি এক হাতে তো তালি বাজে না ঠাকুর। মা লক্ষী ঝগড়া করতেন বটে, তুমি আগে কথা বলতে বলেই বাধত নাকি? ওঁকে ঝগড়া করতে তুমিই তো শিখিয়েছ, আগেও তো আমরা ওঁকে দেখেছি। এমন ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে আমাদের গাঁয়ে একটী ছিল না, এ কথা জোর করে আজও বলতে পারি।"

হরেকৃষ্ণ দেওয়াল হইতে মালা ও ঝুলি পাড়িয়া বলিল, "আমি এখন জপে বসব শ্রীদাম।"

শ্রীদাম গম্ভীর হইয়া বলিল, "বসবে—বসো, আমি আর কথা বলতে আসব না। তবে কাজটা তুমি মোটে ভালো করনি, একদিন এর জন্মে তোমায় পস্তাতে হবে, এ আমি তোমায় বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার কথা সত্যি কিনা দেখো। অমন সতী-লক্ষীকে কষ্ট দিলে, উনি মুখে কিছু না বললেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন তো,—তার ফল ভুগতেই হবে।"

সে চলিয়া গেল, কিন্তু যে কথাটা বলিয়া গেল তাহাই হরেকৃষ্ণের মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল।

মালতী মেয়েটী বেশ!

মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে আদেশ পালন করে। হরেকৃষ্ণ মালতীর কাছে বেশ সুখে রহিয়াছে।

দিনের বেলায় সে ভিক্ষায় বাহির হয়, যে দরজাতেই রাধেকৃষ্ণ বলিয়া দাঁড়ায়, এক মুঠা ভিক্ষা সেখানে পাওয়া যায়।

আখড়া বাড়ীতে সে স্থান লইয়াছে, এখান হইতে বাড়ী বড় বেশী দূর নয়। হরেকৃষ্ণ কোন দিন বাড়ীর পাশের পথ দিয়া হাঁটে না, কি জানি যদি হঠাৎ চোখোচোখি হইয়া যায়, যদি সে হরেকৃষ্ণের গলায় গামছা জড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে টানিয়া লইয়া যায়।

হাঁ, সে তা পারে। কেবল মুখের কসরৎ দেখাইতেই সে মজবুত নয়, দৈহিক শক্তিও যথেষ্ট রাখে। একদিন নিতান্ত অসহ্যবোধে হরেকৃষ্ণ তাহাকে একটা চড় মারিবার জন্ম হাত উঠাইয়াছিল, সেই উদ্যত হাতখানা যখন চাপিয়া ধরিয়াছিল, বেচারা হরেকৃষ্ণ করুণ স্বরে চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল।

হাত তো নয়—যেন বজ্র।

সেই হাতের কথা মনে করিতে আজও হরেকৃষ্ণ শিহরিয়া উঠে!

হঠাৎ একদিন বাড়ীর মঙ্গলা গাইটা আসিয়া উপস্থিত।

একটী দশ বারো বৎসরের ছোট ছেলে গাইটীর গলার দড়ি ধরিয়া আনিয়া আখড়ার উঠানে খোঁটায় পুঁতিয়া দিল।

নিজের গরুটাকে দেখিয়াই হরেকৃষ্ণ চিনিল, অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "এ কি খোকা, এ গরু তুমি কোথা হতে আনলে?"

ছেলে বলিল, "মা ঠাকরুণ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"মা ঠাকরুণ—"

হরেকৃষ্ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ছেলেটী বলিল, "তিনি বললেন, বাবাজির চেহারা দুধ না খেয়ে ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এর পরে ভিক্ষে করতে পারবে না। আপনার দুধ খাওয়ার জন্তে তিনি মঙ্গলাকে পাঠিয়েছেন। এর দুধ খুব হয় বাবাজি, সকালে আড়াই সের দুধ একটানে দিয়ে ফেলে, বিকেলেও সেরখানেক হয়।"

হঠাৎ গরু পাঠাইবার হেতু হরেকৃষ্ণ খুঁজিয়া পাইল না, সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

তাহার স্নেহের পানে দৃষ্টি দিবার এবং সেজন্য গরু পাঠাইবার কোন দরকার নাই এই কথাটা একবার সুধাকে শুনাইয়া দিতে হইবে। ছোট ছেলেটাকে বলিলেও কোন ফল হইবে না,—সে কিছুই বলিতে পারিবে না।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "গরু কোথা হতে এলো গোঁসাইজি ?"

গোঁসাইজি গম্ভীর মুখে বলিল, "কে পাঠিয়েছে পরে খবর নেব।"

ইহার পরেই একদিন হরেকৃষ্ণ বাড়ীর পাশের পথ দিয়া চলিতেছিল। পথে কাহাকেও দেখার আশা সে করিয়াছিল, দেখা হইলে গরু দেওয়া লইয়া বেশ দু'চার কথা শুনাইয়াও দেওয়া যাইত, কিন্তু লোক দেখা তো দূরের কথা বাড়ীর দরজাটা পর্যন্ত খোলা দেখা গেল না।

একবার ইচ্ছা হইল দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকে কিন্তু প্রবল চক্ষুলজ্জা আসিয়া বাধা দিল, হরেকৃষ্ণ সোজা চলিয়া গেল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে দেখিল মালতী নিজেই দুধ দুহিয়াছে, দুধ হইয়াছেও অনেকখানি।

সেই দুধ ভাতের পাতে চুমুক দিয়া খাইতে গিয়া হরেকৃষ্ণ বড় বেশী রকম একটা বিষম খাইল।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া মালতী বলিল, "কোন শ্বশুর গাল পাড়ছে গো—তাই এত বড় বিষমটা খেলে। বাঁ-হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে তিনটে আঁচড় দাও—"

হরেকৃষ্ণ হাসিয়া উঠিল, "হ্যাঁ,যত সব মেয়েলী শাস্তর, ও সব তোমরাই করো। আমার এ দুনিয়ায় একটাও শ্বশুর নেই তা আমি জানি।"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মালতী বলিল, "নেই বই কি, এই গাঁয়েই যে তোমার প্রধান শত্রু রয়েছে।"

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কে শত্রু ?"

মালতী উত্তর দিল, "তোমার পরিবার। শুনেছি প্রতিদিন ভোরে উঠেই সে তোমার আমার যমের বাড়ী যাওয়ার প্রার্থনা করে।"

"তার প্রার্থনা যদি সফল হতো—যমের বাড়ী যেতে পারলেও যে বাঁচতুম—"

বলিয়া হরেকৃষ্ণ উঠিয়া গেল।

লোকটার যেন আদি অন্ত পাওয়া ভার। মালতী ইহার নাগাল আজও পায় নাই, ইহার প্রকৃতি সে বুঝিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সব চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

আখড়ায় মহোৎসব।

কত লোক নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, অষ্টম প্রহরে যোগ দিতেছে।

সঙ্কীর্তনের মাঝখানে হরেকৃষ্ণ—

মাঝে মাঝে সে সমাধিমগ্ন হইতেছে, ভক্তেরা গুরুর সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে।

গোঁসাইজীর খ্যাতি ইহারই মধ্যে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বড় কম নয়, ভক্তের সংখ্যাও অপর্য্যাপ্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ"—

ভক্তদের মুখে এ নামের বিরাম নাই।

গোঁসাইজী গাহিতে গাহিতে এক একবার মুখ তুলিয়া মেয়েদের দিকে তাকাইতেছিল, মেয়েদের মধ্যে ভক্তি ও ভাবের প্রাবল্য বড় বেশী রকম, কোন কোন বর্ষীয়সী চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন।

হঠাৎ একটী মেয়ের উপর চোখ পড়িতেই হরেকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া চমকিয়া দাঁড়াইল।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখ, দুইটী চোখ বাহির হইতে

স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল —সেই দুইটী চোখে কি তীব্র দৃষ্টি !

সে যেন ভক্তির সঙ্গে কীর্ত্তন দেখিতেছে না, তাহার দৃষ্টিতে ফুটিতেছিল দারুণ অবজ্ঞা। কঠিন বিচারকের দৃষ্টি লইয়া সে বসিয়াছিল, দেখিতেছিল, ইহার মধ্যে কতখানি সত্য এবং কতখানি মিথ্যা আছে।

হরেকৃষ্ণ মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর আর ফুটিল না।

আর খানিক কীর্ত্তনে থাকিয়া পরিশ্রান্তভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মালতীও উঠিয়া গেল। সে যেন পতিগতপ্রাণা স্ত্রী ঠিক এই ভাবটাই সে প্রকাশ করিতেছিল।

সুধা নিস্তব্ধে সবই দেখিল, তাহার মুখখানা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল।

ঘণ্টা দুই বসিয়া সে যখন কীর্ত্তনের স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল তখন বেলা আর ছিল না। গোধূলীর ম্লানালোক সমস্ত গ্রামখানির বুকে জাগিয়া রহিয়াছে।

আখড়ার জনৈক বৈরাগী প্রভুকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গোঁসাইজি নিজের ঘরে শুইয়া আছেন, তাঁহার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে। এ সময়ে দেখা করা নিষেধ জানা সত্ত্বেও সুধা গিয়া গোঁসাইজির ঘরের সামনে দাঁড়াইল।

খাটের উপর শুইয়া হরেকৃষ্ণ ; মালতী তাহার মাথায় কেবল হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঝিমাইতেছে।

দেখিয়া সুধার সমস্ত দেহটা জ্বলিতে লাগিল। এই সেবা-ধর্ম্মটাকে সে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিল না।

আত্মবিস্মৃত হইয়াই সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

পায়ের শব্দ পাইয়া হরেকৃষ্ণ মুখ ফিরাইল—"এ কি সুধা, তুমি ?"

ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল।

মালতীর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে বিস্ফারিত নেত্রে সুধার পানে তাকাইল।

"হ্যাঁ আমি—"

মালতীর পানে তাকাইয়া সুধা বলিল, "তুমি ওঠো, আমি খানিকটা দেখি।"

এ আদেশ যেন অগ্রাহ্য করা যায় না। মালতী ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও উঠিল।

ঘরের এককোণে কুঁজায় জল ছিল, সুধা সেইটাকে টানিয়া আনিয়া একরকম প্রায় জোর করিয়া হরেকৃষ্ণের মাথা ধোয়াইয়া দিল ; তাহার পর গামছা দিয়া মুছাইয়া দিতে দিতে তিরস্কারের সুরে বলিল, "আত্মা রেখে ধর্ম্ম—এ কথাটা সব সময়ে মনে রেখো বলে দিচ্ছি, নাম কিনতে গিয়ে দেহটাকে নষ্ট করো না।"

হরেকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "তুমি কি বলতে চাও আমি কেবল নাম কেনবার জন্যেই এ সব করছি ?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুধা বলিল, "আমার চোখে ধূলো দিতে যেয়োনা ঠাকুর, আজ না হয় গোঁসাই হয়েছ, চিরদিন তো ছিলে না। তেরটা বছর তোমার কাছে ছিলুম, তোমায় আমি বেশ চিনি।

হরেকৃষ্ণ নীরবে বিছানায় পড়িয়া রহিল। সত্যই মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গিয়াছিল—বড় আরামে চোখ মুদিয়া আসিতেছিল।

সুধা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, আজ—আজ এই প্রথম হরেকৃষ্ণ অনুভব করিল, সুধার হাত বড় নরম, মালতীর হাতের চেয়েও। মনে হইতেছিল, সুধার হাতখানা সে কপালের উপর চাপিয়া ধরে, নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় বাধিতেছিল বলিয়া সে এই নিদারুণ লোভ সামলাইয়া লইল।

সুধা উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "যাচ্ছো—?"

সুধা বলিল। "হ্যাঁ, কিন্তু যাওয়ার বেলায়

একটা কথা বলে যাই ঠাকুর,—এখানে ওখানে না থেকে নিজের বাড়ীতে গিয়ে বাস কর, আমি বোনের বাড়ী যাওয়া ঠিক করেছি। জমি-গুলো বাগানগুলো বারভূতে খাচ্ছে, সেগুলোর ব্যবস্থা করো। সংসার যখন পাতিয়েছ সবই দরকার হবে। আমারই না হয় ছেলেপুলে হল না, তা বলে আর কারও যে হবেনা তা তো নয়।"

স্তম্ভিত হইয়া হরেকৃষ্ণ তাহার কথা শুনিয়া গেল। সুধা ফিরিতেই অকস্মাৎ সে চেঁচাইয়া উঠিল—"না, আমি বাড়ী যাব না, আমি ও সব কিছু নেব না। আমি যখন একবার সংসারই ছেড়েছি, আর ও-সবে আমার দরকার?"

সুধা আবার হাসিল—

"বকো না ঠাকুর, বাজে কথা কতকগুলো বলো না। সংসার ছেড়েছ মানে? কণ্ঠি-বদল করে আবার একটীকে নিয়ে এসেছ সে কথা ভুলে যাচ্ছো কেন? ওসব কথা এখন থাক, আর সবাইকে ও-কথায় ভোলাতে পারবে, আমায় পারবে না।

হরেকৃষ্ণের মুখখানা বড় করুণ হইয়া উঠিল, তথাপি সে ছোট হইবার ভয়েই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না—কেবলমাত্র সুধাকে জব্দ করিবার জন্যই সে এ অপকর্ম্ম করিয়াছে, এখন জীবন দিলেও যদি তাহা সুধরাইতে পারা যায় তাহাতেও রাজি আছে। ভণ্ডামীর মুখোস যেমন অসহ্য—ওই মালতীও তেমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একটী কথা বলা হইল না, সুধা রাণীর মতই গর্ব্বিত ভাবে চলিয়া গেল একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

মালতী অন্ধকার মুখে বলিল, "অতগুলো জমিজমা অমন করে নষ্ট করছো কেন গোঁসাই, উনি যখন দিতে চাচ্ছেন তখন নাও না কেন?"

হরেকৃষ্ণ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, "দিতে চাইলেই অমনি নেব?"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "নেবে না ই বা কেন?"

হরেকৃষ্ণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "আজ সব দিলে ও থাবে কি, দাঁড়াবে কোথায়? ভিক্ষে করে তোমার মত ওতো আনতে পারবে না তোমার মত ও নয় যে কণ্ঠি-বদল করবে। না খেতে পেলে ও শুকিয়ে মরবে তবু কারও কাছে হাত পাতবে না।"

মালতীর অন্তরের অন্তরতমস্থলে আঘাত বাজিয়াছিল, পাংশু হইয়া গিয়া সে তাই বলিল, "কিন্তু, আমিই কি আগে ভিক্ষেয় বার হয়েছি, গোঁসাই, কেবল তোমার কাছে এসেই না—"

বাধা দিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, "করতে হবে—আলবৎ করতে হবে। যে মেয়ে নিজের ইজ্জতের মূল্য রাখে না—তার মূল্য রাখবে কে মালতী? তুমি একদিন নবীন দাসের স্ত্রী ছিলে;—যদি সেই নামটাই তোমার তুমি রাখতে—আজ শুধু আমি কেন, জগতে যেখানে যেতে সেখানে তুমি যে সম্মান লাভ করতে—সে শুধু দেবীরাই পান। কিন্তু তুমি তো তা কর নি মালতী, নিজের দেহটাকে নিয়ে খেলাই করে চলেছ, নিজের মর্য্যাদা রাখতে তুমি তো এতটুকু চেষ্টা কর নি। তুমি প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছ লুব্ধ পুরুষের মাঝখানে,—তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে, তাই তাদেরই খেয়াল অনুসারে তুমি চলতে বাধ্য।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "এ রকম স্থলে পুরুষদের কাছ হতে ভালোবাসা পাওয়ার আশা করাই তোমার ভুল। আমার স্ত্রী সুধা,—আজ তাকে কেউ একটী অপমানের কথা বললে আমি সে লোককে খুন করে ফেলব, কিন্তু তোমায় লোকে কত বিদ্রূপ করে, আমি

তা শুনেও শুনতে পাই নে—কারণ আমি জানি দু'দিন বাদে তুমি যেমন আমার কাছে এসেছ তেমনই একদিন হয় তো ওদের কারও কাছে যাবে। আমি আগেই তো বলেছি—নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা তুমি নিজেই নষ্ট করেছ। আজ আমার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করে আমার ঘরে এসে স্ত্রীর মত বাস করলেও তুমি সামান্য গণিকা ছাড়া আর কিছু নও।"

মালতীর চোখ দুইটা জ্বলিতেছিল—

তাহারই একটু পরে হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অতি সত্য কথা, অস্বীকার করার যো নেই, নারী এমনই করিয়া নিজের মর্য্যাদা নিজে নষ্ট করে, দেবীর আসন হইতে নামিয়া পড়ে অতি সাধারণের মধ্যে, সেখানে সে হয় খেলার পুতুলই মাত্র।

আশ্চর্য্য যে নিজের সর্ব্বস্ব গিয়াছে জানিয়াও সে সেই সমস্তেরই গর্ব্ব করে, সেই সম্মান পাইবার দাবী করে। হরেকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছে—তাহার ও সুধার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, আর এ পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে সে নিজেই। নিজের মূল্য নিজেই সে নষ্ট করিয়াছে, তাহার মূল্য রাখিবে কে?

একরাশি বাসন লইয়া সুধা ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল।

স্বামীর আলয় ত্যাগ করিয়া সে মাস তিনেক হইল, ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়াছে, এবং চির-কালের মত এখানেই রহিয়া গেছে।

দরজার উপরেই যে লোকটীর সঙ্গে দেখা হইল তাহাকে দেখিবার আশা সুধা কোন দিনই করে নাই।

দুই পা আগাইয়া আসিয়া বিনা ভূমিকাতে হরেকৃষ্ণ বলিয়া বসিল, "বাড়ী চল, আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

বাসনগুলা বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া সুধা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "মানে—?"

হরেকৃষ্ণ উত্তর দিল, "মানে অতি সোজা, কাল হতে আমার পেটে ভাত নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সুধা বলিল, "কেন মালতী—তোমার সেবাদাসী?—"

হরেকৃষ্ণ স্থির কণ্ঠে বলিল, "সে আজ সাত আট দিন হল ঘরে যা কিছু পয়সা-কড়ি ছিল নিয়ে নবদ্বীপে পালিয়েছে।"

সুধা রাগ করিয়া বলিল, "টাকা পয়সা সে হাতিয়ে নেওয়ার সময় পেলে,—প্রভু কি তখন নামগান করছিলেন?"

শুষ্ক হাসিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, "বিছানায় পড়ে ছিলুম সুধা;—পাঁচ দিন জ্বরে বেহুঁস অবস্থা, জ্ঞান ছিল না, তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। নবার মা ছিল, সে-ই আমায় সেবা করে বাঁচিয়েছে, নইলে আমায় আর দেখতে পেতে না। আজ দিন তিনেক হ'ল পথ্য পেয়েছি, তাও আজও অদৃষ্টে ভাত জোটে নি চাল দুটো রেঁধে দেওয়ার অভাবে। নবার মা বিছানায় পড়ে; উঠতে পারছে না,—নিজেরও ক্ষমতা নেই। তুমি না গেলে আমায় এমনি করে শুকিয়ে মরতে হবে সুধা—"

সুধা চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইল।

সত্যই সে ভারি রোগা হইয়া গেছে, চোখ দুইটা একেবারে বসিয়া গেছে।

আহা, অত বড় অসুখ হইতে উঠিয়াছে, ক্ষুধার সময় দুইটী ভাত দিতেও কেহ নাই!

আর মালতীই বা কি রকম মেয়ে? এত দিন একত্রে ঘর করিয়াও এই মানুষটার উপর তাহার এতটুকু স্নেহ-মায়া পড়ে নাই? একটা পাখী পুষিলেও লোকের তাহার উপর মায়া পড়ে,—আর সে কি না মানুষকে ভালোবাসিতে পারিল না!

সুধার চোখ দুইটী জলিতে লাগিল।

হরেকৃষ্ণ ডাকিল, "সুধা"—

সুধা তাহার পানে তাকাইল।

কাতর কণ্ঠে হরেকৃষ্ণ বলিল, "ও যে আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ হবে না, যদি আমি তোমাকে ফিরে পাই। তোমার ওপর রাগ করে—কেবল তোমায় জব্দ করব বলেই ওকে আমি এনেছিলুম, এ কথা তুমি বিশ্বাস করো। এই যে ও চলে গেছে, আমি বড় শান্তি পেয়েছি, মনে হচ্ছে—আমার বাঁধন খসে গেছে, এবার আমি তোমায় আবার ফিরে পাব। ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, যা তুমি বলবে আমি তাই শুনব।"

সুধার চোখ ছাপাইয়া খানিকটা জল উছলাইয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও কথা তুলে আমায় আর লজ্জা দিয়ো না। ঝগড়া তো তুমি একাই করতে না, আমিই যে বেশী করতুম। যাক, আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

পথের উপর একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, হরেকৃষ্ণ সেখানা দেখাইয়া বলিল, "তুমি ওঁদের বলে এসো, আমি ওই গাড়ীতে উঠলুম।"

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের কাপড় ও গামছা গুলি দিয়া একটা বোঁচকা বাঁধিয়া সুধা হাঁক দিল, "কই গো দিদি,—তোমাদের জিনিস-পত্তরগুলো দেখে শুনে বুঝে পড়ে এই বেলা নাও, আমি চললুম।"

বিনা বেতনের দাসী, দিদি সহজে ছাড়িতে চাহেন না।

"সে কি রে, সেখানে আবার যাবি? যে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে কোথা থেকে একটা মাগী এনে ঘর-সংসার করছে—"

বাধা দিয়া সুধা বলিল, "সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে গো দিদি, সে জন্যে আর ভাবতে হবে না। তোমার ভগ্নিপতি নিজেই গাড়ী নিয়ে এসেছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কখনও ঝগড়া হবে না। আমি চললুম, রোদ বেড়ে উঠছে, রোগা মানুষ সইতে পারবে না। এখান হতে গিয়ে ভাত রেঁধে দেব, তবে তো দু'টি খেতে পাবেন!"

নির্বাক ভগিনীর পায়ের ধূলা লইয়া সে বাহির হইয়া পথের উপর দণ্ডায়মান গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

চিত্রাচরিত্র

কুমারী বিচিত্রা দেবী, এম-এ

(ক)

কলিকাতার রাস্তাগুলিতে বাতি জ্বালিয়াছে। উপরে সহস্র নক্ষত্রের স্তিমিতালোক নিচের গ্যাশের আলোয় সাথে মিশিয়া মধুর দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত জনবিরল; দোকানপসার দু'এ-একখানা আছে। অল্প-দূরে কলেজ ষ্ট্রীটের অসংখ্য প্রখর দ্যুতিমান বৈদ্যুতিক আলোক, অসংখ্য জনপ্রবাহ, ট্রাম-বাসের ভারাক্রান্ত গর্জ্জন্ প্রভৃতিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বিশেষতঃ পাশের ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গনটি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্থানটিকে সত্যই একটু শ্যামলতা দান করে। বিনয় 'প্যারাপেট' হেলান দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে কি ভাবিতেছিল। অদূরে দাঁড়াইয়া গীতা রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। কলিকাতা নগরীকে তাহার বড় ভাল লাগে। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বহু ভাবাভাবী, বহু পরিচ্ছদধারী জনপ্রবাহের অনন্ত-জীবন স্রোত রাস্তা দিয়া প্রবাহিত হয়। এ তাহার বড় ভাল লাগে। কত বিভিন্ন রকমের বাড়ী, কত বিভিন্ন রকমের দোকান, বিভিন্ন শ্রেণীর যান-বাহন! এখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ দৃশ্য দেখান হইতেছে। এ দৃশ্য ফুরায় না, নবীন ভাণ্ডারের দৃশ্য নূতন হইয়া নূতন ভাবে চোখের উপর ভাসিয়া আসিতেছে। আধুনিক উপায়ে প্রস্তুত বড় বড় রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে কেমন সুন্দর পুকুর, গাছ ও উদ্যান! যেখানে কর্ম্মব্যস্ততা সহস্র হস্তে জীবন ও নগরীকে কুণ্ঠিত করিতে চায় তাহারই পাশে অনাবিল শান্ত মধুর স্তব্ধতা!

গীতা ধীরে ধীরে বিনয়ের কাছে আসিল। বিনয় নিঃশেষিত প্রায় চুরুট মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"কি রে পড়তে যাবি না?"

গীতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"পড়াতো শেষ হ'তে চ'ল্‌ল। আচ্ছা দাদা, একটা কথা সত্য ক'রে ব'ল্‌বে?"

"কি?"

"আমার বিয়ে দিতে কত টাকা তোমার খরচ হবে?"

"এই হাজার দুই।"

"এত টাকা তুমি কোথায় পাবে? ব্যাঙ্ক-বইয়ে হাজার টাকার বেশী নেই; কিন্তু আর একটা কথা, তুমি আবার মতিবাবুকে দু'শ টাকা—"

এই প্রসঙ্গকে চাপা দিবার জন্য বিনয় হঠাৎ কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল, "ত্যাখ গীতা, আমি না একদিন আমার ব্যাঙ্ক বই দেখতে তোকে বারণ করে দিয়েছি? হ্যাঁ, দিয়েছি তো তাঁকে দু'শো টাকা, তোর কি? আমার টাকা, আমার—"

"তা তুমি দেবে বইকি! কিন্তু আমিও বলে রাখছি দাদা, আমারও একটা ইচ্ছা আছে, আমি আর খুকিটি নই।"

বিনয় হাসিয়া গীতার চুলের গোছা ধরিয়া

টানিয়া নিজের কোলের কাছে আনিয়া দুই হাতে মুখখানি ধরিয়া বলিল, "মণি, তোর জন্যই তো এতদিন আছি রে! তোকে পার করার পালা শেষ করলে, আমায় আর পায় কে?"

গীতা মুখখানা দাদার কোলের কাছে আরও গুঁজিয়া বলিল—"দাদা, আমায় পার করতে চাও কেন? তোমায় দেখবার যে কেউ নেই!"

"পাগলী নাকি, আমি কি এখনও খোকা?"

"খোকা কেন, খোকার চেয়েও ছোট—এই সেদিন আমি সই-এর বাড়ী দু' দিনের জন্য গিয়ে-ছিলুম তখন তোমার না ছিল খাওয়া, না ছিল স্নান—একদিন আফিসই কামাই করেছ। বেয়ারার কথায় বুঝলাম—"আমি ছাড়া তোমার চলবেই না—"

"আচ্ছা, আমি ডাকি বেয়ারাকে, দেখিস্ যদি সত্যি না হয় তা'হলে ওকে আজই তাড়াব।"

ওকে না হয় তাড়ালে কিন্তু আমায় তাড়াতে কেমন করে দাদা!"

এবার ভাই-বোনে হাসিয়া ফেলিল!

"আচ্ছা, এমনি ভাবে তুই আমার সঙ্গে তর্ক করিস—তোর চেয়ে আমি কত বড় জানিস্ তো—এই পাকামীর জন্য যদি তোকে মারি তা হ'লে তুই কি করতে পারিস, গীতা?"

"বেশী কিছু না পারি, কাঁদতে ত পারি?"

বিনয় হঠাৎ 'বেয়ারা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার উপর হুকুম হইল চুরুটের বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিতে। বেয়ারা চলিয়া যাইতেই গীতা আরো কোলের কাছে ঘেঁষিয়া বিনয়ের ডান হাতখানার আঙুলগুলার মধ্যে নিজের নরম আঙুলগুলির ফাঁক মিলাইয়া দিয়া বলিল, "দাদা মায়ের কথা বল না।"

বিনয় উপরের দিকে চাহিল, অসংখ্য তারকা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বিস্তৃত ছায়া-পথে যেন এক পোঁচ সাদা রঙ লেপিয়া দিয়াছে। এতক্ষণে চাঁদ উঠিয়াছে। আর মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ ভাসমান হাল্‌কা সাদা মেঘ ছুটিয়া চলিতেছে। বিনয় বলিতে লাগিল, "সবাই বলত মার আর ছেলে-মেয়ে হবে না। আমি হবার পনের বছর পরে তুই হ'লি। দিনটা আমার বেশ মনে আছে, পৌষ মাস, রাত্রি ভোর হ'য়েছে কিন্তু শীতের ভয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি। পিসিমা খবর দিলেন—বোন হ'য়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম আঁতুড় ঘরে। ডগ্‌ডগে আগুণের কুণ্ড, তোর গায়ের রং যেন কাচা সোনা, মাথা ভরা কোঁকড়ান চুল। আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম—তুই কত সুন্দর, আর কত ছোট! তারপর আঁতুড় গেল, বাবা নাম রাখলেন, "প্রীতি' মা রাখলেন, "গীতা," আর আর আমি দিলাম "বিচিত্রা"

বেয়রা আসিয়া খবর দিয়া গেল যে উপর নীচে সম্ভব-অসম্ভব কোথাও চুরুটের বাক্স পাওয়া গেল না। বিনয় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং বেয়ারাকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিল—দিনের পর দিন তার জিনিষপত্র না পাওয়ার পালাটা যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে তাকে আর বেশী দিন রাখা চলবে না। এও সে নিশ্চিত ভাবে বলিল যে, এই মুহূর্ত্তে বেয়ারার পুঁজি পোটলার মধ্য থেকে তা বের ক'রতে পারে। বেয়ারা নিবিষ্টচিত্তে সবকথা শুনিয়া এবং কোনরূপ ভাব-বৈষম্য না দেখাইয়া চলিয়া গেল। বিনয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল; কিন্তু যাইতে হইল না। গীতা দেখিতে পাইল, বিনয়ের পশ্চাতে "প্যারাপেটের" উপর চুরুটের বাক্সটি চক্ চক্ করিতেছে। বলিল—"দাদা এই যে তোমার চুরুটের বাক্স।"

বিনয় সত্যিই এবার লজ্জিত হইয়া

বলিল—"অনর্থক বেয়ারা বেচারিকে গালাগালি করলাম, ডেকে বলে দিই"—

"কিছু দরকার নাই, কোন কাজ তার নাই, এই সামান্ত তিরস্কার যদি না সে মাসিক কুড়ি টাকার পরিবর্ত্তে হজম করতে পারে, তবে তাকে রাখা কেন?"

বিনয় একটা চুরুট ধরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "তার পর তুই বড় হলি, ঠিক দশ মাসে তুই হাঁটতে শিখলি আর শিখলি বাড়ীময় হেঁটে যত অনর্থ ঘটাতে! সারাদিন ধ'রে তুই যত জিনিষ নষ্ট করতিস্ তাকি আর বলতে! বিশেষতঃ বইএর উপর তোর ছিল বেশী ঝোঁক। পেলে আর রক্ষা নেই, তাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়তিস্!"

"তার পর অল্প অল্প কথা শিখে কত কি বক্তব্য পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা হ'তে বিভিন্ন ভাষায় বলতিস্। বুঝতিস্ তুই, আর বুঝতেন মা, এমন সময় বাবা চলে গেলেন!···

এবার ভাইবোন উভয়ের চোখের পাতা বার বার ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

বিনয় আবার বলিতে লাগিল,"ঠিক চার বছর বয়সে তোর হাতে খড়ি দেই। সবাই বল্লে—"মেয়ের আবার হাত খড়ি কি?" পিসিমা অনেক দিন আগেই এ বাড়ী এসে গেছেন—তিনি বল্লেন, "তাতে আর হ'য়েছে কি? বিনয়ের সাধ হ'য়েছে, দিক না।" সে সময়কার একটা কথা আমার বেশ মনে আছে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, "তোমার নাম কি?" তুই মাথা নেড়ে হেসে-হেসে বলতিস্ নাম "আমার নাম পিতি, আমার নাম গীতা, আমার নাম চিতা।" আমি বলতাম, "চিতা বাঘ নাকি?" তুই বলতিস্—"কিচ্ছু জানে না—চিত্-তা' অমনি সবাই হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠতাম।

"একদিন মেরে ছিলাম মনে আছে কলেজ হ'তে এসে দেখি আমার একখানা 'ইকনমিকসের' বই ভরে ভরে "যত ধন, ছোট মন"—ইত্যাদি সারগর্ভ কথা লিখে রেখেছিস। তারপর তুই বড় হ'লি, স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় হেড্ মিস্ট্রেস্ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" তুই বল্‌লি, "গীতা" মায়ের দেয়া নামই এবার হ'তে অক্ষয় হ'য়ে রইল।—এই তো সেদিনের কথা তুই যে ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেলি, সে কী আনন্দ আমার! কিন্তু বাবা-মা কেউ সে আনন্দের স্বাদ পেলেন না, শুধু তাঁদের আশীর্ব্বাদ আমাদের ঘিরে রইল।"

গীতা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। চাহিয়া দেখিল যে দাদার চোখ জ্যোৎস্নালোকে ছল্ ছল্ করিতেছে। সে যেন ঐ সীমাহীন জ্যোতির্ম্ময় আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার এই ছোট বোনটির ক্রমবর্দ্ধমান জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহার জন্ম, তাহার শৈশব, তাহার কৈশোর কিছুই যেন এই লোকটির কাছে অজানা নাই। যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানুষ, শিশুরা যেমন ভাবে আরম্ভ করে, সেও ঠিক তেমনি করিয়াছে, করিবেও—তাহার অসীম স্নেহপ্রবণ দাদাটির চোখে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনাও যেন অপূর্ব্ব বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। কোনকালে কোন শিশু যেন এমন করে নাই। ইহার কাছে গীতা যে কত আপনার কত স্নেহের পাত্র সে কথা মনে হইতে তারও বুকটায় কে যেন একটা দোলা দিল, তার চোখের কোণ বাহিয়া বিনয়ের হাতের উপর কয়েক ফোঁটা জল পড়িল—বিনয় চমকিয়া বলিল, "পাগলি, তুই কাদছিস্?"

"তুমিও ত কাঁদছ, দাদা!"

"না রে—না"

"সে আমি জানি—'না রে—না' আর বল্‌তে হবে না। দাদা চল তোমার শোবার ঘরে চল—আজ ত রাতে খাবে না, শরীর নাকি খারাপ হয়েছে।"

"না, তেমন কিছু নয়, দুটো খেলে হ'ত।"

"না, তা হ'ত না, ভাত আজ পাবে না। চল।"

বলিয়া গীতা হাত ধরিয়া তাহাকে ছোট শিশুটির মত শোবার ঘরে লইয়া গেল। বিনয়ের মনে হইল, গীতা সত্যই বলিয়াছে, সে না থাকিলে তা'কে এমনি করিয়া কে চালাইয়া লইবে ?

"নাও দাদা, আর ভাবতে হবে না, আমি তোমার শিয়রে বসে মাথার চুল টেনে দিচ্ছি—তুমি ঘুমোও।

বিনয় একটিবার হাসিয়া গীতার চুলের গোছা ধরিয়া বলিল, "তুই ছাড়া সত্যি সত্যিই কি চলবে না রে ?"

গ্রীবা হেলাইয়া গীতা বলিল—" না।"

(খ)

কিন্তু তাহার সে-দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

একটা শুভলগ্নে সদ্য ডাক্তারী পাশ করা অমিয়ভূষণের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিয়া ইচ্ছা করিয়াই বিনয় বাঙলার বাহিরে বদলী হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ কয় বৎসর পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যে দু'চারবার সেখান হইতে আসিয়া গীতা ও অমিয়কে দেখিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল কিন্তু কাজের চাপে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। এদিকে অমিয়র পশার কিছুতেই জমিয়া উঠিতেছিল না। কলিকাতা সহরে ডাক্তারের অভাব নেই, যাহাদের নাম একবার হইয়াছে লোক কেবল তাহাদেরই ডাকে। কিন্তু অমিয়র প্রতিভার উপর বিনয়ের আস্থা ছিল—একদিন না একদিন সে নাম করিবেই। গীতার জীবনেও এর মধ্যে পরিবর্ত্তন কম ঘটে নাই। দাদার অতি ক্ষুদ্র পরিবারে সে মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু এখানে অনেক লোক। তাহার সহজ-সুলভ কর্ম্মকুশলতা গুণে সে সকল দিক মানাইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছিল—তবে টানাটানি সংসারে খুবই বেশী।

বিনয় একটা হোটেলে উঠিয়াছে—দুই এক দিনের মধ্যে বাড়ী তাহাকে ঠিক করিতে হইবে। বিনয় অফিস হইতে ফিরিয়াই অমিয়র বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। তাহাকে লইয়া বাড়ী খোঁজ করিতে হইবে—অমিয়র বাড়ী কলেজ ষ্ট্রীটে। বহুদিন পরে কলিকাতায় আসলে মনটা সহসা কেমন দমিয়া যায়। মনে হয় সমস্ত জগত ছুটিয়া চলিয়াছে, আর নিজে ক্রমশঃ পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। সকলের আগে নজর পড়ে দোতালা বাসগুলির প্রতি। কি প্রকাণ্ড চেহারা! ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে যখন ছুটিয়া আসে তখন মনে হয় এখনই ঘাড়ে পড়িবে, দেখিতে দেখিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়! চতুর্দ্দিকে দেয়ালে বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন; নূতন নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা; একটিকেও সে জানে না। কলেজ ষ্ট্রীট ধরিয়া সে হাঁটিয়াই চলিল; যাইতে যাইতে সে মানিকতলায় গিয়া উপস্থিত হইল। মানিকতলায় গিয়া তার খেয়াল হইল যে সে বাড়ী আগাইয়া আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে আসিয়া বাড়ীটি খুঁজিয়া বাহির করিল।

কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া দিল এবং বিনয় ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। অল্পায়তন নীচু ঘর। ঘরের মধ্যে একদিকে একখানা তক্তপোষ, বোধ হয় রাত্রিতে কেউ শোয়। একখানা টেবিল,

খান তিনেক চেয়ার ও একটা বেঞ্চিতে ঘরটার সমস্তটা জুড়িয়া আছে, ঘর দেখিয়া বিনয় প্রসন্ন হইল না। গীতা যে কি করিয়া এইরূপ বদ্ধ বাড়ীতে বাস করিতেছে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।. কোণের দিকের পর্দ্দাটা ঠেলিয়া গীতা সে ঘরে প্রবেশ করিল।

"—ওমা, এ কি, দাদা যে; কখন এলেন।" বলিয়া প্রণাম করিল॥

বিনয় বলিল, "গীতা, এলেন কবে শিখেছিস্ রে ?"

"কেন, কি অন্যায় হয়েছে দাদা ?"

"দেখ গীতা, তোর দাদাকে এতটা দূরে যে আমার চোখের সামনে ফেলবি তা কিন্তু আমি ভাবি নি।"

"যাক, আমার অন্যায় হ'য়েছে দাদা, এবার ওপরে চল।"

বিনয় চলিতে চলিতে গীতাকে আপাদ-মস্তক দেখিতে লাগিল। বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি তাহার মনে ভাসিতে লাগিল। সে অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার শোবার ঘরে গিয়া সে বসিল, এ ঘরটা তবু একটু ভাল। সম্মুখে একটু খোলা ছাদ, দু'চারটা ফুলের টব রহিয়াছে। ঘরের ভিতরে যে দু'চারটা আসবাব রহিয়াছে তাহা সবই বিনয়ের পরিচিত। খাট, আলনা ও ড্রেসিং টেবিলটা সে বিয়ের সময় দিয়াছিল। বহুদিনের ব্যবহারে পালিশের অভাবে তাহাদের সে চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু গীতার হাতের সম্মার্জনীর তাড়নায় কোথাও একটু ময়লা জমিতে পায় নাই। কাপড়গুলি আলনাতে সুন্দর করিয়া কোঁচান, বিছানাটি পরিপাটি করিয়া পাতা।

বহুদিন পরে ভাই বোন মুখামুখি হইয়া বসিল। বিনয় অপলক-দৃষ্টিতে গীতার দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। নিতান্ত আপনার জিনিষ বহুদিনের অপরিচয়ে যেমন পর হইয়া যায় এ যেন তেমনি। এই কয় বৎসরে সে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, সেই কমনীয়তা, সেই লাবণ্য আর নাই। সব চেয়ে বিনয়কে কষ্ট দেয় এই দেখিয়া যে গীতা আর পূর্ব্বের মত প্রাণ খুলিয়া কথা বলে না—কি যেন লুকাইতে চায়। যে দাদা ছাড়া আর কিছুই জানিত না, সুখে-দুঃখে যে সেই দাদার কোলে মুখ গুঁজিয়া সব কথা বলিয়া প্রাণটাকে হালকা করিত, সেই দাদাকে আজ যেন সব দিক দিয়া নিজেদের লুকাইতে চায়।

অলঙ্কৃতা ক'নে বেশে গীতার সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি এখনও মনে আছে, লাল বেনারসী পরিহিতা, মুকুট শোভিতা, চন্দন-সজ্জিতা তাহাকে বিদ্যুৎ আলোকে গল্পের রাজ-কন্যার মত দেখাইতেছিল। সে বিস্মিত হইয়াছিল, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণত্ব কিরূপে এমন কমনীয় মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠে! আর আজ তাহাকে দেখিলে মনে হইতেছে, যেন জীবনের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া যাইতেছে, বছরখানেক পূর্ব্বে একটি ছেলে হইয়া আঁতুড়েই মারা যায়। যে সম্ভাবনা একদিন মাতৃত্বের গৌরবে সফল হইয়া আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারিত, তাহা যেন ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়া রুক্ষ কঠোরতা অবলম্বন করিতেছে। বিনয় লক্ষ্য করিল সে ঈষৎ রোগা হইয়াছে। কণ্ঠে হস্তে একটা নিরলঙ্কার অরমনীয়তা, মুখে অন্তরালে ঝটিকাঘাতজনিত একটু কঠোরতা, শুধু ঠোঁট দুটিতে বুঝি এখনও পূর্ব্বের সেই আধ-হাসিটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। চুল অনেক পাতলা হইয়াছে, চওড়া সিঁথিতে সরু সিঁদুর রেখা। আরও যেন কর্সা দেখাইতেছে। হঠাৎ বিনয়ের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। বহুক্ষণ আবিষ্টের মত থাকিয়া বলিল, "তোর চেহারা এমন হয়েছে কেন, গীতা ? অল্প বয়সে বুড়ী হয়ে যাচ্ছিস, খুব বুঝি খাটুনি ?"

"তোমার যেমন কথা! খাটুনি আর কোথায় ?

ঝি আছে, চাকর আছে, আমাকে ত ঘরের কুটো গাছও ছুঁতে হয় না। তা খাটুনি না থাকলে বুড়ী হব না ত হ'বে কি? বয়স ত কম নয়।"

"তোর কত বয়স হ'য়েছে?"

"এই পঁচিশ চলেছে, এখন বুড়ী হব না ত কি? তা' পশ্চিম ঘুরে তোমারও স্বাস্থ্য ভাল হয় নি। পাকা চুল দু'চারটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।"

"আমার এই চল্লিশ চলছে, চুল না পাকলেই অগৌরব। কিন্তু তোর ব্যাপারখানা কি? কাছে আয়।" গীতা কাছে আসিল। বিনয় তার হাতখানি লইয়া দেখিতে লাগিল—"হাতে যে হলুদের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে! বাটনা বুঝি বাটতে হয়?"

"কই না? তবে জানোই তো দাদা কলকাতার ব্যাপার, চাকর আর ঝি নিয়েই যত বিভ্রাট, কাজ করছে করছে, কিন্তু ডুব মারলেই অস্থির। তাই মাঝে মাঝে ঠেকায় পড়ে দু'একদিন সব কাজই করতে হয়।"

"আমার কাছে লুকোস্ নি, আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি, তোকে খাটতে হয় খুব। আমি বলছি না যে খাটার মধ্যে কোন অগৌরব আছে, কিন্তু নিজের শরীর ত দেখতে হবে? আমি আজই অমিয়কে বলব যেন সে একটা বেশী চাকর রেখে দেয়।"

"কিছু তুমি ওঁকে বলতে পারবে না। কে বললে আমি খেটে খেটে মরছি, আমরা মেয়ে মানুষ, সমস্ত দিন ঘরে বসে আছি, পুরুষের মত রোজগারের জন্ত বাইরে পরিশ্রম করতে হয় না, যদি ঘরের কাজও না করি তবে কি করব? সমস্ত দিনটা তো ঘুমিয়ে কাটাই। সব কাজই ঝি চাকরে করে, তায় আবার রান্নাও আমাকে করতে হয় না একটা ঠাকুরও আছে। কাজ যদি করতে পারতাম তা হ'লে ত বেঁচে যেতাম।"

"কেন কিছু পড়লেই পারিস। তোর তো বিজ্ঞানের দিকে খুব ঝোঁক ছিল, নূতন তথ্য দিন দিন বের হচ্ছে—"

"তোমার যেমন কথা! সেই কবে হুজুগের মাথায় মান্ধাতার আমলে কত কি পড়েছিলাম, এখন আবার তাই নিয়ে বসব নাকি?"

"তা না হোক্, কিন্তু এ আমার ভাল ঠেকছে না, বাড়ী ঠিক করেই তোকে নিয়ে যাব, আর যতদিন আমি এখানে থাকব তুই আমার কাছে থাকবি, অমিয় কখন ফেরে?"

"তার কিছু ঠিক নেই। মাঝে হঠাৎ একবার এসে কিছু খেয়ে যান। একেবারে ফিরতে রাত্রি হয়।"

"বেশ বুঝি পশার হচ্ছে?"

গীতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল, "তা' মন্দ হচ্চে না, এখন বেশ দু'পয়সাই পাচ্ছেন। তার উপর আবার দু'যায়গায় চাকরি করেন কি না, দু'বেলা যেতে হয়। খাটুনি অসম্ভব।"

বিনয়ের খুব অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার বহুদিনের বোনটিকে সে কিছুতেই ফিরাইয়া পাইতেছে না। গীতা যেন কোন কথাই তাহাকে বলিতেছে না, তাহাকে সুখ-দুঃখের ভাগী করিতে চাহিতেছে না। এই কয় বৎসরে এমন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জীবনের ঘটনা স্রোত এমন কি আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে যে সে তাহার ক্ষুদ্র শিশু বোনটিকে ফিরাইয়া পাইতেছে না? বিনয় এবার অনেকটা দৃঢ়স্বরে বলিল,—"ছাখ্ গীতা, মনে করিস না তুই বড় হয়েছিস বলে আমি কিছু রেহাই দেব, সব কথা যদি না ঠিক ঠিক বলবি তবে মারব।"

"কি তুমি জানতে চাও? সবই তো বলছি।"

"তোর হাত খালি কেন? চুড়ি কই?"

"মানুষ সব সময় চুড়ি পরে বসে থাকে

না কি? আর আমার গয়না পরবার বয়স আছে না কি?"

"কেন ঐ কথা—"

বাহির হইতে কে ডাক দিল—"বউ একবার এদিকে এস।" গীতা মাথায় অল্প কাপড় টানিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনয় নিঃশব্দে চুরুট টানিতে লাগিল আর তার চোখের কোণে জলের রেখা ভাসিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা কথা কানে গেল—"ভারী ত দরদ বোনের জন্য। বলে—বড় চাকরি করে। দিয়েছিল কবে সেই পেতলের ক'গাছি চুড়ি, তার আবার এত কৈফিয়ৎ।" কথাটা শুনিয়া বিনয় উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। গীতা যেন চাপা গলায় বলিল—"ছিঃ ছিঃ। তাই বা···" আর কিছু শোনা গেল না। জল খাবার থালা লইয়া গীতা ঘরে প্রবেশ করিল। অনেক রকম ফল, কিছু মিষ্টান্ন ইত্যাদি—"দাদা সবটা তোমায় খেতে হবে।"

"আমি হোটেল থেকে এই মাত্র খেয়ে বেরিয়েছি। আর তোর বা কি বুদ্ধি; এতগুলো খাবার এ সময় কেউ খেতে পারে না কি?"

"কিছু তো খাও!"

বিনয় দু'টি একটি মুখে দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে বলিল, "হাতের মাপটা দেখি।"

গীতার মুখ বিবর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল বিনয় তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়াছে। তবু একবার সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কেন হাতের মাপ দিয়ে কি হবে?"

"তোর জন্য আজই কয়েক গাছি চুড়ি কিনে দেব।"

"হঠাৎ তোমার এ কি খেয়াল হ'ল? দিদির কথা বুঝি শুনেছ? তা' ঘর করতে গেলে অমন কত কথা হয়।"

"কথা অবশ্যই শুনেছি, কিন্তু তা' বলে নয়, তোর খালি হাত দেখে আমার মনটা কেমন লাগল। আর সত্যি তো তোকে বিয়ের সময় কিছু দেই নি। তখন আমার ক্ষমতা ছিল না, আজ যদি কাউকে কিছু দিতে পারি তা' তুই ছাড়া আমার নেবার কে আছে গীতা?"

"নেবার লোক তোমার অনেক আছে দাদা! কিন্তু চুড়ি গড়িয়ে অনর্থক টাকা নষ্ট করবে কেন—চুড়ি আমার রয়েছে, শুধু ভেঙে নূতন প্যাটার্নে গড়তে দিয়েছি—দু'দিন পরেই ফিরে আসবে।" বলিয়া সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"সত্যি বলছিস ত গীতা?"

"হাঁ দাদা, সত্যি—সত্যি—সত্যি।"

(গ)

বিনয় চলিয়া যাইবার পর গীতা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কতদিন পরে সে দাদাকে দেখিল। সত্যই আজ মন খুলিয়া সব বলিতে পারিল না কেন? সে যেন ধীরে ধীরে কোথায় সরিয়া আসিয়াছে। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া যে দাদার স্নেহছায়াতলে সে মানুষ হইয়াছে, যাঁহার একমাত্র কামনা তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, তাঁহাকে যেন সে বহুদূরে রাখিল। কেন, কেন এমন হইল? এই নূতন সংসার যেন তাহাকে নূতন দিকে লইয়া গিয়াছে। সংসারের প্যাঁচ-ঘোঁচের মধ্যে সে যেন জড়াইয়া গিয়াছে। তাই চারিদিক দিয়া মিথ্যার আবরণে স্বামীর ভালবাসার বিনিময়ে আজ সে প্রাণের একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র দাদাকেও চোখে ধূলা দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই। অপরদিকে এই অসংসারী, আপনভোলা দাদাটির জন্য মন মমতায় ভরিয়া উঠিল—সে আজ কি অন্যায় করিয়াছে। যদি সত্যই আজিকার মিথ্যাগুলির রহস্য দাদা জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার মন যে ভাঙিয়া পড়িবে। একবার গীতার ইচ্ছা হইল সে দাদার

পা ধরিয়া ক্ষমা চায় এবং যাহা সত্য সবই ব্যক্ত করে। কিন্তু সে ইচ্ছাও এখন পূরণ হইবার নয়! ভাবিতে ভাবিতে সে মেঝের উপরই শুইয়া পড়িল।...

অনেক রাত্রিতে অমিয় বাড়ী ফিরিল। রাত্রিতে শুইয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। অমিয় গীতার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিল, "বাস্তবিক চুড়িগুলি বাঁধা দিয়ে ভাল করি নি। আমি তখনই বলেছিলাম যে, জিনিষ একবার হাতছাড়া হ'লে আর পাওয়া যায় না। তুমিই জেদ ধরলে।"

গীতা বুঝিল তাহার বড় জা' ইতিমধ্যেই কথাটা সবিস্তারে তাহার কর্ণগোচর করিয়াছে। কতখানি সত্য আর কতখানি মিথ্যা সে শুনিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "তাতে হ'য়েছে কি? এই চুড়ি ধুয়ে কি আমি জল খেতাম? বিপদে আপদে যদি কাজেই না লাগবে তবে আর অলঙ্কার কেন? তুমি কিছু মাত্র আক্ষেপ করো না।"

"বুঝি সব গীতা, তবু কেমন দমে যাই, মনে হয় তোমার তুলনায় আমি কত ছোট, পাছে আমার মর্য্যাদার হানি হয় তাই ভেবে তুমি বিনয়বাবুর কাছ থেকে হাত-খরচাটাও নাও না। একদিন তুমি বাংলাদেশে ছাত্রী হিসাবে নাম করেছিলে, সেদিন কত আশা করে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম, কিন্তু কিছুই হ'ল না, তোমাকে পাওয়ার মধ্যে আমার একটা মস্ত বড় ফাঁকি ছিল, তাই বুঝি এখানে এসে তোমার সুখ হ'ল না।"

গীতা অমিয়র মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"যে সুখ আমি পাচ্ছি তাই যথেষ্ট! তুমি রোগীকে সান্ত্বনা দাও, ক্লিষ্টকে আরোগ্য কর এর চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে?"

"ছাই করি, যতক্ষণ না তোমার হাতে দিতে পারি ততদিন আমার জীবন বৃথা। বিনয় বাবুই বা কি ভাবলেন বলত, ছিঃ ছিঃ!"

"দাদাকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। তোমার জীবন ব্যর্থ তাতে হবে না, যখন তোমার ভিজিট বত্রিশ টাকা হবে, নাইবার খাইবার সময় থাকবে না, তখন সমস্ত গা' ভরে গয়না পরব!"

অমিয় হাসিয়া এবার বলিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শাদা চুলে অলঙ্কার মানাবে ভাল।"

* * *

বাড়ী ঠিক হইতেই বিনয় পিসিমা ও গীতাকে লইয়া আসিল। পিসিমা গীতাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিলেন। এই বর্ষীয়সী নারীর দিন যতই ফুরাইয়া আসিতেছিল, ততই যেন পৃথিবীর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের প্রতি তাঁহার মমতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। একমাত্র ভ্রাতষ্পুত্র বিনয় সেও বিবাহ করিল না, গীতারও স্বামীর ঘরে গিয়া সুখ হয় নাই তা' সে যতই ঢাকিয়া রাখুক না কেন। সে মা হইতে না পারে কিন্তু মার প্রাণ তাঁর মধ্যে আছে। মেয়ের কথার অন্তরালে নিশিদিন যে মনোবেদনা আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সংসার এমনি কঠিন ঠাঁই যে অনেক জিনিষ বুঝিলেও বা জানিলেও কিছু করা যায় না। তিনি জোর করিয়া কয়েক দিন উপর্য্যুপরি মাথায় তেল মাখাইয়া, আচড়াইয়া, জট ছাড়াইয়া গীতার অবশিষ্ট চুলগুলি পরিপাটি করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাহার শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও ভাল কাপড় জামা আনাইয়া তাহাকে পরাইলেন এবং সামান্য কোন কাজে হাত দিতে গেলে বিনয়কে ডাকাইয়া চেঁচাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিতে লাগিলেন যে গীতার মনে হইল সে যেন তাহার দাদার বাড়ী আসে নাই। সে যতই প্রতিবাদ করিয়া বলিত—"এ তোমার অন্যায় পিসিমা, তুমি এই

ষাট বৎসর বয়সে সারা দিন খাটিবে, আর আমি বসে থাক্‌ব, একি ভাল দেখায়?"

"আমার আর বেশী দিন নাই, যতদিন চলতে ফিরতে পারি একটু কাজকর্ম্ম করে নি। আমি গেলে আর বাড়ীই থাকবে কোথায়, ঘরই থাকবে কোথায়? যদি একটা কিছু করে' দিয়ে যেতে পারতাম তা' আর হবার নয়, এরপর বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে তাদের হোটেলেই যেতে হবে।"

গীতাও যেন এক একবার জীবনে নূতন উৎসাহ পাইতে চেষ্টা করিল, সমস্ত খাট, আলমারী, টেবিল সাজাইয়া সেই আগের মত ফিট্‌ফাট্ করিল। চাকরের নিকট হইতে চাবি লইয়া সমস্ত কাপড়-চোপড় গুছাইয়া ফেলিল। গুছাইতে গুছাইতে দেখিল, দাদার আর পূর্ব্বের মত পোষাকের প্রতি খেয়াল নাই। আগে এক জামা দু'দিন কোন দিন পরেন নাই, কোটের বা প্যান্টের এক জায়গা কোচকান হইলে চলিত না, এখন একটা হইলেই হয়। লোকের এতও পরিবর্ত্তন হয়।

সেদিন বিনয়ের অফিস ছিল না। নীচের ঘরে বসিয়া একখানা ইংরেজী উপন্যাসের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে চুরুট টানিতেছিল, পড়ার দিকে বিশেষ মন নাই। তিনটার সময় গীতাকে লইয়া সিনেমায় যাইবার কথা, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। বিনয় উপরে গেল। নিজের ঘরে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় দেখিতে পাইল পাশের ঘরের খাটের উপর গীতা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে; তাহার সমস্ত মুখখানি বড় সুকোমল দেখাইতেছিল। আসতে আসতে সে কাছে আসিয়া বসিল। ঘুমন্ত গীতার নাকের ডগাটি একটু একটু কাঁপিতেছে, যে ঠোঁট দু'টিতে সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য লাগিয়া থাকিত, তাহা একটু ফাঁক হইয়াছে, দু'টি দাঁতের অংশ বেশ দেখা যাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে পড়িয়া গেল গীতার ছোটবেলার কথা। গীতা একখানি ইংরেজী বই পড়িতেছিল, ভিতরে একটি আঙ্গুল দিয়া কোন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছিল। বইখানি সে সরাইয়া রাখিল, হাতখানি নাড়িয়া দেখিতে লাগিল, হাতে দু'খাছি নূতন সোণার চুড়ি, যাক্, আজ তার একটা সন্দেহ দূর হইল, যদিও সে জানিত যে গীতা তার কাছে কি মিথ্যা বলিতে পারে? ফর্শা হাতের তলাটি যেন কর্কশ। আঙ্গুলের ডগার দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ, তরকারী কুটিবার সাক্ষ্য দিতেছিল। তাহার এই বোনটির উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তাহার প্রত্যেক-টি চিহ্ন মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা, এই বিদ্যানুশীলন—এর কি এই পরিণাম! সে তো নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতেছে, শারীরিক কোন কষ্ট সহ্য করিতেছে না। কি-ই বা সে করিবে, গীতা কোন সাহায্যই গ্রহণ করিতে চায় না। মার পেটের বোন সেও কি আজ পর হইয়া গেল?

চুড়িগুলি লইয়া সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল; বেশ সুন্দর! চ্যাপ্টা হাতে সেগুলি একটু ঢল্ ঢলে হইয়াছে। নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইল, নীচের পিঠে কি যেন লেখা আছে। মাথা নীচু করিয়া পড়িল, "খাঁটী ক্যামিক্যাল স্বর্ণ" চুড়ির দিকে চাহিয়া বিনয়ের চোখ বাহিয়া গরম দুই-ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল গীতার হাতের উপর।

বিনয় দেখিতে পাইল উপরে দেয়ালে মা তেমনি সলজ্জ মধুর বধু-মূর্ত্তিতে তাহাকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মনে হয় যেন তাঁরও চোখে জলের রেখা জাগিয়া উঠিয়াছে!

মাঘী-পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সকলেরই গল্প চাই। 'গল্প-লহরীর' সম্পাদক চাইলেন গল্প, তাঁর যোগানদার অনেক। এক জন না দেয় আর পাঁচ পঞ্চাশজন আছেন দেবেনই। আর পূজায় প্রতিযোগিতার্থে পূর্ব্বাহ্নে শ্রাবণের ভাদ্রের যে কোন দিনে সর্ব্বত্র চিঠি যায়, লোক চায় অন্ততঃ একটা গল্প আগামী মাসের জন্ম বা পূজার সংখ্যার জন্ম চাই-ই! অর্থাৎ সেকেলে ডাকাতির মত ওরা অনেক আগেই নোটিশ দেন।

কিন্তু সেকথা নয়,—এ হচ্ছে বাড়ীতে বুড়া ঠাকুমা আছেন। তাঁর কাছে গল্প চাওয়া ছেলে মেয়েদের অভিযান শ্রাবণের সন্ধ্যায়। কি বিপদ, ভেবে দেখুন সব। প্রথমতঃ এখন বাহান্ন বছর আগের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত গুটীআষ্টেক ঠাকুমা ঠানদি' আর ঘরে থাকেন না, যে, ছবিদের ঠাকুমা বলবেন, যা' নবৌর কাছে যা', কিম্বা ঠাকুঝির কাছে যা'। এখন সহরের খিচির মধ্যে লক্ষ ঠাকুমা, তাও দু'-একটা বাড়ীতে পর্য্যবসিত এবং সে তিনিও একটীর বেশী থাকেন না! আর তিনিও নিতান্ত সেকেলে ঠাকুমা নন, একটু একাল ঘেঁসা, অতএব তিনি হয়ত তখন একখানি মাসিক-পত্র খুলে বসেছেন।

আরও বিপদ এই কলকাতায় তায় বৃষ্টির সন্ধ্যায়, বলবার যো নেই কারুকে কোথাও যা' খেলা কর গে। সরু আট হাতি বারান্দা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আট হাতি ঘর, তার একধারে এক রাশ বাক্স তোরঙ্গ, অন্যদিকে মশারী এবং দড়ির আলনাতে অজস্র শাড়ী এবং ধুতি জামা (কাঁথা) তা' যেমন ময়লা তেমনি ভাপসা গন্ধ, বর্ষার জন্যও (স্নানের সময় সরিষা তৈল সেবনের জন্য)। সেই সব ঘরে জড় হয়ে। কি করা যায়? গন্ধ ভোলাবার জন্ম গল্প শোনা ছাড়া? এবং সেই গল্প বলবেই বা কে বাবার মা ছাড়া; অতএব ঠাকুমা ভেবে চিন্তে মাসিক-পত্র আর দৈনিক কাগজখানি মুড়লেন, তারপর পা ছড়িয়ে বসলেন। নিজেদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ল। ওদের সেই ঠাকুমারা এক গল্পই কত চালিয়েছেন কতবার। ওঁরাও কৃতার্থ ভাবে তাই শুনেছেন নিত্য নতুনের মোহ তাদের প্রশ্রয় পেত না। এবং অসুবিধে হ'লে তৎক্ষণাৎ ঠাকুমা কেমন করে' স্তব বলতে জুড়ে দিয়েছেন।

ওঁরা সবাই মিলে খুড় জাঠতুত বোন-ভাই এবং পিসিমারা সকলে তার স্বরে একের পর এক কণ্ঠস্থ স্তব কবচমালাখানি মুখস্থ বের করে' গেছেন। প্রত্যেকটি প্রণামের সঙ্গে তাঁদের মনে হয়েছে দেবতারা সকলে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন, ওদের সারি গেঁথে বসার মতই তারা প্রসন্ন মুখে প্রণাম নিচ্ছেন।

কিন্তু এই যে সব ছেলেগুলো, এরা না ধারে সে ভক্তির ধার, না মানে ঠাকুর, একেবারে একটী একটী সয়তানের অবতার বিশেষ। (তখনি স্বগত ষাট, ষাট বল্লেন) পাজি সব। কেউ ভাবচেন ঠাকুমা ক্রিশ্চান ছিলেন? না, শয়তান মনে হলে যেন বেশী খারাপ মনে হয় তাই। এদের ঠাণ্ডা করা শক্ত। মনে কি আছে ছাই কোনো গল্প?

'বল ঠাকুমা?'—পিন্টু বল্লে।

মন্টু বল্লে 'বল না?'

শোভনা বল্লে, 'বলুন না ঠাকুমা !'

মলিনা বল্লে, 'চুপ করে' রইলেন যে !' বলা বাহুল্য ওরা প্রায় একসঙ্গেই বলেছিল !

এবারে ঠাকুমা হাসলেন, বিরক্ত হলেন, শেষে বল্লেন, 'দাঁড়া, গল্প কি ঘোড়া যে ছোটালেই ছুটবে।'

পিন্টু আশ্বস্ত হয়ে বল্লে, 'ঠাকুমা, ভূতের বল !'

মলিনা ভীতু মেয়ে, সে কাছ ঘেঁসে সরে এলো, বল্লে, 'না ঠাকুমা' !

মন্টু আর শোভনা আর অন্য ছোট ছোট ক'জন তারা কিন্তু ভূতেরই সমর্থন করলে।

ভোটে সমর্থন বেশী পেল ভূত, পৌরাণিক কথা আর রাজা-রাণীর চেয়ে। ঠাকুমা ভাবলেন, এখনকার ছোট ছেলেরাও 'চমক' চায়।

ঠাকুমা ভাবতে বসেন। ইত্যবসরে ওরা বলে ; 'তুমি ভূত দেখেছ ?'

ঠাকুমা বলেন, 'না'।—একটু চিন্তিতভাবে তারপর বল্লেন, 'তবে'—'না' শুনে ওরা দমে গিয়েছিল 'তবে' শুনে ওরা উৎসাহিত হয়ে খুব সংশয়ে ঘেঁসে বসল। ওদিকের ঘর থেকে দু'-একটী ছেলে আর বেরিয়ে এলো এ ঘরে। বেশ জমজমাট মনে হচ্ছে আসরটী।

"কি তবে" ? এবারে সমস্বরে সবাই বললে।

"কিছুই নয়,—দেখি নি কিছু,—তবে কোন আঁচলের কোণের খুঁটে গেরো পড়ে ছিল বলে একবার গঙ্গা নাইতে "পথ ঘূর্ণী"তে পেয়ে ছিল।

"পথঘূর্ণী" ? শাঁকচুন্নী, পেত্নী, ভূতনী এবং নানাবিধ 'নী' সংযুক্ত স্ত্রী প্রত্যয় করা ভূত আছে, আর পুরুষ ভূতও কম নয়।

কিন্তু ওদের বয়েস অর্থাৎ পাঁচ বছরের থেকে বারো বছর অবধি অভিজ্ঞতায় এই শিশু কয়টীর ও নামটির সঙ্গে কোন পরিচয় হয় নি। সে আবার 'পায়'—অথবা 'পেয়েছিল।' তাও কি না ঐ বীর নারী ঐ ঠাকুমাকে ? যিনি পল্লীগ্রামের তাদের দেশের বাড়ীতে একলা থাকেন পূজার সময় গিয়ে—একজন চাকর মাত্র বাইরে থাকে !

পথঘূর্ণী কি ?—এবং গল্পটী বল। এবার এই আবেদন এলো।

ঠাকুমার সুবিধা হ'ল, যা' হোক্ খানিকক্ষণ টেনে নিয়ে যাওয়া।

"সে-একবার শীতকাল। তখন আমার বয়েস হবে তিরিশ। দেশের বাড়ীতে আছি। তোমাদের ছোট কা'ও তখন হয় নি। এমন সময় মাঘী-পূর্ণিমায় কি একটা যোগ পড়ল, যোগটি থাকবে ভোর সাড়ে চার থেকে পাঁচটা অবধি। তারই মধ্যে ডুব দিতে হবে। দিলে আগের চৌদ্দ-হাজার জন্মের পাপ, আসছে চুয়াল্লিশ হাজার জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাপ আর ছোঁবে না।

একজন বাধা দিয়ে বল্লে, 'কি পাপ ঠাকমা করেছিলে তুমি ?' ঠাকুরমারাও কি পাপ করেন ? ওদের সমস্যা ভাঙতে ঠাকুমা বিপদে পড়লেন, বল্লেন, 'কি জানি ! তিনি যাবেন আর যাবেন ওবাড়ীর আর এক সরিকের বাড়ীর দুই পিসেশাশুড়ী, আর বাড়ীতে ছিলেন তোমাদের বাবার মেজ ঠাকুমা, তিনি যাবেন ঠিক হ'ল। আর আমার ছোট ননদ বলে ছিল যাবে সে। আরও পাড়ার অনেক লোক যাবে। পনর দিন আগে থেকে জল্পনা করে ঠিক করে রাখা হ'ল। এমন সময় ছোট ননদের শাশুড়ীর অসুখ করল, সে গেল শ্বশুরবাড়ী, বর নিয়ে গেল। এবাড়ী থেকে শুধু আমরাই যাব মাত্র। ওপাড়ার পিস্-শাশুড়ীরাও যাবেন, পথে পাব।'

কিন্তু পথ যে আমরা চিনি না। মা গঙ্গা অনেক দূরে ওখান থেকে।

পথ চেনে পাড়ার বুড়ী কুমোর-গিন্নী। সে

যদি যায়! খুব মজা হয়। মেজ খুড়িমা তো তার ওখানে গেলেন। সে বলে, এই মাঘ মাসের শীত, তাতে অর্দ্ধেক রাত্রে নাওয়া আর অন্ধকারে চললে সে মরে যাবে পথেই! তাই যাবে না। তবে পথ বলে দিতে পারে।

সে বল্‌লে,—'পথ মা, সে হ'ল এই এখান থেকে, এই তোমাদের বাড়ী থেকে পাকা ত্ন'কোশ। হাঁটতে পারা শক্ত। তা' যাবে যখন, তখন পুণ্য কাজে বাধা দেব না। এখান থেকে সেজা যাবে রথতলার পথে, সেখানে খানিক গিয়ে একবারে পা.ব ষাঁড়া ষষ্ঠীতলার পাশদিয়ে যে রাস্তা গেছে—সেই রাস্তা, যবে অনেক দূর। তার তু'-ধারে খানিক পোড়োবাড়ী খানিক জমীদারদের সরিকি বাগান। জমীদারের বাগানের একটা পুকুর আছে, তার নাম বৌ-দীঘি। সেখানটায় একটু ভয় আছে— একটু শীগগির হেঁটে যাবে। অনেক লোক ওখানে ভয় পেয়েছে। তা' সে পুরুষমানুষকে ভয় দেখায়, মেয়ে দেখলে হাসে শুধু। মেজ খুড়িমা এর কথা শুনে এসে বল্‌লেন, যেন তাঁর ভয়ে গা' ছমছম করতে লাগল।

সে যাক্, তারপর বৌ-দীঘি ছাড়িয়ে পড়ে মস্ত বন, সেই তু'সারি জঙ্গল-পথে খানিক গিয়ে বাঁ-দিকে একটা সরু রাস্তা পড়ে—সে দিক দিয়ে গেলেই মাঠ। মস্ত মাঠ, তার একদিকে থাকে শ্মশান, আর অন্য দিকে বোধ হয় ডান দিকে খানিক গেলে থাকে গঙ্গার ঘাট। কিন্তু মা, আমার মনে হচ্ছে ঐ শ্মশানের দিকে একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে বোধ হয় বট—সে দিকটা দেখলেই বুঝতে পারবে, আর কত লোক নাইতে যাবে, চেনে তারা।

মেজ খুড়িমা পথের সন্ধান নিয়ে এলেন। গল্পের আবহাওয়াটা বেশ জমাট হয়ে এলো। ছেলেরা কাছ ঘেঁসে বসে পেছন দিয়ে তাকায়।

তারপর মাঘী-পূর্ণিমার রাত্তির। আমার আর ঘুম আসে না। কেবলি মনে হয় কখন ভোর হয়ে যাবে, সেই চান করা হবে, সেই সব হবে অথচ যোগটা যাবে কেটে। উস্‌খুস্ উস্‌খুস্ করছি। ছেলেদের মাথার কাছে ধামী করে সন্দেশ চাপা দিয়ে রাখলাম, কুঁজোয় জল আছে খাবে'খন। তোমাদের বড় পিসিমাকে জাগিয়ে দিয়ে সব বল্লাম, কাঁদেকাটে তো খাবার দিস, আর খিদে পেলে খাস্।

এমন সময় কা কা কা কা করে' কাক ডেকে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি আমি গামছা তসরখানি আর একটা ঘটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম! খুড়িমাকে ডাকি, ও খুড়িমা কাক ডাকে যে' ওঠ।

খুড়িমার ঘুম পাতলাই ছিল। তু'জনে বেরুলাম। সদরের পথে আমার শশুরের আমলের চাকর ছিল, তাকে বলে একেবারে পথে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। পৃথিবী একবারে আলোয় থই-থই করছে, যেন আলোর পাথার বয়ে গেছে। আমার তখন বয়স কম, দেখতে এমন ভাল লাগছিল। অর্দ্ধেক রাত্রে আর কবে দেখেছি উঠে।

মেজ খুড়িমা হন হন করে এলেন। পিস-শাশুড়ীদের বাড়ীর দরজা ঠেলে আরও সা করে' এক বাড়ী তু'বাড়ী ডেকে খুড়িমা চল্লেন। তারা কেউ সাড়া দিলে, কেউ তেমন করে দিলে না।

আমরা সদরের পথে এলুম। তার পর ষষ্টি-তলা, মা ষষ্টিকে প্রণাম করে' গঙ্গার পথ ধরলাম।

তার পর এলো বৌ-দীঘির বাগান। বাগান না বন। গা' যেন আজো মনে করলে কাঁটা দেয়। মাথা নীচু করে সামান চেয়ে শুধু চল্লাম, উঁচুতে না, পাশে না, পেছনে না।

তা' মেয়ে বলেই হোক আর যাই হোক কিছু ভয় পেলাম না।

এইবারে কিন্তু কে বন এলো, সে একবারে সেই বিজোবন। অজগর 'বিজো'বন। গল্পে শুনেছিলাম, "পাত পড়েছে—কুলো হচ্ছে"—"ডাল পড়ছে ঢেঁকি হচ্ছে"—অর্থাৎ জনমনিষ্যি দিনেও সেখানে বড় যায় না। মাঝখানে সরু পথটুকু,—কাঠুরে রাখাল আর গরু-বাছুর দুপুরে কখনো কখনো যায়। আর কেউ গঙ্গার পথে গেলে যায়। তাও ঘুর বলেই যায় সব, ওটা বন-পথ।

জ্যোৎস্নাতে একেবারে রূপো ঢেলে দিয়েছে গাছে গাছে যেন। শিশির চক্‌চক্ করছে। আর এত আলো আর ছায়ায় খেলা যে, চাইতে ভয় করে। মনে হয় ঐ যেন কি সরে গেল, কি নড়ল, আর কি দেখলাম। কিন্তু একবারে নিঝুম্ সব। কোনোদিকে সাড়াশব্দ নেই।

আমাদের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। মনে হ'ল তারা কই, আরও যারা গাঁয়ের সব আসবে! তারা কখন আসবে। মেজখুড়িমা আর কথাটী কইছেন না। আমি একবার বল্লাম, "খুড়িমা তারা?" খুড়িমা বল্লেন, "আসছে বোধ হয়, চল চল এগিয়ে মাঠে গিয়ে দাঁড়াব'খন"।

খানিকদূর গিয়েই মাঠ পেলাম দেখতে। প্রাণটা যেন খোলা পেয়ে বাঁচল। এগোতে থাকি, কিন্তু না রাম না গঙ্গা, কোনো সাড়াশব্দই নেই পেছনে। এবারে খুড়িমা বল্লেন, "তারা হয়ত অন্য পথে গেছে বা। আর পথ আছে? —জিজ্ঞাসা করি খুড়িমা বলেন, 'তা' থাকতে পারে বইকি।

খানিক গিয়ে দেখি— সামনে দূরে একটা লোক আমাদের দিকে আসছে। আর আমরা যেন এগুচ্ছি,—সে পেছোচ্ছে! দাঁড়ালাম দু'জনে। তা' হ'লে ওকে পথ জিজ্ঞাসা করব। ভাও হবে। ওই আসুক।

হঠাৎ চোখ পড়ল আমারা সেই ঝাঁকড়া গাছের দিকে এসেছি।

খুড়িমা বল্লেন, বৌমা ঐ সেই গাছ না?—এ পথ নয়। চল ওদিকে।

আমরা ফিরি, লোকটাও যেন দূরে যেতে লাগল। খুড়িমা বল্লেন, "ওদিকে ঘাট কি না তা' হয় ত কেউ মানুষ এসেছে, তা' যাক্ গে। আমরা নাবার ঘাটেই যাই চল।"

আমার কিন্তু কি হল যতবারই যাই ঘুরে ঘুরে এ দিকেই বালি ভেঙ্গে আসি। এমনি বার তিনেক হতে শেষকালে একজায়গায় বসলাম। বল্লাম, 'খুড়িমা একটু বসি'—

খুড়িমা আর কিছু বল্লেন না, শুধু একটু টেনে অন্য দিকে এসে বল্লেন, 'বোসো মা। আমাকে কোলের কাছে নিয়ে বসলেন। তখন আমি লক্ষ্য করলাম খুড়িমা আস্তে আস্তে ঠাকুরদের নাম কচ্ছেন। রাম রাম দুর্গা দুর্গা বলছেন। তা' গঙ্গা ঠাকুরের নাম তো লোক করেই; ভয়ের জন্যে নাও হ'তে পারে!

কখন যে এসেছিলাম আর উঠলাম কিছুই আমাদের হিসেব ছিল না। একটী একটী মিনিটও অনেক সময় অনেকটা মনে হয়। যাই হোক্, হঠাৎ কোন্‌দিকে, ঘাটের দিকেই হবে একটা গান শোনা গেল। সুর এগিয়ে এলো।

খুড়িমা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, বল্লেন, "ঐ হরি বৈরিগীর গলা, তাকে ঘাটের পথ জিজ্ঞাসা করি। ওঠো তো বৌমা, কাপড়টা ঝেড়ে পরো, দেখতো কোন গেরো নেই তো।"—

আমি উঠলাম, কাপড়ে দেখলাম গেরো আছে, খুঁটিতে শুকুতে দেবার জন্য যে ছোট্ট গেরো আমরা দিই।—

ছেলেরা বল্লে, "গেরোতে কি ঠাক্‌মা?"

ঠাকুমা—সেকেলে মানুষ—গেরোয় গ্রহ ধরে। অসুবিধায় পড়ে আর কি!—

হরি বৈরিগী আমাদের দেখে অবাক্।—বলে, এ কি ঠাকুমা, এই তিনটে রাত্রে এখানে এসেছ একলা?—ভয় পাও নি পথে?"

আমরাও অবাক।

ঠাকুমা আর ভাঙলেন না কিছু, বল্লেন, 'বাবা চল, ঘাটের দিকে চিনিয়ে দাও তো!—পথ ভুলে বড় ঘুরছি।'

মা, তা এই রাত্রে মেয়েমানুষ দু'টি কখনো পথে বেরোয়! একলা এসেছেন, বাবুরা কিছু বল্লেন না?—ঘড়ি নেই তেনাদের দেখেন নি?—

'ঘড়ি বাছা তাদের কাছে,—তারা কি দেশে আছে? তারা—থাকলে বৌটিকে আসতে দেয়?

আমি ঘোমটা দিয়ে আছি।

কথা কইতে কইতে গঙ্গার ঘাট দেখা গেল। আমরা তো ঘাটে গিয়ে বাঁচলাম।—তার কতক্ষণ পরে ওরা সব এলো। তখন ভোর হব হব হয়েছে, হয় নি।

ছেলেরা বলে তার পর?—

তারপর "সর্ব্বপাতক সংহন্ত্রী"—বলে বলে সব ডুব দিলাম। দিয়ে—ভোরে ভোরেই বাড়ী ফিরলাম। তখন সব ঘুমচ্ছে দেখি অসহিষ্ণু ছেলেরা, নাতিরা বলে, 'তা' নয়;—তার পর পথঘুর্ণী না কি বল্লে সেই ভূতের কি হ'ল?—

'ও তার আর কি হবে কিছুই হ'ল না। কাপড়ের গেরো খুলে দিলাম কি না!'

'যাও! সেই লোকটা? সেই ভূতের গাছটা?' ঝাঁকড়া গাছ?'

'সে কি জানি? ঠাকুমা হাসলেন, ভূত কোথায় গাছে?'

'যত মিথ্যা কথা!' ছেলেরা রাগ করে।

ওঘর থেকে একটু বড় নাতি পাঠ্যপুস্তক পড়তে পড়তে বেশ মনোযোগ দিয়ে গল্পই শুনছিল। সে এঘরে এসে একটু হেসে বল্লে, বুঝিস্ নি? ঠাকুমা হচ্ছেন আর্টিস্ট্। ব্যাক-গ্রাউণ্ডটা ভূতের গল্পর বেশ খোয়ালো করেছেন, এই হ'ল গল্প! আসলে কিছুই নয়।'

ঠাকুমা ইংরাজী না বুঝেও হাসেন।

স্বগৃহে

শ্রীউষা বিশ্বাস, এম-এ, বি টি

ছোট্ট একটি ষ্টেশন—নিরালা, নিরানন্দ, জনবিরল। ছায়াহীন দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুকে যেন একটি শুভ্র বিন্দু। আশে পাশে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। ষ্টেশনের রৌদ্রদগ্ধ দেওয়াল-গুলি যেন তা'দের নগ্নদেহ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টেশনের বাইরে বিশাল প্রান্তর ধূ-ধূ করছে—তারই বুকের উপর দিয়ে চলেছে নির্জ্জন একটি পথ—গাড়ী ঘোড়ার ভিড় বা লোক চলাচলের ঠেলাঠেলি নেই। যতদূর দেখা যায় সুদূর প্রসারিত বৈচিত্র্যহীন মাঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। দূরে দুই-একটি কলের চিম্‌নী মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুই-একটি গরুর গাড়ী তার বিপুল কলেবর নিয়ে পথ দিয়ে চলেছে। দুই-একটি দল-ছাড়া পাখী উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। তা'দের সেই একঘেয়ে ডানানাড়ার শব্দ যেন গ্রীষ্মালসদিনে তন্দ্রাতুর লোকের নিদ্রাকর্ষণ করে।

যথসময়ে ষ্টেশনে যাত্রীর ট্রেন এসে থাম্‌লো। যাত্রীদের মধ্যে থেকে নাম্‌লো—এক সুন্দরী তরুণী। আবার যথাসময়ে বাঁশী বেজে উঠ্‌লো—ট্রেণ চল্‌তে সুরু কর্‌লো তার যথা-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে। ট্রেণের শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। তরুণী ট্রেণ থেকে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়লো। গাড়োয়ান যখন তার আসবাব-পত্র গাড়ীতে গুছিয়ে নিচ্ছিল, তরুণী একবার চারিদিকে চেয়ে নিল। তার মনে পড়ে গেল বছর দশেক আগেকার কথা, যখন সে শেষ এখানে এসেছিল। সে তখন ছোট্ট মেয়েটি!...

ষ্টেশন থেকে শোভার বাড়ী প্রায় বিশ মাইল রাস্তা। গাড়ী যখন সেই মাঠের পথে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, শোভার মনে তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হ'তে লাগ্‌লো। সে আনন্দ তার ট্রেণযাত্রার সব ক্লান্তি জুড়িয়ে দিল। অতীত তার মন থেকে যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। সে বর্ত্তমান পথ চলার আনন্দেই বিভোর হয়ে পড়্‌লো—তাকে যেন পথের নেশায় পেয়ে বসেছে। মাঠের উপর দিয়ে পথ চলেছে—অন্তহীন, কোথাও যেন তার শেষ নেই। শোভা সেই মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আত্মহারা হয়ে পড়্‌লো। তা'র সমস্ত মন এক অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দে ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌লো। তরুণী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী সে। এই তেইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন কিছুরই অভাব ছিল না তার—কেবল এই অবাধ স্বাধীনতা ও অপরিসীম মুক্তি ছাড়া—যা'র মদিরা আজ তার মনকে এম্‌নি করে' মাতিয়ে তুলেছে। আজ সে অনুভব কর্‌লো এইটিরই যেন তার জীবনে প্রয়োজন ছিল।

সূর্য্য ক্রমে মাথার উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শোভার মনে হ'ল, পথের এই অপরূপ শোভা-সম্পদ্ আর কখনও সে দেখে নি। পথ যেন আজ তা'র চোখে অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠ্‌লো। পথের ধারে কত বিচিত্রবর্ণের বনফুল ফুটে রয়েছে—সবুজ, হল্‌দে, নীল, সাদা। তা'দের সুমিষ্ট

গন্ধ উত্তপ্ত মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে চারিদিক আকুল করে' তুলেছে। পথের পাশে কতকগুলো নীল রংএর পাখী কেউ তা'দের নাম জানে না। পথের সৌন্দর্যে শোভার মন যখন মাতাল হয়ে উঠেছে, তখন তার সেই গভীর নীরবতার শান্তি ভঙ্গ করে' গাড়োয়ান মাঝে মাঝে আপন-মনে বকে' চলেছিল—মাঝে মাঝে চাবুক উঠিয়ে দূরে কি যেন দেখাবারও বৃথা প্রয়াস পাচ্ছিল। কিন্তু এসব কিছুই শোভার মনকে স্পর্শ করতে পারছিল না। মন তার নিজের আনন্দের রসদ নিজেই জোগাচ্ছিল। বহুদিন তার প্রার্থনা করার অভ্যাস চলে গিয়েছে। তবুও তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করে, এই প্রার্থনা স্বতঃই জেগে উঠছিল, সে যেন এই নির্জ্জন পল্লীগ্রামে প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়—জীবন যেন তা'র বিফল না হয়। এক অনুপম শান্তিতে ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তার সমস্ত অন্তর ভরে উঠ্‌লো। তার মনে হ'ল যেন সারাজীবন ধরে' অফুরন্ত এই পথের অনন্ত শোভা উপভোগ করতে করতে চল্‌তে পারলেই সত্যিকারের সুখের সন্ধান সে পাবে। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ গাড়ী ঝোপঝাড়পূর্ণ একটি গভীর খাতের কাছে এসে পড়্‌লো। অমনি ভিজে মাটির একটি মিষ্টি গন্ধ বাতাসের সঙ্গে বয়ে এল। ঝোপের নীচে বোধ হয় একটি প্রচ্ছন্ন জলের উৎস ছিল। অনতিদূরে খাতের পাশে গুটি কয়েক কপোত গাড়ীর শব্দে সচকিত হয়ে উড়ে গেল। শোভার মনে অতীতের স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। মনে পড়ে গেল তার নিজের বাল্য-জীবনের কথা—যে জীবনকে সে আজ পেছনে ফেলে এসেছে তা'রই অতীত দিনের স্মৃতি তার মনকে নাড়া দিতে লাগ্‌লো। এইখানে সে ছোট বেলায় প্রতিসন্ধ্যায় বেড়াতে আস্‌তো। এই খাতটি দেখেই সে বুঝ্‌তে পারলো যে সে গ্রাম বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই চিরপরিচিত বাব্‌লা গাছগুলি, সেই গোলাঘর—সবই সেরকম রয়েছে।

এক পিসিমা ও ঠাকুরদাদা ছাড়া শোভার সংসারে আপনার বল্‌তে আর কেউই ছিল না। তা'র মাকে সে অনেকদিন আগেই হারিয়েছে, তার পিতা একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সম্প্রতি মাস তিনেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শোভার পিসিমা আজ তাঁর ভাইঝিটির আশাপথ চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। ঠাকুরদা' ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নাত্‌নীর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁদের মনে আজ আর আনন্দ ধরে না। বহুদিন পরে শিক্ষা সমাপ্ত করে' শোভা ফিরে আসছে নিজের বাড়ীতে—তাঁদের সঙ্গে থাকবে বলে। শোভাকে দেখে পিসিমা আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গেলেন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য—তাকে বুকে চেপে ধরে' অশ্রুবিকৃত স্নেহবাগ্রকণ্ঠে উচ্ছ্বাসভরে কত কি বল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর মনে এই সন্দেহও মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল যে,তাঁর উচ্চশিক্ষিতা সহরে পালিতা ভাইঝিটি তাঁদের আপনার কোরে নিতে পারবে কি না, তাঁদের ভালবাস্‌তে পারবে কি না।

শোভার ঠাকুরদা'র সাদা ধব্‌ধবে লম্বা দাড়ি। বেশ নধর পুষ্ট গোলগাল দেহ তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। হাঁপানি রোগী—তাঁর লাঠিটির উপর ভর দিয়ে তিনি যখন চলেন, তাঁর বিপুল ভুঁড়িটি যেন আগে আগে চল্‌তে থাকে। শোভার পিসিমার বয়স আন্দাজ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ—প্রৌঢ়ত্বের সীমা এখনও তিনি অতিক্রম করেন নি। তাঁর বেশভূষার পারিপাট্য দেখলে মনে হয়, যেন তিনি তাঁর বিগত যৌবনকে আরও কিছুদিন ধরে' রাখ্‌তে চান্। তাই তাঁর যৌবন-শ্রী রক্ষা করবার বার্থ প্রয়াস। ছোট ছোট পদবিক্ষেপে পিঠ বাঁকিয়ে চলার ভঙ্গীটি তাঁর অদ্ভুতগোছের।

ঠাকুরদা'র ইচ্ছায় শোভার গৃহাগমন উপলক্ষ্যে

সদিন একটু উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। একটু প্রার্থনা হ'ল, তারপর সান্ধ্যভোজ। শোভার নতুন জীবন সুরু হ'ল আজ থেকে

আহারাদির পরে শোভা শুতে গেল যথানির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে। ঘরটি তার জন্যে বেশ সুন্দর করে' সাজানো হয়েছিল—কিছু ফুলও রাখা হয়েছিল। সে শুয়ে পড়ার পরে পিসিমা একবার সশব্যস্তে ঘরে ঢুক্‌লেন তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না দেখ্‌তে। তিনি এসে দেখ্‌লেন শোভা শুয়ে পড়েছে। তবুও সে জেগে আছে জান্‌তে পেরে তাকে উদ্দেশ করে' আপন-মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেদের সুখদুঃখের কাহিনী খানিকটা শুনিয়ে গেলেন।…শোভা নীরবে পিসিমার বক্তৃতা শুনে যাচ্ছিল। পিসিমা থাম্‌তেই সে জিজ্ঞেস্ করলো—আচ্ছা, তোমাদের এখানে ভালো লাগে পিসিমা? ভয়ানক একঘেয়ে লাগে না? পিসিমা বল্লেন—তা একটু লাগে বই কি। এখানে আর কোনও জমিদারের তো বাস নেই। তবে নিকটেই একটি কারখানা আছে। সেখানে অনেক এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, 'মাইনে'র ম্যানেজার ইত্যাদি আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের যাওয়া-আসা আছে। তা' ছাড়া এখানে একটা থিয়েটারও আছে। আমরা বেশীর ভাগ তাসই খেলি। কারখানার ডাক্তারটি প্রায়ই আসেন আমাদের এখানে। বেশ মানুষটি কিন্তু। যেমনি সুন্দর চেহারা! তিনি তো তোর ফোটো দেখেই একবারে মুগ্ধ। তোর সঙ্গে ওঁর বিয়ে হ'লে দিব্যি মানাবে। আমি তো তাই মনে মনে ঠিক্ করে' রেখেছি। সুশ্রী চেহারা, তরুণ বয়স—টাকাকড়িও বেশ আছে। তোর ঠিক উপযুক্ত বটে! অবিশ্যি তোর এর চেয়ে ভালো বরও জুট্‌তে পারে। তোকে কার সঙ্গেই না মানায়? আমাদের মত ঘর আর ক'জনের?… ঘুমে যে তোর দুই চোখ বুজে আস্‌ছে রে। আমি যাই, তুই ঘুমো এখন।'

পরদিন শোভা অনেকক্ষণ বাড়ীর চারিপাশে ঘুরে বেড়ালো। বাগানটি যেম্‌নি পুরোণো, তেম্‌নি শ্রীহীন—একখণ্ড ঢালু জমির উপর যেমন তেমন করে' কয়েকটা গাছ লাগানো হয়েছে। বেড়াবার জায়গা বা রাস্তা তার মধ্যে কোথাও নেই—অযত্নের চিহ্ন সেখানে সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট-ভাবে বিরাজ করছে। বোধ হয় গৃহকর্ত্রী এর কোনও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনই কোনদিন বোধ করেন্ নি। তাই ঘাসে আগাছায় সে-বাগান আজ একবারে পূর্ণ হয়ে সাপের বাসা হয়ে উঠেছে। গাছের নীচ দিয়ে কতকগুলি পাখী "হুপ" "হুপ" শব্দ করে' উড়ে বেড়াচ্ছিল। তারা যেন শোভাকে কোনও বিস্মৃত কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। কাছেই একটি ছোট পাহাড়—তা'রই তলা দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে' চলেছে গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। নদীবক্ষ লম্বা লম্বা খাগড়াগাছের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। বাগান থেকে বা'র হয়ে শোভা চল্‌তে লাগ্‌লো মাঠের দিকে—দৃষ্টি তার দূরে প্রসারিত। সে ভাব্‌ছিল তার এই নতুন গৃহে নতুন জীবনের কথা—ভাব্‌ছিল তার এই নবারব্ধ জীবনের পরিণতি কোথায়। সম্মুখের উন্মুক্ত বাধাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শান্ত মাধুরী তার চিত্তকে আবিষ্ট করে' তুল্‌লো। তার মনে হ'তে লাগ্‌লো জীবনের চরম সুখের সন্ধান সে এইখানেই বোধ হয় পাবে—হয় তো বা পেয়েছেও। এজগতের হাজার হাজার লোকের ধারণা যে, রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধনসম্পত্তিই মানুষের সুখের মূল। তারা হয় তো তাকে কতই ঈর্ষা করে। সম্মুখের অন্ত-হীন বিশাল প্রান্তরের বৈচিত্র্যহীনতা ও সুগভীর নির্জ্জনতা শোভার অন্তরে কেমন এক রকমের ভীতি সঞ্চার করতে লাগ্‌লো। বুঝি বা এই

প্রশান্ত সবুজ বিশালতা তা'র ক্ষুদ্র জীবনকে তা'র বিরাট মুখগহ্বরে গ্রাস করতে উদ্যত—হয় তো বা জীবন তা'র এখানেই নিষ্ফল ব্যর্থতায় শেষ হয়ে যাবে। সে তরুণী সুন্দরী—প্রাণপূর্ণ তার দেহ মন। সে উচ্চশিক্ষিতা, তিন-তিনটি ভাষাও সে আয়ত্ত করেছে—বোর্ডিং-এ অভিজাত বংশীয়াদের সঙ্গেই তার ছাত্রী-জীবন কেটেছে। সে অনেক পড়েছে—পিতার সঙ্গে দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে। তার বিদ্যা, রূপ যৌবন বিলাস সৌন্দর্যের কী প্রয়োজন যদি তাকে এই সুদূর পল্লীগৃহেই বাকী জীবনটা কাটাতে হয়? তাকে কি সত্যিই এই বিজন পল্লীতে সারা জীবন কাটাতে হবে? কর্মহীন অলস পল্লীজীবনের একটি ভয়াবহ চিত্র তার মনে জেগে উঠ্‌লো—কেবল বাগান থেকে মাঠ, মাঠ থেকে বাগানে ঘুরে বেড়ানো, আর বাড়ী ফিরে এসে হাঁপানী রোগগ্রস্ত ঠাকুরদা'র কাত্‌রানি শোনা। এই যেন তার বর্ত্তমান জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা! উঃ! অসহ্য এই জীবন তার পক্ষে! তবে সে কি করবে? কোথায় যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর কে তাকে বলে' দেবে? বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে মনে তার ঘোর সংশয় জাগ্‌লো সে এখানে বাস করে' সত্যিই সুখী হ'তে পারবে কি না। তার কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌লো ষ্টেশন থেকে যখন সে বাড়ী আস্‌ছিল তখনকার কথা। পথ চলার সেই আনন্দই যেন এখনকার বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার চেয়ে ঢের বেশী মধুর বোলে তা'র মনে হলো।

কারখানার তরুণ ডাক্তারটি—যাঁর কথা পিসিমা শোভাকে রাত্রেই বলেছিলেন—এলেন তাদের বাড়ীতে বেড়াতে। ডাক্তারি তাঁর সাবেক কালের পেশা ছিল। বছর তিনেক আগে কারখানার বেশ মোটা রকমের কিছু অংশ কিনে তিনি ব্যবসায়ের একজন প্রধান অংশীদার হয়ে বসেছেন। যদিও তিনি 'প্র্যাক্টিস্' একবারে ছাড়েন্ নি, তবুও ডাক্তারি তাঁর মুখ্য পেশা নয় আজকাল। দেহের রং ঈষৎ ময়লা, সুন্দর গঠন। পরিধানে তাঁর একটা সাদা কোট। মনে যে তাঁর কি আছে তা' তাঁর মুখের ভাব দেখে অনুমান করা কঠিন। ডাক্তার এসেই শোভার পিসিমাকে যথারীতি অভিবাদন করে' আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি বারবার উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। কখনও কোণে চেয়ার ঠিক করে' রাখ্‌তে, কখনও বা অন্য কাউকে তাঁর নিজের চেয়ারটি ছেড়ে দিতে। সারাক্ষণই প্রায় তিনি নীরবে গম্ভীর মুখে বসে' রইলেন। যদিই বা কোনও কথা বলেছেন তো তাঁর কথার আরম্ভটা কেউ শুনতে ও পায় নি, বুঝ্‌তেও পারে নি। অথচ তিনি যে খুব আস্তে আস্তে কথা বল্‌ছিলেন বা ভুল কথা বল্‌ছিলেন তা-ও নয়। শোভার তাঁকে মোটেই ভালো লাগ্‌লো না—সে তাঁর মধ্যে এমন কিছুই দেখ্‌তে পেলো না যা' তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ শোভার কাছে মোটেই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক বলে' মনে হলো না। তাঁর অতি বিনয় আদব-কায়দা,—তাঁর বর্ণহীন গম্ভীর মুখ—তাঁর ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল—এসবই যেন তার মনে এক গভীর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে দিল। সে মনে মনে ভাব্‌লো—লোকটা নিশ্চয় অতি নির্ব্বোধ, নইলে সারাক্ষণ কোনও কথা না বলে' চুপ্ করে' বসে' রইলো কেন? ডাক্তার চলে' যাবার পরে পিসিমা এসে খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, ডাক্তারকে তোর পছন্দ হলো? কেমন, বেশ সুশ্রী, না?

২

শোভার জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল।

সম্পত্তি ও কাজকর্ম্ম দেখশুনা শোভার পিসিমাই করতেন। বেশ পরিপাটি করে' সাজসজ্জা করে' তিনি রান্নাঘর, গোলাঘর, গোয়ালঘর ইত্যাদি তদারক করে' বেড়াতেন। ঠাকুরদা' সর্ব্বদাই এক জায়গায় বসে' থাকতেন—কথনও তাস খেলতেন, কথনও বা বসে' বসে' ঢুলতেন। তিনি ছিলেন এক মস্ত বড় ঔদরিক তাঁর খাওয়া ছিল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাসি, টাট্‌কা, ভালো, মন্দ, যা তাঁকে খেতে দেওয়া হ'ত সবই তিনি নির্ব্বিচারে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে যেতেন। কখনও তাঁকে 'আর খাব না' বা 'এটা খাব না' বলতে শোনা যে'ত না। বেশীর ভাগ সময় তাঁর আহারে না হয় 'পেশেন্স' খেলায় কাট্‌তো। কখনও কখনও আহারের সময় শোভাকে দেখে, তাঁর হৃদয় রসে উদ্বেল হয়ে উঠতো, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উচ্ছ্বাসভরে বলে' উঠতেন "আমার একটি মোটে নাত্‌নী।" তখন তাঁর অশ্রুসজল চোখ দু'টি জল জল্ করতে থাকতো। শীতকালে তিনি একবারে চুপচাপ বসে' থাকতেন। গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও গাড়ী করে' একটু মাঠে বেড়াতে যেতেন ক্ষেতের শস্যাদি দেখতে। বাড়ী ফিরে রাগারাগি করতেন যে, তিনি আকজাল কিছু দেখাশুনা করতে পারেন না বলে' কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না। পিসিমা নিত্যই অনুযোগ করতেন যে, ভৃত্যেরা তার সব অত্যন্ত অলস হয়ে গিয়েছে, কেউই কিছু করে না, তাই সম্পত্তি থেকে আজকাল তেমন লাভও হয় না। কিন্তু তবুও সারাদিন ধরে'বাড়ীর হৈচৈ এর অন্ত ছিল না—'এটা আন', 'ওটা আন', 'শীগগির কর', চীৎকার ভোর পাঁচটায় আরম্ভ হ'ত ও সন্ধ্যে পর্য্যন্ত চলতো। চাকরদের দৌড়াদৌড়ি ও ফরমাস খাটার আর যেন শেষ ছিল না। তবুও পিসিমা সর্ব্বদাই অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। প্রতি সপ্তাহেই চাকর বদল হ'ত। কখনও বা পিসিমা তাদের নৈতিক দোষের জন্য বিদায় দিতেন। কারণ অপরের নৈতিক চরিত্রের উপর তাঁর সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ছিল। কখনও বা চাকরেরা নিজেরাই কাজ ছেড়ে চলে' যেতো খাটতে খাটতে তাদের প্রাণ বার হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে বলে'। ক্রমে চাকর মেলা দায় হয়ে উঠলো। দূর থেকে তাদের আমদানী করতে হ'ত। কেবল বাড়ীর একটি মাত্র দাসীই সে গ্রামের লোক ছিল। মেয়েটির কাজ না করে' উপায় ছিল না; কারণ, তার অনেকগুলি পোষ্য—তার রোজগারের উপর অনেকগুলি প্রাণীর নির্ভর। এই মেয়েটির নাম মোক্ষদা। ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, একটু বোকাগোছের। রক্তহীন ফ্যাকাশে তার দেহের বর্ণ। সারাদিন তার ঘর পরিষ্কার করতে বাসনপত্র ধুতে পরিবেশন করতেই কেটে যেতো। গৃহস্থালীর সব কাজই তাকে করতে হ'ত। কিন্তু তবু পিসিমার ধারণা যে, সে সারাদিন কেবল ফাঁকি দিয়েই ঘুরে বেড়ায়—যত না কাজ করে তার চেয়ে অকাজ করে ঢের বেশী; অথচ সমস্তক্ষণ এম্‌নি তার ভাবটা যেন সে কত কাজই করছে। পাছে তা'র চাকুরীটি যায় এই ভয়েই মোক্ষদা অস্থির। কত সময়ে সে ভয়েই হাত থেকে বাসনপত্র ফেলে ভেঙ্গে বসতো। অম্‌নি তার দাম তা'র মাইনা থেকে কাটা যেতো। তারপর তা'র মা-দিদিমারা এসে পিসিমার হাতে পায়ে ধরতো।

...সপ্তাহে দু'-একদিন করে' অতিথি অভ্যাগতদের সমাগম হতো শোভাদের বাড়ীতে। পাছে সে তাঁদের সঙ্গে আলাপ না করে এই ভয়ে পিসিমা তাড়াতাড়ি এসে, তাকে বলতেন —"যাও, এঁদের সঙ্গে গল্প-সল্প কর গে। নইলে

ওরা তোমাকে দেমাকী মনে করবেন।" পিসিমার কথায় শোভা অভ্যাগতদের সমাদরে নিজেকে নিয়োজিত করতো। তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতো, খেলতো—তাদের মনোরঞ্জনের জন্য পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতো। এ রকম করে' নৃত্য-গীতে গল্প-গুজবে, খেলায় কত সন্ধ্যে তা'র কেটে যেতো।···একদিন বিশেষ একটি পর্ব্ব উপলক্ষ্যে একসঙ্গে ত্রিশজন নিমন্ত্রিত এসে উপস্থিত হ'লেন। আহারের পর অনেকরাত্রি পর্যন্ত তাস খেলা চললো। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ কেউ সে রাত্রে থেকে গেলেন সেখানে। সকালে আবার তাস খেলা স্বরু হ'ল। প্রাতরাশের পর শোভা তার নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। সেখানেও কি তা'র নিস্তার আছে? আবার তা'র ডাক পড়লো অতিথিদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে। এইবার রাগে দুঃখে বিরক্তিতে তার চোখ ফেটে জল আসছিল। এ-কি বিড়ম্বনা তা'র কপালে! প্রাণে তা'র আনন্দের উৎসটি শুষ্ক, তবু পরের জন্যে তা'কে আনন্দের মুখোস পরে' স্ফূর্ত্তি করতে হ'বে! লোকের সঙ্গ যখন তার কাছে অসহ্য, তখনও হাসিমুখে অপরকে তা'র সঙ্গদানে পরিতুষ্ট করতে হ'বে।···অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে শোভা মোটেই আনন্দ পাচ্ছিল না। তাঁদের কাছে তা'র সহজ সঙ্কোচহীন ভাবটিকে সে মোটেই বজায় রাখতে পারছিল না। তবুও সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তে, দিনের শেষরশ্মি পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই—কিসের টানে মন তা'র ব্যাকুল হয়ে উঠতো বাইরে যাবার জন্যে। সারা চিত্ত তা'র মানুষের সঙ্গলিপ্সু হয়ে উঠতো।··· শোভা আমোদ-প্রমোদে নিজের অশান্ত মনকে ডুবিয়ে রাখতে ব্যর্থ প্রয়াস পেত! প্রতি সন্ধ্যায় কোথাও না কোথাও তাসখেলা, নৃত্যগীত, সান্ধ্য-ভোজনাদি হ'ত, আর সে তা'তে যোগ দিত—তার আনন্দপিপাসু মন নিয়ে। তরুণ-তরুণীরা গাইত। কী মিষ্টি তা'দের গলা! কখনও বা গল্প-গুজব চলতো—যার যত গল্পের পুঁজি ছিল সব উজাড় করা হতো সেখানে। কিন্তু এ সবই যেন তা'র কাছে বিস্বাদ লাগতো—তার মন সব কিছুতেই যেন তৃপ্তি পেতো না। হৃদয় তা'র কি এক অজ্ঞাত ব্যথায় টনটন্ করতে থাকতো রাত্রি একটু বেশী হ'লে, ঘরের মধ্যকার গল্প-গুজবের মাঝখানে কখনও কখনও বাইরের দু'-একটি চীৎকার গোলমালের শব্দ এসে পৌছাতো ও সকলের মনে ক্ষণিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে' যেতো! কখনও বা কোনও মাতালের অর্থহীন প্রলাপ, কখনও বা কোনও আর্ত্ত পথিকের চীৎকার—গল্পনিরত নরনারীকে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সজাগ করে' তুলতো! কখনও বা মাতাল দমকা বাতাসের হুঙ্কার ঘরের চিমনীগুলির মধ্যে দিয়ে শোনা যেতো, জানালার ঝিলমিলিগুলি সশব্দে নড়ে উঠতো,আর বাইরের দুর্য্যোগের বার্ত্তা ঘরের লোকদের কাছে এসে পৌছাতো। কিন্তু শোভার মন যেন সব কিছুতেই নির্লিপ্ত, উদাসীন।··· সর্ব্বত্রই সকলের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করতেন শোভার পিসিমা ও কারখানার ডাক্তারটি। এখানকার লোকেরা কেউই পড়াশুনার বড়-একটা ধার ধারতেন না। বেশীর ভাগ সময়ই তাঁদের কাটতো আমোদ-প্রমোদে, খেলা-ধুলায়। তরুণ-তরুণীরা মাঝে মাঝে জোর উষ্মার সঙ্গে তর্ক তুলতো এমন সব বিষয় নিয়ে যা'র সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই নেই—বা তারা বোঝেই না। ফলে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে তারা এসে পৌছাতে পারতো না! তবু জোর তর্ক চলতো।···শোভা এদের মত লোক কখনও দেখে নি। এদের যেন কোন বিষয়েই প্রকৃত অনুরাগ নেই—যেন কোনও নিজস্ব মত বা দেশ নেই—কোনও ভাল কাজে উৎসাহও নেই। সাহিত্য অথবা

অন্য কোনও বিষয় সম্বন্ধে যখন তর্ক উঠ্‌তো ডাক্তারের মুখ দেখেই বেশ বোঝা যেতো যে, তাঁর এ-বিষয়ে কোনও জ্ঞান বা রুচি নেই—অনেকদিন কিছু পড়েন্ নি বা পড়্‌বার চেষ্টাও রেন নি'। তাঁর সেই গম্ভীর মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পেতো না। তিনি যেন কোনও কলানৈপুণ্যহীন চিত্রকরের আঁকা একখানি পটমাত্র। পরিদানে একই সেই সাদা কোট। সর্ব্বদাই যেন এক দুর্বোধ্য মৌনতার রহস্যজাল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখবার প্রচেষ্টা। তবুও তরুণীরা ও বয়স্থারা তাঁকে প্রায় প্রাধান্য দিতে ছাড়্‌তো না—তাঁর ভদ্দর কায়দার, শিষ্টাচারের প্রশংসায় লক্ষমুখ হতো সকলেই! সবাই শোভাকে ঈর্ষা করতো—কারণ তার প্রতি ডাক্তারের আকর্ষণ সকলেরই চোখে পড়েছিল। শোভা প্রতিদিনই বিরক্তভাব নিয়ে বাড়ী ফিরতো—প্রতিদিন মনে মনে সঙ্কল্প করতো যে, সে আর বাড়ীর বা'র হ'বে না—এবার থেকে সে বাড়ীতেই থাক্‌বে রোজ। কিন্তু দিনের শেষে যেই সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আস্‌তো, অম্‌নি সে কারখানার দিকে বেরিয়ে পড়্‌তো—পূর্ব্ব দিনের সঙ্কল্প তার আর টিঁক্‌তো না। আবার প্রতি সন্ধ্যায় সেই বৈচিত্র্যহীন আমোদ-প্রমোদ গল্প-গুজবের পালা। সমস্ত শীতকাল শোভার এই রকম ভাবেই কাট্‌লো।

শোভা নিজেকে পড়াশুনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাইল। নিত্য নতুন বই, মাসিক-পত্রিকার অর্ডার দিতে লাগ্‌লো সে। নিজের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চুপ্‌টি করে' একলা একলা বসে সে বই পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে সে পড়্‌তো। বারান্দার ঘড়িতে ঢং ঢং করে' দু'টা তিনটে বেজে যেতো—বহু ক্ষণ ধরে' পড়ার দরুণ তার কপালের দু'পাশের শিরাগুলি ব্যথায় টন্‌টন্ কর্‌তে থাক্‌তো। সে শয্যার উপর উঠে বসে' ভাব্‌তো—কি করি? কোথায় যাই? তা'র অভিশপ্ত অশান্ত হৃদয়ের এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব দেবে কে? এর কত জবাবই তো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনটাই যথার্থ জবাব বলে' মনে হয় না।...এক-একবার শোভার মনে হ'ত দশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে' দিতে পার্‌লেই বুঝি বা তার জীবন সার্থক সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। আর্ত্ত মানবের সেবা, দুঃখীর বেদনাশ্রু মুছিয়ে দেওয়া, অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানালোকের আস্বাদ দেওয়া কত পবিত্র, কত মহৎ, কত সুন্দর কাজ! একেই সে জীবনের মহাব্রত বলে' গ্রহণ কর্‌বে। কিন্তু এই সব লোকদের সম্বন্ধে তা'র জ্ঞান কতটুকু!—কী বা এদের সঙ্গে তা'র পরিচয়! সে এদের সেবা কর্‌বে কি করে' তবে? দুঃখী দরিদ্র পীড়িত মানব—যাদের সে সেবা কর্‌তে চায়—তা'রা তো তা'র কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তা'দের কোনও সুখ, কোনও ব্যথাই তো তা'র হৃদয়-তন্ত্রীতে তেমন করে' আঘাত করে না! তাদের জীর্ণ কুটীরের বদ্ধ দূষিত বাতাসে তা'র যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়! কর্ম্ম-ক্লান্ত সন্ধ্যায় গৃহ-প্রত্যাগত কৃষকদের মাত্‌লামি-ভরা গল্প-গুজব, রহস্যালাপ—তা'দের অশ্রাব্য গালিগালাজ, কলহ-বিবাদ আমোদ-প্রমোদ সবই তা'র কাছে অসহ্য। ঐ গরীব লোকদের নোংরা ছেলেমেয়েদের ছুঁতেও তা'র ঘৃণা বোধ হয়। যা নোংরা ওদের কাপড়চোপড়! ঐ নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সুখ-দুঃখ অসুখ-বিসুখের কাহিনী শুন্‌বার ধৈর্য্য বা আগ্রহ তার নেই। দারুণ শীতে বাইরের তুষারপাতের মধ্য দিয়ে অনেকখানি পথ হেঁটে গিয়ে দরিদ্রের আলো-বাতাসহীন কুটীরে বসে', তা'দের ধূলি-মলিন অপরিষ্কার ছেলেমেয়েদের পড়ানো—শিক্ষা দেওয়া—সেও যে তা'র পক্ষে অসহ্য! সে নেবে গরীব কৃষকদের

ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার, আর তার পিসিমা এদেরই পীড়ন করে' জরিমানা করে' এদের পৈশাচিক প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়ে অর্থলাভ করবার চেষ্টা করবেন। এও যে মস্ত বড় একটা প্রহসন—এক অসহ্য পরিহাস! সময়ে সময়ে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন, সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলন—কত সংকার্য্যেরই কল্পনা-জল্পনা চলে, এ সব আর কিছুই নয়—ধনীর নিত্য অশান্ত বিবেককে প্রবোধ দেবার চেষ্টা মাত্র! তাঁ'দের এত অপর্য্যাপ্ত আছে তবু তাঁরা কৃষকদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন—এ যেন কেমন ভাল দেখায় না। এতে তাঁদের হয়তো একটু লজ্জাও বোধ হয়। ডাক্তারের হৃদয়বান্ পুরুষ বলে' মেথেমহলে খ্যাতি। কারণ তিনি নিজ অর্থে একটি বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করে' দিয়েছেন—একটি পুরোণো ভাঙ্গা বাড়ীর ইট-কাঠ দিয়ে একটি বাড়ী তিনি করে' দিয়েছেন স্কুলের জন্যে। এতে যে তাঁর কিছু অর্থব্যয় হয় নি তা' নয়। যেদিন সেই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হ'ল সেদিন দাতার দীর্ঘজীবন কামনা করে' যথারীতি প্রার্থনাও করা হ'ল। কিন্তু দান কি তাঁর যথার্থই নিঃস্বার্থ? তিনি কি এই দুঃখী-দরিদ্রদের জন্য তাঁর যথাসর্ব্বস্ব—কারখানার মূল্যবান্ অংশগুলি—দান করে' দিতে পারেন? তাঁর কি মনে হয়েছে এই কৃষকেরাও তাঁরই মত মানুষ—তাদেরও প্রয়োজন তাঁর মতই—তা'দের জন্মগত অধিকারে দাবী আছে—উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে? এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য কতটুকু? তা' তাদের মনুষ্যত্বের দাবী মেটাতে পারবে কি?...শোভার সারা মন নিজের উপর ও অন্যান্য সকলের উপর বিরক্তিতে ভরে' গেল। সে একখানা বই নিয়ে পড়বার বৃথা চেষ্টা করলো। আবার তখনই সেখানা রেখে দিয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলো—সে কি করবে? কি হ'বে? ডাক্তার হবে? সে হ'তে গেলে তাকে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে? তা'ছাড়া রোগ ও মড়ার প্রতি তার অসীম বিতৃষ্ণা। সে যদি কারিগর, বিচারক, জাহাজের কাপ্তেন অথবা বৈজ্ঞানিক হ'তে পারতো বেশ হ'ত। সে এমন কিছু একটা করতে চায় যাতে সে তার সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ করতে পারে—তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। সারাদিন কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে—নিশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও যেন তার থাকবে না। রাত্রিতে পরিশ্রমক্লান্ত অবসন্ন দেহ তার গভীর নিদ্রায় এলিয়ে পড়বে। সে তার জীবনকে এমন একটি কাজে উৎসর্গ করতে চায় যাতে সে এক-জন মহীয়সী নারী বলে' পরিগণিত হবে—দেশের ও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠবে—খ্যাতি তার ছড়িয়ে পড়বে দেশ বিদেশে। তার যশ দেশের যত গণ্যমান্য কৃতী সন্তানদের আকৃষ্ট করবে তার প্রতি—সকলে তার সঙ্গলাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে সে চায় ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে, সন্তানের মা হ'তে। তাকেই কেন্দ্র করে' গড়ে উঠবে একটি সুন্দর পরিবার—এই তার স্বপ্ন। কিন্তু এর জন্যে কি সাধনা তাকে করতে হ'বে? কোথায় কি করে' তা'র প্রকৃত কাজটি খুঁজে নেবে সে?—আরম্ভ করবে তার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করতে?

বিশেষ কোনও একটি পর্ব্বের সময় এক রবিবারে খুব ভোরে শোভার পিসিমা তার ঘরে ঢুকলেন—মন্দিরে যাবার জন্যে তার ছাতাটি নিতে। শোভা তখন বিছানার উপর বসে' নিজের মাথাটি দু'হাতে ধরে' গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঘরের মধ্যে পিসিমার কণ্ঠস্বর শুনে চকিত হয়ে উঠলো। পিসিমা অনুযোগ করছিলেন, সে মন্দিরে যায় না

বলে'। তাঁর ভয় পাছে লোকে মনে করে তাঁর ভাইঝির ধর্ম্মে মন নেই। শোভা পিসিমার কথার কোনও জবাব দিল না দেখে তিনি সংশয়ক্লিষ্টচিত্তে তার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে' পড়ে' বল্‌তে লাগ্‌লেন—"শোভা, তোর কি হয়েছে আমায় বল্‌। আমার কাছে কিছু লুকোস্‌ নি। তোর এখানে একটুও ভালো লাগ্‌ছে না, না? সত্যি বল্‌তো?"

শোভা উত্তরে বল্লো—"সত্যি, পিসিমা, এখানে আমার বড় অসহ্য বোধ হচ্ছে।"

—"লক্ষ্মী মা আমার! ডাক্তার তোকে অত্যন্ত ভালবাসেন—প্রায় পূজো করেন বল্লেই হয়। তবু তাঁকে তোর কেন পছন্দ হয় না বলবি না আমায়?"

শোভা বিরক্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—"বাপ রে, যা' লোক উনি! ওঁর তো একটা কথাও শোনা যায় না। সমস্তক্ষণ বোবার মত চুপ্‌ করে' বসেই থাকেন।

—"উনি একটু লাজুক মা! ওঁর ভয় হয়, পাছে ওঁকে তুই প্রত্যাখান করিস্‌।"

…পিসিমা চলে যাবার পরে শোভা বহুক্ষণ আনমনা হয়ে ঘরের মাঝখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। সে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না সে কি করবে—আবার বিছানায় শুতে যাবে, না না'বার-খাবার জন্যে প্রস্তুত হবে। শয্যা তার কাছে অসহ্য বোধ হ'ল। সাম্‌নেই খোলা জানালা। সেখান থেকে তাকালেই চোখে পড়ে পত্রহীন শীতশীর্ণ গাছগুলির নগ্নমূর্ত্তি, ধূসরাভ পর্ব্বতমালা, শীতাতুর কাকগুলির কুৎসিত চেহারা, আর ঠাকুরদাদার ভবিষ্যৎ খাদ্যের উপাদান—মুরগী শাবকগুলি।

…অনেক চিন্তার পরে শোভা মনে মনে স্থির কর্‌লো সে বিয়েই কর্‌বে।…

তিন

একদিন সন্ধ্যের সময় শোভা বাগানে একটি বেঞ্চের উপর বসে' একটি মজুরের কাজ দেখ্‌ছিল। মজুরটি একটি তরুণ সৈনিক। সে নতুন কাজে লেগেছে। সে এখানকার লোক নয়, অথবা কাছাকাছি কোনও গ্রামেরও লোক নয়। শোভার হুকুমেই বাগানে রাস্তা তৈরী কর্‌তে সে নিযুক্ত হয়েছিল। কোদাল দিয়ে ঘাসের চাঙড়াগুলো কেটে কেটে তুলে সে একটা ঠেলা গাড়ীর উপর সেগুলো স্তূপাকারে কর্‌ছিল। শোভা তাকে প্রশ্ন কর্‌লো—"তুমি এর আগে কোথায় কাজ কর্‌তে? এখন কোথায় যাবে? বাড়ী?"

"না, আমার কোনও বাড়ী নেই। "গাড়োয়ালে সৈনিক বিভাগে কাজ নেবার আগে আমি মার সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাক্‌তাম। আমার মাই ছিলেন সে বাড়ীর কর্ত্রী—বাড়ীর লোকদের সব বিষয়ে তাঁর উপরেই নির্ভর কর্‌তে হ'ত। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সে বাড়ীতে আমারও আদর ছিল। তারপর আমি সৈনিক বিভাগে কাজ নিয়ে যাবার কিছুদিন পরে একদিন চিঠিতে জান্‌তে পার্‌লাম যে আমার বৈধ কোন অধিকার সেখানে নেই—গৃহকর্ত্তা আমার নিজের বাবা নয়।

—"তোমার নিজের বাবা বেঁচে আছেন?"

—"জানি না।"

ঠিক সেই সময় পিসিমা জানালার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সৈনিককে উদ্দেশ্য করে' বল্লেন—"যাও বাছা, তোমার গল্প রান্নাঘরে গিয়ে বল গে।"…

তারপর প্রতিদিনের মত আবার সেই সান্ধ্য-ভোজন, বইপড়া, বিনিদ্র রজনীযাপন—সেই একই চিরন্তন বিষয়ে অন্তহীন চিন্তা।…স্বর্গ

উঠ্‌লো। ঝি বারান্দায় কাজে ব্যস্ত। শোভা তখনও ঘুমোয় নি। বই নিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। সে ঠেলা গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে বুঝ্‌তে পার্‌লো নতুন লোকটি বাগানে কাজ আরম্ভ করেছে।…শোভা একখানা বই নিয়ে খোলা জানালায় বস্‌লো—বসে' বসে' দেখ্‌ছিল সৈনিকটি কেমন করে' তা'র জন্তে রাস্তা তৈরী কর্‌ছে। বড় ভালো লাগ্‌ছিল তার এই কাজ দেখ্‌তে। রাস্তাগুলি কেমন সুন্দর সমান করে' চৌরস কর্‌ছিল সে। দূর থেকে সেগুলো একখণ্ড মসৃণ চাম্‌ড়ার পট্টির মত দেখাচ্ছিল। শোভা ভাবছিল হল্‌দে বালি এই রাস্তাগুলিতে বিছিয়ে দিলে কী সুন্দর দেখাবে! …পাঁচটার সময় পিসিমা একখানা গোলাপী রংএর র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ির উপর দু'-তিনমিনিট কোনও কথা না বলে' দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর সৈনিকের উদ্দেশ্যে বল্লেন—"এই নাও তোমার মজুরী, চুপচাপ চলে' যাও। আমি আমার বাড়ীতে কোনও রকমে তোমায় রাখ্‌তে পারি না।"

এক অসহ্য ক্রোধের গুরুভার পাষাণের মত শোভার বুকটার উপর চেপে বস্‌লো। পিসিমার উপর তার ক্রোধের ও ঘৃণার সীমা রইলো না। তাঁর প্রতি বিরাগে, ঘৃণায়, দুঃখে তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো! কিন্তু তবু উপায় কি? সে কি কর্‌তে পারে? পিসিমার মুখ বন্ধ করবে? তাঁর সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে রূঢ়াচরণ করবে? তা' করে' লাভ কি হবে? যদি সে তার সঙ্গে বিবাদ করে' তাঁর কাছ থেকে চলে যায়, কিংবা তাঁর ও ঠাকুরদা'র স্বভাব শুধরাতেও সক্ষম হয়, তাতেই বা কি ফল হবে? এ যেন একটী অনন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের একটি মূষিক বা সর্পকে বিনাশ করা!

দাসী এসে শোভাকে নমস্কার করে' আরাম কেদারাগুলো নিয়ে গেল ধূলো ঝাড়তে। শোভা বিরক্ত হয়ে বল্লে—"এই বুঝি তোমার ঝাড়পোঁছ করবার সময়? যাও।" পরিচারিকা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল—বুঝতেই পারলো না তাকে কি কর্‌তে বলা হ'ল। সে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলটা গুছাতে আরম্ভ করলো। শোভা চীৎকার করে উঠলো—"যাও, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। যাও বলছি।" সে যেন সহ্য শক্তির সীমা অতিক্রম করতে বসেছে। তার এরকম অসহনীয় মনোভাব আর কখনও হয় নি।

ভয়ে দাসীর হাত থেকে সোনার ঘড়িটা গালিচার উপরে পড়ে গেল। শোভা অমনি লাফিয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো—"যাও, বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। একে দূর করে' দাও—এ আমায় জ্বালিয়ে মারলো।" সে ঝিয়ের পিছন পিছন বারান্দা পর্য্যন্ত দৌড়ে গেল—মাটিতে সজোরে পদাঘাত করে' বল্‌তে লাগলো—"যাও, শীগ্‌গির বলছি। মার ওকে। লাগাও চাবুক।"

তারপর হঠাৎ সে প্রকৃতিস্থ হ'ল। সেই অবস্থায় চটি পায়ে, কোন একটা ভাল কাপড় না পরেই দৌড়ে সেই চির-পরিচিত খাতটিতে গিয়ে গাছের আড়ালে নিজেকে সে লুকিয়ে রাখলো—সে যেন কাউকে দেখতে না পায়, তাকেও যেন কেউ দেখতে না পায়। সেখানে ঘাসের উপর খানিকক্ষণ অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলো সে। চোখে তার অশ্রু নেই, মনেও তার ভয়ের লেশ নেই। আয়ত চক্ষু দু'টি তার সুদূর আকাশের অনন্ত নীলিমায় সন্নিবদ্ধ। সেই নিদারুণ উত্তেজনার অবসানে সে বুঝতে পারলো কি একটা যেন ঘটে গেল,

যা' তা'র জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে—সে আর কখনই তা' ভুলতে পারবে না বা এর জন্তে নিজেকে সে জীবনে কখনও ক্ষমাও করতে পারবে না। সে মনে মনে স্থির করলো এখন আর তার জীবনের অমূল্য দিনগুলিকে নষ্ট হ'তে দিবে না—জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার সময় এসেছে তার, নইলে এর আর শেষ পাওয়া যাবে না। এরকমভাবে জীবন কাটানো তার আর চলবে না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ডাক্তার খাতের পাশ দিয়ে গাড়ী করে' বাড়ী ফিরছিলেন। শোভা তাকে দেখতে পেলো। তাঁকে দেখেই সে আজ স্থির করে' ফেল্লে সে এক নতুন জীবন আরম্ভ করবে—যে কোরেই হোক্, তাকে এ করতেই হবে। এই সঙ্কল্প করার পর মন তার শান্ত হ'ল। ডাক্তারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে' শোভা তার সঙ্কল্পে দৃঢ়তা আনবার জন্যই যেন আপন-মনে বল্লে—ডাক্তার বেশ লোকটি! এঁকে বিয়ে করলে জীবন আমাদের বেশ একরকম কেটে যাবে।"···সে বাড়ী ফিরে এল। সে নিজের ঘরে পোষাক পরছিল, এমন সময় পিসিমা ঘরে ঢুকে বল্লেন—"ঝিটা তোমাকে জ্বালাতন করছিল। আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার মা তাকে খুব মেরেছে, সে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে এসেছে।" শোভা এক নিশ্বাসে বলে গেল—"তাকে থাকতে দাও। দেখ, পিসিমা, আমি ডাক্তারকে বিয়ে করবো। এ বিষয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলো···আমি পারবো না কিছু তাকে বল্‌তে।

তারপর সে আবার মাঠে ঘুরতে গেল। উদ্দেশ্যহীনভাবে এধারে ওধারে খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে সে মনে মনে স্থির করলো বিয়ের পর সে কি করবে। সে সব গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে—কৃষকদের মধ্যে ঔষধ-পথ্য বিতরণ করবে, রোগের সময় তাদের শুশ্রূষা করে' ভাল করে' তুলবে—স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াবে—যা' তার পরিচিত অন্যান্য মেয়েরা করে' থাকে, সেও তাই করবে। এই দুর্নিবার অসন্তোষ—নিজের প্রতি ও অন্যান্য সকলের প্রতি অপরিসীম বিরক্তি—অতীতের পর্ব্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তি এই সব নিয়েই তার বাস্তব জীবন। একেই তাকে সত্য বলে' মেনে নিতে হবে। এই তার নিয়তি! এর বেশী আর কী আশা করতে পারে সে? এর চেয়ে ভাল আর কী থাকতেই বা পারে? সুন্দর প্রকৃতি, জীবনের মধুর স্বপ্ন, সুধাময় সঙ্গীত যে আনন্দের যে মাধুর্য্যের আস্বাদ দেয়, বাস্তব জীবনে তা' মেলে কোথায়? বাস্তবের কঠোরতায় এসবই সুখ-স্বপ্নের মায়ার মত কোথায় মিলিয়ে যায়! যতদূর সে দেখেছে, তার থেকে তার এই বিশ্বাসই জন্মেছে যে, সত্যিকারের সুখ বাস্তব জীবনের অতীত।···কাজেই সে নিজের জীবনকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে—নিজের সত্তাকে সে ডুবিয়ে দেবে এই দিগন্ত-প্রসারিত সজীব সুষমায় ভরা চির-নির্ব্বিকার প্রান্তরের অসীমতার মধ্যে, এর বিচিত্র-কুসুম-লাবণ্য, সুদূর দিগচক্রবালরেখার অশেষ রহস্য, এর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ঠেলা-ঠেলি—সবই সে গ্রহণ করে' নেবে নিজ জীবনে। তা' হ'লে হয় তো তার জীবনের চরম কল্যাণ সাধিত হবে। কে বলতে পারে?···

একমাস পরে শোভা কারখানার ডাক্তারের নব-পরিণীতা হয়ে তার নতুন জীবন আরম্ভ করলো। *

---

* শেখভের 'এ্যাট হোম' গল্প অবলম্বনে।

প্রতিশোধ

শ্রী জ্যোৎস্না ঘোষ

জীর্ণ শ্রীহীন ভাঙ্গা বাড়িখানা প্রথম দৃষ্টির সঙ্গেই দর্শককে যেমন তাহার অধিকারীর দুরবস্থার কথা জানাইয়া দেয়, তেমনই তাহার বিশালত্ব, বিগত যৌবনা নারীর সৌন্দর্য্যের মত, লুপ্তপ্রায় শিল্পকলা বিকাশের ক্ষীণ রেখা, পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কথাও বলিয়া দেয়। সেই দিকে চাহিয়া কালপ্রবাহে মানব অদৃষ্টের বিচিত্র গতির কথা আপনা হইতেই অন্তরে জাগিয়া উঠে। সুধাধবলিত বিরাট্ সৌধের মেঘচুম্বি উচ্চ শীর্ষ যেন ব্যথায় ম্রিয়মান হইয়াই অনেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! রৌদ্র বৃষ্টির অবিরাম স্পর্শে দেহ ম্লান, বিবর্ণ। ছোট বড় অনেকগুলা গাছ ইটের মধ্য দিয়া মাথা বাহির করিয়াছে! চারিদিকে অনেকটা স্থান। পূর্ব্বে বুঝি এখানে উদ্যান ছিল। এখনও অতি পুরাতন শীর্ণ পত্র-পুষ্পহীন দুই-একটা ফুলের গাছ দেখিলে সে কথা বোঝা যায়। এখন শুধু আগাছা ও কাঁটার ঝোপে পূর্ণ। সম্মুখস্থ পুষ্করিণীরও তেমনই শোচনীয় অবস্থা। এই বাড়িই ছিল একদিন এ দেশের ভূস্বামী ভবন। তখন বাড়িরও ছিল যেমন অবস্থা, অধিকারীদেরও সৌভাগ্য-সূর্য্য ছিল তেমনই প্রচণ্ড তেজে অদৃষ্ট গগনে অবস্থিত। এই জনহীন ভাঙ্গাবাড়ি, যা' দেখিলেই ভয় হয়, এ দেখিলে সে কথা কি কেহ ভাবিতে পারে? একদিন এই গৃহ অগণিত জনপূর্ণ সতত উৎসব-কলরোল-মুখর ছিল, আজিকার নিথর নীরবতা দেখিলে কি ক্ষণেকের জন্য সে কথা অনুভব করা যায়? বেশী নয়, মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দীর্ঘ শ্রীভ্রষ্ট লুপ্ত সৌন্দর্য্য জনশূন্য গৃহই স্বপ ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্যের উৎস বক্ষে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর সহসা একদিন তাহার অধিকারীর সহিত তাহারও ভাগ্যের কঠিন পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেখিতে দেখিতে কয়দিনের মধ্যে এই রূপান্তর। কোথায় বা গেল সেই জনবর্গ, কোথায় বা রহিল সেই উৎসব কোলাহল? আর কোন্‌খানেই বা বিলীন হইল, সেই গৃহের বিচিত্র সজ্জারাশি। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেলেন বা সেই ঐশ্বর্য্য মদগর্ব্বিত অধিস্বামী তাহার।

এই রূপান্তর ঘটিল এখনকার অধিকারী কমলেশের পিতা রমাপতির সময়ে তাহারই কার্য্যের ফলে। রায়বংশের জমিদারী বহু পুরাতন। খ্যাতি-প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য্যও ছিল দেশ-বিশ্রুত। ইঁহাদের দানশীলতা পরদুঃখকাতরতার কথাও যেমন শুনা যাইত, সেই সঙ্গে একটা মৃদু অখ্যাতির গুঞ্জনও মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হইত। সেটা হইতেছে তাঁহাদের জেদী স্বভাব; আর তাহারই জন্য সময় বিশেষে লোক-জনের উপর তাঁহারা যে ব্যবহার করিতেন, তাহারই আলোচনা। এ বংশের সকলেই অত্যন্ত জেদী। যা'ধরিতেন,তাহা না হইলে কেহ শান্তি পাইতেন না; ফলে এজন্য সময় সময় অনেক নীতিবিগর্হিত কার্য্যেও তাহারা পশ্চাদপদ হন নাই! ধারাবাহিকরূপে এ প্রকৃতি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিলেও চরম হইয়া দেখা দিল রমাপতিতে এবং সর্ব্বনাশ হইল ত তাহাতেই! কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি।

পিতৃ-পিতামহগণের মত জেদী স্বভাব

হইলেও তাঁহাদের প্রকৃতিগত অন্য অনেক সদ্‌গুণে রমাপতি বঞ্চিত ছিল। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে ও জিনিষটা থাকিলেও কতকটা সহনীয় ছিল, রমাপতির সময় অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। অল্পবয়সে পিতৃহীন রমাপতির সব বিষয়েই জেদের দরুণ একটা অশান্তি চতুর্দ্দিকে লাগিয়াই ছিল, তথাপি কোন বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় নাই। প্রজা হইতে কর্ম্মচারী বৃদ্ধ সকলেই তখন শান্তির পক্ষপাতী ছিল, সহসা কোন বিপ্লব বাধাইয়া তুলিতে কেহ চাহিত না। তাহারা না চাহিলেও রমাপতি জোর করিয়াই সেইটা করিয়া তুলিল। মৃগাঙ্ক চৌধুরী ছিল রমাপতির বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা। বংশ-মর্য্যাদায়, অর্থে, বিদ্যাবুদ্ধি, শারীরিক বলে সব বিষয়েই মৃগাঙ্ক সে অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ ছিল। ভূসম্পত্তি না থাকিলেও তাহার ঐশ্বর্য্যের অপ্রতুলতা ছিল না। মৃগাঙ্কের পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠা ভগিনী সুনেত্রা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। নিজে সে বিবাহ করে নাই, ভগিনীটীর বিবাহের জন্য মনোমত পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিল। সুনেত্রা অপূর্ব্ব সুন্দরী। কি করিয়া একদিন যেন রমাপতি তাহাকে দেখিল। রমাপতি তখন বিবাহিত। কমলেশ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি সুনেত্রাকে দেখিয়া রমাপতি মুগ্ধ বিচলিত হইল। কিছুক্ষণ সে নীরবে ভাবিল, তাহার পর ডাকিয়া পাঠাইল মৃগাঙ্ককে। মৃগাঙ্ক তাহারই স্বজাতি। সুনেত্রাকে তাহার পাইবার পক্ষে কিছু বাধা আছে বলিয়া মনে হইল না।

প্রস্তাব শুনিয়া মৃগাঙ্ক কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আপনি কি বলছেন? এ অসম্ভব।

—অসম্ভব কিসে?

—অসম্ভব বই কি। আপনি বিবাহিত।

—তারপর—

—তারপর কি?

মৃগাঙ্ক কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব সহজ করিয়া লইয়া বলিল, কি তাতো আপনি জানেন; আমার মুখ থেকে আর নাই বা শুনলেন।

—তোমার বোনের জন্য আমার মত পাত্র পাবে মনে কর?

কথাটা শেষ হইতে না দিয়াই দৃঢ়স্বরে মৃগাঙ্ক কহিল, সতীনের উপর আমার বোন্‌কে আমি কখন দেব না এ নিশ্চয়।

অসহ্য রোষে রমাপতি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর ক্রোধ-বিকৃত-কণ্ঠে বলিল, আমায় তুমি এত বড় কথা বলতে সাহস কর?

—সত্যি কথা বলতে ভয় আমি কখনও পাই না, তা'কি আপনি জানেন না?

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া রমাপতি বলিল, আচ্ছা, এ সত্য কথা বলার পুরস্কার তুমি খুব শীগ্‌গির পাবে।

নীরবে যুক্তকর ললাটে তুলিয়া মৃগাঙ্ক কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

মৃগাঙ্কের সত্যভাষণ অপরাধের শাস্তি হইতে বিলম্ব হইল না। সেও এজন্য প্রস্তুত হইয়াই বোন্‌টীকে সেখান হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিল। তাহারই দুই-তিনদিন পর প্রভাতে সদ্য নিদ্রা ভঙ্গে সে বাহিরে আসিতেই স্থানীয় পুলিশ ইনস্‌পেক্টর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মৃগাঙ্ক বিস্মিত হইল না, চাহিয়া দেখিল অগণ্য পুলিশ তাহার বাড়ীখানা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মানুষ দূরে থাক, একটা পাখী পর্য্যন্ত তাহাদের অজ্ঞাতে পলাইতে পারিবে না। সহজ কণ্ঠে ইনস্‌পেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া মৃগাঙ্ক বলিল, কি অপরাধ আমার?

গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, খুন!

মৃগাঙ্ক এতটা আশা করে নাই। একটু বিচলিত হইয়া বলিল, কা'কে খুন করেছি জান্তে পা'ব না ?

—ওঃ, দেখান হচ্ছে, কিছুই জানেন না যেন! আমার দরওয়ান লালসিংকে খুন করেছে কে ?

মৃগাঙ্ক চাহিয়া দেখিল জমিদার রমাপতি স্বয়ং। কোন কথা না বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল। পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের আদেশে একজন তাহার হাতে লৌহবলয় পরাইয়া দিল। বাড়ির মধ্যে সন্ধান চলিতেছিল, যদি কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলে সেইদিকেই ব্যস্ত। রমাপতি সরিয়া আসিয়া মৃগাঙ্কের একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, কি রকম ধাক্কাটা দেখ্‌ছ তো, হয় ফাঁসী, নয় দ্বীপান্তর, তখন তোমার বোন্‌কে কে বাঁচাবে ?

—ভগবান!

ভগবান ? বটে! তা' ভগবান তোমায় কেন বাঁচাচ্ছেন না ? স'ত্যি যে তুমি খুন কর নি, এর বিন্দু-বিসর্গও জান না, তোমার সর্ব্বদর্শী ভগবান তা' জানেন না কি ?

তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে মৃগাঙ্ক শুধু তাহার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিস্পর্শে রমাপতির সর্ব্বদেহ বারেক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পুলিশবাহিনী তখনও বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হয় নাই, রমাপতি এদিক-ওদিক চাহিয়া ত্রস্তকণ্ঠে বলিল, এখনও যদি আমার কথার বাধ্য হও, তা' হ'লে এ মামলা আমি তুলে নেব। ভেবে দেখ, কিছু অন্যায় কথা আমি বলি নি, তোমার বোন্‌কে বিবাহ কর্ত্তেই চেয়েছি। বুঝে দেখ, কেন মরবে ? এই বয়স, তোমার জীবনে কি মমতা নেই ? জীবনের মমতা কার না থাকে ? সর্ব্বস্ব হারিয়ে, জীবনাধিক প্রিয়বস্তুর বিয়োগ-ব্যথা সয়েও কি কেউ মরতে চায় ? দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে থেকেও মানুষ জীবনে স্পৃহাহীন হ'তে পারে না। লোকে মুখে বলে একে হারিয়ে বাঁচব না, ওর অদর্শনে মরে' যাব, কিন্তু তারা যখন সত্যই চলে যায়, তখন তো কই কেউ সেই শোকে জীবন বিসর্জ্জন দেয় না। শোক জ্বালা সইতে না পেরে কেউ জীবন হারিয়েছে, কেউ আত্মহত্যা করেছে, একথা কখনও শোনা গিয়েছে কি ? নিজ জীবন হ'তে প্রিয় বোধ হয় কিছুই নয়। ঝোঁকের মাথায় একথা অনেকেই অস্বীকার করলেও ভেবে দেখ্‌লে কিন্তু বুঝ্‌বে এটা অতি সত্য কথা।

রমাপতির কথায় মৃগাঙ্ক ক্ষণতরে বিচলিত হইল। যে অপরাধ তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহার পরিণাম যে কি, সে তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছিল, তাই মনটা চকিতে লুব্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষণমধ্যে সে ভাব সে দমন করিয়া লইল।

ভগিনীর বিনিময়ে জীবন লাভ ? নিষ্ঠুর অত্যাচারী হীনচরিত্র রমাপতির হাতে কমলেশের জননীর উৎপীড়ন তো কাহারও অজ্ঞাত নয়, সুনেত্রা তাহারই অংশভাগিনী হইবে তাহারই জন্য। শৈশবে পিতামাতা হারাইয়া একান্ত নির্ভয়ে যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই দাদাই তাহার জীবনব্যাপী তুষানলে পুড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে! কথাটা মনে করিতেই নিবিড় কুণ্ঠা তাহার অন্তর ভরাইয়া তুলিল। রমাপতির স্থির দৃষ্টি তাহারই মুখে আবদ্ধ ছিল। সে বলিল, কি ভাবছ এত, রাজি হও। এখনি আমি তোমায় ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

—কেন মিছে বকছ, তোমার কথা আমি শুনব না।

—তবে মর।

—অদৃষ্টে যদি তাই থাকে হবে।

—বেশ!

পুলিশ বাহির হইয়া আসিল—অনেক দ্রব্য-সম্ভার লইয়া। রক্তমাখা বড় ছোরা, তাহাতে লালসিং হত হইয়াছে। কমলেশের জননীর অলঙ্কারের বাক্স, তাহার লোভে মৃগাঙ্ক তাহাকে হত্যা করিয়াছে। হত্যার আর কি প্রমাণ চাই! পুলিশ মৃগাঙ্ককে লইয়া চলিল। আদালতে গিয়া মৃগাঙ্ক তাহার অপরাধের সমস্ত বিবরণ শুনিল। জমিদার-পত্নী গিয়াছিলেন ভগিনীর বাড়ি দুই-একদিনের জন্য। সেস্থান হইতে কোথায় নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠান। বিশ্বাসী দ্বাররক্ষী লালসিং বাক্স লইয়া রওনা হয়। সে সময় জমিদার-পত্নীর পত্র আসে, এবং লালসিংকে দিয়া অলকার পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, সে সময় রমাপতির নিকট শুধু মৃগাঙ্ক উপস্থিত ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে লালসিং যায়। তাহার কিছু পরই তাহার রক্তাক্ত জীবনহীন দেহ নদীতীরে দেখা যায়। লালসিং গহনা লইয়া যাইবে, একথা মৃগাঙ্ক ভিন্ন কেহ জানিত না বলিয়াই সন্দেহক্রমে রমাপতি তাহার কথাই পুলিসে জানায়। তারপর হত্যার সকল প্রমাণই তো তাহার ঘরে পাওয়া গিয়াছে।

মৃগাঙ্ক সমস্ত কথা শুনিয়া শুধু অল্প হাসিল, কিছু বলিল না। সাক্ষীও কয়জন আসিল। যাহাদের মৃগাঙ্ক ইহজন্মে কখনও দেখে নাই! তাহাদের কেহ বলিল, লালসিং যেদিন হত হয়, সেদিন সন্ধ্যায় মৃগাঙ্ককে তাহার অনুসরণ করিতে সে দেখিয়াছে। কেহ বলিল, লালসিংয়ের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেখানে গিয়া শোনিতাক্ত শানিত অস্ত্র হাতে মৃগাঙ্ককে চলিয়া যাইতে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। কেহ বলিল, সে রাত্রে বাড়ি ফিরিতে পথে মৃগাঙ্ক ত্রস্তভাবে ছুটিয়া পলাইতেছে তাহার চোখে পড়িয়াছে, ইত্যাদি।

মৃগাঙ্ক বিচারকের প্রশ্নে শুধু একটী উত্তর দিল, সে নির্দ্দোষ। এ ঘটনার কিছুই তাহার জানা নাই। আর কোন কথাই বলিল না। এমন সব প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর বিচারপতি যে এ সামান্য কথা বিশ্বাস করিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। কয়দিন পর তিনি আদেশ দিলেন মৃগাঙ্ক অপরাধী। শাস্তি প্রাণদণ্ড। মৃগাঙ্ক এ সংবাদেও মৃদু হাসিল, রমাপতি সোল্লাসে বাড়ি ফিরিল।

সুনেত্রা ছিল মাতুলালয়ে। ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পর আপনিই আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ছুটিল মাতুলের কাছে। মাতুল রমেন্দ্রনাথও খবর পাইয়াছিলেন। সুনেত্রার কথায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বরাবর মৃগাঙ্ক যেখানে ছিল, সেই সহরে আসিলেন। মৃগাঙ্কের অর্থাভাব ছিল না, মাতুলের চেষ্টা-যত্নে প্রথম হাইকোর্ট, তাহার পর বিলাতে আপীল হইল, উভয় পক্ষের জলের মত অর্থব্যয় হইতে লাগিল। মৃগাঙ্কের যথাসর্ব্বস্ব শেষ হইয়া মাতুলের সম্পত্তিতে হাত পড়িল। রমাপতিও গজভুক্ত কপিত্থের মত অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কয় বৎসর পর বিলাতের বিচারে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তরের আদেশ হইল, তখন মাতুল ও মৃগাঙ্কের সম্পত্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। রমাপতিও সম্পূর্ণ নিঃস্ব। মৃগাঙ্ক আন্দামানে যাত্রার পূর্ব্বে শুনিয়া গেল সুনেত্রা আত্মহত্যা করিয়া তাহার চিন্তা হইতে ভ্রাতাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘ বিংশতি বৎসর পরের কথা।

রিক্ত সর্ব্বহারা রমাপতি কয় বৎসর নানা যন্ত্রনা সহ্য করিয়া পরলোকে গিয়াছে। পত্নী বহু পূর্ব্বেই এখানকার দেনা-পাওনা মিটাইয়া গিয়াছিলেন। একমাত্র কমলেশ শুধু বৃহৎ বাড়িখানার একপার্শ্বে স্ত্রী-পুত্র লইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছিল। সংসারে পত্নী ও শিশু পুত্রটি ভিন্ন তাহার আপন বলিতে কেহ

নাই। সম্বলের মধ্যে এই ভগ্নপ্রায় বাড়িখানা। জমিদার পুত্র সে। শিক্ষা তাই অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।—যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। বিপুল বংশগৌরব, কাহারও দ্বারে হাত পাতাও চলে না। বাটিস্থ আসবাব-পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দরজা-জানালাগুলা পর্যন্ত খুলিয়া বিক্রয় করিয়া সে কোনরূপে দিন কাটাইতে ছিল। তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতের চিন্তায় কমলেশ সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল। পত্নী নীরাও রুগ্ন। তাহাকে বিনা চিকিৎসায় রাখা আর উচিৎ নয়। কমলেশ কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রোগজীর্ণ দেহখানা কোনমতে টানিয়া নীরা কমলেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলেশ উদাস নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। একবার ব্যথিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া নীরা বলিল, কি কষ্ট বল না।

কমলেশ কথা বলিল না। নীরা আবার বলিল, খোকা যে বড় কেমন কচ্ছে। কি হবে?

—কি হবে নীরা,উপায় তো কিছুই দেখছি না।

—একবার যাও ডাক্তার-বাড়ি।

—শুধু শুধু ডাক্তার-বাড়ি গিয়ে কি করব বল। টাকা না দিলে ডাক্তারও আসবে না, ওষুধও দেবে না।

—তবে কি খোকা আমার বিনা চিকিৎসায়—!

নীরা কথা শেষ করিতে পারিল না।

কমলেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। নীরা বলিল, না হয় তুমিই একবার চল, দেখ তাকে।

—দেখে কি হবে নীরা, শুধু কষ্ট আমার আরও বাড়বে। কিছু যখন কর্ত্তে পারব না, তখন দেখে কি লাভ?

—না, না, একবার চল, আমার বড় ভয় কচ্ছে।

—চল তবে বলিয়া কমলেশ উঠিল।

অর্দ্ধভগ্ন অবরুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া কমলেশ ও নীরা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। শীতের প্রভাত। তখনও ভাল করিয়া রৌদ্র উঠে নাই। ভাঙ্গা জানালাগুলার মধ্য দিয়া হিমশীতল সমীর তীক্ষ্ণ ছুরির মত দেহ বিদ্ধ করিতেছিল। সুবৃহৎ ঘরখানার অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রাচীর-গাত্র হইতে চুণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে। কালী-ঝুলে ঘরখানা যেন একটা বীভৎস বিকট মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। একাংশে একটা অতি মলিন শয্যার উপর তেমনই ম্লান বিমর্ষ একটি ছেলে শুইয়া। কমলেশ ব্যথিত-কণ্ঠে ডাকিল, খোকা!

ছেলেটি চাহিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, বড় কষ্ট!

কমলেশ পুত্রের পাশে বসিল। নীরা দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল। স্থিরনেত্রে বহুক্ষণ ছেলেটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কমলেশ বলিল, নীরা, মনকে শক্ত কর। ভগবানকে ডাক।

নীরা অস্ফুট কণ্ঠে কি-একটা বলিয়া কম্পিত দেহে সেইখানে বসিয়া পড়িল। কমলেশ তেমনই ভাবে শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশু আবার বলিল, বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা!

কমলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বলতে পার নীরা, কি পাপে আমার এত শাস্তি! আমি তো জীবনে কোন অন্যায় কাজ করি নি! তবে?

নীরা কিছুক্ষণ নীরব রহিল, তাহার পর কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, এ শাস্তি তোমার নিজের পাপে নয়।

—আমার পাপে নয়? তবে কার পাপে?

—জান না? নির্দোষীকে বিনা অপরাধে তোমার বাবা কি উৎপীড়ন করেছিলেন! লাল সিং দরওয়ান তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে

যায় নি বলে' নিজে লোক দিয়ে তাকে খুন করিয়ে সেই দোষ অন্যের—

শিহরিয়া কমলেশ বলিল, চুপ্ চুপ্! চুপ কর নীরা! ও কথা আর নয়। তিনি পিতা, আমি সন্তান। তাঁর কাজের আলোচনা করবার অধিকার তো আমার নেই।

—যিনি দোষী, তিনি পিতা হলেও—

—না, না। নীরা থাম, থাম তুমি—

—থামছি। কিন্তু জেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জীবন ভরে কর্ত্তে হবে তোমাকে! কি অবস্থা হতে কি অবস্থায় এসেছ! সকলের অবজ্ঞেয়, ঘৃণার পাত্র! অনাহারে অচিকিৎসায় ছেলেটা যে মরতে বসেছে, এ শুধু সেই পাপের ফল।

—কিন্তু সে শাস্তি আমি পাব কেন?

পাপের ফল এমনই। পুরুষানুক্রমে শোধ হয়।

—তাই কি?

—তাই। বুঝতে পাচ্ছ না? এত শীগ্‌গির এই অবস্থায় এসে দাঁড়াইবার কথা তো নয়। এ অঞ্চলের অধিকারী ছিলে তোমরা। আজ তাঁদের বংশধর তুমি. কেউ তোমাকে ডেকে একটা কথা বলে না। না খেয়ে মরলেও কেউ চেয়ে দেখে না। আর কি হতে পারে?

কমলেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। নীরা বলিতে লাগিল, আমি জানতুম এমনই হবে। বিয়ের পর যখনই নির্দ্দোষ মৃগাঙ্কের শাস্তির কথা, লাল সিংহের খুনের কথা মার কাছে শুনেছি, তখনই জানি এ বংশের শেষ হয়ে এসেছে। তোমার মাও আমায় বলেছিলেন, নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ ও নিজেই উন্মুক্ত করে' দিয়েছে। যাবে সবই। শুধু নিজের পুণ্য দিয়ে তুমি যদি পার আপন স্বামী-সন্তানের জীবনটুকু রেখ। আর কিছু থাকবে না, রাখতে পারবে না, এ নিশ্চিত। আমিও সেই অবধি সব সময় ভগবানকে ডেকেছি, আর কিছুর জন্য নয়, শুধু তোমাদের জীবনের জন্য। কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না! খোকা আমার—! নিজের দুই হাতে সে মুখ ঢাকিল। বিভ্রান্ত ইঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া কমলেশ বলিল, খোকা তা' হ'লে সত্যিই যাবে? তুমি তবে রাখতে পারবে না?

না, না আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, যদি ডাক্তারকে ডেকে আনতেপারি।

তাই যাও, আমাদের অবস্থার কথা শুনলে কি তার দয়া হবে না? একটু ওষুধও কি দেবে না?

আমাদের উপর কারো দয়া হবে না নীরা। সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে! কথা পর্য্যন্ত বলে না।

তা হোক্ তুমি একবার যাও, দেখছ না খোকার অবস্থা।

দেখছি, দেখছি ত সবই, চল্লুম তবে।

কমলেশ বাহির হইয়া গেল।

শ্রান্ত স্বেদাপ্লুত দেহে মধ্যাহ্নে বাড়ি ফিরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কমল বলিল, কিছুই হল না নীরা! ডাক্তার টাকা না হ'লে আমার বাড়ি আসবে না! এত করে' বল্লুম নিজের অবস্থার কথা, বিশ্বাস করলে না। বলে রঘুপতি রায়ের ছেলে তুমি, তোমার পয়সা নেই, এ কি হয়! তোমার বাবা এত লোকের সর্ব্বনাশ করে' যে কিছু রেখে যায় নি, এ কখন সম্ভব? ধার করব বলে' প্রত্যেকের কাছে গেলুম, সকলেই ঐ কথা বলে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর সহ্য হয় না নীরা! আত্মহত্যা করে' মরা এর চেয়ে অনেক ভাল, না?

শিহরিয়া নীরা বলিল, পাগল তুমি!

—না নীরা, আর সহ্য হয় না! এতদিন কোনমতে কারও দ্বারস্থ না হয়েও চালাতে পেরেছি; কিন্তু আর যে কোন উপায় নেই!

—আচ্ছা, এবাড়িখানা বিক্রী হয় না ?

এই বাড়ি, তুমি জান না নীরা, এর নাম হয়েছে অভিশপ্ত-বাড়ি। লোকের ধারণা এ বংশে ভগবানের অভিশাপ পড়েছে। যে এ বাড়ীতে আসবে তার সর্ব্বনাশ হবে। ভয়ে কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসে না। এবাড়ি লোকে কিনবে ! সে চেষ্টা আমি অনেকবার করেছি।

—কি হবে তা' হ'লে ? কি করে' চলবে ?

ভগবানও যদি আর সকলের মত আমার উপর বিরূপ না থাকেন, তবে উপায় তিনিই করবেন।

বহুক্ষণ উভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বাতায়নের মধ্য দিয়া দুগ্ধশুভ্র শীতের রবিকর ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল হাসির মত ছড়াইয়া পড়িয়া ভয়াবহ ঘরখানার বিকট গাম্ভীর্য্য কতকটা সরাইয়া দিয়াছিল। নির্ম্মল নীল আকাশের গায়ে কতকগুলা শুভ্র লঘু মেঘের টুকরা নীল বসনে রূপালী জরির ফুলের মত ছড়ান রহিয়াছে। উদাসনেত্রে কমল সেই দিকে চাহিয়াছিল। অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে শিশু বলিল,—মা, খেতে দেবে না ?

সচকিতে কমলেশ বলিল, ওকে কিছু খেতে দাও নি নীরা ? এত বেলা হয়েছে।

সজল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া নীরা কহিল, এক পয়সার সাবু কি বার্লী যদি আনতে পার !

দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কমল বলিল, ভগবান !

নীরা স্বামীর হতাশা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর উঠিয়া কম্পিতপদে বহু কষ্টে কক্ষের বাহির হইয়া গেল। একটা বিবর্ণ এনামেলের বাটিতে খানিকটা ঈষৎ গাঢ় জলীয় পদার্থ লইয়া অল্প পরেই সে ফিরিয়া আসিল। ছেলেটির সম্মুখে বসিয়া ঝিনুক দিতেই সাগ্রহে তাহাই সে খাইতে লাগিল। তাহার বুভুক্ষু মুখের দিকে চাহিয়া কমল বলিল, সবটাই কি এখন দিলে ?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া নীরা বলিল, এক মুঠো মাত্র চাল ছিল, এইটুকু ফেন হয়েছে।

তারপর—

নীরা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, কথা বলিল না। শীতের ছোট দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল। ছেলেকে খাওয়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া নীরা বলিল, উঠে ডুব দিয়ে এসে খাও, বেলা যে আর নেই।

—চাল ছিলো না বলছিলে যে—

যা' ছিল, তাই রেঁধেছি। না খাওয়ার চেয়ে এক মুঠো খাও !

কিন্তু কাল কি হবে নীরা !

নীরা উত্তর দিল না। কমল বাহির হইয়া গেল। একখানা পিতলের থালে মুঠাখানেক ভাত আনিয়া নীরা সেই খানেই রাখিল। একটু লবণ পর্য্যন্ত নাই। সিক্তদেহে সিক্তবস্ত্রে একটু পরই কমলেশ ফিরিয়া আসিল। একখানা অতি জীর্ণ কাপড় তাহার হাতে দিয়া নীরা বলিল, কাপড়টা আগে ছাড়। স্বামীর পরিত্যক্ত কাপড়খানা নিংড়াইয়া সে তাহার গায়ের জল মুছিতে লাগিল। কম্পিতদেহে কম্পিতকণ্ঠে কমল বলিল, বড় শীত পাচ্ছে। নীরা গায়ে দেবার একটা কিছু দিতে পার ? শীতে দাঁড়াতে পারছি না। নীরা একটু ভাবিল, তাহার পর বাহির হইয়া গিয়া একটা জীর্ণ চটে আপন দেহ ঢাকিয়া পরিধেয়খানি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল।

রাত্রি হইতেই নীরার খুব জ্বর হইয়াছিল। উঠিবার শক্তি নাই, ছেলেটার অবস্থা ভাল নয়। শুষ্ক গাছের পাতা ডাল প্রভৃতি জ্বালাইয়া সারা রাত্রি উভয়কে শীত ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া জাগরণ-ক্লিষ্ট কমলেশ প্রভাতে নীরাকে ডাকিয়া

তুলিল। স্বামীর দিকে চাহিয়া জড়িত-কণ্ঠে নীরা বলিল, খোকাকে আগে দেখ। ও যে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

—কষ্ট পাচ্ছে সে তো জানি নীরা কিন্তু শুধু দেখলে তো হবে না। উপায় কর্ত্তে হবে। আমি চল্লুম।

—কোথায় যাচ্ছ? কি কর্‌বে তুমি?

—কি করব তা' জানি না। কিছু না হয়, ভিক্ষে করব নীরা! তাতেও আর আমার দুঃখ নেই!

ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল, মা খেতে দাও, বড় খিদে।

—তাই ত কাল সেই একবার একটু জলের মত ফেন খেয়েছে। তুমিও কিছু খাও নি। এভাবে থাকলে কতক্ষণ বাঁচবে তোমরা?

আমি যাচ্ছি নীরা, আজ যেমন করে' পারি কিছু নিয়ে ফিরব! খোকা কাঁদিস না রে। একটু চুপ করে' থাক। আমি এখনি তোদের জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

নীরা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কমলেশ ঘরের বাহিরে আসিল। পথে আসিয়া গ্রাম ছাড়িয়া বরাবর সে ষ্টেশনের পথ ধরিয়া চলিল। আপন কার্য্য-প্রণালী সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছিল। গ্রামে কাহারও কাছে ভিক্ষা করা চলে না। করিলেও ভিক্ষা মিলিবে না। তাই ষ্টেশনে চলিয়াছিল ট্রেণের যাত্রীরা যদি দয়া করিয়া কিছু দেয়। ভিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। অনাহারে পত্নী-পুত্র ক্রমশঃ মরণের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। ভিক্ষা করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই। তাহাদের জীবন অপেক্ষা তো কিছু তাহার কাছে বড় নয়। রোগ জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট পত্নী পুত্রের মুখই কেবল তাহার মনে জাগিতেছিল। নীরা কাল কিছু খায় নাই। বহু চেষ্টায়ও সেই এক মুঠা ভাত হইতে অর্দ্ধেক সে তাহাকে খাওয়াইতে পারে নাই। আর ক'দিন সে না খাইয়া বাঁচিবে ঐ ব্যাধির উপর। পুত্রের যা' অবস্থা, তাহাতে তাহারও জীবনের আশা নাই বলাই চলে। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া কেহ কি দয়া করিয়া কিছু দিয়া সাহায্য করিবে না? মানুষ কি এতটাই কঠিন হইতে পারিবে?

ষ্টেশন দেখা যাইতেছিল। প্লাটফর্ম্মে এক-খানা ট্রেণ দাঁড়াইয়া। কমল ত্রস্তভাবে ছুটিয়া নিকটে আসিল। যাত্রীরা আপনাদের উঠানামা জিনিষ-পত্র লইয়াই ব্যস্ত। যাহারা সেখানে নামিবে না, তাহারা সংবাদ-পত্র বা সহযাত্রীর সহিত গল্পে বিভোর। কমল একবার দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিলেই আপনাকে সর্ব্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দিতে পারা যায় না। প্রার্থনার বাণী মুখে আসিয়াও ওষ্ঠ পথে বাহিরে আসিতেছিল না। পত্নী ও পুত্রের মুখ সে মনে করিয়া লইল। তাহার পর সকল সঙ্কোচ জড়তা কাটাইয়া প্রত্যেকের কাছে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিল। অনেকেই কথা বলিলেন না। কেহবা উগ্রকণ্ঠে প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিলেন। দুই-চারিজন মৃদু মন্দ ধাক্কা দিয়া পথ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ট্রেণে উপবিষ্ট মূল্যবান পরিচ্ছদধারী একব্যক্তি সহঙ্কারে তাহাকে বিদায় করিয়া বলি-লেন, ট্রেণেও নিস্তার নেই। গভর্ণমেণ্ট যদি এই ভিখিরী বন্ধ করার একটা আইন করে তো দেশের মঙ্গল হয়। হতচ্ছাড়া ব্যাটারা জ্বালিয়ে খেলে। পয়সা দাও। পয়সা অম্‌নি গাছের ফল কি না। বের, বের বদমাস, এখান থেকে। যা' চলে যা'।

গাড়ী চলিয়া গেল। কমলেশ স্তব্ধভাবে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিল। একটি আধলা ভিন্ন সে আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। বড় আশা করিয়া সকালে সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা করিলেই যে মিলিবে, এ

বিষয়ে কোন সন্দেহ তার মনে ছিল না। মান-সম্ভ্রম ঘুচাইয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইলেই যে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, এ বোধ তাহার ছিল না। একটি কপর্দ্দক, এক মুঠা চাল ভিখারীকে দিতে লোকের সর্ব্বনাশ হয়, অথচ বিলাসিতা ঐশ্বর্য্যের অনর্থক আড়ম্বরে কত পয়সার যে অপব্যয় তাহারা করে ভাবিতেও ঘৃণা বোধ হয়। চোখের উপর না খাইয়া কেহ মরিতেছে দেখিলেও তাহার প্রতিকার করে না। আর আপনাদের সামান্য একটু সুখ-সুবিধার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা মনে আসে না। কমল ভাবিতেছিল ফিরিয়া যাইবে কি না, কিন্তু একটি আধলায় কি হইবে? সে ভাবিতে লাগিল, আসিয়াছে যখন তখন ভাল করিয়াই চেষ্টা করা যাক। আর একখানা গাড়ী এখনি আসিবে। কেহ কি কিছু দিবে না। দিনান্তব্যাপী পরিশ্রমে আড়াইটী পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ক্লিষ্ট দেহে কমল বাড়ী ফিরিতেছিল। মনে জাগিতেছিল নীরা ও তার পুত্রের কথা। সমস্ত দিনের অনাহারে এখনও কি তাহাদের দেহে জীবন আছে? হয় ত নাই। আর যদিও থাকে, এখন তাহা মরণের পথে পা বাড়াইয়াছে। তাহাদের বাঁচাইবার কোনও উপায় কি নাই? কমলের সর্ব্বদেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। একটা গাছতলায় সে বসিয়া পড়িল। একটু জল পর্য্যন্ত সে খায় নাই, তাহার উপর সমস্ত দিনের পরিশ্রম। আপনার কথা ভুলিয়া পত্নী-পুত্রের কথাই সে ভাবিতে লাগিল। কি উপায়ে তাহাদের বাঁচান যায়, কোন উপায় নাই কি? হয়ত কোন পুষ্টিকর আহার ঔষধ দিলে তাহারা বাঁচিবে। কিন্তু সংগ্রহের উপায় কই? আড়াইটী পয়সায় কিছুই যে মিলিবে না। আরও কিছু চাই। যে ভাবে হোক আরও চাই, নইলে নীরা বাঁচিবে না, খোকা বাঁচিবে না। কমল দাঁড়াইল।

পেছনের দিক হইতে একজন লোক আসিতেছিল। মূল্যবান পরিচ্ছদ। দামী শাল। বুকের উপর সোনার চেনটা সায়াহ্নের ম্লান আলোকেও ঝকঝক করিতেছে। কমল দাঁড়াইল। ভদ্রলোক নিকটে আসিল। লোলুপ-নেত্রে চাহিয়া কমল বলিল, বড় কষ্ট, কিছু ভিক্ষে দিন।

সন্দিগ্ধনেত্রে তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া কর্কশস্বরে লোকটি বলিল, মর, মর। কষ্ট তার আমি কি করব? কুড়ের ঢেঁকি, ভিক্ষে কর্ত্তে লজ্জা করে না? হাত রয়েছে, পা রয়েছে, খেটে খা'না।

ম্লানহাসির সহিত কমল বলিল, খাটতে তো চাই মশায়। খাটায় কে? কিছু দিন। নইলে না খেতে পেয়ে আমার স্ত্রী আর ছেলে মরে যাবে। দিন কিছু।

কমলের স্বাভাবিক বোধশক্তি ক্রমশঃই বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। আঃ, বড় জ্বালা দেখছি তো! কে এ ব্যাটা?

—দিন বাবু, একটা টাকা, না হয় আট আনা পয়সা। দিন বাবু দিন, ভগবান আপনার ভাল কর্ব্বেন।

আরে মর, এ ব্যাটা পাগল না কি? ভাল জ্বালা দেখছি। ভদ্রলোক ফিরিয়া পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হরে বেটাও তো এখন আসে না দেখছি।

দিন না বাবু, কিছু না দিলে হবে না।

হবে না? জোর নাকি? বেশ তো চুরি-ডাকাতি কর না হয়। সে তবু একটা পরিশ্রমের কাজ, ভিক্ষে করার চেয়ে ভাল। ভিক্ষে দিলে আলসেমীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়। হাত-পা

রয়েছে, ভিক্ষে চাইছ। ব্যাটা, একটি আধলাও দেব না, বের।

বিদ্যুৎ মেখলার মত চুরী ডাকতির কথা যেন কমলের সম্মুখে একটা পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। এই ত উপার্জ্জনের একটা উপায়। তাই হোক। দেহের সমস্ত শোণিত তাহার উষ্ণ হইয়া উঠিয়া তাহাকে উন্মাদ বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। লোকটির দিকে আরক্ত-নেত্রে চাহিয়া সে বলিল, দেবেন না তা' হ'লে ?

না না, যা' না বাপু ! বিরক্ত করিস নি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লোকটী ভয় পাইয়াছিল। কমল মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর উন্মত্তের মত ঝাঁপাইয়া তাহার উপর পড়িল। মানুষ অবস্থারই দাস। কোন্ অবস্থা কাহাকে কখন কোথা হইতে কোথায় লইয়া আসিতে পারে, পূর্ব্বে কেহই তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। যাহা স্বপ্নেরও অগোচর তাহাই সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

কমল বলিল, বেশ তবে চুরীই কচ্ছি।

অতর্কিত আক্রমণে লোকটী পড়িয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। নীরব সন্ধ্যার বুকে সেধ্বনি অতি বিকটভাবেই আঘাত করিল। মুহূর্ত্তের চেষ্টায় লোকটী উঠিয়া পড়িয়া সবলে কমলের ললাটে একটা আঘাত করিল। কমল টলিয়া পড়িল। অবসন্ন দেহ কাঁপিতেছিল, তথাপি কোথা হইতে একটা বিপুল শক্তি আসিয়া তা'কে যেন মরিয়া করিয়া তুলিল, ক্ষণেকের চেষ্টাতেই সবলে উঠিয়া লোকটার গলা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। কয় মুহূর্ত্ত মাত্র। লোকটী নিঃশব্দে ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। স্থিরনিশ্চলনেত্রে কমল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কি যে করিল, কি হইল কিছুই বুঝিবার মত সামর্থ্য রহিল না। চমক ভাঙ্গিল ! অদূরে কয়জন লোক আসিতেছিল। অন্ধকারে তাহারা ইহাদের সুস্পষ্ট দেখিতে পায় নাই। তাহাদের কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই কমল সচকিতে ফিরিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে লোকটীর মনিব্যাগ ও ঘড়ির চেন খুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল। কয়জন লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। কমলেশ তখনও ফিরিল না দেখিয়া নীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গ্রামে কেহ তাহার প্রতি প্রসন্ন নহে বলিয়া কমলেশ কাহারও নিকট যাইত না। এতক্ষণ তাহাকে না আসিতে দেখিয়া নীরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ছেলেটী বহুক্ষণ কাঁদিয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে কিছু নাই। কিছুমাত্র পথ্য তাহার মুখে পড়িল না। নীরা কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না! পল্লীস্থ কাহারও দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। নিজে অক্ষম, রুগ্ন। দুই পদ চলিবারও শক্তি নাই, কোথায় যাইবে,কি করিয়া স্বামীর সংবাদ লইবে, শীতকালের ক্ষুদ্র দিন শেষ হইয়া আসে। নীরব স্তব্ধ পল্লীর মধ্যে এই সুবিশাল বাড়ি-খানার মধ্যে মৃতকল্প সন্তানকে লইয়া কি ভাবে সে সময় কাটাইতেছিল, শুধু অন্তর্য্যামীই জানিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া রজনী নামিয়া আসিল। আলোক রেখাহীন বাড়ির প্রতি কক্ষ যেন বিরাট মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। নীরার মনে হইল কক্ষে কক্ষে আজ যেন কাহারা ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। কাহাদের অট্টহাসির উল্লাসধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া তাহার শ্রবণে পশিতে ছিল। বুঝি বাড়ির পূর্ব্বতন অধিকারীরা একত্র হইয়া তাহাদের অতীতের লীলা নিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া, উৎসবে মত্ত হইয়াছে! তৈল নাই। আলো জ্বলিল না। নীবিড় অন্ধকারে পুত্রকে

বুকে জড়াইয়া আড়ষ্ট কাঠ হইয়া নীরা বসিয়া রহিল। শিশু অস্ফুট কণ্ঠে একবার কাঁদিল। আর কাঁদিবার বা কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। উপবাসে রোগ যন্ত্রনায় নীরারও দেহ তখন অবশ হইয়া আসিয়াছিল। কোন মতে আপনাকে দৃঢ় রাখিয়া সে বসিয়া রহিল! বাহিরে ছাদের উপর বসিয়া একটা কাল পেঁচা মধ্যে মধ্যে কর্কশ রবে ডাকিয়া উঠিতেছিল। গভীর নীরবতার বক্ষ জীর্ণ করিয়া সেই বিকট রব প্রেতলোকের ধ্বনির মত নীরার কানে বাজিতে লাগিল! একটা ভীষণ অমঙ্গল যেন করাল বাহু বিস্তার করিয়া সবেগে তাহাকে আপন বক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইতে চাহিতেছে—নীরা ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে লাগিল। বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল, আশ্বস্তভাবে নীরা বলিল, তুমি এসেছ?

হ্যাঁ আমি এসেছি নীরা। নীরা, তুমি আছ? খোকা? খোকা কি এখনও আছে? তোমরা বেঁচে আছ—

আছি। আছি। তোমার এত দেরী হল কেন? খোকা বুঝি আর থাকে না? আলো জ্বালবার কোন উপায় আছে কি? একবার দেখি।

হাতের জিনিষগুলো নামাইয়া রাখিয়া পকেট হইতে বাতি দেশলাই বাহির করিয়া কমলেশ আলো জ্বালিল! ছেলেটী নিথর ভাবে নীরার অঙ্কে পড়িয়াছিল! অতি ক্ষীণ-ভাবে শ্বাস বহিয়া জীবনের অস্তিত্ব তখনও জানাইয়া দিতে-ছিল! কমল ক্ষিপ্র হাতে তাহাকে বুকের ওপর তুলিয়া বলিল—নীরা দুধ এনেছি। খাওয়াবার চেষ্টা কর দেখি। হয়ত এখনও তাহলে খোকা বাঁচতে পারে।

নীরা অতি কষ্টে কম্পিত অবশ দেহটাকে তুলিল। একটা মাটীর পাত্রে দুধ ছিল, বাটিতে ঢালিয়া সে পুত্রকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমটা মুখের পাশ বহিয়া দুধ গড়াইয়া পড়িল। নীরা হতাশ ভাবে স্বামীর দিকে চাহিল। বিভ্রান্ত-কণ্ঠে কমল বলিল, কি হল নীরা, সব বৃথা হল? দেখ, দেখ, আবার চেষ্টা কর। কি করে এ সব আমি সংগ্রহ করে এনেছি যে, উঃ নীরা…

আবার ঝিনুক করিয়া দুধ শিশুর মুখে দিল, কয়বারের পর দুই এক ঝিনুক যে গলাধঃকরণ করিল! উৎফুল্ল ভাবে কমল কহিল, দাও নীরা আরো দুধ দাও,তবে খোকা আমার বাঁচবে হয় ত।

ছেলেটী খানিকটা দুধ খাইয়া চোখ চাহিল। কমল তাহাকে বুকে লইয়া বলিল, তুমি এবার কিছু খাও। ছেলেটীকে সুস্থ দেখিয়া নীরাও অনেকটা আশ্বস্ত হইল। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, আগে তুমি মুখ হাত ধুয়ে খাও। কি করে' এসব আনলে?

ক্ষণেকের জন্য ভুল হইয়াছিল, আবার সব কথা মনে পড়িল। কমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, কি করে', জান নীরা? চুরি করেছি, খুন—খুন করেছি—তোমা-দের জন্যে—! তোমাদের জন্যে—! উন্মাদের মতই কণ্ঠস্বর তেমনই শূন্য,—বিভ্রান্ত দৃষ্টি!

'কি বল্লে!' নীরা মুহূর্ত্তে সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল! কমল নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। পত্নীর সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিবার কোন চেষ্টা করিল না। উত্তেজনার পর অব-সাদ আসিবে এ নিশ্চিত। ক্ষণপূর্ব্বে যে উত্তেজনা লইয়া সে নরহত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সে-উত্তেজনার আর বিন্দুমাত্র তখন অবশিষ্ট ছিল না। কৃতকার্য্যের অনুশোচনার সঙ্গে একটা গভীর অবসাদ তাহার অন্তর ছাইয়া সমস্ত দেহ মন অসাড় করিয়া তুলিয়া হঠাৎ রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোক রেখা সম্মুখস্থ জমাট অন্ধকারের রশ্মি বিখণ্ডিত

করিয়া তীব্র হাসির মত স্বরে ছড়াইয়া পড়িল। বিস্ময় জড়িত নেত্রে সেদিকে চাহিয়া কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ উন্নত-দেহ এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্থির মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে কমলেশের দিকে চাহিল। সে তীক্ষ্ন দৃষ্টির সম্মুখে কমলেশ যেন অস্থির হইয়া উঠিল। জড়িতস্বরে সে প্রশ্ন করিল, কে তুমি?

আগন্তুক উচ্চ কণ্ঠে হাসিল। নিস্তব্ধ ঘরখানা সে-হাসিতে যেন শিহরিয়া উঠিল। ভূতের মত লোকটির আকস্মিক অভ্যুত্থান কমলেশকে যেমন ভীত করিল, তেমনই চিত্তে একটা অশান্তি জাগাইয়া তুলিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে এভাবে আসিয়া হাসিতে দেখিয়া একটা গভীর শঙ্কায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। বয়স পঞ্চাশের উপর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সবল দীর্ঘ দেহ, বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। জীঘাংসাপূর্ণ একটা পৈশাচিক দীপ্তি তাহার চোখে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কঠিন মুখে প্রতিহিংসার একটা ক্রূর অদম্য বাসনা নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কমলেশ কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে আবার বলিল, কে তুমি? এখানে কেন এসেছ?

আমি? মৃগাঙ্ক চৌধুরীর নাম শুনেছ?

তুমি? তুমি মৃগাঙ্ক চৌধুরী? তুমি বেঁচে আছ?

অট্টহাস্যে আবার গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। এতশীঘ্র আমি মরব? তোমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করেই? ভেবেছ দ্বীপান্তরেই আমি মরব? তোমরা নিশ্চিন্ত হবে। তা হয় না কমল রায়! ঋণ শোধ দিতে হয়, রমাপতি বেঁচে নাই, কিন্তু তার সন্তান তুমি আছ। তোমাকেই রমাপতির ঋণ শোধ দিতে হবে।

আমি যে এই কুড়ি বছর ধরে কেবল এই দিন ধরেই প্রতীক্ষা করেছি! কমল বিহ্বলভাবে চাহিয়াছিল, একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

মৃগাঙ্ক তেমনই হাসিয়া বলিল, ভয় পাচ্ছ। ভয় কি? তোমার তো ভয় পাবার কথা নয়। তোমাদের বংশে তো ভীরু কেউ নেই। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে পড়। কমলেশ একটী কথারও উত্তর দিল না। রমাপতি বলিল, নাও প্রস্তুত হতে বেশীক্ষণ তো অপেক্ষা কর্ত্তে পারব না আমি! এখনি যেতে হবে যে!

এবার কমল কথা বলিল। কহিল, তুমি কি আমায় মারতে চাও?

নিজের হাতে নয়। একটু একটু করে পুড়িয়ে। যেমন ভাবে তোমার বাবা আমার জন্য জীবন ব্যাপী তুষানলের ব্যবস্থা করে গেছে সেইভাবে। তবে দুঃখ এই, খানিকটা জ্বলেই তোমার জ্বালার অবসান হবে।

মৃগাঙ্ক বলিয়া চলিল, আমার জ্বালা জীবনেও শেষ হবে না। আমি যা কষ্ট পাচ্ছি তার তুলনায় এ ত অতি লঘু শাস্তি! এই ঘর বাইরে হতে বন্ধ করে আগুন দিয়ে, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র নিয়ে আস্তে আস্তে পুড়বে। পালাবার উপায় নেই; আমি একা আসিনি—সঙ্গে লোক আছে। মনের মত সব সহকারী সংগ্রহ করেছি। তুমি ভগবানের নাম কর, আমার কাজ আমি করি।

আর্ত্তকণ্ঠে কমল কহিল,—এ তুমি কি বলছ! অপরের পাপে আমায় শাস্তিভোগ কর্ত্তে হবে? না—না আমায় বাঁচাও।

হাঃ হাঃ-হাঃ। জান না পিতার ঋণ পুত্র শোধ করে?

কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র এদের উপরও কি তোমার দয়া হবে না, আমায় যা খুশী শাস্তি দাও এদের বাঁচাও—

সে হবে না, আমার বোন সুনেত্রা কি অপরাধ করেছিল? তোমার পিতার কবল হতে উদ্ধার পাবার জন্য তরুণ জীবন মুহূর্তে তাকে নষ্ট কর্ত্তে হয়েছে, আমি ঘৃণ্য খুনী বলে জগতে পরিচিত। নিঃস্ব কপর্দ্দক হীন হয়েছিলুম, নিজের চেষ্টায় আজ অর্থের অভাব নেই আমার। তবু আমি সকলের কাছে হেয়—

কিন্তু সে অপরাধে আমি তো অপরাধী নই?—

অপরাধী তোমার পিতা। একই কথা। বৃথা কাব্য ব্যয় করে ফল নেই। কমলেশ ভগবানের নাম কর। মৃগাঙ্ক বাহির হইয়া গেল। বিহ্বলভাবে কমলেশ সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে কতকগুলি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। কমল আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, ভগবান! ভগবান!

নীরা তখনও সংজ্ঞাহীনা; দ্বারটা খুলিয়া গেল। দ্রুতপদে দশ বারজন লোক ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল বিস্মিত ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়াই কমলেশ শিহরিয়া উঠিল জন কয়েক পুলিশ পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিল।

কমলেশ রায় আপনারই নাম?

কমলেশ উত্তর দিতে পারিল না। পশ্চাত হইতে ভৃত্য শ্রেণীস্থ এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সম্মুখের লোকটিকে বলিল, হুজুর এঁকেই আমার মানবের পাশ থেকে ছুটে পালিয়ে আসতে দেখেছি। তখনই আমি ওর সঙ্গে আসি এ বাড়ি পর্য্যন্ত। তার পর পুলিশে গিয়ে খবর দিই। ইনসপেক্টর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, চুরি, হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে তোমায় আমি গ্রেপ্তার করলুম। এক জোড়া লৌহ বলয় সে কমলেশের হাতে পরাইয়া দিল। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের এক প্রভাতে যে ভাবে মৃগাঙ্কর হাতে ইহারাই পূর্ব্বতন এক পুলিশ কর্ম্মচারী লৌহ বলয় পরাইয়া দিয়াছিল ঠিক সেইভাবে। বাহিরে একটা গভীর হাসির রোল উঠিল। সকলেই সত্রাসে সে দিকে চাহিল। মশালের আলো আর দেখা যাইতেছিল না। হাসির ধ্বনিটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কে এক জন অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, রাম রাম, ভূত আছে নাকি?

কমলেশ তেমনই নীরব রহিল। ইন্সপেক্টর বলিলেন, আজ সন্ধ্যার সময় তুমি স্থানীয় অধিবাসী ভূপেন্দ্র দত্তকে খুন করবার চেষ্টা কর। আসন্ন বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও এই কথাটিতে কমলেশ অন্তরে স্বস্তি বোধ করিল। লোকটা তাহা হইলে হত হয় নাই। সত্যই সে হত্যাকারী নয়। কৃতজ্ঞ চিত্তে সে ভগবানকে প্রণাম করিল। মুহূর্ত্তের ভুলে যে কাজ সে করিয়াছে তাহার শাস্তিগ্রহণে সে প্রস্তুত হইল। অনুসন্ধানে পকেট হইতে ঘড়ি চেন মণিব্যাগ বাহির হইল। ইনস্পেক্টর বন্দীসহ প্রস্থানের আয়োজন করিলেন। নীরার চেতনা ক্ষণপূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রথমটা সে সম্মুখের দৃশ্যটা স্বপ্ন বলিয়াই ভাবিল। তাহার পর লুপ্তপ্রায় স্মৃতি শক্তি ফিরাইয়া আনিয়া স্বামীর মুখে উচ্চারিত বাণীটা স্মরণ করিয়া সম্মুখের দৃষ্ট বস্তর যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিল! তাহার পর আপ্রাণ চেষ্টায় উঠিয়া উত্থত কমলেশকে সে সবলে জড়াইয়া ধরিল।

ইনস্পেক্টরটা ভদ্র। সাধারণ পুলিশের মত পাষাণ হৃদয় নহেন। তিনি দাঁড়াইলেন। রুদ্ধ কণ্ঠ কোনরূপে পরিষ্কার করিয়া কমল কহিল, আমি যাই নীরা। কিছু তো বলবার নেই। দিদি বা তার খোকাকে নিয়ে কারো দাসী হয়ে থেকে বাঁচবার, খোকাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র। যদি বেঁচে থাক, আর আমি ফিরি তবে দেখা হবে।

দীর্ঘকণ্ঠে নীরা বলিল, সে হবে না, হবে না, তোমায় আমি যেতে দেব না—কিছুতেই যেতে দেব না! কমলেশের অশ্রু তাহার রুক্ষ চুলের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পুলিশের মধ্য হইতে কে একজন বলিল, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব? গোটাকতক রুলের ঘা দিলেই ছেড়ে যাবে 'খন। খুনী আসামী উনি যেতে দেবেন না! ইন্‌সপেক্টর ধমক দিতেই সে থামিল। শান্তভাবে ইন্‌সপেক্টার কহিলেন, তোমার স্বামী অপরাধী মা। তাকে ছেড়ে না দিলে তো চলবে না। সরে যাও তুমি, কেন মিথ্যে অপমান সইবে? ওকে যেতে দাও। নীরা তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল—দয়া করুন দারোগাবাবু? সংসারে আমার আর কেউ নেই! দেখুন ঐ আমার ছেলের অবস্থা। এ সময় আমার স্বামী না থাকলে ও কি বাঁচবে? আপনি বিশ্বাস করুন,উনি খুন করেন নি। উনি যে একটা পশুপাখীকে মারেন না। আজ তিনদিন আমরা খাই নি, তাই হয়ত কারো কিছু নিয়ে এসেছেন, সেও শুধু আমাদের জন্যে। কিন্তু খুন উনি করেন নি। আপনার পায়ে পড়ি, ওঁকে নিয়ে যাবেন না —উনি তা' হ'লে বাঁচবেন না!

ইনস্‌পেক্টর আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, কি কর্ব্ব মা, কর্ত্তব্য। না নিয়ে তো যেতে পারি না, আমার তা' হ'লে চাকরী যাবে

—তা' হ'লে আমায় আর আমার ছেলেকে আপনারা মেরে রেখে যান—কিছু পাপ তা'তে হবে না দারোগাবাবু! এমনইও না খেয়ে মরব, এ তার চেয়ে ভালই হবে। তাই করুন, আপনারা আমাদের মেরে রেখে যান! ইনস্‌পেক্টর কমলেশকে চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিল। সে একপদ অগ্রসর হইতেই নীরা তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাদের মেরে তারপর যাও। ও গো, আমাদের কি হবে তা' কি একবার ভাবছ? না, তার চেয়ে আমাদের শেষ করে যাও!

—নীরা!

—না না, তুমি চলে' গেলে একটী দিনও আমি বাঁচব না! আজ আঠার বছর আমি তোমার পাশে কাটিয়েছি, তোমায় ছেড়ে একটী দিনও বাঁচতে পারব না! আত্মহত্যা পাপ থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর। আমাদের জীবনের শেষ করে' দিয়ে তারপর যাও! উঃ, ভগবান এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি! নীরা সংজ্ঞা হারাইয়া আবার মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

ইনস্‌পেক্টর বাবু আপনি ভুল করেছেন, কমলেশ নির্দ্দোষ। ভূপেন্দ্র দত্তকে আহত করে' আমিই তার জিনিষ নিয়ে পালাই—কমলেশ এর কিছুই জানে না। সকলেই সবিস্ময়ে দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী মৃগাঙ্কের দিকে চাহিল। ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া সে বলিল, কমলেশ নির্দ্দোষ, ওকে ছেড়ে দিন।

তীক্ষ্ণনেত্রে চাহিয়া ইনস্‌পেক্টর কহিলেন, তুমি মৃগাঙ্ক চৌধুরী, না? বছর দুই আগে আন্দামান থেকে ফিরে এসে মস্ত কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলে, সেই লোক নয়? মৃদু হাসিয়া মৃগাঙ্ক বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই ইন্‌সপেক্টর বাবু, স্বভাব তো যায় না! পথে লোকটীকে দেখে লোভ সামলাতে পারি নি—তারপর বুঝছেন তো?

—কিন্তু ঘড়ি-চেন কমলেশের কাছে এল কি করে'?

সেটা বুঝলেন না? ও আমার কতবড় শত্রুর বংশধর জানেন তো? এক ঢিলে দুই পাখী মারব বলে এ দুটো ওর ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে রেখে দিলুম, অবশ্য ওর অজ্ঞাতে।

ইনস্‌পেক্টর চিন্তিতভাবে চাহিয়া-

রহিলেন। মৃগাঙ্কের কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। দ্বীপান্তর বাস করিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে সে ফিরিয়াছে, পুলিশ তাহার উপর ক্ষরদৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিন্তু দোষের কিছু পায় নাই। কাপড়ের দোকান খুলিয়া সৎভাবে সে দিন কাটাইতেছিল। কমলও যে অপরাধী, তাহাও বোধ হয় না। এ যে ভীষণ সমস্যা!

হাসিয়া মৃগাঙ্ক কহিল, কি ভাবচেন? চলুন, যাওয়া যাক্। একঘেয়ে জীবনটায় দিনকতক নতুনত্ব আসুক! ও বেচারীকে আর কেন কষ্ট দেন।

—তুমি দোষ স্বীকার কচ্ছ?

—কচ্ছি বই কি। নিন,ওর হাত হ'তে খুলুন-ওটা। নিজে মুখে স্বীকার কচ্ছি, এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি চান? ইনস্‌পেক্টরের ইঙ্গিতে একজন কমলেশকে মুক্ত করিয়া দিল। বিহ্বলভাবে সে একদিকে চাহিয়া রহিল। কি ঘটিল, কি হইতেছে সে যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সমস্ত বিষয়টা যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল।

মৃগাঙ্ক বলিল, আমায় একটু দয়া করুন ইনস্‌পেক্টর বাবু, এই কমলেশকে দুটো কথা বল্‌ব। পালাব না।

মুহ্যমান কমলেশকে একপাশে টানিয়া লইয়া চলিল। যন্ত্রচালিতের মত কমলেশ তা'র অনুগমন করিল। একতাড়া নোট তাহার হাতে দিয়া মৃগাঙ্ক বলিল, প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুন, কিন্তু পালুম না—তোমার স্ত্রীর জন্যে! ভগবান তোমারও শাস্তির ব্যবস্থা করে' রেখেছিলেন; সেটা আমিই মাথায় তুলে নিয়ে গেলুম। টাকাটা রাখ, আমার এই দু'বৎসরের উপার্জ্জন। তোমার কিছুদিন সুখেই কাটবে। পার ত অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করো। শোধ নেওয়া এ জন্মে হ'ল না, জন্মান্তরে বোঝাপড়া হবে—তবে তোমার সঙ্গে নয়, রমাপতির সঙ্গে। চল্লুম তবে।

মৃগাঙ্ক সরিয়া আসিয়া ইনস্‌পেক্টরকে বলিল, চলুন তবে, যাওয়া যাক্।

ভাইফোঁটা

শ্রীভূপালী সরকার

দশটা দশ।

বাড়ী হইতে কোনরকমে দুইটা নাকে-মুখে গুঁজিয়া অফিসের দিকে ছুটিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব অফিস-বন্ধু নিতাই-দা'র সহিত দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাঁহার অবস্থাও আমারই মত। কথা একরূপ বলিতেই পারিলেন না, নিজের ঠিকানাটা দিয়া, যাস্ না একদিন অনেক কথা আছে বলিয়া চক্ষের নিমেষে অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।

বেশীদিনের 'তর' সহিল না; পরদিনই সন্ধ্যার পর নিমাই-দা'র উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

একখানি একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমার অনুসন্ধানের শেষ হইল। নম্বরটার দিকে একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া ডাকিলাম, নিতাই-দা', ও নিতাই-দা', বাড়ী আছ ?

সদর দরজাটা যেন ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যাদেবী তখন পৃথিবীর বুকে আপনার কৃষ্ণবর্ণ চেলাঞ্চলখানি টানিয়া দিতেছিলেন। আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণটা কি জানি কেন রহস্য-ঘন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

খনিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলাম, নিতাই-দা' এলে বল্‌বেন, অপূর্ব্ব এসেছিল, সময়-মত আর একদিন না হয় আসা যাবে।

সহসা রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম যৌবন অনতিক্রান্তা এক দেবী প্রতিমা! একান্ত অসঙ্কোচেই বলিলেন, ভেতরে এসে বসুন, তিনি এখনই এসে পড়্‌বেন।

এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি ছিল না; কোনরকমে তাঁহার সহিত আসিয়া ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অকারণ ঘামিতে লাগিলাম।

তারপর কখন যে আপনি ভাঙ্গিয়া তুমি এবং ঘাম মুছিয়া গিয়া বিপুল আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম, সে কথা মনে নাই। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সেদিন যে তৃপ্তি লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম, তাহা আজ অনুমাত্র মলিন হয় নাই!

সেদিন রবিবার। দুপুরের দিকে নিতাই-দা'র বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। তীব্র রৌদ্রের ঝাঁজে যেন সমস্ত বাড়ীখানাই মূর্চ্ছাতুর। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম—চৌকির উপর নিতাই-দা' শুইয়া আছেন; ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষ-পত্রগুলা আজিকার কোন কিছু বিপর্য্যয়ের সাক্ষী দিতেছে।

নিতাই-দা' বলিলেন, পাগলীর আজ মাথা গরম হয়ে গেছে অপু, যা' না একবার ওঘরে—

পাশের ঘরে গিয়া দেখি, একেবারে ছোট্ট মেয়েটীর মত বাচারী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সারা মেঝেটা ভাসাইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, এতবড় অন্যায় সয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না ঠাকুরপো—না, না, তুমি আমায় এ জন্তে কোন অনুরোধ করো না!

বলিলাম, ব্যাপার কি বৌদি' ?

হাতের মুঠার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তিনি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। দেখিলাম, একখানি দুইশত টাকার 'এ্যাকনলেজমেণ্ট' রসিদ। বন্ধের কোর্ট

কেসিয়ারের সই লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিলাম—এক্তে…

উত্তেজিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইতেই সব আছে। ছেলেবেলার প্রেম কি ভোলা যায়; তা' ছাড়া ছেলেপুলে রয়েছে, তাদের ত দেখা চাই। বাবু তাদের দুঃসময়ের চিঠি পেয়ে নিজের সমস্ত মাসের মাইনে, হাতের যা'-কিছু পুঁজি-পাটা সব পাঠিয়ে দিয়ে এসে বাড়ী উঠেছেন। কাপড় কাচ্‌তে দিতে গিয়ে দেখে ফেলেছিলুম তাই, নইলে জান্‌তেই পারতুম না যে, ভেতরে ভেতরে এত বড় ষড়যন্ত্র চলেছে। ওঁর যদি মনে এই ছিল, তবে কেন আমায় উদ্ধার করতে গেলেন। এর চেয়ে যে সে আমার ঢের ভাল ছিল। সে পথের কাঁটার কথা জানা ছিল, আঘাতটাকেও বরণ করে নিতুম, কিন্তু ফুলের মধ্যে যে এতবড় বিষ লুকান রয়েছে, তা'ত ভুলেও ভাবি নি আমি। বলিয়া আবার তিনি মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে লাগিলেন।

কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিক পরে বৌদি' আবার বলিতে লাগিলেন, আজ আর কোন কথাই লুকোব না। মান, কিসের মান আবার, যার নিজের ঘরেই হয় অপমান! আমি কে জান ঠাকুরপো, ঝিয়ের মেয়ে। চমকে উঠো না, সত্যিই তাই। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিল না, থাকলেও স্থান দিলে না। মা লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে' আমায় বাঁচিয়ে তুল্‌লেন। পয়সা অভাবে কেউ বামুন বলেই স্বীকার করত না, বিয়ে ত দূরের কথা!

—অন্ধের আলো দেখার স্বপ্ন কেন আমাকে পেয়ে বস্‌ল বলত! একটী ছেলে এসে আমায় বল্‌লে, আমার মত গরীবের ওপর তার দয়ার সীমা নেই, সে আমায় বিয়ে করবে।

—সব ভুলে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। বিয়ে করার সাধু-প্রবৃত্তি কিন্তু ছেলেটীর মধ্যে কর্পূরের মতই উবে গেল—বাড়ী ছাড়তে-না-ছাড়তেই। সব বুঝলুম, আত্মহত্যা করবার জন্যে গলায় দড়ি ঝুলিয়েও দিয়েছিলুম—পায়ে পড়ি তোমার ঠাকুরপো, শুধু তুমি ওকে একবার জিজ্ঞেস করে' এস, কেন ও আমায় পাশের বাড়ী থেকে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে' ছাদ টপ্‌কে এসে বাঁচালে—আমায় বিয়ে করলে! আমার স্বপ্নকে রূপ দিয়ে আজ অকারণে—

কি বলিব, এলোমেলো দু'-চারটী কথা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। নিতাইদা'র উপর মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; আসিবার সময় একটা কথা বলিবারও প্রবৃত্তি হইল না।

বৎসর দুই পরের কথা। হঠাৎ নিতাই-দা'র সহিত পথে দেখা।

একরাশ মোট ঘাড়ে করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন। সাম্‌নে একটী ছেলে চলিয়াছে। তাহাকে কেবলই সাবধান করিয়া চলিয়াছেন, সাবধান অজয়কুমার, গাড়ী-ঘোড়ার পথ, একটু হুঁসিয়ার না হয়েছ, কি গ্যাছ।

'দপ্‌' করিয়া বৌদি'র কথা মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গের ঘর-সংসার এখানে আসিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কঠোর-কণ্ঠে বলিলাম, এটী আবার কোন্ পক্ষের? হ্যাঁ, কীর্ত্তিমান পুরুষ বটে!

অপ্রস্তুত হইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া নিতাই-দা' বলিলেন, তুমি ঠিকই বলেছ অপূর্ব্ব! তা' পথে কেন, বাড়ীতে চল না ভাই।

—তোমার বাড়ী! আমি! ক্ষেপেছ?

—ওঃ বলিয়া নিতাই-দা' চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইল না। সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলাম।

চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। মনে পড়িয়া গেল আজ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। বাংলার সমগ্র নারী আজ অন্তরকে উজাড় করিয়া দিয়া দেবতার চরণে ভায়ের কল্যাণ-কামনায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। যমের দ্বারে তাহাদের দেওয়া কাঁটা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়া অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে কি না জানি না! কিন্তু অদৃশ্য-শক্তিকে উপেক্ষা করিবার এই যে প্রচেষ্টা, ইহাকে আমি সম্মান করি, ভক্তি করি।

মনের কোণে কোথায় যেন হু হু করিয়া উঠিল। কিন্তু যে স্মৃতি বিষাক্ত, তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নৈতিক চরিত্র আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

অজ্ঞাতে কখন যে নিতাই-দা'র বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাবিয়া পাইলাম না। মনের তলে বোধ করি বৌদি'র সেই ব্যথিত আঁখি দু'টী আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল —আজ হতভাগাটাকে যেমন করিয়াই হোক্ শিক্ষা দিতে হইবে।

সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

নিতাই-দা' বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলাম, তোমার মত মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়া কি সোজা! আর সব কীর্ত্তিকলাপও চোখে না দেখে থাকতে পারলাম না, তাই ধুলো পায়েই এসে হাজির হয়েছি।

নিতাইদা' হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই তোর রাগ আমার ভারী ভাল লাগে। চল্, ঘরে, চল্।

ভিতরে আসিয়া বসিলাম। ঘরখানি বেশ শৃঙ্খলার সহিত সাজান। অন্যদিন হইলে আনন্দ পাইতাম; আজ কিন্তু ইহাই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! এখানের প্রতিটী সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন বৌদি'র কান্না মাখান রহিয়াছে।

সহসা নিতাই-দা'র দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম, তোমার মত অমানুষকে তিরস্কার করতেও আমার লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত জিনিষগুলো টেনে বাইরে ফেলে এখান থেকে চলে যাই। বৌদি'কে তাড়িয়ে এ রাজত্ব করতে সত্যি তোমার একটুও বাধছে না?

নিতাইকে উত্তর দিতে হইল না। আমার সমস্ত চিন্তাকে ব্যঙ্গ করিয়া যিনি আমার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁ'কে দেখিয়া আমি হতবাক্ হইয়া রহিলাম।

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন, অবাক্ হবারই কথা বটে, কিন্তু তার চেয়ে অবাক্ হয়েছি আমি ভগবানের দয়া দেখে। সত্যি বলছি ঠাকুর-পো, ভাইফোঁটার দিনে তোমাকে পেয়ে নিজের ভাই নেই বলে যে দুঃখ ছিল, তা' ভুলে গেছি। এস, ও ঘরে এস। বলিয়া কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তিনি হাত ধরিয়া আমাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া হাজির করিলেন।

তারপর নিঃসঙ্কোচে আমার পাশটীতে বসিয়া পড়িয়া হাত দু'টা ধরিয়া বলিলেন, সেদিন থেকে আর কেন আস নি ভাই? রাগ করেছিলে, না? রাগ তোমার করাই উচিত, কিন্তু ও'র উপর নয়, আমার ওপর। আমি পোড়াকপালী, নইলে—

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, বল্‌ব বলেই ত এখানে টেনে নিয়ে এলুম। সত্যি ঠাকুরপো, যখন সে কথা মনে পড়ে, লজ্জায় আমি ওর সাম্‌নে মুখ তুল্‌তে পারি না—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। ওকে যেদিন জান্‌তে পেরেছি, সেইদিনই অনিতাকে—

শিহরিয়া উঠিলাম! অনিতা, অনিতা কে বৌদি'?

—সতীন নয় ভাই, আমার বোন্। হতভাগী

আমারই মত দুঃখী! ভুলের পথে পা দিয়েছিল, কিন্তু তা' ভাঙতে দেরী হয় নি। যখন বুঝেছে,—তখন নিজেকে ছিনিয়ে এনে মানুষের মত বেঁচে থাকতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। শুনেছি তা'র দাদার কাছে সে চিঠি লিখেছিল, কিন্তু আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, খবরও নেয় নি। আমারই মত আত্মহত্যা করতে ছুটেছিল। উনি বাঁচিয়ে একটী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বম্বের একটা অফিসের কেসিয়ার বন্ধুকে ধরে' চাকরী পর্য্যন্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওকে ত্যাগ করে' পালিয়েছে। তাই ত জানতে পেরে অনিতাকে এখানে আনিয়ে রেখেছি।

কথা কহিবার শক্তি আছে বলিয়া মনে হইল ন', ফ্যালফ্যাল করিয়া বৌদি'র মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, ভাবছ কি ভাই, সত্যি তাকে দেখলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না। এমনই ছেলেমানুষ, আজ একমাস থেকে ওঁকে ভাই-ফোঁটা দেবার জন্তে কেবল কল্পনাই করছে। বলে, যখন বাড়ী ছিলুম, দাদার কপালে ফোঁটা দেবার কি হুড়োহুড়ি! হতভাগী আজও সেদিন ভোলে নি, দেয়ালে—উঠছ কেন ভাই?

—হাঁ, না বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইলাম। ওই না দ্বারের ফাঁক দিয়া অনিতার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। আজও সে তেমনই আছে, চোখে সেই দৃষ্টি, মুখে সেই শান্ত সৌম্যতা।

বৌদি' পিছন হইতে ডাকিলেন, ঠাকুরপো, শোন, শোন—

অনিতার অস্ফুট কণ্ঠ হইতে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া দু'টী কথা কানে আসিয়া বাজিল—দাদা!

একবার পিছনে ফিরিবার মত সাহস হইল না চোর যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়, তেমনই করিয়া সামনের পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

দু'পাশের বাড়ীগুলা হইতে তখনও মঙ্গল-শঙ্খ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল। মনে হইল চীৎকার করিয়া বলি—কেন এ মিথ্যা প্রচেষ্টা—এ বক্ষ আর যাহা দিয়াই তৈয়ারী হোক্ না কেন, এত নরম নয় যে, এক আঘাতেই গলিয়া যাইবে। নিতাই-দা'র মত বিরাট্ কপাল লইয়া আসি নাই, এজন্মের মত না হয় ফোঁটা লইতে বঞ্চিত রহিলাম, কিন্তু অন্তরালে বসিয়া যে নারী তাহার দাদার উদ্দেশ্যে দেওয়ালের গায়ে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ফোঁটা দিয়া চলিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা সৃষ্টির কোন দেবতারই নাই। বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে আমার মত হীন দুর্ব্বলের জন্ম অদৃশ্য-দেবতা স্নেহ-করুণা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন—না হইলে পৃথিবী যে শ্মশান হইয়া যাইবে। মনে মনে বলিলাম, রক্তের সম্পর্ককে মিথ্যা করিয়া দিয়া যে মহানুভব তোমার সত্যকার 'দাদা' হইয়াছেন—ও শব্দটা তাহারই জন্ম তুলিয়া রাখ বোন্। দেবতারা ক্ষমা করিলেও তুমি তোমার এই হীন রক্তের সম্পর্ককে স্বীকার করিও না।

বৌদি'র কথা স্মরণ হইল। যাহাকে ক্ষমা করিতে পারি নাই, যাহাকে ত্যাগ করিয়া মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছি মনে ভাবিয়া সকলে প্রশংস-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে, তুমি শুধু জানিয়া যাও, তাহাদের সে কল্পনা মিথ্যা! যদি কখনও মানুষ হইতে পারি, নিতাই-দা'র পায়ের তলায় বসিবার যোগ্যতা হয়, তাহা হইলে আসিয়া ফোঁটা লইয়া নিজেকে ধন্ত করিব। আজিকার মত বিদায় দাও, ক্ষমা কর!

ঘৃণিতা

শ্রীশেফালি মিত্র

মালতী ছিল সকলের পরিত্যক্তা; কিন্তু কামনার আহুতিরূপে পাইতে তাহার পিছনে ছুটাছুটি করিবার লোকের অভাব ছিল না।

রংটা তার ফর্সা না হইলেও মুখ-চোখের শ্রী ছিল অপূর্ব্ব। সে লোকের মনের ভাষা জানিত, তাই কেহ ভালবাসা জানাইতে আসিলে বলিত, —কি গো, তোমরা না ভদ্দরলোক, জাত যাবে না?

সকলে ভাবিত নাগীর দু' পয়সা হয়েছে, তাই মাটীতে পা পড়ে না।

মালতী কিন্তু গৌর বৈরাগীকে একটু স্বতন্ত্র-ভাবে দেখিত, আর গৌরও যেন মালতীকে অন্য চোখে দেখিত।

সেদিন গৌরের মাতৃহীন অবোধ শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া মালতী বলিল,—দেখ্ গৌর, একে আমায় দিয়ে দে তুই।

গৌর উত্তর দিল—সে তো ভালই হয়; আমি আর পারি না! সত্যি নিবি? দেখ্ না, কি রকম কাঁদছে! কিন্তু ওর জ্বালায় দু'দিন পরে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাস্ নি যেন, দেখিস্।

মালতী খোকাকে বুকে চাপিয়া চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করিতে করিতে উত্তর দিল—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। অমন সোনার ধনে আবার জ্বালাতন হয়, তোর যেমন কথা!

গৌর মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

গ্রামের লোকের মাথায় যেন টনক নড়িল। ···তাহাদের কাছে এ অনাচার যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। গৌরের এ অসামাজিকতার জন্য ডাক পড়িল।

গৌর আসিতেই ঘোষাল বলিয়া উঠিলেন—হাঁরে গৌরে, বলি আমরা আছি, না মরেছি?

সশরীরে ঘোষাল-মহাশয় বসিয়া আছেন, কাজেই কিরূপে গৌর মনে করিবে—ঘোষাল-মশায়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। সে উত্তর দিল—কি হয়েছে?

ঘোষাল অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—কি হয়েছে—যেন কিছুই জানেন না! ওই যে মালতী, তোর কাছে আসে যায়—এ কি ভাল? আবার শুনছি না কি তোর ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছে? ছি, ছি, তুই বোষ্টমের ছেলে হয়ে কি না···

রাগে ঘোষালের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

সেদিনের কথা গৌরের মনে পড়িল। যেদিন সে এই শিশু সন্তানটির জন্য সকলের কাছে করুণা ভিক্ষা চাহিয়াছিল, কিন্তু করুণা করা দূরে থাকুক, কেহ একবারও ফিরিয়া চাহে নাই এবং নারী

অছিলায় সকলে একে একে সরিয়া পড়িয়াছিল। আজ তাহারাই কি না···সে আর ভাবিতে পারিল না। তাহার সমস্ত রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—প্রথমে আপনাদেরই তো সাহায্য চেয়েছিলেম ঘোষাল-মশাই। সেদিন তো এর জন্ম মোটেই মাথা ঘামান নি?

এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু ঘোষাল-মহাশয় সহসা দিতে পারিলেন না। শিরোমণি উত্তর দিলেন—তাই বোলে ওই···ছিঃ! তার দেওয়া জল তো খেয়েছে, না হয় প্রাচিত্তির করিয়ে···কি জানিস গৌরে, তোর বাপ ছিল বড় ধার্ম্মিক, আর তুই কি না তার বংশধর হয়ে এত বড় অনাচারটা করবি?

আরও যেন কী বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু দীপ্তকণ্ঠে গৌর উত্তর দিল—প্রাচিত্তির-টির ও সব হবে না শিরোমণিঠাকুর।

সকলে তো অবাক্। গৌর যে এতবড় কথা সকলের মুখের উপর বলিতে পারে, তাহা যে তাঁহারা বিশ্বাসই করিতে পারেন না।

গৌর আর দাঁড়াইল না। সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন।

ঘোষাল বলিলেন—ভেড়া বানিয়েছে হে শিরোমণি, ছোঁড়াকে ভেড়া বানিয়েছে।

এ ব্যাপার গৌর চাপিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু মালতীর কাছে চাপা রহিল না। সে গৌরের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁরে, তোকে না কি সকলে একঘরে করেছে?

গৌর প্রথমে থতমত খাইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে সে উত্তর দিল...হ্যাঁ।

মালতী বলিল—আমায় বলিস্ নি কেন? বিনা মাইনের চাকরাণী পাছে হাত ছাড়া হয়ে যায়, সেই ভয়ে, না?

গৌর ডাকিল—মালতী!

মালতী বলিল—অত ভণিতা শোনবার সময় আমার নেই। ফিরিয়ে নে গৌর, তোর ছেলেকে ফিরিয়ে নে। একদিন চেয়েছিলুম বলেই যে সারা জীবন বইতে হবে, এত মন্দ জুলুম নয়।

সহসা গৌর কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরক্ষণে তাহার চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—বলেছিলাম তো জ্বালাতন হয়ে একদিন তুই-ই ফিরিয়ে দিয়ে যাবি। তাই দে, পারবি নে যখন, তখন সখ করে' দরদ দেখান কেন?

মালতী কোন কথা বলিল না। ধীরে ধীরে খোকাকে নামাইয়া দিল; খোকা কিন্তু মালতীর কাপড় ধরিয়া টানিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কী বলিল, কে জানে! মালতী দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একবার খোকার দিকে, আর একবার গৌরের মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

মালতী চলিয়া গেল দেখিয়া খোকা কাঁদিয়া উঠিল। গৌর তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—চুপ্ কর হারামজাদা ছেলে!

ইহাতে কিন্তু সে মোটেই চুপ করিল না, বরং তাহার গলা পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল।

মালতী তখনও বেশী দূরে যায় নাই। খোকার কান্না শুনিয়া একবার দাঁড়াইল বটে, কিন্তু ফিরিল না।

সকলে শুনিল গৌর প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহার যে সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্ত

সকলে একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

মালতীও শুনিল। কিন্তু একটা কথাও সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিল না। ও'পাড়ায় মেলা বসিয়াছে সাজগোজ করিয়া তাহাই দেখিতে চলিয়া গেল।

কেহ-ই এই নারীর সংবাদ রাখিল না, সকলে তখন গৌর বৈরাগীর বাড়ীতে গিয়া প্রায়শ্চিত্তের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে ব্যস্ত। কিন্তু গৌরের দিক্ দিয়া কোন প্রশ্ন বা উত্তর আসিল না, সে শুধু নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

সকলে বলিল—প্রথম প্রথম এমন হয় বৈ কি, পাখী পুষলেও মায়া হয়, আর এ তো মানুষ। বুঝ্‌লে বাবাজি, এ দু'দিনে সয়ে যাবে। একটা টুক্‌টুকে বৌ আন দেখি—হেঁ, হেঁ···।

গৌর বসিয়া কি ভাবিতেছিল, কে জানে! কোথা হইতে খোকা আসিয়া তাহার গা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে বলিতেছিল—মা-ম্-মাঃ, বা-ব্-বাঃ।

অস্থিপঞ্জরসার শিশুটীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৌর বলিল—তোকে কেউ দেখ্‌তে পারে না ধন, কিন্তু তা' বলে' আমি তো ফেল্‌তে পারি নে!

খোকা কিছু বুঝিল কি না কে জানে,—সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গৌর দু'হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু এত আদর খোকার কাছে অত্যাচার বলিয়াই মনে হইল, সে কাঁদিয়া উঠিল।

খোকা বড় হইয়া উঠিয়াছে। আদর করিয়া গৌর খোকার নাম রাখিয়াছে মাণিক।

মালতীর বাড়ীর পাশ দিয়া স্কুল যাইবার পথ। মাণিক যখন স্কুলে যায়, মালতী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে; তারপর চলিয়া গেলে সেই চলিয়া যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার চোখ দু'টা টন্‌টন্ করিয়া উঠে, তারপর একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়। ঠিক দুইটি বেলাই মালতী এই শুভ-মুহূর্ত্তটীর জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

মাণিকের মাতৃহারা হৃদয়কে জয় করিতে মালতীর দেরী হইল না। একদিন দুইজনে ভাব হইয়া গেল। ক্রমে মালতীর কাছে যাওয়া-আসা মাণিকের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল।

এমনি করিয়া দিন যায়। এই দুইটি আত্মার নিভৃত মিলন অতি সঙ্গোপনেই চলে। কেহ জানিতেও পারে না।

* * ধর্ম্মের কল না কি বাতাসে নড়ে। একদিন মাণিক মালতীর বাড়ীতে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় পিছন হইতে দৃঢ়-কঠোর-কণ্ঠে কে ডাকিল—মাণকে!

মাণিক পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তার পিতা। গৌর প্রশ্ন করিল—রোজ ইস্কুল যাওয়ার নাম করে' বুঝি এখানে আসা হয় পাজি, শুয়ার!

পিতার এরূপ মূর্ত্তি সে তো কখন দেখে নাই। এতদিন সে শুধু আদরই পাইয়া আসিয়াছে।

গৌর মাণিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাড়ী নিয়া হাজির করিল। মাণিকের অভিমানহত ক্ষুদ্র অন্তরটী নিবিড় বেদনায় ফুলিতে লাগিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। পুত্রের অশ্রু দেখিয়া গৌরেরও সমস্ত কঠোরতা জল হইয়া গেল; তাহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। সে মাণিককে

তাহার বুকের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল—সে কী বলে রে?

'সে' যে কে, মাণিক তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে বলিল—কে বাবা?

গৌর উত্তর দিল—তুই যার কাছে যাস্।

উচ্ছ্বসিত হইয়া মাণিক বলিল—ও, মা? আমায় খুব ভালবাসে বাবা। তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

কোন্ সুদূরের একখানি স্মৃতি আজ দীর্ঘ দিনের পরে গৌরের মনের কোণে ভাসিয়া উঠিল···তবে কি সে এতদিন যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে, তাহা মিথ্যা! না না, ইহা কখনই হইতে পারে না।

মালতীর চোখের সামনে কী করিয়া গৌর মাণিককে নির্য্যাতন করিয়া টানিয়া লইয়া গেল, তাহা সে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না। যেন একটা স্বপ্নের মত। সত্য হোক্, আর স্বপ্নই হোক্, দারুণ আঘাতে মালতী সেই যে বিছানা লইল, আর উঠিল না। দিন দিন তাহার জ্বর বাড়িয়াই চলিল।

সেদিন মাণিক আসিয়া ডাকিল—মা!

মালতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই স্বর! মাণিক ঘরে ঢুকিয়া মালতীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল।

মালতী মাণিককে বুকে জড়াইয়া ধরিল। দারুণ উচ্ছ্বাসে তাহার চোখের জল মাণিকের মাথায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মাণিক কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মালতী ঘুমাইলে পর অতি সন্তর্পণে সে দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মাণিক গৌরকে লইয়া যখন আবার মালতীর ঘরে ঢুকিল, তখন মালতী জাগিয়া উঠিয়াছে। গৌরকে দেখিয়া সে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না। তারপর বেশ করিয়া চোখ রগড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিল—হাঁা, গৌরই বটে—সেই গৌর!

মাণিক বলিল—বাবা দেখ্তে এসেছে মা।

গৌর আগাইয়া গিয়া মালতীর গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল। মালতীর সারা দেহ যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল।

গৌর বলিল, শুধু তোমার মুখের কথা শুনেই রাগ করেছিলুম; বুকের কথা জান্বার চেষ্টা না করে কত বড় ভুল করেছি,—আজ তা বুঝতে পেরেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর মালতী!

মালতীর অন্তরের সুদীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অভিমান অপমান যেন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে জোর করিয়া কী যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে আর উঠিতে হইল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূল্যায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার গায়ে হাত দিয়া মাণিক কাঁপিয়া উঠিল। গৌর চীৎকার করিয়া উঠিল, পাষাণি, শুধু ওকে মা বলেই ডাকালি, তবে তার সে অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত করে' চলে গেলি!

গৌরের এই ব্যথামাখা অশ্রু-সজল-বাণী, করুণ ক্রন্দন, সেই বিজয়িনী নারীর কাণে পৌঁছিয়াছে কি?—কে জানে!

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪০ | সপ্তম সংখ্যা

ঢাকের দায়ে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সময়টা না কি বড়ই খারাপ পড়িয়াছে। সংসারে মনোযোগ না দিলে আর ভদ্রস্থ নাই। সওদাগরী অফিস; কাটা মাহিনা লইয়া মাস-কাবারের হিসাব করিতে হয়। শুনিতেছি, বড় বড় অফিসেও কলরোল উঠিয়াছে।—'রিট্রেঞ্চ-মেণ্টে'র কাঁচিতে অনবরত শাণ পড়িতেছে; আঙুলের ফাঁকে কাঁচির ব্যাদিত বদনও বিভীষিকা দেখায় বৈকি। চাল কিছু নামিয়াছে, কিন্তু চুলার দর সমানই আছে। কাজেই দশ বৎসরের দোতলার সুখ ছাড়িয়া শুড়ায় আসিলাম। পাকা ইমারত হইতে খোলার ঘর! কিন্তু কাটা মাহিনার সদগতি উহার মধ্যেই হইয়া গেল।

পানা পচা পুকুর? মশার মিছিল ও খোলা ড্রেণের দুর্গন্ধ? রাম বল! দু'দিন বাস করিলেই চামড়া না কি পুরু ও দুর্গন্ধ না কি নাক সহা হইয়া যায়। একটা ভয়কে কিন্তু কোনক্রমেই ঠেকাইতে পারিলাম না। কলিকাতায় দোতলা বাড়িতে বাস করিবার কালে প্রাচীর বা বেড়ার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া বুঝিলাম, ও গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উঁচু রেললাইন ধরিয়া সময়ে-সময়ে কত আগন্তুকই আসেন ও অসতর্ক গৃহস্থের উপর মাঝে মাঝে সতর্ক বাণীও প্রচার করিয়া যান। গৃহস্থ ক্ষতির পরিমাণে খানিক কাঁদে, বড় জোর গাল দেয়। আপনারা হয় ত বলিবেন, আমাদের মত যত মাস গোণা কেরাণীর কক্ষে কি বহু মূল্য রত্নই বা আছে যে, ঐ সব জ্ঞানদাতাদের লুব্ধ চক্ষুকে আকর্ষণ জানাইবে। কিন্তু মাসের খবর—ভাগ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া খড়কুটা চালডালগুলিকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না এবং একটি পয়সা হারাইলে অর্থক্ষতির শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ি।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া একদিন স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করিলাম, বাড়ির মালিককে পাকা প্রাচীর একটা তৈয়ারী করিবার অনুরোধ জানাইব।

বাড়িওয়ালাকে জানাইলে সে এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত মাথা হেলাইয়া কহিল, দুর্ম্মূল্যের বাজার মশাই, নইলে ও বাড়ীর ভাড়া কি দশ টাকা। বলিয়া করুণচক্ষে তাঁর খোলা ভাঙা খোঁয়াড়ের পানে চাহিলেন।

সুতরাং বাক্যব্যয় বৃথা বুঝিয়া নূতন পন্থার আবিষ্কারে মনোযোগ দিলাম।

অকস্মাৎ চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—ঠিক ঠিক, একথাটা এতদিন মনে হয় নাই। হাতের কাছে উপায়—অথচ ?

বাড়ি আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, হয়েচে একটা উপায়।

স্ত্রী বলিল, কি গো, কি উপায় ?

বলিলাম, সাহেব ক'দিন ধরেই ব'লচে, কিন্তু কাণ দিই নি। আজই গিয়ে ব'লতে হবে।

—কি গো ?—

আপন-মনে বলিলাম, কি আহাম্মুখ আমি ! হাতের কাছে উপায়—অথচ মরচি লোকের খোসামোদ ক'রে।

—কি গো—বলই না !

স্ত্রীর অধৈর্য্যভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম, একটা কুকুর গো—একটা কুকুর। বাড়িতে থাকলে চোরের বাবারও সাধ্য নেই—

স্ত্রী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কুকুর এলে ত ঘর-দোরের অভাব ! ছোঁয়া-নেপা—বলি থাকবে কোথায় ?

বলিলাম, সে কি আর ঘরে বিছানায় শোবে ? বাইরে ওই ছাঁচতলায় শুয়ে বাড়ি চৌকি দেবে। ছোঁয়া-নেপার ভয় দেশী কুকুরকে। এ যে খাঁটি বিলিতী জিনিষ। তথাপি স্ত্রীর খুঁতখুঁতানি গেল না।

—একে ত সংসারের আয় বাড়ন্ত। কুকুর পুষতে হ'লে দু'বেলা কাড়ি যোগাবে কে ? শেষ পরে কি –

—না গো না। এ বিলিতী কুকুর—খায়—এই সত্যিকার এত ক'টি। আমাদের পাতের যে ভাত ফেলা যায়—তাতে অমন চারটে বিলিতী কুকুর পোষা যায় ! একি দেশী কুকুর যে, একসের চালের ভাতও পড়তে পায় না !

খরচ কিছুই নাই—অথচ জিনিষ-পত্র খোয়া যাইবার দায়ে নিশ্চিন্ত। স্ত্রী রাজি না হইয়া পারিল না।

বুঝিলাম, রাজি হইবার তার আর একটি গুহ্য কারণ আছে।

পাশের দোতলা বাড়ির গৃহিণী জানালায় বসিয়া আমাদের তত্ত্ব মাঝে মাঝে লইয়া থাকেন। অফিসের ভাড়া কাটিয়া গেলে,—দ্বিপ্রহরের অবসরটুকু ওই দোতলার কক্ষে বসিয়া দিব্য গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া চলে। কুকুর থাকিলে বাড়ি আগলাইবে। ছেলেদের মিষ্টের লোভ দেখাইয়া খোসামোদ করিতে হইবে না।

তথাপি মুখে সে বলিল, খরচ-পত্তর যদি না হয়, ছোঁয়া-নেপার ভয় যদি না থাকে ত এনো না হয়।

সেইদিন রাত্রিতে ও-পাশের খোলার বাড়িতে একটা গোলগোল উঠিল। আলো জ্বলিল, লোকজন ছুটাছুটি করিল এবং খানিক পরে ক্রন্দন ও গালির কোলাহল ঠেলিয়া এই কয়টী কথা কাণে আসিয়া পৌঁছাইল বাকী আর কিছু রাখে নি গো—বাকী আর কিছু রাখে নি—সর্ব্বস্ব নিয়ে গেচে।

স্ত্রী আমার গায়ে হাত ঠেলিয়া কহিল, শুনচো ? চুরি হয়ে গেল। তুমি বাবু কালই কুকুরটাকে এনো।

অন্ধকারে হাসিয়া বলিলাম, আচ্ছা।

পরদিন অপরাহ্ণে।

কুকুর দেখিয়া স্ত্রী মুখ বাঁকাইল, ও মা—ও কি গো! ও যে একরত্তি বাচ্চা। ও আগলাবে বাড়ি—তবেই হ'য়েচে!

বলিলাম, বাচ্চা বড় হবে একদিন—দেখবে তখন ওর রোক্। মাস দুই আর একটু সাবধানে থাকতে পারবে না?

কল্য রাত্রির কথা মনে পড়িতেই স্ত্রী বলিল, তা' না হয় থাকলুম, কিন্তু বাচ্চা ত শুধু ভাত খেতে পারবে না।

বলিলাম, না—দিনকতক ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। দেখ ভেবে, যদি খরচ বেশী ব'লে মনে কর ত যাদের চুরি হয়েচে—তাদেরই দিয়ে দিই।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলিল, ওমা গো!—তা' আর নয়? মাস দুই না হয় হ'লোই একটু খরচ—তা' ব'লে ওদের দিয়ে দিতে হবে?

বলিয়া বাচ্চাটিকে কোলে তুলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরদিন অফিস হইতে ফিরিয়া ঘরের কোণে জামা টাঙাইতে গিয়া দেখি, কোণে সাদা মত কি-একটা রহিয়াছে। হেঁট হইতেই বুঝিলাম আমারই আনীত শিশু কুকুরটি দিব্য কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। একখানি চটের উপর ছোট একখানি কাঁথা পাতা, তার উপর ধোপ-দস্ত কাপড়ের খানিকটা চাদরের কাজ করিতেছে। বইয়ের সেল্‌ফটা কোণ হইতে সরাইয়া পাশে রাখা হইয়াছে।

একদৃষ্টে কুকুরের নিদ্রাবিলাস দেখিতেছি, স্ত্রী আসিয়া বলিল, অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো? হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও।

বলিলাম, একেবারে ঘরের মধ্যে—

স্ত্রী মুখভার করিয়া বলিল, কি করি বল, পোড়ারমুখো কুকুরকে পোয়ালে রাখলে খালি কেঁউ কেঁউ করে। একরত্তি নরম তুলোর মত বাচ্চা—ওর আবার ছোঁয়াছুঁয়ি।

একটু হাসিয়া, একফোঁটা হ'লে কি হয়, দুষ্টু-বুদ্ধি ওর পেটে পেটে। কিছুতে কি ভাত খেলে? একটি দানাও না। চক্‌চকিয়ে আধ-বাটি দুধ খেয়ে ঘুমুচ্চে।

বলিলাম, ছোট কাঁথা কোথায় পেলে?

স্ত্রী তেমনই হাসিয়া বলিল, শোন কথা—পেলুম কোথায়? তোমার রাজা কুকুর না শোয় মাটীতে, না চটে। কি করি, সারা দুপুর ব'সে কাঁথা সেলাই ক'রলুম। খোকার ছেঁড়া কাপড় কেটে চাদরও একটা ক'রেচি। কিন্তু দেখ, স্যাঁতা মেঝেতে শুলে ও কিছুতেই বাঁচবে না।

—তবে কি খাট অর্ডার দিতে হবে না কি?

—খাট নয়। পায়রার খোপের জন্তে যে কেরাসিন কাঠের বাক্‌সো এনেছিলে না, তাই থেকে পেরেক পুঁতে একটা তক্তা বানিয়ে দিয়ো; ওই কোণে পাতা থাকবে, তাতেই ও শোবে।

সুতরাং পরদিনই খাট তৈয়ারী করিয়া দিলাম।

সকাল-বিকাল বা রাত্রি কোন' সময়েই কুকুরটিকে কেঁউ কেঁউ করিতে শুনি না। হয় দেখি—দিব্য আরামে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে, না হয় ঘুরঘুর করিয়া ঘরময় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রী কোলে করিয়া কখনও বা নাচাইতে থাকে, রহস্য করিয়া কখনও বা আমার কোলে 'ঝুপ্' করিয়া ফেলিয়া দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে।

ভাতের দানা তার পেটে যায় কি না—অতঃপর শুনি নাই। কিন্তু কৌটোর কোণ ... তার সর্ব্বক্ষণই ঠেলিয়া থাকিতে দেখি। এক

সেই ঠেলাতেই শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় তার দিন দিন বৃদ্ধি।

স্ত্রী বলে, ভাল ক'রে খায় না—দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্চে।

উত্তর দিই, মাসকাবারে গয়লার বিল যে দস্তা ভারি হ'য়ে উঠচে।

উত্তর শুনি, ছাই দুধ! ওরা মাংসখোর জাত। এক-আধখানা হাড় না চিবুলে দাঁত শক্ত হবে কেন?

কুকুরের দাঁতও যত শক্ত হইতে থাকে—আমার অাঁতও তত শুকাইয়া উঠে।

মাস দুই পরে—তার কেঁউ কেঁউ ঘুচিয়া ভেউ ভেউ সুরু হইল। বাড়িতে কাণ পাতা দায়।

তাড়া দিবার যো নাই। স্ত্রী শাসাইয়া বলে, ও কি গো, ডাকুক না একটু। কুকুরের রোক্ না বাড়লে চোরে ভয় খাবে কেন?

যদি বলি, তবে ওটাকে আর ঘরের মধ্যে রেখো না, রাত্তিরে ছেড়ে দিয়ো—

ভয়ে মুখ পাংশু করিয়া স্ত্রী বলে, হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা! ওই একরত্তি বাচ্চা—হিম লাগলে আর বাঁচবে।

স্ত্রীর সকল আশঙ্কাকে বিফল করিয়া কুকুর কিন্তু বাঁচিয়াই রহিল। শুধুই বাঁচিল না, বেশ একটু শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল—এবং দিনে দিনে তার তার 'রোক্' বাড়িতে লাগিল।

একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, সে এমন রোকের পরিচয় দিয়াছে, যাহা আনন্দোৎফুল্ল-কণ্ঠে পাঁচজনের সামনে ব্যক্ত করিবার নহে।··· এবং তাহার ফলে বইয়ের আলমারিটা সে ঘর হইতে সরিয়া গিয়াছে।

স্ত্রী মুখভার করিয়া বলিল, ওটারই বা দোষ কি? দুপুরবেলায় ওদের গিন্নি ডাকলে, গেলুম। কথায় কথায় একটু দেরী হ'য়ে গেল। ফিরে দেখি, একরাশ ছেঁড়া বইয়ের মধ্যে নন্দ-গোপাল ঘুমিয়ে র'য়েচেন। এমন রাগ হ'লো, দিলুম চড় লাগিয়ে। দিতেই সে যা' কেঁউ কেঁউ। ব'লবো কি চোখ দিয়ে জল প'ড়তে লাগলো। ওর কান্না দেখে আমিও মরি কেঁদে। ভাবলুম, ও ত তোমার কোন্‌কেলে পড়া পুরোনো পচা বই, গেচে যাক্। তার জন্যে ওটাকে কেন মারি? সত্যি, এমন মায়া হ'লো ওর মুখ দেখে। তুমি দেখলে—তুমিও কাঁদতে।

না দেখিয়াই চোখ ঠেলিয়া জল ঝরিতে চাহিতেছে। বই যে পচিয়া অপাঠ্য হইয়া যায় এবং অন্য সব বিষয়ের মত পুরানো বলিয়া পুস্তককেও অবজ্ঞা করা যায়, এই প্রথম শুনিলাম।

সে এক সময়ের কথা।

যখন হোষ্টেলে থাকিয়া পৃথিবীকে নূতন করিয়া আস্বাদ করিতে শিখিতেছি। জগতটা ছিল সুবিস্তীর্ণ, আশা ছিল পরিধির পারে। কামনার ইন্দ্রধনু সপ্তবর্ণ রঞ্জিত হইয়া চিত্ত-আকাশে নিত্যই দেখা দিত। তখন বইয়ের মধ্যেই ছিল আমার অখণ্ডিত উল্লাস, বউয়ের সীমায় সে আত্মসমর্পণ করে নাই।

সেই পুরানো জবাবের অবশিষ্ট সম্পদ্ বই-গুলি গেল। দুর্ব্বহ স্মৃতি হইতে সে আমায় মুক্তি দিল। তার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া ক্ষোভে চোখের জল ফেলিবার উপক্রম করিতেছি?

জোর করিয়া হাসিলাম, বেশ হ'য়েচে।

স্ত্রীও হাসিয়া বলিল, আমি জানি অদরকারী জিনিষ, ও ত দু'দিন পরে উইয়ে কাটতোই। তাই গোয়ালের মাচায় তুলে রেখে এলুম।

এদিকে কুকুর সমস্ত দুরন্তপনা লইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অফিস হইতে ফিরিয়া তার ক্ষুদ্র দুরন্তপনার কাহিনী আর শুনিতে পাই না। হয় ত সে কাহিনীতে গৌরবকর কিছু ছিল বলিয়াই গৃহিণী নীরব হইয়া গিয়াছে।

দিনকয়েক পরে গৃহিণী বলিল, কাল একটা শেকল কিনে এনো ত।

বিস্মিত-কণ্ঠে কহিলাম, শেকল, কেন ?

—কুকুর বড় হ'চ্ছে না ? বাঁধতে হবে না ?

হাসিয়া বলিলাম, যাক্ বাঁচা গেল। কাল পর্য্যন্ত শুনেচি—বাচ্চার গলায় শেকল পরালে ও ম'রে যাবে।

—তা' হোক্, তুমি এনো। বলিয়া স্ত্রী উঠিয়া গেল। শিকল আসিলেও কুকুর কিন্তু বাঁধা পড়িল না। মাত্র পাঁচ মিনিট বাঁধিতেই সে যা' চীৎকার! গৃহস্থের প্রাণ বাঁচানো দায় হইয়া উঠিল।

সে ছাড়াই রহিল এবং বয়োধর্ম্মপ্রভাবে শীঘ্রই কীর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বইয়ের রাশি শেষ হইয়াছিল। খাটের পায়াগুলিও দেখিলাম, তার দন্তাঘাতে জরজর।

লেপ, তোষক, কাঁথা, চাদর, বালিশের প্রায়ই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে সবের অবস্থাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু স্পষ্ট বুঝিলাম সেইদিন, যেদিন দ্বিপ্রহরে কুকুর প্রহরী রাখিয়া গৃহিণী এক উঠান ভিজা কাপড় দড়িতে শুকাইতে দিয়া পাশের বাড়িতে পুনরায় গল্প করিতে গিয়াছিল। এবং ফিরিয়া আসিয়া কীর্ত্তিমন্তের যা' কীর্ত্তি দেখিল, তাহা অপ্রকাশ রাখিবার হেতু সে খুঁজিয়া পায় নাই।

একে মাসের শেষ—তদুপরি দু'জোড়া ছাড়া চার জোড়া কাপড় কাহারও নাই। কুকুরের দন্তাঘাতে সেগুলির অবস্থা এমন শোচনীয় যে, 'রিপু' পর্য্যন্ত অচল। (ছুঁচ চলিলে কি আর এ কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাইতাম!)

এখন একমাত্র উপায় 'আদম ইভে'র উপাসনা করা। আদিম যুগে ফিরিয়া যাইতে না পারিলে এ দায় হইতে নিষ্কৃতির অন্য উপায়ই বা কি ?

কিন্তু উপায় ছিল। স্ত্রী সেই প্রস্তাবই করিল।

—দেখ, কিছু ধার ক'রে এ মাসটা চালাও। কাপড়, ও চাই-ই। এবার সাবধান হ'লেই হবে। মরুক চেঁচিয়ে কেঁদে—শেকল দিয়ে এবার বাঁধবো—বাঁধবো—বাঁধবো—এই তোমায় বললুম।

কথায় বলে বিপদে পড়িলে বুদ্ধি যোগায়। টাকা কিছু ধার করিলাম এবং কিছু বুদ্ধিও। স্ত্রীকে বলিলাম, আসচে মাস থেকে আমাদের মাইনে না কি আর কাটবে না। মনে করেচি—ক'লকাতাতেই ফিরে যাব।

স্ত্রী খুসী হইতে গিয়া দুঃখিতই হইল, কিন্তু সেখানে কুকুর রাখা—

বুঝিলাম কম্বলী শীঘ্র ছাড়িবে না। মনে মনে আর একটা মতলব আঁটিয়া কহিলাম, ওকেও না হয় নিয়ে যাব।

তারপর—একদিন, বাসা উঠাইবার পূর্ব্বদিন অকস্মাৎ কুকুর হারাইয়া গেল।

বাজার হইতে ফিরিতেই স্ত্রী খুব খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কাঁদিল। অনুসন্ধানের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কুকুরের নাম ধরিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে। আমি খানিক চেঁচাইলাম। কিন্তু ঘুমন্ত লোককে জাগাইয়া তোলা কিছুমাত্র কঠিন নহে, জাগিয়া ঘুমাইলেই মুস্কিল! যে কুকুর হারাইবে জানি—তাহাকে ডাকিয়া বাহির করা—তেমনই কঠিন নহে কি ?

আসল কথা,—কাটা মাহিনার অঙ্কও বিলে যোগ হয় নাই, কুকুরও হারায় নাই। মাসের পাঁচটা টাকার কমবেশীতে আমাদের মত কেরানিদের কতটুকু বা যায় আসে। যে হেতু খণ্ডের লিখন খণ্ডাইবার নহে।

চোর ঠেকাইতে গিয়া যে লোকসান এতাবধি দিয়া আসিতেছি—হিসাব করিয়া দেখিলে শহরের সমস্ত চোর মিলিয়াও তত ক্ষতি আমাদের করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

আরও, স্ত্রীর অপত্যস্নেহের পরিণাম যে আমাদিগকে পঞ্চাশের বহুপূর্ব্বেই সম্পূর্ণ বিশ্রামের শেষ কোঠায় জোর করিয়া ঠেলিয়া দিবে—সে আশঙ্কা প্রচুরতর ছিল বলিয়াই কুকুরটি.ক হারাইতে হইল।

নীড়হারা

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত
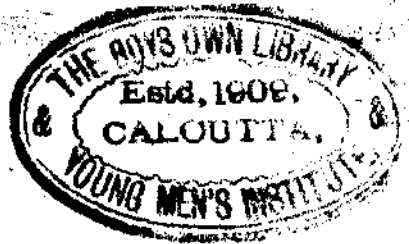
চিতার উপর শোয়াইয়া শেষবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।...

বাইশ বছর মাত্র বয়স, ইহার মধ্যে সে তার জীবনের সমস্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্য আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া পরিপূর্ণ যৌবন লইয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা।...

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইয়াও মুখাগ্নি আমাকেই করিতে হইল, তা' ছাড়া করিবেই বা আর কে? কিছুক্ষণের মধ্যেই চিতা দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।...

কাশীমিত্রের শ্মশান-ঘাট।

দূরের দুইটি চিতাও কিছুক্ষণ হইল ধরানো হইয়াছে। বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোর সহিত আগুনের ফুল্‌কী আর ধোঁয়া মিলিয়া মিশিয়া শ্মশানের আবহাওয়াটাকে অদ্ভুত করিয়াছে।

আমি আর বন্ধু রাখাল দুইজন স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া, পাশে কয়েকজন লোক নানারূপ আলোচনায় ব্যস্ত, কেবল একটী সধবা স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া কোনও ফল নাই মনে করিয়া রাখাল ও আমি পাশের ওয়েটিংরুমে গিয়া বসিলাম।

রাখাল বলিল—"তোমার কথায় শ্মশানে এলাম, পরোপকারও ত হ'ল; আর যা' দেখ্‌ছি, রাত্তিরটা এখানেই কাটাতে হবে। সেদিন জান্‌তে চেয়েও শুন্‌তে পাই নি, আজ আদ্যোপান্ত বল্‌তে হবে ওই মেয়েটার ইতিহাস।"

অখ্যাত নারীর ইতিহাস শুনিবার দারুণ ঔৎসুক্য রাখালের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমি অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। চিতায় যে পুড়িতেছে, তাহার ইতিহাস জানাইয়া তাহাকে তাহার কর্ম্মের পুরস্কার দিতে হইবে। এমন কি, স্মরণীয় কাজও করিয়া গিয়াছে, যাহা ইতিহাস নাম ধারণ করিতে পারে।

বলিবার আগে সিগারেট কিনিবার জন্য দুই-জনে বাহির হইয়া শ্মশানভূমির উপর থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।...

দুইটী যুবক একটী শিশুর মৃতদেহ বহিয়া আনিয়াছে। শিশুর মৃতদেহ বহু দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটি আর চোখে পড়ে নাই। লাল জামা পরা, ঘুমন্ত শিশু, যেন ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা।

দু'-একটী প্রশ্নে বুঝিলাম, এম্‌নি জ্বররোগে ও মরিয়াছে, উহারা প্রতিবেশী, অন্য কোনও লোক না থাকায় উহাদের শ্মশানে আসিতে হইয়াছে।

উৎসাহী, উদ্যমী তাহারা। একজন চিতা-রচনায় লাগিয়া গেল, আর অপরজন খুলিতে লাগিল শিশুর রাঙা জামা, মাদুলী দুইটা—ছুরি দিয়াই তাহাদের কাটিতে হইল। নগ্ন দেহটার পানে চাহিয়া মনে হইল,—যেন শেফালী ফুল, শিশিরের ঘায়ে এখনি ঝরিয়া পড়িয়াছে। বিজলীর আলোয় দেখিলাম, শিশুর কাঁথাখানির উপর কাঁচা হাতে তোলা দু'লাইন ছড়া।..

আর না দাঁড়াইয়া সিগারেট এক প্যাকেট কিনিয়া আনিলাম। ততক্ষণে চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমাদের ধরানো চিতাও সমান তেজে জ্বলিয়া যাইতেছে।

স্পষ্ট অনুভব করিলাম, শ্মশানের আবহাওয়া

দয়-বিদারক, করুণ হইলেও বড় উপভোগ্য।...

সিগারেট ধরাইয়া আমাদের পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া দেখিলাম, অক্লান্ত শ্মশান-যাত্রীরা সেখানে নূতন গল্প চালাইয়াছে। 'কাহার মাসী আহ্নিক করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন', 'কে শ্মশানে জলন্ত চিতা হইতে শব দেহ উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছে, বা কোন্ ছোক্‌রা একদিন অপরের কয়টা শব পুড়াইয়া পরোপকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে',—এই সকলই হইতেছে তাহাদিগের আলোচনার বিষয়বস্তু।

বাধ্য হইয়া আমরা বাহিরের বারান্দায় আসিলাম। বেঞ্চ একখানি পড়িয়াছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম। সামনেই শব্দহীনা ভাগীরথী, কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকারে গা মিশাইয়া যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কালো আকাশ ও জল মিলিয়া-মিশিয়া সব একাকার মনে হইত —যদি না ওপারের মিলের একসার আলো পরস্পরের বিভিন্নতা উপলব্ধি করাইত।...

রাখাল একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—"মেয়েটির কাহিনী শোনাও হে, আজ রাত্রের এই প্রচুর অবসরে না শুন্‌লে আর কবেই বা শুন্‌বো।"

গা ঝাড়া দিয়া বলিতে লাগিলাম,—

"বন্ধু সুশীলকে তুমি দেখিয়াছ এবং তাহার অনেক কিছু গল্প তোমার কাছে করিয়াছি। একই দেশে আমাদের বাড়ী, দেশের স্কুলে একই শ্রেণীতে দুইজনে আমরা পড়িতাম। স্কুলে ও গ্রামের সকলের কাছে সে বেশ নাম করা ছিল। অত্যন্ত দুরন্ত হইলেও পড়া শুনায় সে সর্ব্বদা সকলের উপরে ছিল।...

"দেশে ওই ছিল আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু। এক সাথে বেড়ান, খেলাধুলা, এমন কি পড়াশুনা পর্য্যন্ত সে পাশে না বসিলে আমার হইত না। সুশীলের বাড়ীই ছিল যেন আমার বাড়ী। সুশীলের বোন পারুল আমায় ভালবাসিত খুব বেশী। হ্যাঁ পারুলই তার নাম, যে এখন চিতায় পুড়িতেছে।...

"পারুলের সকল আব্‌দার আমি নির্ব্বিবাদেই সহ্য করিতাম। পুতুলের বিবাহে বহুবার আমায় পৌরহিত্য করিতে হইয়াছে। পুতুলের শ্বশুর সাজিয়া পুতুলকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবার জন্য কপট মিনতি কতদিন সে আমার নিকট করিয়াছে। আজিও তাহা ভুলি নাই, চোখে বায়স্কোপের ছবির মত একটার পর একটা ভাসিয়া উঠে।

"চিরদিন মানুষের একভাবে যায় না, তাই ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আমি পড়িতে আসি কলিকাতার কলেজে, আর সুশীল তার বোনকে বাপের কাছে রাখিয়া দৌলতপুর কলেজে পড়িতে যায়।...

"চিঠি-পত্র কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়। বাবা কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়া দেশের সকলকে এখানে লইয়া আসিলেন। কাকাবাবু মধ্যে মধ্যে দেশে যাইতেন বটে, আমার কিন্তু যাওয়া আর হইত না। এখন কাকাবাবুও দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। দীর্ঘদিনে পারুল বা সুশীলের খবর না পাওয়ায় উহাদের প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।...

"এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় অফিস হইতে ফেরার পথে হঠাৎ হেদোর ধারে সুশীলের সঙ্গে দেখা। হাস্যচঞ্চল ও কৌতুকপ্রিয় যে সুশীলের রূপ আমার হৃদয়পটে আঁকা ছিল, তাহার কোনও খানটার সহিত মিল আমি ইহার মধ্যে পাইলাম না। গায়ে একটা খদ্দরের ছেঁড়া ময়লা সার্ট, পায়ে বহুদিনের পুরাতন তালি-খাওয়া চটী, আর পরণের ধুতিখানি ময়লা জমিয়া এমনি বিবর্ণ ও বিশ্রী হইয়াছে, যাহা পরিয়া কোনমতেই বাহির

হওয়া যায় না জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, ঠিক যেন নরকঙ্কালের মত।

"উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হে, খবর কি? এ কি চেহারা তোমার!…'

"বাকী কথা সে আমাকে বলিতে না দিয়া কহিল,—'চল, পার্কের বেঞ্চে একটু বসা যাক্। আজ হঠাৎ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে, এ আশাই করি নি।'

"একটা খালি বেঞ্চ আমরা অধিকার করিলাম।

"কিছুক্ষণ থামিয়া সুশীল বলিল, 'অনেক কিছু ঘটে গেছে ভাই এই কয় বছরে, সেগুলো তোমাকে বলা দরকার মনে করি।' এইটুকু বলিয়াই সে মলিন কাপড়ের খুঁটে দু'-তিনবার চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

"রোদনের বেগ সামলাইয়া লইয়া গা ঝাড়া দিয়া বলিতে লাগিল,—'ম্যাট্রিক পাশ করে' তুমি এলে কোল্‌কাতায় আর আমি গেলাম দৌলতপুরে। পরীক্ষা দেবার কিছুদিন আগে টেলিগ্রামে বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেশে এসে বাবাকে আর দেখ্‌তে পেলাম না। রইলাম শুধু পারুল আর আমি। লেখাপড়ার সেইখানে হ'ল ইতি। জমি-জমার আয়ে দিন আগে যেমন চল্‌ছিল, তেমনি চল্‌তে লাগ্‌লো। একটা টিউস্‌নী কোনরকমে যোগাড় করে' নিয়েছিলাম। মোট কথা, দুই ভাই-বোনের বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিন চলে যাচ্ছিল। ভগবান আমাদের সে সুখে বাদ সাধ্‌লেন!…

'বাবা মারা যাওয়ার বছরখানেক পরে কোল্‌কাতা হতে একদল ছেলে এলো পল্লীসংস্কার করাতে আর গাঁয়ের লোকদের খদ্দর পর্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌তে। তাঁবু পড়লো আমাদের বাড়ীর পাশে সেই চৌধুরীদের মাঠ্‌টায়। জন সতেরো ছেলে আর তাদের একজন নেতা, নাম তার অবনী রায়। দলের ছেলেরা তাঁকে অবনী-দা' বলে' ডাকতো।

'একদিন অবনী-দা' এসে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন। স্বামী বিবেকানন্দের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার বিশেষ মিল; বিশেষতঃ, পাগড়ীবাঁধা মুখখানি অবিকল স্বামীজীর মত।

'আমার থেকে পারুল তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠ্‌লো। আজানুলম্বিত হাত দু'টী নেড়ে জলদ্-গম্ভীর স্বরে তাঁর কথা বল্‌বার ভঙ্গিটী ছিল অপরূপ। স্বামিজীর সমস্ত কবিতা ও বাণী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; যখন-তখন তিনি সেগুলি আওড়াতেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর কাছ ছাড়া থাক্‌তে পারুল বিশেষ কষ্ট অনুভব কর্‌তো। কাজকর্ম্ম সেরে ছেলে পড়িয়ে আমি প্রায়ই এসে দেখ্‌তাম যে, পারুল তাঁর কাছে বসে' নানা আলোচনায় ব্যস্ত।…

'অবনী-দা' পারুলের হাতের রান্না চেয়ে চেয়ে খেতে লাগ্‌লেন। তাঁর স্বদেশী বক্তৃতায় আমি মেতে উঠেছিলাম, কিন্তু দেশের জন্য পারুলের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো আমার চেয়ে ঢের বেশী।

'তারপর একদিন অবনী-দার কথায় ভুলে দেশের জমী-জমা ভাগে বিলিয়ে দিয়ে তাঁর ছেলের দলের সঙ্গে আমরাও চলে এলাম কোল্‌কাতায়।

'টালার দিকে একখানা বাড়ী তিনি সস্তায় ভাড়া নিলেন—পনেরো টাকায়। একতালা বাড়ী, পাঁচখানা তার বড় বড় ঘর।

'স্বদেশসেবা-সঙ্ঘ নাম দিয়ে সেটাকে তিনি আশ্রমে পরিণত কর্‌লেন। আর প্রচার করা হ'ল,—স্বদেশ সেবাই সেই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। পারুল হ'ল আশ্রম-মাতা। একজন রাঁধুনী বামনী মাইনে করে' রাখা হ'ল, তিনি হ'লেন আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্রী।

'কেমন করে' জানি না প্রচার হয়ে গেল,—অবনী-দা' হচ্ছেন আশ্রমের গুরু; অর্থাৎ, সর্ব্বেসর্ব্বা।

'পিকেটিং, খদ্দর বিক্রী, আমি আর দলের সেই জন সতেরো ছেলে করতুম। পারুল আর অবনী-দা' আশ্রমে চুপ্‌চাপ্‌ বসে' থাক্‌তো। দলের ছেলেরা আড়ালে-আব্‌ডালে এ নিয়ে নানা রকম ইতর রসিকতা করতে সুরু করলে।

'আমার মনে তখনও মোহের জের উজান-স্রোতে ব'য়ে চলেছে। মনে মনে হাসতুম,—সঙ্কীর্ণতা দেখ না, এরাই করবে দেশ-উদ্ধার, মানুষের সম্বন্ধে যাদের এত হীন ধারণা!

'কেন বল্‌তে পারি না, একদিন হঠাৎ অবনী-দা' আমায় ডেকে বললেন,—'হ্যাঁ হে, পারুলের সঙ্গে গল্প করি, খোলাখুলি মিশি, এতে কি তুমি অসন্তুষ্ট?'

'হাসি পেল। বুঝতে বাকী রইল না যে, সেদিন পারুলকে এই নিয়ে দু'-এককথা বলেছি, সেটা সে ভুল ধরে' অবনী-দা'র কাছে অভিযোগ করেছে।

'বললাম,'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আপনি ঘরে বসে' থাকবেন, আর পাঁচজন খেটে মরবে কেন? তারা যদি বলে, 'আমরা চোরদায়ে ধরা পড়েছি না কি।' কি উত্তর দেবেন বলুন ত? তা' ছাড়া, সবার কাছে অশ্রদ্ধা কিনে আপনার লোকসান না হ'তে পারে, আমাদের হয়; কেন না, আপনাকে আমরা ভালবাসি, আপনার কর্ম্মপথকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

'অবনী-দা' ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' খানিক আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন! তারপর বল্‌লেন, 'আচ্ছা, আমিও কাল থেকে তোমাদের সঙ্গে বেরুব।'

'তারপরথেকে অবনী-দা' আমাদের সঙ্গে বেরুতেন। লোকের মুখ কিন্তু এতেও বন্ধ করা সম্ভব হ'ল না। সবাই বলত, 'এমন বেরুনোর চেয়ে না বেরুনই ছিল ভাল! ফরমাস করছেন, আর চাঁদার পয়সা নিয়ে দোকানে চায়ের শ্রাদ্ধ করছেন বই ত নয়।'

'সে কথায় কাণ দিতুম না।

'সামনের কর্ম্মস্রোতের টানে এমনই ভেসে চলেছিলুম যে, ও সব তুচ্ছ কথায় কাণ দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করতুম না।

'একদিন কিন্তু আমার সমস্ত কল্পনারাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল! ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি মদের গন্ধে চারিদিক ভরপুর; আর অবনী-দা' মড়ার মত পড়ে'; পারুল তাঁর মাথায় জল আছ্‌ড়া দিয়ে পাখা করছে।

'বুঝতে কিছু বাকী রইল না। মাথা আমার রাগে ও দুঃখে বোঁ বোঁ করে' ঘুরতে লাগল্। ইচ্ছা হ'ল অবনী-দা'র গলাটাকে টিপে জন্মের মত নিশ্বাস বন্ধ করে' দি; চীৎকার করে' বলি, 'মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মত মহাপাপ আজও সৃষ্টি হয় নি—অদূর ভবিষ্যতের হাতে এ বিচারের ভার তোলা রইল! কিন্তু আমার মহত্তর কল্পনার পথে বিঘ্ন দিয়ে তুমি যে ক্ষতি করলে, কিসের বিনিময়ে তার পূরণ হবে বল্‌তে পার?'

মুখ দিয়া কিন্তু একটা কথাও বা'র হ'ল না। 'আঙুল বাড়িয়ে শুধু রাস্তার পথটা তাকে দেখিয়ে দিলুম।

'একটী কথা না বলে' সে বেরিয়ে গেল। ভক্তের দলও বেগতিক বুঝে সরে' পড়ল।

'বাড়ীওয়ালার ক'মাসের বাটীভাড়া, মুদীর দোকানের উটনো পাওনার হিসাব ইত্যাদি করে' একরাশ দেনার ফর্দ্দ হাতে এসে পড়তে লাগল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কয়েকদিনের সময়

নিয়ে চুপ করে' ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পেলুম না' !"

রাখাল এইবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্য থামাইয়া দিয়া বলিল,—"অচ্ছা, সেই সময়ে সুশীল ত তার দেশে চলে' গেলে পারতো। অন্ত পাওনাদারের তাগাদায় দেশে ফিরে যাবার কথাটা আর তাদের মনে পড়লো না।"

আমি বলিলাম,—"পড়েছিল বই কি রাখাল, কিন্তু দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে যে কলঙ্ক অকারণে এসে তাদের ওপর চেপে পড়েছিল, তার অনুগ্রহে গ্রামে যাওয়ার কল্পনাও করা চলে না ভাই।"

রাখাল 'ও' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় আমি বলিতে লাগিলাম,-"হ্যা, সুশীল কিছুক্ষণ দম লইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল।"

—'পারুলের কান্না আর পাওনাদারের জঘন্য তাগাদা আমাকে পাগল করে' তুল্লো। অতি-কষ্টে দশটাকা মাইনের একটা টিউসানী যোগাড় কর্লাম্। 'নারী-শিক্ষানিকেতনে' পারুলের জন্য সেলাই শেখানোর এক শিক্ষয়িত্রীর পদ পাওয়া গেল।

"পারুলকে এসে যেদিন সে কথা বল্লাম, সেদিন সে আনন্দে অধীর হলেও আমাকে বলেছিল,—'দাদা, সত্যিই আমাদের কি অবস্থা দাঁড়ালো, শেষে কি না আমাকেও চাকরী কর্তে হ'ল !'

'ও কথা শুনে আমি চোখের জল কিছুতেই সাম্লে রাখ্তে পারি নি। তবু বল্লাম,—'দুঃসময়ে এ ভগবানের দান পারুল !'

'পারুলের মাহিনা হ'ল কুড়ি টাকা। আমার হাতের আঙটীটা আর পারুলের দু'টী সোণার দুল আর সেফ্‌টিপিন বিক্রী করে' দিলাম। সেই টাকায় দেনা শোধ করে' আহিরীটোলায় এক-জনদের বাড়ীতে দশটাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম।

'একদিন সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছি, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন গিন্নী বল্‌ছেন—'কলিকাল আর কাকে বলে—নইলে সোমত্ত বোন্ আর ভাই এক ঘরে শোয়! লজ্জাও করে না।'

'হরিনামের মালা আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর এমন কতকগুলা কথা কাণে এসে পৌছুল, যাতে করে' সে বাড়ীতে বাস করা দুরূহ হয়ে উঠ্‌ল। এই লজ্জাটাই সব চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়াল—যদি পারুল শুন্‌তে পায়, তাকে মুখ দেখাব কেমন করে!

'যাক্ কোনরকমে দশ-পনোরো দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিলাম। এলাম দর্জ্জিপাড়ায়—নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঘরভাড়া নিলাম।

'ও বাবা সেখানে মাস চারেক পরে তিনি একদিন অত্যন্ত বিনীতভাবে বল্লেন,— দেখুন কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বল্‌বো আপনারা অন্যত্র থাকুন গিয়ে।'

'আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম,—'কেন বলুন ত ?'

'তিনি বল্লেন,—'এই শুন্‌ছি, আপনার স্ত্রী না কি অবনী বলে কে এক ছোক্‌রার সঙ্গে···। বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছেন সব, এসব দুর্নামের পর রাখাটা···আমাকে ত পাঁচঘর শিষ্য নিয়ে করে' খেতে হয়।'

'এ কথার প্রত্যুত্তর কর্‌তে যাওয়ার বোকামী আর প্রকাশ কর্‌লাম না। মাথার ভিতর দুইটী অক্ষর কেবল জেগে উঠ্‌ল,—ঘর, ঘর—কোথায় ঘর! একখানি ঘরভাড়ার যদিও বা সন্ধান মেলে, স্কুল-শিক্ষয়িত্রী থাকবে শুনে কেউ থাকতে

দিতে চায় না। তা' বলে বেশ্যাপাড়া বা দাই-পাড়ায় ঘরভাড়া করে' থাকতে পারি না ...

'শেষকালে এক জায়গায় সুবিধামত ঘর পাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালাকে স্পষ্ট বলেই দিলাম যে, আমার বোন্ স্কুলমাষ্টারী করে—এতে আপনাদের আপত্তি নেই ত ?

'বাড়ীওয়ালা জানালেন যে, তা'তে তাঁর মোটেই আপত্তি নাই।

'সেখানে নিরুপদ্রবে তু' বছর বেশ কেটে যাবার পর বাড়ীওয়ালা দিল তাঁর বাড়ী বিক্রী করে' দেনার দায়ে। 'রেস্' খেলে তিনি তাঁর সর্বস্ব হারিয়েছিলেন।

'সেখান থেকে এলাম শেষে চোরবাগানে এক কায়স্থের বাড়ীতে। এখন সেখানে আছি প্রায় এক বছর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমি আমার টিউসানী হারিয়েছি, আর পারুল তার চাকরী খুইয়েছে,—সেও প্রায় একবছর হ'তে চল্‌লো। জমান টাকা ভেঙে খাওয়া-দাওয়া, এমন কি ঘরভাড়াও চলছে। ·· এর উপর আর এক নতুন বিপদ। এতদিন পরে অবনী-দা' এসেছে, ঘরে ঢুকতে দিই নি বলে' পাড়ার আর কয়টা ছেলের সঙ্গে জান্‌লার সাম্‌নে হট্টগোল বাধায়। কি করি বন্ধু, বল ত ?'

"এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীল আমার দিকে চাহিয়া ভেউভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।...

"সুইমিং ক্লাবের ঘড়িতে তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

'কতরকম লোক এ পৃথিবীতে আছে বুঝিতেছ ত। আমাদের অজ্ঞাতে এই রকম আরও হয় ত কত কিছু ঘটিয়া যাইতেছে।"

কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া রাখালকে বলিলাম, —"চল রাখাল, চিতার অবস্থাটা একবার দেখে আসি।"

তুইজনে চিতার নিকট আসিয়া দেখিলাম, মাথার দিক্‌টা এখনও পুড়িতে বাকী আছে। ও মাথা কি সহজে পোড়ে—ওই মাথার ব্যামোতেই ত ও মলো !

রাখাল বলিল,—"সুশীল তোমাকে ওসব কথা বলার পর কি হ'ল ?"

বলিলাম,—"সুশীলের কাছে ওই কথা শুনে তাদের আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসি। তাদের জমীজমার যৎসামান্য আয় মাঝে মাঝে এলেও যাকে বলে ওরা রইলো একরকম আমাদের আশ্রিত হয়ে।...আশ্রিত থাকার বেদনা সুশীলের চাইতে পারুলের বুকেই বেশী বেজেছিল। একটা জিনিষ আমায় সব সময়ে কষ্ট দিত, সেটা পারুলের মৌনভাব।...আমার বাড়ীতে ছিল যতদিন, ততদিন আমি পারুলের মুখে হাসি দেখি নি। বেশ মনে আছে, একদিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে বিয়ের প্রশেসান্ যাবার সময় পারুলের ব্যগ্রদৃষ্টিতে বর-কনে দেখা।...হেসে সেদিন বলেছিলাম,—'কিরে পারুল, বিয়ে কর্‌বি ! তোর বিয়েতে দেখিস্ আমি কি ঘটাই না করি।'

"পারুলের মলিন মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল এমনই করুণ, এমনই কঠোর আজও তা' ভুলতে পারি নি রাখাল ! সে বুঝি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেরই উপর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। জীবনের কোন্ শুভলগ্নে দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের স্বপ্ন তার তরল কোমল মনে দোলা দিয়ে ঘর ছাড়া করেছিল, কিন্তু পরের ঘরবাঁধার সাহায্য করা ত দূরের কথা, নিজের ঘরবাঁধার কল্পনা আজ তার কাছে স্বপ্ন।"

ব্যথিত কণ্ঠে বাধা দিয়া রাখাল বলিল,—"তারপর, কি হ'ল ?"

বলিলাম,—"তারপর আর কিছুই নেই বিশেষ। তারপর সুশীল মাসখানেক হ'ল গেছে তার দেশেতে, আমার কাছে পারুলকে নিশ্চিন্ত মনে রেখে। ইতিমধ্যে ত ইনি সরে' পড়লেন তিন দিনের জ্বরে। সুশীলকে জানাবারও অবসর পেলাম না। ডাক্তার বললে,—'এ্যাপোপ্লেক্সি'র দস্তুরই হচ্ছে এই'।"

রাখাল বোধ হয় বলার ভঙ্গী দেখিয়া আমার পানে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। গম্ভীর-ভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া সে টানিতে লাগিল।

অদূরে চিতা দুইটীতে এইমাত্র কাহারা শান্তিজল ঢালিয়া কলসী ফাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। খোকা যে চিতায় পুড়িতেছিল, তাহার কার্য্যও অনেকক্ষণ হইল শেষ হইয়াছে।

আমাদের চিতায় শবের অর্দ্ধদগ্ধ মাথার কাছে কয়টা জলন্ত আঙরা ঠেলিয়া দিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলাম

ঘড়িতে দেখিলাম, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আট

তারপর আমাদের জীবনের দিনগুলিতে যে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠ্‌লো, তাদের রুক্ষ বিবর্ণ চেহারা আজো মনে পড়লে ভীত চকিত হয়ে উঠি। সেই মরুদগ্ধ দিনগুলিকে কিছুতেই ভুলতে পারি নে। যতদিন জীবন আছে ততদিন তাদের স্মৃতি অবিনশ্বর। নিশীথ রাত্রে প্রেতাত্মার মতো ভীষণ আকৃতি নিয়ে তারা আমার মনকে আক্রমণ করে। শত চেষ্টা করেও তাদের এড়াতে পারি নে।

বাবা ফিরে আসবার পর যে রবিবার এলো—সেদিনের স্মৃতি আমার মনের ওপর কালো দাগ কেটে বসেছে। আমার ছোট্ট জীবনের খাতায় সেদিনের কথা রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ! যখনই সে-কথা আমার মনে পড়ে, তখনই এই প্রার্থনা করি, যেন পরম শত্রুকেও অমন একটি দিনের স্মৃতি বহন করতে না হয়।

ভোর হ'ল।

সকালবেলাটা যেমন-তেমন ভাবে কাট্‌লো। কোলকাতা থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত বাবা আমাদের সঙ্গে ভাল করে' কথা বলেন নি—সর্ব্বদাই গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়েছিলেন। আমাদের ব্যাকুল এবং ভীত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন বটে যে, তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে, কিন্তু অতসী যখন ডাক্তার আনবার প্রস্তাব করলে তখন তিনি [illegible] তার প্রতিবাদ করলেন আহারাদির পর তিনি তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে' দিলেন—বুঝলাম, তিনি এখন একা থাকতে চান। দুই বোনে নিরুপায় হ'য়ে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিলাম।

সকালবেলা তিনি যথারীতি মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করলেন। পুরানো একটি ধর্ম্মকথা, তাকেই তিনি নিস্পৃহ উদাস-কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন! তাঁর বলবার ভঙ্গী এবং অবসন্ন চেহারা দেখে একথা কারুরই বুঝতে বাকী রইল না যে, তাঁর শরীর অসুস্থ। সকলেই দুঃখ প্রকাশ করে' বাড়ী ফিরলো।

উপাসনার পর রমাপিসি আমায় একান্তে ডেকে বল্লেন—তোমার বাবার শরীর বেশ খারাপ হয়েছে দেখ্‌লাম। ঠিক যে সময়ে তাঁর শরীর এবং মন ভাল থাকা দরকার ছিল, সেই সময় তাঁর দেহ খারাপ হ'ল—ভারী দুঃখের বিষয়।

মন্দিরের বাইরে এসে দু'জনে মাঠের উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সুদূর-বিস্তৃত মাঠের স্থানে স্থানে চাষারা লাঙল দিচ্ছে। পায়ের তলায় ঘাসের উপর রাত্রের শিশির বিন্দুগুলো সূর্য্যের আলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে। গাছের মাথায় নানা রঙের পাখীর কল-কাকলী।

পথ চলতে চল্‌তে রমাপিসির কথা শুনে কৌতূহলী হ'য়ে উঠ্‌লাম। বল্লাম—আপনার কথার শেষ দিকটা তো বুঝতে পারলাম না পিসিমা।

রমাপিসি বল্লেন—রবিবার দিন আচার্য্যদেব এখানে আসছেন যে!

তাই না কি!

হ্যাঁ। তিনি মন্দিরের উপাসনায় যোগ দেবেন। তাই বলছিলাম, মিত্র-মশায়ের শরীরটা ভাল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর সেদিনকার বক্তৃতা খুব ভাল হওয়া চাই।

বল্লাম—কিন্তু পিসিমা, তার শরীর ভীষণ খারাপ হয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যে তিনি কি আর সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে পারবেন? দেখছিলেন না, আজ বক্তৃতা করবার সময় তিনি কি রকম হাঁপাচ্ছিলেন?

রমাপিসি বল্লেন—দেখেছি বৈকি। তাই তো ও কথা বল্লাম। যাক্, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখো—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি চল্লাম। তোমার বাবাকে জানিও যে, আচার্য্যদেব কাল আসছেন।

ঘাড় নেড়ে বাড়ী ফিরবার পথ ধরলাম।

আমার কথা শুনে বাবা বিষম উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

আচার্য্যদেব আসচেন! রবিবার দিন! তাই তো। রবিবার-এর কাজের এখনো কিছুই তৈরী হয় নি। মন যে আমার অন্য চিন্তায় একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

বল্লাম—কিসের এত চিন্তা, বাবা? আমাদের তুমি কি কোন কথাই বলবে না? চিরকালই কি আমাদের কাছে তোমার মনের ভাবনা এমনি করে' লুকিয়ে রাখবে? বল, কিসের দুশ্চিন্তা তোমার!

তিনি মাথা নাড়লেন। তাঁর মুখের ওপর বিচিত্র মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। আমার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লেন—বলব বেটি, একদিন তোকেই সব কথা বলব। কিন্তু যতদিন না স্বেচ্ছায় বলি, ততদিন আমাকে জেরা করিস নি, মা! তাতে বড় বিরক্ত বোধ করি।

এই বলে' দাঁড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে লাঠিগাছটি তুলে নিয়ে বল্লেন—আমি একটু বেড়িয়ে আসছি; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবো।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—আমি তোমার সঙ্গে আসবো বাবা?—আমিও বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

কথা শুনে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন—বোধ হ'ল যেন আমাকে মানা করবেন। শেষ পর্য্যন্ত বল্লেন—আচ্ছা এসো।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমে তিনি মনীষা দেবীর বাড়ী যে পথে, সেই পথ দিয়ে চলতে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এ দিক্‌টায় তো অনেকবার আসা গেছে; চল, আজ ওই দিক্‌টায় যাওয়া যাক।

এই বলে' মাঠের উপর দিয়ে ভিন্ন দিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি নীরবে তাঁর সঙ্গে চল্লাম।

মাঠ পার হ'য়ে অপেক্ষাকৃত জনবিরল এক পথের প্রান্তে এসে বাবা স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন। এতক্ষণের মধ্যে পিতা-পুত্রীর মধ্যে একটি কথারও বিনিময় হয় নি। তাঁর শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখের পানে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম, আর দুশ্চিন্তায় আমার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এতখানি হেঁটে বেড়াবার মতো সুস্থ তিনি নন। এইটুকু হেঁটে এসেই তিনি হাঁপিয়ে পড়েছেন, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, পা টলছে। কিন্তু তিনি সে-কথা আমাকে একেবারেই জানতে দিতে চান না।

বল্লেন এই পথ দিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া যাক্।

বল্লাম—পথের পাশে কী সুন্দর বেদী তৈরী করা রয়েছে। এইখানে একটু বসতে ইচ্ছে করছে।

বাবা বল্লেন—বসবে? আচ্ছা, বোসো।

এই বলে' তিনি অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে বেদীর

ওপর আসন গ্রহণ করে' তৃপ্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। বিশ্রাম করবার প্রয়োজন তাঁর যে কতখানি হয়েছিল, তা' বুঝতে দেরী হ'ল না।

বেদীর একান্তে বসে' চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জন স্থানটি ভারী সুন্দর। পথের ধারে মাটির ঢল নেমে গেছে এবং তারই ওপর দিয়ে একটি ক্ষীণকায়া ঝরণা ব'য়ে চলেছে—কোথায় কোন সুদূরে গিয়ে মিশেছে কে জানে! পথের ধারে ধারে নাম-না-জানা ছোট ছোট গাছের মাথায় ফুলের বাহার।

অদূরে পথের শেষে গাছের ফাঁক দিয়ে বাড়ীর অংশ দেখা যাচ্ছে। কাদের বাড়ী? ঠাহর করে' দেখলাম, ও মা, আমরা রমাপিসির বাড়ীর কাছাকাছি চলে' এসেছি!

রমাপিসির বাড়ী দেখতে দেখতে মনে হ'ল—ওর মধ্যে সেই লোকটাও নিশ্চয় এখনো বাস করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার কথা বাবাকে জানাবার ইচ্ছা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না।

বল্লাম—বাবা, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে। মনে করেছিলাম, বল্‌ব না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সেকথা জানা তোমার বিশেষ দরকার।

মুখ ফিরিয়ে তিনি আমার পানে তাকালেন। দুই চোখে তাঁর প্রশ্ন জেগে উঠ্‌লো। ভুরু কুঞ্চিত হ'ল—মনে হ'ল যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন।

বল্‌লেন—কি কথা। বল।

বল্লাম—তুমি হঠাৎ কোলকাতা চলে' যাবার পর একদিন রমাপিসি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিছলেন। সেইখানে তিনি আমায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দ্যান। তাঁর নাম—বিজয়লাল দত্ত।

স্তব্ধ হয়ে বাবা আমার কথাগুলি শুনলেন। মুখদিয়ে তাঁর একটি উক্তিও নির্গত হল না। শুধু দেখলাম, তাঁর মাথাটা সুমুখ দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল এবং মুখের উপর অস্বাভাবিক কাঠিন্য ভেসে উঠল। স্তব্ধতার মধ্যে তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পেতে লাগলাম।

বল্লাম—একথা তুমি যেন মনে করো না বাবা, যে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তোমার এবং তোমার কাজের ওপর নজর রাখছি—সম্পূর্ণ অ চম্বিতে আমি তোমার একখানি চিঠির ওপরকার লেখা দেখতে পাই। চিঠিখানি বোম্বাই থেকে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, তুমি সেই পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই কোলকাতা গেলে। তারপর রমাপিসির বাড়ীতে বিজয়বাবুকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার পর আমার মনের মধ্যে কে যেন বল্লে—ওই লোকটাই তোমাকে পত্র লিখেছিল।

আমার কথা শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে বাবা কথা বল্লেন।—যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর কাছ থেকে তিনি ভীষণ আঘাত পেয়েছেন, এমনি ক্লিষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর! মনে হ'ল যেন অনেকদূর থেকে সে স্বর ভেসে আসছে। তাঁর দুই চোখ অদূরে রমাপিসির বাড়ীর পানে নিবদ্ধ।

অস্ফুটকণ্ঠে বল্‌লেন—এত কাছে! এত, এত কাছে! কেমন করে' সে এখানে এলো? কেউ কি তাকে বলে' দিয়েছিল, না এমনি বেড়াতে এসেছে?

বল্‌লাম—রমাপিসিদের সঙ্গে তাঁর বিদেশে আলাপ হয়েছিল। তাই তিনি এখানে এসেছেন। ও'রা বলছিলেন, তিনি না কি খুব বড়লোক।

বাবা মাথা নাড়লেন। তাঁর মুখের পানে চেয়ে আমার মন কেঁপে উঠ্‌লো। যেন কোন আসন্ন ট্র্যাজিডির ছায়া তাঁর দুই চোখে ফুটে উঠেছে।

গভীর বজ্রস্বরে তিনি বল্‌লেন—তা' হ'লে

শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে। ধর হয় ত কাল, কিম্বা হয় ত আজই। কেটি, দেখ্‌তো মা, দূরে কি কোন লোক আমাদের দিকে আসছে? দেখ্‌তো।

উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর প্রসারিত ডান হাত অনুসরণ করে' দেখলাম, বহুদূরে একটি মানুষের মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে।

বল্‌লাম—হ্যাঁ। একটি লোক। বোধ হয় এইদিকেই আসছে।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ আমরা একভাবে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা একাগ্রমনে একদৃষ্টে সেই লোকটির আগমন পথের পানে চেয়ে রইলেন। ক্রমশঃ লোকটি দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী হ'ল। দেখা গেল, তিনি বয়সে যুবা। হাতের ছড়ি দিয়ে পথের পাশের গাছগুলোকে আঘাত করতে করতে এগিয়ে আসছেন।

আর একটু কাছাকাছি আসতেই মনের সন্দেহ দূর হ'ল! যে লোকটির সম্বন্ধে এতক্ষণ বাবাকে বলছিলাম, তিনিই বটে!

নিকটে এসে মুখ তুলে আমাকে দেখে তাঁর দুই চোখে অপার বিস্ময় ফুটে উঠ্‌ল! পরক্ষণেই তিনি মাথা নীচু করে' আমায় অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে বাবার দৃষ্টি সম্মিলিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখ্‌লাম, বিজয়বাবুর সারা দেহ কেঁপে উঠ্‌ল, হাত থেকে ছড়িগাছটি মাটিতে পড়ে' গেল - মনে হ'ল এক নিমেষে তিনি যেন পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছেন! অকম্পিত নেত্রে তিনি বাবার পানে তাকালেন—কবর থেকে যে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে তার প্রতি লোকে যে ভাবে তাকায়, তেমনি ভীত দৃষ্টিতে তিনি বাবার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা নির্গত হ'ল না।

কয়েক মুহূর্ত্তের অসহ্য স্তব্ধতার পর ধীরে ধীরে বাবা বল্লেন—বহুদিন পরে আবার বাঙ্‌লা দেশে ফিরে এসেছো দেখে তোমাকে আমার স্বাগতম জানাচ্ছি বিজয়। ভাবে বোধ হ'ল যেন, তুমি আমার মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলে। কি কথা? তুমি কি পথ হারিয়েছো? —এখানে নতুন লোকের পক্ষে তা' একেবারেই আশ্চর্য্য নয়!

বিজয়বাবু কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন— আমি ও'কে নিশীথবাবু - নিশীথ সেন-এর বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

বিজয়বাবুর দৃষ্টি সারাক্ষণ বাবার মুখের পানে নিবদ্ধ রয়েছে। বাবাকে দেখে তিনি যেন অতিমাত্রায় ভীত হ'য়ে পড়েছেন।

বাবা বল্‌লেন—নিশীথবাবুর বাড়ী? আমিও সেইদিকেই যাব। চল, তোমায় তাঁর বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি। অনেকগুলো পথের মোড় ঘুরে তবে তাঁর বাড়ীর রাস্তা পাওয়া যাবে।

বাবা তাঁকে আহ্বান করে' অগ্রসর হলেন। বিজয়বাবুর ভাব দেখে মনে হ'ল যেন তিনি দ্বিধা করছেন। ক্ষণকাল পরে আমাকে দেখিয়ে বল্লেন—ইনি, ইনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?

বাবা গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—ওর অন্যদিকে কাজ আছে। সেই কাজ সেরে ও বাড়ী যাবে। কেটি, তুমি বাড়ী ফিরবার পথে মহিমবাবুর সঙ্গে দেখা করে' বলে' যাবে, তিনি যেন আজ সন্ধ্যার সময় অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করেন। যাও।

এমন কঠিন কণ্ঠে তিনি কথাগুলি বল্লেন যে, সে কথার প্রতিবাদ করবার সাহস হ'ল না। ধীরে ধীরে অন্যদিকে অগ্রসর হলাম। এই দু'জন লোককে একলা রেখে যেতে আমার মন নিরতিশয় অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগ্‌ল।

মনে হ'ল যেন, এদের দু'জনার এই যে অতর্কিত সাক্ষাৎ—এ সাক্ষাৎ সাধারণ নয়। এর ফল হয় ত ভীষণ হ'তে পারে!

বিজয়বাবু যে বাবাকে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়েছেন, সে-কথা অন্তত আমার কাছে অপ্রকাশ নেই। দেখ্লাম, তিনি ধীরে ধীরে বাবার পিছনে পিছনে চলেছেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে তাদের পানে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর অন্য পথে অগ্রসর হলাম।

ঘন্টাখানেক পরে বাড়ী ফিরলাম।

দরজার মুখে অতসীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

প্রশ্ন করলাম—অতসী, বাবা ফিরেছেন?

অতসী মাথা নেড়ে বল্লে—মিনিট পাঁচেক আগে এসেছেন। বেড়িয়ে এসে তাঁকে বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে—বেড়ানোয় তাঁর বেশ উপকার হয়েছে। অনেকদিন বাদে তিনি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন। কিন্তু দিদি, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে—এ কি, তোমার মুখ-চোখ যে শুকিয়ে বিশ্রী হ'য়ে গেছে! অসুখ করল না কি?

বল্লাম—বাবা একলা ফিরেছেন ত?

—একলা! হাঁা, একলা বৈকি! ওকথা জিজ্ঞাসা করলে যে?

—এমনি। অতসী, আমায় একটু চা করে' দে না ভাই, ভারী শ্রান্ত বোধ করছি।

—নয়—

পরের রবিবার।

আচার্য্যদেবের শুভাগমন উপলক্ষ্যে মন্দিরটি লতা-পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভিতরের বেদীর ওপরেও কারুকার্য্য রচনা কম হয় নি। সারাদিন ধরে' অতসী এই সব কাজে লেগে রয়েছে। বেদীর ওপর আলপনা আঁকা হয়েছে। তারই একাংশে আচার্য্যদেবের আসন। অন্য ধারে বাবা বসবেন। বেদীর মধ্যভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পট। পিছনকার দেওয়ালের গায়ে পূজনীয় রাজা রামমোহনের প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র টাঙানো হয়েছে।

প্রস্তুত হ'য়ে মন্দিরে যেতে আমার কিছু বিলম্ব হ'য়ে গেল। গিয়ে দেখ্লাম, জনসমাগমে মন্দির পরিপূর্ণ। যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁরা সবাই এসেছেন। বিস্মিত হ'য়ে দেখলাম, ঘরের একপ্রান্তে নিশীথবাবু বসে' আছেন। অদূরে মনীষা দেবীকেও দেখা গেল। এরাও এসেছেন তা' হ'লে!

নিজের আসনে গিয়ে বস্লাম। অতসী তখন উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে। সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে অতসীর গান শুনছে—

'পূর্ণ আনন্দ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো,
এসো মনোরঞ্জন!
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু
করহ পূর্ণ,
কর দারিদ্র্য ভঞ্জন!'

বাবার দুই চোখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য—সুমুখে টেবিলের ওপর ন্যস্ত দুই হাত তাঁর মৃদু মৃদু কাঁপছে। আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বচন শেষ হবার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন। সমবেত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর প্রত্যেকটি কথা যেন গ্রাস করতে লাগলো!

'আমি সেই ধর্ম্ম স্বীকার করি (বাবা বলতে লাগলেন), সেই শাস্ত্রবিধি পালন করি, যা' আমায় জীবন দ্যায়, আমার প্রাণে আগুন জ্বালে, আমি অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল হই। আমি অস্পষ্ট নই, আমি অন্ধ নই, ভ্রান্তি ঘোরে

আমি থমকে দাঁড়াই নি। আমি চলেছি, ক্ষিপ্র-বেগে প্রবল ঝড়ের চেয়ে দ্রুত, আমি তীব্র বিদ্যুতের ন্যায় মানুষের চক্ষু ঝল্‌সে মাঝে মাঝে আপনাকে প্রকাশ করি, আবার কালের মেঘে আত্মগোপন করে' ফল্গু প্রবাহের ন্যায় চলি, বজ্রধ্বনি করে' জানাই আমার অস্তিত্ব।'

দেখ্‌লাম, মনে যা' ভয় ছিল তা' সত্যে পরিণত হ'ল না। অসুস্থতা সত্ত্বেও বাবা যে রকম মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন, সুস্থ অবস্থাতেও সে-রকম বক্তৃতা তাঁর মুখে খুব বেশী শুনি নি। মানুষের মাঝে পরমেশ্বরের প্রকাশ তাঁর ঈষৎ আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে তাঁর দীপ্ত চোখ-মুখের ভঙ্গীর মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলী যেন প্রত্যক্ষ করে' অভিভূত হ'য়ে পড়ল।

বাবা বল্‌তে লাগলেন—'আমি শাশ্বত অমৃত-ময় সনাতন; আমি বেদ, পুরাণ উপনিষদ। আমি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উপাসনা। নিখিল বিশ্ব মথিত করে' আনন্দের উৎস সৃজন করতে আমি নানা ছন্দে লীলায়িত হই।'

সহসা তাঁর শান্ত সংযত বাক্‌বিন্যাস অন্তরের আকুলতায় কম্পিত হ'তে লাগল। তাঁর বিবর্ণ মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্তরের আলো তাঁর দুই চোখে প্রতিফলিত হ'ল। পাপী যারা, এ-জগতে যারা লোকচক্ষে অন্যায়কারী, তাদের জন্যে বাবা ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাতে লাগ্‌লেন। কার জন্যে—কাদের জন্যে তিনি প্রার্থনা করছেন? মুগ্ধ হ'য়ে আমরা শুনতে লাগলাম। তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা তড়িৎ প্রবাহের মতো আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হ'ল। মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লাম—নিশীথবাবু নিস্পন্দ হ'য়ে বসে' আছেন। তাঁর মাথা সুমুখ দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মনীষা দেবী স্তব্ধদৃষ্টিতে বক্তার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন—তাঁর দুই চোখ জলভারে টল্‌মল্ করছে। দেখলাম, আচার্য্য-দেব পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে শুনছেন।

বাবার তীক্ষ্ণ দৃপ্তকণ্ঠ আবার ধ্বনিত হ'তে লাগলো:

'জীবন চাই। ভগবানের জীবন। এই হোক আমাদের মূলমন্ত্র। আদর্শ বিভ্রাট যেন জীবনকে কোনদিন সঙ্কটাপন্ন না করে। জীবন চাই—তাই বলে' জীবনের প্রয়োজন যেন উগ্র ভোগবৃত্তি না হয়। জীবন ঋজুপথে ঊর্দ্ধগামী হবে—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, নিষ্পাপ বিশুদ্ধ। হে ভগবানের মানুষ, তুমি শাশ্বত, অবিনাশী। তোমার সংহতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করুক। দৃ[illegible] সম্মুখে প্রসারিত কর-লক্ষ্য তোমার[illegible]ন।'

সহসা এ[illegible]ক লোক ঘ[illegible] মধ্যে ঢুকে বেদীর সম্মুখে' [illegible] হাজির হ[illegible]। বাবার বক্তৃতা বন্ধ হ'য়ে গেল।[illegible] করে দেখ[illegible] তারা ত্রস্ত চাপাকণ্ঠে বাবাকে [illegible] যেন বোঝাতে চাইছে। ঠাহর করে' [illegible] [illegible]তে পার[illegible] যে [illegible] কইছে সে মন্দিরের দরওয়ান। পাশে তার একজন পুলিশের জামা গায়ে দে[illegible] লোক—বোধ হয় ইন্‌সপেক্টার হবে।

দরওয়ানটাই বা অত ভীত হয়ে পড়ছে কেন?

কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি[illegible] এক অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় আমার হৃদ্-স্পন্দন যেন বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

দেখ্‌লাম, ভীত শঙ্কিত মুখে [illegible]চার্য্যদেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষণকাল পরেই [illegible]কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আজকের মতো সভার কাজ শেষ হ'ল। আপনারা বাড়ী যেতে পারেন।'

ব্যাপার কি জানবার জন্তে অনেকে কৌতূহলী হ'য়ে উঠ্‌লো। নিশীথবাবুও এগিয়ে গেলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে বিষম চাঞ্চল্যের আভাষ জেগে উঠ্‌লো।

দেখ্‌লাম, পুলিশ অফিসারের সঙ্গে নিশীথ-বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ত্রস্ত চাপাকণ্ঠে চারিদিকে অস্ফুট কোলাহল শোনা যাচ্ছে। দেখ্‌লাম কখন্ এক সময়ে মনীষা দেবী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ক্ষণকাল পরে নিশীথবাবু ফিরে এসে মনীষা দেবীর পানে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—হঠাৎ একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটেছে!

মনীষা দেবী বল্‌লেন—ব্যাপার কি!

—বিজয়বাবুকে কে খুন করেছে! আহত হয়েও তিনি মন্দির-এর বাগান অবধি এসে-ছিলেন! বাগানের ধারে এসে আর চলতে পারেন নি। সেইখানে পড়ে' যাবার পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে! বোধ হয়, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল।

নিশীথবাবুর কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে কি এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম। মনে হ'ল, দুই কাণের মধ্যে কে যেন আগুনে গালানো সীসে ঢেলে দিচ্ছে। ভীষণ দ্রুত-তালে বুক কাঁপতে লাগল। অতি কষ্টে দু'হাত বাড়িয়ে মনীষা দেবীকে ধরে' ফেল্লাম। তার পরক্ষণেই আমার চোখের সামনে অতল অন্ধকার নেমে এল।

চলবে
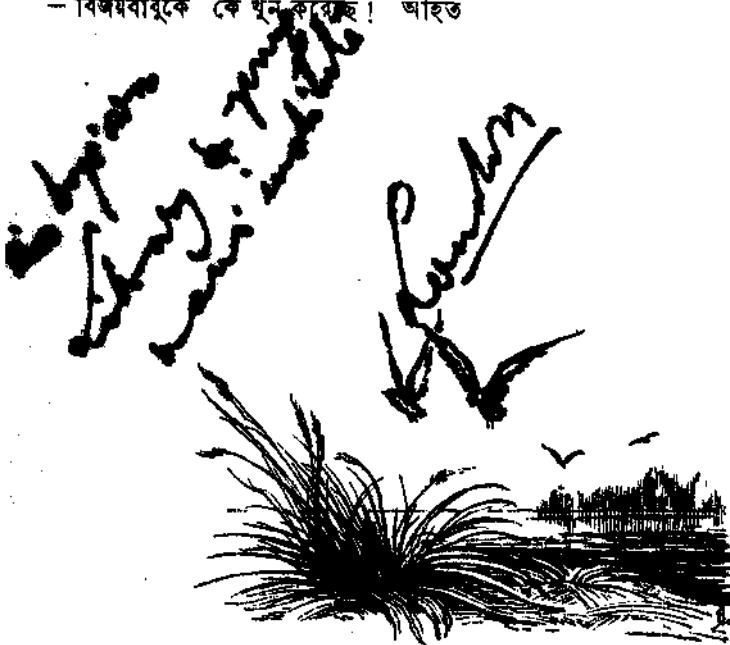
ভুলের বোঝা

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল
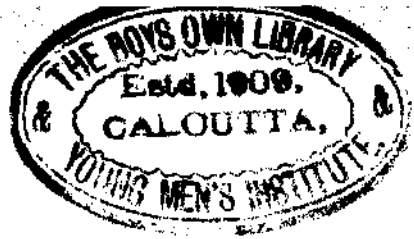
প্রায় নিত্যই কলহ বাধে, কিন্তু অতি সঙ্গোপনে। অথচ আজ বিজিতা কিছুতেই স্বামী অরুণকে ক্ষমা করিতে পারিল না। ঘরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল: আজ ও কি ডাক্তার নন্দীর ওখান থেকেই আসা হচ্ছে না কি?

অরুণ মৃদু হাসিল মাত্র। হাস্যোজ্জ্বলকণ্ঠে কহিল: পাগলী আজ চটেচে দেখ! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বিজু?

দ্বিগুণ উত্তেজিতা হইয়া বিজিতা কহিল: ও-সব সোহাগ পরে দেখিও, আজ আসল কথা তোমার মুখে না শুনে কিছুতেই থামচি নে, তা' তোমায় স্পষ্টই বলে' দিচ্চি।

অতিবেগে এবং জেদের সহিত বলিলেও অরুণ এবারও কথাটা নিতান্ত লঘু করিয়া কহিল: ব্যাপারটা কি বলো ত, ছাতে দাঁড়িয়ে সব দেখা হয়েচে বুঝি?

অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে পত্নী কহিল: নাঃ, তুমি ধেড়ে ধেড়ে মেয়েদের পাশে বসিয়ে মোটরে করে' হাওয়া খেয়ে বেড়াতে পারো, আর আমরা চোখে দেখলে বা বললেই যতো পাপ, না? আজ ও-মেয়েটার সব কথা—ও কোথায় থাকে, কি করে, সব বলতে হবে তোমায়।

অরুণ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল: যদি বলি ও বেশ্যা;—পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে' আনন্দ দেওয়াই ওর পেশা; তা' হ'লে?

এতখানি রূঢ় সত্য বিজিতা আশা করে নাই। তাহার ধারণা ছিল, অরুণ যতোই ঐ কথা চাপা দিতে চাহিবে, ততই ওর প্রসঙ্গ তুলিয়া সে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। কিন্তু স্বামী একেবারেই তার দুর্ব্বলতার সঠিক স্থানে আঘাত করিতে সে সচকিত হইয়া উঠিল। ঐ চিন্তা পর্য্যন্ত যেন তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ঈষৎ পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল: তা-ই যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে আমাকেও অনুরূপ রাস্তা বেছে নিতে হবে। এটা ঠিক জেনো, অন্যদিক্ দিয়ে রেহাই পেলে-ও—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অরুণ বলিয়া উঠিল: এদিক্ দিয়ে পাবো না, এই ত? আচ্ছা যদি বলি, ও বেশ্যা নয়। উচ্চশিক্ষিতা এবং আলোকপ্রাপ্তা একটী মেয়ে। সে-ও আমায় ভালবাসে এবং আমি-ও তাকে ভালবাসি। কিন্তু যে-সম্বন্ধ চিন্তা করে' তুমি কষ্ট পাচ্ছ, এমন কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আমাদের নেই। তা' হ'লে?

হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের বাঁধন ছিন্ন করিয়া বিজিতা হাসিয়া উঠিল: আগুন আর ঘী পাশাপাশি। সম্বন্ধ নাই বা থাকল, নতুন করে' গজাতে কতক্ষণ?

অরুণ কহিল: দেশ, কাল এবং পাত্রভেদে প্রভেদ ত হ'তে পারে? না, সব নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে তোমার ওই এক নীতি প্রয়োগ করা চলবে?

বেশী কিছু না বলিয়া বিজিতা শুধু বলিল: নিঃসন্দেহে

সহজ সরল এবং বেশ শান্তস্বরে অরুণ কহিল: বেশ তাই না হয় হোল। রাগ কোরো না কিন্তু, আমি-ও বলি তা' হ'লে, তোমার-ও ক্রি

পরশুদিন নীতিশকে নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে' থাকাটা ঠিক হয়েছিল ? আমি-ও ত অন্তরকম—

শুষ্ককণ্ঠে বিজিতা বলে : বাঃ রে, ওঁকে ত আমরা মামাবাবু বলি ! তা' ছাড়া, বাইরে যা' ধোঁয়া দিয়েছিল তপন, তাতে দরজা খুলে কি করে' বসে' থাকি বলো ত ?

গাম্ভীর্য্য অটুট্ রাখিয়া অরুণ কহিল : আমি-ও যে সেই মেয়েটীকে দিদি বলি না তাই বা জানলে কি করে' ?

বিরক্তির স্বরে বাধা দিয়া বিজিতা কহিল : যাও, যাও ! এই কি একটা উপমা হোল ? এইজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলতেই আমার কি রকম হয় ! যার অতো ছোট নজর—

—কিন্তু এই কি রকম হওয়াটা আর ছোট নজরটা কার তরফ্ থেকে প্রথম আসা উচিত, সেইটাই হচ্চে ভাববার কথা !

বিজিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে : তুমি আমার সঙ্গে একটা-ও কথা বলো না, আমি দিব্যি দিচ্ছি তোমায় !

হাসিয়া অরুণ বলে : বেশ তাই হবে। ন্যাজে পা পড়লে সবাই —

ঝড়ের বেগে বিজিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

নীতিশ আসিয়াছিল। ঘরে অরুণকে একা স্যুটকেশ্ গুছাইতে দেখিয়া বলিল : কি হে, এসব তল্পিতল্পা কিসের ? বিজুকে দেখ্‌চি নে যে ! সে গেল কোথায় ?

হাসিয়া অরুণ জবাব দিল : সে রাগ করেছে মামাবাবু। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে' দিয়েচে।

—হঠাৎ এতখানি ভারিক্কি হবার কারণ ?

অরুণ হাসে, উত্তরে কিছু বলে না।

মনে মনে কী ভাবিয়া নীতিশ বলিল : তুমি বোধ হয় বকেছ তাকে। ক'বছর বিয়ে হয়ে গেছে, এখনো কি এইসব ভালো ?

অরুণ হাসিয়া বলে : ভাল-মন্দ বুঝি নে মামা। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে উনি যাচ্ছেন খুড়োর কাছে দিল্লীতে,—যেখানে মজাদার লাড্ডু পাওয়া যায়। আসল উপলক্ষ্য-টা কি তোমারও বুঝতে বাকী নেই, আমারও না। আমিও দেওঘর যাবো কি না ভাবচি।

নীতিশ হাসিয়া বলে : বেশ হয়েচে। তোমরাই আছো ভাল।

বিজিতা কোথায় ছিল কে জানে, হঠাৎ ঝড়ের বেগে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল : খবরদার ! মামাবাবুর সঙ্গে কথা কইতে একটু ও লজ্জা হচ্চে না তোমার ? তারপর নীতিশের একখানি হাত আকর্ষণ করিয়া কহিল : উঠে আসুন মামাবাবু, ওর সব গুণের কথা বলছি আপনাকে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল যে, সময় বিশেষের জন্য অরুণ ও নীতিশ দু'জনেই হতবাক্ হইয়া গেল। বিস্ময়-মুগ্ধ-দৃষ্টিতে একবার অরুণের পানে চাহিয়া নীতিশ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তড়িৎ কণ্ঠে বিজিতা কহিল : অমন করে' দেখ্‌চেন কি ? চলুন এখান থেকে।

বিহ্বলের মতো নীতিশ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। বাহিরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ হো-হো করিয়া বিষম জোরে হাসিয়া উঠিল !

পাঁচ-সাতদিন অদর্শনের পরে হঠাৎ অসময়ে অরুণকে আসিতে দেখিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল : এ কী অরুণ-দা ! কী ভাগ্যি আমার ! ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেললে-ও দেখা পাবার

যো নেই ; অথচ একেবারে অযাচিতভাবে—আজ রোদ কোন্‌দিকে উঠেচে ?

হাসিয়া অরুণ বলিল : রহস্য পরে কোরো, সূর্য্যি আজ আর উঠবেই না। কি রকম মেঘলা দেখচ্‌ ত। এখন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে পড়ো দিকি। এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়। রজতবাবুর আপত্তি হবে না নিশ্চয় ? তোমার বৌদি' আজ একটু পরেই দিল্লী চলে' যাচ্ছেন।

ঘরের বাহিরে আসিয়া স্বামী রজত বলিল : বেশ বলেন আপনি। আপনার বাড়ীতে যাবে, তাতে কী আপত্তি থাকতে পারে অরুণবাবু ?

জবাব দিল মাধবী। বলিল : বেশ বলো তোমরা, বৌদি' যাবেন, তা' আমি গিয়ে কি করবো ? তা' ছাড়া যাওয়া বললেই যাওয়া হয় কি না ? এত যে ময়দার পত্ত করা হয়েচে, আর ওই কুট্‌নোগুলোর কি হবে তা' হ'লে ? তোমার সেই ফাঁস দেওয়া টিকিওয়ালা ঠাকুর-মহারাজের ত এখনো দেখা নেই। শুধু দিল্লী যাওয়ার উদ্যোগ দেখলেই ত আর পেট ভরবে না ?

গম্ভীরস্বরে অরুণ কহিল : তুমিই দেখা করতে চেয়েছিলে, তাই।

হাসিয়া মাধবী কহিল : ভবিষ্যতে দেখা না হবার সম্ভাবনা আছে না কি ?

গম্ভীর হইয়া অরুণ বলিল : সঠিক তাই-ই বা কি করে' বলা যায় ?

কথা ঘুরাইয়া রজত বলিল : দেখা করতে যাওয়া মানে কি একেবারে জমে যাওয়া না কি ?

—তা' না হলেও খানিকটা যে দেরী হবে, তা' ত নিঃসন্দেহ।

রজত বলিল : উনিও এয়েচেন, প্রতিশ্রুতি-ও দিয়েচ যখন, কি আর করবে,একটু ঘুরেই এসো

বাহিরের ঘরে সতর্কপদে আসিয়া বিজিতা স্তম্ভিতা হইয়া গেল। দক্ষিণদিকের জানালার সামনের টেবিলের লাগোয়া চেয়ারে সেই মোটারের দৃষ্ট তরুণী-টি বসিয়া! আর দ্বিতীয় আসন না থাকায় টেবিলের উপরে ঠিক তার পাশ ঘেঁষিয়া অরুণ নিবিষ্টচিত্তে হাসিয়া হাসিয়া কি যেন বলিতেছে।

বিজিতা বুকের মধ্যে শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা অনুভব করিল। কোন কথা না বলিয়া অতি সতর্কপদে বিপরীত দিকের দ্বার ঠেলিয়া সে চলিয়া গেল।

অরুণ বিজিতার আগমনের কথা মোটেই জানিতে পারে নাই। নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অস্পষ্ট শাড়ীর খসখস শব্দে সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল ; সঙ্গে সঙ্গে একটা দুষ্টবুদ্ধি তাহার মস্তিষ্কে খেলিয়া গেল! বিজেতাকে আঘাত করিবার উদ্দাম লালসা অরুণকে মাতাল করিয়া তুলিল। মাধবীর উদ্দেশে কহিল : তা' হ'লে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্চো ত ?

অলক্ষ্যে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে দুইটী কর্ণ উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে, ইহা যেন সে মানসপটে স্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইল।

অবান্তর কথার কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাধবী তার মুখের দিকে চাহিল।

অরুণ বলিয়া চলিল : রজতবাবু আমাকেই নিয়ে যেতে বললেন। ক'দিন বেশ আমোদেই কাটান যাবে, কি বলো ? দেওঘরে পাহাড়ের ওপরগুলা যেমন আরামপ্রদ, তেমনি নিরালা। তুমি—

বিজিতা কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দড়াম্‌ করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাণ করিয়া অরুণের উদ্দেশ্যে বলিল : আমার গয়নাগুলো—

হঠাৎ মাধবীকে প্রথম দেখার অভিনয়ও সে সুন্দরভাবেই করিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিটা তাহার চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিল :

আমার দাঁড়াবার সময় নেই, শীগ্‌গির বার করে' দাও। আমি মামাবাবুর সঙ্গেই যাবো। তাঁকে অনেক বলে'-কয়ে রাজি করেছি, তিনি রাজীও আছেন।

অরুণ যেন তাহার কোন কথাই শুনে নাই, এমনি ভাণ করিয়া মাধবীকে কহিল : ওদিকে এর আগে আর কখনো যাও নি ত? তা' হ'লে খুব ভালই লাগবে তোমার।

অন্তরের ক্ষুব্ধ ক্রোধ উদ্যত ফণা লইয়া বাহিরে আসিবার জন্ম ফুঁসিয়া উঠিতে লাগিল। অতিষ্ঠ হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বিজিতা কহিল : শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, না, এর চেয়েও জোরে বলতে হবে? মামাবাবু রাজী হয়েছেন, আমার গয়না-গুলো দাও।

অরুণ আপন কর্ত্তব্য মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল। সে-ও তাহাকে এই মাত্র দেখার ভাণ করিয়া বলিল : ও, এই যে এয়েচ! মামাবাবু রাজী আছেন; তা' তিনি ত অনেক-দিনই রাজী! তারপর মাধবীর দিকে ফিরিয়া কহিল : ইনি-ই আজ দিল্লী যাচ্ছেন—তা' হলেই বুঝতে পারছো তোমার কে?

কলহাস্যের সহিত চেয়ার ছাড়িয়া মাধবী হাত দু'টী যোড় করিয়া কহিল : তুমিই বৌদি'? তারপর কর্ত্তৃত্বের সুরে বেশ একটু জোর রাখিয়া বলিল : এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়, দাদাটীকে এমনি করে' একলা ফেলে যাওয়া!

বিজিতার মনের আগুন দ্বিগুণ আবেগে জ্বলিয়া উঠিল। কপট হাস্যের সহিত বলিল, কেন, একলা কিসের, দাদাটী-ও দিদিটী-কে নিয়ে কোন্ পাহাড়ে হাওয়া খেতে যাবেন শুনছিলুম।

কথাটার নিগূঢ়ত্ব মাধবী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল না, তথাপি কী ভাবিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

দু'জনকে ঘরে ফেলিয়া অরুণ ভিতরে গেল, কিন্তু নীতিশকে পাইল না। কি ভাবিয়া কিছু পরে সেই ঘরে আসিয়া কহিল, তা' হ'লে মাধবী এইবার চলো, আর ত দেরী করা চলে না, তোমার যোগাড়-যন্তর অনেক কিছু বাকী?

তীক্ষ্ণধী মাধবীর বুঝিতে বাকী রহিল না, তাহাদের জীবন-যাত্রার কোন্‌খানে গলদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই অরুণের কথার মোড় ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে কহিল : বৌদি'র ত এখনো সবই বাকী। উনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?

হাসিয়া অরুণ বলিল : না, উনি যে দিল্লীতে কাকার কাছে যাচ্ছেন। তা' ছাড়া, পাহাড় দেখলে ওঁর আবার মাথা ঘোরে।

কলহাস্যের সহিত মাধবী কহিল, আমার কিন্তু নাম শুনেই ঘুরেছে।

হাসিয়া অরুণ কহিল : তোমার নামটা বড় হাল্‌কা কি না!—

দীর্ঘায়ত দৃষ্টি ফেলিয়া অভিযোগের সুরে মাধবী কহিল : আপনাকে যতটা সোজা ভাবতেম, আসলে দেখচি তা' ত নয়ই বেশ কিছু পার্থক্য আছে। নিজে আদর করে' নাম দিয়ে—বলে দেব সব কথা?

অরুণ স্পষ্ট দেখিল বিজিতার মুখখানি মড়ার মত ম্লান হইয়া গেছে। তাহাকে আরো একটু আঘাত দিবার জন্ম মাধবীর উদ্দেশ্যে বলিল : কিন্তু তোমার বৌদি'র যা নাম জীবন-যাত্রায় আসলে তা' আর পরিবর্ত্তিত হবে না। উনি চিরদিনই আমার কাছে বিজিতা।

আরো কিছুক্ষণ নানাবিধ আলোচনার পর যখন তাহাদের সভাভঙ্গ হইল, তখন ইহাদের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিলেও বিজিতা

ইহা বুঝিল, হয় অরুণ পাপের অতল পঙ্কিলতলে ডুবিয়াছে ; না হয় ডুবিতে বেশী দেরী নাই।

অল্প কিছুক্ষণ পরে মাধবী চলিয়া যাইবার জন্ম যখন বিদায় প্রার্থনা করিল, বিজিতা মৃদু হাসিল মাত্র। অরুণ চলিয়া গেলে জিদের বশে সত্যই সে নীতিশকে লইয়া দিল্লী যাইবার জন্ম গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

মাধবীকে পৌছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া বিজিতা বা নীতিশকে না দেখিয়া অরুণ শিহরিয়া উঠিল। একে একে সব ঘরগুলি দেখিয়া তাহার সারাচিত্ত এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল। 'গুম্' হইয়া সে কৌচের উপর বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চলিয়া যাইবার পর মনে মনে স্থির করিল, বিজিতা যেমন না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে-ও আর তাহার কোন সংবাদই রাখিবে না।

কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়া এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। অরুণ বিজিতা বা নীতিশের কোন সংবাদই লইল না। সেদিন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া সত্তোমুক্ত টাই, সেপ্টিপিন, কলার ইত্যাদি গুছাইতে গুছাইতে আপন-মনে সে নিজের কথাই ভাবিতেছিল। চেতনা হইল মাধবীর কণ্ঠস্বরে। এ কি অরুণ-দা', এই এখন আসা হচ্চে? বেলা যে দুটো বেজে গেছে! আমরা ভেবেছিলেম, বিশ্রাম নিচ্ছেন এতক্ষণ। উনি ত তাই আসতে চাইছিলেন না, বলছিলেন : এখন গিয়ে বিরক্ত করা উচিত নয়। তা' দেখছি, ওঁর কথাই ঠিক হোল।

উচ্ছ্বাসের সহিত রজতকে অভ্যর্থনা করিয়া মাধবীর উদ্দেশে অরুণ কহিল : তা'কে আর কী এমন রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে গেছে? বোন্ কি আর ভায়ের কাছে আসে না? বসুন রজত-বাবু।

গালিচা বিছান পালং আশ্রয় করিতে করিতে রজত বলিল : না, এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি আপনার, এখন আর—তবে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কি বলবেন বুঝতে পারছি না।

ধমকের ভাণ করিয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে মাধবী কহিল : বুঝবে আবার কি? ও'র কিসের আপত্তি থাকতে পারে? বৌদি' ত আর এখানে নেই যে—

হাসিয়া অরুণ কহিল : ব্যাপার কি বলো দিকি'?

বিনীতস্বরে উত্তর দিল রজত। কহিল : বিশেষ কিছু নয়, আমরা সব দিল্লী যাচ্ছি, আপনাকে-ও যেতে হবে। আপনার টিকিট আমরা করেছি।

হাসিয়া মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া অরুণ কহিল : এত দেশ থাকতে হঠাৎ দিল্লীর ওপর এত মোহ কেন? স্বাস্থ্যের সন্ধানে নয় নিশ্চয়?

মাধবী গম্ভীরভাবে বলিল : কি জানি, দিল্লীটা আমার কেন এত ভাল লাগে!

অরুণ আপত্তি করিতে যাইতেই বাধা দিয়া মাধবী বলিল : যতই 'কেসে'-র নজীর দেখান, আমরা কোন কথাই শুনবো না। আপনাকে যেতেই হবে।

শেষ পর্য্যন্ত রাজী না হইয়া অরুণের গত্যন্তর রহিল না।

আসিবার পর বিজিতা অরুণকে এক-খানিও পত্র দেয় নাই এবং পরিবর্ত্তে সেখান হইতেও কোন সাড়া পায় নাই। হতাশাময় দুঃসহ বেদনায় তার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল।

এই ঘটনার জন্য মূলতঃ কে দায়ী, সেই চিন্তা আজকাল তাহাকে ব্যথা দিতে লাগিল।

নীতিশ তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আজ কয়দিন হইল আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। বিজিতা স্থির করিল, এইবার তাহার সহিত সে চলিয়া আসিবে। কিন্তু অরুণও মাধবীকে লইয়া এখন কোথাও চলিয়া গিয়াছে কি না ভাবিয়া কোন কূল-কিনারা করিতে পারিল না।

সেদিন বৈকালে কুতুবমিনার বেড়াইতে গিয়া তাহার প্রায়পসারিত মনের মেঘখানি দ্বিগুণ ঘনঘটা করিয়া পুনরায় ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অরুণ ও মাধবী এবং সঙ্গে আর একটী যুবক কুতুব মিনার দেখিতে আসিয়াছে।

অরুণ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শীকে লইয়া তাহার স্বামীর রসিকতা বিজিতা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। মনের কোণে কিসের একটা ব্যথা খচ্ খচ্ করিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে সে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল এবং অরুণকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য মনে মনে অসংখ্য ফন্দী আঁটিতে লাগিল।

চিরদিনের আয়েসী রজত তখন সবে মাত্র দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া আরামের একটা অংশ ত্যাগ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বেহারা প্রদত্ত চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময় বেহারার পরিবর্তে ঘরে আসিয়া ঢুকিল বিজিতা। বিজিতা হাসিয়া বলিল : দেখে চমকে উঠেছেন না? কিন্তু চমকাবার মত কিছু নেই; আপনি আমায় না চিনলেও আপনার স্ত্রী বুঝি আমায় বিলক্ষণ চেনেন, কেনমা সজনীটি আমার স্বামী।

—ওঃ নমস্কার, বসুন বসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের যে এমন অযাচিত ভাবে পায়ের ধুলো পড়ল! কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা অরুণ বা মাধুবী ঘরে রইল না আপনাকে অভ্যর্থনা করতে। রাত দশটার আগে ফিরবে বলে ও মনে হয় না। পাশের বাড়ীর মেয়েরা ধরে' বসলেন কি না, কি দেখ্‌তে যেতে হবে। ঠিক দুপুর রোদ্দুরে না বেরুলে পৌছান যাবে না। ওরা সব তাতেই রাজী, কিন্তু শর্মারাম সে দিকে নেই, তার চেয়ে ঘুমুলে কাজ দেখবে ঢের বেশী, তাই চুপচাপ পড়ে আছি।

বিজিতার মুখে কিসের আভায় খেলিয়া গেল। স্বস্তির একটা নিশ্বাস সজোরে রোধ করিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে বড় বিপদে পড়েই তার কাছে ছুটে এসেছিলুম।

বিপদ!

হ্যাঁ ক'লকাতা থেকে এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে, এক আত্মীয় মরণাপন্ন, না গেলেই নয়; অথচ, কাকাবাবুর এখানে এমন কেউ পুরুষ মানুষ নেই যে, আমার সঙ্গে যাবে। কি করি বলুন ত?

সমস্যার কথা বটে! গাড়ী ত সাতটা ক' মিনিটে, তারপর···

—না না, তারপর দেখলে আর চলবে না। আপনাকে এ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে।

আমাকে?

নইলে বিশ্বাসী লোক কোথা পাব বলুন? চলুন পৌছে দিয়েই চলে আসবেন 'খন।

—কিন্তু ওঁরা—

ওঁরা কিছু মনে করবেন না, বরং এ বিপদে সাহায্য না করলেই মনে করতেন। আর কথা কয়বার সময় নেই উঠে পড়ুন। একান্ত ভাবনা হয় কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখে রেখে যান, তা' হলেই যথেষ্ট হবে।

বাধ্য হইয়া রজতকে রাজী হইতে-ই হইল। নীতিশ বিজিতাদের ভিতরকার মনোমালিন্যের সমস্ত কথাই জানিত, তাই ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া বিজিতার পরামর্শ মত অজানা অচেনা রেলযাত্রীরূপে তাহাদের সহিত প্রফুল্ল অন্তরে কলিকাতামুখী হইল।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া রঘুয়ার মুখে অরুণ ও মাধবী যাহা শুনিল তাহাতে উভয়েই বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিল না। রঘুয়া বলিল, পাশের বাটীর কোন চাকর রজতবাবুকে একটী জেনানার সঙ্গে ক্ষিপ্রপদে ষ্টেশনের দিকে যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং সত্যই রজতবাবু এখন বাসায় নাই।

সকল জিনিষই যথাযথ পড়িয়া আছে, নাই শুধু রজত এবং তাহার মাঝারি সাইজের স্যুটকেশটী। হঠাৎ চৌকির উপর এক টুকরা কাগজ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হস্তাক্ষর রমণীর, কোন স্বাক্ষর বা সম্বোধন নাই!

—"তোমার দেখানো রাস্তাই বেছে নিলাম। অনুতাপ করলে বুঝবো তুমি কাপুরুষ। বৃথা খুঁজো না, আমাদের এখানে পাবে না।"

আর একদিকে রজত লিখিয়াছে মাধবীকে।

"বিজিতা দেবীর অনুরোধ এড়াতে পারলেম কিছুতে, তাই যেতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার ওপর বিশ্বাস আমার যথেষ্টই আছে, আশা করি ভুল বুঝবে না।"

পত্র পাঠ করিয়া ত্রিভুবন অরুণের চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল। কাগজখানি ছুঁড়িয়া সে মাধবীর দিকে ফেলিয়া দিল।

অনুতাপের তুষানলে অরুণের সারা অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, রজত সত্যই আসিল না দেখিয়া সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। তাহাকে সবচেয়ে পীড়া দিতে লাগিল বিজিতার চিন্তা! নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে কখন সুপ্তির স্নিগ্ধক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে-ও পারিল না।

বাহিরের দ্বারসংলগ্ন রোয়াকে বসিয়া মাধবী এই রহস্যের কথা চিন্তা করিতেছিল। রাত্রি বেশ খানিকটা গভীর হইলে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অরুণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খাবারগুলি ঢাকা দেওয়া পড়িয়া আছে। সে অরুণের গায়ে হাত দিয়া ডাকিল: অরুণ-দা', মশার বনে এমনি করে' পড়ে থাকতে হয়?

অরুণ তখন বোধ হয় বিজিতারই স্বপ্ন দেখিতেছিল বামাকণ্ঠে সচকিত হইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কেরোসিনের প্রদীপের মিটমিটে আলোতে ঘড়িটা ধরিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বিক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল: এখনো তুমি শোও নি মাধবী? খাওয়া হয়ে গেছে?

গম্ভীরকণ্ঠে মাধবী কহিল: আপনারও হয় নি অরুণ-দা'। চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক্।

খাইতে খাইতে অরুণ কহিল: ফিরে যাবার এখন কি কোন গাড়ী আছে মাধবী। জানো তুমি?

মাধবী বলিল: এখন বোধ হয় নেই, যদি থাকে ভোর রাত্রে।

—সেইটেতেই ফিরে যেতে হবে। জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে নাও মাধবী।

মুখ টিপিয়া হাসি চাপিয়া মাধবী বলিল: সবই গুছোন আছে।

মাধবীকে লইয়া বাটীতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অরুণ যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিল। উপরে আসিয়া একটী বর্ষিয়সী রমণী এবং তাহারই পার্শ্বে বিজিতাকে উপবিষ্ট দেখিল। অদূরে একটী অপরিচিতা কুমারী রজতকে আঙুলের

বসাইয়া কপালে ফোঁটা দিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পুলকিত কণ্ঠে রমণী কহিলেন : ওলো বিজু, কে এলো দেখ্, কি বাবা চিনতে পারো আমায়?

অরুণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী বলিয়া চলিলেন : আমি যে বিজুর পিসিমা। অনেকদিনের কথা, মনে নাও থাকতে পারে। সেই বিয়ের সময় মাত্র দু'দিন দেখেছিলে। আমার কিন্তু ঠিক মনে আছে, দেখচ ত?

অরুণ তাঁর পায়ের ধূলা লইল।

পিসিমা সেকেলে মানুষ, কহিলেন : তোমরা ভুলবে বলে' আমরা ত আর ভুলতে পারি নি বাবা। তা' ছাড়া আজকের দিনে কোন্ বোন্ ভাইকে ছেড়ে বিদেশে থাকে বলো ত? রজতই না হয় রাগ করে' আমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে নি,—স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেছে। কিন্তু ওর ঐ বোন্ ত এখন বড়টী হয়েচে, এসব শুনবে কেন? মজা দেখ, বিজু পর্য্যন্ত ওকে প্রথমে চিনতে পারে নি ওর ভাই বলে। আমিই না সে ভুল শুধরে দিলুম। বলিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর হাসিয়া কহিলেন : ও বলে কি জানো? বলে, রজতবাবু তোমার বিশেষ বন্ধু। অদৃষ্ট আর কাকে বলে, ভাইকে চেনে না বোন, ভাই চেনে না ভগ্নিপতি! আমি ত হেসে বাঁচি না। সে যাক্; এখানে এলুম কি ভাবে শোন্। বীণার বায়নায় অতিষ্ঠ হয়ে, দেশের একটী ছেলের সঙ্গে এখানে এসে রজতের বাড়ীতে উঠে, শুনলুম সব দিল্লী চলে গেছে। মনটা বিগড়ে গেল ভাবলেম, না হয় যাই একবার বিজুর সঙ্গে দেখা করে'। তা' এখানেও ওই এক কথা। ভাবলেম একসঙ্গেই গেছে, ভাব হয়েছে, ভালই হয়েচে। থাকবো কি চলে' যাব ভাবচি, একখানা ভাড়া মটোর এসে দরজায় লাগ্‌ল। মন যাদের চাইছিল, তারাই; বিজু আর রজত। রজত আমায় দেখে অবাক্। আর বীণার সে কী আনন্দ!

হাসিয়া অরুণ কহিল : তা' হ'লে আপনার [illegible]নের জোরেই ওরা এসে পড়েছিল পিসিমা!

—সে যাই হোক্, সবই অদেষ্ট বাবা! তোমরা বুঝি গাড়ী ফেল্ করেছিলে? কই গো, বৌমা কই আমার? এদিকে এসো ত মা। সেই বিয়ে দেবার পর আর ত দেখি নি তোমায়। —তুমি-ও না।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মাধবী শাশুড়ির চরণ বন্দনা করিল। থাক বাছা থাক, বলিয়া পিসীমা কি একটা কাজে উঠিয়া গেলেন।

হাস্যোজ্জ্বল-কণ্ঠে রজত বলিল : বিজু, এইবার বড়ো করে' ফোঁটার—তথা চর্ব্বচোষ্য খ্যাটের আয়োজন কর দিদি। আর বীণা, তোর দাদাবাবুটীকে একটা বড়ো করে' লাল ফোঁটা লাগিয়ে দে!

বীণা অরুণের মুখের পানে চাহিল।

হৃদয়ের গুরুভার খসিয়া গিয়াছিল, তথাপি কৃত্রিম গম্ভীরকণ্ঠে অরুণ কহিল : ফোঁটা নেবার মতো বিরাট কপাল অমার নেই রজত! ফোঁটার আড়াল দিয়ে সেই সর্ব্বস্বময় পরম পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ইচ্ছাও অনেকদিন চলে' গেছে। যার স্নেহে—তাহার স্বর ভারী হইয়া আসিল।

—থাক, থাক্, আর দুঃখ জানাতে হবে না। ভুল যেন আমিই শুধু করেছি! উনি কিছুই জানেন না! ও, বুঝেছি খোসামোদ না করলে আজ রাগ যাবে না, নাঃ?

—না, খোসামোদ আবার কিসের! আগুন—

অপাঙ্গে তীব্র একটা কটাক্ষ হানিয়া স্বামী ব্যাচারীকে অবশ করিতে চাহিয়া বিজিতা বলিল : ঢের হয়েছে। বেশী পাশ করেছ কি না তাই অত বুদ্ধি বেড়েছে। তুমিই বল না বৌদি', আজকের দিন যত সব বাজে কথা চলতে আছে না কি?

মাধবী প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বোধ করিল না। অদূরে রক্ষিত চন্দনের বাটীটী তুলিয়া অরুণের কপালে ফোঁটা আঁকিয়া দিয়া [মু]খ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সহসা বাধা দিয়া অরুণ বলিয়া উঠিল : না,না, [শু]ধু ফোঁটা দিলে চলবে না। আমার কাপড় [ক]ই মাধবী?...

পাশের বাড়ী হইতে সেই সময় ঘন ঘন [শাঁ]খের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

পট-পরিবর্ত্তন

শ্রীহরিপদ গুহ

পূজার দিন-দুই পূর্ব্বের কথা।

হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না, তাই বিকালের দিকে একখানি বই লইয়া ট্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।

তখন বোধ হয় রাত্রি গোটা আটেক হইবে। মনে করিলাম—এইবার নামিয়া বাড়ী যাইব। অনেকক্ষণ হইতেই আকাশে মেঘ করিয়াছিল। বাসার কাছাকাছি আসিতেই অকস্মাৎ ঝম্‌ঝম্ শব্দে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। সঙ্গে ছাতি ছিল না, কাজেই আর নামা হইল না, ভাল করিয়া আবার চাপিয়া বসিলাম। গাড়ী ডিপো হইতে আবার ছুটিয়া চলিল।

বৃষ্টির বিরাম নাই।

বইখানি পড়িতে-পড়িতে আমি একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ চাহিয়া দেখি—কখন এস্‌প্লানেড আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক গাড়ীর জন্তই অপেক্ষা করিতেছিলেন। লোক নামিয়া যাইতেই হুড়মুড় করিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। সকলের আগে যে তরুণীটি উঠিল—তাহার বয়স অনুমান সতের আঠার হইবে। বেশ সুশ্রী গড়ন; তাহার চোখে-মুখে এমন একটা ছাপ আছে যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুন্দরের পূজারী কে নয়? সকলেরই আগ্রহভরা দৃষ্টি ছিল তাহার দিকে; আমিও অবশ্য বাদ যাই নাই।

তরুণী সম্মুখে "লেডিজ সিট"এর দিকে যাইতে যাইতে সহসা আমার কাছে আসিয়া একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াই হাসি-হাসি-মুখে ধীর-সহজকণ্ঠে কহিল, "কি চিনতে পারেন আমায়?"

আমি লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। কিছুতেই কিন্তু তাহাকে স্মরণে আনিতে পারিলাম না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, 'কই, না ত।'

তরুণী একটু হাসিল। তারপর 'আপনি সুনীল দা' ত?' বলিয়া স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। তথাপি কোন কথা বলিলাম না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে সম্মুখের সিটে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পিছন পিছন আরও তিন চার জন মহিলা সেখানে গিয়া বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত তরুণীটি আমাকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদের কি বলিল। সকলেই আগ্রহ ভরা দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া আমাকে দেখিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। শুধু তাঁহারাই হাসিতেছিলেন না, এক গাড়ী লোকের কৌতুহল দৃষ্টি ছিল আমার উপরে। আমি লজ্জায় একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কিন্তু কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না যে, তরুণীকে কবে, কোথায় দেখিয়াছি?

একপাল চক্ষুর সম্মুখে উঠিয়া গিয়া তাহাদের পরিচয় লইতেও কেমন বাধ-বাধ লাগিতেছিল। নূতন করিয়া আবার লজ্জা পাইতে ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম তাঁহারা যখন নামিয়া যাইবেন, পরিচয়টা তখনই জানিয়া লইব'খন।

পাঠে আর মন দিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে তরুণীর দিকে চাহিয়া চিন্তা সাগরে ডুবিয়া তাহারই কথা ভাবিতেছিলাম। কিন্তু কোনই কিনারা পাইতেছিলাম না।

হ্যারিসন রোড পার হইয়া যাইতেই ভবেশ উঠিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে ছাতি ছিল। সে আমারই পাশের বাড়ীতে থাকে। ভাবিলাম—বাঁচা গেল, আর ভিজিতে হইবে না!

বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়িতেছিল, মনে করিয়াছিলাম—তাঁহারা বোধ হয়, আমার আগেই কোথাও নামিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহারা উঠিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিলেন না।

ট্রামের বাসার কাছাকাছি আসিতেই 'ওঠ হে!' বলিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও আর ভাবিবার অবসর পাইলাম না। তাহার পিছন পিছন নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনের কোণে অপরিচিতা মেয়েটীর নিকট অকারণ লজ্জিত হইবার কথাগুলা খচ্ খচ্ করিয়া মনে মনে বাজিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কয়েকদিন চলিয়া গেল। ক্রমে তাঁহাদের স্মৃতিও মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিলাম।

এমনই হয়। জীবন নদীতে কত ফুল ভাসিয়া আসে, কত চলিয়া যায়, কে আর সব মনে করিয়া বসিয়া থাকে?

মাস দু' এক পরের কথা।

বৌদির একখানি চিঠি পাইলাম। তিনি পিত্রালয় হইতে লিখিয়াছেন। অন্যান্য সংবাদের পর তিনি জানাইয়াছেন—কয়েকদিন হইল ছায়া এখানে আসিয়াছে। সে আমার খুব নিন্দা করিয়াছে। বলিয়াছে কবিরা নাকি এমনই স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিহীন হয়। নহিলে তাহাকে দেখিয়াও আমি চিনিতে পারিলাম না কেন? সে চিনা দেওয়া সত্ত্বেও আমি তাহার সঙ্গে আলাপ না করায় সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

হইবারই কথা। সত্যই ত আমারই দোষ। তাহাকে বলিবার কিছুই নাই ...

বৌদির ছোট বোন-সেই ছায়া! এত পরিবর্তন! আমার স্মৃতি শক্তির দোষ দেওয়া চলে না তাহা হইলে। সত্যই তাহাকে চিনিবার উপায় নাই! ছেলেবেলায় তাহাকে সেই কতটুকু দেখিয়াছিলাম! তারপর অনেকদিন তাহাকে আর দেখি নাই। অতটুকু ছোট্ট মেয়ের বৈশিষ্ট্যহীন জীবনের কথা কে আর মনে করিয়া রাখিতে পারে?

বছর পাঁচ ছয় পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম দিন কয়েকের জন্য। বৌদিকে বাপের বাড়ী রাখিতে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে ছায়া টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাশায়ী ছিল। অস্থি কঙ্কালসার শ্রীহীন রুগ্ন দেহ, রোগ যন্ত্রণায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিত! মধ্যাহ্নে সকলে যখন আহারাদি করিতে যাইত। সেই সময়ে কিছু ক্ষণের জন্য আমি তাহার পাশে বসিতাম। ঘড়ি দেখিয়া ঔষধ দিতাম। যখন ক্ষীণ কণ্ঠে কাতর ধ্বনি করিত, তাহার রোগ মলিন শুষ্ক কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতাম। সে তাহার জ্যোতিহীন ডাগর ডাগর চোখ দু'টী তুলিয়া ধরিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।...

সে' যাত্রা সে সারিয়া উঠিল। তখনি কি বিশ্রী চেহারাই না হইয়াছিল তাহার। মাথার চুলগুলি ছোট্ট করিয়া কাটা, যেন শ্মশান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনা হয়েছে।

বৌদির মা একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন—আমার সঙ্গে ছায়ার বিবাহ হইলে নাকি ভাল মানাইত।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবারই মত। সে কি বুঝিয়াছিল তাহা সেই জানে। আমার কাছে সে আর বড় বেশী বাহির হইত না। অথচ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আড়াল হইতে সে সর্ব্বদাই সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। এই ত ব্যাপার! ইহার মধ্যে এমন

কিছু ছিল না, যাহাতে তাহাকে একেবারে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিতে হইবে? ঐ রূপ শ্রীহীন অবস্থায় দেখিবার পাঁচ ছয় বৎসর পর ছায়াকে ট্রামে যে অবস্থায় দেখিয়াছি, তাহাতে প্রথম দর্শনেই চিনিয়া ফেলা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাহার যৌবন চঞ্চল সুশ্রী লীলায়িত তনুলতা দেখিয়া কিছুতেই রোগ পাণ্ডুর শুষ্ক ছায়ার কথা স্মরণ হইতে পারে না। বিশেষ তখন সে বিবাহিত। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, ছায়ার যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না। কাজেই তাহাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া আমাকে খুব দোষী করা চলে না। সমস্ত ঘটনাটা ভাবিয়া দেখিতেই আমার হাসি পাইল।

বছর সাতেক পরের কথা।

বর্ষাকাল। কি একটা প্রয়োজনে আমি বাগবাজার ষ্ট্রীটে একজন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তখনই ফিরিয়া আসিব বলিয়া সঙ্গে ছাতা লই নাই। ঘটনাচক্রে ফিরিতে দেরী হইয়া গেল। তখন কাজল-কালো মেঘে সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বেই ফিরিবার জন্য পা' দুইটাকে তাড়াতাড়ি চালাইয়া দিলাম। কিন্তু পারিলাম না। কিছুদূর আসিতেই ঝমঝম শব্দে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া একখানি বাড়ীর বারান্দার নীচে রোয়াকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়া কোন প্রকারে জলের ঝাপটা হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম সহসা পাশের একটা জানালা খুলিয়া গেল। একটু পরেই চার পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ে ডাকিতে লাগিল, 'মামাবাবু, ভেতরে আসুন; মা ডাক্‌ছে;' মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম; ঠিক বুঝিতে পারিলাম না যে, কাহাকে বলিতেছে। মেয়েটা পিছন দিকে দেখিয়া বলিতে লাগিল; 'বা রে, ডাক্‌ছি ত শুন্‌তে পায় না যে!' নারী কণ্ঠে কে বলিল: 'আবার জোরে ডাক!' মেয়েটা সত্যই এবার খুব জোরে বলিল: 'ও মা-মা বা-বু, তোমায় মা ডাক্‌ছে!' আমার হাসি পাইল, ধীরে ধীরে জানালাটার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলাম, 'খুকী, আমাকে ডাক্‌ছ?' সে উত্তর দিবার জন্য পিছনে তাহার মায়ের দিকে চাহিল। তাহাকে আর উত্তর দিতে হইল না। তাহার মা-ই ধীরকণ্ঠে বলিল: 'হ্যাঁ, ভেতরে আসুন!'

একজন অ-পরিচিতা রমণীর আহ্বানে ভিতরে প্রবেশ করিব কি না, তাহাই ইতঃস্ততঃ করিতেছিলাম: সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ভাবছেন কি, আসুন। আমি ছায়া।' যাক্‌, বাঁচিলাম। আমার বিস্ময় ভাবটা কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সম্মুখেই একখানি চেয়ারে আমি বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলাম; 'কেমন আছ ছায়া?'

সে ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল; 'বেশ।' তাহার হাসির ফাঁকে যেন কান্না ঝরিয়া পড়িল।

সেই যৌবন-গর্ব্বিতা দীপ্তিময়ী ছায়া আর নাই। সে এখন তিন চারটী সন্তানের জননী। তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চোখে মুখে বেদনার ছাপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শীতের শুষ্ক মরা নদীর মত, তাহার তনুলতা ও যৌবনের একটু অস্পষ্ট দাগ রাখিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। কি রহস্য ভরা নারীর জীবন।

অনেকদিন পরে দেখা। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে কত প্রশ্নই না করিতে লাগিল। আমার আর নূতন কি কি বই বাহির হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সে যে আমার একজন ভক্ত পাঠিকা

তাহাও জানাইয়া দিল। তাহার কথা আর ফুরাইতে চাহে না। অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, 'আজ উঠি তবে।' ছায়া বাধা দিয়া বলিল, 'বারে, তা হবে না, চা করি, খেয়ে তবে যেতে পাবে।'

আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম, 'এইমাত্র আমার এক বন্ধুর বাড়ী থেকে চা খেয়ে আসছি! বেশী চা আমি খাই না। বরং একটা পান দাও আজ। আবার যেদিন আসব, সেদিন কোন আপত্তি করব না, যা' দেবে খাব!'

সে হাসিল। কি প্রশান্ত সে হাসি। পান আনিয়া হাতে দিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল ছায়ার স্বামী অরুণবাবু। আমি তাহাকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম। সে কিন্তু প্রতি নমস্কার করিল না। জড়িত কণ্ঠে কি যে বলিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাহার মুখের একটা তীব্র গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভরিয়া গেল। ছায়ার দিকে চাহিলাম—তাহার মুখে কিছু মাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না। হাসির একটা ক্ষীণ রেখা টানিয়া আনিয়া সে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করিতে চাহিতেছে।

বুঝিলাম সবই। আর মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইলাম না। 'আসি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হায়, এই ছায়ার স্বামী। ছায়া একটাও কথা কহিল না। একবার আমার দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইল।

রাস্তায় আসিতেই অরুণের বিশ্রী অশ্লীল রসিকতা ও নিষ্ঠুর প্রহারের শব্দ কাণে আসিয়া বাজিল, শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। ছিঃ ছিঃ, কি জঘন্য অন্তঃকরণ। মানুষ এত নীচ হয়?

ছায়ার বিবাহিত জীবনের কথা ভাবিয়া আমার অন্তরটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

বেদনাতুর হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। জানিয়া শুনিয়া ছায়া কেন আমাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া এতবড় অপমান সহ্য করিল। ভাবিয়া পাইলাম না। হয় ত একদিন তাহার রোগ-শয্যায় বসিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সেবা করিয়াছিলাম এ তাহারই ঋণ-পরিশোধ। অথবা যাহাকে লইয়া একটী কুমারী জীবন অকারণ সুখ-স্বপ্ন রচনা করিয়াছিল বাস্তব আজ তাহাকে কোথায় টানিয়া আনিয়াছে তাহাই দেখাইয়া দিয়া নিঃশব্দে লইল প্রতিশোধ! কে জানে!

দুর্জ্ঞেয় নারী চরিত্র কেই বা বুঝিবে?

কৃষ্ণা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
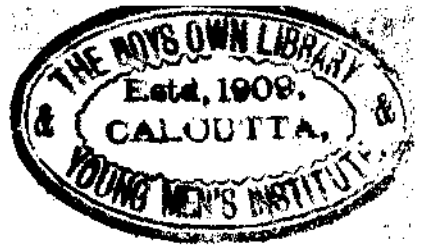
চতুর্দ্দিক থেকে সম্বন্ধ আসে, কৃষ্ণার বিয়ে আর কিছুতেই হয় না। তার মা বলেন—"মেয়ের মুখ দেখলে আমার ভেতরটা শুকিয়ে যায়। ও যদি কালো না হ'ত তা' হ'লে কি আজ বিয়ের ভাবনা? সবই অদৃষ্ট—"

মুখুয্যে-মশায় অস্থির হয়ে পড়েন—সোমত্ত মেয়ে আর কতদিন ঘরে রাখা যায়! কন্যার জন্য পাত্রের অন্বেষণ করেন। দুই-একটি জায়গা হ'তে পাত্রী দেখতেও আসে, কিন্তু কালো মেয়েকে পছন্দ করাবার মত অর্থ তাঁর নেই; কাজেই সেইখানেই দেখা-শোনা শেষ হয়ে যায়। গ্রামের মাইনর স্কুলের তিনি হেড পণ্ডিত। স্কুলের সামান্য বেতন। তাইতেই কোনরকমে দিন চলে। যা' কিছু জমিজমা ছিল, বাকী খাজনার দায়ে একে একে সব জমীদারের কবলে গিয়ে পড়েছে। বাথায় পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে শুধু অতীতের কাহিনী।

সংসারের বেশীর ভাগ কাজ কৃষ্ণাকে করতে হয়। একটু ত্রুটী হ'লে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত থাকে না। সে ভাবে—এর চেয়ে মরণ ভালো।

সে রাঁধে, ছোট ভাই-বোনদের খেতে দেয়, ঘুম পাড়ায়, গল্প করে। তারপর বৈকালে জল তুলতে, বাসন মাজতে এবং কাপড় কাচতে তার সময় চলে যায়। সূর্য্য ডুবে যায় পশ্চিমের আকাশে। সে গা ধুয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিয়ে তুলসীতলায় ভক্তিভরে বিশ্ব-দেবতাকে প্রণাম করে' চেয়ে দেখে আকাশ-দেউলে লক্ষ প্রদীপ জেলে কে দীপালী করছে। ভাবের আবেগে তার হৃদয়ের সপ্ত সুর একত্র বাজে। সাঁঝের বাতাস লেগে তার এলোচুল এলোমেলো হয়ে যায়। রাত্রিতে কুটীর অঙ্গনে মাদুর পেতে ভাই-বোনদের ঘুম পাড়িয়ে পাশের বাড়ীর ললিতার সঙ্গে গল্প-গুজব করে।

সম্প্রতি তার প্রিয়সঙ্গিনী ললিতার বিয়ে হয়ে গেছে। যাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাতো; আজ তার সঙ্গে একটা মস্তবড় ব্যবধান ঘটেছে। ললিতা যে ক'দিন বাপের বাড়ী আছে; সেই ক'দিন তার তৃপ্তি। ললিতা সুখের স্বপ্ন বেঁধেছে সুন্দর স্বামী লাভ করে'। কখন শ্বশুর-বাড়ীর আদর-যত্নের কথা, কখন স্বামীর প্রণয়-সম্ভাষণের কথা সে বলে যায়, কৃষ্ণা মন দিয়ে শোনে, আর ভাবে—হবেই বা না কেন? ও যে ফরসা, সুলক্ষণা! ওর জন্মাবার পর ওর বাপের অবস্থা ফিরে গেছে! আর সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার পড়ে। সে আপন-মনে বলে—"আমি কালো, জন্মেছি তেরস্পর্শ মাথায় করে'—মা তাই বলেন—'তুই অলক্ষুণে'!"

ললিতার সুখ-নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে সে যখন তার আনন্দ-লহরী দেখে, তখন মনের ভিতর অনেক কিছুই তার তোলাপাড়া করে। কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ-আহ্লাদ জেগে ওঠে, আবার দূরদূরান্তে মিলিয়ে যায়। কুমারী-জীবনের ব্যর্থতা এবং প্রণয়-লিপ্সা একত্র এসে কৃষ্ণাকে বিপর্য্যস্ত করে' তোলে। কে যেন তাকে বলে—"যৌবনের অগ্নিশিখায় জীবন-যজ্ঞের আয়োজন কর—" এর অর্থ সে বুঝতে পারে না—স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ললিতার ফুলশয্যা রজনীর গল্প কৃষ্ণা শুনেছে, আর দেখেছে স্বামীর প্রথম প্রণয়-লিপি—কবিতার প্রথম ছত্রটী তিনি লিখেছেন—"জ্যোৎস্না রাতে তোমায় প্রিয়া চোখে লাগে বড় ভালো'—" কত মধুর!

কৃষ্ণার জীবন-নদী ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরু ভূমি হচ্ছে, সে বুঝেও ঠিক বুঝতে পারে না। অব্যক্ত বেদনায় সে গুমরে ওঠে।

দুই

বাংলাদেশে কালোমেয়ের অনাদর এবং লাঞ্ছনা দিনপঞ্জীর মধ্যে বিরল নয়; কিন্তু কে বুঝতে চায় তাদের ভেতরও স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা কিছুরই অভাব নেই। তাদেরও মানস-সরোবরে শতদল আঁখি মেলে। বহু চেষ্টার পর কৃষ্ণার পিতা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের চৌধুরী-মশায়ের শরণাপন্ন হলেন। চৌধুরী-মশায় কুসীদজীবি। মানুষের চেয়ে অর্থটাকেই তিনি বড় করে' দেখেন। মুখুয্যে-মশায় তাঁর কাছে বিবাহের মত জানাতে তিনি প্রথমে সম্মত হন নি; শেষে অর্থের বিশেষ চাপ দিয়ে বল্লেন—"এর কম হয় না।" তারপর গড়গড়ার নল দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বল্লেন—"কি বল, রাজি?"

কথা কইবার মত অবস্থা নয়, কাজেই মুখুয্যে মশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চৌধুরী-মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার অন্তরে কে যেন বলে উঠল—"দুঃখ কিসের, তুমি একা নও, তোমার মত কত অরক্ষণীয়া মেয়ের বাপ এমনই ভাবে সমাজের যাঁতায় তলে পিষে মরছে, বাংলা-দেশে কন্যাদাহ হচ্ছে সমাজবিধির প্রলয়শিখায়।" তাঁর অজ্ঞাতে গণ্ড বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল।

চৌধুরী বল্লেন, "তা' ছাড়া এত তাড়াতাড়ি সুকুমারের বিয়ে দেওয়া কারও ইচ্ছে নয়, এখন পড়াশুনা করছে, বিয়ে দিয়ে কি হবে—"

মুখুয্যে-মশায় সহসা তার পা দু'টা চেপে ধরে' বললেন—"কিন্তু আমার যে সমূহ বিপদ, আপনি দয়া করে' মেয়েটিকে না নিলে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।"

—"মহা মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। বাড়ীর সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে যদি বিয়ে দিতে হয়, ভবিষ্যতে একটা গণ্ডগোলের সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে টাকা কমাতে পারব না, রাজি থাকেন হয়ে যাক্ শুভকর্ম্ম, আপত্তি করব না। বুঝেছেন?"

না বোঝা ছাড়া আর উপায় নাই, কাজেই মুখুয্যে-মশায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। চৌধুরী হেসে বললেন—"লোকে কথাটি বলবার যো রাখবে এমন ছেলে চৌধুরী-বংশে কেউ জন্মায় নি! সোণারচাঁদ পাত্র, অন্য কেউ হ'লে আগেই তিন হাজার হেঁকে বসত। তোমার অবস্থা বুঝে আমি অনেক কম করে' বলেছি। হাজার টাকা ত মাটির দর, বুঝলে হে মুখুয্যে।"

—"তা' বটে" বলে' মুখুজ্যে-মশায় উঠে পড়লেন।

তিন

ভগবানই শেষে অকূলে কূল দেখিয়ে দিলেন। ভবঘুরের মত কিছুদিন ঘোরার পর মুখুয্যে-মশায় থিয়েটারের সাহায্য-রজনীতে প্রয়োজনাতীত অর্থ লাভ করে' দেশে ফিরে এলেন। কৃষ্ণাকে পুত্রবধূ করে' নিতে চৌধুরীর তখন আর কোন আপত্তিই রইল না। মুখুয্যে-মশায় এবং তার স্ত্রী আজ হর্ষোৎফুল্ল। ঘর থেকে এক পয়সাও লাগ্‌লো না, অথচ সম্পত্তিপন্ন ঘরে মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করা গেল এই ভেবে তাঁরা বিপদ-বারণকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

ললিতা শ্বশুর-বাড়ী চলে গেছে, নতুবা কুমারী-

জীবনের অর্ঘ্য কিরূপ ভাবে সাজিয়ে স্বামীর চরণে নিবেদন করতে হয় কৃষ্ণা সে বিষয়ে তার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করতে পারতো। উৎসব-রজনীতে সে ললিতকে বহুবার স্মরণ করেছে।

ফুলশয্যার রাত্রে কৃষ্ণা স্বামীর মুখ থেকে সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনলে—তার মত মেয়েকে বিয়ে করেছে, এই তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সৌভাগ্য। তার ওপর আবার প্রেম করার সময় তার নেই; তার চেয়ে সে মরতেও প্রস্তুত আছে।

কৃষ্ণা একটা কথা বললে না, চুপ করে' পড়ে রইল। বল্‌বার তার কিই বা আছে? মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে, কিন্তু এ যে বিধাতার বিধান—সে সুন্দরী নয়!

তারপর কয়দিন ঘর করার মধ্যেই নব-বিবাহিতা কৃষ্ণা স্বামী-দেবতার নিকট রূঢ় বাক্য, পদাঘাত, দারুণ অত্যাচার সব নীরবে উপহার নিয়ে সগৌরবে শ্বশুর-বাড়ী হ'তে বাপের বাড়ী ফিরে এল।

চুল বাঁধ্‌তে গিয়ে পিঠে কাল কাল লম্বা দাগ দেখে জননী শিউরে উঠ্‌লেন! কন্যার কাছে সদুত্তর না পেলেও মন তাঁর সন্দেহ দোলায় দুলে উঠ্‌ল।

দিনের গতির সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার সে সন্দেহ ক্রমে দৃঢ়তর হয়ে উঠ্‌ল। ছ'মাস কেটে গেল, কেউই কৃষ্ণার খোঁজ করে না কেন? তবে কি.........

পিতা-মাতার মুখ দেখে কৃষ্ণার চোখ জলে ভরে' উঠ্‌ল। সে একদিন বললে—"আমায় সেখানে রেখে এসো বাবা।"

বাপ বললেন,—"কেন মা, তারা যখন তোর খোঁজ করে না, তুই বা সেধে যাবি কেন?"

কৃষ্ণা হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে—"না বুঝে ঝগড়া করেছিলুম, তাই আসেন নি, কিন্তু আর না যাওয়া ভাল দেখায় না বাবা।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখুয্যে-মশায় শেষে বৃদ্ধ হরিচরণের সঙ্গে মেয়েকে গোযানে তুলে দিলেন। কৃষ্ণা শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা কর্‌লে।

গাড়ী থেকে নাম্‌তেই তার শাশুড়ী বল্‌লেন—"ওরে আবাগীর বেটী, আবার আমাদের জ্বালাতে এসেছিস্!—যে ক'দিন ছিল বাছার আমার ঘুম হয় নি;—একদিনও সে শান্তি পায় নি—"

কৃষ্ণা কেঁদে ফেলে বল্‌লে—"মা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—আমাকে একটু জায়গা দিন—"

শাশুড়ী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন—"ওসব মায়াকান্না আমি ঢের বুঝি। ভূত-পেত্নীর স্থান এ বাড়ীতে হবে না, সোজা বলে' দিচ্ছি।" মুখ ঘুরিয়ে তিনি বাড়ীর ভেতর চলে' গেলেন।

শেষে শ্বশুর এসে বল্‌লেন—"এস বউমা, ঘরে চল"

কৃষ্ণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। শ্বশুর-বাড়ীতে অতি কষ্টে এবার সে স্থান পেলে বটে, কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লো।

স্বামী ব্যঙ্গ করতো—"কৃষ্ণা নয়, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ!"

শাশুড়ী বল্‌তেন—"কেষ্টা নয়, বউমা আমার রক্তেকালী!"

কৃষ্ণা নীরবে এই সব অপমান সহ্য কর্‌তো এই আশায়, স্বামী—যদি কোনদিন তার প্রতি দয়াপরবশ হন।

কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষুব্ধদেহ নিয়ে আবার কৃষ্ণাকে একদিন স্বেচ্ছায় তার বাপের বাড়ী ফিরে আসতে হ'ল। এবার আর সে তার পরাজয়ের বেদনা কারও কাছে গোপন করতে পারলে না।

মা কেঁদে ফেল্‌লেন, বললেন—"এ কি করেছিস্ কৃষ্ণা, মরতে বসেছিস্ যে!"

হাসিতে কান্না ঢাকতে চেয়ে কৃষ্ণা বল্লে—"মরণই যে আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু মা! আমি আর কি নিয়ে বাঁচব?"

উত্তর নেই!

বাঙালা দেশের গর্ভধারিণীদের শুধু চোখের জলই সম্বল, তাই দিয়ে জননী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন।

চার

কৃষ্ণা স্ব ইচ্ছায় চলে যাওয়াতে সুকুমার মনে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করল—যাক্, আপদ গেল! তার কৈশোরের স্বপ্ন সুতন্বী অর্চ্চনাকে পেতে পথে আর কোন কণ্টকই রইল না। সে তখন অর্চ্চনার পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণি-প্রার্থনা করল। কিন্তু অলক্ষ্যে দেবতা একটু হাসলেন মাত্র।

সুকুমার এবং অর্চ্চনার মনের মিল এবং ভালবাসার কথা কারও অজানা ছিল না। শুভলগ্নে মাতা-পিতার উৎসাহ এবং আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাদের দু'জনের মিলন হয়ে গেল।

বিবাহের কয়েক মাস পরে সুকুমার আবিষ্কার করল—অমাবস্যার সেই চাঁদ এবং শুক্লপক্ষের এই চাঁদে বেশ একটু পার্থক্য আছে। কৃষ্ণার কোন গুণ না থাক্‌লেও অর্চ্চনার মত সে এতটা 'ফরওয়ার্ড' ছিল না এবং কথায় কথায় মুখের উপর এমন করে' জবাব করতে সাহস পেত না। নিজের কালো চেহারার জন্যে সে যেমন সদাই সন্ত্রস্ত থাকত পাছে স্বামী ত্যাগ করে,তেমনি নিজের সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে অর্চ্চনা সুকুমারকে মোটেই আমল দিত না, এবং তাকে সে একটু উপেক্ষার চোখেই দেখত।

সুকুমার যদি কারও নাম করে' বলতো—ছেলেবেলায় তোমরা বন্ধু হ'লেও এখন আর তার সঙ্গে তোমার খেলা করা শোভা পায় না অন্থু। হাজার হলেও সে পুরুষমানুষ। হতে পার তোমরা সমবয়সী, কিন্তু—"

তার কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই তাচ্ছিল্যের সুরে অর্চ্চনা উত্তর দিত—"থাম থাম, আমার যাকে ভাল লাগে, তার সঙ্গে মিশবো এবং খেলবো। তোমার যদি অপছন্দ হয়, তোমার সেই 'রক্ষেকালী'কে নিয়ে এলেই পার।"

সুকুমার ক্রোধে বিরক্তিতে 'গুম' হয়ে থাকে পত্নীর কথার সে জবাব দিতে পারে না।

* * একদিন অর্চ্চনা এসে সুকুমারকে বলল—"আজ আমার ফিরতে একটু বেশী রাত হ'তে পারে, আজ 'ড্যান্সে' চক্রবর্ত্তী আমার পার্টনার আছে। তুমিও আসছ ত?"

সুকুমার বিহ্বল-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"সে কী! তুমি নাচতে যাবে? মা-বাবা এসব জানেন?"

মুখের ওপর অর্চ্চনা সটান উত্তর দিল—"তোমার বাবা-মা না জানলেও আমার বাপ-মা জানেন। তোমার বাবা নাচের খবর রাখবেন, না টাকার সুদ গুণবেন?"

সুকুমারের ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। সখ করে' পছন্দ মত সে যাকে বরণ করে' ঘরে এনেছে, তার ভেতর এতটা হলাহল কোথায় লুকানো ছিলো সে খুঁজেই পেলে না। অলক্ষ্যে তার মনের চোখের মাঝে কৃষ্ণার কাল মুখের ওপর কুচ্‌কুচে সেই কাল তারা দু'টী ফুটে উঠল—অত তাচ্ছিল্য এবং মারধোরের মধ্যেও তার সেই সকরুণ চাহনি মনে জাগতে লাগল।

যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হওয়ায় শান্তি পাবার আশায় সে সাগরের উদ্দেশে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

পাঁচ

দীর্ঘ পাঁচবৎসর পরে সিভিলিয়ান্ সুকুমার অনেক আশা নিয়েই ফিরে এলো।—অর্চনা এই-বার তাকে নিয়ে সুখী হবে, আর অতটা ঘৃণা করবে না বা 'ড্যান্সে'র জন্য অন্ত দোসর খুঁজবে না। কিন্তু বাড়ী ফেরার প্রথমদিনেই পত্নীর সঙ্গে প্রথম আলাপে সে যা' বুঝল, তাতে তার মগজ বিগড়ে গেল। সুকুমার আপনার ঘরে স্ত্রীর আগমনের অপেক্ষায় প্রায় আধঘণ্টা কাটাবার পর রীতিমত প্রসাধন সেরে অর্চনা এসে বলল—"এখন ত আমার সময় হবে না, নৃপেনবাবুর সঙ্গে আমার আজ থিয়েটারে যাবার কথা, থিয়েটার আরম্ভ হতেও আর বিশেষ দেরী নেই, এখন আমি চলি।"

সুকুমার তার সঙ্গে আর একটিও বাক্য বিনিময় না করে' সরাসরি কৃষ্ণার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

ডাক্তারকে বিদায় করে' মুখুয্যে-মশায় সবেমাত্র গড়াগড়াটিতে একটা টান দিয়েছেন, অকস্মাৎ সাহেববেশী সুকুমারকে দেখে তিনি বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। জামায়ের বিলাত যাওয়ার কথা তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু সে কবে ফিরল, তার কিছুই তিনি জানতেন না।

সুকুমার শ্বশুরের পায়ের ধূলো নিয়ে একে-বারে বলে' বসল—"আমায় আপনারা মাপ করুন, আমি অনেক অন্যায় করেছি। আজ ওকে আমি নিয়ে যেতে চাই।"

বৃদ্ধ মুখুয্যের গণ্ড বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল। জামাতার উদ্দেশ্যে বললেন—"তুমি আজ কৃষ্ণাকে নিতে এসেচ বাবা, এদ্দিন পরে! মা আমার ভেবে ভেবে ওপারে যাবার জন্যে যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে—ডাকও তার এসে গেছে। ডাক্তার ত একটু আগেই স্পষ্ট বলে' গেলেন—'আজকের রাত আর কিছুতেই কাটবে না'।"

সুকুমারের মাথায় অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল। উন্মাদের মত চীৎকার করে' সে বলে' উঠল—"এ্যাঁ, বলেন কি! কী অসুখ তার?"

মুখুয্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"পাল-মোনারি টি বি অর্থাৎ যাকে বলে যক্ষ্মা।"

সমস্ত দুনিয়াটা সুকুমারের চোখের সামনে দুলে উঠল। ব্যগ্রকণ্ঠে সে শ্বশুরকে বলল—"চলুন আমি একবার দেখবো তাকে।"

অপেক্ষা না রেখেই অন্দরে যাবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জামাতাকে দেখে কৃষ্ণার মা হাহাকার করে' কেঁদে উঠলেন—"বাবা, আমার কালো মেয়েকে আজ তুমি নিতে এলে?"

সুকুমারকে দেখে বিশীর্ণ হাত দিয়ে কৃষ্ণা তার মাথায় কাপড়টা টেনে দিল। তারপর পাণ্ডুর অধরে মৃদু হাসির রেখা টেনে সে ধীরে ধীরে বলল—"আমার কাছে এইখানটায় বোস!"

অনেক কষ্টে অশ্রু দমন করে' সুকুমার চোখ মুছতে মুছতে তার পাশে গিয়ে একটু যায়গা করে' নিল। বলল—"তোমায় নিতে এসেছি কৃষ্ণা! আমি রাঁচির হাকিম হয়ে এসেছি আমার সঙ্গে যাবে না?"

গভীর আবেগে স্বামীর হাত চেপে ধরে কৃষ্ণা বলে উঠল—"যাবার ত খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু—!" তার চোখের কোল জলে ভরে উঠল। সে ধীরে ধীরে মুখখানি ঘুরিয়ে নিল।

কোমল হস্তে তার মুখখানি আকর্ষণ করে সুকুমার বলে উঠল—"কিন্তু কি কৃষ্ণা?"

—"আমি যে বড্ড কালো!"

—"উঃ, কৃষ্ণা, এমনি করেই আমায় আঘাত করতে হয়! তুমি কালো বলে' জগতে একথাটি জানাতে কি কেউ আর বাকী থাকবে না?

না, না, তুমি কালো নও, আজ আমার চোখে তুমি পরম সুন্দর! কালো না হ'লে বোধ করি তুমি এত সুন্দর হ'তে পারতে না! তুমি আমায় ক্ষমা কর কৃষ্ণা! আমার যা' কিছু সমস্ত তোমার চিকিৎসায় আমি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত! বলো. তুমি আমায় ক্ষমা করেছ!—"

শীর্ণ দু'টী আঙুল স্বামীর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে' কৃষ্ণা বলে' উঠল—"ছি, ও কথা বলতে আছে? তুমি যে আমার দেবতা!"

সুকুমারের চোখ আজ কোন বাধাই মানতে চায় না। কাচ ভ্রমে কি রত্নকেই না সে অবহেলা করেছে! দরবিগলিতধারে সে বলল—

"কৃষ্ণা, তা' হ'লে বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

—"হাঁ গো হাঁ, নিশ্চয়ই যাব" বলতে বলতে সে অকস্মাৎ উঠে বসে' স্বামীর পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করল। হঠাৎ একটা দমকা কাসি এসে তাকে আচ্ছন্ন করে' ফেলল। নীড়চ্যুত পাখীর মত সে সশব্দে সুকুমারের কোলের ওপর পড়ে গেল।

দুর্ব্বল শরীরে ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণবায়ু অসীমের পথে মিলিয়ে গেল। সুকুমার চীৎকার করে কেঁদে উঠল—"কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!"

বিস্ময়

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
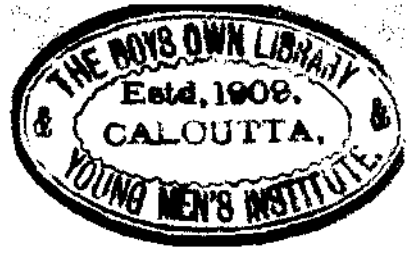
একদিন যে এমন একটা কথা উঠিয়া পড়িবে তাহা কেহই ভাবিতে পারে নাই।

সন্তোষের বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। কিন্তু যাহাকে লইয়া গণ্ডগোল সুরু হইল, সে-ই সন্তোষকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, এ আমি জানতাম। কোনদিন আমি গোপন করতেও তাই চেষ্টা করি নি। বুঝেচ' ঠাকুরপো?

সন্তোষের কাছে ব্যাপারটা তখনও বোধগম্য হইতেছিল না। বিস্ময় সকল দিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

বীণা বলিল, তুমি কিছু ভেব' না। এমন হয়েই থাকে এবং মানবজাতির আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত হবেই।

সন্তোষ এতটা সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপার আর সকলের চেয়ে যে ভাল করিয়াই জানিত, সেও যে এমন করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে পারে তাহা তাহার ধারণার অতীত। সে সকলের বিদ্রূপ অকাতরে সহ্য করিতে পারিত একমাত্র বীণার সান্ত্বনায়; কারণ, এ ব্যাপারের সত্যাসত্য সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানে। সে দিক্ হইতে ব্যাপারটা যখন হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয় দেখিল, তখন সন্তোষ আর কোনরূপ ভরসাই মনে স্থান দিতে পারিল না।

বীণা সন্তোষের মুখের ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া বলিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, কথাটা কি সত্যি না? লোকে কি কিছু অন্যায় বলে?

সন্তোষ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, সত্যি?

বীণা মৃদু হাসিয়া বলিল, হুঁ, সত্যি বই কি ঠাকুরপো!

গ্রামের যুবকদের অশ্রান্ত উদ্যমের আর সীমা ছিল না। প্রতি বৎসর পূজা উপলক্ষে চৌধুরী-বাড়ীতে থিয়েটার হইয়া থাকে। এ বৎসরও সটেজ বাঁধিয়া গ্রামের ছেলেরা তাহার আয়োজন আড়ম্বরে একটু অতিমাত্রায় মাতিয়া উঠিয়াছিল একমাস ধরিয়া 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অক্লান্ত মহলা চলিতেছিল। পথে ঘাটে কেবল তাহারই আলাপ-আলোচনা—অন্য কোন কথা নাই। এমন সময় একদিন সহসা দারুণ দুঃসংবাদ—সন্তোষ, ওরফে 'চাণক্য' কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। চাণক্যের এই অকারণ সরিয়া পড়ায় মর্ম্মাহত ম্যানেজার শৈলেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অভিনয়ের সর্ব্ববিধ সাফল্য যে, একমাত্র সন্তোষের উপরেই নির্ভর করিতেছিল তাহা সকলেই জানিত।

'মোশোন্' মাষ্টার কমল বলিল, তবে আর কি 'শৈলেশ-দা', এখন সটেজ গুটিয়ে ফেললেই তো হয়।

শৈলেশ অতিকষ্টে আপনাকে সংযত রাখিয়া বলিল, এখন লোকের কাছে মুখ দেখাব' কেমন ক'রে?

পাশাপাশি দুই গ্রামের যুবকদের মধ্যে থিয়েটার ব্যাপারে বেশ একটু রেষারেষির ভাব বিদ্যমান ছিল। এ গ্রামে যখন 'চন্দ্রগুপ্ত'র মহলা চলিতেছিল, তখন পাশের গ্রামে 'প্রফুল্ল'

রিহার্সেল পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। এ অবস্থায় সন্তোষের অকারণে এবং কাহাকেও না জানাইয়া চলিয়া যাওয়াটা ম্যানেজারকে নিতান্ত নির্মমভাবে আঘাত করিল। লোকের কাছে মুখ দেখানো বলিতে সে পাশের গ্রামের ছেলেদেরই লক্ষ্য করিয়াছিল।

কমল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, বিদ্গাঁ খুব জোর্‌সে ছুয়ো দেবে এবার।

শৈলেশের কানে কমলের অতি দুঃখের কথা একটা তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল। শৈলেশ সন্তোষের উপর দারুণ আক্রোশে হাতের বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এতবড় দুঃখও কেহ পায় নাই, এতদিনের সকল পরিশ্রমকে এতবড় পণ্ডশ্রমও কেহ ভাবে নাই। শৈলেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার অনুভব করিল। মধ্যগগনে সূর্য্য তখন বিরাজ করিতেছিল। অনাহারে অনিদ্রায় শৈলেশ যে কতখানি পরিশ্রম এ কয়দিনে করিয়াছে, তাহা এইমাত্র সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। এত দুর্ব্বল সে তো কোনদিনই ছিল না।

সন্দেহের বাষ্প ভাল করিয়াই জমাট বাঁধিল। গ্রামের কল্পিত আশঙ্কাকে সন্তোষ আশঙ্কা করিয়াই আরও তাহাদের বিশ্বাস প্রগাঢ় করিয়া তুলিল। যে শৈলেশ সন্তোষকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, সেও গুজবটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না।

গাঁয়ের পোষ্টাফিসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেদের মধ্যে এই সব আলোচনাই চলিতেছিল।

কে একজন শৈলেশকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিহে শৈলেশ, রিহার্সেল্ চলচে কেমন?

ব্যাপারটা এতক্ষণে জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে, সন্তোষের অবর্ত্তমানে 'চন্দ্রগুপ্ত' কখনই অভিনীত হইতে পারে না।

শৈলেশ খোঁচা খাইয়াও নীরব হইয়া রহিল।

পোষ্টমাষ্টার শশীশেখর বলিল, শৈলেশবাবু, আপনার নামে একখানা টেলিগ্রাম আছে।

কই দেখি?—বলিয়া শৈলেশ জানালার মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া সই করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। শৈলেশের নামে ইতিপূর্ব্বে বহু টেলিগ্রামই আসিয়াছে, এমন কি, আই-এ পাশের খবরও একদিন আসিয়াছিল, কিন্তু এতখানি আনন্দ বহন করিয়া কোন টেলিগ্রামই এ পর্য্যন্ত তাহার কাছে আসে নাই।

কিসের টেলিগ্রাম তাহা জানিবার জন্য কমল ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেই শৈলেশ তাহার একটা হাত ধরিয়া একটা টান মারিয়া বলিল, চল্।

পরক্ষণেই ইতিপূর্ব্বে যে শৈলেশকে আঘাত করিবার জন্য বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাওয়ার মুখে বলিয়া গেল, রিহার্সেল? চলচে ভালই।

তা'হলেই ভাল।—বলিয়া সে একটু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাটি একটা হঠাৎ উৎসারিত হাসির ধাক্কা খাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল।

শৈলেশ তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কমলের হাত ধরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বাধাপ্রাপ্ত উদ্যম উৎসাহ আবার দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সন্তোষ লিখিয়াছে, তোমরা রিহার্সেল বন্ধ করো না। অভিনয় রাত্রে আমি উপস্থিত থাকবই।

শৈলেশ ভাল করিয়াই জানে, সন্তোষের রিহার্সেলের প্রয়োজন নাই।

অভিনয়ান্তে সেদিন লুচি-মাংস লইয়া যখন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, তখন সন্তোষ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনমনে বাড়ী চলিয়া গেল। মুখের পাউডার ধুইয়া ফেলা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা তাহার মাথাতেই আসিল না। মনে পড়িল, তাহার কলিকাতায় যাওয়াটা কতখানি বিসদৃশ হইয়াছিল। আর তাহারই জন্ত যে জবাবদিহি করিতে হ'বে, তাহাও বড় সহজ ব্যাপার নয়।

মা'র কাছে সন্তোষ মিথ্যা জবাবদিহি করিতে পারিবে না ঠিক এবং সত্যই বা সে কেমন করিয়া বলিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইতে ছিল না।

তারপরে বীণা·········

সে যদি সত্যই কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বসে··· সন্তোষ আকাশের পানে শূন্যদৃষ্টি তুলিয়া ভাবিল, এই অবস্থাতেই আবার কলিকাতা ফিরিয়া যায়।

এমন অনেক কিছু অবান্তর কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন সে তাহাদের পুকুরের ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পূর্ব্বাকাশে আসন্ন উষা আব দারের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে।

একটা চাপা হাসির ধাক্কায় সন্তোষ চম্‌কাইয়া উঠিল। বীণা একপাঁজা বাসন লইয়া ঘাটে চলিয়াছিল, সন্তোষের মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতে সে কোনমতেই আর হাসি চাপিতে পারিল না। বীণা অতিকষ্টে হাসি থামাইয়া কহিল, ওমুখ আর কাউকে দেখিও না ঠাকুরপো, সবাই হাসবে।

বীণা আবার হাসিতে লাগিল।

সত্যই এ মুখ সে কেমন করিয়া দেখাইবে? একথা ইতিপূর্ব্বে সে বহুবারই ভাবিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোন উত্তর সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই। বীণার মুখ হইতে কথাটা বাহির হইয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া ঘা মারিল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বীণা তাহার সে স্তম্ভিতভাব লক্ষ্য করিয়া খিল্‌খিল্‌ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বলচি কি, মুখের পাউডার ধুয়ে ফেলে তারপর বাড়ী ঢুকো, নইলে যে দেখবে, সেই হাসবে। এমন বুদ্ধিমান যে আবার চাণক্য সেজে বাহবা পায়—এইটাই আশ্চর্য্য!

অপ্রতিভ সন্তোষ চলিয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়াইতেই বীণা বলিল, সত্যি, মুখটা ধুয়ে যাও ঠাকুরপো। ভারী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

তা' দেখাক্‌ গে!—বলিয়া সন্তোষ বীণার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

পুকুরের অপর পাড়ের লাউগাছ হইতে লাউ চুরি গেল কি না দেখিতে আসিয়া চিনুর মা এ পাড়ের পানেই দুই চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া জলের কাছে আসিয়া চোখে-মুখে খুব ঘটা করিয়াই জল ছিটাইতে লাগিল। বীণা সেদিকে চাহিতেই চিনুর মা মনে মনে হাসিয়া লইয়া বলিল, কে, বৌমা বুঝি?

বীণা সলজ্জভাবে কহিল, হুঁ।

চিনুর মা কাপড়ের আঁচলে হাত-মুখ মুছিয়া লইয়া বলিল, ভোর না হ'তেই বাসনের পাঁজা বয়ে যে ঘাটে এয়েচ বৌমা?

বীণা মুহূর্ত্তে তাহার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিয়া লইল। চিনুর মা একটা ঢোক গিলিয়াই আবার বলিল, ও গেল কে, সন্তোষ না? কখন এলো ও বৌমা?

বীণা এই চিনুর মা'র উপর কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিল না। আজ যেন তাহার ঘৃণা শতগুণে বাড়িয়া গেল। পাঁজা করা বাসনের পানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিয়া ফেলিল, হুঁ,

কানাই এসেছে কল্‌কাতা থেকে। জিগ্যেস্ করতে বললে, চিনুর খোঁজ ত কই পাওয়া গেল না।

চিনুর মা'র এই দুর্ব্বল স্থানটি, স্পষ্টতঃ আঘাত করিবার মত সাহস গ্রামের আর কাহারও আছে কি না খুবই সন্দেহজনক। বীণার মধ্যে যে আছে, তাহা সেও এই প্রথম বুঝিল।

চিনুর মা ঘা খাইয়াও দমিল না। চীৎকার করিয়া কহিল, আমার যেমন কপাল পুড়েছে, এমন যেন সবাইকার পোড়ে।

বীণা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে হাসিয়া ফেলিল। চিনুর মা'র শত কথায়ও আর সে উত্তর করিল না। বীণা বুঝিয়াছিল, ঐ একটি ঘা সামলাইতেই তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে।...আর আঘাত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তিন-তিনবার ষোড়শোপচারে রক্ষাকালীর কাছে পূজা দিয়া এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী প্রদত্ত কবচে ধ্রুবেশের অঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়া তবে তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। এই রুগ্ন ছেলেটির প্রতি জগত্তারিণীর স্নেহের আর সীমা ছিল না। বড় ছেলে নিখিলেশ নীরোগ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিল —এ কথা বলা চলে না। তবে সে স্নেহের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা ছিল—তাহার বেশীও নয়, কমও নয়।

ধ্রুবেশ যৌবনে আপনাকে দৈহিক পরিপুষ্টতায় আর সকলের তুলনায় এত হীন বলিয়া বোধ করিল যে, শারীরিক উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত না হইয়া সে থাকিতে পারিল না। রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিল।...দুই বৎসরে দেহের এমন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। বন্ধুবান্ধব সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, ধ্রুবেশের সাধনা সার্থক হইয়াছে।

মা'র চোখে ধ্রুবেশ কিন্তু সেই গতদিনের দুর্ব্বল শিশু ধ্রুবেশই রহিয়া গেল। কাজেই একদিন যে স্নেহ ও করুণা ধ্রুবেশ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা হইতে কোনদিনই সে বঞ্চিত হয় নাই।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগত্তারিণী সংসার হইতে অনেকটা সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তারপরে ধ্রুবেশ যেদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সেদিন জগত্তারিণীর দেহ-মন একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল।

বীণা শোক পাইল, কিন্তু শোকের টাল সামলাইয়া উঠিতেও তাহার সময়ের প্রয়োজন হইল না। এ কথা সে বুঝিয়াছিল যে, তাহার স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া গেলেও সন্ন্যাস কখনই গ্রহণ করিবে না। বীণা ধ্রুবেশকে ভাল করিয়াই চিনিত।

গ্রামের লোক অন্তরকম ভাবিল—সন্ন্যাসী না হইলে সবার অজ্ঞাতে গৃহত্যাগের প্রয়োজন ছিল কি?

মাস চার কাটিতে-না-কাটিতেই বীণার ধারণা নির্ভুল প্রমাণ করিয়া দিয়া ধ্রুবেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল—জীর্ণ ম্লান ধূলিধূসরিত পর্য্যটকের বেশে।

কিছুদিন গৃহে কাটাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারেই আবার সে পর্য্যটনে বাহির হইল।

বীণা আপত্তি করে নাই। জগত্তারিণী আপত্তি জানাইয়া ব্যর্থ হইলেন।

বড় ছেলে নিখিলেশ এখন মা'কে ধরিয়া পড়িল, দেশের বাড়ী ছেড়ে তুমি আমার কল্‌কাতার বাসায় থাকবে চল।

জগত্তারিণী কিছুতেই রাজী হইলেন না।

নিখিলেশ জানাইল, তবে তীর্থ ভ্রমণ করে' এসো, আমি তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে' দিচ্ছি।

জগত্তারিণী জানাইলেন, স্বামীর ভিটেই আমার কাশী-প্রয়াগ-গয়া, এ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। মরি ত এখানেই মরব।

নিখিলেশ অগত্যা তেমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই কলিকাতা চলিয়া গেল। নিখিলেশের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সে আর বিবাহ করিতে কিছুতেই রাজী হয় নাই। জগত্তারিণী অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেই, নিখিলেশ ভ্রাতৃবধূ বীণার উপর মা'র তত্ত্বতল্লাসের সমস্ত রকম ভার চাপাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

জগত্তারিণীর এতদিন সংসারের সঙ্গে যে সামান্য একটু যোগসূত্র ছিল, তাহাও ছিন্ন হইয়া গেল। জপের মালাটিই হইল তাহার অষ্ট-প্রহরের সঙ্গী। বীণার প্রতি তিনি তাঁহার অন্ধ স্নেহ অগাধ বিশ্বাস জন্মাইয়া তুলিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কেহ হইলে নিজের অদৃষ্টকে না দুষিয়া বীণাকেই হয় ত দুষিত। এ দিক দিয়া নিজের প্রশংসা না করিয়া পারিত না।

ঠাকুরপো!

সন্তোষ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বীণা দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বীণা দরজার আর একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, বুঝেছ ঠাকুরপো, আজ এবেলা তুমি আমাদের ওখানে খাবে কিন্তু; মা বাবার তিথি উপলক্ষে আমাকে দিয়ে তোমায় নেমন্তন্ন করে' পাঠালেন। যেও কিন্তু।

সন্তোষ সহসা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল, মা'র কাছে বলে' গেলেই ত হ'ত। তা' হ'ত। আর মা যদি এসে নিজে বলে যেতেন ত আরও ভাল হ'ত, না?—বলিয়া বীণা হাসিয়া ফেলিল।

সন্তোষ মুখ ফিরাইয়া বীণার সহাস্য মুখ দেখিতে সাহসী হইল না। উত্তর দিতেও কেমন তাহার বাধিয়া গেল।

বীণা বলিল, কি, চুপ করে' রইলে যে?

সন্তোষ তবুও উত্তর করিল না।

বীণা তখন ঈষৎ রাগত কণ্ঠে কহিল, অপরাধ না করে' অপরাধী সেজে বসে' থাকা বিশ্রীও, পাপও।

সন্তোষ চাবুক খাইয়া ফিরিল। বীণার মুখের হাসি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। উত্তর দিতে গিয়া সন্তোষের আবার কেমন বাধিয়া গেল। অল্পপরেই একটা নিশ্বাস টানিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি', আমি যাব 'খন। তুমি এখন যেতে পার।

তাহার মুখনিঃসৃত বাক্য তাহার নিজ কাণেই ভারী বিশ্রী শুনাইল।

বীণা কোন অবস্থাতেই প্রায় অপ্রতিভ হইতে জানে না। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠেই সে বলিল, আমি গেলে যে তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচ, তা' বুঝি। কিন্তু একটা কথা না বলে' যে, আমি যেতে পারচি না।

বেশ, বল।

বীণা মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, তোমার দাদাটি না কি —মাসিক-পত্রে ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে সুরু করেচেন; আশ্বিন মাস থেকেই তা' বেরুচ্ছে। স্থূল বোধ করি ঐ মাসিক-পত্রটা রাখা হয়। যদি একটু চেষ্টা করে' ওটা আমাকে এনে পড়াও।

আচ্ছা, সে দেখব বলিয়া সন্তোষ অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসে আবার মন দিল।

বীণা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য

পা বাড়াইতেই দেখিল, উঠানে চিনুর মা সন্তোষের মা'র কাছে নালিশ লইয়া উপস্থিত। বীণা সলজ্জভাবে ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

চিনুর মা হাঁফ লইয়া বলিতেছিল,...তা' যাই কেন না বল দিদি, অমন দজ্জাল বউ গাঁয়ে এই পেরথম। নিখিলেশের বউকেও ত দেখেচি, আহা, সে যেন মাটির মানুষ! সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী কি না, তাই শাঁখা সিঁদুর বজায় রেখে গেল। কত পুণ্যিই না সঞ্চয় করেছিল, নিখিলেশ আর বিয়েটি পর্যান্ত করলে না। একেই বলে সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী। তুমি কি বল দিদি?

সন্তোষের মা কাত্যায়নী দেবী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, কলিতে অমন হয় না, অমন হয় না!

বীণা চিনুর মা'র সহসা ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ঘোমটার আড়ালে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চিনুর মা কোমরের প্রায় শিথিল হইয়া আসা কাপড় আবার ভাল করিয়া আঁটিয়া লইয়া কহিল, তা' যাই বল দিদি, রূপসীমাত্রেই তা'ন্, আর তাদের নিজেদের গর্ব্বেই তারা গেল!

কাত্যায়নী দেবী অত্যন্ত সরলমনেই উত্তর করিলেন, তা' যা' বলেচ দিদি, রূপের বালাই অনেক। চিনুর আমাদের রূপের খ্যাতি ছিল বলেই ত—

চিনুর মা কিন্তু আবেগে বাধা দিয়া কহিল, অমন কেষ্টো ঘরে ঘরে দিদি, ঘরে ঘরে। গরীব-গুরবোরটা খাট হয়ে যায়, আর বড় ঘরের সব চাপাচুপি থাকে। সে কি আজও কারও জানতে বাকী আছে না কি? গাঁয়ের সব মেয়ে-বউকেই ত চিনি দিদি, জানতে আর কিছু বাকী নেই।

বীণা জানিত, কাত্যায়নী দেবী কাহারও কোন ভাল-মন্দে নাই। চিনুর মা'কে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি যে চিনুর কথা তোলেন নাই, তাহা বীণা সহজেই বুঝিল। কিন্তু চিনুর মা যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া সে খুসি না হইয়া পারিল না।

কাত্যায়নী দেবীর এ সব বাক্যালাপ মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, কাজেই তিনি অন্য কথা তুলিলেন। কহিলেন, ও সব যেতে দাও দিদি, যেতে দাও। মানুষের মন ত! তা' আজ কি রান্নাবান্না হবে ঠিক করেচ?

চিনুর মা এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মোটেই খুসি হইতে পারিল না। পরছিদ্রান্বেষী চিনুর মা যে সরস আলাপ তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার পরে এমন নিষ্প্রাণ নীরস প্রশ্নে যে কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিই যে ক্ষুণ্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

চিনুর মা তাড়াতাড়ি কাত্যায়নী দেবীর প্রশ্ন এড়াইয়া বলিয়া চলিল, দিদি, কথায় বলে, মন না মতি। কখন কি হয়, কিছুই ত বলা যায় না। আমার কপাল পুড়েছে বলেই না পরকে আমি সাবধান করতে ছুটে আসি। আর আমার গেলেও যা', তোমার গেলেও তা'—তাই নয় কি, দিদি? কাজেই আগে থেকে সাবধান করে' দেওয়াই ভাল।

সন্তোষ বইয়ে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহার মন ও কাণ উভয়ই উঠানের দিকে পড়িয়া ছিল। চিনুর মা'র প্রত্যেকটি কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাহার হৃদয়কে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতেছিল। সন্তোষ মুখে শান্তভাব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বীণা কিন্তু সহজেই সন্তোষের চাঞ্চল্য বুঝিয়া লইয়া

তাহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত থাকিতে বলিল। কিন্তু সন্তোষ তাহার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়াই বাহিরে গিয়া কম্পিত কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল, মাসীমা, বাড়ী বয়ে এসে সদুপদেশ আর দান করতে হবে না! মা'র যদি বুদ্ধির অভাব কিছু ঘটে ত আপনার ওখানে গিয়েই আনতে পারবে।

বী।। সন্তোষের চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিয়াই দরজার আর একটু আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়া- চিন্নুর মা'র ভাব বিপর্য্যয় দেখিবার সাধ থাকিলেও উপায় ছিল না।

কাত্যায়নী দেবী বিশেষ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বাবা সন্ত, তুই কেন আবার এর মধ্যে এলি ?

চিন্নুর মা তাড়িত কুকুরের মত ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

সন্তোষ চিন্নুর মা'র পলায়নতৎপর গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া কহিল, এমন না হ'লে এদের বিদেয় করাও যায় না। দেখলে ত কেমন সরে' গেল ?

কাত্যায়নী দেবী বলিলেন, হাজার হ'লেও তোর পূজনীয়া যে সন্ত।

তা' আমি জানি।--বলিয়া সন্তোষ ঘরে ফিরিয়া আসিতেছিল। কাত্যায়নী দেবী পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ছোট বৌমা এসেছিল, সে কি চলে' গেল না কি ? তোর আজ ও বাড়ীতে নেমন্তন্ন বুঝলি ?

বীণা কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া আপনার উপস্থিতি জানাইয়া দিল।

কাত্যায়নী দেবী বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও বৌমা। সন্ত যাবে 'খন।

সন্তোষকে আহারে বসাইয়া একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াই নিজের সলজ্জভাবটুকু কাটাইয়া উঠিবার জন্য বীণা বাধ্য হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। সন্তোষও আরক্তমুখে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বীণা যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও সন্তোষ হাত তুলিয়া অন্যমনার মত বসিয়াছিল।

বীণা পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কই, হাত চলছে না যে ?

সন্তোষ থালার উপর হাত রাখিয়া বলিল, আর খেতে পারব না।

তা' বললে শুনব কেন ? তুমি কতদূর খেতে পার, না পার, তা' কি আজও অজানা আছে, মনে কর ? ও ক'টি ভাত তোমাকে খেয়ে উঠতেই হবে।—বলিয়া বীণা নিজমনে একটু হাসিল।

সন্তোষ সে হাসি লক্ষ্য না করিয়া আবার আহারে মন দিল। বীণা সন্তোষের আনত মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই বীণার এই সলজ্জ নীরবতা নিজেকেই বিঁধিতে লাগিল। বীণা অকারণে আঁচলের চাবির গোছাটা নাড়িয়া একটা আওয়াজ তুলিয়া কথা পাড়িল, আচ্ছা ঠাকুরপো, চিন্নুর মা'র মুখের বড় ধার, না ?

সন্তোষ বিরক্তভাবে উত্তর করিল, অত জানি নে।

জান না কি রকম ঠাকুরপো ? তা' নইলে অমন করে' সকালবেলা তাকে কুকুরের মত তাড়ালে কেন ? বলিয়া বীণা চাবি দিয়া মেঝের আঁক কাটিতে লাগিল।

সন্তোষ মুখ তুলিয়া কহিল, সে তোমারই মঙ্গলের জন্যে বৌদি'।

বীণা নির্লিপ্তের মত বলিল, আমার মঙ্গল-অমঙ্গলে তোমার কি আসে যায় ঠাকুরপো ?

সন্তোষ আহতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, এমনিই যাঁ'কে ভালবাসি ও ভক্তি করি বলেই তোমার

সুনাম-দুর্নামে আমার আসে যায়। নইলে আবার কি—

বীণা সন্তোষের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাসিতে লাগিল। সন্তোষ সে হাসির কোন অর্থ বুঝিল না সত্য, কিন্তু নিজেকে সে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিতে লাগিল। এমন সময় জগত্তারিণী দেবী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্তোষ আহার শেষ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, জগত্তারিণী দেবী 'হেই হেই' করিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, বৌমা, আমি চোখের সামনে না থাকলে তুমি বুঝি একটা কাজও কর্‌তে পার না?

বীণা ইতিমধ্যে যে কি এমন ভুল করিয়া বসিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া জগত্তারিণীর পানে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জগত্তারিণী বলিলেন, যে দইটুকু পেতে রেখেছিলাম, সেটুকু কি তেম্‌নি পাতাই পড়ে' থাকবে না কি? বামুনকে তবে বলা কিসের জন্যে আমার।

জগত্তারিণীর মুখে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনদিন কোন কটু কথা শোনে নাই। কথাগুলির রূপ যেমনই হউক না কেন, তাহার রূঢ়তা ও কটুতা তাহার স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া যাইত। বীণা এ মধুর শাসনে চিরদিনই খুসি হইত, আজিও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও মা, সে যে আমি ভুলেই গেছি! ঠাকুরপো, উঠো না ভাই, একটু বসো লক্ষীটি! আমি দইটা ওঘর থেকে নিয়ে আসি।

বলিয়া বীণা উঠিয়া গেল। জগত্তারিণীর শান্ত প্রফুল্ল আননে সহসা একটা ব্যথার ছায়া ঘনাইয়া আসিল; তিনি বলিলেন, যে লোক তোকে বসিয়ে খাওয়াছে সন্তু……চেয়েচিন্তে না নিলে নিজেই ঠকে' যাবি। মা'র আমার মন তো বিশেষ ভাল না। আর এমন হ'লে ভাল থাকেই বা কেমন করে'?

জগত্তারিণীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল, জেঠাইমা তোমার কোন ভাবনা নেই। যা' আমার লাগে, তা' ত আমি চেয়ে-চিন্তেই খেয়ে থাকি।

হু' বাবা, তাই করিস্—বলিয়া জগত্তারিণী ঘরে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন। সন্তোষ অবশিষ্ট ভাত দই দিয়া মাখিয়া লইতে জগত্তারিণী মালা জপিতে জপিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

বীণা তখন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আজকাল এমন সব বিশ্রী বিশ্রী ভুল করে' বসি……

সন্তোষ নীরবে নিতান্ত নিমন্ত্রিতের মতই আহার শেষ করিল।

সহসা সন্তোষ আরক্তিমমুখে ছুটিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌদি', তুমি এমন করে' আমার শত্রুতা সাধতে আরম্ভ করলে কেন বলত?—উত্তেজনায় সন্তোষের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল।

বীণা নিবদ্ধদৃষ্টি মাসিক-পত্র হইতে তুলিয়া সন্তোষের বেশের পানে চাহিয়াই অবাক্ হইয়া গেল। সন্তোষের কাপড় মালকোচা করিয়া পরা, কোমরে রঙীন গামছা ফের দিয়া বাঁধা—অঙ্গে আর কোন কিছুরই বৃথা আড়ম্বর নাই শুধু অঙ্গের পৈতাটা সুগৌর সমৃদ্ধ দেহের উপর নিতান্তই বিশ্রী বেমানান হইয়াছিল। অঙ্গে স্বেদবিন্দুগুলি মুক্তার মত ঝলিতেছিল।

বীণা বিব্রতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বলি, এ কি! এ বেশে যে হঠাৎ?

সন্তোষ ক্ষিপ্তআবেগে কহিল, সেই কথা

বলতেই ত এসেচি।—বলিয়া সহসা বীণার হাতের মাসিক-পত্রটায় ক্রবেশের ফটো দেখিয়া অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিল।

বীণা 'ঝপ' করিয়া মাসিক-পত্রটা বন্ধ করিয়া কহিল, কি বলতে এসেচ, বল।

সন্তোষ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, এ সব তোমার কি বৌদি'?··· সতীশ রায়ের ছেলের যে আজ পৈতে, তা' তুমি জান নিশ্চয়?

বীণা নীরব হইয়া রহিল।

সন্তোষ বলিয়া যাইতে লাগিল, নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করছিলাম, এমন সময় অতুল চক্কোর্ত্তি কথা তুললো যে, আমি পরিবেশন করলে তারা কেউ খাবে না। আমি কি করেছি বৌদি'? তুমি এমন করে' আমার সর্ব্বনাশ করলে কেন? তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা ও প্রাণময়তায় বীণা ভয় পাইয়া গেল। বীণা এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না, কাজেই ক্ষণিকের জন্য সেও নীরব হইয়া রহিল। পরক্ষণেই আপনার দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিল, তারা আপত্তি তুলতেই তুমি তৎখুণি থালা ফেলে চলে' এলে ত? না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অপমান নিজ কাণে শুন্‌লে?

সন্তোষ বীণার অবিচলিত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল! কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ-মন এই অন্যায় অত্যাচারে এতদূর ক্ষুব্ধ ও আহত হইয়াছিল যে, কোন কিছুরই উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

বীণা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, বেশ করেচ, চলে' এসে ভালই করেচ। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বোধ করি মুখে জল পড়ে নি?

সন্তোষ বলিল, এ গাঁয়ের বাইরে না গেলে আর পড়বেও না।

বীণা সন্তোষের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিল। মনে মনে কি একটা সংকল্প করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বীণা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায় দেখিয়া সন্তোষ ব্যস্তভাবে কহিল, দাঁড়াও বৌদি', তোমার সঙ্গে আরও একটা কথা আছে আমার।

আচ্ছা, সে পরে হবে। আমি এখুনি আসচি।—বলিয়া বীণা ক্ষিপ্রগতিতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সন্তোষ অগত্যা উচ্ছিষ্ট কাপড়ে দরজা ধরিয়া বীণার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।
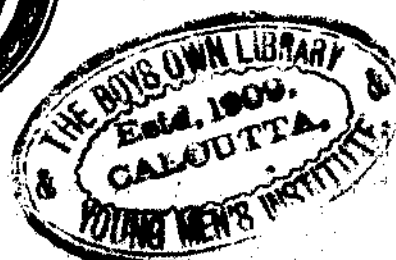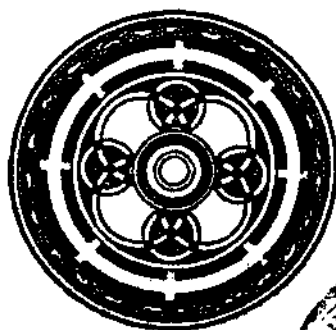
ক্রমশঃ

পরকীয়া

শ্রীমতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল্

রত্তনখালির রমেশ সান্যাল লেখক বলিয়া সাহিত্যে নাম করিয়াছে। আষাঢ়ের অম্বু-বাচীতে ঘন বর্ষণ চলিতেছিল, পত্নীর সহিত কলহ করিয়া রমেশ একলা বিষণ্ণচিত্তে মেঘের বপ্র-ক্রীড়া দেখিতেছিল। বন্ধু নীরেশ আসিয়া বলিল, "কি ভায়া, কি হচ্ছে? কিছু লিখছ না কি?"

রমেশ বলিল "না, লেখা ছেড়ে দেব মনে করছি, আর ভাল লাগে না।"

"অকাল বৈরাগ্য ত শুভচিহ্ন নয় দাদা! ব্যাপারটা কি? দাম্পত্য কলহ নয় ত।"

"না হে ভায়া, কাব্যের জগৎ আর সংসার ত এক নয়।"

নীরেশ সোৎসাহে বলিল, "তা' ত নয়ই, তা' না হ'লে কি আর মাসের পর মাস ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা লিখতে পারতে?"

"কেন?"

"কেন আবার কি? মাসের পর মাস মাসিকে যে সব প্রেমের গল্প লিখছ, তার কোনও ভিত্তি আছে কি?"

"তা' ত নয়ই। সত্যিকার নায়িকা জীবনে একটীকে চিনি, আর তাঁর প্রেম আছে, একথা কখনই মনে হয় না।"

"বাড়াবাড়ি করছ দাদা! গল্প লিখে লিখে তোমার মনটা তরল হয়ে গেছে, তাই প্রেমের স্থির ধীর প্রভাকে তুমি কিছুতেই চিনছ না।"

"আমার ত তা' মনে হয় না। বাংলাদেশের বিয়ের মধ্যে 'প্রেম' নামক কোন পদার্থ নেই, আর সংসারের প্রয়োজনে ওটা আদপেই ভাল নয়, তাই আমাদের সমাজে ওর কোনই স্থান নেই।"

নীরেশ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কি যে বলছ আমি বুঝতেই পারছি না, তুমি কি বলতে চাও আমাদের বিবাহিত জীবন প্রেমহীন?"

"আলবৎ বলব! 'ফ্রয়েড' পড়েছ? স্বপ্নে আমরা অপরিতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি পাই। মাসিকে যে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রেমের ন্যাকামি বেরুচ্ছে, লোকে তা' মন দিয়ে পড়ে কেন জান?"

"কেন?"

"কারণ, তাদের ঘরে ও জিনিষটা নেই, তবু এর প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা মনে রয়ে গেছে, তাই প্রেমের গল্প পেলে আমরা সব ভুলে যাই। তার হেতু আমাদের অপরিতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা খাদ্য খুঁজে পায়।"

আকাশে মেঘ কালো হইয়া আসে। নীরেশ চাকরকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলে, তাহার পর গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে ধীরে বলে, "তোর সঙ্গে তর্কে পারব না ভাই, কিন্তু সত্যিকার প্রেমের কাহিনী একটা শুনিস ত বলতে পারি।"

রমেশ এবার চাঙ্গা হইয়া বসিল এবং বন্ধুর প্রতি উৎসুক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি?"

"ফাঁকি নয়, এটা আমারই জীবনের কাহিনী। ভাল লাগলে তুমি এটা নিয়ে গল্প রচনা করতে পার।"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "তা' মন্দ হয় না এতদিন ত শূন্যে প্রাসাদ গড়েছি, এবার দেখি যদি

সত্যের ভিত্তি দিয়ে রসের রঙমহাল তৈয়ারী করতে পারি।"

নীরেশ বলিল,"বলছি, কিন্তু একটা অনুরোধ, তামাকটা যেন ফুরিয়ে না যায় সেটা দেখ, গড়গড়ার নল বন্ধ করলে আমারও কথার খেই হারিয়ে যাবে।

আমি তখন ঢাকায় পড়ি, ল-কলেজে ভর্ত্তি হয়ে একটা সস্তার মেসে বাসা নিয়ে থাকি। সেটা ছিল চাকুরিয়াদের মেস। দোতালায় আমাদের বাসা, একতালায় ছিল একটী পশ্চিমা হালুইকর। ছেলে পড়াইয়া ফিরিতে আমার প্রত্যহই দেরী হইত, তখন দোতালার কলে জল থাকিত না, কাজে প্রায়ই আমাকে নীচের তলায় স্নান করিতে হইত।

এইখানেই তাহার সহিত পরিচয় হইয়া গেল। প্রেমের পথে নয়, কলহে। সে বালতি করিয়া জল ধরিতেছিল, আমি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাই সে রাগে গরগর করিতে করিতে জল ফেলিয়া দিয়া গালাগালি দিতে লাগিল—

হিন্দী ভাষা কিছুই আমি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। কাজেই গালাগালির আসল রূপ আজ তোমায় বলিতে পারিব না। কিন্তু গালাগালির ফাঁকে মকরকেতন তাঁর ফুলশর বিঁধিয়াছিলেন।

তের-চোদ্দ বছরের মেয়ের কালো ভাসা ভাসা চোখ আমার মনে কোনও ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু মেয়েটি কি জানি কি চোখে আমায় দেখিয়া বসিল। তাহার পর আমার জন্ত সে জল ধরিয়া রাখিত। মাসে মাসে আমার কাপড় ধুইয়া দিত।

হঠাৎ মেয়েটির কি খেয়াল হইল, সে বাংলা শিখিবে। অতিশয় আগ্রহে সে বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিল! যখনই আমার দেখা পাইত বাংলা ভাষায় পাঠ শুনিয়া লইত।

মেয়েটির এই পাগলামি কাহারও চোখে খারাপ লাগে নাই, আমারও না।

গ্রীষ্মের বন্ধের পর ফিরিলে শুনিলাম লখিয়ার বিবাহ। মেয়েটির নাম লখিয়া। একদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিতেছি, লখিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া আমি অবাক্! ভাঙা ভাঙা বাংলায় লখিয়া লিখিয়াছে, সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু বাপ-মায়ের মুখ রাখিবার জন্ত সে বিয়ে করিবে, কিন্তু আমাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

মেয়েটির পাগলামি দেখিয়া আমি খানিক হাসিলাম। পরদিন কলতলায় তাহাকে একা পাইয়া সতীধর্ম্মের এক বক্তৃতা দিয়া দিলাম। লখিয়া কথা কহিল না। ছলছল চোখে চলিয়া গেল।

তাহার পর ধুমধামের মাঝে লখিয়ার বিবাহ হইয়া গেল। মাসখানেক পরে লখিয়া নববধূর প্রথম পরীক্ষা দিয়া পিতৃগৃহে ফিরিল। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রথমানুরাগের ব্রীড়ামাধুর্য্য দেখিলাম না।

লখিয়া কিন্তু আমাকে ভুলিতে পারিল না। সময়ে অসময়ে বাসায় ফিরিয়া পথে তাহার উজ্জ্বল চোখ দু'টী অন্ধকারে জ্বলিতেছে দেখিতে পাইতাম। এ কি মৃগতৃষ্ণিকা! মাঝে মাঝে তাকে চিঠি আসিত, সে আমায় ভালবাসে; আমি যেন তাহাকে না ভুলি।"

তাহার মোহ ভাঙিবার জন্ত আমি একদিন তাহাকে বলিলাম, "আমি বিবাহিত; আমার স্ত্রী আছে। তাহাতে লখিয়ার মনে ঈর্ষা জাগিল না। সে আমার স্ত্রীর ছবি চাহিয়া বসিল।

এমন করিয়া দিনে দিনে লখিয়া আমাকে জড়াইয়া একটা স্বপ্নরাজ্য গড়িতে বসিল। হয় ত মোহে, নয় ত কৌতুকে আমি এ জাল ছাড়াইতে

পারিলাম না। কিসের যেন আকর্ষণ মুগ্ধ পতঙ্গের মত আমাকে এই খেলায় মাতাইয়া রাখিল। তাহাকে কখনও ভালবাসিতে পারি নাই, পরদেশীয়া এই কালো মেয়েটির রূপের বহ্নিদাহেও আমি পুড়ি নাই, তথাপি কি যে আকর্ষণ আজিও বুঝিতে পারি নাই—

লখিয়ার বিবাহ আবার এক অজ পাড়াগাঁয়ে হইয়াছিল। নানা কৌশলে সে বরাবর আমার সঙ্গে পত্র বিনিময় করিত। সেবার পাটনায় বোনের বাড়ীতে তাহার এক চিঠি পাইলাম। অনেকদিন দেখা হয় নাই—তাই একবার সে আসিয়া তাহাকে দেখিতে বলিয়াছে।

কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতার প্রতি স্বাভাবিক যে আগ্রহ, তাহা আমাকে পাইয়া বসিল।

বোনের নিকট মিথ্যা অজুহাত দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আরায় নামিয়া সেখানে দশক্রোশ চলিয়া লখিয়ার বাড়ী। বিহারের মাঠ ভাঙ্গিয়া দশক্রোশ চলিয়া যখন গিরিধরিলালের বাড়ী পৌছিলাম, তখন গোধূলির আলো নামিয়াছে।

গাঁয়ের মাঝে তাদের বাড়ী সকলের চেয়ে বড়। বাড়ীর সম্মুখে এক বুড়া হিন্দুস্থানীর দেখা মিলিল। তাহাকে বলিলাম—আমি গম কিনিব, পাটনায় গমের বড় ব্যবসা করিব ঠিক করিয়াছি—গমের দর জানিতে আসিয়াছি।

বুড়া আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাত্রে সেবার কি ব্যবস্থা হইবে বলায় আমি বলিলাম, আমি নিজে রাঁধিয়া খাইব, পশ্চিমা রান্না আমার মুখে ভাল লাগিবে না। বুড়া যত্ন করিয়া বলিল যে, তাহা হইবে না, রান্না করিতে আমার তকলিফ হইবে; তাহার এক বহুয়া বাংলাদেশে ছিল, সে বাঙ্গালীর রুচিকর খাবার বানাইয়া দিবে।

কাজেই রাজী হইলাম। কূপের তলায় হাতমুখ ধুইতেছি, এমন সময় লখিয়া সন্ধ্যাদীপ দিতে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "রাতে দরজা খুলে রেখো।"

গিরিধরিলাল বুড়ার ছেলে, আর লখিয়ার ভাসুর। সে ব্যবসায়ের কথাবার্ত্তা কহিয়া কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল। তাহার কথায় আমার মন ছিল না, কিন্তু সায় দিয়া চলিতে হইতেছিল। অনেক রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

লখিয়া আসিবে বলিয়া বহুক্ষণ জাগিয়া রহিলাম, কিন্তু লখিয়া আসিল না। কাজেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি প্রদীপ হস্তে অভিসারিকা লখিয়া। সে প্রদীপ রাখিয়া আমার পাশে বসিল এবং নানা প্রশ্ন করিয়া চলিল। পিতামাতার কথা, ঢাকার বাসার কথা, আমার স্ত্রীর কথা বিনাইয়া বিনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিলাম। যৌবনলাবণ্য লখিয়াকে সেই অর্দ্ধরাত্রে পরম রমণীয় করিয়া তুলিল। আমার মধ্যে রাক্ষস জাগিয়া উঠিল—আমি নানা যুক্তি ও তর্কে মনকে থামাইতে চাহিলাম।

কিন্তু মন থামে না। স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া আমি লখিয়ার বরবপুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। লালসা আমাকে পাইয়া বসিল। আমি উন্মাদ ব্যাকুলতায় লখিয়াকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিলাম।

লখিয়া প্রথমে চকিত হইয়া উঠিল, পরে ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া আমার উন্মত্ত আলিঙ্গন হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "একি বাবু! আপনাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার ইজ্জত বেচি নি'।"

লজ্জায় ও ঘৃণায় আমি মাটীতে মিশিয়া গেলাম। লখিয়া উঠিয়া প্রদীপ হাতে করিয়া

লইল, পরে দূর হইতে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু, আপনাকে ভালবাসি, যতদিন বাঁচব ততদিন ভালবাসব, কিন্তু আর কখনও দেখা করবেন না, পুরুষ ভালবাসা কি তা' জানে না।"

লখিয়ার কথা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত দিল। সত্যই ত ভালবাসা পুরুষে জানে না। পুরুষের আছে রিরংসা, সর্ব্বাতিশায়ী ভোগ বাসনা। লোলুপ ক্ষুধার প্রবল তাড়নাকে সে মিথ্যা ভালবাসার নাম দেয়। নারীর আত্ম-নিবেদন সে কোথায় পাইবে!

গিরিধরিলালকে পুত্র লিখিব বলিয়া পরদিন বিদায় লইলাম। লখিয়ার সহিত আর দেখা হয় নাই, কিন্তু এখনও তার চিঠি প্রতি মাসে একখানি করিয়া পাই।

নীরেশের গল্প শেষ হইলে রমেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, "এটা ভায়া তোমার বানানো কথা।"

নীরেশ গড়গড়ায় টান দিয়া বলিল, "মোটেই নয়। সত্য কথা, তাই এতে আর্ট নেই। কিন্তু আমি অবাক্ হয়ে ভাবি এই মেয়েটীর ভালবাসার কথা—"

রমেশ খানিক মেঘের পানে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "এটা অবশ্য বাইরে থেকে দেখলে বড়রকম একটা আত্মত্যাগ মনে হবে, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এটা একটা 'সেক্স কমপ্লেক্স' বই কিছুই নয়।"

নীরেশ অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে ?"

"মানে বিশেষ কঠিন নয় ভায়া। এই মেয়েটীর মনে একটা সংঘাত চলেছে। তোমাকে পাওয়ার জন্য ওর মনে অদম্য লালসা আছে; অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর সঞ্চিত একটা ভাবধারা আছে, যাতে পড়ে মেয়েটী আপন পরিবেশ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারছে না—এইখানেই এর ট্রাজেডি!"

নীরেশ বলিল, "কিন্তু দাদা, আরও অনেক মেলামেশার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু লখিয়ায় মনে কখনও যে যৌনবোধ জেগেছে, তা' ত মনে হয় নি—তার ভালবাসাকে দিব্য ও স্বর্গীয় বললে হয় ত অত্যুক্তি হবে, কিন্তু এটা জোরগলায় বলতে পারি যে, সেটা লালসা নয়—"

রমেশ বলিল, "ব্যাপারটা বোঝা সহজ নয় ভাই। অবচেতন মনে মেয়েটীর লালসা ষোলকলায় পূর্ণ, কিন্তু চেতন মনের সংস্কার এই লালসাকে একেবারে দাবিয়ে রেখেছে—

"তা' হ'লে তুমি বলতে চাও যে, 'প্ল্যাটনিক লভ' বলে যে কথাটা এতদিন চলছে, সেটা গাঁজাখুরি—"

রমেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ভাই দরদ দিয়ে কথাটাকে তুমি খুব উঁচু করতে পার, কিন্তু আসলে এ সমস্ত 'সেক্স কমপ্লেক্স।' ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংস্কারের, লালসার সঙ্গে বুদ্ধির যে দ্বন্দ্ব তাই নিয়েই মানুষ এই সব মিথ্যার রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছে—কবিরা সংসারে যত মিথ্যা ছড়িয়েছে, এমন আর কেউ নয়। বিনিময়হীন ভালবাসা, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা, কামশূন্য প্রীতি এসব কথা সব ঝুটা।"

রমেশের পুত্র আসিয়া বলিল, "বাবা, মা ডাকছেন।"

রমেশের বক্তৃতায় বাধা পড়িল। কলহান্তরিতা পত্নীকে অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া রমেশ আমতাআমতা করিয়া বলিল—"বৃষ্টিটা এখন ধরেছে দেখছি—"

ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া নীরেশ দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, গয়ার পাপ এখন বিদায় নিচ্ছে। নিষ্কাম প্রেম যে ঝুটা তা' নয় বুঝলাম, কিন্তু সকাম প্রেম যে পূর্ণ সত্য, তার জন্য বোধ হয় আর বক্তৃতা শুনতে হবে না।"

রমেশ কথা কহিল না, শুধু হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লালকাকা

বজ্রাচার্য্য বিরচিত

বোম্বাই সহরে পার্শী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ডাক্তার কর্ণেল লালকাকা পেন্সনপ্রাপ্ত আই-এম-এস্ অফিসর। রাত দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' ড্রয়িংরুমে সোফায় হেলান দিয়ে মনের সুখে একখানি ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ছেন। ঘরটী অতি সুশোভন, মনের মত সাজান। পেণ্টীং, ছবি, আলো, পিয়ানো, অরগ্যান, গ্রামোফোন, রেডিও, কার্পেট, সোফা, পরদা, ফুলদান, ফুল, প্রভৃতি যা' কিছু যেখানে সাজে, সবই সেই ড্রয়িংরুমে স্থান পেয়েছে—দরে, সৌন্দর্য্যে, প্রত্যেক জিনিষটাই ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। সব চেয়ে সুন্দর আর আশ্চর্য্য ওই পনেরটী পুতুল যা'—তাঁর ড্রয়িংরুমে চিমনির ম্যাণ্টালপিসের ওপর সাজান রয়েচে।

পুতুলগুলি কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, বাঘ, ভল্লুক, সিংহ, গণ্ডার, হাতী, হরিণ নয়। নিছক মানুষ, এমনভাবে গড়া, রং ফলনের এমন কায়দা, নাকে-চোখে-মুখে এমন তুলির টান দেওয়া, দেখলে মনে হবে তোমায় যেন কি বলবে বলবে কচ্ছে, কিন্তু বলতে পাচ্ছে না। যে দেখতো সেই অবাক হয়ে যেতো। কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করে' জানা গেল যে, তিনি এই ভারতেরই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হ'তে এক-একটী করে' বহুদিনে ওই পনেরটী পুতুল সংগ্রহ করেচেন। পুতুলগুলি দেখলে মনে হয়, যেন সত্যিকারের মানুষকে টিপে টাপে ছোট্ট করতে গিয়ে তার প্রাণটী বেরিয়ে গেছে, তারপর বেচারী বাক্‌-শক্তিহীন ছোট্ট পুতুলটী হয়ে কর্ণেলের কৃপায় তাঁর আশ্রয় লাভ করেছে।

রাত বারটা, ঢং ঢং করে' ঘড়ি বেজে উঠলো। কর্ণেল বই বন্ধ করে' আলো নিবিয়ে শুতে চলে' গেলেন। সব অন্ধকার।

আজ একমাস হ'ল অতবড় বাংলোতে কর্ণেল একা আছেন। তার কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্র 'উটি'তে চেঞ্জে গেছেন। ড্রয়িংরুম, আর তাঁর শোবার ঘর, পাশাপাশি, যাতায়াতের দু' দুটো দরজা; সারারাত খোলা থাকে।

কর্ণেলের তন্দ্রা এসেছে, আর একটু হ'লেই গাঢ় ঘুমে অচেতন হন, এমন সময় অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে কে যেন ডাকলে—"কর্ণেল।"

কর্ণেল তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাল্‌লেন, প্রথমে বারাণ্ডা, পরে এ ঘর, ও ঘর, শেষে চাকর-বাকরদের ঘরে হাঁকাহাঁকি করে' সন্ধান নিলেন—কেউ তাঁকে ডাকে নি। বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন; মাথার বালিশের নীচে রাখলেন একটা রিভলভার আর একটা টর্চ্চ।

ঘণ্টাখানেক পরে অনেক সাধ্যসাধনায় আবার ঘুম আসে আসে এমন অবস্থাটী হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ফের শুনতে পেলেন, তাঁকে কে ডাকছে—

"কর্ণেল।"

ডাকটা বোধ হ'ল ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে আসছে। এক লাফে কর্ণেল ড্রয়িংরুমে পৌঁছুলেন, হাতে রিভলভার আর টর্চ্চের আলো।

নিঃশব্দ।

কর্ণেল সোফায় বসে' পড়লেন, টর্চ্চ নিবিয়ে দিলেন, ব্যাপারটা কিছুই বোধগম্য না হওয়াতে

যারপর নাই বিরক্ত হলেন। কয়েক মিনিট পরে পুনরায় ডাক শুনতে পেলেন—

"কর্ণেল!"

তৎক্ষণাৎ টর্চ জ্বলে উঠলো, কর্ণেলের দৃষ্টি পড়লো ম্যাণ্টল্‌পিসের ওপর। দেখলেন হুঁকোধরা বুড়ো পুতুলটির কেমন কেমন ভাব, এবার তাঁর বিস্ফারিত চোখের সামনেই বুড়ো আবার ডাকলে—

"কর্ণেল।"

কর্ণেলের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থরথর করে' কাঁপতে লাগল, রিভলভর টর্চ হাত থেকে পড়ে গেল, কর্ণেল মহাবিস্ময়ে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ!

"কর্ণেল, ভয় পেও না—কাছে এস।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ কর্ণেল বুড়ো পুতুলটির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"দেখ, বড় বিরক্ত হয়ে তোমায় ডেকে ফেলেছি — শুনচো?"

"হুঁ—"

কর্ণেলের ভীতকণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ।

"আমার দু'পাশে কারা রয়েছেন— দেখচো?"

"দেখছি।"

বিশেষ চেষ্টা করে' কর্ণেল তখন যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে' ফেলেচেন।

দেখাদেখি আর কি, কর্ণেল স্বয়ং পুতুলগুলি সাজিয়ে রেখেচেন। হুঁকোধারী বুড়োর ডাইনে এক হ্যাটকোটধারী যুবক ব্যারিষ্টার, বাঁয়ে সেমিজ-সাড়ীপরা নবযুগের নবীনা।

"দেখ বাবা, বুড়োদের আশেপাশে বুড়োই রাখতে হয়। কিন্তু বাবা, তোমার সখের খাতিরে আমার দু'পাশে যাদের বসিয়েছ, তাদের ঘোরাল আলাপের জ্বালায় অস্থির পঞ্চম। রোজ রোজ সারারাত তাদের আলাপের বিরাম নেই— শুধু কথা, আর কথা, কি যে ছাইপাশ কথা তা' না পারি বুঝতে, না চাই শুনতে। কাণ ঝালাপালা, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এখন রক্ষে কর বাবা, হয় ঐ দু'টাকে সরাও, না হয় আমাকে নড়ে বসাও।"

"কোথায় দেবো বলুন, ঐ জটাজুটধারী সাধুর পাশে যাবেন?"

"না বাবা, প্রেমালাপ তার চেয়ে ভাল। ওই বাজখাঁই গলার লেকচার শুনলে···"

"তবে ঐ ভিস্তির পাশে বসাব?"

"হাঁ বাবা, ঐ ভিস্তিই ভাল।"

বুড়োর স্থান হ'ল ঐ মশক-পৃষ্ঠ ভিস্তির ডাইনে।

সে রাত্তির কোনরকমে কাটল। ভালরকম ঘুম হ'ল না। অতি প্রত্যূষে উঠে কর্ণেল পুতুলগুলি ভাল করে' পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল প্রত্যেক পুতুলের পিঠে সরু সরু তিনটী লোহার তার বসান। তারের কাঠি তিনটি চুম্বকগুণসম্পন্ন, কেন না ছুঁচ প্রভৃতি ছোটখাট লোহার জিনিষ চট্ করে' টানতে লাগল।

ব্যাপারটা বোধ হয় এই—

পুতুলগুলি এককালে কোন যাদুকরের সম্পত্তি ছিল। সে যেখানে যেখানে ঘুরেছে, সেই সেইখানে ওইগুলি বেচতে বেচতে গেছে। কর্ণেলও হাতফেরতা কিনেচেন;—এই রকম করে' পুতুলগুলি এখন তাঁরই সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে। দৈবযোগে ওই পনেরটী পুতুল একই পদ্ধতিতে তৈয়ারী;—আর বোধ হয় সেই যাদুকরেরই হাতের গড়া। পিঠে চুম্বক থাকাতে পুতুলগুলি পরলোক হ'তে ভূত আকর্ষণ করে; ভূতের মিডিয়ম্ হয়ে কথা কয়, কিন্তু ওই পর্য্যন্ত; হাত-পা নাড়তে-চাড়তে পারে না, দেখতে পায় না, কিন্তু শুনতে পায়।

কর্ণেল একাগ্রমনে গবেষণা করে' এই

সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'লেন। কাকেও কিছু না বলে' পরদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন ; তাঁর দুই কাণে ভৌতিক শব্দ ধরবার রেডিওফোন।

স্তিমিত আলোকে কর্ণেল উদ্বেগ আকুল হ'য়ে সোফায় বসে' আছেন। রাত বারটা বাজল। অমনি শুনতে পেলেন স্ত্রীকণ্ঠে চীৎকার কচ্ছে—

"মিষ্টার সিং···একটা অসভ্য বর্ব্বর আমার পাশে এসেছে···অপমান কচ্ছে···"

বোঝবার সুবিধার জন্য পুতুলগুলি বাঁদিক্ হ'তে ডানদিকে কি রকম সাজান ছিল, তা' বলছি—

সম্পাদক সেপাই রাজপুত্তর চুলি মহাজন
১ ২ ৩ ৪ ৫
খাঁড়াধারীকামার প্রচারক জমিদার
৬ ৭ ৮
শাইলক ব্যারিষ্টার হুঁকোধারী বুড়ো নবীনা
৯ ১০ ১১ ১২
কৃষক সন্ন্যাসী ভিস্তি।
১৩ ১৪ ১৫

ভাল করে' না বললে বুঝতে পারবেন না— যে,— ঐ স্ত্রীকণ্ঠ পুতুলের পাশে বর্ব্বরটী কে? পূর্ব্বেই বলেছি যে, কর্ণেল হুঁকোধারী বুড়োকে ভিস্তির পাশে বসিয়ে দিলেন ; যে যায়গাটী খালি হ'ল, সেখানে যুবতীটিকে রাখলেন ; যুবতীর খালি যায়গাটীতে ওই সন্ন্যাসীকে বসালেন। কাজেই যুবতীর বাঁয়ে এল সন্ন্যাসী। অর্থাৎ ১১র যায়গায় ১২ ; ১২র যায়গায় ১৪ ; আর ১৪র যায়গায় ১১ এল।

নবীনার নালিশ শুনে ব্যারিষ্টার রেগে আগুন হয়ে উঠলো—

"তোমার আমার মাঝে বুড়ো ছিল না? বর্ব্বরটা কোথা হ'তে এল?"

"দুর্ব্বিনীত বুড়োকে নড়িয়ে দিয়েছেন মিঃ সিং। আমার বাঁপাশে ভালমানুষ এক কৃষক ছিল, এখন এসেছে একটা বুনো সন্ন্যাসী।"

"তোমার আমার মাঝে কেউ নেই?"

"না।"

"তবে মিস্ কপ্‌রিকা, আজ আমাদের শুভ দিন!"

"তা' বটে, যদি বাঁয়ে ঐ বর্ব্বরটা না থাকতো। কি যে জ্বালাতন কচ্ছে—"

"তাকে বলে' দাও···যদি না থামে···তার নামে কেস্ করবো···জব্দ করে' দেবো···হুঁ···"

এমন সময়ে একটা বিকট হুঙ্কার শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হ'ল—

"জয় দিগম্বর পিতা···দিগম্বরী মায়ীকি জয়!"

কামার বলে' উঠলো—

"জয় মা!"

মোষ আর পাঁঠা হাড়িকাঠে পড়লে যেমন চেঁচায়—তেমনি সব আর্ত্তনাদ হ'তে লাগল।

ঢুলির নিকট হ'তে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আসতে লাগল।

কতক্ষণ যে এই তাণ্ডব চলেছিল, তার ঠিক নেই। কর্ণেল দেখলেন যে, তিনি সোফায় শুয়ে আছেন ; রেডিওফোনে কোন শব্দ নেই ; ভোর হয়ে গেছে।

* * *

আবার আজ রাত বারটায় পুতুলের মজলিস সুরু হ'ল। কর্ণেল দিব্য শুনতে পেলেন, ভিস্তি মিহে[illegible]জে গান ধরেছে—"দরিয়ার মিঠা পানি ল্যায়া, বড় মজাদার—"

হুঁকোধারী বুড়ো যিনি সম্প্রতি ভিস্তি ভায়ার অতি নিকট প্রতিবেশী হয়েছেন, তিনি কিন্তু গান বরদাস্ত করতে পারলেন না ; —খক্ খক্ কাশি ও ওয়াক্ ওয়াক্ করতে লাগলেন।

সম্পাদক চীৎকার করে' বলে' উঠলো—

"এ কি অত্যাচার! ভদ্রসমাজে ভিস্তি এসে

গান ধরে ? তা' আবার যে সে গান নয়, গোপাল উড়ের বিদ্যেসুন্দর পালার গান।"

প্রচারক বললে—

"থাম, থাম—আজকার রাত আমার!—আমি বহুদিন পরে এসেছি শোনাতে—হে মুগ্ধ—সুপ্ত—মুমূর্ষু—মুমুক্ষু—কোথায় তোমরা ভেসে যাচ্ছ—ভীষণ প্লাবনের খরস্রোতে—আঁধার নিরাশ মলিন অজানার দেশে···"

সেপাই বললে—

"কোন্ চিল্লাতা হ্যায়—পাকড় লেঙ্গে···"

মাড়োয়ারী বল্লে—

"সিপাহি, খাড়া রহো, বহুত রূপেয়া হামারে পাশ হ্যায়···"

শাইলক বললে—

"ও আমার টাকা···ধার দিয়েছিলুম···এক পয়সাও ফেরৎ দেয় নি···না সুদ, না আসল···ধর, ধর···পালাচ্ছে···ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে···"

জমীদার বললে—

"না—না—না—ও আমার টাকা। ওই ও—রে ফাঁকি দিয়ে নিয়েচে···সত্যি কি মিথ্যে তা' ওই চাষাকে জিজ্ঞেস্ করো···"

চাষা বললে—

"ও টাকা কারও নয়···আমার! আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যথাসর্ব্বস্ব বেচে, ঐ জমীদারের খাজনা দিয়েছি···"

ঢুলি তখন যেন ঢাকে কাঠি দিল···বোল উঠলো—"তাই না কি···নয়তো হয়···হয়[illegible]···তা'—তা'—তা'—তাই···তাই···তাই না কি···তাই না কি···

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে গর্জ্জে উঠলো—

"জয় বাবা দিগম্বর—দিগম্বরী মায়ীকি জয়!"

অমনি মোষ, ভেড়া, ছাগল বিকট আর্ত্তনাদ করে' উঠ্লো—আর সঙ্গে সঙ্গে কাষার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—

"জয় মা!"

ব্যারিষ্টার ও তার প্রণয়িনী ভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলে' উঠলো—

"কর্ণেল, গেলুম, গেলুম···রক্ষে কর···"

সেপাই বললে—

"ভয় মৎ করো···ডরো মৎ···"

সম্পাদক, ভিস্তি আর কৃষক ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললে—

"গরীব আমরা...মারা পড়লুম..."

প্রচারক গলা ছেড়ে গান ধরলে—

"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃত বাণমসি বেদম্..."

তখনও ঢাক বাজছে—

"তাই না কি···তাই না কি···তা' তা' তা'···তাই না কি—তাই না কি···"

কর্ণেলের সংজ্ঞা লুপ্ত!

ক্রমাগত সাত রাত্রি কর্ণেল পুতুল মজলিসের ভৌতিক ব্যাপার উপলব্ধি করে' বিস্ময়ে অবাক্ হ'লেন। পুতুল এলোমেলো করে' সাজান, পাশাপাশির বদলে আগুপিছু করে' সাজান, দাঁড়ানর বদলে শোয়ান—কিন্তু কিছুতেই রাতে সেই ভৌতিক আওয়াজ বন্ধ হ'ল না।

আটদিনের দিন রাতে মিনিট পাঁচেক ধরে' ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ হচ্ছে শোনা গেল। কর্ণেল হুঁকোধারী বুড়োর কাছে গিয়ে জিগেস করলেন—

"মিঃ লর্ড, আপনি শুধু চুপচাপ আছেন, আর ওই কৃষক। আজকে কি এগনি ঝড় উঠবে?···শুধু তাণ্ডব, না প্রলয়?"

বুড়ো বললে—

"চুপ······আজ গুপ্ত-মন্ত্রণার দিন। কৃষক আর আমি ও দলে নেই।"

"কি হবে?"

"ভৌতিক জগত হ'তে এমন চীৎকার আসবে যে, তোমাকে বাংলো ছেড়ে পালাতে হবে।"

"কেন, আমি ত দল পাকাতে দিই নি; সবগুলোকে ত নেড়েচেড়ে দিয়েছি।"

"কর্ণেল, ঐখানেই ত ভুল—ভূতের কি নড়াচড়ায় বিঘ্ন ঘটে?"

"তবে উপায়?"

"এক কাজ করতে পার? পিঠের ঐ তিনতিনটে চুম্বকের তার খুলে দিতে পার? তা' হ'লে ভূতের গলা আর পুতুলে পৌঁছুবে না।"

"আপনারও?"

"আমারও।"

কর্ণেল শেষে একান্ত অনিচ্ছাসত্বে তাই করলেন। চুম্বকের শিরদাঁড়া যাওয়াতে এখন আর কারও গলা শুনতে পাওয়া যায় না। কর্ণেলের বাংলো এখন নীরব, নিথর।

ছেলেমেয়েরা 'উটী' থেকে ফিরে এসেছে। তারা এবং তাদের মা কর্ণেলের কথা বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়; বলে—

"তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

অথচ এ যে পরম সত্য, তা' কর্ণেল প্রমাণ করেন কেমন করে'?

আবার কতবার পুতুলদের পিঠে চুম্বকের শিরদাঁড়া বসিয়ে দেখেছেন; কিছুতেই কিছু হয় না। হবে কেন?

সে যে যাদুকরের ওস্তাদী আঙ্গুলে গড়া। একবার ভাঙলে···আর হয় না।

বিমাতা

কুমারী লাবণ্যপ্রভা মজুমদার

—"আভি, ও পোড়ারমুখি, ছেলেটা যে কেঁদে ম'ল, কাণে শুনতে পাচ্ছিস্ না?" বাটনা বাটিতে বাটিতে কন্যাকে এই কথা বলিয়া সুনীতি দেবী দ্বিগুণবেগে হস্ত চালাইতে লাগিলেন। ক্রন্দনপরায়ণ শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া অপরাধিনীর ন্যায় শুভা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল—"রণু কিছুতেই চুপ করছে না মা, তোমার কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। আমি বাটনা বাটছি, তুমি রণুকে নাও।"

রুক্ষকণ্ঠে সুনীতি কহিলেন—"না বাপু, তুমি যাও; সেলাই-টেলাই করছিলে, তাই কর গে যাও—বাটনা বাটতে হ'বে না।"

মাতাকে দেখিয়া শিশুর ক্রন্দন তখন পঞ্চমে উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া মাতার কণ্ঠও সপ্তমে উঠিল।

—"সঙয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে? আভি, এই আভি হতচ্ছাড়ি, কালা হয়ে মরেছিস্ না কি?"

পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরুণী আভারাণীর শুভাগমন হইল। ঝঙ্কার দিয়া আভা কহিল—"কি? দিদি তো নিয়ে রয়েছে। চুপ করছে না তো আমি কি করবো? যে গুণধর ছেলে তোমার!"

—"তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে আভি! সংসারের একটা কাজও তুমি করতে পারবে না —ছেলেটাকেও একবার নিতে পারবে না, নয়?"

—"সংসারের কাজ আবার কি করব? সবই তো তুমি আর দিদি কর। আমি—"

—"চুপ করে' থাক্‌বি হতভাগী। সব বিষয়ে তোর ফোড়ন দেওয়া চাই। তুই খোকাকে নিতে পারবি কি না বল্?"

গজ্‌গজ্ করিতে করিতে এক হেঁচকা টান মারিয়া দিদির ক্রোড় হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া আভারাণী সবেগে প্রস্থান করিল। মাতা ততক্ষণে বাট্‌না বাটা শেষ করিয়া, রন্ধনের আয়োজন করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। শুভা স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। শয়ন-কক্ষ হইতে নিশানাথ ডাকিলেন—"শুভু, এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো মা।"

—"যাচ্ছি বাবা।" এক গ্লাস জল গড়াইয়া লইয়া শুভা সেখান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দুই

পরদিন বৈকালে রোয়াকের উপর বসিয়া শুভা কুট্‌না কুটিতেছিল। তাহার এলোচুলের রাশি পৃষ্ঠের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রান্নাঘর হইতে উঁকি মারিয়া সুনীতি তাহা দেখিয়া কহিলেন—"এলোচুলে কুটনো কোটা হচ্ছে কেন, শুনি?"

কুণ্ঠিতস্বরে শুভা কহিল—"চুল বাঁধবার সময় হয়ে ওঠে নি মা। বাবার জামাগুলোতে বোতাম বসাতে বসাতে অনেক দেরী হয়ে গেল।"

—"তবে আর কি,—আমার মাথা কিনলে! চুল না বেঁধে খবরদার কুট্‌নোতে হাত দেবে না আমি তো চোখের মাথা খেয়ে বসে' আছি—

দেখতে পেলে না হয় কুটে নিতুম। একশ' দিন না তোমাকে বারণ করা হয়েছে যে, এলোচুলে যেন কুট্‌নো কোটা না হয়। শোনা হয় না কেন শুনি? লোককে দেখানো হচ্ছে, সংমা এমন খাটিয়ে খাটিয়ে মারে যে, চুল বাঁধবার পর্যান্ত সময় হয় না।"

ব্যথিত হৃদয়ে শুভা ধীরে ধীরে আসিয়া কক্ষ মধ্যে ঢুকিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল-ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ইদানীং কাজে হাত দিতে গেলেই, বিমাতা কোনো-না-কোনো একটা খুঁত ধরিয়া এমন গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসেন যে, সে কোনোমতেই অশ্রুরোধ করিতে পারে না। কাজ করিলেও বকুনি, না করিলেও বকুনি! শুভা ভাবিল, কেন এমন হয়? বাবা একদিন বিমাতাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, শুভা আমার বড় আদরের মেয়ে, ওকে দিয়ে বেশী কাজ-কর্ম্ম করালে আমি বড় কষ্ট পাই।" তাই কি কোনো কাজ করতে গেলেই মা "হাঁ, হাঁ" করিয়া উঠেন, আর সে অপরাধিনীর ন্যায় সেখান হইতে সরিয়া যায়! হায় রে, ইহা হইতে যে কাজ করা শতগুণে শ্রেয়! এই সব ভাবিতে ভাবিতে শুভা চুল বাঁধা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, দশমবর্ষীয় ভ্রাতা রমেন্দ্র কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"দিদি ভাই, একটা পয়সা দাও না, ঘুঁড়ি কিন্‌বো।"

—"আমার কাছে পয়সা নেই তো ভাই।"

—"বা রে, তোমার কাছেও নেই—মার কাছেও নেই! দেখ না দিদি, যদি কোথায় একটা পয়সা থাকে—অজিত, সনৎ ওরা সবাই কিনছে।"

সভয়ে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া, শুভা কহিল—"আচ্ছা, দাঁড়া, দেখ্‌ছি।" বলিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল ও অল্পক্ষণ পরে একটা পয়সা লইয়া ফিরিল।

পয়সাটী সে যেই রমেনের হাতে দিতে যাইবে, সুনীতি হঠাৎ সেই সময় কোথা হইতে আসিয়া কহিলেন—"ও কি! কি দেওয়া হচ্ছে?"

শুভা সঙ্কুচিত হইয়া হস্ত গুটাইয়া লইল।

রমেন কহিল—"পয়সা মা, ঘুঁড়ি কিন্‌বো।"

সুনীতি শুভার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া রমেনকে কহিলেন—"ঘুঁড়ি কিন্‌তে হবে না। একফোঁটা ছেলে, রোজ রোজ পয়সা চাই। খবরদার কোনোদিন যদি আবার পয়সা চেয়েছিস তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে' দেব।" এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে নিশানাথ সেখানে আসিয়া কহিলেন—"শুভুকে শীগ্‌গির একখানা পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দাও—এক ভদ্রলোক দেখ্‌তে এসেছেন।"

তিন

রাত্রে স্বামীকে খাইতে দিয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে, সুনীতি শুভার বিবাহ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন। নিশানাথ কহিলেন—"পাত্রের বয়স এই পঁচিশ-ছাব্বিশ হ'বে। আর এদিকে সবই ভাল, কিন্তু অবস্থা সে রকম ভালো নয়। তা' আর কি করবো বল? অবস্থাপন্ন ঘরে দিতে গেলেই বেশী পয়সার দরকার।" নিশানাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

—তা', এদের কত টাকা দিতে হবে?"

জলের গ্লাসটা মুখ হইতে নামাইয়া নিশানাথ কহিলেন—"এদের? তা' অনেক বলা-কওয়ায় হাজার টাকায় রাজী হয়েছে।

সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সুনীতি কহিলেন—"হা-জা-র টাকা দিতে হবে? ঐ অবস্থার পাত্রকে দিতে হবে হাজার টাকা! ওর প-রই যে আমার বিয়ে দিতে হ'বে, তার টাকা তখন কোথা থেকে যোগাবে শুনি? ও সব হবেটবে না —এ কাজ ছেড়ে দাও।"

—"তুমি কি বলছ নতুন গিন্নী ? এর কমে কি আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় ? আর আভার বিয়ের কথা বলছ—সে তখন পরে ভাব্‌বো। আপাততঃ, শুভার বিয়ের ব্যবস্থা করি তো।"

—"আগে শুভির কি রকম ? আভি কি কচী খুকী না কি ? ঐ সঙ্গে ওরও সম্বন্ধ কর। আর শোন, আভির আমি খুব অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দিতে চাই—তা' তোমার যত টাকাই লাগুক।—শুভির ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও।"

দ্বিতীয়-পক্ষের পত্নীর বাক্যে বিশেষ প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কাজেই ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিশানাথ কহিলেন—"তবে আর কি কর্‌বো—বাধ্য হয়ে তাই কর্‌তে হবে।"

—"শুভি তো ধেড়ে হয়ে উঠেছে, ওর কি আর প্রথম-পক্ষের মানায় ? একটা দ্বিতীয়-পক্ষ দেখ—পয়সাও কম লাগবে, মানাবেও ভাল।" ইহা শুনিয়া নিশানাথের মুখের ভাত ক'টা আর গলা দিয়া নামিল না। তিনি "হু" বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"ও কি—ও কি—উঠলে যে! দুধ খেলে না ?"

—"থাক্। রমু খাবে 'খন—আমার পেট ভরে' গেছে।" বলিয়া তিনি কলঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

চার

সেদিন সন্ধ্যায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রনেন্দ্র মহা বায়না ধরিয়াছিল। শুভা তাহাকে ভুলাইবার জন্য মাজা বাসনগুলি তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি আসিতে সে হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গেল। বাসনের উপর পড়িয়া তাহার হাত ও কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাতের বাসনগুলিও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শব্দ শুনিয়া দ্রুতপদে সুনীতি রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়েই নিশানাথ অফিস হইতে ফিরিয়া "শুভু" বলিয়া একটা ডাক দিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিলেন। তিনি শুভাকে ঐরূপভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে তুলিয়া কহিলেন—'ইস্, রক্ত পড়ছে যে! কি করে' পড়ে গেল ?"

—"বাসন তুল্‌ছিল। এ কি সর্ব্বনাশ! এঁ্যা! এমন সুন্দর থালাখানা—"

তীব্রকণ্ঠে নিশানাথ কহিলেন—"থালা পরে দেখবে; এদিকে মেয়েটা যে ম'ল, একটু জল এনে দাও দয়া করে'—তা' হ'লে চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌বো!"

—"তা' আমি কি কর্‌বো—আমার ওপর কেন ঝঙ্কার হচ্ছে ? আমি ওই জন্যে তো ওকে পাঁচশোবার বারণ করে'ছিলুম যে, বাসন তুল্‌তে হবে না।"

গজগজ করিতে করিতে সুনীতি এক বালতী জল লইয়া আসিলেন। নিশানাথ শুভার ক্ষতনাথ ধুইয়া, বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন—"শুভার মামা সেদিন চিঠি লিখেছিল, ওকে নিয়ে যাবে বলে; আমি পাঠাতে চাই নি—কিন্তু এখন দেখছি পাঠিয়ে দিলেই ভাল হ'ত। যাই হোক্, আমি কালই ওর মামাকে লিখে দেব, যেন শীগ্‌গিরই ওকে নিয়ে যায়। হাজার হোক্ নিজের মামা তো, যত্নে রাখবে।"

শুভা তখন ক্ষতের যন্ত্রনা ভুলিয়া ভাবিতেছিল যে, কতক্ষণে সে এখান হইতে সরিয়া গিয়া গৃহকোণে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিবে। মাতুলালয়ে যাইবার কথা শুনিয়া স একবার মুখ তুলিয়া পিতার দিকে চাহিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। সুনীতি কহিলেন—

"পাঠাও না মামার বাড়ী, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করে' রেখেছে? তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি!"

পাঁচ

শুভার মাতুল আসিয়াছে, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য। শুভা কক্ষ মধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। মাতুলালয়ে গমনের সময় যতই আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল; এমন সময় আভা দ্রুতপদে সেই কক্ষে ঢুকিয়া কহিল—"দিদি, বাবা বল্লেন—তোমার জিনিষ-পত্র সব গোছান হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তা' হ'লে কাপড় পরে নাও। আর বেশী দেরি করবার সময় নেই।"

শুভা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"এই যে আমার কাপড় পড়া হয়ে গেছে ভাই।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আভাও শুষ্কমুখে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। সেখানে আর কাহাকেও না দেখিয়া শুভা সাগ্রহে আভাকে কহিল—"আমার চিঠি পেলেই উত্তর দিবি তো ভাই?"

আভা মস্তক নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

শুভা তাহার হস্ত ধরিয়া আদরপূর্ণস্বরে কহিল—"আভু, আমি চলে' গেলে তোর বড় কষ্ট হ'বে, নয় রে? একলাটি সব কাজ-কর্ম করে' উঠ্‌তে পারবি না হয় ত।"

আভা মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাহার এই স্বল্পভাষিণী দিদিটীর উপর বড়ই খুসী ছিল; কারণ, শুধু সংসারের কাজ-কর্ম বলিয়াই নহে,অনেক বিষয়েই দিদি তাহাকে রক্ষা করিত। কিন্তু আজ কাজের কথা ভাবিয়া তাহার যত না কষ্ট হইতেছিল, ততোধিক কষ্ট হইতেছিল দিদি চলিয়া যাইবে বলিয়া। তাই সে সর্ব্বক্ষণই দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিল। যাইবার কালে যখন ছোট ভাই-বোনগুলি তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল, অদূরে পিতাকে বেদনা-বিবর্ণ-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল, তখন এক অব্যক্ত ব্যথায় শুভার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ঘোড়ার গাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া মাতুল শীঘ্র করিয়া আসিতে কহিতেছিলেন। প্রথমে মাতুলালয়ে যাইবার কথা শুনিয়া শুভার একটু আগ্রহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাতুলকে দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সে আগ্রহ বিলুপ্ত হইয়াছিল। ওই কঠিন মুখ, অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে রং এবং শীর্ণ চেহারা দেখিয়াই শুভার বক্ষের রক্ত জল হইয়া আসিতেছিল!—এই তাহার মাতুল? জীবনে আজ সর্ব্বপ্রথম শুভা তাহার মাতুলকে দেখিল। বিমাতা সেদিন পিতাকে কহিতেছিলেন—"মামীর আঁতুড় তোলবার লোক জোটে নি কি না, তাই মামার এতদিন পরে ভাগ্নীর ওপর দরদ উথ্‌লে উঠেছে!"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সত্যই কি তাই? শুভা ভীত-চকিত-নেত্রে অদূরে দণ্ডায়মান মাতুলের দিকে একবার চাহিল, পরে সে তাহার কনিষ্ঠগুলিকে আদর করিয়া, নত হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল নিশানাথের চরণদ্বয়ের উপর ঝরিয়া পড়িল। নিশানাথ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—"শুভু, মা!"

—"বাবা!"

নিশানাথ কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু বলা হইল না। ঠিক সেই সময়েই শুভার মাতুল তাহাদের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—"নিশানাথবাবু, আর দেরী করবেন না; ট্রেনের সময় হয়ে এল।"

ব্যস্ত হইয়া নিশানাথ কহিলেন—'শুভু, তা' হ'লে আর দেরী কোরো না। কিছু নিতে বাকি থাকে তো দেখে-শুনে নাও।"

শুভা "আচ্ছা" বলিয়া চকিতে একবার চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কোনোস্থানে তাহার

বিমাতাকে দেখিতে পাইল না। শুভা তখন বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রত্যেক কক্ষ খুঁজিয়া সে বিমাতাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে রান্নাঘরে ঢুকিল। সুনীতি তখন মাথা নীচু করিয়া বসিয়া কি করিতেছিলেন। শুভা ডাকিল—"মা!"

চমকাইয়া মাথা তুলিতে শুভা দেখিল, তাঁহার চক্ষুদ্বয় জবার ন্যায় রক্তবর্ণ! সুনীতি অঞ্চল দিয়া চক্ষু রগ্ড়াইতে, রগ্ড়াইতে কহিলেন—"উ', কি যে চোখে পড়ল, জ্বলে মলুম!"

কিছুক্ষণ চক্ষু রগ্ড়াইবার পর তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন—"কি দরকার?"

শুভা "আমি যাচ্ছি" বলিয়া সেখান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। উত্তরে বিমাতা কি বলিল, শুনিতে পাইল না।

ছয়

দুইমাস গত হইয়াছে।

শুভা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে এক বাটি দুধ জাল দিয়া লইয়া আসিতেছিল। মামীমা এক মাসের শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন-কক্ষের দাওয়ার উপর শুভার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন।

পল্লীগ্রামের বর্ষাকাল। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক পিছল করিয়া তুলিয়াছে। শুভার ব্যস্ততাবশতঃ খানিকটা দুধ চল্‌কাইয়া পড়িল। শয়নকক্ষের মধ্যে বোধ করি শুভার মাতুল ছিলেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মাতুলানী তীব্র ঝঙ্কারে কহিলেন—"তখনি আমি তোমাকে বলেছিলুম—'ও অলক্ষীকে এনো না ঘরে।' জন্মেই যে মাকে খেলে—বাপ যাকে দূর করে' দিলে—তাকে আন্‌লে পদে পদে যে অলক্ষীর ছায়া বাড়ীতে পড়বে তা' তো জানা কথাই। তখন কত না বলা হ'ল—তোমার কাজের ঢের সুবিধা হবে, ঝিয়ের খরচ বেঁচে যাবে, হেন তেন কত কি! এখন বোঝ, লাভ হচ্ছে কি লোকশান হচ্ছে! ঝি রাখলে যেমন মাইনে দিতে হ'ত, একে তেমনি কাঁড়ি কাঁড়ি গিল্‌তে দিতে হচ্ছে না? আশ্চর্য্য হই মা! এতবড় মেয়ে, খালি গিল্‌বে, কাজের বেলায় টিপিস! দাঁড়িয়ে রইলি যে? যেখান থেকে পারবি দুধ নিয়ে আস্‌বি। রোজ রোজ এসব কি! এই সেদিন পাথর বাটিটা ভাঙ্‌লি—"

—"পাথর বাটি আমি তো ভাঙি নি মামীমা।"

—"কি, আবার মুখের ওপর উত্তর!"

—"দূর করে' দাও—দূর করে' দাও—ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে দূর করে' দাও।" বলিতে বলিতে মাতুল-মহাশয় রঙ্গস্থলে আসিয়া দেখা দিলেন।

শুভা তখন দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মাতুল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"বেরিয়ে যা—"

—"প্রসাদ।" নিশানাথ একটি সুটকেস হস্তে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"প্রসাদ।"

প্রসাদকুমার চম্‌কাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বিমূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন!

নিশানাথ হাসিয়া কহিলেন—"কি হে, চিনতে পারছ না?"

অপ্রতিভ হইয়া প্রসাদ কহিলেন—"না না, চিন্‌তে পারবো না কেন। হঠাৎ খবর না দিয়ে এলেন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। আসুন, বসুন।"

—"হ্যাঁ বসছি। তারপর খবর সব ভাল তো? কা'কে বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছিলে? এই যে বৌঠান, ভালো আছেন তো?"

নিমেষে রণরঙ্গিনীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া বৌঠান তখন লজ্জাশীলা বধূমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। মৃদুস্বরে কহিলেন—"হ্যাঁ। আপনি?"

—"অমনি এক রকম। শুভা কোথায়? তা'কে দেখ্‌ছি না যে! আরে, উঠোনে দাঁড়িয়ে

ওই মেয়েটি কে ভিজছে? ওকেই বুঝি বক্‌ছিলে প্রসাদ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, কুণ্ঠিতস্বরে প্রসাদ কহিলেন—"আজ্ঞে, চিন্‌তে পারছেন না, ও যে শুভা। বৃষ্টিতে ভিজতে এত করে' বারণ—"

বাধা দিয়া নিশানাথ গাঢ়স্বরে কহিলেন—"শুভা! ওই কি আমার শুভা! আমার চোখের কি এতই দোষ হয়েছে প্রসাদ, যে, আমার মেয়েকে আমি চিন্‌তে পারছি না! আচ্ছা, ডাকতো ডাকতো মেয়েটিকে এদিকে দেখি—তুমি ঠাট্টা করে' বলছ, না সত্যিই ও আমার শুভা।"

ডাকিতে হইল না—শুভা ধীরে ধীরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া ডাকিল—"বাবা!"

নিশানাথ স্তম্ভিত হইলেন। দুই হস্তে শুভাকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন—"প্রসাদ, প্রসাদ, এই আমার সেই অন্নপূর্ণা! প্রসাদ, বড় আশা করেই শুভাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম, তাই কি তুমি আমাকে এই দেখালে? যাও, আমি শুভাকে এখনই নিয়ে যাব; ব্যবস্থা করো।—আর একমিনিটও ওকে এখানে রাখতে চাই না।"

সাত

—"আহা, মামার বাড়ীর আদর খেয়ে খেয়ে মেয়ের কি ছিরিই হয়েছে!"

—"নতুন গিন্নী, তুমি ঠিকই বলেছিলে যে, স্বামীর আঁতুড় তোলবার জন্যে ভায়ীর ওপর জলক্ উথলে উঠেছে।"

মুখ বাঁকাইয়া সুনীতি কহিলেন—"কেন, এখানে মেয়ের দুর্গতির শেষ নাই, মামার বাড়ী সুখে থাকুক।"

—"দোহাই তোমার নতুন গিন্নী, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। ওকে একটু দয়া করে' দেখো শুনো।"

—"তুমিই দেখ শোন গে। কিন্তু মামার বাড়ী থেকে ও যে রকম এসেছিল, তা'র চেয়ে চেহারা ফিরেছে কি না?"

অপ্রতিভ হইয়া নিশানাথ কহিলেন—"হাঁ, তা' তা'—"

—"হ্যাঁ, তা' তা' রেখে যা' বল্‌ছিলে, তাই এখন বল।"

—"হ্যাঁ বলি। শুভার জন্যে যে পাত্রটি ঠিক করেছি, সে অনেক টাকার মালিক। নিজেই নিজের অভিভাবক। পছন্দ হ'লে এক পয়সাও নেবে না। তবে দ্বিতীয়-পক্ষ—বয়সও একটু হয়েছে। তা' হোক্ গে, শুভা খেতে-পরতে পেলেই হ'ল।"

—"আর আভার?"

—"আভার জন্যে যে পাত্রটী দেখেছি, সে ছেলেটী এম-এ পড়ে। অবস্থাও ভাল, কিন্তু ওরা সবশুদ্ধ দু'হাজার টাকা চায়।"

—"শুভার জন্যে যে সম্বন্ধ করেছ, তা'দের চেয়ে কি এই এম-এ পড়া ছেলেটী বড়লোক?"

—"না, ওদের চেয়ে বড়লোক নয় বটে, তবে আমাদের চেয়ে ঢের বড়লোক।"

—"শুভার ভাবীস্বামীর চেয়ে গরীব হ'বে, চাকরীও করে না, এমন ছেলের সঙ্গে আমি কখনই আভার বিয়ে দেব না। তুমি ওই এম-এ পড়া ছেলেটীর সঙ্গে শুভার বিয়ের ব্যবস্থা কর।"

সাশ্চর্য্যে নিশানাথ কহিলেন—"সে কি! এই সেদিন বল্লে—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে সুনীতি কহিলেন—"ওসব আমি শুন্‌তে চাই না। ওই এম-এ পড়া ছেলেটীর সঙ্গে শুভার বিয়ে দাও। আভার বিয়ের সম্বন্ধ আমি নিজেই করবো; তোমাকে কিছুই করতে হবে না। মোট কথা, আমি শুভার

চেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে আভার বিয়ে দিতে চাই—তা' তোমার যত টাকাই লাগুক।" বলিয়া সশব্দে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিশানাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই গর্ব্বিতা মুখরা নারীটিকে আজও তিনি ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আট

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। শুভার শরীরটা আজ অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় সে সন্ধ্যার পরেই শয্যা লইয়াছিল। কিন্তু রাত্রি দুইটা বাজিল, তবু তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। তাহার পার্শ্বে শুইয়া আভা বহুক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বের কক্ষে বিমাতা ও ছোট ভাই দুইটার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না; পিতাও বোধ করি ঘুমাইতেছেন। শুধু তাহার চক্ষেই নিদ্রা নাই। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুভা শয্যায় পড়িয়াছিল। জগতের যত চিন্তা যেন আজ তাহাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল। হায় রে, তাহার কি কোথাও স্থান নাই? সে যেখানে যায়, সেইখানেই অশান্তির সৃষ্টি হয়! "অভাগী যেখানে যায়, সাগর শুকায়ে যায়!" তাহার এই ললাট-লিপির কি কখনও ব্যতিক্রম হইবে না? এইসব নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে শুভার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় ললাটে কাহার মৃদু করস্পর্শ অনুভব করিতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সে ভাবিল, বোধ হয় ঘুমের ঘোরে আভার হস্ত তাহার ললাট স্পর্শ করিয়াছে। সে আভার হস্ত নামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে চক্ষু উন্মীলিত করিতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল! এতখানি বিস্ময় তাহার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম সে অনুভব করিল। শুভা দেখিল, বিমাতা হ্যারিকেনটা উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্বেলকম্পমুখে তাহার ললাটে হস্তার্পণ করিয়া চাহিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি শুভার চোখের উপর পড়িতে তিনি দেখিলেন, সে বিমূঢ়-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তিনি হস্ত সরাইয়া লইয়া কহিলেন—"আভার কাছে চাবীটা রাখ্‌তে দিলুম, হতচ্ছাড়ি যে কোন্ চুলোয় ফেল্লে—খুঁজেও পাচ্ছি না! বল্লে কি না—'আঁচলে বেঁধে রেখেছি।' কোন বিষয়ে যদি মেয়ের একটু গোছগাছ থাকে!" বলিয়া তিনি আভার অঞ্চলটা ধরিয়া একবার টানিলেন, মাথার বালিশটা একবার তুলিয়া দেখিলেন, পরে নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন।

চাবী! রাত্রি দু'টার সময়ে চাবীর কি প্রয়োজন হইল? তাহাই যদি হয়, তবে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্বিগ্ন-মুখে কি দেখিতেছিলেন তিনি? অতীতের সকল ঘটনা শুভার মনশ্চক্ষে দর্পণের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল—চুল না বাঁধিয়া কোনো কাজ করিতে গেলেই তীব্র কটূক্তি, রন্ধন অথবা কোনো কঠিন কাজ করিতে গেলেই, অন্য কার্য্যের দোহাই দিয়া বিদায় করা—মাতুলালয়ে গমন কালে তাঁহার সেই আরক্ত চক্ষু—এ সকল কি কেবল বিমাতার কঠিন হৃদয়ের পরিচয় জ্ঞাপন করে? শুভা পুনরায় চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল।

নয়

বৈশাখ মাস। আজ শুভার বিবাহ। বিমাতা নির্দ্দিষ্ট সেই এম-এ পাঠরত পাত্রটির সহিতেই তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। দিদির বিবাহের আনন্দে আভা ও রমেন হাসিমুখে এধার-ওধার ছুটাছুটি করিয়া ফরমাইস্ খাটিয়া বেড়াইতেছিল। আজ আভার নিকট সকল কাজই খুব হাল্কা বোধ হইতেছিল। কুটুম্ব ও প্রতিবেশিনীরা সকল

একটী কক্ষে শুভাকে লইয়া ঘেরিয়া বসিয়াছিল। সুনীতি তাঁহাদের জন্য পাণ আনিতে অপর কক্ষে গিয়াছিলেন। একজন আত্মীয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ দিদি, তুমি তো ওই পাশের বাড়ীতেই থাকো; এ বাড়ীর সব হালচাল জান বোধ হয়? শুনেছিলুম যে, সৎমা শুভাকে বড় কষ্ট দেয়—সে কথা কি সত্যি?"

এদিক-ওদিক চাহিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া প্রতিবেশিনী কহিলেন—"ও মা, সে কথা আর বল কেন ভাই—মেয়েটাকে কোনো কষ্ট দিতে মাগী বাকী রেখেছে না কি—এক-একদিন ধরে' মেরেছে পর্য্যন্ত। এই যে শুভার এমন ভাল ঘরটাতে বিয়ে হচ্ছে, তাতে কি কম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল হিংসেয়!"

বাধা দিয়া তাঁহার পার্শ্বোবিষ্টা একটী বিবাহিতা মেয়ে কহিল—"তুমি অন্যায় কথা বলছ কেন জেঠিমা? শুভার মার ইচ্ছেতেই যে এ বিয়ে হচ্ছে, তা'তো সেদিন নিশিকাকা আমাদের বাড়ীতে বসে' গল্প করে' এলেন।"

হঠাৎ বাধা পাইয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া জেঠিমা কহিলেন—"তুই সব জানিস কলি, নয়? এই সেদিনকার মেয়ে তুই, আমার সঙ্গে ফড়্‌ফড়্ করতে আসিস্? বলি, তুই এখানে ক'দিন আছিস্, এখানকার ব্যাপার কি জানিস্ যে, 'ফস্' করে' বলে' বস্‌লি—অন্যায় কথা? অবাক হয়ে' যাই মা, তোদের আস্পর্দ্ধা দেখে!"

কলি তাহার এই জেঠাইমাটীকে বিলক্ষণ চিনিত; কাজেই সে বেচারী আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

নিশানাথের অন্য একজন আত্মীয়া কক্ষের অপর পার্শ্বে উপবিষ্টা শুভাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"হ্যাঁ রে শুভা, তোকে না কি সৎমা এত কষ্ট দেয়?"

শুভা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল। কষ্ট দেয়!—হায়, স্বল্পভাষিণী শুভা তাঁহাকে কিরূপে বুঝাইবে যে, তাহার সৎমা কেমন! তাহার মা থাকিলেও বোধ করি ইহার অধিক স্নেহ-যত্ন সে পাইত না। চক্ষু সত্বেও সে অন্ধ ছিল—তাই বিমাতাকে এতদিন চিনিতে পারে নাই। শুভা আপনাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। চারিদিকে পরচর্চ্চা ও পরকুৎসার মৃদু গুঞ্জন শুনিয়া সে সঙ্কুচিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কক্ষের বাহিরে যাইতে যাইতে শুনিল, কে একজন বলিতেছেন—"হাজার হোক্ সৎমা তো, কত ভাল হবে বল?"

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুভা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, এক রেকাবী সাজা পাণ হস্তে লইয়া তাহার বিমাতা বিবর্ণমুখে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। শুভা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সভয়ে কহিল—"মা, মা, অমন করছ কেন! কি হয়েছে?"

সুনীতি ম্লান হাসিয়া "কিছু হয় নি" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

—"মা, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তুমি ও'দের কথা শুনে ব্যথা পেয়েছ। কিন্তু ওঁরা যাই বলুন না কেন, তা'তে কি এসে যায়? আমি তো জানি, তুমি আমার কেমন মা!" শুভা জীবনে একসঙ্গে এতগুলি কথা এই সর্ব্বপ্রথম বলিল।

রুদ্ধকণ্ঠে সুনীতি কহিলেন—"ও রে, হাজার করলেও আমি যে তোর সৎমা!"

দ্বারের অপর প্রান্ত হইতে নিশানাথের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"হাঁ, তুমি ওর সৎমাই বটে! শুভু, তোর নূতন মায়ের পায়ের ধূলো একটু মাথায় দে!"

৩ মিতালী সঙ্গী মনের কথা

ফটোঃ এম্‌ চৌধুরী
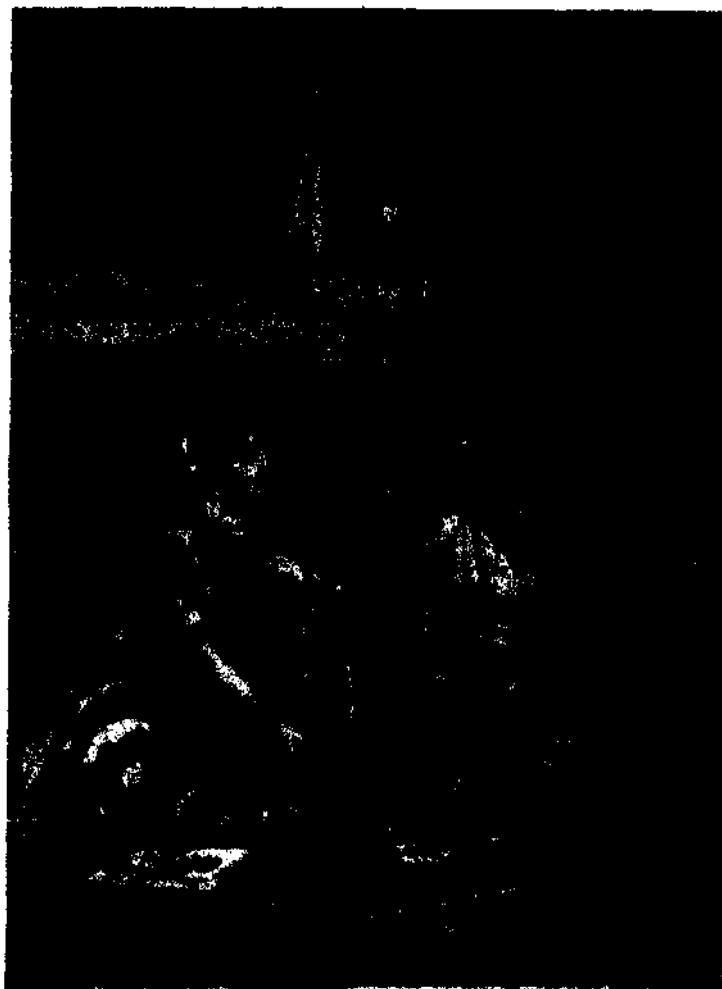
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ | অষ্টম সংখ্যা

অপরাধী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

অনেকদিন পরে দায়রা-আদালতে একটী মামলার মত মামলা উঠিয়াছে। আজ কয়দিন ধরিয়া শহরের লোকের মুখে মুখে এই মামলার কথা ফিরিতেছে।

স্থানীয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশ :—"গত শনিবার, পচিশে কার্ত্তিক অত্র শহরের ঝাউতলার ঘাটে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় একটার সময় ঘাটের জনৈক মাঝি দেখিতে পায়, এক ব্যক্তি কী একটা ভারী জিনিষ টানিয়া নদীর জলের দিকে আনিতেছে। লোকটীর হাবভাব দেখিয়া মাঝির মনে সন্দেহ হয়! আরো দুই-তিনজন মাঝিকে জাগাইয়া, তাহারা লোকটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে, সে একটী মৃতদেহ টানিয়া আনিয়া জলে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। মৃতদেহটী তাহারা ঝাউতলা-ঘাটের বুড়া ভিখারীর বলিয়া চিনিতে পারে। মাঝিদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া দুই-তিনজন পাহারাওয়ালা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয় এবং লোকটীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে। ডাক্তারি রিপোর্টে প্রকাশ, বুড়া ভিখারিটীকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উক্ত লোকটীই ভিখারীর ভিক্ষালব্ধ অর্থের লোভে তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। লোকটীকে পুলিশ এখনও সনাক্ত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু লোকটী যে একজন পাকা বদমায়েস্, সে বিষয়ে তাহাদের কোন সন্দেহ নাই। গত সোমবার দায়রা-আদালতে লোকটীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গ্রেফ্তার হওয়ার পর হইতে গত বুধবার পর্য্যন্ত লোকটী একটীও কথা বলে নাই। তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে ভদ্রবংশীয় ও শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন ও জরাজীর্ণ। 'পাবলিক প্রসিকিউটর'

লোকটাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করেন এবং সঠিক্ পরীক্ষার জন্য তাহাকে রাঁচীর পাগলা হাস-পাতালে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে লোকটী তাহার তিনদিনের মৌন-ভঙ্গ করিয়া বলে যে, সে বিকৃত-মস্তিষ্ক নহে। এই হত্যা সম্বন্ধে তাহার যাহা বলিবার আছে, সে তাহা লিখিয়া জানাইবে। আদালত হইতে তাহাকে কাগজ-কলম দেওয়ার হুকুম হউক্। জজ-সাহেব তাহার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিন-দিন স্থগিতের পর অদ্য আবার এই মামলার শুনানী হইবে। বোধ হয়, আসামী অদ্যকার আদালতেই তাহার বর্ণনা-পত্র দাখিল করিবে। এই ব্যাপারের সহিত কী রহস্য জড়িত আছে, তাহা জানিবার জন্য শহরের সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ, আজ তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মৃত ভিখারীর দেহ তল্লাস করিয়া মাত্র তিন আনার পয়সা পাওয়া গিয়াছে—তাহার মধ্যে আধলার সংখ্যা চৌদ্দটী। আসামীর নিকট অস্ত্রশস্ত্র বা অর্থাদি পাওয়া যায় নাই।"

বেলা দশটা বাজিতে-না-বাজিতেই জজের এজলাস্ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। ভিড় সামলাইতে না পারিয়া পুলিশ-প্রহরীরা কোর্টের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অনেকে ভিতরে ঢুকিতে পারিল না বটে, কিন্তু মামলার ফল কি হয় তাহা জানিবার জন্য বাহিরেই ভিড় জমাইতে লাগিল।

বেলা এগারোটার সময়ে জজ-সাহেব এজলাশে ঢুকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ায় পুরিয়া দিল। সকল লোকের দৃষ্টি আসামীর উপর গিয়া পড়িল। লোকটীর বয়স ত্রিশের উপরে নহে; গৌর বর্ণ, দোহারা গড়ন, চোখ দু'টী বেশ টানাটানা, কিন্তু কয়-দিনের দুশ্চিন্তায়ই বোধ হয় ঈষৎ রক্তিমাভ ও কোটরপ্রবিষ্ট। কিছুদিন ধরিয়া ক্ষৌরকার্য্য না হওয়ায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি; তৈলাভাবে মাথার চুলগুলি রুক্ষ। পরণের কাপড়খানি অত্যন্ত মলিন ও ছিন্ন; গায়ে একটী রঙ-চটা ছিটের শার্ট। পায়ের জুতায় তালির সংখ্যা এত যে, জুতাজোড়া পূর্ব্বে কি রঙের ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

প্রথমেই উকীল-সরকার তাঁহার গুরুভার দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জজ-সাহেবও 'জুরার'গণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, অদ্য আসামী তাহার লিখিত জবানবন্দী দাখিল করিবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

জজ-সাহেব পদ-মর্য্যাদায় 'সাহেব' হইলেও, আসলে বাঙালী। তিনি আসামীকে সম্বোধন করিয়া বাংলায় বলিলেন—'তোমার জবানবন্দী লেখা হয়েছে?"

আসামী কোন উত্তর দিল না; ছিন্নপ্রায় পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুলিশ-প্রহরীর হাতে দিল। পাহারা-ওয়ালার হাত হইতে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার-বাবুর এবং তথা হইতে উকীল-সরকারের হাত ঘুরিয়া কাগজের তাড়াটি জজ-সাহেবের হাতে গিয়া পৌঁছিল। তিনি তাহা পেশকারের হাতে দিয়া পড়িতে আদেশ করিলেন।

পেশকারবাবু দুই-একবার কাশিয়া গলাটী একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া জবানবন্দীটি পড়িতে সুরু করিলেন। উকীল, মোক্তার ও মুহুরি হইতে আদালতের পেয়াদাটী পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পাঠ শুনিয়া যাইতে লাগিল। আসামীও পরম আগ্রহভরে একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া পেশকারবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া

রহিল। পেশকারবাবু পড়িতে লাগিলেন—"আমি সর্ব্বপ্রথমেই স্বীকার করছি যে, আমি-ই এই বৃদ্ধ ভিখারীকে হত্যা করেছি। নরহত্যার অপরাধে আমি অপরাধী—এবং সে অপরাধের চরম দণ্ড গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত। মাঝিদের ও পুলিশের সাক্ষ্যে যা' প্রকাশ পেয়েছে, তার সবই সত্য; শুধু একটা কথা তারা তাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে' বলেছে—আমি অর্থলোভে এই জরাতুর বৃদ্ধকে হত্যা করি নাই। অর্থের আমার প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী; হয় ত অর্থের জন্য মানুষকে খুন করতে আমি পিছপাও হতাম না; তথাপি বলছি—অর্থের জন্য এই বৃদ্ধ ভিখারীকে আমি হত্যা করি নি। নরহত্যার অপরাধে আমি মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষা করছি; আশা করি মরণ-পথের পথিকের এই কথাটা আপনারা অবিশ্বাস করবেন না। আমি জানি, কথাটা আপনাদের কাছে হেঁয়ালির মত লাগবে; আপনারা আমাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে' মনে করবেন। আর কিছু দিন থাকলে হয় ত আমি সত্যসত্যই উন্মাদ হয়ে যেতাম—সেই চরম দশা উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই আমি স্বেচ্ছায় এই জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। কেন আজ আমি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয়ে আপনাদের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছি, সে কথাটা বোঝাতে হ'লে আমার জীবন-সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলা আবশ্যক মনে করি।"

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে উকিল-সরকার উঠিয়া বলিলেন—"হুজুর, আসামী নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে এই বৃদ্ধ ভিখারীকে খুন করেছে। সাক্ষীদের কথাও সত্য বলে' সে মেনে নিয়েছে—এরপর তার আর কোন কথা শুনবার আবশ্যক কোর্টের আছে বলে' আমার মনে হয় না। এই মোকর্দ্দমা শেষ করে' ফেলে সোখা-ভাঙ্গা 'গ্যাঙ্ কেস্'টা হাতে নিলে হয় না?"

জজ-সাহেব ইঙ্গিতে উকিল-সরকারকে বসিতে বলিলেন এবং পেশকারবাবুকে পড়িয়া যাইবার হুকুম দিলেন।

—"আমার নাম সত্যবিকাশ বসু। এই জেলারই কোনো একটা অখ্যাত পল্লীতে আমার জন্ম। আমার গ্রামের নাম এবং পিতৃ-পরিচয় আমি গোপন রাখতে চাই; কারণ, এই মামলার সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

"আমার বয়স যখন পাঁচ, আর আমার ছোট বোনের বয়স তিন বছর, সেই সময়ে আমার মা মারা যান। দূরসম্পর্কের এক পিসী আমাদের মানুষ করেন। আমাদের দুই ভাই-বোনের মুখ চেয়ে বাবা আর বিবাহ করেন নি। বিয়ে করবার মত অবস্থাও তাঁর ছিল না—মনেরও নয়, সংসারেরও নয়। গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে মহকুমার কোর্টে তিনি সামান্য বেতনের চাকুরী করতেন। আমাদের পৈতৃক আমলের জমিজমা যা' কিছু ছিল, তা' আমার মায়ের চিকিৎসার জন্যে বিক্রী হয়ে যায়। রোজ আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে তিনি বাড়ী থেকে মহকুমায় যাতায়াত করতেন। অভাব-অভিযোগ ও মনোকষ্টে তাঁর স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর মনে একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি ভাল করে' লেখা পড়া শিখে জেলার সদরে একজন বড় উকিল হই। পাশের গ্রামের হাই স্কুলের সেক্রেটারির হাতে পায়ে ধরে আমাকে তিনি স্কুলে 'ফ্রী' করে' দেন। তখন আমার বয়স অল্প হ'লেও দারিদ্র্য আমাকে অভিজ্ঞ করে' তুলেছিল। বাবার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি বিশেষ যত্ন করেই লেখাপড়া শিখ্‌তে লাগলাম।

"আমার বোন্‌টী ছিল পরমাসুন্দরী। শৈশবের

মায়ের মতই সে সুন্দর হয়েছিল ; তার উপর, বড় কুলীন বলেও সমাজে আমাদের খ্যাতি ছিল। আমার ভগ্নীপতিরা সামাজিক-মর্য্যাদায় আমাদের চেয়ে নীচু ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থ তাঁদের যথেষ্ট ছিল। বিবাহের পর শীলা সেই যে শ্বশুরঘর করতে গেল, তারপর আর একবারও সে আমার বাবার পর্ণকুটীরে আসে নি। গরীবের ঘরে বৌ পাঠাতে তার শ্বশুর-শাশুড়ী কিছুতেই রাজী হলেন না। বাবার মন এতে একেবারে ভেঙে গেল। আমার মায়ের শোক আবার নতুন হয়ে তাঁর মনের মধ্যে দেখা দিল। মনে পড়ে, আমিও কতবার বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ধনী কুটুম্বের বাড়ী থেকে নিতান্ত অনাত্মীয়ের মত সম্ভাষণ পেয়ে ফিরে এসেছি।

"যে পিসীমা আমাদের সংসার দেখ্‌ছিলেন, তাঁর স্বামীর এক ভাগিনেয় এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। এলাহাবাদে তিনি কি একটা কাজ পেয়েছিলেন। তরুণী স্ত্রীকে আগলাতে ও ঝি-এর কাজ করবার জন্যে তাঁর একটী লোকের দরকার ; তাই খুঁজে খুঁজে এই মামীটিকে আবিষ্কার করে' ফেললেন। প্রয়াগবাসের লোভে বুড়ীও অক্লেশে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে' গেলেন।

"এখন থেকে রান্নাবান্না হ'তে সুরু করে' সংসারের সমস্ত কাজ বাবার ঘাড়ে গিয়ে চাপলো। আমিও অনেক সময় তাঁকে সাহায্য করতে চাইতাম্, কিন্তু আমার পড়ার ক্ষতি হবে বলে' তিনি আমাকে কিছুই করতে দিতেন না।

"এইভাবে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে ম্যাট্রি-কিউলেশন্ পাশ করলাম। পাশের খবর যেদিন বেরুলো, সেদিন বাবার চোখে জল দেখে আমারও চোখ সজল হয়ে উঠ্‌লো।

"বাবার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমার আর পড়বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছার কথা স্মরণ করে' আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। আমাদের পাশের গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক কোল্‌কাতায় চাকুরি করেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর তিনি তাঁর বাসায় আমাকে একটু-খানি থাকবার জায়গা দিতে রাজী হলেন। আমি বিদ্যাসাগর কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হলাম। বাবা যে কী করে' আমার কলেজের মাইনে ও হোটেলের খরচা মাসে মাসে জোগাতেন, তা' আমি বুঝতে পারতাম না।

"এমনি করে' আরও দু'বছর কেটে গেল। আমি খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে আই-এ পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার ফল বের হ'লে দেখা গেল,—আমি কুড়িটাকা বৃত্তি পেয়েছি।

"আমাদের পল্লীর আশে-পাশে ভাল ছেলে বলে' আমার নাম খুব রটে গেল। ফলে, তখন থেকেই দু'-চারজন ঘটক আমাদের পর্ণকুটীরে যাতায়াত সুরু করে' দিল। বাবার একক নিঃসঙ্গ জীবনের কথা স্মরণ করে' আমার মনও অত্যন্ত নরম হয়ে পড়লো ; সুতরাং, তিনি বিবাহের প্রস্তাব যখন আমার কাছে করলেন, আমি কোনো প্রতিবাদ না করে' চুপ করে' রইলাম।

"দু'-চারজন পয়সাওয়ালা লোকের ঘর থেকেও সম্বন্ধ এসেছিল ; কিন্তু আমার ভগ্নীপতিদের ব্যবহার স্মরণ করে' বাবা সবিনয়ে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করলেন। পিতৃ-মাতৃহীনা ও মাতুলের সংসারে অযত্নে প্রতিপালিতা এক দরিদ্র-কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে তিনি তাঁর শূন্য ঘর পূর্ণ করলেন।

"বিয়ের পর থেকে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় সুরু হলো। তরুণী পত্নীর প্রেমে আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌লাম—আমার মনে হ'ত এই কিশোরী বালিকার

সঙ্গলাভের জন্যই যেন আমি এতদিন ধরে' কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলাম।

"আমার স্ত্রীর সেবা যত্নে বাবা আমার বোনের দুঃখ অনেকটা ভুলে গিয়েছিলেন; মায়ের শোকও বোধ হয় অনেকটা সামলে নিয়েছিলেন। আমার ঘন ঘন বাড়ীতে আসার জন্য তিনি মুখে কোনো অনুযোগ করতেন না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে পড়াশুনার কথা মনে করিয়ে দিতেও তাঁর ভুল হ'ত না!

"এই সময়ে আমার একটী উপসর্গ জুটলো —সেটী কবিতা রোগ। একদিন একখানা মাসিক-পত্রিকা থেকে একটী ভালবাসার কবিতা রমলাকে পড়ে' শোনাচ্ছিলাম। মুগ্ধচিত্তে কবিতাটী শুনে সে আমার মুখের উপর তাঁর আয়ত চোখ দু'টী রেখে বললে—'তুমি এমন ভালো কবিতা লিখতে পার না?"

"আমি হেসে উত্তর দিলাম—'এর চেয়ে ঢের ভালো কবিতা আমি লিখতে পারি।'

"রমলা আমার হাতখানাকে তার কোমল হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে' বললে—'তা' হ'লে লিখো, লক্ষ্মীটি! আমি সকলকে দেখাবো।'

"সেই থেকে এই নূতন ব্যাধির উৎপত্তি। প্রথম প্রথম কবিতা লিখতে ভারী কষ্ট হ'ত। শেষে যা' হোক্ কিছু অভ্যাস হয়ে এলো।

"কবিতা আর বনিতা এই দুয়ের আকর্ষণে পড়ে', পাঠ্যপুস্তকের দিন দিন দুর্দ্দশা ঘটতে লাগলো। যাদের সঙ্গে এক সময় ছিল আমার অবিচ্ছেদ্য সাহচর্য্য, ক্রমে ক্রমে তারা দূর হ'তে দূরতর, দূরতম হয়ে উঠ্‌লো।

"বি-এ পরীক্ষার ফল যখন বের হ'ল, পাশের তালিকায় আমার নাম আর দেখা গেল না। লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়লাম। দুঃখে চোখ ফেটে জল এলো! আমি যেন সকলের দয়ার পাত্র। যে দেখে সেই সান্ত্বনা দেয়, এবার ভালভাবে পাশ হবে। রমলার চিঠিতেও ঐ কথা, বাবার চিঠিতেও তাই।

"আশায় বুক বেঁধে আবার পড়তে সুরু করলাম; কিন্তু সে উৎসাহ আর আমার ছিল না। ইতিমধ্যে বাবার পত্রে একদিন সংবাদ পেলাম, আমার একটী পুত্র হয়েছে। এই খবরে আনন্দের চেয়ে বিষাদ-ই হয়েছিল আমার বেশী। আমার এক পয়সা উপার্জ্জন নেই, বুড়ো বাপের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পয়সায় আমি একবার বি-এ ফেল করে' আবার পড়ছি, অথচ, এরই মধ্যে সংসারের ভার আমার ঘাড়ে ষোলআনা এসে চেপেছে। আমি শুধু স্বামী নই, আমি এখন সন্তানেরও পিতা।

"হয় ত এভাবেই আমার দিন একরকম ক'রে চলে' যেত—হয় ত সেবারে আমি ভালভাবেই পাশ করতে পারতাম—কিন্তু অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ। আমার পরীক্ষার একমাস আগে হঠাৎ আমার পিতার মৃত্যু হ'ল। আমি বুঝলাম, আশাভঙ্গ হওয়াতেই তাঁর মরণ এত শীঘ্র এগিয়ে এসেছে। কোনোরকমে তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে' আমি দেখ্‌লাম পড়াশুনা আমার পক্ষে এখন স্বপ্নের কল্পনা। সামান্য চাকুরির উপর নির্ভর করে' বাবা কোনোরকমে দিন কাটিয়ে গেছেন; একটী পয়সাও সঞ্চয় করে' যেতে পারেন নি। আমার নিজের, স্ত্রীর ও শিশুপুত্রের ভরণপোষণের জন্য তখনই সদ্য সদ্য আমার অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন। পাশের বাড়ীর ঠান্‌দি'কে অনেক বলে'-কয়ে রমলাদের দেখবার ভার তাঁর উপর দিয়ে, আবার কোল্‌কাতার দিকে রওনা হলাম—নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে, অর্থোপার্জ্জনের আশায়।

"পাঠ্যপুস্তকগুলি বিক্রী করে' যা' কিছু পেলাম, তাই থেকে একবেলা করে' হোটেলে

খেয়ে কোল্‌কাতার অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে লাগলাম একটা চাকুরির আশায়। কিন্তু যেখানেই যাই, শুনি,—'নো ভেকেন্সি।'

"তখন মানুষের ওপর আমার অশ্রদ্ধা এসে গেল। ক্রমে ক্রমে আমি ঈশ্বরয়ের উপরও বিশ্বাস হারালাম। মাঝে মাঝে রমলার চিঠি পেতে লাগলাম—'টাকা না হ'লে আর চলে না, পাড়ায় ধার করতে কারও কাছে বাকী নেই, তার ত একখানা গয়নাও নেই যে, তাই বাঁধা দিয়ে বা বিক্রী করে' সংসার চালাবে। খোকাটা ক্রমাগতই অসুখে ভুগ্‌ছে, একফোঁটা ওষুধ তার পেটে পড়ছে না, ঠিকভাবে পথ্যও জুট্‌ছে না। তার নিজের শরীরও খুব খারাপ, ইত্যাদি।

"প্রথম প্রথম পত্রের উত্তর দিতাম, আশা দিতাম, শীগ্‌গিরই টাকা পাঠাবো—কিন্তু টাকা কোথায়? নিজের একবেলা খাবারও আর জোটে না। শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে। মনে হ'ত, চুরি করি, ডাকাতের দলে গিয়ে মিশি, ছুরি মেরে লোকের টাকা-কড়ি কেড়ে নিই—কিন্তু সাহসে কুলোত না; শরীরে সে সামর্থ্যও ছিল না।

"নানা রকম দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হ'ত না। এক-একদিন তন্দ্রার ঘোরে আশা-নিরাশার কত চিত্র আমার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌তো। এক-দিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। মনে হতে লাগলো,—আমার স্ত্রী-পুত্র হয় ত আর বেঁচে নেই। কোনোরকমে ভূতপূর্ব্ব বন্ধুর কাছ থেকে তিনটী টাকা ধার করে' দেশের দিকে রওনা হলাম।"

দম লওয়ার জন্য পেশকারবাবু একটুখানি থামিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর একটী দীর্ঘ হাই তুলিলেন ও তুড়ি দিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা, জবানবন্দী ত নয়, বেটা যেন মহাভারত রচনা করেছে! আর কতটা আছে মশায়? একবার বাইরে থেকে না হয় ঘুরে আসি।"

পেশকারবাবু চশমাটীকে কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন—"আর বেশী নেই, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।"

—"ষ্টেশন থেকে গ্রামে যাওয়ার পথে দুই-চারজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমার অবস্থা দেখেই তারা বুঝলে যে, কাজকর্ম্ম কিছুই জোটে নি। তাদের মধ্যে একজনের কাছে বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করাতে সে একটু-খানি দুঃখ জানিয়ে বল্‌লে,—'স্ত্রী-পুত্র বেঁচে আছে বটে, কিন্তু উপায়ন্তর না দেখে আমার স্ত্রী ও পাড়ার দত্তদের বাড়ীতে রাঁধুনির কাজ নিয়েছে—নইলে ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়েই মারা যেত।'

"লোকটা তার পথে চলে' গেল। আমি আর একপাও এগুতে পারলাম না। আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্‌ করতে লাগলো। মনে ভাবলাম, আমি এমনই অপদার্থ যে, লেখাপড়া শিখেও স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই! আমি কোন্‌মুখে গ্রামে গিয়ে ঢুকবো! লোকে এখনই আমায় শত ধিক্কার দেবে—তা'তে আমার স্ত্রীর মর্ম্মবেদনা শতগুণে বাড়বে বই কিছুই কমবে না। পেটের দায়ে, দু'মুঠো অন্নের জন্যে, আমার সন্তানকে অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমার প্রেমময়ী পত্নী পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করছে, আর আমি··· তার চেয়ে আজ যদি আমার মরণ হয়, তবু পল্লীর লোক আমার হতভাগিনী পত্নীকে অনাথা বিধবা বলে' সহানুভূতি দেখাবে, পিতৃহীন শিশু গ্রাম-বাসীদের দয়ায় হয় ত একদিন মানুষ হয়ে উঠ্‌বে।

"মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে

এই শহরে এলাম। দুরদৃষ্ট আমার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছে কি না, তাই তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েও, কোথাও কিছু জুটলো না।

"এইবার শনিবারের রাতের কথা বলি—

"রাত্রি তখন প্রায় বারটা। অন্যমনস্কের মত পথ দিয়ে চলেছি। কোথায় চলেছি, তা' জানি না। হঠাৎ দেখি, একটা বাড়ীতে মহা-সমারোহ! ভেতর থেকে নাচ-গানের সুর ভেসে আসছে; মাঝে মাঝে স্ফূর্ত্তির হর্‌রা শোনা যাচ্ছে। মন অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো; ভাবলাম,—এরা ত বেশ সুখে আছে; আর আমার স্ত্রী দু'টি উদরান্নের জন্য পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করছে! ধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ঈশ্বরও নেই!

"মনে পড়লো, রাত্রি আড়াইটার সময় কোল্‌কাতার একটা ট্রেণ এখানে এসে পৌঁছোয়। যাই, শহরে আসবার পথে মাঠের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে থাকি। যদি সুযোগ পাই,—কারও-না-কারও গলা টিপে ধরবো, তার কাছে যা' আছে তা' কেড়ে নোব। ধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ঈশ্বরও নেই!

"ঝাউতলার ঘাটের কাছাকাছি যেতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ আমার কাণে ভেসে এল। চেয়ে দেখি পথের পাশে বটগাছতলায় একটা বৃদ্ধ ভিখারী রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। কাছে এগিয়ে দেখি,—কী বীভৎস, কী কুৎসিৎ মূর্ত্তি তার! গলিত কুষ্ঠরোগে হাত-পায়ের আঙুলগুলো খসে' পড়ে' গেছে—গায়ে যেখানে সেখানে দগদগে ঘা—একটা চোখ যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে—মুখের পাশ দিয়ে লালা ঝরে' পড়ছে!

"প্রথমটা শিউরে উঠ্‌লাম। তারপর ভাবলাম, সেও ত আমারই মত এক হতভাগ্য! কে জানে, একদিন হয় ত সেও কত স্বপ্নের জাল বুনেছিল! পৃথিবীকে কত সুন্দর, কত আপন বলে' মনে করেছিল! কিন্তু এক মুঠো অন্নের জন্য হয় ত চিরকাল পরের দয়ার উপর নির্ভর করে' এসেছে! এই পথের পাশ দিয়ে কত লোক কত দ্রব্য-সম্ভার বহন করে' নিয়ে গেছে, কত উৎসবের শোভাযাত্রা বাদ্যভাণ্ড নিয়ে রাজপথকে কোলাহল-মুখরিত করে' চলে গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ ভিখারিণীর দিকে কেউ হয় ত একবারও ফিরে চায় নি! তাদের বিপুল অপব্যয়ের এককণা পেলেও যে একটা মানুষের প্রাণ রক্ষা হয়, সে কথা হয় ত কেউই ভাবে নি!

"মুমূর্ষু বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আপন-মনে বললাম —'বন্ধু,জগৎ তোমাকে চায় না—এর উৎসব-সভায় তোমার আসন নেই। বাঁচবার প্রয়োজন তোমার কিছুমাত্র ছিল না—কিন্তু এতদিন ধরে' যে এই বীভৎসতা নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে, তার জন্যে পৃথিবী তোমায় শুধু অভিশাপ দিয়েছে! আমি তোমার ব্যথার ব্যথী—তোমার এ মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখা আমার পক্ষে অসহ্য! হে আমার পরম সুহৃৎ, তোমার কষ্টের লাঘব আমি করে' দিচ্ছি! তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করে' যাও,—আর যেন মানুষ হয়ে এসে এ পৃথিবীতে না জন্মাই! এখানে ধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ঈশ্বরও নেই!

"শুষ্ক শীর্ণ করতলের কঠিন পেষণে ধীরে ধীরে মৃত্যু-পথযাত্রীর চোখ দু'টী উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো —জিবটা বাইরের দিকে ঝুলে পড়লো—কণ্ঠের ঘড়ঘড় শব্দ স্তব্ধ হয়ে অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ডুবে গেল!

"তারপর প্রায় পনেরো মিনিট কাল স্তব্ধ হয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে আমার চেতনা ফিরে এল। এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে দুর্ব্বলতা দেখা দিল,—এ কী করেছি আমি? রোগ-যন্ত্রণায় কাতর জরাতুর বৃদ্ধকে গলা টিপে হত্যা করেছি! কী করে' আমি পশুর চেয়েও এত অধম হয়ে পড়লাম! পরক্ষণেই

মনে হ'ল,—ধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ঈশ্বরও নেই!

ভাবলাম, রোগাতুর কুৎসিৎ দেহটার মধ্য থেকে প্রাণটাকে যখন মুক্ত করে' দিয়েছি, তখন দেহটাকেই বা এখানে ফেলে যাই কেন? শেয়াল-কুকুরে টানাটানি করে' ছিঁড়ে খাবে—সে ভারী বীভৎস দেখাবে! হয় ত কাল সকালে পথ চল্‌তি লোক এই চির-অভিশপ্ত হতভাগ্যকে আবার নতুন করে' অভিশাপ দেবে। তার চেয়ে বরং গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিই; লোকটার হয় ত একটা সদ্গতিও হয়ে যেতে পারে।

"এরপরের ঘটনা লেখা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। সাক্ষীদের মুখ থেকেই তা' আপনারা শুনেছেন। শুধু এই কথাটা আমি বলতে চাই,—অর্থের লোভে এই বৃদ্ধকে আমি হত্যা করি নি। তার আসন্ন ও কষ্টদায়ক মৃত্যুকে শুধু দয়াপরবশ হয়ে সরল করে' দিয়েছিলাম।

"আর শেষ কথাটা এই,—আমার গ্রেফ্‌তার না করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না; কারণ, নর-হত্যার যে চরম দণ্ড আইনে দিতে পারে, তা' আমি স্বেচ্ছায়ই গ্রহণ করতাম। বৃদ্ধ ভিখারীর মৃতদেহকে আঁকড়ে ধরে' গঙ্গায় এমন ডুব দিতাম যে, আর সেখান থেকে উঠ্‌তাম না! হয় ত পরদিন লোকে দেখতে পেত, সমদুঃখভাগী আমরা দুই বন্ধু পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে ঢেউয়ের সাথে সাথে নেচে বেড়াচ্ছি!"

পেশকারবাবুর পড়া শেষ হইলে চারিদিকে একটা অস্ফুট ধ্বনি ফুটিয়া উঠিল। প্রহরীরা হাঁকিল,—"চুপ, চুপ!"

জুরীদিগের দিকে চাহিয়া জজ-সাহেব বলিলেন—"এ মামলায় আর কোন বিবৃতি আবশ্যক বলে' আমার মনে হয় না। আপনাদের কি মত তা' বলুন হয়।

কিছুক্ষণের জন্য জুরীগণ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উঠিয়া গেলেন। জজ-সাহেব গম্ভীর-মুখে বর্ণনা পত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। আসামী অধীর আগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় কুড়িমিনিট বাদে জুরারগণ ফিরিয়া আসিলেন। 'ফোর্‌ম্যান' বলিলেন—"এই আসামী যে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই। মুমূর্ষুকে হত্যা করা, আর সুস্থ সবল ব্যক্তিকে হত্যা করা আইনের চক্ষে তুল্য অপরাধ। নরহত্যার চরম শাস্তি প্রাণদণ্ড। সেই দণ্ডই আইনতঃ এই অপরাধীর প্রাপ্য। কিন্তু এর জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনা এবং হত্যাকালীন মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে' আমরা আসামীর প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরই সমীচীন বলে' মনে করি।"

জজ-সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন,—"মাননীয় জুরারগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমিও ঠিক্ সেই মত পোষণ করি। সুতরাং, এই আসামীকে আমি নরহত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিলাম।"

হুকুম দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জজ-সাহেব ও জুরারগণ উঠিয়া পড়িলেন। দর্শকেরাও নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে এজলাস্-গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

কাঠগড়ার ভিতর অপরাধী তখন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমি বাঁচতে চাই না,—আমার প্রাণদণ্ড দিন্—আমার ফাঁসির হুকুম দিন্! বাঁচা এখন আমার পক্ষে চরম অভিশাপ—মৃত্যুই আমার পরম সুহৃৎ—আমার প্রাণদণ্ড দিন জজ-সাহেব!"

বাহিরের কলকোলাহলে আসামীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

ছন্দহারা

:শ্রীভুবনমোহন মিত্র

চোখে তার সজল মেঘের কাজল মায়া। বুকে তার সাহারার অসীম তৃষা। প্রীতি যেন নিষ্ঠুর বিধাতার গড়া একটা পরিহাস।

মায়ের গৌরীদানের ফল মাকেই পেতে হ'ল। বছর পেরুল না, সাধের জামাই হারিয়ে সেই যে তিনি শয্যা নিলেন, তা' থেকে আর তাঁকে উঠতে হ'ল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেউ এসে একটা মুখের কথা বলেও সান্ত্বনা দিলে না এই ভয়ে,—সর্বনেশে মেয়েটা যদি ঘাড়ে পড়ে যায়; বাবা, অমন অলক্ষীও হয়! বছর ঘুরল না গা!

মূর্ত্তিমতী করুণার মত সামনে এসে দাঁড়ালো অপর্ণা। প্রীতি কেঁদে উঠলো—আমার কি হবে সই-মা!

সই-মা ছোট্ট একটা চড় মেরে বল্লেন, পাগল মেয়ে, কাঁদিস কেন, আমি ত রয়েছি ভয় কি তোর।

মৃত্যু শয্যাশায়িনী বুঝি এইটুকু শোনবার জন্যই বেঁচেছিলেন। আনন্দের অশ্রু তাঁর গণ্ড বেয়ে ঝরে' পড়ল। কথা বেরুল না, তিনি সইয়ের হাতে প্রীতির হাতটা তুলে দিয়ে সেই যে চোখ বুজ্‌লেন,তা' আর সহস্র চেষ্টায়ও খোলা গেল না।

সই-মার সংসার বলতে তিনি আর তাঁর একমাত্র ছেলে অলক। তাদের মধ্যে এসে প্রীতি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সমবয়সী সঙ্গী পেয়ে অলকও কম উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো না।

বছর ঘুরে চল্‌ল।

অলকের সঙ্গে প্রীতির খুব ভাব অলকের সমস্ত অত্যাচারই প্রীতি নীরবে সহ্য করে। অলকের নিত্য-নূতন ফরমাস—লাট্টু, গুলি, লজেন্সেস্। প্রীতির কাছে তার সব আব্দার যেন ভালও লাগে। তবু সে একদিন বল্‌লে—আচ্ছা অলক, তোর এ কি অনাছিষ্টি আব্দার, এত পয়সা আমি পাই কোত্থেকে বল্‌তো?

অলক শুন্‌লে না, বল্‌লে—নাঃ, তোর আবার পয়সা নেই, বাক্সে সেদিন যে দুটো টাকা দেখ্‌লেম্—ও কার শুনি?

প্রীতি হাস্‌লে। এ কথার ওপর ত আর তর্ক চলে না। তার জলখাবারের পয়সা জমিয়ে অলকের অত্যাচারের খোরাক জোগাতেই হবে যে তাকে।

এমনি করে' দিন যায়। অতর্কিতে যৌবনের আগমনী-গানে তার হৃদয় মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রীতি যেন কি চায়, পায় না। তার যেন কিসের অভাব। একটা কাঁটা মনের কোণে যেন সর্ব্বদাই খচ্‌খচ্ করে' বেঁধে—তরুণী প্রীতি,সুন্দরী প্রীতি!

সে যেন কী ভাবে—তরুণ অলক, সুন্দর অলক! প্রীতির সারা অন্তরে শিহরণ লাগে।

সেদিনের কথা। অপর্ণা চান করতে গেছেন। প্রীতি চেয়ে আছে শরতের নীল আকাশের দিকে, যেন সে কিসের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। সহসা কোথা থেকে অলক এসে বল্‌লে—প্রীতি, চার আনা পয়সা দে না ভাই।

প্রীতি চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। সরল সুন্দর মুখ; পাপের একটু ছায়াও সেখানে নেই।

সে যেন কি ভাবলে, তারপর একটু হেসে বল্‌লে—কেন বল্ ত ?

অলক বল্‌লে—শচীন, হরিশরা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুঁড়ি ওড়াচ্ছে, দে না ভাই।

প্রীতি হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, এই নে। অলকও হাত বাড়াল। প্রীতি চট্ করে' তার হাত ধরে' নিজের কাছে তাকে এগিয়ে এনে কানে কানে কী যেন বল্‌তে গেল।

অলক বল্‌লে—আঃ, ছাড়্ না, লাগে যে।

প্রীতির মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিয়ে একটা সিকি অলকের দিকে ফেলে দিলে। অলক আর দাঁড়াল না, যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি করে' ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রীতির বুকে কিসের ঝড় বয়ে চলেছে, সে তা' নিজেই বুঝ্‌তে পারলে না। অলককে তার এত ভাল লাগে কেন ? এ 'কেন'র উত্তর কে তাকে দেবে ?

অকারণে প্রীতির ভয় করতে লাগল, মনে হ'ল, যদি অলক সই-মার কাছে বলে' দেয় : তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। অলক তখন তার ঘুঁড়ির সঙ্গে আর একখানায় প্যাচ লাগাতে ব্যস্ত। প্রীতি অলককে ডাকলে —অলক !

সে ফিরে না চেয়েই বল্‌লে—যাবো না, যা' ; উঃ, যা' লাগিয়ে দিয়েছিস্ ! ওই যা, তোর সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সব গেল ! নইলে শস্তুর ঘুড়ি—

প্রীতির কি মনে হ'ল কে জানে ! ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জোর করে' অলককে টেনে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল ; বল্‌লে—আবার নতুন ঘুঁড়ি কিনে নিস্' খন। কোথা লেগেছে রে ?

অলক দেখিয়ে দিলে। প্রীতি আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে—সই-মাকে বলে' দিস নি, লক্ষীটি !

অলক যো পেয়ে হেসে বল্‌লে—আজ যদি লাটাই কেন্‌বার পয়সা দিস্, তা' হ'লে বল্‌বো না, নয় ত—

বাধা দিয়ে প্রীতি বল্‌লে—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই দেব !

অলক হাত পেতে বল্‌লে—কই দে।

প্রীতি উত্তর দিলে—বা রে, এখন কোত্থেকে দেবো !

অলক গম্ভীর-কণ্ঠে বললে—তা' আমি কি জানি।

প্রীতির বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে অলকের হাতে লাটাই কেনবার পয়সা দিয়ে সে কি বল্‌তে গেল, কিন্তু সে কথা শোনবার অবসর অলকের নেই, সে তখন লাটাই কেনবার সন্ধানে ছুটেছে।

সেদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য অলক খেতে বসেছে। কোথা থেকে প্রীতি এসে তার চুল ধরে' এক টান দিলে। অলক চেঁচিয়ে উঠল।

অর্পণা বল্‌লেন—আর তোদের নিয়ে পারি নে পিতু ! ছেলেটা খাচ্ছে, তাকেই বা তোর অমন করা কেন ? সব তাতে ছেলেমানুষী।

প্রীতি হেসে বললে—দেখ না, কেমন করে' খাচ্ছে।

অলক বলে' উঠলো—খাচ্ছে বই কি ; নিজের যেন সব ভাল। সেদিনের কথা কিন্তু বলে' দেবো, হ্যাঁ।

প্রীতির মুখ শুকিয়ে গেল। সই-মা প্রশ্ন করলেন—কি রে অলক ?

প্রীতি ইসারায় অলককে যেন কি বল্‌লে ; সে চুপ করে' গেল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়ল।

আড়ালে অলকের সঙ্গে দেখা হতেই প্রীতি অনুযোগ করল—আচ্ছা ছেলে তুই যা' হোক্।

অলক কিছু বুঝতে পারলে না।

প্রীতি হেসে বল্‌লে—হাঁ করে' দেখছিস্ কি বোকা কোথাকার! সই-মাকে বল্‌তে গেলি যে বড়?

অলক বল্‌লে—ও, তাই বল্। আমি ত অবাক্ হয়ে গেছলুম! তুই চুল ধরে' টানলি কেন?

প্রীতি বোঝাতে পারে না, কেন সে তার চুল ধরে' টেনেছিল। কতক্ষণ সে অলকের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অলক বল্‌ল —কাল সব ক'খানা ঘুঁড়ি ফটকে-টা কেটে দিয়েছে। আজ বাছাধনকে আর ঘুঁড়ি উড়ুতে হবে না। দে ত ওই জামার পকেট থেকে পয়সা বের করে'।

প্রীতি হেসে বল্‌ল—ওঃ, বড় মহাজন যে দেখছি! কোথায় পেলি?

অলক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উত্তর দিলে—বা রে, ওবেলা তুই-ই ত দিলি!

প্রীতি কিছু বল্‌লে না। তাই ত এত ভুলো হয়েছে সে! তার মনটা কেমন হয়ে গেল। কিন্তু এমন করে' আর কতদিন সে নিজেকে ঠকিয়ে পথ চলবে! সজল মেঘের উতল হাওয়ার স্পর্শ তার মনের দ্বারে আঘাত করতে লাগল। চোখ দুটো ভারি হয়ে এল। প্রীতির বাহিরের নারী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তার অন্তরের নারী যেন কিসের আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

কিশোরীর মনের দ্বন্দ্ব বোঝার ক্ষমতা তখন অলকের ছিল না। বাধা-বন্ধনহীন রঙিন প্রজাপতির মত তার সর্ব্বত্র সাবলীল অবাধ গতি। বিশ্বের কোন খবরই সে রাখে না।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। অলক আর এখন সে কিশোর নেই। তার দেহের দ্বারে যৌবন উঁকি দিয়েছে। এখন প্রীতির স্পর্শের মধ্যে সে যেন কিসের অস্পষ্ট আভাষ পায়।

সে কোল্‌কাতায় পড়তে যাবে। তার যাওয়ার দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। প্রীতির মনে যেন কিসের দোলা লাগল, হয় ত অলকেরও।

যাত্রার দিনে প্রীতি অলককে আড়ালে ডেকে এনে বললে—আবার কবে আসবে?

তাদের 'তুই' এখন 'তুমি'তে দাঁড়িয়েছে।

অলক যেন কি বল্‌তে গেল, পারলে না। আপনাকে সামলে নিয়ে খানিক পরে বললে—ছুটি হলেই।

প্রীতি সজল চক্ষু দু'টি তুলে ধরে' অলকের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে অলক যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

সই-মার বুকে তখন আনন্দের তুফান উঠেছে। বারবার তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়তে লাগল। মৃত্যুকালে একটি অনুরোধই শুধু তিনি স্ত্রীকে করে' গেছলেন—অলককে মানুষ কোরো। তাই ত পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথায় মায়ের সারা অন্তরটা টন্‌টন্ করে' উঠ্‌লেও পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তিনি মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করছিলেন।

প্রীতির চোখ কিন্তু বাধা মানে না। তার মনের বীনার প্রতি তারটি একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে' উঠ্‌ল। তার বুকে জাগল মেঘমল্লারের ব্যথার রেশ।

চোখের সামনে দিয়ে গাড়ী চলে' গেল। গাড়ীর খড়খড়ি দিয়ে অলক দেখলে প্রীতির কাজল-ঘন সজল চোখ দু'টি। ওই দু'টিতে বুঝি বিশ্বের সমস্ত রহস্য উতল হয়ে উঠেছে।

যতদূর দৃষ্টি যায় প্রীতি অলকের গাড়ীর দিকে চেয়ে রইল, তারপর মিলিয়ে গেলে সেই চলা পথের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দুটো টন্‌টন্ করে' উঠ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে সরে' এল। সহসা তার দৃষ্টি পড়ল অলকের রেখে যাওয়া জামাটার দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে জামাটার কাছে। অলকের হাতে রাখা জামা! কিসের আবেগে সে শিউরে উঠে সেখান থেকে সরে' এল।

সুদূর প্রসারি নীল আকাশের দিকে সে চেয়ে রইল। ক্রমে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকার জমা হয়ে উঠ্‌ল। তার কিছু ভাল লাগল না। বসন্তের পাগল হাওয়া তার মনের গোপন আগলে ঘা দিয়ে গেল। ফাগুনের রঙিন রাগে তার ব্যথার কুসুমে যেন রং ধরেছে!

সে আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, গভীর বেদনায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

অনেকদিন পরে শরতের এক স্নিগ্ধোজ্জল প্রভাতে অলক বাড়ী ফিরল। সকলে তাকে সাদরে বরণ করে' নিলে। প্রীতি দেখলে অলকের তরুণ মূর্ত্তি। তার সারা দেহে যেন ছন্দ নেচে চলেছে। অলক প্রীতিকে দেখলে যেন শরতের শিশির-সিক্ত শুভ্র শেফালী।

অর্পণা অলকের গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—বড় রোগা হয়ে গেছিস্ বাবা! আর কত দিন পড়বি?

অলক কিছু বললে না, শুধু হাসলে একটু। অলকের সঙ্গে প্রীতি আর পূর্ব্বেকার মত মিশতে পারলে না। সে যেন আপনা হ'তে দূরে দূরে সরে' যেতে লাগল।

অলকেরও মনে জাগল কোন্ সে অতীতের সবুজ স্বপ্ন। সেদিন না বুঝ্‌লেও হয় ত আজ বুঝ্‌তে পেরেছে। প্রীতির সঙ্গে কথা বল্‌তে গেল, কিন্তু পার্‌লে না।

অলকের ছুটি ফুরিয়ে এল, সে আবার চলে' গেল কোলকাতায়। প্রীতির নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনের মাঝে শুধু ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দিয়ে!

বছর চারেক পরের কথা। অলক এখন দেশে। তার মা আর নেই। মাত্র দু'টি প্রাণী। সে আর প্রীতি। প্রীতির মুখের দিকে চেয়ে সে কি দেখে। সুন্দরী প্রীতি, রহস্যময়ী প্রীতি!

কারণে-অকারণে প্রীতিও আলোকের মুখের দিকে চায়, তার মন যেন সন্দেহের দোদুল্ দোলায় দুলে ওঠে, সাদাকথায় জোর দিয়ে বলে—কি—ই।

তার বলার ভঙ্গীতে অলক চমকে ওঠে, কথা খুঁজে পায় না।

হয় ত প্রীতি তার চোখের ভাষা ধরতে পেরেছে—হয় ত পারে নি। সে মাথা নত করে' সামনে থেকে ঘরে চলে' যায়।

প্রীতির বুকে কিন্তু আর দোলা লাগল না; ক্ষণে ক্ষণে সে শিউরে উঠতে লাগল। এ সে কোথায় নেমে চলেছে! তাকে ত যৌবনের রঙিন নেশায় গা' ঢেলে দিলে চলবে না। সে যে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে বাঙালীর মেয়ে হয়ে।—ও কল্পনাটাও যে তাকে নরকগামী করবে। প্রাণপণে সে অস্পষ্ট স্মৃতিকে সুস্পষ্ট করে' তুলতে চাইলে। কবে কোন্ শুভলগ্নে তার জীবনে এসেছিল,—অনাহুত এক অতিথি, কণ্ঠে ছিল তার ফুলের মালা, চোখে ছিল

অপরূপ ভঙ্গী, ওষ্ঠে ছিল অফুরন্ত আনন্দের উৎস! সেই চিন্তার মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইলে—কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল! মন্ত্র-মুখর রাত্রি, বিবাহ-বাসর, শ্বশুর-গৃহ, স্বামীর যত্ন, সব মুছে গিয়ে অলকের মুখ-খানিই বড় হয়ে উঠল। সে উন্মত্তের মত চারি-ধারে ছুটাছুটি করে' বেড়াতে লাগল।

আম্রমুকুলের গন্ধ বয়ে এনে বাতাস সাড়া দিয়ে গেল বসন্ত এসেছে বলে। অলক সেদিন আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না। প্রীতি কি একটা কাজে ঘরে আসতেই তার লুকনো পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—প্রীতিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সে চুম্বনে চুম্বনে তাকে আচ্ছন্ন করে' তুললে।

যে স্পর্শের কল্পনা একদিন প্রীতিকে উন্মাদ করেছিল, আজ তাই তাকে বিদ্রোহী করে' তুললে। সজোরে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে শরাহত হরিণীর মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সই-মার সজল-চোখ দু'টি যেন তার চারপাশে ঘুরছে।

তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কামনা লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বউ, হীরার টুক্‌রার মত বংশধর! না, না, কোন কিছুর বিনিময়েই সে তাকে অপমান করতে পারে না!

তরুণ সূর্য্যের অরুণ আভা আকাশের গায়ে রং ধরিয়েছিল। তখনও ধরার বুকে কোলাহল জেগে ওঠে নি। অলকের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধীরে ধীরে সে প্রীতির ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলা। উঁকি মেরে দেখলে, প্রীতি নেই। সে ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর একটা চিঠি দেখতে পেলে। তার সারা মনে যেন বেদনার ঘন কালো ছায়া জমা হয়েউঠ্‌ল। প্রীতি চলে' গেছে তার কোন্ আত্মীয়ের বাড়ী। অলক এ পর্য্যন্ত কখনও শোনে নি যে, প্রীতির আত্মীয় বলে' কোন জীব জগতে আজও বিদ্যমান। স্খলিত পদে নিজের ঘরে এসে সে প্রীতির হাতের সাজান সমস্ত জিনিষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। প্রীতি কেন গেল, তা' সে অনেক চেষ্টা করেও বুঝে উঠ্‌তে পারলে না। তার সারা অন্তর হাহাকারে ভরে' উঠল। না পেয়ে হারাণোর চেয়ে পেয়ে হারা-ণোর বেদনায় যে কত জ্বালা, তা' আর কেউ না বুঝুক, অলক কিন্তু তা' রক্তে রক্তে অনুভব করতে লাগল! চোখের সামনে ভেসে উঠল তার কৈশোরের রঙিন স্বপ্ন! মিথ্যা? তাই বা সে কি করে' বলবে?

সংসারের সুকঠিন চাপে অলক আজ ভারা-ক্রান্ত; স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

ডাক্তারী ফেল করে' কোথাও কাজ না পেয়ে সে এখন বাড়ীতেই ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে বসেছে। গ্রামের ডিস্‌পেন্‌সারি। উপায় হয় না তেমন।

স্ত্রী মীরা খন্‌খনে গলায় বল্‌লে—কাল যে চাল বাড়ন্ত বল্লুম, তা' কি মনে নেই? এখন এত-গুলোর পিণ্ডি জোগাই কোত্থেকে বল ত?

অলক সেই সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌লে—কাল বল্‌লে কারও মনে থাকে না কি? আজ বল্‌তে কি হয়েছিল?

মীরা উত্তর দিলে—যে এত লেখাপড়া মনে করে' রাখ্‌তে পারে, তার আর সংসারে সামান্য কি দরকার মনে থাকে না? ওঃ, ভারি বিদ্বান!

ছেলে-মেয়েরা বায়না ধর্‌লে—বাবা, খাবার এনে দাও, খিদে পেয়েছে!

অলক অধৈর্য্য হয়ে তখন তাদের গালে চড়

মেয়ে বস্‌ল। মীরা দারুণ রাগে ফুল্‌তে লাগল। খানিক পরে সে বল্‌লে—আর পারি না—খেটে খেটে গা-গতর কালি হয়ে গেল! নাও ওঠো, এবার চান করে' পিণ্ডি গিলে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করো।

অলক চান করতে চলে' গেল। সন্ধ্যার সময় অলক এসে বল্‌লে—একটু চা তৈরি করে' দেবে গা?

মীরা ধম্‌কে উঠ্‌ল—চা করে' দেবে গা! আদর দেখে অঙ্গ যেন জ্বলে যায়! শুধু দাসীবৃত্তি করতেই আছি আর কি! যার এক পয়সা আন্‌বার মুরোদ নেই, তার আবার চা খাওয়ার সখ কেন?

অলক বল্‌লে—না এনে দিলে সংসার চলে কি করে' শুনি?

মীরা বলে—আন বই কি, যে উপায়ের ছিরি—এবার আমার জন্যে কোটা বালাখানা বানিয়ে দেবে দেখছি!

অলোক বল্‌লে—সারাদিন পেটের ধান্দায় জান্ হায়রাণ, উনি এলেন কথা শোনাতে।

মীরা অলকের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্‌লে—ওরে আমার কম্মিষ্ঠি রে! শুধু আমাদের পেটের ধান্দায় বুঝি ঘোরো; আহা, তুমি যেন একেবারে নিখাকি!

অলক আর কিছু না বলে' রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সেখান থেকে চলে' এসে বিছানার 'ওপর দেহটাকে লুটিয়ে দিলে। বিষম ক্লান্তিতে তার মন তখন অবসন্ন হয়ে উঠেছিল।

অর্দ্ধেক রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরের দিকে সে চেয়ে দেখলে, চারিদিকে শুভ্র জ্যোৎস্নার ফিনিক ছুটেছে। মীরার জ্যোৎস্না-স্নাত মুখের দিকে চাইতে তার বুক খানাকে তোলপাড় করে' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে বাইরের হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

কথা মনে পড়ল। কিসের বেদনায় তার সারা অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তারপর চোখে নেমে এল বিস্মৃতির ঘন-কাল নিবিড় ছায়া! ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে এল. চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

একদিন সে মীরাকে ধরে' বসল—কিছু টাকা দেবে?

মীরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—আমার কি টাকার গাছ আছে না কি? কেন, টাকা কি হবে শুনি?

অলক আম্‌তা'আম্‌তা করে' উত্তর দিলে—তা' হ'লে একবার কোল্‌কাতা গিয়ে কাজের সন্ধান দেখি। ওখানে আমার ছেলেবেলার অনেক বন্ধু আছে।

মীরা বল্‌লে—টাকা পাব কোথা?

অলকমাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে উত্তর দিলে—গয়না।

মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মীরা তার দিকে যেন তেড়ে এল।

তারপর অন্ধের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ারই মত একদিন অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেল। আনন্দে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অলক মীরার কাছে ছুটে এসে বল্‌লে, শুনেছ, শুনেছ মীরা, আমার চাকরী হয়েছে!

মীরা তার কথার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেল্‌লে, বললে—তা' আমি কি করব? নাচ্‌তে হবে না কি?

—না না, নাচ্‌বে কেন। সত্যি মীরা, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সেদিন 'হিত-বাদী' দেখে দরখাস্ত করে' দিয়েছিলুম; হবে ত জানিই, কাজেই কারুকে জানাই নি। আজ চিঠি এসেছে; তাঁরা আমায় মনোনীত করেছেন। মাইনে প্রথম দেড়শ', পরে আরও বাড়তে পারে।

মীরা স-বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, দেখি। তারপর চিঠিখানি পড়া হয়ে গেলে বল্‌লে, ভালই হয়েছে, কবে বেরুবে?

—আজই, কিন্তু এখন আর তোমাদের নিয়ে যাব না—এরপর একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই—

সে আমার জানা আছে। তোমাদের ভালবাসা মুসলমানের মুরগী পোষা বই ত নয়।

* * *

নির্দ্দিষ্ট দিনে অলক কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলে সকলেই তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। অত আদর-অভ্যর্থনায় নিজেই সে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল।

একজনের কাছে শুন্‌লে, হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাত্রী এখনও এসে পৌছন নি। তিনি কোলকাতায় থাকেন; একটু পরে যে গাড়ী আসবে, তাতেই আসবেন। তাকে আন্‌তে ষ্টেশনে গাড়ী গেছে।

ট্রেণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গাড়োয়ান শূন্য গাড়ী নিয়ে ফিরে এল। খবর যা' দিলে, তা' যেমনই অশুভ, তেমনই আশঙ্কাজনক।

মাইলটাক আগেই ট্রেণ আউট্ লাইন হয়েছে। গাড়ী কখন এসে পৌছুবে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। ক'খানা গাড়ী না কি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

কুৎসিত মৃত্যু-বিভীষিকায় সমস্ত স্থানটা যেন স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। সকলেই ব্যাকুল আগ্রহে উন্মত্তের মত ছুটে চল্‌ল—সর্ব্বনাশ, ওই গাড়ীতে যে মা আছেন! তাদের সঙ্গে সঙ্গে অলকও যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে চল্‌ল।

নির্জ্জীবের মত অলক এগিয়ে গিয়ে এক-জনের মুখে শুন্‌লে এখনই গাড়ী চল্‌বে। দু'-একজন আহত হয়েছে বটে, একটী প্রৌঢ়া ছাড়া কেউ মারা যায় নি। ওই ওদিকে তার লাশ চাপা দেওয়া রয়েছে—দেখ্‌বেন না কি, আপনাদের কেউ হয় কি না।

ধীরে ধীরে অলক এগিয়ে গিয়ে দেখলে—কার ঢাকা দেওয়া ক্ষতবিক্ষত বিকৃত দেহ; শুধু মুখখানির ওপর কোন আঘাত দিতে নিষ্ঠুর ট্রেণখানারও বোধ হয় দয়া হয়েছিল। সকলে চীৎকার করে' কেঁদে উঠল—এই যে আমাদের মা!

অলকের বোধ হ'ল যেন চেনাচেনা মুখ! স্মৃতির অতল-তল হাতড়াতে হাতড়াতে তার মনে হ'ল,—এ যে প্রীতি। যৌবনের রঙিন স্বপ্নের রাণী তার!

একজন পিছন থেকে বল্‌লে—ও বাবা, ওকে আর জানি না, ও যে মনিয়া বাইজী।

অপর একজন অলককে প্রশ্ন করলে—ওকে চেনেন না কি? মুখে তার কিসের হাসি।

অলক কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে' মৃতদেহের আরও সন্নিকটে এগিয়ে গেল। সেই সুন্দর দেহ,—যে দেহে একদিন নীল সাগরের উতাল ঢেউ ফেনিল উচ্ছ্বাসে বয়ে যেত! সেই রহস্যময়ী নীলাব্জ নয়ন—ওই চোখ দুটিতে না জানি একদিন কত আলো-ছায়ার সৃষ্টিই হ'ত! বিশ্বের কত রহস্যই না তার মধ্যে লুকানো থাক্‌তো! অলকের মনে পড়ল,—সেই কৈশোরের কথা, যৌবনের কথা···কোন সুদূর হ'তে এক টুকরা স্মৃতি আজ ভেসে ওঠে তার সারা দেহ মনে, প্রতি অবয়বে! আর মনে পড়ে প্রীতির সেই বিদায়-দিনের নীরব বাণী! সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রীতির মুখের দিকে চেয়ে সে কি খুঁজতে লাগল। আজ আর তার চোখে জল আসে না—তার বুকে অশ্রুর পাথার জমাট বেঁধে গেছে যেন।

দাদামহাশয়

শ্রীবিমল সেন, বি-এস-সি

দাদামহাশয়ের নিকট হইতে জরুরি তলব আসিয়াছে—সকালেই অবশ্য যেন গিয়া দেখা করি। তাই, জামাটা গায়ে দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

একটা গল্প সদ্য শেষ করিয়াছি, সেটা সঙ্গে লইলাম; কারণ, দাদামহাশয়ের কড়া হুকুম আছে,—কোন গল্প লিখিয়া কোথাও পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন দেখাইয়া লওয়া হয়।

তাঁহাদের বাড়ীর বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলাম, তিনি তক্তাপোষের উপর কাৎ হইয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। মুখে যেন চিন্তার ছাপ।

ব্যাপারটা একটু নূতন। দাদামহাশয়কে কখনও চিন্তিত দেখি নাই। তাঁহার শান্ত, সৌম্য, সদাহাস্যময় মুখ সব সময়েই আমাকে আনন্দ দিয়াছে।

রসিক পুরুষ; ছেলে-ছোকরাদের সহিত হাসি-তামাসা লইয়াই আছেন। গ্রামের সকলেরই তিনি দাদামহাশয় হন। কিন্তু আমার প্রতিই তাঁহার স্নেহটা একটু বেশী। আমার সাহিত্য-চর্চ্চায় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। আবার কোন লেখা পছন্দসই না হইলে সেটার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেও ছাড়েন না।

ঘরে গিয়া দাঁড়াইতে, গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন—এসো। এতক্ষণে সময় হ'ল বাবুর?

হাতের কাগজখানা নজরে পড়িয়াছিল। বসিতে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—হাতে ওটা কি?

বলিলাম—একটা গল্প। কাল রাত্তিরে শেষ করেছি। আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলুম।

—কিসের গল্প? সেবারে ত 'মৃত্যু-মিলন' লিখেছিলি। এটার কি নাম দিলি—'বেহেস্তের প্রেম?'

হাসিয়া বলিলাম—না, দাদামশায়, বেহেস্তের প্রেম-ট্রেম নয়। এবার সাদাসিধে আমাদের পৃথিবীর প্রেম নিয়েই লিখেছি।

দাদামহাশয় কাৎ হইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লইয়া যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—পৃথিবীর প্রেম, মানে—পরের বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি, আর চুমো খাওয়া ত? ফের আবার ঐ সব গল্প লিখেছিস্? 'মৃত্যু-মিলন' ফিরে এল, তা'তেও লজ্জা নেই?

বুঝিলাম, দাদামহাশয়ের কথার 'তুবড়ি' এবার ছুটিতে আরম্ভ হইবে। বলিলাম—প্রেম ত লোকে পরের মেয়ের সঙ্গেই—

শেষ না করিতে দিয়াই, তিনি মুখ-হাত নাড়িয়া বলিলেন—সে না হয় বুঝলুম; প্রেম যত ইচ্ছে করগে যা'। কিন্তু তাই বলে'—বিয়ে হয় নি, যা হয় নি, চুমু খাবি? কোন্ 'রাইটে'?

একথা লইয়া পূর্ব্বেও অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। তাই, আর বেশী না ঘাঁটাইয়া, চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি হাতের কাগজের মোড়কটা খুলিয়া, শেষের দিকের একটা পাতা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তারপর, পড়িতে লাগিলেন—

"নিস্তব্ধ, নিশুতি রাত। কোলাহল-মুখরিত কলিকাতা নগরী নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

"মীরার চোখে ঘুম নাই। স্বামীর শয্যা তার গায়ে যেন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। সে তখন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে', মীরা ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করলে। তারপর, অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

"সর্ব্বদেহে তার আগুন ছুটছে! না না, ভরা যৌবনে উষ্ণ রক্তের সেই কাতর আহ্বানকে সে উপেক্ষা করতে পারবে না—আত্মাকে নষ্ট দিতে চায় না সে!..."

দাদামহাশয় হঠাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'উষ্ণ রক্তের কাতর আহ্বান'-টা কি হ'ল? এ যে ভয়ানক কাব্যি করে' ফেলেছিস দেখছি—বোঝা দায়।

ফাঁপরে পড়িলাম। দাদামহাশয়কে ভয় কিংবা সঙ্কোচ করিয়া চলি নাই কখনও তাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম—এই,—যৌবনকালে,—অন্য 'সেক্স'-এর প্রতি মানুষের যে একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ হয়ে থাকে,—তারি কথা—

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি বলিলেন—বলিস্ কি রে! এতবড় বিশ্রী কথাটা তুই কাগজে-কলমে লিখে ফেল্লি? আমি ভাবছিলুম, গরমে বুঝি মেয়েটার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। ছি ছি ছি, পাঠাস্ নি, পাঠাস্ নি এটা কোথাও! বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন —

"বৈঠকখানার পাশে, ডানদিকের ঘরে আলোক শোয়। মীরা ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

"আলোক নিবিষ্টচিত্তে বই পড়ছিল। কাছে এসে এক ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, মীরা পেছন থেকে আলোকের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরল।

"কাতর-কণ্ঠে ডাক্‌লে—'আলোক, দয়া কর, একটু বুঝতে চেষ্টা কর'—"

দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামীটার কি নাম দিয়েছিস্? কুম্ভকর্ণ?

পরের চ্যাপ্টারের একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলাম—না দাদামশায়, সে সব টের পেয়েছিল। এই দেখুন এখানে লিখেছি—মীরার পেছন পেছন সেও নেমে এসে, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

—বটে? ব্যাপারটা তা হ'লে খুবই জটিল বল্। পড়্‌তে হচ্ছে ত।

বলিয়া আবার পড়িতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার নাত্‌নী নীলি সে ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহার আঠার বৎসর বয়স। কলিকাতায় কলেজে পড়ে। দেখিতে সুশ্রী। এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ একটু স্বদেশীর ঝোঁক আছে। খদ্দর পরে। এখানকার 'মহিলা-সমিতি'র সে সহকারী-সম্পাদিকা। পূজার ছুটিতে গ্রামে আসিয়া, মহিলা-সমিতির হাজার রকম কাজে নিজেকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া বলিল—বড়দা কখন এলে?

বলিয়াই দাদামহাশয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জানাইল—দাদু, আমি একবারটি কমলদিদের বাড়ী যাচ্ছি; আজ আমাদের খদ্দর বিক্রী করতে বেরুবার কথা আছে। নিমু-দা' ত এখনও এলো না; এলে বলে' দিয়ো, যেন যায় সে বাড়ীতে।

বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ত্বরিতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাদামহাশয় অপ্রসন্নমুখে কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—ও রে, যে জন্যে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তাই যে এখনও বলা হয় নি। আমি যে এদিকে এক মহাচিন্তার মধ্যে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের চিন্তা?

জানিস্‌ই ত, নির্ম্মলের সঙ্গে আমাদের নীলির বিয়ে দেব ঠিক করেছিলুম। ছেলে ভাল, অবস্থাও বেশ, দু'জনের ভিতর ভাব-সবও আছে খুব। দেখে ভাবতুম, এতে ওরা দু'জনে সুখীই হবে। কিন্তু কাল মেয়েটা নির্ম্মলকে কি বলছিল জানিস্?

—কি?

—বলছিল—জীবনে বিয়ে করাটাই কি চরম সার্থকতা নিমু-দা'? আমি আমার জীবনকে দেশের কাজে উৎসর্গ করে' দিয়েছি। বিয়ে কর্‌লে, আমার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে, এসো আমরা দু'জনে পরস্পরের বন্ধু হয়ে, দেশের কাজে গা ভাসিয়ে দিই। তুমি আমার বন্ধু, আমিও তোমার বন্ধু,—আর কিছু নয়, কেমন?

—এম্‌নি সব কত কি কাব্যি! অনেক কথারও মানে বুঝলুম না ছাই! বেচারির ত মুখ শুকিয়ে এল। কিন্তু, ছুঁড়িটা তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়লে যে, সে বিয়েতে মত দেবে না।

আমিও একটু আশ্চর্য্য হইলাম। নির্ম্মল সর্ব্ববিষয়েই নীলার উপযুক্ত পাত্র। এবার এম-এ দিয়াছে। এই পাড়াতেই বাড়ী। বেশ নম্র এবং বিনয়ী। নীলাকে সে খুবই ভালবাসে জানি। রোজই একবার করিয়া এ বাড়ীতে আসিয়া তাহাদের সভা-সমিতির কথা এবং দেশের মঙ্গলের বিষয় আলোচনা করে। নীলাও তাকে ভালবাসে বলিয়া জানিতাম।

দাদামহাশয় বলিতে লাগিলেন—এদিকে, একদিন যদি নিমেটার আসতে একটু দেরি হ'ল ত, অম্‌নি ঘর-বার করতে থাকেন; রাগ হয়, থেকে থেকে কান্না পায়; অথচ, বিয়ে করবেন না! জ্যালা আপদ! বিয়ে করবিনি ত করবি কি শুনি? আজকালকার তোদের মহিমে বোঝাই ভার।

একটু 'দম্' লইয়া আবার বলিলেন—প্রতিজ্ঞাটা করিয়ে নিয়েই আমার কাছে এসে জানিয়েছেন যে, এখন তিনি বিয়ে-টিয়ে করতে পারবেন না। অনেক কাজ, বিয়ে করবার ফুরসুৎ নেই।

আমি একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিলাম—কথাটা এমন মন্দই বা কি দাদামশায়? এখন যদি না কর্‌তে চায়, নাই বা দিলেন বিয়ে। সত্যিই ত ওরা গ্রামের অনেক কাজ করছে।

আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, বুঝি বা ঘরের দেয়ালকে উদ্দেশ করিয়া দাদামহাশয় বলিলেন—এ ছোঁড়া কী মুখ্য রে! ওরে শালা, বিয়ে করবে না, অথচ, দু'-দুটো সোমখ ছেলে-মেয়ে একঘরে দিবা-রাত্রি বসে' খালি বন্ধুত্ব করবে, এ শুধু তোদের কলমের মুখেই সম্ভব হয়। কারও বাড়ীতে হয় না, তা' জানিস?

বলিলাম—কেন হবে না?

—বাজে কথা রাখ্‌ মুখ্যু! বলি, এ মানুষ দুটো কি পাথরের তৈরি? এদের প্রাণে কি কখনও তোর ওই রক্তের আহ্বান-টাহ্বান আসতে পারে না? তখন কে সাম্‌লাবে?

বলিয়া তিনি এইবার একটু গম্ভীরভাবেই বলিলেন—না বাবু, ও সব কাব্যিভাব এখানে চলবে না। শীগ্‌গিরই ওদের বিয়ে দেব, সেই ভরসাতেই এতদিন দু'জনকে এমন করে' মিশতে দিয়েছি। কিন্তু আর ত এখন নিমেকে এত ঘন ঘন আসতে দিতে পারি না। বড় সব

অনাছিষ্টি! কেন রে বাবু, বিয়ে করে' দেশের কাজ করা চলে না? সি আর দাশ করেন নি? গান্ধী করেন নি? সোমত্থ বয়েসের ছেলে-মেয়ের ভেতর আবার বন্ধুত্ব কি রে?

তারপর, গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন—আসল কথা কি জানিস ভায়া? আজকাল-কার ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো সব এক-একটি ক্ষুদে বিশ্বপ্রেমিক। শুধু একজনের তাঁবেদার হয়ে থাকতে চান না আর কি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নীলাকে ভালভাবেই জানি। আদর্শ লইয়া সে মাথা ঘামাইয়া মরে। যখন একবার স্থির করিয়াছে বিবাহ করিবে না, তখন জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া কঠিন। ইহা ব্যতীত আমি নিজেও চিরদিন বিবাহ জিনিষটার বিপক্ষে। নীলা যাহা স্থির করিয়াছে, আমার নিজের আদর্শও তাই। সে জন্য বলিলাম—থাক্ না দাদামশায়, আর কিছুদিন অপেক্ষাই করুন না; এখন জোর জবরদস্তি করলে, ওদের চোখে আপনি বড্ড খেলো হয়ে যাবেন।

তিনি ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিলেন—আর, ওঁরা ঘরে বসে' সকাল-সন্ধ্যে বন্ধুত্ব করলে স্বর্গে উঠে যাব, না রে শালা? তোর মত আকাট মুখ্যু আমি? দাঁড়া না, দু'দিনে ছুঁড়িকে শায়েস্তা করে' দিচ্ছি, দেখ্ তুই।

কি দেখিব, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নির্ম্মল ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চুলগুলি রুক্ষ, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, রাত্রে সে ঘুমায় নাই।

শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—নীলা কি কমল-দি'দের বাড়ীতে গেছে?

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই দাদামহাশয় মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—আমার কথা কিছু বলে' গেছে?

—হ্যাঁ, বলে' গেছে। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে। বোস্ এখানে।

নির্ম্মল এককোণে বসিয়া পড়িল। দাদা-মহাশয়ের মুখ দেখিয়া সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল।

তিনি প্রথমেই কাজের কথা পাড়িলেন—নীলিকে বিয়ে করতে চাস্? সত্যি বল্‌বি; কাব্যি-টাব্যি করলে মার খেয়ে মরবি বলে' রাখছি।

নির্ম্মলকে লাজুক বলা চলে না; তবু, দাদামহাশয়ের মুখে সোজাসুজি কথাটা শুনিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—সে বিয়ে করতে চায় না দাদামশায়।

—আমি তোর কথা জিজ্ঞাসা করছি; বেশ ভাল করে' ভেবে জবাব দে।

নির্ম্মল মাথা তুলিয়া বলিল—চাই দাদা-মশায়, কিন্তু, তার অমতে, জোর করে' বিয়ে দেওয়ালে আমি কিছুতেই করব না।

—না, সে সব কিছু হবে না। ভাল করে' ভেবে দেখেছিস—নীলাকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবি?

—হ্যাঁ, ভেবে দেখেছি।

দাদামহাশয় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—বেশ, তা' হ'লে আমি যা' যা' বলব, নির্ব্বিবাদে সে সব মেনে চলতে হবে। শোন। প্রথমতঃ, দিনকয়েক বাইরে কোথাও না বেরিয়ে চুপচাপ নিজের বাড়ীতে বসে' থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি না ডেকে পাঠালে এ বাড়ীতে আর কক্ষনো আসবে না। কেমন, রাজি?

শেষের কথাটা শুনিয়া নির্ম্মলের মুখ আরও

শুকাইয়া গেল। কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেই, দাদামহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন—ও রে, ঘাবড়াস নি, তোদের ভালর জন্তেই বলছি। যা' বললুম শোন্। খবরদার এখন কমলের বাড়ীতে যাস্ নি। সোজা ঘরে গিয়ে চুপচাপ থাক্ গে

ইহার ঠিক পাচদিন পরে দাদামহাশয় আবার আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অন্যস্থানে একটু জরুরি কাজ ছিল। সেটা সারিয়া, দাদামহাশয়ের বাড়ীর পিড়কির দ্বার দিয়া ভিতরে আসিলাম। দেখিলাম, এককোণে, একটা ছোট আমগাছের তলায়, নীলা বই হাতে করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই হাত তুলিয়া ডাকিল—ও বড়দা' শুনে যাও একবারটি।

কাছে আসিয়া দেখিলাম, তাহার মুখখানি অসম্ভব গম্ভীর; চোখ দু'টি ফুলিয়া লাল হইয়াছে। এতক্ষণ বোধ হয় কাঁদিতেছিল।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রে? অমন করে'—

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া নীলি বলিল —বড়দা', দেখ, ওই ওকে একবারটি ডেকে নিয়ে এসো ত এখানে। বৈঠকখানায় বসে' আছে। চুপিচুপি—কেমন?

—কা'কে রে?

—ঐ নির্ম্মল মুখুয্যেকে। নিয়ে এসো দিকি —ওকে আজ আমি খুন করব।

হাসিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কি রে! ব্যাপার কি?

নীলা বলিল—সে কি করেছে জান?—প্রায় হপ্তাখানেক গা ঢাকা দিয়ে থেকে, আজ এ বাড়ীতে এসেছে নিজের বিয়ের কনে দেখ্‌তে।

ভাবিয়াছিলাম, নীলাই ত বিয়ের কনে। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—কনে কে আবার?

—আমার পিস্‌তুত বোন্—শোভা। নির্ম্মল মুখুয্যের বাপের না কি ভারি ইচ্ছে, শোভার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন। তাই, দাদুর সঙ্গে পরামর্শ করে' স্থির করা হয়েছে যে, দু'জনকেই নেমন্তন্ন করে' এখানে আনা হবে—যা'তে দু'জনে দু'জনকে দেখে পছন্দ করে' নিতে পারে। নির্ম্মল মুখুয্যেরও না কি আপত্তি নেই। তবে আগে একবার দেখে নিতে চায়।

বিস্মিত হইলাম। হঠাৎ এ কি শুনি এমন ত কথা ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম— তুই ঠিক জানিস্, দাদামশায়ের পরামর্শে এসব হচ্ছে?

—হাঁ, জানি। কিন্তু পিসিমা কিম্বা শোভা এখনও এসব কিছু জানে না। চুপিচুপি নির্ম্মল মুখুয্যেকে দেখিয়ে দিয়ে, আগে তার মতটা জেনে নেওয়াই দাদুর উদ্দেশ্য আর কি।

হইবেও বা! দুনিয়ায় অসম্ভব বলিয়া ত কিছুই নাই। নির্ম্মল আজকালকার ছেলে— মত পরিবর্ত্তন হইতে কতক্ষণ!

নীলা বলিতে লাগিল—উঃ, মানুষটা এতবড় 'ক্রুট্'! দেখ বড়দা', এমন মিথ্যেবাদী, রোজ এখানে এসেছে, আর এতসব মিছে কথা বলেছে যে, কি বলব! বলেছে, আমি কক্ষনো বিয়ে করব না—দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে' দেব। আমার জীবনের একটিমাত্র ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে'...উঃ! বড়দা', তুমি যাও দিকি, ডেকে নিয়ে এস তাকে এখানে।

বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—

কি আর করবি দিদি, ও যদি বিয়ে করতে চায়, করুক গে। তুই সে জন্যে কেঁদে ভাসিয়ে কি করবি বল্!

—কই কেঁদে ভাসিয়েছি? আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে। মানুষের একটা 'প্রিন্সিপল্' থাকতে নেই? তা' হ'লে প্রতিজ্ঞা করলে কেন? কেন রোজ এতদিন ধরে' জানিয়েছে—

বলিতে বলিতে বইটা মুখের উপর চাপা দিয়া নীলা সেইখানেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঘৃণায় তাহার সর্ব্বদেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি ব্যথিত অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু, সে আর মুখ তোলে না দেখিয়া ব্যাপারটা সব ভাল করিয়া জানিয়া লইবার মানসে দাদামহাশয়ের বৈঠকখানার দিকে চলিলাম।

বৈঠকখানার কাছে আসিতে দেখিলাম, শোভা আর তার মা, বুঝি বা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেছেন। শোভা এই গ্রামেরই মেয়ে। সেও সুন্দরী; তবে, নীলির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। সেইদিকে চাহিয়া, এবং ক্রন্দনরতা নীলিকে স্মরণ করিয়া, নিজেদের উপর যেন ঘৃণা হইতে লাগিল। বিবাহ হইবার সম্ভাবনা কম, কথটা টের পাইতে-না-পাইতেই নীলির প্রতি নির্ম্মলের এতদিনকার ভালবাসা এক ফুৎকারে নিভিয়া গেল? ছিঃ!

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে যাইব, দেখি নীলা ছুটিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল—চল, আমিও যাচ্ছি।

দাদামহাশয় নির্ম্মলের সহিত বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি নীলির আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। পর মুহূর্ত্তে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—এসেছিস? ভালই হ'ল। নির্ম্মলের ত শোভাকে বেশ পছন্দ হয়েছে—জানলি? তোরা বোস্ একটু, আমি ওর বাপকে চট্ করে' খবরটা দিয়ে আসি।

সহসা নীলা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—একবার মুখটা তোল ত—লজ্জা-সরমের কিছুমাত্র সেখানে আছে কি না দেখি। মাথা নীচু করছ কেন, লজ্জা হচ্ছে? যে লোক প্রতিজ্ঞা করে' এত শীগ্‌গির ভুলে যেতে পারে, প্রতিজ্ঞা করে' আবার আমারি বাড়ীতে এসে এমন বেহায়াপনা করতে পারে,—তার আবার লজ্জা কিসের? চাও আমার দিকে—

নির্ম্মল করুণ-দৃষ্টিতে চাহিতেই, নীলা দুই চোখে যেন আগুণ ঢালিতে ঢালিতে বলিল—তুমি না বলেছিলে, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবে? সে আজ ক'দিন আগেকার কথা? কেন এতদিন ধরে' ঝুড়ি ঝুড়ি সব মিছে কথা বলেছ? এই মনের জোর নিয়ে দেশের কথা ভাবতেও তোমার লজ্জা হয় নি? 'হিপোক্রিট', মিথ্যেবাদী—

দাদামহাশয় বসিয়া মুচকি হাসিতেছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তা',ও আর কি করবে? বাপের একমাত্র ছেলে, ধরে' পড়েছে—অবাধ্য হয় কি করে'?

নীলি যেন ফাটিয়া উঠিল—তা' হ'লে প্রতিজ্ঞা করতে গেছল কেন? তুমি জান না দাদু, ও কীভাবে এতদিন আমার সঙ্গে ছলনা করে' এসেছে। যদি জানতে, তা' হ'লে কক্ষনো আজ ওকে প্রশ্রয় দিতে না। যদি বুঝতে, তা' হ'লে, আজ এমন করে' লোকজন ডেকে এনে অপমান করতে পারতে না। আমার জীবনের সমস্ত আদর্শকে ও দুই পায়ে দলে—

কথাটা আর শেষ হইল না। সে খাটের

উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অস্ফুট কান্নার স্বরে ঘর ভরিয়া তুলিল।

নির্ম্মল চঞ্চল হইয়া উঠিল। দাদামহাশয় ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিয়া, নীলার কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন—ও বেচারির ত কোন দোষ নেই, ভাই! আমরাই ত এক-রকম জোর-জবরদস্তি করে' এ কাজ করছি।... নইলে, ও ত তোর পথ চেয়েই বসেছিল; আমারও বড় সাধ ছিল—কিন্তু, তুই যখন বিয়ে করবি নি ঠিক করেছিস, তখন—

এ কথা শুনিয়া হঠাৎ নীলার কান্না থামিয়া গেল। অশ্রুভরা বিস্মিত চোখে একবার নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া লইয়া, দাদামহাশয়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিল—তাই যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে আমি কিছুতেই এ বিয়ে হ'তে দেব না।

—এ বিয়ে যদি হ'তে দিবি নি, তা' হ'লে তুই চাস কি বল দিকি? নিজেও রাজি হবি নি, আবার শোভার বেলায়ও—

নীলা ধরাগলায় বলিল—মানুষের একটা ক্ষমা নেই দাদু?

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে দাদামহাশয় সহসা দুই হাত তুলিয়া খাটের উপর লাফাইতে লাগিলেন। আনন্দে ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে আমাকে বলিলেন—দেখ্‌লি ত, দেখলি ত ছোঁড়া, কেমন ওষুধ ধরেছে? পিতিজ্ঞে-টিতিজ্ঞে কোথায় ভেসে গেল, দেখ্‌লি?

আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে তিনি বলিলেন—সব ভুয়ো রে, সব ভুয়ো! মুখ্যাটী, বুঝতে পার না? বিয়ের সম্বন্ধে শোভা ত দূরের কথা, শোভার মা-ও জানে না। এমনি নেমন্তন্ন করে' এনে এদের জানিয়েছিলাম যে, দেখাতে এনেছি

তারপর নীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এই ত লক্ষ্মী দিদির মত কথা! বিয়ে-থা হোক্, তার-পর দু'জনে যতখুসি বন্ধুত্ব কর্, দেশের কাজ কর্, আমার কোন আপত্তি নেই। এদিকে মানুষটার জন্যে হেদিয়ে মরবি, অথচ, বিয়ে করবি না, এ কেমনতর কথা?

বলিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইতে ফাটাইতে তিনি আবার খাটের উপর দু'টা ঘুরপাক খাইয়া লইলেন।
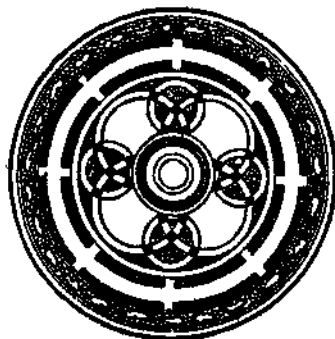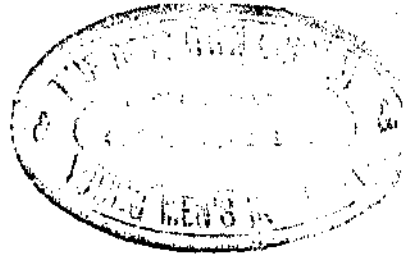
নীলাঞ্জন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দশ

কয়েকদিন আধ-মূর্চ্ছা আধ-চেতনার মধ্যে কাট্‌ল। অনুক্ষণ চোখের সামনে বীভৎস দুঃস্বপ্নের ছবি ভেসে বেড়াতে লাগল—সারা দেহ উত্তেজনায় আতঙ্কে অনুক্ষণ যেন বিবশ শিথিল হ'য়ে আছে।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে মনে হ'ল, এই প্রথম যেন পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। জানলার বাইরে ওই যে অসীম নীলের প্রবাহ, তার অপরিসীম সৌন্দর্য্য এমন করে' আর কখনো আমার চোখের সামনে ধরা দেয় নি। জানলার গা বেয়ে মাধবী-লতার যে ঝুরি নেমেছে, তার প্রত্যেকটি পাতায় যেন নব-জীবনের আনন্দ-সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হচ্ছে!

কয়েকদিন পরে আজ সকালে দেহে-মনে অনাবিল সুস্থতা অনুভব করছি।

ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম, আমার বিছানার পাশেই একটি টিপাইএর ওপর ছোট বড় নানা আকারের ওষুধের শিশি সাজানো—ঘরের মধ্যে দস্তুরমতো হাসপাতালের আব-হাওয়া বইছে।

অতসী আমার মাথার শিয়রে বসেছিল। আমি জেগেছি দেখে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বল্লে—দিদি! আজ কেমন আছ?

মাথা নেড়ে বল্লাম—ভাল আছি! আমি উঠে বসব।

অতসী আমায় সাবধানে তুলে বিছানার উপর বসিয়ে দিলে। বল্‌লে—হাঁ, আজ তুমি বেশ ভাল আছো—তোমার মুখ দেখে তা' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উঃ, এ-ক'দিন কি ভাবনার মধ্যেই কেটেছে!

ক'দিন এমনভাবে পড়ে' আছি অতসী?

কাল হ'লে এক সপ্তাহ হবে।

বলিস্ কি, সাতদিন!

চোখ মুদে সাতদিনের ঘটনাটি স্মরণ করলাম···উপাসনা-গৃহের দৃশ্যটি আমার চোখের সুমুখে জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌ল···বাবার বক্তৃতা, পুলিসের আগমন...নিশীথবাবুর খবর···

মাথার মধ্যে যাতনা অনুভব করে' আবার শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে দেহে অনেকখানি বল পেলাম—প্রায় সহজ অবস্থায় যেমন বল পাই, তেমনি। বিছানার উপর উঠে বসতেই আমার নজর পড়ল—ঘরের মধ্যে নানাস্থানে গোছা গোছা সুন্দর গোলাপফুল সাজানো রয়েছে। সবচেয়ে যেটি ভাল গোছা, সেটি আমার মাথার কাছে টিপইএর ওপর একটি 'ভাসে'র মুখে! ঘরের বাতাস ফুলের গন্ধে মন্থর হ'য়ে উঠেছে।

ফুল আমি খুব ভালবাসি। বিশেষ করে' গোলাপফুল! ফুলগুলি যেন আমার মনের ওপর তাদের অমৃতস্পর্শ সঞ্চার করল। অতসী পাশে বসেছিল, তাকে প্রশ্ন করলাম—কোত্থেকে এগুলি এলো অতসী?

অতসী মৃদু হেসে বললে—কোথেকে বল ত দেখি ?

কেমন করে' জানবো বল্। আমার কোন ধারণা নেই।

ভাসের মুখ থেকে একটি বড় গোলাপ তুলে নিয়ে সেটিকে আমার খোঁপার মধ্যে গুঁজে দিয়ে অতসী বললে—তোমার নতুন বন্ধুর কাছ থেকে।

আমি অবুঝের মতো তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। অতসী আমার মুখের ভাব দেখে জোরে হেসে উঠলো।

তুমি কি সত্যই আন্দাজ করতে পারছো না ?—সে বললে।

মাথা নেড়ে বললাম—না।

এ ফুলগুলি পাঠিয়েছেন নিশীথবাবু। তোমার অসুখের কথা শুনে তিনি এ-ক'দিন প্রত্যহই তোমার সংবাদ নিতে আসতেন।

বিস্ময়কর খবর বটে !

বললাম—অতসী, বাবা কোথায় ? তাঁর শরীর ভাল আছে তো ?

হ্যাঁ। তিনি ভালই আছেন। জান দিদি, আচার্য্যদেব কাল আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। বাবার সেদিনকার বক্তৃতা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। তিনি বাবাকে সুখ্যাতি করলেন।

নিম্নকণ্ঠে বললাম—হ্যাঁ, বাবা সেদিন আশ্চর্য্য বক্তৃতা করেছিলেন।

আচার্য্যদেব সেই কথাই বললেন। অন্য সকলেও বলছে। (অতসীর কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল) সেদিন বাবার বক্তৃতা শুনে যে কি আনন্দ বোধ করেছিলাম, তা' বলে' শেষ করা যায় না দিদি। কী চমৎকার বললেন, অথচ আগে থাকতে একটুও তৈরী হন নি !

বললাম—মনে হচ্ছিল যেন সত্যিকারের জীবন-ইতিহাসের একটা পাতা কেউ যেন পড়ে' শোনাচ্ছে—প্রত্যেকটি কথা যেন মনের মাঝখান থেকে উঠছিল।

আমার কথায় হয় ত উত্তেজনা ফুটে উঠেছিল। অতসী চকিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বললে—ও-কথা থাক দিদি—অন্য কথা বল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, বাবা আমায় বারবার করে' তোমার সঙ্গে সেদিনকার সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করতে বারণ করে' দিয়েছেন।

শান্তকণ্ঠে বললাম—আলোচনা আমি করতে চাই নে, অতসী। আমি জানতে চাই, সেদিন আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়বার পর কি হ'ল। সেই কথাই তুই আমাকে বল্।

অতসী একটু ইতস্ততঃ করে' বললে—হবে আর কি ! তিন চারদিন ধরে' পুলিসে তদন্ত করলে। তদন্তের ফলে প্রকাশ পেয়েছে যে, লোকটি মাঠের মধ্যে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এবং তাকে এক বা একাধিক লোক মিলে খুন করেছে। এখানে তার কোন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। রমা পিসিমার বাড়ীতে তিনি একদিন মাত্র এসেছিলেন ; সুতরাং, তাঁরা তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরই দিতে পারে নি।

প্রশ্ন করলাম—লোকটির পকেটের জিনিষ পত্র, টাকাকড়ি কি চোরে নিয়ে গিছলো ?

না। তার ঘড়ি এবং মণিব্যাগ পকেটের মধ্যে যে জায়গায় থাকবার সেইখানেই ছিল। পুলিসে বলছে, কেস খুবই রহস্যজনক ! রমা পিসির বাড়ীতে অনেকদিন আগে তিনি এক চায়ের নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের পর তাঁকে এখানে আর কেউ দেখে নি।

সেদিনের পর কেউ তাঁকে দেখে নি ?

কেউ না।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার কথা ফুরিয়ে গেল। সহসা ঘরের দেওয়াল যেন উন্মুক্ত হ'য়ে

গেল। আমি দেখলাম, বাবার পাশে মাঠের ধারে বেদীর ওপর আমি বসে' রয়েছি, আর বহুদূর হ'তে গাছের ফাঁকে একটি মানুষের মূর্ত্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি দেখ্‌লাম, অগ্রগামী মানুষটিকে চিন্‌তে পেরে বাবার দুই চোখে যেন ক্ষণকালের জন্য আগুন জ্বলে উঠ্‌লো! আমি শুনলাম, তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করলেন।

ক্ষণকাল পরে অতসীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তদন্তে বাবার জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল না কি?

—না। কেন তা' হবে? বাবার সঙ্গে লোকটির একেবারেই কোন পরিচয় ছিল না। তিনি তাকে আগে কখনো দেখেন নি।

দুই চোখ আপনি বুজে এলো। ধীরে ধীরে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলাম। অতসী চিন্তিতস্বরে বল্‌লে—তোমার সঙ্গে এ সব কথা নিয়ে আমার আলোচনা করা উচিত হয় নি। বাবা আমায় বারবার নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তোমার আগ্রহ দেখে আমায় বল্‌তে হ'ল। আমার কাছে শপথ কর দিদি, ও-সব কথা আর ভাববে না!

শপথ করব? ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল! অতসী যদি আমার মনের কথা জানতে পারতো! আমায় নীরব দেখে অতসী মনে করলে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই ও আর কোন কথা না বলে' ধীরে ধীরে আমার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগ্‌লো।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—অতসী, বাবা এখন বাড়ীতে আছেন না কি?

অতসী বল্লে—ও মা, তুমি ঘুমোও নি! আমি মনে করি···! না, বাবা তো বাড়ী নেই। তিনি গেছেন আচার্য্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে। ইস্কুল-সংক্রান্ত কি সব পরামর্শ আছে।

বাড়ীর সুমুখে গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। খানিক পরেই বাবার গলা শোনা গেল। অতসী বল্লে—আমি এখুনি আসছি, দিদি। বাবা বোধ হয় আমায় ডাকছেন।

কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘরের বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে বাবা দু'-একবার কাশির শব্দ করলেন। আমি উঠে বসলাম।

এগারো

কপালে হাত দিয়ে তিনি বল্লেন—আজ কেমন আছ? মুখ দেখে আজ অনেকখানি সুস্থ বোধ হচ্ছে—নয় কি?

বল্লাম—হ্যাঁ বাবা, আজ ভাল আছি। ক'দিন ধরে' যে এত অসুস্থ হয়েছিলাম, আজ আর তা' মনেই হচ্ছে না।

বাবা কিয়ৎকাল অন্যমনস্ক চোখে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দু'-চারটা সাধারণ কথার পর ধীরে ধীরে আমার বিছানার একাংশে এসে বসলেন। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম, তিনি যেন আমায় কিছু বলতে চাইছেন।

বাবা বল্লেন—কেতকী, তোমার সঙ্গে আজ আমি গোটাকয়েক গুরুতর কথা আলোচনা করব। আমার মনে হচ্ছে, সে কথা শোনবার মতো দেহ এবং মনের শক্তি তুমি ফিরে পেয়েছ।

নিম্নকণ্ঠে বল্লাম—হ্যাঁ, বল। আমি শুনবো।

আমি অতসীর কাছ থেকে শুন্‌লাম, শুনে তোমার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি;—আমার সঙ্গে বিজয়ের যে পথে দেখা হয়েছিল, এ-কথা তুমি কারুর কাছে যে বল নি, তা' দেখে আমি বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছি।

স্খলিত স্বরে বল্লাম—তুমিও সেকথা কারুর

কাছে প্রকাশ করো নি। কিন্তু কেন করো নি বাবা? আমি তোমার আচরণ বুঝতে পারি নি। আমায় সব কথা খুলে বল।

তিনি স্থির অবিচলিত চোখে আমার পানে তাকালেন। তাঁর শুষ্ক শান্ত মুখের ওপর অপ্রসন্নতার ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে বল্লেন—কেন যে ওকথা আমি কারুর কাছে প্রকাশ করি নি, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। আমার নিজের জন্যে এবং তার সঙ্গে অন্য একজনের জন্যে আমি ঠিক করলাম, বিজয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা কারুর কাছে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়। সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারবো না। তবে তোমার এটুকু বোঝা উচিত যে, বিজয়ের সঙ্গে আমার যে পথে দেখা হয়েছিল, এ-কথা প্রকাশ করে' কোন দিক্ থেকে কোন মঙ্গল সাধিত হ'ত না। তাই আমি চুপ করে' থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলাম। তা' ছাড়া, অন্য কারণও যে ছিল না, তা' নয়। সে সব কারণ তোমার না জানাই ভাল। শুধু নিজের জন্যে নয়, এর মধ্যে আর একজন আছেন, যাঁর মঙ্গল চিন্তা করে' আমায় নীরব থাকতে হয়েছে এবং তোমাকে আমি অনুনয় করে' বলছি কেতকী, তুমিও এ-সম্বন্ধে কোন কথা কারুর কাছে উচ্চবাচ্যও করবে না।

বাবার দীপ্ত প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম। তারপর মিনতিপূর্ণ-কণ্ঠে বল্লাম—বাবা, তোমার সব কথা আমায় বিশ্বাস করে' বল। এমন করে' জানা-অজানার মধ্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে যে! যেটুকু আমি শুনেছি, যা' আমি দেখেছি, তারা পাষাণভারের মতো আমার বুকে চেপে রয়েছে। আমায় তুমি সত্যিকথাগুলো বলো—প্রাণান্তেও আমি সে সব কারুকে জানাবো না।

তিনি ডান হাতখানি উর্দ্ধে তুলে আমার কথায় বাধা দিলেন। শান্তকণ্ঠে বল্লেন—তোমায় কোন কথা বলবার নেই। তোমার মন থেকে ওসব চিন্তা দূর কর। আমি ইচ্ছে করি না যে, ও-সকল চিন্তার গুরুভার তোমায় বহন করতে হয়।

বল্লাম—চিন্তার গুরুভার বহন করতে আমি কাতর নই বাবা—ভয় পাই নে। কোন কথা না জানতে পেরেই আমার ভয় বাড়ছে। তুমি কেন আমায় বিশ্বাস করছ না? আমি কি এখনো বড় হই নি? আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কি কিছুই হয় নি?

আমার কথার উত্তরে বাবার কঠিন মুখের ওপর স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো—পিতার স্নেহের হাসি, করুণার হাসি, তার বেশী কিছু নয়।

বল্লাম—এর মধ্যে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে। সেই রহস্য-জালে আমরা আচ্ছন্ন হয়েছি। এর অর্থ কি।

বাবা এইবার ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—এক কথা কতবার করে' তোমায় বল্‌ব। সব জিনিষের অর্থ সবাইকার জানবার নয়। তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

এই বলে' তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বারো

তিনদিন পরের কথা।

ঘরের মধ্যে বসে' বোর্ডিংএর বন্ধু রমাকে পত্র লিখ্‌ছিলাম, এমন সময় আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। এ সময় কে এল?

ক্ষণকাল পরে বুধুয়া ঘরে ঢুকে বল্লে—দিদিমণি, একটি মেয়েলোক এসে কর্ত্তাবাবুকে খুঁজতেছে। আপনি এসো। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্ত্রীলোক? কৌতূহলীচিত্তে ঘর থেকে বাইরে এলাম।

বারান্দার নীচে যে মহিলাটি দাঁড়িয়েছিল, বুধুয়া তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই তিনি নমস্কার করে' এগিয়ে এলেন।

দেখলাম, মেয়েটি আমার চেয়ে বড়—বয়স, বছর চব্বিশ হবে। দোহারা আঁটসাঁট গড়নের চেহারা—প্রচুর স্বাস্থ্যের আভা তার গালে রঙ্ ধরিয়েছে। ফর্সা রঙ্। চোখ দু'টী বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। হাতে তার একটি কুমীরের চামড়ার 'ভ্যানিটি কেস্'। পায়ে মেয়েদের জুতো। ক্রেপের শাড়ীর নীচে বিলাতী কর্সেট্! পেটি-কোটটি ত কম দামী নয়। পথশ্রমে প্রসাধন কতক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গেছে। মাথায় বা হাতে আয়তির কোন চিহ্ন নেই।

মনে মনে বিস্মিত হলেও মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বল্লাম—আসুন, ভিতরে আসুন।

মহিলাটি উপরে উঠে এলো এবং বারান্দার ওপর আমার প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করল। বল্লাম—আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

উত্তর হ'ল—শ্রীযুক্ত জগদীশ মিত্র, যিনি এই মন্দিরের আচার্য্য, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

বল্লাম—কিন্তু তিনি তো বাড়ী নেই; ফিরতে অন্ততঃ ঘণ্টা দুই বিলম্ব হবে।

মহিলাটি আমার কথা শুনে হতাশ বোধ করলে। তারপর সহসা তার মুখের আশ্চর্য্য ভাবান্তর ঘটল। হাতের রুমাল দিয়ে সে দুই চোখের উদ্গত অশ্রু দমন করলে। আমার বিস্ময় বিষম বেড়ে উঠ্‌লো।

মহিলাটি বল্লে—আমি এইমাত্র এখানে এসে নামছি! হঠাৎ যে গুরুতর আঘাত পেয়েছি, কিছুতেই তা' ভুলতে পারছি না। আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করবেন।

অস্ফুট কণ্ঠে বল্লাম—আপনি কি কোল্‌কাতা থেকে আসছেন।

—না, ঠিক কোল্‌কাতা থেকে নয়। আমি আসছি শিলং থেকে।

—শিলং থেকে! চকিত হ'য়ে উঠ্‌লাম! বল্লাম—যে ভদ্রলোক কয়েকদিন আগে এই শহরে হত হয়েছেন, আপনি কি তাঁর···

—হ্যাঁ। আমি তাঁর ছোট বোন্। আমার নাম, চন্দ্রা দত্ত। আমি শিলংএর গার্লস স্কুলে কাজ করি।

লক্ষ্য করে' দেখলাম, ভাই-বোনের মুখের ছাঁচ প্রায় এক।

দেখলেই বোঝা যায়। এরই কথা বিজয়-বাবু আমায় বলেছিল।

প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লে—খবরের কাগজে আমি দাদার মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। এখানে পৌছেই থানায় গিছ্‌লাম। তারা তাঁর ঘড়ি এবং পকেট বইখানি আমায় দিলে। তাঁর ফটোগ্রাফ আমায় দেখালে। তার বেশী আর কোন খবর দিতে পারলে না। এ সংসারে দাদা ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল না। সেই দাদাকে যে এমন করে' হারাতে হবে, তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি!

শেষের দিকে চন্দ্রার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল। কঠিন আত্মসংযমী মেয়ে, কিন্তু তবুও মনের বেদনা সে চেপে রাখতে পারছে না।

বল্লাম—ভারী দুঃখ লাগ্‌ছে আপনার কথা

শুনে! আপনার মনের বেদনা আমি কতক বুঝ্‌তে পারছি!

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে চন্দ্রা বল্‌তে লাগল—দাদার শিলং যাবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি এখানে যে কেন এলেন! কোল্‌কাতা থেকে টেলিগ্রাম করে' আমায় জানিয়েছিলেন যে, হঠাৎ জরুরী কাজে তিনি আমার কাছে যেতে পারলেন না। কথা ছিল, প্রত্যহ তিনি আমায় পত্র লিখবেন। হঠাৎ চিঠি বন্ধ হয়ে গেল, তারপর খবরের কাগজে পড়লাম, তাঁর মৃত্যুর কথা! কী নিষ্ঠুর তারা…!

মিষ্টি কথায় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে' বল্লাম—আচ্ছা, বলতে পারেন আপনার দাদা এখানে এসেছিলেন কেন? তিনি স্যার জি সি মিত্রের বাড়ীর অতিথিরূপে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বুঝি তাঁর অনেকদিনের পরিচয়?

চন্দ্রা বল্লে—তাঁদের নাম আমি কখনো শুনি নি। শেষ চিঠিতে জেনেছিলাম, তিনি হঠাৎ বিশেষ কোন কাজে শিলং না গিয়ে এখানে আসছেন। আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এখানে আসার জন্ত কেন তাঁর এত তাড়া পড়ল? বিশেষ কোন গুরুতর কাজে যে তিনি এখানে এসেছিলেন, তা'তে আর সন্দেহ নেই। তাঁর এখানে আসার পিছনে এমন কিছু আছে, যা' সহজ সাধারণ নয়। সেই কথাটাই আমি জানতে পাচ্ছি না।

বল্লাম—আপনি খবর পেয়েছেন বোধ হয় যে, লেডী মিত্র এখান থেকে কোল্‌কাতায় চলে' গেছেন? তাঁর বাড়ীতে চাবী পড়ে' গেছে।

—হ্যাঁ। পুলিশ-ষ্টেশনেই সে খবর পেয়েছি। আমি লেডী মিত্রকে টেলিগ্রাম করেছি—দাদার সম্বন্ধে তিনি যা' জানেন, সব কথা আমাকে খুলে লিখ্‌তে। অনেকদিন দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। চিঠির বিনিময় চলত বটে; কিন্তু চিঠিতে ত সব কথা জানা যায় না। হয় ত ইতি-মধ্যে অনেকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে, যে-সব খবর আমি মোটেই জানি না। আমি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে' তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করব।

বল্লাম—বন্ধুত্বও হ'তে পারে আবার শত্রুতাও হ'তে পারে।

চন্দ্রা চিন্তা করে' বল্লে—শত্রুতা? হ্যাঁ, তাও হ'তে পারে। অসম্ভব নয়। দাদার প্রকৃতি ছিল কড়া; তার ওপর তিনি ছিলেন ভারী খেয়ালী। তাঁর মত লোকের শত্রুবৃদ্ধি হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়।

এই বলে' কিছুক্ষণের জন্যে চন্দ্রা আপন চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে রইল। খানিক পরে কৌতূহলী হ'য়ে বল্লাম—কি ভাবছেন?

আমার কথায় চন্দ্রার চমক ভাঙ্‌লো। মুখ তুলে সে প্রশ্ন করলে—আপনারা এখানে কতদিন আছেন? বেশীদিন নয় বোধ হয়?

মাথা নেড়ে বল্লাম—না, মাত্র মাসখানেক হবে।

চন্দ্রা বল্‌তে লাগলো—আমার বোধ হয় এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগ ফ্যামিলির সঙ্গেই আপনাদের পরিচয় আছে।

বল্লাম—অনেকের সঙ্গে আছে; অন্ততঃ, নামধাম প্রায় সকলেরই জানি।

—বলতে পারেন, এখানে মজুমদার নামে কোন ফ্যামিলি আছে কি?—বিশেষ করে' ফণিভূষণ মজুমদার নামে কেউ?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বল্লাম—না, এ নাম জীবনে এই প্রথম শুনলাম। আমি নিশ্চিত জানি, এ শহরের মধ্যে ও নামে কোন পরিবার নেই।

চন্দ্রার চোখের দীপ্তি নিবে এলো। মনে হ'ল, সে আমার কথায় হতাশ বোধ করল।

আপনি নিশ্চিত জানেন?

নিশ্চিত জানি।

চন্দ্রা মৃদুকণ্ঠে বল্লে—আমি জানি, এই ফণি মজুমদারের সঙ্গে দাদার শত্রুতা ছিল। লোকটা দাদাকে অতিশয় ঘৃণা করত। সমস্ত জীবন ধরে' এঁদের দু'জনের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষ চলে' এসেছে। ফণি মজুমদারের ভয়েই দাদা বোম্বাই চলে' গিছলেন। এখানে যদি সেই নামে কোন লোক থাকতো, তা' হ'লে আমি শপথ করে' বলতাম,—দাদা তার হাতেই প্রাণ দিয়েছে। আমি আমার দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করতাম না, তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।

চকিত হ'য়ে বল্লাম—মেয়েদের পক্ষে এসব প্রতিশোধের কল্পনা করা কি ভাল?

ভাল নয়? কেন ভাল নয়? আমার এখন আর অন্য কোন চিন্তা নেই। আপনাদের কথা আলাদা। আপনাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমার আর কেউ নেই। দাদার দোষ থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন আমার প্রিয়তম আত্মীয়। যে তাঁকে হত্যা করে' আমাকে আত্মীয়হীন করেছে, তার উপর আমার ঘৃণা কি অস্বাভাবিক?

ভয়ে ভয়ে বল্লাম—এমনও ত হ'তে পারে যে, কেউ তাঁকে খুন করে নি; হয় ত তিনি নিজেই···

মাথার ঝাঁকানি দিয়ে চন্দ্রা বলে' উঠলো—অসম্ভব। ও-কথা কল্পনা করা যায় না। কেন তিনি ও-কাজ করবেন। জীবনকে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। না। আমি জানি পথের ওপর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিসেও সেই কথা বলছে। আমারও বিশ্বাস তাই। আমার মনে হয়, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এখানে এসেছিলেন। আমি জানতে চাই, কে সে? কি কাজে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? তোমার কাছে এ অন্যায় লাগতে পারে, আচার্য্যের মেয়ে তুমি। কিন্তু তা'তে আমার কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্কল্প আমি কাজে পরিণত করবই!

নীরব হ'য়ে রইলাম। চন্দ্রার জন্যে মনে মনে দুঃখ অনুভব করছিলাম সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন কি এক অজানা আশঙ্কায় থেকে থেকে আন্দোলিত হ'য়ে উঠছিল এবং চন্দ্রার ওপর আমার অন্তরের সকল সহানুভূতি লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, সে আমার সুমুখ থেকে, আমাদের বাড়ী থেকে চলে' গেলে যেন বাঁচি!

আমায় নীরব দেখে সেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তারপর বল্লে—আমার মনে হয় জগদীশ-বাবু ফিরতে হয় ত এখনো অনেক বিলম্ব আছে। সুতরাং, আর অপেক্ষা না করে' ওঠাই ভাল। তা' ছাড়া, বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে ফণি মজুমদারের কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। তিনিও ত মাত্র একমাস এখানে আছেন?

বল্লাম—হ্যাঁ। তা' ছাড়া, এখানে যাঁরা আছেন, তাদের সম্বন্ধে বাবার চেয়ে আমি ঢের বেশী খবর রাখি। তিনি এখানকার কয়েকজনকে ছাড়া বাকী লোকদের সঙ্গে পরিচিত নন। তিনি দিনের বেশীর ভাগ সময় গরীব-দুঃখীদের সঙ্গেই কাটান। সমাজে বড় একটা মেলামেশা করেন না।

চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বল্লে—আপনি ঠিকই বলেছেন। তবুও যখন এসেছি, তখন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আপনি জানেন না বোধ হয়, আমরাও ব্রাহ্ম। সুতরাং, তাঁর সঙ্গে দেখা করে' তাঁর পরামর্শ নেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয় কি?

বল্লাম—দেখা করবেন। বাবা তা'তে আনন্দিতই হবেন।

এমন সময় পিছনে পদশব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পিছনদিকের গেট দিয়ে বাবা বাড়ী ঢুকে তাঁর ঘরে চলে' গেলেন। বল্লাম—বাবা এলেন।

চন্দ্রা বলে' উঠলো—তাই না কি?

—হ্যাঁ। এইবার আপনি তাকে আপনার যা' বক্তব্য সব বলতে পারেন।

বলব বই কি। ভাগ্যিস আগে চলে' যাই নি।

বল্লাম—বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম, বাবা দেওয়ালের কোণে চেয়ারের ওপর বসে' আছেন। তাঁর চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। পথশ্রমে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন।

তাঁর কাছে গিয়ে বল্লাম—বাবা, একটী মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে হচ্ছে, বিজয়বাবুর ছোট বোন্। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছে।

বাবা মুখ তুলে বল্লেন—আমার কাছে তার কি প্রয়োজন?

সে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, ফণি মজুমদার বলে' কোন লোককে আমরা জানি কি না? সেই লোকটা না কি ওর দাদার ভীষণ শত্রু। মেয়েটীর ধারণা, ফণি মজুমদারই ওর দাদাকে খুন করেছে। আমি ওকে বলেছি, এ শহরে ও নামে কোন লোক থাকে না।

বাবা কয়েকবার মৃদুভাবে কেশে তাঁর গলা পরিষ্কার করে' নিলেন। তারপর বল্লেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ কেটি,—এ চত্বরে ও নামে কোন লোক বাস করে না। এর বেশী আর কি জানবার আছে? আমার কাছে সে কি চায়? বল্লাম—আমার কথায় সে নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। তোমার মুখের কথা শোনবার জন্যে বসে' আছে।

বাবা মাথা নেড়ে বলে' উঠ্‌লেন—না না, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। আমি শ্রান্ত; তা' ছাড়া, অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি। তাকে বলে' দাও ও নামে কোন লোক এখানে থাকে না। আমি ঠিক জানি, থাকে না।

অনুরোধের সুরে বল্লাম—একবার দেখা করেই এসো না। মেয়েটা অনেকক্ষণ থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে' আছে। তোমার মুখ থেকে শুনলে, ও আরও খুসী হ'য়ে যাবে।

বিষম চটে' উঠে বাবা বল্লেন—না, আমি দেখা করব না। ও কথা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগছে না। অনর্থক ওই নিয়ে আমায় অনেক উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আর নয়। তুমি তাকে বলে' দাও গে, এখন আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

—অন্য সময় আসতে বল্‌ব?

—না, একেবারে না। কোন সময়ে নয়।

চল্‌বে

তাসের প্রাসাদ *

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ভগ্নী কমলা তাহার তিন বছরের ছেলে কোলে করিয়া আমাদের বাড়ী আসিতেছে। এখনো পনেরো দিন বাকী। ছোট ছোট ভাই-বোন্‌গুলির আনন্দের সীমা নাই। দিন গণিয়া গণিয়া তাহারা যেন অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

ছোট বোন্ বিমলা বলিল—"মা গো, দিদির শ্বশুরবাড়ীর লোকদের কি পছন্দ! অমন সুন্দর ছেলের নাম রাখলেন শেষকালে কালীচরণ। এখানে এলেই আমরা অন্য একটা ভাল নাম রাখবো।

বিনোদ গম্ভীরভাবে বলিল—"দূর পাগল, তা'কি হ'তে পারে! তাঁরা যে নাম রেখেছে, সে নাম কি বদলানো যায়?"

মুহূর্ত্তমধ্যে সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। বিমলা হতাশ হইয়া বলিল—বদলানো যায় না দাদা! তা' হ'লে কি হবে! আমরা কিন্তু কালীচরণ বলে ত ডাকতে পারবো না কিছুতেই।"

তাহাদের একান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—এক কাজ তোমরা করতে পারো। এখানে ভাগ্নেটী যতদিন থাকবে, ততদিন তোমরা তোমাদের রাখা নামে তাকে ডাকতে পারো।"

সকলের মুখে নিমেষের মধ্যে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিমলা বলিল—"দাদা, খোকার নাম 'তুষারবরণ' কিংবা 'জ্যোৎস্নাকুমার'—এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা রাখা যেতে পারে?"

রেণু বহুক্ষণের মৌনতা ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমি বল্‌ছিলাম কি 'মলয়' নামটাই ভাল।"

টুনু বলিল—না, সমীর রাখ্‌লেই বেশী ভাল হয়।"

বিনোদ বলিল—"সুনীলকুমার। দাদা, কি বল?"

মহামুস্কিল। সকলেই নিজ নিজ পছন্দমত নাম ঠিক করিয়াছে। কাহার কথা রাখি! অবশেষে সকল সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য বলিলাম—"দেখো, তোমাদের কোন নামটাই ঠিক হ'ল না। ভাগ্নের নাম রাখা হোক্, 'পুলক।' মানে,—যাকে দেখ্‌লে পুলক জাগবে, বুঝ্‌লে?"

আমার মতে সকলেই মত দিল। 'পুলক' নামটা সকলেরই ভাল লাগিল।

বারান্দার কোণে ভাঙ্গা আল্‌মারীটা বহু দিনই অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। ভাই-বোনেরা জল খাবারের পয়সা জমাইয়া সেটীকে সারাইয়া নূতনের মতই করিল। বার্ণিস্ করা কাঁচ বসান আলমারী ঘরে উঠিতে তাহাকে আর আমাদের বলিয়া চিনিবার উপায় রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম দুই তাকে নানারকম পুতুল-খেল্‌নায়, আর নিচের দুই তাক নানান রঙ্-বেরঙের জামায় ভরিয়া উঠিল।

রেণু বলিল—"পুলকের জন্যে কত জিনিষ কিনেছি দেখেছ, দাদা?"

টুনু বলিল—"সে এত জিনিষ পেয়ে কত আনন্দ করবে বল ত দাদা! তুমি যেন আগে থেকে চিঠি লিখে এ কথা জানিয়ে দিও না।"

বলিলাম—"কেন রে?"

সে বলিল—"একেবারে এসে হঠাৎ এসব

---

* ক্র্যালুকেসিঁর গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

দেখে দিদি ও পুলক দু'জনেই খুব অবাক হয়ে যাবে!"

বিমলা আলমারী হইতে এক-একটী জিনিষ বাহির করিয়া দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিল—"এই ভাখো দাদা, দম দেওয়া রেল-গাড়ী, মোটর—রেণু কিনেছে। এই বল, ডল্, বাঁশী, হাতী—বাতাস লাগলেই এটা শুঁড় নাড়বে—এগুলো সব আমি দিয়েছি। সিল্কের পাঞ্জাবী, জরী পেড়ে কাপড়, ভেল্‌ভেটের জুতো, এ সব দিয়েছেন বাবা। আর মা দিয়েছেন—এই জরী বসানো ভেল্‌ভেটের কোট-প্যান্ট। রুমাল চারখানা, ছিটের ফ্রক্ পাঁচটা, চুড়ি, লুডো এগুলো কেনা হয়েছে টুন্থ আর বিনোদের পয়সায়!"

হঠাৎ একটা তীব্র আওয়াজে চমকিয়া উঠিলাম। ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। বিমলা এবং অন্যান্য সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বিমলার হাতে দেখিলাম ছেলেখেলার জার্ম্মাণীর এক পিস্তল। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হবে এতে?"

রেণু হাসিয়া বলিল—"পুলক এই ছুঁড়ে আমাদের সকলকে ভয় দেখাবে। ভয় তো আমরা পাব না। বেশ মজা হবে!"

—"দাদা, চিঠি এসেছে দিদির, দেখবে এস

ভাই-বোনের মিলিত ডাকে পড়াশোনার আশা ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

মা তরকারী কোটা ছাড়িয়া একমনে চিঠি পড়া শুনিতে লাগিলেন। বিমলা পড়িতেছিল।

কমলা লিখিয়াছে—খোকা সেদিন না কি তার বাপের সঙ্গে অনেক দূর বেড়াইয়া আসিয়াছে; কথা সে ভালভাবে বলিতে শিখিয়াছে; আর অত্যন্ত মজার কথা এই যে, তার বাপকে একদিন তামাক খাইতে দেখিয়া উহা সে খাইবার জন্য অত্যন্ত জেদ ধরিয়াছিল।

মা হাসিয়া আকুল। বিমলা গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা, কি ছেলে গো!"

পনেরো দিন কাটিল, কিন্তু কমলার দেখা নাই। আরও সাতদিন চলিয়া গেল, তবুও তাহার কোন সাড়া-শব্দ মিলিল না।

ব্যাপার কি কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। দু'খানা চিঠি লেখা হইল। তাহারও কোন উত্তর আসিল না।

বাবা বলিলেন—"ভাববার কিছু নেই; কোনও বিশেষ কাজে হয় ত তারা আট্‌কে পড়েছে—দু'-তিনদিন পরে আসবেই তারা।"

সকলেই ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত! বাহিরে মোটরের আওয়াজ হয়,—ভাই-বোন্, এমন কি মা পর্য্যন্ত হুমড়ি খাইয়া সদরের দিকে আগাইয়া যান—কমলা পুলককে লইয়া আসিল কি না দেখিতে!

বাবা হিসাবের খাতা ফেলিয়া উপর হইতে জিজ্ঞাসা করেন—"দাদু আমার এলো না কি?"

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আবার তিনি কাজে মন দেন।

কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলাম,—বাড়ীটার চারিদিক একটা ম্লান বিষণ্ণতায় যেন থম্‌থম্ করিতেছে!

কিছুক্ষণ পরে কানে ভাসিয়া আসিল, একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। সকলই রহস্যময় ঠেকিল!

উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিলাম,—মা, ভাই-বোন্‌গুলি সব কাঁদিতেছে। মেঝে হইতে টেলিগ্রাম তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম,—কমলার খোকা আমাদের ফাঁকি দিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে!

বিস্ময়

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বীণা অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একবার একটু ইদিকে এসে দেখে যাও

সন্তোষ চকিত হইয়া কহিল, কেন ?"

বীণার চোখের পাতা চপল হইয়া উঠিল। সে বলিল, তোমার অনেক সর্ব্বনাশই ত এ পর্য্যন্ত করেচি, আজ আর একটুও না হয় শেষ করে' রাখি।

সন্তোষ বীণার কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ও-সব ঠাট্টা-ইয়ারকি এখন ভাল লাগে না বৌদি'।

বীণা সহজ কণ্ঠেই বলিল, ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো। এর পরেই ত দশজনে খোঁজ করবে, সেদিন তুমি রাগ করে' কোথায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে ? লোকে জানলে খুসিই হবে যে, তোমার বৌদি' তোমাকে কতখানি ভালবাসে।

সন্তোষ ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি খাব না, কিছুতেই না।

বীণা সন্তোষের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, অপমানে লজ্জায় দেহমন বিষিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা' বলে' পেটের ক্ষিদে ত পেটেই থেকে যায়। এই বেলা একটার সময় আর কেউ পারলেও আমি তোমাকে অভুক্ত থাকতে দিতে পারি না।

সন্তোষ অতিদুঃখে বলিয়া ফেলিল, আজ আমাকে মাপ কর, বৌদি'।

বীণা তাচ্ছিল্যভরে কহিল, পুরুষ মানুষের এতটা দুর্ব্বলতা কি ভাল ঠাকুরপো ? স্বীকার করি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার সামর্থ্য সকলের থাকে না, কিন্তু তা' বলে' যে যা' বলবে, তাই যে মাথা পেতে নেব—এও ত কোন কাজের কথা নয়।

সন্তোষ কোন উত্তর করিতে পারিল না।

বীণা এমন ভাবে সন্তোষের হাত ধরিয়া তাহাকে রান্নাঘরের দিকে লইয়া আসিল যে, সন্তোষ ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কোনমতেই আর বাধা জন্মাইতে পারিল না।

সন্তোষ ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই কহিল, বৌদি', আমাকে ছ'টা টাকা এখুনি দিতে হবে কিন্তু।

বীণা এঁটো হাত তুলিয়া পাশেই বসিয়াছিল। উত্তর করিল, কেন, এখুনি কোল্‌কাতা যাবে না কি ?

সন্তোষ ছোট্ট একটি 'হু'' বলিয়া আহার্য্যের প্রতি মন দিল।

সন্তোষ আঁচাইয়া আসিয়া বীণার সম্মুখে দাঁড়াইতেই বীণা মৃদু হাসিয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, চোখ-কাণ বুজে গো-গ্রাসে কি যে গিল্‌লে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে ত ?

কি জানি! বলিয়া আবার কহিল, বৌদি', যা' বল্লাম।

সন্তোষ আঁচাইতে গেলে সেই অবসরে বীণা বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া-

ছিল, কিন্তু দেওয়া উচিত, কি অনুচিত হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই চুপ করিয়াছিল। উচিত অনুচিতের স্থির সিদ্ধান্তে কিছুতেই পৌঁছাইতে না পারিয়া টাকা কয়টি সন্তোষের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, দেওয়া উচিত হ'ল কি না এখনও ঠিক বুঝতে পারচি না।

সন্তোষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, তোমার টাকা না পেলেও আমি আজই এ গাঁ ছেড়ে চলে' যাব।

সন্তোষ চলিয়া গেলে বীণা না জানি কোন্ এক অজ্ঞাত ক্রুর দেবতার উদ্দেশে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। অশ্রুর আঘাতে নিষ্ঠুর অটল দেবতার ধ্যান ভাঙ্গিল কি না—কে জানে!···

ভীষণভাবে এই কদর্য্য নিষ্ঠার প্রতিবাদ করিল শৈলেশ।

সভার এতগুলি দোষে-গুণে বিজড়িত প্রৌঢ় বৃদ্ধ কেহ-ই যখন কোন কথা বলিল না, তখন শৈলেশ পোলাওয়ের বাল্‌তিটা মেঝেয় সশব্দে বসাইয়া দিয়া কহিল, এটা আপনার কোন্ দেশী ভদ্রতা হলো, চক্কোত্তি-ম'শায়? এতই যদি আপনার নিষ্ঠা-শুদ্ধি বাদ-বিচার, তবে সভায় না বসাই ত আপনার উচিত ছিল। একটা মিথ্যাকে ভিত্তি করে' আপনি আজ যে কাজটা অনায়াসে করে' বাহাদুরী নিতে চাইচেন, সে জন্যে একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে—

শৈলেশ ক্ষিপ্তের মত কম্পিত-কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলিয়া যাইত, যদি না বাড়ীর কর্ত্তা সতীশ রায় ব্যাকুল হইয়া আসিয়া তাহাকে বাধা দিতেন। সতীশ রায় সহজেই বড় ভয় পাইয়া যান; পাছে, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেহ বাদানুবাদের ফলে সভা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে,তাহা হইলে তাহার সমস্ত আয়োজনই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই ভয়ে তিনি বলিলেন, আহা-হা, করিস্ কি শৈল?

শৈলেশ প্রথমটা বাধা পাইয়া থামিল; কিন্তু পরক্ষণেই উদ্দীপ্ত ক্রোধে বলিয়া যাইতে লাগিল, আজ এতগুলো নিমন্ত্রিত ব্যক্তির খাওয়া-দাওয়া পণ্ড করবার সাধ আমার নেই তাই, নইলে, চক্কোত্তি ম'শায়, আজ আপনাকে আমি চোখের জলে নাকের জলে করে' ছাড়তাম। কে না জানে আপনার নিজ স্বভাব-চরিত্রের কথা?

সভার সকলে প্রায় একসঙ্গেই হেই হেই করিয়া শৈলেশের উন্মত্ত আবেগে বাধা দিল।

ছিঃ, লজ্জা বোধ হয় না একটুও?—রাগে ক্ষোভে শৈলেশের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে পোলাওয়ের বাল্‌তির উপর পিতলের হাতাটা সশব্দে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতুল চক্কোত্তি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

সতীশ রায় হাতজোড় করিয়া অতি কুণ্ঠিত বিনয়ের সহিত এই অসঙ্গত বাদানুবাদের জন্য সভাস্থ সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শৈলেশ উন্মাদের মত কোমরের গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল, তখন সতীশ রায়ের বড় মেয়ে তরুবালা তাহাকে দেখিয়াই একটা কিছু যে ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিয়া তাহার গতিতে বাধা জন্মাইল।

শৈলেশ বলিল, অতুলো চক্কোত্তির মত ছোটলোককে যেখানে নেমন্তন্ন করা হয়—

আর কিছুই সে বলিতে পারিল না।

তরুবালা শৈলেশের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ছিঃ শৈল, তা' বলে' অমনি রাগারাগি করে' যেতে আছে কি?

এই তরুবালার বয়স খুব বেশী না হইলেও গ্রামের আর সকলের চাইতে সেই যে গ্রামের তরুণ-তরুণীদের কাছ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা ও সম্মান আদায় করিয়া লইত তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বন্ধ্যা হইয়াও এতবড় মাতৃস্নেহের আধার এ গাঁয়ে কেন অনেক গাঁয়েই দুর্লভ। তাহার কথা এড়াইতে পারা অতিবড় একগুঁয়েরও সাধ্য ছিল না; শৈলেশও পারিল না।

তরুবালা সস্নেহে শৈলেশের হাত ধরিয়া তাহাকে দরদালানে আনিয়া সযত্নে বসাইয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, আচ্ছা শৈল, রাগারাগি করে' এই দুপুরবেলা গিয়ে না খেয়ে থাকতিস্ ত ?

শৈলেশ অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, উপোসী থাকতে হবে কি না বলতে পারি না, কিন্তু এ বাড়ীতেও আমি আজ আর খেতে পারব না।

তরুবালা হাসিয়া ফেলিল। সে হাসিলে তাহার গালে যে টোল পড়িল, তাহা সত্যই বিস্ময়কর! কিন্তু তাহার [illegible] মধ্যে এমন একটি মাতৃভাব সদাজাগ্রত থাকিত যে, মুখের কোন ভাববিলাসই কখন কাহারও মনে নীচ লালসা জাগাইয়া তুলিত না। এই পবিত্র মন্দির-চূড়া যাহারই দৃষ্টিপথে পতিত হইত, সেই সম্ভ্রমভরে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইত।

শৈলেশের রাগ এই হাসির ইঙ্গিতে সরিয়া দাঁড়াইল।

তরুবালা বলিল, শৈল, রাগারাগি যাদের সঙ্গে হয়েচে, তাদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করিস, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কি? যাক্, ব্যাপারটা কি হয়েচে শুনি ?

শৈলেশ সসঙ্কোচে কহিল, সে আমি তোমার কাছে প্রকাশ করে' বলতে পারব না।

তরুবালা সস্নেহে বলিল, এমন কিছু কি করতে আছে শৈল, যার জবাবদিহি অসঙ্কোচে সকলের কাছে করা যায় না ?

শৈলেশ শান্ত ধীরকণ্ঠে বলিল, আমি কিছুই করি নি।

তরুবালা পাখা মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে তাহার না আছে বিস্ময়, না আছে ব্যথা, বা ব্যাকুলতা, —আছে এমন কিছু, যাহা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু মানুষ না বুঝিয়াও তাহারই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

তরুবালাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া শৈলেশ বলিল, আমি চল্লাম কিন্তু বড়দি'।

তরুবালা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অন্ততঃ দুটো মিষ্টি মুখে না দিয়ে গেলে চলবে না আর তুই যদি এমন করে' চলে' যাস ত বিজয় পৈতেয় অমঙ্গল স্পর্শাবে যে।

শৈলেশ ক্ষুব্ধ হইলেও তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু সহসা তাহার সন্তোষের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেও ত' তাহারই মত অভুক্ত অবস্থায় অপমানিত হইয়া বিদায় লইয়াছে। সে তরুবালার চক্ষু এড়াইয়াছে; কিন্তু গৃহে যদি এই অবেলায় তাহার ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছুই না থাকে, তবে সে এই অবস্থাতেই হয় ত স্টেশনে চলিয়া যাইবে। শৈলেশ ইহা বুঝিয়াছিল যে, সন্তোষ কোনমতেই আর আজিকার রাত্রি এই গ্রামে কাটাইবে না। তাহার এ অনুমানের নজিরেরও অভাব হইল না। সে'বার ইহা অপেক্ষা তুচ্ছ কারণেই ত তাহাদের অভিনয় স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।........

তরুবালা একটি থালায় পোলাও হইতে সুরু করিয়া একপ্রকার সকল দ্রব্যই কিছু কিছু সাজাইয়া আনিয়া হাজির করিল।

শৈলেশ অপর্য্যাপ্ত আহার্য্যের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি তোমার চোখ এড়াতে পারি নি বলে' আমাকে ত খুব ঘটা করে' খাওয়াচ্ছ, কিন্তু যে চোখ এড়িয়ে গেল সে যে অভুক্ত থাকবে

তরুবালা রাগ করিয়া বলিল, সে আবার কে? তা' এতক্ষণ বলিস্ নি কেন হতভাগা?

শৈলেশ বলিল, সন্তোষ।

আচ্ছা, তুই একটু বোস্ তবে।—বলিয়া তরুবালা একটা চাকরকে ডাকিয়া তাহাকে সন্তোষের খোঁজে তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। অনতিবিলম্বেই চাকর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, সন্তোষ দাদাবাবু ত বাড়ী ফিরে যান নি।

তরুবালা চিন্তান্বিতভাবে বলিল, তবে আমি নিজেই একবার দেখে আসি ভাই, তুই একটু বোস্ শৈল।

কিছুক্ষণ পরে তরুবালাও ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সন্তোষের সন্ধান মিলিল না। সে ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, তোরা যে কি শৈল, আমাকে না কাঁদিয়ে তোদের দিন যায় না।

এই দিদিটির ব্যাকুলতা দেখিয়া শৈলেশেরও বুকে একটা ব্যথাতুর উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ চাপিয়া রাখিয়া কহিল, এমন করে' মিথ্যামিথ্যি অপমান করলে কেউ তিষ্ঠোতে পারে না দিদি; তুমিও পারতে না। সন্তোষ বোধ করি এতক্ষণে স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েচে।

তরুবালা উৎকণ্ঠা-আকুল-কণ্ঠে কহিল, লোক পাঠিয়ে দেব শৈল?

শৈলেশ বলিল, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না দিদি।

তবে তুই নিজেই একবার তাড়াতাড়ি খেয়ে যা' না শৈল। দেখা পেলে যেমন করে' পারিস্ তাকে ফিরিয়ে আনবি। নইলে সমস্ত আনন্দই যে আমার কাছে বিষ হ'য়ে উঠবে।

উপর হইতে সতীশ রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, ও কমল, ও সতু, সবাই যে হাত তুলে বসে' আছে।

শৈলেশ ও সন্তোষের মত দুই-দুইজন দিক্‌পাল হারাইয়া তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ নিজেদের কাজের মধ্যে উভয়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলা একবার আনিয়া ফেলিল, তাহা আর শত চেষ্টায়ও শৃঙ্খলায় দাঁড় করাইতে পারিল না

তরুবালার কর্ণে পিতার নিরুপায় চীৎকার-ধ্বনি আসিয়া পৌঁছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, ও'দিকে কিন্তু ভারী বিশৃঙ্খলা সুরু হ'য়ে গেছে।

শৈলেশ মাথা নীচু করিয়াই আহার করিতে

সতীশ রায় আবার হাঁকিয়া কহিলেন, আঃ, তোরা কি আনবি, নিয়ে আয় না!

এই বিশৃঙ্খলা সকলের চোখে ধরা পড়িয়া গিয়া গোলমাল চীৎকার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, কিন্তু কাজ কিছুতেই অগ্রসর হইল না

পদ্মাতীরের এই গ্রামগুলির পথঘাট অন্য গ্রামগুলির তুলনায় উচ্চ বলিয়াই পুরা বরষায়ও ডুবিয়া যায় না। তবে গ্রামের ভিতরকার খাল-গুলি ফাঁপিয়া খরস্রোতময়ী হইয়া উঠে—পারাপারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটাইয়া তোলে, এই পর্য্যন্ত।

শৈলেশ এই উত্তেজনাময় ঘটনার ভবিষ্যৎ মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে এবং কি উপায়ে এই ঘটনার মূল ওই নীচ প্রকৃতির অতুল চক্রবর্ত্তিকে গাঁয়ের লোকের সামনে মাথা হেঁট করানো যাইতে পারে তাহা ভাবিতে ভাবিতে যখন নিজ বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বাড়ীর চাকর দুঃখীরাম

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাগানের বেড়া বাঁধিতেছিল। শৈলেশই তাহাকে কাজের জন্ম নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিল। সকালবেলা কোথাকার একটা দুষমন ষাঁড় আসিয়া নানাস্থান হইতে বহু আয়াসে সংগৃহীত পুষ্পবৃক্ষগুলির উপর এমন নৃশংস দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছে যে, শৈলেশ চোখের জল অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়াছে মাত্র।

তাহার জীবনে দুইটি জিনিস কায়েমী অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল—একটি ফলের বাগান, আর দ্বিতীয়টি থিয়েটার। তাহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য সে এই দুইটির জন্ম ঢালিয়া দিয়াছিল। যাহা কিছু সে করিত,—প্রাণ দিয়াই করিত। হৃদয়াবেগের তাহার অভাব ছিল না, তাই সেদিন যখন সন্তোষের অভাবে 'চন্দ্রগুপ্ত' মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছিল তখন অতিদুঃখেই গ্রামের লোক নিঃসন্দেহে অসঙ্কোচে সন্তোষের ঘাড়ে যে অপবাদ চাপাইয়া দিয়া খুসি হইয়াছিল, তাহা সে বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ঠিক বিশ্বাস বলা চলে না—তাহা ক্রোধেরই রূপান্তর মাত্র। কাজেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সে প্রতিবাদ করিতেও দ্বিধা বোধ করিল না।

শৈলেশ দুঃখীরামের ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত মুখের পানে চাহিয়া স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিল, ওরে দুখু, তোকে একটা কাজ করতে হবে যে।

দুঃখীরাম শৈলেশের সমবয়সী এবং তাহার প্রত্যেক কাজে একান্ত অনুগত ভক্ত শিষ্যের মত অনুসরণ করাই ছিল তাহার স্বভাব।

দুঃখীরাম হাতের কাটারি জন্তে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, কি দাদাবাবু?

আমার সঙ্গে একবার স্টেশন-ঘাটে যেতে হবে।

এ আর বেশী কথা কি!—দুঃখীরাম উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশ নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া র‍্যাকেট হইতে একটা টুইলের সার্ট তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। দুঃখীরাম খাটের তলা হইতে সযত্ন-রক্ষিত পম্পসু জোড়াটি আবিষ্কার করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল।

শৈলেশ জুতাজোড়ার পানে চাহিয়া বলিল, অত সাজগোজের আমার সময় নেই।

দুঃখীরাম জুতাজোড়া পায়ে পরাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়া কহিল, সে হয় না দাদাবাবু, মাঠ ঘাট এখন তেতে লাল হ'য়ে আছে।

শৈলেশ অগত্যা দুঃখীরামকে সরাইয়া দিয়া নিজেই জুতাজোড়া পায়ে পরিতে পরিতে বলিল, চল এবার।

দুঃখীরাম কাঁধে একটা ফতুয়া ফেলিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা বাঁধানো ছড়ি লইয়া শৈলেশের হাতে দিয়া বলিল, চলুন দাদাবাবু।

শৈলেশ এইবার হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, আমি কি শ্বশুরবাড়ী চলেছি না কি দুখু, যে, তুই আমাকে ঘটা করে' সাজতে সুরু করলি?

কি যে বলো দাদাবাবু, টুইলের সার্ট গায়ে কি তোমাকে সেখানে যেতে দিতাম না কি?—বলিয়া দুঃখীরাম নিজের রসিকতায় নিজেই একান্ত তৃপ্তিভরে হাসিয়া উঠিল।

শৈলেশ ঘর হইতে বাহির হইলে দুঃখীরাম ঘরের চৌকাটে হস্ত স্পর্শ করাইয়া কপালে ঠেকাইল, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশকে দাদাবাবুর মনস্কাম পূর্ণ করিতে ঐকান্তিক অনুরোধ করিয়া মোটা বাঁশের লাঠিটি কাঁধে ফেলিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

এতক্ষণে বীণা বুঝিল, যে ঘটনায় একপ্রকার

বাধ্য হইয়া সন্তোষ গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, তাহা ক্রমে শাখা-পল্লবে পরিপুষ্ট হইয়া এমন রূপ ধারণ করিয়াছে, যাহাতে ও বাড়ীতে নিজের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সকলে আকারে-ইঙ্গিতে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইবে না যে, তাহাও নিশ্চয় করিয়া ত কিছুই বলা যায় না, বরং পাওয়াই স্বাভাবিক।

সন্তোষ সরিয়া পড়িয়া তাহার সাহস অনেকখানি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে যদি প্রত্যক্ষ সভ য় দাঁড়াইয়া স্পষ্টভাষায় মিথ্যার তীব্র প্রতিবাদ করিত, তবে ব্যাপারটা বিশেষরূপে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই, কিন্তু বীণার পক্ষে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করাটা কিছু সহজ হইত বলিয়া তাহার মনে হইল। কিন্তু ঠিক কি যে হইত, তাহা সেও বুঝিতে পারিতেছিল না। মানুষ যে অবস্থার সম্মুখে আসিয়া পড়ে তাহাকেই শক্ত, এবং যাহার সম্মুখীন হওয়া গেল না, তাহাকেই সহজ মনে করিয়া থাকে— বীণা তাহাই মনে করিতেছিল।

পরমুহূর্ত্তেই আবার নিজের এই ক্ষণদৌর্ব্বল্যে বীণা নিজেই চমকাইয়া উঠিল। এই উৎকট চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্তি দিবার জন্য পরিত্যক্ত মাসিক-পত্রখানা আবার তুলিয়া লইয়া তরুবালার আহ্বানের প্রতীক্ষাই করিতে লাগিল।

স্বামী কর্ত্তৃক বিবৃত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে সে যখন প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে, তখন তরুবালা আসিয়া বলিল, ছোট-বৌ অহোরাত্র তোমার কি অলুক্ষুণে বই পড়া বল ত? ঘরে আগুণ লেগে গেলেও যে তোমার হুঁস হয় না। খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?

এই যাই!—বলিয়া বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তরুবালা এতদিন পরে এই প্রথম বীণার রূপ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

এতখানি রূপ!—সে বিস্মিত হইল না, একটা অকারণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বুকের বোঝা অনেকখানি হাল্কা করিল।

পুরুষের দল হল্লা করিয়া তখন নিমন্ত্রণ-বাড়ী হইতে বিদায় লইতেছিল

হাড়-হাবাতে মাঠটা চিতাগ্নির মত দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। শৈলেশ মাঠে পা বাড়াইয়াই এক ঝলক্ তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিল। দুঃখীরাম অমনি আত্মপ্রশংসায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। এসব সুযোগ সে কোনদিনই ব্যর্থ হইতে দেয় না। সে বলিল আমার কথা না শুনলে আজ কি কষ্টটাই না পেতে দাদাবাবু।

শৈলেশ দুঃখীকে খুসি করিবার জন্যই বলিল, এই জন্যেই ত আর সবাইকে বাদ দিয়ে তোকে সঙ্গে আনতে চাই দুখু।

দুঃখী আত্মমর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া গদগদভাবে বলিল, কত্তাবাবুও আমাকে ভিন্ন আর কাউকে সঙ্গে নেন না।

এমন সময়ে দুঃখীরামের মনে পড়িয়া গেল, —তাই ত, সেই ষাঁড়টা আবার যদি এই অবসরে বাগানের উপর উৎপাত সুরু করিয়া দেয়, তবে তাহাকে বাধা দিবার মত কেহ যে নাই। এখন উপায়?

কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া দুঃখারাম নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিল, দাদাবাবু, এই যা'—একটা ভুল হ'য়ে গেছে যে।

শৈলেশ বলিল, কি আবার তোর ভুল হলো?

দুঃখীরাম নিতান্ত প্রাণহীনের মত বলিল,

বাগানটা ত কারও জিম্মায় রেখে এলাম না দাদাবাবু।

শৈলেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, ও হরি, এ-ই। নে এখন, একটু পা চালিয়ে চল। ওবেলা যে ঠেঙান্ ঠেঙিয়েচিস্, বেটার যদি বুদ্ধি থাকে ত ছ'মাসের মধ্যেও আর ও মুখো হবে না।

দুঃখীরাম কিছু আশ্বস্ত হইয়া জোরে জোরে হাটিতে সুরু করিল।

শৈলেশ আর দুঃখীরাম ষ্টীমার স্টেশনের সকল জায়গা ভাল করিয়া সন্ধান করিয়াও সন্তোষের দেখা পাইল না।

শৈলেশ স্টেশন মাষ্টার শিববাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ষ্টীমার আসিতে এখনও কুড়ি মিনিট বিলম্ব আছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল, সন্তোষ একটা চামড়ার সুটকেশ হাতে স্টেশনের দিকে চিন্তা-শ্লথ পদদ্বয়কে অতিকষ্টে টানিয়া আনিতেছে।

সন্তোষ এই প্রত্যাশিত দর্শনেও বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিল।

শৈলেশ আনন্দ ও ব্যথার সংমিশ্রনে এক-প্রকার অদ্ভুত-কণ্ঠে বলিল, এ কি তোর পাগ্-লামী নয় সন্তোষ? এই অবেলায় খাওয়া-দাওয়া কিছু না করে' কোথাও যাওয়া কি তোর উচিত? আর বড়দি' যে এতে কতদূর ক্ষুণ্ণ হয়েচেন তা' বলা যায় না।

সন্তোষ একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, এমন একটা বাধা যে আমি পাব তা' আগেই ভেবে-ছিলাম। সত্যি, আমি খাওয়া-দাওয়া করে' এসেচি। আর তুই ত ভাল করেই জানিস্ যে, আমি একবেলাও না খেয়ে কাটাতে পারি না। আর, বড়দি'র কথা···হুঁ, তাকে বলিস, সে যেন মনে করে, এবার পূজোয় আমি গ্রামে আসি নি। এমন ত অনেক বছর গেছে, যেবার পূজোয় আসতে পারি নি।

শৈলেশ বলিল, আচ্ছা, স্বীকার করলাম তুই খেয়েচিস্, কিন্তু বড়দি' এমন উত্তরে কখনই সন্তুষ্ট হবে না।

সন্তোষ বলিল, তা' আমি জানি, কিন্তু এ ভিন্ন আমি ত আর কোন পথই দেখচি না।

শৈলেশ কণ্ঠস্বর আর একটু নামাইয়া বলিল, আমি তোকে না নিয়েও হয় ত ফিরতে পারব, কিন্তু বড়দি'র কাছে এ মুখ আর দেখাতে পারব না।

সন্তোষ অবিকৃত-কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা, তুই নিজেই বল,—এ অবস্থায় আর একদণ্ডও কি আমার এ গ্রামে থাকা উচিত?

শৈলেশ ভাবিয়াছিল, ষ্টীমার আসিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে তর্ক করিবে এবং তাহার যুক্তির মাঝে সন্তোষ যে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য, তাহা একান্তভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু সন্তোষ যে তাহাকে কখনও এমন সমস্যায় ফেলিয়া দিতে পারে তাহা সে ভাবেই নাই।

নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সে বলিল, আচ্ছা, তুই নিজেই ভেবে দেখ্।

সন্তোষ এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার মত অবকাশ পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া দিয়া সে বলিল, সত্যি, এ আমার দুর্ব্বলতা শৈলেশ। আমি এর ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে চাই। আমি পুরুষ, আমার অপবাদ অপযশে খুব বেশী আসে যায় না, কিন্তু—

আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। শৈলেশ তাহার অব্যক্ত কথার ইঙ্গিত সহজেই ধরিতে পারিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে নিজেকে অক্ষম জানিয়া সন্তোষের উপরেই বিচার বিবেচনার ভার দিয়াছিল, কিন্তু এমন মনোমত ফল যে

কখনও ফলিতে পারে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

অদূরে পদ্মার মাঝে আগন্তুক ষ্টীমারের সিটি বাজিয়া উঠিল।

সন্তোষ শৈলেশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, চল, ফিরেই যাব।

দুঃখীরাম সন্তোষের হাত হইতে স্যুটকেশটা নিজের কাঁধে ফেলিয়া তাহাদের আগ বাড়াইয়া চলিতে লাগিল।

সন্তোষ সম্মুখের আগুন ছড়ানো বিস্তৃত মাঠের পানে চাহিয়া বুঝিল,—যে মাঠ সে ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখন আর তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়। এমন নির্মমতা সে বোধ করি জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল।

শৈলেশ আপন বিস্ময়ের সীমারেখা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ভোরের নবস্ফুট আলোকে বীণা উঠান নিকাইতেছিল।

চিনুর মা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কি একটা কথা বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে বীণার সুনিপুণ হাতের কাজ দেখিতে দেখিতে নিজের কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেল।

বীণা চিনুর মা'কে লক্ষ্য করিয়াই গোময়-লিপ্ত হাতে সলজ্জভাবে মাথার ঘোম্‌টা আর একটু টানিয়া দিল। কাপড়ের উপর এক পোঁচ গোবর জলের দাগ পড়িয়া গেল।

একটা সদ্য জাগরিত বনের পাখী তখন নবোদ্যমে চীৎকার সুরু করিয়াছিল।

বিস্মৃত কোন কথা সহসা মনে পড়িয়া গেলে মানুষ যেমন ত্রস্তে তাহা প্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইয়া ওঠে, চিনুর মা'ও সেইরূপ ব্যগ্রতাসহকারে কহিল, বুঝলে বৌমা, এই অত্‌লো চক্কোত্তিকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। এ গাঁয়ের কে না জানে এই পোড়ারমুখোর কু-চক্করে দৃষ্টিতে পড়েই চিনু আমার—

বলিয়াই চিনুর মা কাঁদিয়া ফেলিবার এমন আয়োজন করিল যে, বীণা উদ্‌ভ্রান্ত ত হইলই, ভয়ও কিছু পাইল। আর চিনুর মা'র লক্ষ্য যে কোথায় তাহা অনুমান করিয়াই তাহার সমস্ত দেহে রক্ত-চাঞ্চল্য দেখা দিল। সতীশ রায়ের বাড়ীর উপনয়নের দিনটা স্মরণ করিয়া শঙ্কায় তাহার মুখ পাংশু হইয়া উঠিল।

চিনুর মা আগত অশ্রু কোনরকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিতে সুরু করিল, ও বেটার মত ছোটলোকে কি এ গাঁয়ে আর দু'টি আছে! ভূ-ভারতে এই হতভাগার আর জুড়ি মেলে না, এ আমি তোমাকে বলে' রাখচি বৌমা। সন্তোষ করছিল পরিবেশন,—কই, আর কেউ ত আপত্তি তুললে না; তুলতে গেল কি না ওই অপোগণ্ড আকাট টা। ইচ্ছে করে, ওর মাথাটা শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে ভাল করে' থেঁৎলাই। এ না যদ্দিন করতে পারব, তদ্দিন আমার আশ আর কিছুতেই মিটবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, আর তোমাকেও বলি বৌমা। তোমা-দের দু'জনারই সোমত্ত বয়স, এত মাথামাথি মেশামিশি একটু আড়ালে-আব্‌ডালে করাই ঠিক না কি? আমরা অবিশ্যি পাড়া-পিতিবেশী। …দু'জনকেই জানি,—আমরা কিছু না মনে করলেও বাইরের লোক ত সহজেই একটা মন্দ কিছু ধারণা করতে পারে। তাদের ত খুব বেশী দোষ দেওয়াও চলে না।—

বীণার সংযম টলিল। প্রথম উত্তর দিতে তাহার কেমন যেন ঘৃণা বোধ হইল, পরমুহূর্ত্তেই

আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সংযত-কণ্ঠে বলিল, ও মুখ নিয়ে বাড়ী বয়ে এসে কথা শোনাতে লজ্জা করে না ?

চিনুর মা আহত অভিমানে অধিকতর রূঢ় আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল,করে, করে, কিন্তু বৌমা, তোমাদের ভালবাসি বলেই ত তোমাদের অমঙ্গল সইতে পারি না, নইলে—

চিনুর মা'র এই কৃত্রিম অভিনয়ে বীণার সর্ব্বাঙ্গ বিষের জ্বালায় রিরি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উঠান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ব্যঙ্গ-বিকৃত-কণ্ঠে বলিল, ওরে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরে—

বীণা এত আস্তে এই ব্যঙ্গোক্তি করিল যে, তাহা চিনুর মা'র কানে প্রবেশ করিল না।

চিনুর মা অদূরে জগত্তারিণীর আগমন লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় সরিয়া যাইতেছিল। জগত্তারিণী তাহা লক্ষ্য করিলেন কি না বলা যায় না, তিনি বীণার অসমাপ্ত কাজের প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়াই কহিলেন, ছোট বৌমা, কাজ ফেলে উঠে গেলে যে ?

বীণা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, তোমার পূজার বাসন-কোসন যে এখনও মাজা হয় নি।

জগত্তারিণী সস্নেহে বলিলেন, ক'খানা আর বাসন, সে আমি নিজেই একটু মেজে-ঘষে নেব 'খন। তুমি উঠোনটা নিকিয়ে ফেল বৌমা।

বীণা বলিল, এই সকালবেলা তোমাকে আমি জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে দিতে পারব না।

মানুষের হৃদয়ে ব্যথা সংগ্রহের যে একটি যন্ত্র আছে, তাহা একটু অতিমাত্রায় সচেষ্ট। কাজেই কখন যে কোন্ অতি সাধারণ ঘটনা হইতে সে ব্যথা সংগ্রহ করিয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে একটু ভারী করিয়া তোলে, বা আর একটু গভীরতা দিতে গিয়া চোখ আর্দ্র করিয়া দিয়া যায়, তাহার হদিস্ পাওয়া খুব শক্ত। মানুষ সে জন্য প্রস্তুত হইয়াও থাকিতে পারে না, জগত্তারিণীও প্রস্তুত ছিলেন না। বীণার কষ্টক্লান্ত মুখখানা জগত্তারিণীর অন্তরে ঘা দিল। বীণা পূজার বাসন-কোসন মাজা করিয়া ঘাটে চলিয়া গেলে জগত্তারিণী বীণার জন্য অশ্রু ফেলিলেন। তারপর ক্লেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর-ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর-ঘরের এই পটের দেবমূর্তির প্রাণ থাকিলে জগত্তারিণীর কতদিনকার সঙ্গোপনে নিভৃতে অশ্রু-বিসর্জ্জনের যে যে সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর কেহ এ পর্যন্ত কোন আভাসই পায় নাই। বীণাও না।

বীণা পূজার বাসন লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন জগত্তারিণী আত্মসম্বরিত হইয়া ছিলেন।

বীণা এ অবস্থায় কোনদিনই তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায় নাই, আজও তাহা করিল না।

(ক্রমশঃ)

কম্‌লিডাঙার ভিটে

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বৃদ্ধ মোমিন মাঝি নমাজ সারিয়া নোঙর তুলিয়া লইল; পুত্র কাছেমকে দাঁড় টানিতে দিয়া নিজে হাল ধরিয়া বসিল। আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে আমাদের নৌকা আবার চলিতে সুরু করিয়াছে!

ফাল্গুনমাস; কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা। এতক্ষণ নদীর পরপারে যে বনরেখা স্পষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা গাঢ় অন্ধকারলিপ্ত হইয়া উঠিল। নদীতীরে শিমুল, পলাশ ও কৃষ্ণচূড়ার দীপ্ত রক্তিমাভায় ঋতুরাজের যে নৈসর্গিক রক্তকেতনের সৃষ্টি হইয়াছিল, কাহার যাদুমন্ত্রে যেন তাহার উপর যবনিকা পড়িয়া গেল। পক্ষীকুল সসব্যস্তে নিজ নিজ নীড়ের সন্ধানে চলিয়াছে। অনতিকালপূর্ব্বেও দুই-চারিটা গাংশালিক দেখা গিয়াছিল; এখন তাহারা তীরবর্ত্তী গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকার ও গভীর স্তব্ধতা। কেবল মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিচরণশীল জোনাকীপোকার ক্ষণস্থায়ী আলোকে অন্ধকার গাঢ়তর বলিয়া মনে হইতেছে ও ঝিল্লীর অনাহত রাগিনী যেন সেই অতল স্তব্ধতাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতেছে। নানা বন্যকুসুমের মৃদু মদির সৌরভে ফাল্গুন-সন্ধ্যা যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক এইরূপ ভাবনিবিড় নির্জ্জন নীরব পটভূমির কেন্দ্রগত হইতে না পারিলে বোধ করি ফাল্গুন-সন্ধ্যার মাধুর্য্য ঠিকমত উপলব্ধি হয় না।

আমাদের নৌকা চলিয়াছে, নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া। ছলছলায়মান জলস্রোতের উপর তালে তালে দাঁড় পড়ার বিচিত্র শব্দ হইতেছে—আর একটা অদ্ভুত শব্দ হইতেছে, দাঁড় টানার—ক্যাঁ-চ-র···ক্যাঁচ্, ক্যাঁ-চ-র···ক্যাঁচ্। সমস্ত মিলিয়া যেন এক অনির্ব্বচনীয় অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর ঐক্যতান সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে।

অদূরে সুবিস্তৃত চড়ার উপর কৃষকদের কুটীরে অল্পক্ষণ হইল আলো জলিয়াছে। এদিকেও নদীর পাড়ের উপর একটা স্থান সহসা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। খগেন সেই দিকে চাহিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটা কোন্ জায়গা দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি, মাঝি?

—আজ্ঞা কর্‌তা, হালিসহর; হুই যে বিজ্‌লিবাতি দেখ্‌তিছেন, ওডা হুকুমসাঁদের মিল কর্‌তা।

খগেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—শুন্‌লি ত'রে, এ সেই হালিসহর,—যেখানে সাধক রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন;—মা কালী নিজে যাঁর বেড়া বেঁধে দেয়েছিলেনরে—

অনিল তাহার রিষ্টওয়াচের উপর টর্চ্চের আলো ফেলিয়া সময় দেখিতেছিল। খগেনের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—মাঝি, এদিকে তোমার স'সাতটা ত' এখানেই হ'ল,··ডুমুরদ' পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে বল দিকিন; ভাঁটা প'ড়তে ত' আর দেরী নেই,···তা'র আগে পৌঁছুতে পারবে ত'?

এবার বৃদ্ধ মাঝির পুত্র কাছেমই উত্তর দিল।—বসেন না কর্‌তা চুপ্ কইর‍্যা; ভাহেন না তীরের মত উইড়্যা লইয়ে যাই। বলিয়া সে জোরে জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল।

চারিদিকে নিবিড় স্তব্ধতা থম্‌থম্ করিতেছে।

তীরস্থ গ্রামগুলি বোধ করি এতক্ষণ সুপ্তিমগ্ন। কচিৎ বহুদূরে কোথায় কুকুরের কর্কশ চীৎকারে নৈশ স্তব্ধতা মথিত হইতেছে।

সহসা খগেনের মাথায় খেয়াল চাপিল আমাকে একখানি গান গাহিতে হইবে। অনিলও সে প্রস্তাব সমর্থন করিল। বন্ধু-বান্ধবের আসরে এ কাজটা প্রায়ই আমাকে করিতে হয়। সুতরাং মামুলী ভণিতা ভূমিকা না করিয়া গান একখানি ধরিতেই হইল।

গান, ইতঃপূর্ব্বে বহুদিন গাহিয়াছি কিন্তু এরূপ তন্ময় হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে কখনও গাহিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। অথবা পারিপার্শ্বিক আব্-হাওয়ার সহিত গানের সুর এমন নিবিড়ভাবে মিলিয়াছিল বলিয়াই সেদিন সত্যই সুর-সরস্বতী আমার গানে যেন ধরা দিয়াছিলেন।

গান থামিলে সকলের জ্ঞান হইল। বাতাস তখন বেশ প্রবলভাবে বহিতে সুরু করিয়াছে। এতক্ষণের অভ্যস্ত চক্ষে স্তিমিত আলোকের যে আভাসটুকু ছিল, এখন আর তাহাও নাই। মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্যুতালোক আকাশের বুক বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোকে বেশ দেখা যায় আকাশ ঘন কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নৌকা তীর ঘেঁষিয়া চলিয়াছিল। নদীর পাড়ের নীচে গাছগুলা ঝড়ের ঝাপটে প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে।

সহসা তীরের উপর কিসের যেন একটা কর্কশ শব্দ শ্রুত হইল। অনিল টর্চ্চের আলো সেইদিকে ফেলিতেই দুইটা শৃগাল পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুঝিলাম, গ্রাম্য-শ্মশানে কোন পরলোকগত মানবের অস্থি-পঞ্জর লইয়া তাহারা বিবাদ বাঁধাইয়াছিল।

বৃদ্ধ মাঝি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—বদর্ বদর্, দাঁড় মার্ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ দ্রুততর হইয়া উঠিল।

খগেন বলিল,—কি রকম বুঝ্ছো মাঝি? না হয়···

বৃদ্ধ আশ্বাস দিল,—ডর্‌তিসেন ক্যানে বাবুরা? বসেন না থির হইয়া।

কিন্তু স্থির হইবার আর উপায় রহিল না দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা সুরু হইয়া গেল। মুহুর্মুহু মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। আমরা তিনজনে তাড়াতাড়ি নৌকার ছ'য়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু ঢুকিলে কি হইবে? সে ছ'য়ের অবস্থা এমন জীর্ণ যে, সেই দুর্য্যোগে উহার মধ্যে নিরাপদে আছি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়া হয় ত' চলিতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি হইতে প্রকৃত আত্মরক্ষা করা চলে না।

অনিল চিরকালই একটু ভীরু স্বভাবের। সে বলিল,—নৌকা কোথাও বাঁধতে বল্ না।

বলিতে কি আমি এবং বোধ করি খগেনও সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। মাঝি বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে নৌকা বাঁধিতে রাজী হইল।

বলিল,—কর্‌তারা যহন বল্‌তিসেন, তহন না হয় লা হুই "বাঘের খালে"র মধ্যিই ভিড়াই; কম্‌লিডাঙার ঘাটে নোঙর কর্‌তি হবে। কিন্তু কর্‌তা ভাঁটার আগে তাঁলে আর পৌছুতি পারা যাবে না,—উজোন ঠেল্‌তি হবে।

নৌকা নোঙর করার কথায় অনিলের ধড়ে যেন প্রাণ আসিয়াছে। সে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—তা' হোক্ মাঝি, সে পরের কথা পরে হবে। তুমি এখন নোঙরের বন্দোবস্ত কর।

এই সময়ে সহসা অনতিদূর হইতে বিপুল গর্জ্জমান জলস্রোতের একটা শব্দ শ্রুতিগোচর হইল এবং আমাদের নৌকা যতই অগ্রসর হইয়া চলিল, সেই শব্দও যেন তত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনিল রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ও কিসের শব্দ মাঝি ?

—হোইত' "বাঘের খালে"র আওয়াজ আস্তিছে ; উয়ার পাশেই ত' কমলিডাঙার ঘাট করতা ; ওইহানে গে উঠ্তি হবে।

ভুজঙ্গ জলস্রোত প্রচণ্ডবেগে যেন হুঙ্কার করিতে করিতে খালের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের নৌকাও সেই স্রোতের মুখে টলিতে টলিতে যেন তীরের মত সেই খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ মাঝি সুকৌশলে শুধু হাল ধরিয়া রহিল ; পুত্র দাঁড় ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। খালের মধ্যে পড়িয়া তখন আমাদের নৌকার গতিও ক্রমে আবার মন্থর হইয়া আসিয়াছে

খগেন কৌতূহলী হইয়া ছ'য়ের মধ্য হইতেই টর্চ্চের তীব্র আলোক তীরের উপর নিক্ষেপ করিতেছিল। বারিধারা যে পারিপার্শ্বিক দৈশ-দৃশ্যের উপর একটা মৃদু আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া দেখা যায় তীরে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বৃহৎ বৃক্ষরাজি শাখায় শাখায় জড়াইয়া আছে। কোথাও খেজুর গাছের মাথায় ধুঁধুল গাছ লতায়-পাতায় ফলে যেন এক মণ্ডপ রচনা করিয়াছে ; কিন্তু সে মণ্ডপ বুঝি আর থাকে না। ঝড়ের ঝাপটে বৃক্ষচ্যুত সজিনাফুল তীরে যেন এক শ্বেত আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে ; তীরবর্ত্তী বন যেন নিষ্ঠুর ঝড়ের এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিতেছে না ; যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে। এইরূপে অল্পক্ষণ চলিবার পরই ঘন হোগ্লা ও কশাড় বন ঠেলিয়া আমাদের নৌকা যেখানে নোঙর করিল, সেখান হইতে একটি সরু পথ সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

মাঝি বলিল,—ঐই পাড়ের পরেই কমলি-মায়ের ভিটে···কিন্তু এই পানির মধ্যে যাবেন ক্যামনে করতারা ?

অনিল বলিল,—পানির জন্যে ত' ভাবনা হ'চ্ছে না মাঝি, যা' ভেজবার সেত' ভিজেই গেছি ; কিন্তু যে রকম অন্ধকার...

মাঝি তাহার লণ্ঠন দেখাইয়া আশ্বাস দিল, অন্ধকারেরর জন্য কোন চিন্তা নাই, সে আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

অগত্যা তাহাই হইল। সে আগে আগে আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল ; আমরা তাহার পশ্চাতে টর্চ্চ জ্বালাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া কর্দ্দমাক্ত পথ বাহিয়া চলিলাম।

পাড়ের উপর উঠিয়া একটু দক্ষিণ ঘুরিয়া মাঝি এক বহু প্রাচীন অট্টালিকার প্রকাণ্ড সদর দরজা প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিতেই যেন একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উহা অল্পে অল্পে খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরের খোলা উঠান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। তাহার মধ্য দিয়া মাঝি অবলীলাক্রমে চলিতে সুরু করিল। উপায় থাকিলে আমরা হয়ত সেইখান হইতেই ফিরিতাম, কিন্তু সেই অবিশ্রান্ত বারি-পতনের মধ্যে তখন ভাবিবারও অবসর নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া দুই হাতে জঙ্গল সরাইতে সরাইতে বৃদ্ধ মাঝিকে অনুসরণ করিয়া চলিলাম। সে কয়েক ধাপ প্রশস্ত অথচ জীর্ণ সোপান অতি-ক্রম করিয়া বারান্দা পার হইয়া সম্মুখের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহটি সুপরিসর। জানালা-দরজা একটিও নাই, বোধ হয় কাহারা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। গৃহের ভিতর একটা চাপা দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হইয়া উঠিয়াছে। যেন একটি মৌণ সুরে ঘরটি আচ্ছন্ন হইয়াছে। অনন্ত গতিশীল কাল বুঝি শ্রান্তদেহে এই জীর্ণ ভগ্নোন্মুখ গৃহটির মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে। ভিতরে শাণিত তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণ টর্চ্চের আলোক নিক্ষেপ করিতেই এক ঝাঁক চামচিকে ইতস্ততঃ উড়িতে

আরম্ভ করিল। সহসা মনে হইল অশরীরী কেহ যেন আমাদের গতিবিধির উপর সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ভয় হইল, এরূপে এখানে অনধিকার প্রবেশ করাটা হয়ত' ভাল হয় নাই। পরক্ষণেই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা বলিয়া মনকে বুঝাইলাম।

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোথায় আমাদের আন্‌লে মাঝি? শেষে কি ঘরচাপা পড়ে' মরব নাকি?

মাঝি আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে বলিল,—বিপদ-আপদে ইহার অপেক্ষা নিরাপদ স্থান আর নাই; এ অঞ্চলের মাঝি-মাল্লারা সকলেই নাকি সেকথা জানে।

তাহার সহিত এসময়ে বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই। কিন্তু কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। সে গৃহে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহস হইল না; বারান্দায় অবস্থান করাই স্থির হইল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সকলে মাথা মুছিয়া ফেলিলাম

বৃষ্টি যেরূপ প্রবলবেগে সুরু হইয়াছে, কতক্ষণে যে থামিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। খগেন স্থির হইয়া থাকিবার পাত্র নহে। সে এই অবসরে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বারান্দার দেয়ালে বালি নাই বলিলেই হয়; নিরাবরণ রুক্ষ কঙ্কালের মত শুধু ইটগুলাই বাহির হইয়া আছে। মাথার উপর ছাতটা একপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। জঙ্গলাকীর্ণ প্রশস্ত উঠানের একপ্রান্তে স্তূপীকৃত ইট; তাহার উপর শ্যাওলার একটা সবুজ আস্তরণ পড়িয়া গিয়াছে; ফাঁকে ফাঁকে আমরুল গাছও গজাইয়াছে। সদর দরজার পার্শ্ববর্ত্তী জীর্ণ প্রাচীরের উপর এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ অসংখ্য ডালপালা মেলিয়া অতিকায় "অক্টোপাসে"র মত বাড়ীটাকে শতপাকে জড়াইয়া আছে। অপরদিকে জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রশস্ত ঘর একপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর টর্চ্চের আলো পড়িতেই একটা ফাটলের মধ্য হইতে সাদা মত কি একটা পাখী কর্কশ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল সেই শব্দ শুনিয়াই বৃদ্ধ মাঝি নমস্কার করিয়া বলিল, দ্যাক্‌সেন্ করতা, ঐ কম্‌লি-মাকে দ্যাক্‌সেন্?

আমরা তিনজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম,—তা'র মানে?

মাঝি ঈষৎ বিস্মিত হইল। বলিল,—কম্‌লি-মায়ের কথা এ অঞ্চলে এমন কেহ নাই যে জানে না।

খগেন বলিল,—তবে ত' তোমার কম্‌লি-মায়ের গল্পটা শুনতে হ'চ্চে মাঝি,—তবু যা' হো'ক্ সময়টাও কাটবে। বলিয়া সে পকেট হইতে সেই দিনকার একটা খবর কাগজ বাহির করিয়া সকলকে এক-একখণ্ড দিয়া নিজেও এক খণ্ড সেই ধূলি-মলিন বারান্দার উপর বিছাইয়া বসিয়া পড়িল। আমরাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মাঝিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘেরিয়া বসিলাম।

মাঝি তাহার লণ্ঠনটিকে বাতাস হইতে আড়াল করিয়া বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া নিজস্ব গ্রাম্যভাষায় গল্প সুরু করিল।

তবে শুনুন বাবু, অনেকদিন আগে—তখন আমরা ছেলেমানুষ এইখানে দত্তবাবুদের সামান্য একখানি ঘর ছিল। দত্তবাবু কোলকাতায় থেকে লোহালক্কড়ের দোকান চালাতেন, ছেলে-মেয়ে পরিবার এখানে থাকত, বাবু শনিবার বাড়ী আসতেন। ছোট-খাট দোকান,—আয় বেশী ছিল না; বাবুদের কায়ক্লেশে সংসার চ'লত। প্রথম জীবনে বাবু খুব ধার্ম্মিক ছিলেন;

বিশেষ করে' তিনি লক্ষ্মী পূজো ক'রতেন খুব ধূমধাম করে'—আমরা প্রসাদ পেতাম, সে কথা এখনও আমার মনে আছে। তখন আমিও এর পাশের গ্রাম কাল্‌কেতলায় থাকতাম। সেকালে হালিসহরের নাম কে না জা'নত?···এখনও আপনারা যদি আশপাশের গ্রামে ঘুরে আসেন ত' দেখ্‌তে পাবেন "খাসবাড়ী," "বল্‌দেঘাটা"য় তিন-চারতলা বাড়ী সব সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে;···খাঁ খাঁ করছে। কোনটা হয় ত' গেছে পড়ে', কোনটা নিকট ভবিষ্যতে পড়বার অপেক্ষায় আছে। বাড়ীর ভেতর-বাইরে জঙ্গল,—জীব-জন্তু বাস করছে, দিনদুপুরে বাড়ীর ধারে শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। এখন আপনি এদেশে মানুষ হয় ত' খুব কমই দেখতে পাবেন,···অর্দ্ধেকলোক মারা গেছে, বাকি অর্দ্ধেক দেশত্যাগী। কিন্তু তখন তখন আমরা দেখেছি, বল্‌দেঘাটার বাজার যখন ব'সত, লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যেত, ঠেলে বাজারে ঢোকা যেত না—দশ-বিশক্রোশ দূরের ভিনগাঁ থেকে চাষারা বাজারে সবজি নিয়ে আ'সত—গঙ্গের ঘাটে ব্যাপারীদের বড় বড় নৌকা এসে লা'গত। এখন আর সে বাজারও নেই, সে লোকজনও নেই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাঝি চুপ করিল। বোধ হইল তাহার মন বর্ত্তমান পারিপার্শ্ব ভুলিয়া সেই সুদূর বিগত যুগের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

তাহার তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম,—তারপর, মাঝি?—হাঁা, বাবু, তারপর কি বলছিলাম?···দত্তবাবুর কষ্টের সংসারে অভাব-অনাটন বারমাসই লেগে থাকত—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলা'ত না। তার ওপর তাঁ'র ছেলে-পুলেও ছিল, বলতে নেই,—অনেকগুলি। দত্ত-বাবুর আর্থিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে যতই খারাপ হ'তে লাগল, তাঁর সংসার আর তা'র সঙ্গে খরচও ততই বেড়ে চলল। আয় যত কমে, ব্যয়ও তত বাড়ে, তা'র ফল যা' হবার তাই হ'ল,··বাবুর অনেক টাকা দেনা হ'য়ে গেল। দেনা শোধ আর হয় না; সুদে-আসলে দেনার অঙ্ক ক্রমেই বেশ মোটা হ'তে লা'গল। গিন্নি-মায়ের সব গয়না একে একে বাঁধা পড়ল,··শেষে শুধু একগাছি "নোয়া" রইল হাতে। আধপেটা খেয়ে খেয়ে গিন্নি-মায়ের চেহারা হাড়সার হয়ে প'ড়ল। ছেলেগুলোরও তাই, বারমাস অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে,···পয়সার অভাবে এক-ফোঁটা ওষুধও জোটে না। রোগা রোগা হ্যাল-হ্যালে ছেলেগুলো উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত, বাবুর এমন পয়সা ছিল না যে, তা'দের একটা জামা কি কাপড় কিনে দেন। এইভাবে দেখতে দেখতে তাঁর দুরবস্থা চরমে পৌঁছুলো...ভাবনায়-চিন্তায়, অনাহারে-অর্দ্ধাহারে চেহারা বিশ্রী হ'য়ে গেল,...চোখের কোলে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে, দু' গালের হাড় ঠেলে উঠেছে··· মাথায় এক মাথা উস্কো-খুস্কো চুল, কাপড়-চোপড় ময়লা। বাবু দেনাদারদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ান; তা'রা তাঁকে দেখতে পেলেই যেখানে-সেখানে যা'র-তা'র সাম্‌নে কাবলীওলার মত তাগাদা দেয়, অপমান করে ...আদালতে নালিশ করে' দোকানপত্তর সব ক্রোক করে' নেবে বলে' ভয় দেখায়। অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের কম্‌লি-মায়ের জন্ম হ'ল। যদিও অভাবের সংসার, নিজেদেরই অর্দ্ধেক দিন অনা-হারে থাকতে হয়, তবু অনেকগুলি ছেলের পর প্রথম এই মেয়েটি হওয়ায় দত্ত-গিন্নীর মনে যেন আনন্দের বান ডা'কল। কিন্তু কোলকাতায় দত্তবাবু এই মেয়ে হওয়ার খবর পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু তাঁ'র মেজাজ বেশী-ক্ষণ খারাপ রইল না।—সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে তিনি দোকানে বসে' হতাশভাবে তাঁর জীবনের

ব্যর্থতার কথা ভাবছিলেন, এমন সময় একটা বড় কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি মালের বেশ মোটা রকম একটা বায়না পেলেন ; তেমন বায়না তিনি অনেকদিন পান নি। সেই অর্ডারি মাল বেচে সেবার তাঁর বেশ দু'পয়সা মুনাফা হ'ল। মেয়ে হওয়ায় বাবুর মনটা যে রকম খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, আশাতীতভাবে টাকাটা পেয়ে, তাঁ'র সে ভাবটা কেটে গেল। দেশের লোকেরা শুনে বললে,—স্বয়ং মা-লক্ষ্মী এসেছেন। কর্ত্তা খুসী হ'য়ে মেয়ের নাম রাখলেন "কমলা"।

সেই মালটা বেচে বাজারে বাবুর দোকানের বেশ নাম হ'য়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে বাবু আরও অনেকগুলো বড় বড় অর্ডার পেলেন। ক্রমেই তাঁর দোকানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাবুর আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হ'তে লা'গল। ক্রমে ক্রমে তিনি দেনা শোধ করতে লাগলেন। ছেলেদের গায়ে আবার জামা উ'ঠল, ..পেট ভ'রে খেতে পেয়ে তা'দের চেহারা ফিরে গেল...গিন্নী-মায়ের বাঁধা দেওয়া গয়নাগুলো আবার উদ্ধার হ'ল। দেখতে দেখতে সংসারে আবার লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে এলো।

এই সময়ে সহসা একটা দমকা বাতাসে লণ্ঠনটি নিভিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। অনেক-গুলি দিয়াশালাই নষ্ট করিয়া আলো জ্বালা হইলে মাঝি আবার সুরু করিল,—কম্‌লি-মায়ের আদরের আর সীমা নাই...বাপ-মায়ের যেন চোখের মণি সে। বাপ বাড়ী এসে আগে, "আমার মা জননী কই ?" বলে' মেয়ের খোঁজ করেন। দেশের লোক বলে, "নামেও কমলা, কাজেও কমলা...যেমন রূপ, তেমনি গুণ,... যেদিন মেয়ে হ'য়েছে, সেদিন থেকেই দত্তদের বরাত ফিরেছে।" মেয়ে যত বড় হ'তে লা'গল, তা'র রূপ যেন ফেটে পড়তে লা'গল। বছর আটেকের মধ্যেই দত্তবাবুর সাবেক বাড়ী দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড তিনমহলা তেতলা বাড়ীতে পরিণত হ'ল ; দেশের জমিদারী দেখার জন্ম গোমস্তা নিযুক্ত হ'ল ; দেউড়িতে গালপাট্টা-ওয়ালা দ্বারোয়ান মোতায়েন হ'ল।

বাবুর হাওয়া খাওয়ার জন্ম দু'খানা ময়ূরপঙ্খী নৌকো হামেহাল ঘাটে বাঁধা থা'কত। তা'র মধ্যে একখানার মাঝি ছিলাম আমি। প্রথম প্রথম বাবু গিন্নী-মাকে নিয়ে, কম্‌লি-মাকে নিয়ে, কখনও ছেলেদের নিয়ে নৌকো করে' হাওয়া খেতে যেতেন। নৌকোয় চড়ে' কম্‌লি-মায়ের কী ফূর্ত্তি! তখন সে বড় হয়েছে,...বাপের সঙ্গে অনর্গল গল্প ক'রত, কখনও আমার সঙ্গেও। কম্‌লি-মা নৌকোর মাঝিদের বড্ড ভাল-বা'সত। মাঝিদের বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়ে কত সময়ে খেতে দিয়েছে মনে আছে। আজ-কের মতন এমন ঝড়-বৃষ্টি হ'লেই কম্‌লি-মায়ের শিশু মন মাঝিদের জন্ম ভেবে আকুল হ'য়ে উ'ঠত। আমরা তা'কে কতদিন নদীর দিকে চেয়ে চুপ করে' জানলার ধারে বসে' থাকতে দেখেছি।

যা' হোক্, এমনি সুখের মধ্য দিয়ে দত্তবাবুর দিনগুলো বেশ কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাবু মাথা ঠিক্ রাখতে পারলেন না। কাজকর্ম্ম নিজে দেখা ছেড়ে দিলেন। কর্ম্মচারী-দের ওপর দোকান-পত্তরের ভার দিয়ে মোসাহেব আর কুচরিত্র ইয়ার-বক্সিতে বৈঠকখানা জম্‌কে তুললেন। যে অর্থের অভাবে একসময়ে অনা-হারে কেটেছে, তা'রই প্রাচুর্য্যে বোতল বোতল মদ চলতে লাগল...বাবু মাতলামি ক'রে কাঁচা পয়সা ওড়াতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে মাত-লামি এমন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল যে, বাবু গিন্নী মাকে মারধোর পর্য্যন্ত আরম্ভ করলেন। সংসারে শনির দৃষ্টি প'ড়ল। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা বলে' যে একটা কথা আছে, এও বাবু ঠিক্

তাই, বলিয়া মাঝি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আরম্ভ করিল,—কম্‌লি-মায়ের তখন ন'-দশ বছর বয়স,—জ্ঞান বুদ্ধি হ'য়েছে, সব কথা বুঝতে পারে। বাপ যখন প্রকৃতিস্থ থাকত, সে বাপকে কত করে' বোঝাবার চেষ্টা ক'রত। তখন বাপের অনুতাপ হ'ত; মেয়েকে বলতেন,—আচ্ছা মা, তাই হবে, আর ও সব ছোঁবো না।

মেয়ে স্নেহ-কোমল-স্বরে আব্দার করে' ব'লত,—এবার কিন্তু দেখলে তোমার হাত থেকে টেনে ও সব ফেলে দেব বলে' দিচ্ছি বাবা, তখন তুমি ব'ক্‌তে পাবে না কিন্তু।

—আচ্ছা মা, তাই হবে, বলে' হেসে বাপ মেয়েকে কোলের মধ্যে টেনে নিতেন।

কিন্তু পেটে ও বিষ প'ড়লে, মানুষ আর মানুষ থাকে না। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে বাবু তাঁ'র প্রতিজ্ঞা ভুলে, ইয়ারদের নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে মাতলামি করচেন...ঘরের দরজাটা সেদিন বন্ধ করে' দিতে বোধ হয় আর মনে নেই...কমলি-মা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে তা'র টানাটানা চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি হেনে গম্ভীর-ভাবে শুধু বললে,—বাবা, আবার?

দত্তবাবু মাতাল অবস্থায়ও যেন একটু চম্‌কে উঠলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তা'র পরেই ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে উঠে এসে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,—কেরে ছুঁড়ি, এমন জমাটি ফুর্ত্তির সময়ে ব্যাঘাত ঘটাতে এলি?...যা' বেরো এখান থেকে...শীগ্‌গির...

ইয়ারেরা হাঃ হাঃ করে' অট্টহাসি হেসে তাঁর কাজের সমর্থন ক'রল। কম্‌লি-মা দৃপ্তকণ্ঠে ব'লল,—কি বললে বাবা, আমি বের হ'ব?

দত্তবাবু মত্ত পশুর মতন গর্জ্জন করে' উঠ্‌লেন,—হ্যাঁ, বেরো, এখান থেকে দূর হয়ে যা'... বলেই তা'কে জোরে একটা ঠেলা দিলেন। কম্‌লি-মা সে ঠেলা সাম্‌লাতে না পেরে, দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে সজোরে ঘরের বাইরে ছিট্‌কে পড়ে' গেল। সেই যে অজ্ঞান হ'য়ে গেল, সারারাত্তির আর জ্ঞান হ'ল না। কেবল প্রলাপ ব'কতে লা'গল,—আমায় দূর করে' দিয়েছ, বেশ, আমি দূরই হব, বেশ।

পরের দিন সকালে বাবুর যখন জ্ঞান হ'ল, কন্যাহারা জননীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনে পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা সব তাঁর মনে প'ড়ল, আর তীব্র অনুশোচনায় বুক যেন ভেঙে যাবার মত হ'ল। কিন্তু তখন সব অনুশোচনাই বৃথা,...যা' হবার তা' হ'য়ে গিয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকেই বাবুর ব্যবসায়ে লোকসান আরম্ভ হ'ল। পর পর ক'টা ঘা খেয়ে তাঁ'র দোকান অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় উঠে যাবার দাখিল হ'ল। উপযুক্ত বড় ছেলে হঠাৎ দু'দিনের জ্বরে মারা গেল। তা'র মাসখানেকের মধ্যেই গিন্নী-মা মাথায় রক্ত উঠে মারা গেলেন। এই সব দেখে বাবুর আর বাড়ী থাকতে সাহস হ'ল না,...ক'টি ছেলে নিয়ে দেশত্যাগী হ'লেন। সেই থেকে তাঁ'রা আর দেশে ফেরেন নি। এখন তাঁ'রা কোথায় কি ভাবে আছেন, তাও কেউ জানে না। বাবুর সে দোকানও শুনেছি, অনেকদিন হ'ল উঠে গেছে। আর সেই তিনমহলা বাড়ীর দুর্দ্দশা আপনারা ত' নিজের চোখেই দেখছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাঝি চুপ করিল।

আমাদের মন তখনও যেন অতীত কালের এক নবনির্ম্মিত রহস্যময় প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল। হয়ত' অন্য সময়ে আর কাহারও মুখে শুনিলে ঘটনাটিকে অবাস্তব কাহিনী বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু সেদিন সেই মেঘ-মেদুর আকাশ, বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, বাহি

রের নিবিড় অন্ধকার ও লণ্ঠনের চকিত আলোক, সরল গ্রাম্য মুসলমান মাঝির বলিবার অনাড়ম্বর ভঙ্গী, তাহার আন্তরিকতা ও তন্ময়তা সমস্ত মিলিয়া মনের উপর নিতান্ত সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই। বস্তুতঃ, সেদিন সে তাহার বক্তব্য বোধ হয় ঠিক এইভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার কথিত ভাষার দৈন্যে যাহা অনুচ্চারিত ছিল, তাহার গভীর হৃদয়াবেগে, তাহার বাঙ্ময় নীরব দৃষ্টিতে তাহা সুপ্রকাশিত হইতে কোন বাধা পায় নাই।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অনিল বলিল,—কিন্তু পাখীর কথা ত' কই বললে না মাঝি?

মাঝি বলিল,—সেই কম্‌লি-মাই এখনও তাহাদের ভুলে নাই; তাই, সে লক্ষ্মীপ্যাঁচার রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পুরাতন ভিটায় অবস্থান করে। এদিককার নদীতে মাঝিদের কাহারও কোন বিপদ-আপদ হইলে, কমলি-মায়ের দয়ায় সে রক্ষা পায়। গত বৎসরও নাকি মির্জ্জা সেখের ছেলে বছিরুদ্দিনের 'না' দয়ে পড়িয়াছিল, সে কেবল ওই কম্‌লি-মায়ের মেহেরবানিতেই রক্ষা পাইয়াছিল।

খগেন দ্বিতীয় গল্পের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অনিল বলিল,—আচ্ছা মাঝি, সে গল্প তোমার নৌকোয় উঠে শোনা যাবে'খন। ওদিকে বৃষ্টি যে প্রায় থেমে এসেছে, ঝড়ও নেই, সেটা দেখেছ? সারারাত কি এখানেই…

মাঝি ব্যস্তভাবে তাহার লণ্ঠন লইয়া উঠিয়া পড়িল।—ঠিক্ কথা কর্‌তা, আগে বল্‌তি হয়,… আমার কি আর হুঁস্ আছে?.. হোই কাছেম, উঠ্ না রে, ঘুমালি না কি?

বাহিরে আসিয়া সেই স্বল্পালোকে যাহা দেখিলাম, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইলাম। বহু বৃক্ষশাখা ঝড়ে ভূপতিত হইয়াছে। একটা সুবৃহৎ জামগাছ আমাদের পথরোধ করিয়া পড়িয়া আছে। এতক্ষণে যেন আমরা সেই দুর্য্যোগের স্বরূপ দেখিতে পাইলাম। সেই সুপ্রাচীন জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ বাড়ীটির ভিতর এতক্ষণ কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। বাহিরে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে এরূপ প্রলয়কাণ্ড চলিয়াছিল, আমরা কিন্তু সে কথা কেহই বিশেষ বুঝিতে পারি নাই। যেন সত্যই কোন অলৌকিক শক্তিশালী অদৃশ্য বন্ধুর মঙ্গলহস্ত কোন দুর্ঘটনার সুদূর সম্ভাবনাকেও সেই বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে দেয় নাই। সেদিন এ বিশ্বাস না করিয়া উপায় ছিল না। গ্রাম্য মাঝির অলৌকিকত্বের প্রতি সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমরা বিস্মিতচিত্তে গিয়া নৌকায় উঠিলাম।

কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ চন্দ্র তখন মেঘান্তরাল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহার ক্ষীণালোকে শুচিস্নাতা ধরণী যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের নৌকা কম্‌লিডাঙার ঘাট পিছনে ফেলিয়া আবার বড় নদীতে আসিয়া পড়িল। তীরের গাছপালা তখন স্তিমিত আলোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পাড়ের উপর কম্‌লি-মায়ের ভিটা দেখিতে দেখিতে যেন মায়াপুরীর মত অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। আমরা তিন বন্ধুতেই তখন নির্ব্বাক্। ভাবিলাম, সত্যই কি সেই বিস্মৃত যুগের বালিকারূপিণী দেবী এই মর্ত্তলোকের মায়াবদ্ধা হইয়া ঐ জীর্ণ জঙ্গলাচ্ছন্ন ইষ্টকস্তূপের মধ্যে ভিন্নরূপে থাকিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত এই সরল গ্রাম্য মাঝিদের সকল আপদ-বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন, না ইহা ভিত্তিহীন কিংবদন্তী, না কুসংস্কার?

পুরস্কার ?

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

এক

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত দেহে গোবর্দ্ধন প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেই ভামিনী সক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বলি, এ বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন হ'ল কেন ?"

পত্নীর এই অদ্ভুত প্রশ্নের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, গোবর্দ্ধন নিতান্ত নির্ব্বিকার-চিত্তে কহিল, "কেন, হ'য়েচে কি ?"

ভামিনী মুখভঙ্গী করিয়া দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিল, "সব কথা খুলে বলতে হ'বে বুঝি ? আমি সব জেনেচি। তুমি ভেবেচ ডুবে ডুবে জল খাবে, কেউ টের পাবে না, কেমন ?"

গোবর্দ্ধন এবার একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু স্ত্রীকে তাহা জানিতে না দিয়া স্থিরভাবে কহিল, "আমি তো দিবারাত্র দোকানের কাজ নিয়ে ব্যস্ত—কখন্ যে কি করলাম, তা' তো বুঝতে পারচি না !"

ভামিনী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "ন্যাকামী করো না বলে' দিচ্চি। সোনালী আমায় সব বলেচে।"

গোবর্দ্ধনের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। তবু কথাটা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল, "কাল দুপুরে তুমি যখন খিড়কীর পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলে, তখন আমি শুধু—"

ভামিনী ধমক দিয়া কহিল, "শুধু কি ?"

গোবর্দ্ধন ঢোক গিলিয়া কহিল, "আমি সোনালীকে শুধু দুটো পান সেজে দিতে বলেছিলাম।"

ভামিনী ঝাঁজিয়া কহিল, "কেন, ঘরে কি পান সাজা ছিল না ?"

"ছিল বটে, তবে ডিবেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।…জানইতো খাওয়ার পরে পান না খেলে—"

ভামিনী ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "ঢের হ'য়েচে —তোমাকে আমার জানতে বাকী নেই। কিন্তু বলে' দিচ্চি, ফের যদি এমনি কিছু শুনি, তা' হ'লে তোমায় আমি সহজে ছাড়ব না।" বলিয়া স্বামীর পানে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে রন্ধন-গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে সোনালীকে আড়ালে পাইয়া গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাগিনীকে কি বলেচ ?"

সোনালী ভয় পাইয়া কহিল, "কিছুই তো নয় !"

"পান সাজার কথা—"

"হ্যাঁ, তা' বলেচি। পানের বাটা 'তাকে' তোলা হয় নি, দিদি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, পান সাজলে কে ? তাই শুধু বলেছিলাম—"

গোবর্দ্ধন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর কিছু বল নিতো ?"

"না" বলিয়া সোনালী মুচকিয়া একটু হাসিল।

দুই

ভামিনী বরাবরই স্বামীকে সন্দেহ করিত।

সন্দেহ করিবার যে কোন হেতু ছিল না ইহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি না। পুকুর-ঘাটে মেয়েরা যখন স্নান করিত, গোবর্দ্ধন সেই সময় মাছ ধরিবার অছিলায় ছিপ্ হাতে লইয়া প্রায়ই ঘাটের নিকটে গিয়া বসিত।- গোবর্দ্ধনের মুদির দোকান ছিল। মেয়েরা জিনিষ-পত্র কিনিতে আসিলে তাহাদের সহিত রহস্যালাপ করিবার লোভ সে কোনক্রমেই সংবরণ করিতে পারিত না। বিরক্ত হইয়া কেহ দু'টা কড়া কথা শুনাইয়া দিলেও সে নিজেকে সংযত করিতে পারিত না।

সোনালী ভিন্ন গ্রামের মেয়ে। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া সে দেবরের আশ্রয়ে ছিল, সম্প্রতি এক বিবাদের ফলে সে দেবরের গৃহ ত্যাগ করিয়া ভামিনীর আশ্রয়ে আসিয়াছে। ভামিনীর পিতৃ-গৃহ তাহাদের গ্রামে। ভামিনীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিচয় ছিল, ভামিনী পিতৃগৃহে আসিলে সে তাহাকে আপনার বিপদের কথা জানায়। সোনালীকে গৃহে আশ্রয় দিতে ভামিনীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তবে সংসারের সমস্ত কায সে একা পারিয়া উঠে না বলিয়াই সোনালীকে বিদায় দিতে তাহার মন সরে নাই। সোনালীর বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। যৌবনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য তখনও তাহার দেহে হিল্লোলিত। ভামিনী সোনালীর উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। গোবর্দ্ধনের সহিত কথা কহিতে সে সোনালীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। সোনালীও গোবর্দ্ধনকে দেখিলে সরিয়া যাইত—বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সম্মুখে আসিত না। গোবর্দ্ধন কিন্তু এ সুযোগ ছাড়িতে পারিল না। নিজের বাগানে যদি ফুল ফুটিয়া থাকে, সে ফুলের আঘ্রাণ লইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেদিন পান সাজার অছিলায় ঘরের মধ্যে ডাকিয়া গোবর্দ্ধন সোনালীর সহিত আলাপ করিয়া ফেলিয়াছে। সোনালীর কালো কালো দুষ্ট চোখ দুইটা বাস্তবিকই যাদু জানে! গোবর্দ্ধন মুহূর্ত্তেই একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

তিন

সেদিন ঘোষেদের বড় মেয়ের সাধ। পাড়ার সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ভামিনী রন্ধন সারিয়া, স্বামীর অন্নব্যঞ্জন রন্ধন-গৃহেরই এক পার্শ্বে ঢাকা দিয়া রাখিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। মধ্যাহ্নে গৃহে ফিরিয়া গোবর্দ্ধন শুনিল—ভামিনী নিমন্ত্রণে গিয়াছে, ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে। যথাসম্ভব শীঘ্র স্নান সারিয়া লইয়া সে আহারে বসিল। সোনালী রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় বসিয়া মশলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল। গোবর্দ্ধন ইসারায় তাহাকে নিকটে ডাকিল। সে নিকটে আসিলে, গোবর্দ্ধন একবার চারিদিক্ দেখিয়া লইয়া নিম্নস্বরে কহিল, "সোনা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। সেদিন বলি-বলি করেও বলা হয় নি।"

সোনালী বক্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "কি কথা?"

গোবর্দ্ধন ভাত মাখিতে মাখিতে কহিল, "সে কথা বলে' শেষ কর্ত্তে অনেক সময় লাগবে—এখন বলা যেতে পারে না। তুমি যদি শুনতে চাও—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোবর্দ্ধন সোনালীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সোনালীর দুষ্ট চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—ভরসা পাইয়া গোবর্দ্ধন এক নিঃশ্বাসে আপন বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিল, "তা'হ'লে আজ রাত্রে ঘরের দরজাটা খুলে শুয়ো। আমি দোকান থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

সোনালী মুচকিয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

আহার সমাপন করিয়া গোবর্দ্ধন শয়ন-কক্ষে

উপস্থিত হইয়া দেখিল, ভামিনী গম্ভীরমুখে শয্যার উপর বসিয়া আছে। গোবর্দ্ধন ডিবা হইতে দুইটা পান মুখে পুরিয়া আধময়লা পিরাণটা গায়ে দিয়া দোকানের কাযে বাহির হইয়া গেল।

দরজার অন্তরাল হইতে ভামিনী গোবর্দ্ধন ও সোনালীর কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিয়াছিল। এবার সে গোবর্দ্ধনকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবে না!

রাত্রে রন্ধন সারা হইলে ভামিনী সোনালীকে ডাকিয়া কহিল, "ক'দিন বড় গরম পড়েচে, সোনা—রাত্রে ঘুমুতে পারচি না। তোর ঘরে হাওয়া বেশী, তাই মনে করচি আজ আমি ওই ঘরে শোব—আর তুই আমার ঘরে এসে শুবি। বিছানা-পত্র নড়াবার দরকার নেই—যেমন আছে, তেমনি থাকবে। তোর কোন অসুবিধে হবে না তো, সোনা?"

সোনালীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহাদের কথাবার্ত্তা ভামিনী শুনিয়াছে। আপত্তি করিয়া ফল নাই জানিয়া সোনালী চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া গোবর্দ্ধন অতি সন্তর্পণে সোনালীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ভয়ে তাহার পা দুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। ভামিনী যদি জাগিয়া থাকে এবং সহসা এই দিকে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না। দুই-চারি পা অগ্রসর হইবার পর গোবর্দ্ধন কি ভাবিয়া হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আচ্ছা, ভামিনী তাহাকে এমন করিয়া চোখে চোখে রাখিতে চায় কেন? তাহাকে ভালবাসে বলিয়াই তো? সে কি তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা দিয়াছে? ভামিনী যদি জানিতে পারে যে, তাহার স্বামী সোনালীর সহিত গোপনে প্রেম করিতে উৎসুক, তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা কি হইবে? সে যেরূপ ভামিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হইয়াছে, ভামিনীও যদি সেইরূপ—

গোবর্দ্ধনের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। তখন সে সোনালীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরের ভিতর আলো নাই—দরজা ভেজান আছে বলিয়াই বোধ হইল। গোবর্দ্ধন এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া চলিল। ভামিনীর শয়ন-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। জুতা জোড়া খুলিয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে রাখিয়া সে নিঃশব্দে ভামিনীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।...*

* "How a Husband's Virtue was Rewarded" নামক ইংরাজী গল্পের অনুসরণে।

স্কুল-বাড়ী

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল

শহর হ'তে সাতক্রোশ দূরে একটা অজ্-পাড়াগাঁয়ের স্কুল। খোলা মাঠের ওপর টিনের চালের লম্বা লম্বা বারাণ্ডা ঘেরা ঘর, তারই মাঝে স্কুল বসে। মাঝখানের কম্পাউণ্ডে ছেলেদের খেল্বার গ্রাউণ্ড।

অখিল ও বিমান সম্প্রতি কোল্কাতা হ'তে এখানে মাষ্টারী করতে এসেচে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীপার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যেদিন দু' বন্ধুতে এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে দু'টি মাষ্টারী পেয়ে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে, সেদিন তারা কত স্বপ্নেই না বুক বোঝাই ক'রে টগ্‌বগে জুড়ির মত মোটঘাট বেঁধে কোল্কাতা হ'তে রওনা হ'য়ে পড়ল। অখিল সাতক্রোশ মেঠো পথের নমুনাতেই বেশ একটু থম্‌কে দাঁড়ালো। বিমান তাকে 'চিয়ার আপ্' ক'রে বল্‌লো, তুই কাপুরুষ! যুদ্ধক্ষেত্রে নামবার আগেই ভড়্‌কালে তো চলবে না। এ রীতিমত একটা যুদ্ধ,—জীবন-যুদ্ধ; এ গ্রেট্ জার্ম্মান ওয়ারের চেয়েও ঢের বড়।

অখিলের শুক্‌নো ঠোঁটের কিনারায় হাসি ফুট্‌লো। সে জিজ্ঞাসা করলো,—কি রকম?

বিমান গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লো, তার পরমায়ু মোটে সাত বচ্ছর। আর এ যুদ্ধের পরমায়ু কতদিন জানিস্? যতদিন না আমাদের পরমায়ু ফুরোয়। এর মধ্যে ভয় পেলে তো চলবে না।

মেঠো আঁকাবাঁকা পথ। দু'পাশে ঘন-জঙ্গল। গাছগুলো পথের ওপর হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, বিরাটাকার দৈত্যের মত। দিনের বেলাও একা পথ চল্‌তে গা ছম্‌ছম্ করে। সেই পথ বেয়ে দু'বন্ধুতে এগিয়ে চল্‌লো গাঁয়ের দিকে। বিমান বল্‌লে, আমার কিন্তু এ বেশ ভালো লাগচে, সেই কোল্‌কাতায় একঘেয়ে ইটকাঠ আর হট্টগোল। আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌তো।

অখিল স্বভাবতই একটু কম কথা কয়। তার উপর সে কোল্‌কাতার ছেলে। এরকম পাড়াগাঁয়ে সে কখনো আসেনি।

বিমান চিরদিনই দুর্দ্দান্ত। সে যেমনি বে-পরোয়া তেম্‌নি দুঃসাহসী। সে কেবল লেখাপড়াই করে নি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ও খেলাধূলোর চর্চ্চাও করেচে যথেষ্ট।

প্রথম রাতটা স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ীতে কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে মোটঘাট নিয়ে তারা স্কুল-বাড়ীর সংলগ্ন শিক্ষকদের কোয়ার্টারে এসে উঠলো। মেটে দোতলা ঘর, খড়ের চালা। স্কুল-বাড়ী ছাড়া আর চারপাশে এক মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। চতুর্দ্দিকে সবুজ ধানের ক্ষেত আর শালের জঙ্গল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের মাঝে একটা ইঁদারা। ইঁদারার পাশে স্কুলের বেয়ারা বা দরোয়ানের ঘর। সে কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকে না। পাশের গাঁয়ে তার ঘর—সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরে যায়, আবার সকালে দশটার আগে এসে স্কুল খোলে।

তার নাম নিবারণ। জাতে সে সদ্গোপ। বয়স হলেও বেশ মজবুত, বেঁটেখেটে লোকটি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সে নতুন মাষ্টারদের আনতে ষ্টেশনে গিয়েছিলো এবং ঘরদোর

পরিষ্কার ক'রে রেখেছিলো। সেদিন সকালে নিবারণ তাদের মোটঘাট বাসায় সব গোছগাছ ক'রে দিলে।

অখিল এই নির্জ্জন তেপান্তর মাঠের মাঝে মাত্র দু'জনে থাকতে বেশ একটু ভয় পেলে। বিমানের মুখে কিন্তু দুঃশ্চিন্তার এতটুকু ছায়া নেই। সে তখন স্যুটকেশটাকে টেবিল ক'রে দাড়ি কামাতে সুরু করেচে।

সেদিন রবিবার। স্কুলের ছুটি, তবুও সংবাদ পেয়ে অন্যান্য শিক্ষক এবং ছাত্ররা এলো তাদের সঙ্গে আলাপ করতে। বিমান হাসি-গল্পে প্রথম পরিচয়টিকে এম্‌নি ঘন ক'রে তুল্‌লে যে, সকলেই তার আলাপের ধারাটিকে প্রশংসা না ক'রে পারলে না।

এমনি হাসি-গল্পে সারাটি দিন গেল কেটে। বিকালের দিকে ছেলেরা এসে জম্‌লো খেলার মাঠে। বিমান ও অখিল মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো। এক সময় বিমান খেলায় যোগ দিলে, দেখাদেখি অখিলও নেমে পড়লো। ছেলের দল মহাখুসী। খেলা শেষে বিমান তাদের চা খাওয়ালে। ছেলেরা মহানন্দে নতুন মাষ্টারদের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরলো।

একখানি ঘরে পাশাপাশি দু'খানি তক্তা-পোষে দু'জনের বিছানা। রাত্রের সঙ্গে চারিদিক কালো হ'য়ে উঠলো। বাইরে শুধু তাল তাল আঁধার। গাছ, মাঠ, আকাশ সব আঁধারের কোলে একাকার হ'য়ে গেছে। অখিলও ঘরের মাঝে বেশ একটু জড়সড় হ'য়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ চারিদিক্ এমনি স্তব্ধ হ'য়ে উঠলো যে, অখিল নিজের নিঃশ্বাসের শব্দেই কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। গাছের মাথায় বাতাসের ঢেউ লেগে মাঝে মাঝে শোঁ-শোঁ ক'রে কেঁপে উঠ্‌চে, সে শব্দ অখিলের বুকের মাঝে কার আর্ত্তনাদের মত আছড়ে পড়চে। জঙ্গলের বুক হ'তে শেয়ালের দল একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, অখিল রুদ্ধশ্বাসে উৎ-কর্ণ হ'য়ে শোনে। আতঙ্কে তার বুকখানা দুলে ওঠে। চোখে তার ঘুম নেই। অথচ পাশের বিছানায় বিমান নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। ... বিমানের ওপর তার রাগও হচ্ছে খুব।

আধেক রাতে ধাক্কা খেয়ে বিমান জেগে উঠ্‌লো। অখিল নীচু কম্পিত গলায় বল্‌লো, নীচে কাদের ছেলে কাঁদচে শুনতে পাচ্ছিস্?

বিমান হোহো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে,—তোর বুঝি ঘুম হ'চ্ছে না?

—ঘুম আমার বিদেশ বিভূঁয়ে হয় না। কিন্তু সত্যি, চুপ ক'রে শোন্ না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে কচি ছেলের চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

অখিল ভাঙা গলায় বল্‌লে, ঐ শোন্।

বিমান স্থির হ'য়ে রইলো।

আবার সেই শব্দ!

বিমান বিছানার উপর উঠে বসে' বালিশের নীচে হ'তে টর্চটা বের্ ক'রে জ্বাল্‌লে। টর্চের আলোয় বিমান দেখ্‌লে অখিলের মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। বিমান হেসে বল্‌লে, ও কিছু না, শোনবার ভুল।

ঠিক সেই সময় আবার সেই কান্না!

বিমান হ্যারিকেন জ্বেলে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই অখিল তার কোঁচার খুঁটটা টেনে ধরে' বল্‌লে,—কি পাগলামী করছিস্?

বিমান হেসে উঠে বলল, আচ্ছা ভীতু তুই! বাপ্!

অখিল অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠ্‌ল।

বিমান বল্‌লে', আয় না দেখি, ব্যাপারটা কি?

অখিল নীরবে বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

বিমান বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কালো আকাশভরা তারা জল্‌জ্বল্ করচে।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম! জঙ্গলের মাথায় মাথায় ঝিল্লীর দল জোট পাকিয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। বিমান উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো! কোথাও কোন আওয়াজ নেই। একটা গাছের মাথা হ'তে একদল পাখী ডানা ঝাপ্টানি দিয়ে উড়ে গেল।

বিমান ঘরে এসে বল্‌লে, ও কি জানিস্? গাছের মাথায় শকুনির ছানা কাঁদছিল। ঠিক কচিছেলের মতই কাঁদে। শরৎবাবুর 'শ্রীকান্ত' পড়িস্ নি?

বিমান ছেলেদের যেমনি প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলো, তেম্‌নি আশপাশের গাঁয়ের লোকও তাকে প্রশংসার চোখে দেখ্‌লো। সে যেমনি সদালাপী, তেমনি মিষ্টভাষী। তার উপর খেলায়, গানে সে গ্রামের তরুণদলের নেতা হ'য়ে দাঁড়াল। অখিল শিক্ষকতায় যেমনি কৃতিত্ব দেখালে, বিমান তেমনি ছাত্রদের কেতাদুরস্ত ক'রে তুল্‌লে। লেখাপড়ার সময় ছাড়াও বিমান ছাত্রদের শিক্ষা দিত, নীতি, ব্যায়াম স্বাস্থ্য ও পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে। সে তাদের আদর্শ ছাত্র গড়ে' তুল্‌তে চায়। ছাত্রদের সঙ্গে এম্‌নি প্রাণ খুলে সে মিশতো, যেন তারা বন্ধু, যেন সে তাদের খেলার সাথী। ছাত্রের দল যেমনি তাকে ভক্তি করতো, তেমনি ভালোবাসতো। অখিল একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তাই ছেলেরা পড়াশুনা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে তার কাছে বড় একটা ঘেঁস্‌তো-না। বিমান ছেলেদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ, খেলা, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতিতে ঠিক্ তাদেরি একজনের মতো প্রাণখুলে মিশতো। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর্‌তো। ছেলেরাও তার ইঙ্গিতে চলাফেরা করতো।

কিসের একটা ছুটি ছিল সেদিন। বিমান ও অখিল হাটে গিয়েছিল। হাটে ছেলের দল মাষ্টার-মহাশয়দের ঘিরে দাঁড়ালো। বিমান একটি ছেলেকে বল্‌লে, ঐ কালো পাটাটা দর কর। আজ স্কুল-বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। ছেলের দল মহোল্লাসে লেগে গেল। পাটা কেনা হলো; বিমান দিলে তার দাম। ছেলেরা সব চাঁদা দিয়ে সংগ্রহ করলে, ঘি, ময়দা, কাঁচা বাজার, মসলা। তারপর সারাদিন স্কুল-বাড়ীতে সে এক সমারোহ ব্যাপার! বিমান ও ছেলেরা মিলে রান্না করলে। নিবারণ দিলে যোগাড় ক'রে! কী সে আনন্দ! বিমান ছেলেদের সঙ্গে গান গায়। জাতীয় সঙ্গীত! অখিলের বুকে আনন্দ ঘন হ'য়ে ওঠে। সে অপলকে তাদের পানে চেয়ে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে রাত হ'য়ে গেল। নিবারণের গ্রামের ছেলেদের সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। বাকি ছেলেদের বিমান বল্‌লে, চল্, তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি। তোদের সঙ্গে তো আলো নেই। অখিল ও বিমান টর্চ হাতে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে গ্রামে গেল। মাইল খানেক পথ। ঝির্‌ঝির ক'রে হাওয়া দিচ্চে। হাওয়ায় ভেসে আস্‌চে বনফুলের গন্ধ। আকাশে ফালি চাঁদ উঠেচে। দূরে, মেঠো পথে কে একজন ভাটিয়ালি সুরে গান ধরেচে।...ফের্‌বার পথে বিমান বল্‌লে, সত্যি বল্ দেখি, এ আবহাওয়াটুকু কি শহরে মেলে! অখিল বল্‌লে, না, এই ফাঁকা হাওয়াটুকু সত্যি উপভোগ করবার মত।

বিমান বল্‌লে, এই সবুজের রাজত্ব, ঐ কুয়াসা-ঢাকা ঝাপসা চাঁদের আলো, এই নির্জ্জনতা, এই তাজা ফাঁকা বাতাস, এরা যেন আমায় পাগল ক'রে তোলে। আর ঐ অশিক্ষিত পল্লীর তরুণদল, ঐ নিষ্পাপ দরিদ্র, ওদের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে যেন নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি। এদের মত দুঃখী কে? এদের না আছে অর্থ, না আছে শিক্ষা!

অখিল একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বিমানের মুখের পানে চাইল।

এমনি অন্যমনস্ক হ'য়েই একসময় তারা স্কুল-বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। কিন্তু ও কি! ও কারা! অখিল ও বিমানের মনে হলো কতক-গুলো ছোট ছোট ছেলে দল বেঁধে স্কুল-বাড়ীর উঠোনে ছুটোছুটি করচে।

...সকলেরই পরণে সাদা কাপড়-জামা। চাঁদের আলোয় ধপ ধপ্ করচে। এত রাত্রে ও কারা?...এখনো কি ছোঁড়ার দল বাড়ী ফেরে নি না কি?

অখিলের বুকের নীচেটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো! এইতো একটু আগে নিবারণের সঙ্গে তারা বাড়ী গেল! বিমান বল্‌লে, চল্ না, দেখাই যাক্।

দু'জনে নীরবে বাসায় না উঠে স্কুল-বাড়ীর দিকে এগিয়ে এলো। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। রাত্রির গভীরতা ঘন হ'য়ে উঠেচে। কুয়াসার মত কিসের একটা ঘন আবরণে যেন আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত। ছেলেদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই তারা দু'জনে স্কুল-বাড়ীর উঠোনে এসে পৌছল—ঠিক সেইখানে, যেখানে ছেলের দল নেচে নেচে খেল্‌ছিল। কিন্তু তারা যখন সেইখানে পৌছল, ছেলেরা তখন ঠিক তাদের সাম্‌নের ইঁদারাটা ঘিরে তার চারিপাশে হাতধরাধরি ক'রে নাচ্‌ছে। কেমন ক'রে, কখন যে তারা চোখের নিমেষে এতখানি সরে গেল, তাই ভেবে বিমা-নের সাহসী বুকও কেঁপে উঠ্‌লো। অখিল তো থরথর ক'রে কাঁপচে।

...বিমান চিরদিন একগুঁয়ে। সে সাহসে ভর ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কে তোরা?

উত্তরে একসঙ্গে দশ-পনেরজনের মিলিত খিল্‌খিল্ হাসি ভেসে এলো।

দাঁড়া ত' বলে' বিমান রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে তাদের পানে ছুটে গেলো। কিন্তু বিমান কুয়ো-টার কাছে এসে পৌছাবার পূর্ব্বেই ছেলেগুলো খিল্‌খিল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে কুয়োর ওপর উঠে ঝপ্ ঝপ্ ক'রে কুয়োর ভেতর লাফিয়ে পড়ল।

সংজ্ঞাহীনের মতই বিমান কাঠ হ'য়ে কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

সারারাত্রি বিমানের ঘুম হলো না। অখিল তো মূর্চ্ছিতের মত নিঃশব্দে পড়ে রইল। বিমান বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। ভেবে কিছুতেই এ রহস্যের কিনারা করতে পার্‌লে না। অথচ, নিজের চোখ্‌কেও তো অবিশ্বাস করা চলে না। তবে কি সত্যই এরা—? বিমান যে কখনো ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে নি।

পরদিন সকালে বিমান কিন্তু আবার সেই বিমান। সে চা খেতে খেতে অখিলকে বল্‌লে, দেখ্ অখিল, ভয় আমি মোটেই পাই নি, বিশ্বাসও আমি করি না, তবে আশ্চর্য্য হয়েছি কতকটা।

অখিল নীরবে চা-এর বাটীতে চুমুক দিতে লাগ্‌লো।

বিমান বল্‌লে, একথা কাউকে বলা হবে না। তা' হ'লে সবাই ভাব্‌বে আমরা ভয় পেয়েচি। ব্যাপারটাকে পরিষ্কার কর্‌তেই হবে। আজ থেকে আমাদের রীতিমত ওয়াচ্ কর্‌তে হবে।

অখিল বল্‌লে, জানপিটের মরণ তেপান্তরের মাঠে, আমি কিন্তু আর এখানে থাক্‌চি না। গাঁয়ের ভেতর বাসা ঠিক কর্‌ব। বিঘোরে প্রাণটা দিতে পার্‌ব না।

বিমান হেসে তার কথাটাকে তখনকার মত তরল ক'রে নিলে। তারপর মনে মনে ঠিক্ কর্‌লে—অখিলকে দিয়ে কিছু হবে না, সে সারারাত জেগে চৌকি দেবে।

দিন দুই পরের কথা।

রাত দুপুর। স্কুলের অফিস-ঘরে বসে' বিমান যুবকদের সঙ্গে পাশা খেল্‌ছিল; ধপ্‌ধপে সাদা থান্‌পরা একটি স্ত্রীলোক যে কখন দোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েচে, তারা লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ বিমান বাইরের পানে চেয়ে দেহে রোমাঞ্চ বোধ কর্‌লে। বিমান যুবকদের ইঙ্গিত কর্‌লে। কিন্তু যুবকদের সঙ্গে যখন সে বাহিরের পানে চাইলে, তখন নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেচে। বিমান স্তব্ধবিস্ময়ে যুবকদের সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লে। হয়তো চোখের ভুল!

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আবার তাদের খেলা জমে' উঠেচে। হঠাৎ বাইরে একটা খটাখট্ আওয়াজ শোনা গেল। বিমান ও সঙ্গীরা উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌লে।

মনে হলো পাশের ঘর হ'তে আওয়াজটা আস্‌চে। বিমান সঙ্গীদের পেছনে রেখে ঘর হ'তে বাইরে এলো। হাতে তীব্র টর্চ্চ।

একটা ক্লাসের সাম্‌নে এসে টর্চ্চের তীব্র আলোয় যা' দেখ্‌লে, তা'তে তার হৃদকম্প আরম্ভ হলো। একটা আধ্‌বয়সী মেয়ে, পরণে সেই সাদা ধপ্‌ধপে থান, একটা বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে পড়ে' হাতুড়ী দিয়ে একটা পেরেক না কিসের উপর ঘা মার্‌চে, আর তার ঠিক্ পাশে দাঁড়িয়ে একটি গোলগাল সাত-আটবছরের ছেলে। টর্চ্চের তীব্র আলো তাদের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপও কর্‌লে না।

বিমানের দল দোরের আড়ালে নিঃশব্দে রইলো। মেয়েটি তেম্‌নি খটাখট্ হাতুড়ী ঠুক্‌চে, আর ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। এক সময় মেয়েটি মুখ তুলে ছেলেটির পানে চাইলে, সে খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌লে। মেয়েটি কথা কইলে, বেশ স্পষ্ট, সহজ মানুষের স্বর! মেয়েটি বল্‌লে, বেঞ্চের পেরেকে রোজ্ রোজ্ ছেলেদের কাপড় ছিঁড়্‌চে, পোড়া মাষ্টাররা দেখেও দেখে না।—

বিমান সাহস সঞ্চয় করে' ঘরে ঢুকে কি একটা প্রশ্ন কর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখের পলকে কোথায় যে তারা মিশিয়ে গেল, কেউ বুঝ্‌তে পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে বিমানের দলের দু'জন —বাপ্‌রে বলে' সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন বিমান নিবারণকে সব কথা খুলে বল্‌লে। নিবারণ গাঁয়ের পুরোণো লোক। সে বল্‌লে, যখন ভয় পেয়েচেন বাবু, তখন আর এ বাসায় থেকে কাজ নেই, গাঁয়ের ভেতর চলুন। আমি জান্‌তুম, এখানে থাক্‌তে পারবেন না।

প্রশ্ন করে' বিমান জান্‌লে, স্কুল-বাড়ীর যেখানে ঐ ইঁদারাটা রয়েচে, ঐ জায়গায় এক কালে নাকি কচিছেলের মৃতদেহ পোঁতা হতো। পাড়াগাঁয়ে ছেলেদের দেহ পোড়ান হয় না। ইঁদারা কাটাবার সময় ছেলেদের কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছিল। আর বিমানের মুখে নারী-সম্পর্কীয় গল্প শুনে নিবারণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে বল্‌লে, বলেন কি বাবু? এ যে সত্যি ঘটেছিল, এই সেদিনের কথা। একদিন স্কুল চল্‌চে, তখন বেলা দেড়টা-দুটো হবে। শীতকাল, আমার বেশ মনে আছে। আমাদের গাঁয়ের কুসুম ঠাক্‌রুণের ছেলে পড়তো সেভেনথ্ কেলাসে। কেলাসে পড়াচ্ছিলেন তখন মন্মথবাবু, এইতো সেদিন তিনি চলে' গেলেন আদালতে চাক্‌রী পেয়ে। হ্যাঁ, মন্মথবাবু পড়াচ্চেন, হঠাৎ হন্ত-দন্ত হ'য়ে একটা হাতুড়ী হাতে নিয়ে কুসুম ঠাক্‌রুণ কেলাসের মাঝে এসে হাজির! মন্মথ-

বাবুতো ভয়ে জড়সড়! ঠাক্‌রুণ ছেলেকে জিগ্‌গেস্ করলেন, কই, কোন্ পেরেকে কাপড় ছিঁড়েচিস্ দেখি। ছেলে দেখিয়ে দিতেই কাল রাতে যে কথা শুনেচেন, ঐ কথা না বলেই আপন-মনে পেরেকের উপর হাতুড়ীর ঘা মারতে লাগলেন। আমি আবার হাঁ হাঁ করে' ছুটে আসি। ··· সত্যি গরীব ছিলেন, নিজের হাতে পৈতে কেটে তাঁদের চলতো।

বিমান জিগ্‌গেস্ করলে, হ্যাঁ, তারপর তাঁদের কি হলো।

নিবারণ বল্‌লে, আহা! সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব আপনাকে। গ্রীষ্মের ছুটি হবে বলে' সেদিন ঠিকমত ইস্কুল বসে নি, ছেলেরা সব এঘর-ওঘর করে' বেড়াচ্ছে, হঠাৎ চীৎকার উঠ্‌ল ডুবে গেল, ডুবে গেল! ছুটোছুটি লাফালাফি করে' সব পাতকোর ধারে গিয়ে দেখি অভাগীরই কপাল পুড়েচে—কুসুম ঠাক্‌রুণের ছেলেই কূয়ায় পড়েছে। তখনই তোলা হ'ল, কিন্তু সব বৃথা! সম্ভবতঃ, দমবন্ধ হয়েই সে মরে গেছে। মাগীর সে কী কান্না—পাথরও তা'তে গলে যায়! পরদিন খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি সব শেষ,—কুসুম ঠাকরুণ ওই কূয়াতে নিজেকে টেনে এনে জন্মের মত বিসর্জ্জন দেছে।

বিমান একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিবারণের মুখের পানে চাইলে,—আতঙ্কের বিস্ময়ে!

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

এবার আর কানাঘুষা নয়—চিঠিখানা স্বচক্ষে দেখিলাম। রমেনের বাপ লিখিয়াছেন। রমেন বলিল, 'পড়ে ছাখো।'

তাহার পিতার এক বন্ধুকন্যার সহিত রমেনের বিবাহের একটা কানাঘুষার খবর প্রায় মাস দুয়েক হইতে শুনিতেছিলাম। কিন্তু চিঠিখানায় রমেনের বাবা জানাইয়াছেন যে, বন্ধুর শরীর ভাল নয়, গিরিডির জল-হাওয়া ঠিকমত সহ্য হইতেছে না,সে কারণ আলমোড়া কিংবা নৈনিতাল অঞ্চলে যাওয়ার তাঁহার ইচ্ছা। শুভ কার্য্যটা তাহার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলা ভাল। সুতরাং এই মাসের সাতাশে—

একটা কবিতা আওড়াইতে যাইতেছিলাম, কিন্তু রমেনের মুখের দিকে হঠাৎ চাহিয়া আর ভরসা হইল না। সে মুখখানাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আমি আজই বাবাকে স্পষ্ট লিখে দেব যে, বিয়ে আমি করবো না।'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলাম, 'সে কি রে?'

রমেন বলিল, 'বিয়ে সম্বন্ধে এতদিন মনে মনে যে একটা আদর্শ ঠিক করে' রেখেছিলাম, সেটা এক কথাতেই উড়ে যাবে?'

মনে পড়িল বটে। ইডেন্ গার্ডেনে এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে বসিয়া রমেন আমাকে অনেক কবিতা শোনাইয়াছে বটে, এবং সেই সঙ্গে বহুবার বলিয়াছে যে, বিবাহই যদি সে কখনও করে, রীতিমত একটা রোমান্সের সৃষ্টি করিয়া তবে করিবে।

ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! হতভাগাটা কি সেই উদ্ভট কল্পনাগুলাকে সত্যই মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছে না কি? আজকালকার নভেলগুলাই দেখিতেছি ছেলেদের মাথা খাইবে।

বলিলাম, 'সে কি রে? বাঙ্গালী গেরস্থ-ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে রোম্যান্স কোথায় পাবি? এ কি বিলেত—না আমেরিকা?'

রমেন কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। সে বলিল, 'যা' বল ভাই, ও রকম ভাবে বিয়ে আমি করবো না। যাকে দেখি নি; জানি না, আমাকেও যে কখনও দেখে নি বা জানে না, তারই সঙ্গে কি না সারাজীবন বাঁধন? সেই ঝকমারি চির-দিন পোয়াতে হবে? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।'

তারপর সে বলিতে লাগিল, 'সকল দেশেরই প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের ভেতরে দেখ, আমাদের যেমন এই উদ্ভট প্রথা, এমন আর কোথাও নয়। দুষ্মন্ত শকুন্তলা,' এন্টনি-ক্লিওপেট্রা,

কিম্বা জগৎসিংহ-তিলোত্তমার কথা ছেড়েই দাও, আমাদেরই দেশের বীর সুরেশ বিশ্বাস কি করে-ছিলেন ?—ব্রেজিলে একটী মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তারপর বিয়ের কথা মেয়ের পক্ষ থেকে আপনা হতেই এলো। এই সেদিন তো একখানা বইতে পড়ছিলাম যে, একখানা নৌকো উল্টে গেল। পাশের ষ্টীমার থেকে একজন ছোকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে', একটী মেয়েকে উদ্ধার করে' ষ্টীমারে তুললে। তারপর কৃতজ্ঞতার পালা শেষ হবার পর মেয়েটির সঙ্গেই হলো তার বিয়ে। ভাব দিকিনি, এ কেমন একটা ব্যাপার। আর আমাদের সেই মামুলী প্রথা, দেখা নেই, শোনা নেই, কর বিয়ে তো, করলাম বিয়ে—'

হাসিলাম। তাহাকে বলিলাম, 'তোর বাবাকে বলে' মেয়েটীকে একবার কেন দেখেই আয় না রমেন। গিরিডি তো এমন কিছু বেশী দূর নয়। 'মিষ্টান্নমিতরে জনা'র লোভে না হয় আমিও তোর সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।'

হঠাৎ রমেন বলিল, 'তুমি সত্যি রাজি আছ সেখানে যেতে ?'

আমার অসম্মতির কোনও কারণ নাই তাহা তাহাকে জানাইলাম।

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া সে বলিল, 'সত্যি তুমি যদি যাও নীরোদ-দা,' তা' হ'লে আমার মাথায় ভারি মজার একটা প্ল্যান এসেছে।'

আমি বিস্ময়ের সুরে বলিলাম। 'কি প্ল্যান রে, হরিদাসী বোষ্টুমী-টোষ্টুমী কিছু হবি না কি ? গান-টান প্র্যাকটিস্—

তাহার প্ল্যানটা শুনিতে হইল। ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম, কিন্তু তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমার 'আর্গুমেন্ট' টিঁকিল না। সে তো সেইদিনই রওনা হইতে চাহিল, অনেক কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিয়া অবশেষে পরদিন শ্রীদুর্গা বলিয়া গিরিডি রওনা হইলাম।

পাগলটাকে লইয়া কি ঝকমারি দেখ দেখি !

দুই

পাঁজি-পুথি দেখিয়া অবশ্য যাত্রা করি নাই, কিন্তু অদৃষ্টে যে দুর্গতি আছে, তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। রাত্রে আর থাকিবার স্থান কোথায় পাইব, সেজন্য ডাকবাঙলায় গিয়া উঠিলাম ; কিন্তু শুনিলাম তাহাতে স্থান নাই—দিন তিনেকের মধ্যে সেখানে আশ্রয় মিলিবার উপায় নাই। অবশেষে ষ্টেশনের ওয়েটীং-রুমে রাত কাটাইয়া ভোরবেলা এক হিন্দুস্থানীর মাঠকোঠার দ্বিতলে একখানি ঘর ঠিক করা গেল।

রমেনের ভাবীশ্বশুরের নাম এবং ঠিকানা অজানা ছিল না ; সুতরাং, আমাদের প্রাতর্ভ্রমণের অভিযান সেইদিকেই সুরু করিলাম।

খানিকটা কম্পাউণ্ড-ঘেরা বেশ ছোট্ট বাড়িটি। গোটাকয়েক ইউক্যালিপ্টাস গাছ ছোট ফটকটার দুইদিকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারই ওপাশে গোটাকয়েক করবীর ঝাড় এবং বিক্ষিপ্ত কয়েকটী শাল গাছ। তাহারই ফাঁক দিয়া অদূরে যে একটা বালির চড়ার মত দেখা যাইতেছিল, সেইটাই উশ্রী নদী।

একটা তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়াছে। একটী মেয়ে আঁচলে করিয়া কতকগুলি আলু তুলিতেছে। রমেনের গা টিপিলাম। অনুমানে বুঝিলাম, ঐ মেয়েটীই রমেনের ভাবীবধূ।

কেন, নিন্দা করিবার মত মেয়ে তো নয়। রংটা একটু ময়লা বটে, নাকটাও হয় তো খুব টিকালো নয়, কিন্তু চোখ দু'টি বেশ ভাবা ভাবা।

রং একটু ময়লা হইলই বা—রমেন কি তাহাকে 'শো কেসে' সাজাইয়া রাখিবে না কি।

উস্ত্রীর চড়ায় খুব খানিকটা ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল যে, আমাদের মাঠকোঠার আশ্রমটী নেহাৎ নিকটে নয়, বরং এতবেলায় সেখানে ফিরিয়া বাড়ীওয়ালা ঠাকরুণের হাতের রান্না যে কি উপায়ে গলাধঃকরণ করিব, সেও একটা সমস্যার বিষয়।

কোন্ রাস্তা দিয়া যে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছিলাম তাহা জানি না, হঠাৎ দেখি পাশের একটা গলি-পথে খানকয়েক বই হাতে করিয়া একটি তরুণী কিছুদূর গিয়া একটা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

শাড়ীটা এখন অন্য রংয়ের হইলেও চিনিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। এবার রমেনকে জোরে একটা চিমটি কাটিয়া দিলাম।

তিন

রমেনকে বলিলাম, 'দিন চারেক তো কেটে গেল, আর কেন? এইবার বরং চল, একদিন ওদের বাড়ীতে রীতিমত পরিচয় দিয়ে, তার পর যথারীতি পাত্রী দেখে পেটপুরে খেয়ে এই ক'টা দিনের হাফ উপোষের ধাক্কাটা কাটিয়ে নেওয়া যাক্। কি বলিস্? মেয়ে তো দেখা হোল। মন্দই বা কি? বেশ মেয়ে, দিব্বি মেয়ে!'

কিন্তু রমেন বলিল, 'আহা, মেয়ে দেখা হলেই একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে যাব আর কি! এই বার আমার আসল প্ল্যানটা শোন নীরদ-দা'।'

তাহার 'আসল প্ল্যানটা' শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'বলিস কি রে রমেন! শেষটা—'

তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এই কয়দিন ধরিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মেয়েটি যায় ব্রাহ্ম-মন্দিরের ওপাশের রাস্তার একটি বাড়ীতে—বোধ হয় গান শিখিতে।

তাহার অনুমানশক্তিকে তারিফ করিতেছিলাম; কিন্তু সে বলিল যে, মেয়েটি যাইবার কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বোক্ত বাড়ীটি হইতে সঙ্গীতের আওয়াজ সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

কিন্তু তারপর —প্ল্যানটা সব শুনিয়া গেলাম এবং কি করি, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সম্মতিও দিতে হইল।

সাজপোষাক দেখিয়া আমি তো আর হাসিয়া বাঁচি না। যে শতছিন্ন কম্বলখানি রমেন আমার জন্য আনিয়াছে, তাহা যে কোনো ঘোড়ার আস্তাবলের, সে বিষয়ে আর সংশয় ছিল না। সেই কম্বলটাকে আমার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া, মুখে 'স্পিরিট গাম' দিয়া কতকগুলি দাড়ি-গোঁফ বসাইয়া, আরও কতগুলি প্রক্রিয়ার পর সে যখন আমার হাতে আয়নাখানা দিল, তখন নিজেকেই আর চিনিতে পারি না। বলিলাম, 'এ বেশে যদি বাড়ীওয়ালা লালাজী আমাকে বাহির হইতে দেখে—'

কিন্তু আমার পোষাকের উপর এবং মাথায় ও মুখে একটা কাপড় জড়াইয়া, অন্ধকারের আবছায়ায় রমেন আমাকে বাড়ীর বাহিরে আনিল। লালাজীর নজরে পড়িলাম না।

'বারগণ্ডা'য় আসিয়া রমেনের নির্দ্দিষ্ট রাস্তার একপাশে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া পড়িলাম। কি দুর্ভোগেই পড়া গিয়াছে! পুলিশ-টুলিস এদিকে না আসিলে বাঁচি!

প্রায় আধঘণ্টা সেই অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইল। কম্বলটা সর্ব্বাঙ্গে কুটকুট করিতেছে, তার মধ্যে ছারপোকা কি পিঁপড়া আছে, কে জানে! আর দুর্গন্ধও তেমনি!

হঠাৎ দেখিলাম, রাস্তাটা যেখানে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেইদিক হইতে কে যেন আসিতেছে। নারীমূর্ত্তিই বটে। যাক্, বাঁচা গেল!

সাম্‌নাসাম্‌নি হইবামাত্র আমি রমেনের শিক্ষামত বলিলাম, 'ফকীরকো একঠো আধেলা দেলায় দেও মায়ি।'

কিন্তু মায়ীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অগ্রসর হইলেন। আমিও তাঁহার সম্মুখীন হইয়া আবার হাত পাতিলাম। অন্ধকারে মুখ দেখিতে পাইলাম না, তবে অনুমানে বুঝিলাম,—ইনি রমেনের ভাবীবধূটিই বটেন।

এবার উত্তর হইল, 'নেহি হ্যায়। যাও।'

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। প্রায় তাঁহার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিলাম, 'ই কেয়া বাত মায়ি, একঠো আধেলা নেহি হ্যায়? হাতমে তো সোনেকা চুড়ী হ্যায়, আউর—'

কথা ছিল, রমেন নিকটেই লুকাইয়া থাকিবে। আমি তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিব না, সেই সময় সে আসিয়া বীরত্ব দেখাইয়া আমাকে দূর করিয়া দিবে এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিবে। রাগটা বেশী করিয়া দেখাইতে গিয়া যেন আমাকে প্রহার-ট্রহার না করে, সে কথা তাহাকে পুনঃপুনঃ ভাল করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। তারপর সে দুষ্মন্ত হোক্ বা জগৎসিংহ হোক্ বা ষ্টীমারের ঝাঁপ দেওয়া সেই তরুণ নায়ক হোক্, তাহাতে আমার আপত্তি ছিল না।

একটু রাগের সহিত উত্তর হইল, 'নেহি হ্যায় বোলা—'

আমিও সাম্‌নে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলাম। বুকের ভেতর তখন যেন গুরগুর করিয়া কাঁপিতেছিল। আমার কম্বলটা বোধ হয় তাঁহার শাড়ীর আঁচলটা স্পর্শ করিয়া থাকিবে, হঠাৎ তিনি দূরে ছিটকাইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'পুলিস—'

বাঁকের মুখে দেখিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এদিকে আসিতে-ছেন। যাক্, রমেনটাই তবে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হাতে লাঠি কেন আবার? যাই হোক্, গায়ের কম্বলটা এবং মুখের গোঁফদাড়িগুলা খুলিতে পারিলে যে বাঁচি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মুখে টর্চ্চ লাইটের তীব্র আলো পড়িল, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই কাঁধে এক ঘা লাঠি। তারপরই এক চীৎকার এবং সঙ্গে-সঙ্গেই এদিক-ওদিক হইতে পাঁচ-সাতটা লোক ছুটিয়া আসিল। কি সর্ব্বনাশ! এও কি রমেনের প্ল্যানের মধ্যে না কি? আমাকে যিনি লাঠি মারিয়াছিলেন, হঠাৎ টর্চ্চ লাইটটা একবার তাঁহার মুখের উপর পড়িতেই, আমার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিল। এ কি, এ তো রমেন নয়! সে হত-ভাগা তবে গেল কোথায়? আমাকে এই বিপদের মুখে ফেলিয়া—

যে লোকগুলি আসিল, তাহারা যে আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিল, তাহা না বলিলেও কাহারও অসুবিধা নাই। মোটা কম্বলের কল্যাণে প্রথম আঘাতটা আমি কোনরূপে সহ্য করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তারপরের চার-পাঁচ ঘা! উঃ, সে কথা মনে পড়িলে আজও চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারি না।

দুর্ভোগটা সেইখানেই শেষ হইল না। থানায় আসিতে হইল। তাঁহারা কেস ডায়েরী করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে হাজতের দুয়ার খুলিয়া দিল। চোখে জল অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, এবার স্পষ্টই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার আমার ডাক

পড়িল। এবার দেখি ইনেস্‌পেক্টারের সম্মুখে রমেনটা দাঁড়াইয়া আছে। পাজি, হতভাগা, শয়তান! রোম্যান্স না হইলে উনি বিবাহ করিবেন না! ষ্টুপিড কোথাকার! রোম্যান্স চাই তো, আমেরিকায় চলিয়া যা' না! আমার এই দুর্গতি করিয়া ওর রোম্যান্স! ইচ্ছা হইল, উহার মাথাটা কচমচ করিয়া একবার চিবাইয়া দেখি যে, নরমাংস খাইতে কেমন লাগে! অকৃতজ্ঞ, ক্যাডাভরাস্!

রমেন ইনেস্‌পেক্টারকে বুঝাইল যে, আমি তাহার বন্ধু, তাহাকে ভয় দেখাইয়া একটু আমোদ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং—

কিন্তু পুলিসের ইনেস্‌পেক্টার এত সহজ কথায় ভোলেন না। তিনি বলিলেন, বন্ধুকে ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার উদ্দেশ্যই যদি আমার ছিল, তবে একজন ভদ্রমহিলার উপর অত্যাচার করিতে যাওয়ার তাৎপর্য্যটা কি?

ভাল করিয়া বোঝানো গেল না। শেষে ইনেস্‌পেক্টারটী বলিলেন, যদি সেই মহিলাটীর তরফ হইতে কেস উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি আর চাপাচাপি করিতে চাহেন না।

সেটা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা বুঝিলাম। মহিলাটী—অর্থাৎ রমেনের সেই ভাবীপত্নী—সেখানে রমেন গিয়া কি পরিচয় দিবে? এসব ব্যাপার যে কেন ঘটিল, তাহার কোনও বিবরণই সে সেখানে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। উঃ, পিঠটা আর সোজা করিবার উপায় নাই! সর্ব্বাঙ্গ বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে।

কিন্তু সেইরাত্রেও রমেন আবার বাহির হইল। জামিনের চেষ্টায় কি না কে জানে! আর এই বিদেশে কেই বা জামিন হইবে? আমি আবার হাজতে ঢুকিলাম।

চার

গোঁফদাড়িগুলা বড়ই অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলাকে হাজতে বসিয়াই তুলিয়া ফেলিলাম। তবু স্পিরিট গাম্‌টা মুখের উপর শুকাইয়া মুখটা চড়চড় করিতেছিল।

সকালবেলা থানার অফিস-কক্ষে নীত হইয়া দেখি, রমেন ম্লানমুখে বসিয়া আছে; আর একখানা চেয়ারে বসিয়া, সেই যে আমাকে লাঠি মারিয়াছিল। ওঃ, লোকটা ঠিক যেন একটা গুণ্ডা! নাম শুনিলাম, সত্যবিলাসবাবু! মনে হইল, লগুড়বিলাস হইলেই ঠিক মানাইত।

যা' হোক্ একটা কাল্পনিক কাহিনী রমেন ইহাদের নিকট বিবৃত করিয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম! পাছে বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলি, এই ভয়ে আমি আর কথা কহিলাম না।

সত্যবিলাস হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনার মুখটা যেন চেনা চেনা দেখাচ্ছে।'

শিহরিয়া উঠিলাম। এই অবস্থায় চেনা লোক! সর্ব্বনাশ আর কি! কিন্তু লগুড়বিলাস হঠিবার পাত্র নয়। সে বলিল, 'আচ্ছা, আপনার শ্বশুরবাড়ী কি ঝাঁপাগেছে?'

ইচ্ছা হইল, অভিনয়ের সুরে চীৎকার করিয়া বলি, 'দ্বিধা হও জননী ধরিত্রী!'

কিন্তু ভয় হইল, সেরূপ করিলে পাছে এই থানা হইতেই সোজা একেবারে পাঠাইয়া দেয় পাগলা-গারদে।

কাজেই আমতাআমতা করিয়া বলিতে হইল, 'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে আর কি—ঝাঁপাগেছের অনেক—মানে আর কি—'

'আচ্ছা নীলমাধববাবু আপনার কেউ—'

শ্বশুর-মহাশয়ের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধও যে

আমার আছে, সে কথা স্পষ্টই অস্বীকার করিতে হইল। ওঃ, বিপদে পড়িলে মানুষের অসাধ্য আর কি আছে!

যাই হোক্, মুক্তি পাওয়া গেল। এবং সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসাও হইল।

পাঁচ

পিঠের ব্যথা সারিতে প্রায় দিন পনের কাটিয়া গেল। সাতাশে তারিখের আর বেশী দিন নাই—হঠাৎ একদিন রমেন আসিয়া হাজির। হাতে একখানা চিঠি।

পড়িলাম। ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র। তাহার ভাবীশ্বশুর তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়াছেন। পড়িয়া বলিলাম, 'সে কি রে! অবশেষে সেই সত্যবিলাসবাবুর সঙ্গে? সেই লেঠেলটা? তোর এত রোম্যান্স, আমার পিঠজোড়া লাঠি, সারা রাত্রি হাজতের মশা, লালাজীর পুদিনার আচার—সব শেষটা বৃথা হোল?'

কিন্তু রমেন বলিল, 'এ ভালই হোল। আমি ফিরে এসে বাবাকে স্পষ্টই অসম্মতি জানিয়েছিলাম—সেদিনকার ঐ ঘটনার পরে ও মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারি না।'

হাসি আসিল। রমেনকে বলিলাম, 'তোর অবস্থা হোল কথামালার সেই শেয়াল আর আঙুরের মতন। আঙুর যখন নাগালে পাওয়া গেল না—'

রমেন বাধা দিয়া বলিল, 'না সেটা নয়?'

আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কোন্‌টা?'

সে হাসিয়া বলিল, 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।'

সমালোচনা

গলার কাঁটা—অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই উপন্যাসখানির প্রথম দিকটা পাঠকের মনে হয় ত তেমন রং ধরাইতে না পারিলেও, ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহারা যদি একটু অগ্রসর হন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের গুণপনায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লীর চিত্র ও চরিত্র তাঁহার কলমের মুখে ফুটিয়াছে ভাল। দোষ-ত্রুটী যে নাই এমন বলিলে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকখানির নীরভাগ ত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগ গ্রহণে সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই নবীন অতিথিটির প্রথম প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবেন, এ আশা করা বোধ হয় অনুচিত হইবে না।

ফাল্গুনী——মাসিক-পত্রিকা——'বান্ধব-পুস্তকালয়', ১৭, শিবপুর রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। এই নূতন পত্রিকাখানিকে আমরা সাদরে সাহিত্যের দরবারে আহ্বান করিতেছি। ইহার রচনাগুলি সুনির্ব্বাচিত। চিত্র সংখ্যায় অল্প হইলেও সুন্দর। সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গৌড়দূত—মালদহ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার টিপ্পনী ও সমালোচন প্রশংসনীয়, মূল্যবান সাহিত্যের হাটে, এই স্তুতিগুরু বান্ধবতার যুগে এইরূপ নির্ভীকতা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ } পৌষ, ১৩৪০ নবম সংখ্যা

অ-দৃষ্ট পুরুষের পরিহাস !

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

কল্পনা—আলোচনা

শাশুড়ী-ঠাকরুণ উপদেশ দিলেন। তিনি গুরুজন ; অবহেলা করিতে পারি না, কাজেই তাঁহার আদেশ সাদরে মাথা পাতিয়া লইলাম।

গৃহিণী প্রিয়ভাষিণী ; কথাটার টীকা-টিপন্নি দিয়া বিশদ ব্যাখায় যা' বুঝাইলেন, তা' অর্থ-শাস্ত্রেরই অনুকূল বটে ! ভাবিয়া দেখিবার জন্য অবশ্য অনুরোধের রসান তা'তে যে মিশ্রিত ছিল না, তা' বলা চলে না ; অতএব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইলাম, "হাঁ সংসার করিতে গেলে এটা খুব প্রয়োজনীয়ই বটে !"

প্রিয়ভাষিণীর কণ্ঠে যেন মধু ক্ষরিতে লাগিল, "দেখছ ত, গয়লার দেনা মাসে মাসে কি রকম বেড়েই চলেছে ; অথচ, বন্ধ করারও ত উপায় নেই—দুধের ছেলেদের কি দিয়েই বা পুষি বল ?"

নিঃসন্দেহে কথাটা মানিয়া লইলাম ; সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারের মধুর বিবৃতির কথাটাও যে স্মরণে আসিল না, তাহাও বলা চলে না। তিনি

ছিলেন, "গয়লার জল, কিন্তু ওতেও যেটুকু 'ভাইটামিন্' আছে, আপনাদের অন্য কোন কিছুতে তা' খুঁজেও পাওয়া যায় না ; তা' ছাড়া, শিশুর উপযোগী, বুঝছেন ? ওদের হাল্কা খাদ্য কতবড় দরকার, আপনারা না জান্‌লেও আমি ত জানি ; কাজেই দরখাস্ত দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর অন্ধ চক্ষু খুলে ওদের কোলকোতার বাইরে চিরদিনের জন্যে বের করে' দিতে পারলেও তা' দিই না, এই জন্যই না।"

একতরফা দরখাস্ত মানিয়া লইলেও অর্দ্ধাঙ্গিনীর 'কোর্ট' বন্ধ হইল না ; তিনি বলিলেন, "মা আমাদের কত ভালই দেখেন, তা'ত দেখছ। বাড়ীর গরু, সামনে দিকে খাবে কতটুকু ; কিন্তু পিছন দিয়ে যা' দেবে, তার দাম হিসেব করেও

কি নিকেসে আসে? দুধ ত দেবেই—গয়লার দেওয়া জলো তা' মোটেই নয়, যেন বটের আটা; তা' ছাড়া, নিত্য দই, ছানা, মাখম ওতেই তৈরী হ'য়ে যাবে; সর তুলে ঘিও যে একটু-আধটু পাওয়া যাবে না, তাও নয়। আর গোবর এঁটো পাড়বার জন্যে—যা' নিয়ে ঝিকে নিত্য এত খোসামোদ, সেটা ত জমবেই; তা' ছাড়া, তোমার মাসে বার গণ্ডা পয়সাও বেঁচে যাবে—

কথাটা অব্যক্ত রাখিয়াই গৃহিণী মুখের দিকে চাহিলেন। এমন শ্রুতিমধুর ভাষা—অবশেষটুকু না শুনিয়া কি থাকিতে পারা যায়! বলিলাম, "কিসে?"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মত ভোলানাথ হ'লেই সংসার করেছিলুম আর কি! ও গো, নিত্য যার জন্যে গয়লাপাড়ায় ছুটতে, যা' না হ'লে আঁচই ধরান চলে না, অফিসের 'লেট'; কেন না, রান্না না হ'লে পাত পাতবে কি দিয়ে—সেই ঘুঁটে? আর শুনেছ গা, ও বাড়ীর ঠাকুরুণ বলছিলেন, 'গোবরে মা মনসার দয়া না কি মোটেই হয় না। বিছে ত ও পথ দিয়েই মাড়ায় না—লতাও'।"

বলিলাম, "তা' তোমাদের সবার যখন মত, তখন আমারই বা অমত হবে কেন? তবে এর আগের জোগাড় পয়সা কিছু ত চাই। একটা ভাল গরু কিনতে খুব কম করেও একশ' টাকা।"

স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আসলে তুমি দেখছি,আমার কথাটাই বোঝ নি। কিনতে হবে না গো, সে বায়না তোমার বাঁচবে—দুর্ভাবনা ছাড়। মা বলছিলেন, তাঁর মামী—মানে কি না দিদিমা, একটা গরু 'পোষাণ'দিয়েছিলেন; কথা ছিল, যারা নিয়েছে, এক বেয়ানের পর তারা সেটা ফেরৎ দেবে। নেওয়া হয় নি; এতদিন পরে তারই এক বাচ্ছা না কি গাভিন হ'য়েছে। দিদিমার পণ সেটাকে নেবেনই! সেই গরু আমাদের আসবে। শুনেছি, ওর মা না কি একটানে পাঁচসের দুধ দিত; দু'বেলায় সাত-আট সের। আমাদের ভাগ্যে যদি ফলে, তোমরা সবাই দুধে-ভাতে থাকবে; আনাজ তেলের পয়সাও বাক্স থেকে বের করবার দরকার হবে না।"

উৎফুল্ল বলিলে হয় ত ভুল হয়; আবেগে উন্মত্ত হইয়া উঠিলান। কল্পনার এইখানেই ইতি।

দুই

বাস্তব—আয়োজন

এইবার বাস্তবের কথা।

প্রথম সমস্যা উঠিল ভাড়াটিয়া-বাড়ীতে গরু রাখা যায় কোথায়? উপরে দুইখানি ঘর; আর বারান্দার এককোণ ঘেরিয়া একটা কাঠের পার্টিসন উঠিয়া যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রায়তন স্থানটীর ব্যবধান সৃজন করা হইয়াছে, তা'কে ঠিক গৃহ বলা চলে না; সুতরাং দেবভোগ্য মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে; কারণ, চার হাত আড়াই হাত স্থান কোন বামন অবতারের উপযোগী ছাড়া মানুষের ব্যবহারে যে আসিতে পারে না, তা' সহজেই বোধগম্য; কাজেই, বামনদেবেরই স্থান করিয়া দিয়াছিলাম।

উপরের একখানি ঘরে নিজেদের শয়ন, এবং অন্যখানি অবসর আত্মীয়দিগের জন্য; যা' আমার কপালে নিত্য লাগিয়াই ছিল। নিজের জন্মভূমির না হোক্, শ্বশুরকন্যার আত্মীয়-আত্মীয়ার শুভাগমনের বিরাম ছিল না। নীচের আড়াইখানিতে কলঘর, রান্না এবং ভাণ্ডারস্থলী ত ছিলই, ফাজিলখানি বাহিরের দিকে নিজ খরচায় দরজা ফুটাইয়া বৈঠকখানায় পরিণত করিয়াছিলাম; তা'তে জগন্নাথ খুড়ো থাকিতেন। আধখানিতে কাঠ-কয়লার ডিপো। উঠান বা পরিবেষ্টনির মধ্যে খানিক ফাঁকা জমি

পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তা'তে মোটেই আচ্ছাদন ছিল না; কাজেই, গরু রাখা যায় কোথায়?

প্রিয়ংবদার প্রিয়বাক্য এ ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী হইল। তিনি বলিলেন, "এক কাজ করা যাক্, বুঝলে; তোমার বৈঠকখানার সামনের দিকে যে জায়গাটা আছে, আপাততঃ নয় তা'তেই রাখা যাক্?"

আমি সম্মতি জানাইলাম; কিন্তু মনটা ধুক-পুক করিতে লাগিল। ঠিক্ বাহির অঙ্গনের সংলগ্নে এ গোবরের গন্ধ—ভদ্রলোকেরা আসিয়া কি বলিবেন? অতএব অন্য পন্থা আবিষ্কারের জন্য প্রয়াসী হইলাম।

মাসকাবার হইয়াছিল। অন্যবারের মত বাড়ীওয়ালার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেই টাকা কয়টা পকেটে ফেলিয়া অগ্রসর হইলাম। কর্ত্তা ঘরেই ছিলেন; সহজেই দেখা মিলিল। আমায় দেখিয়া ঝুড়িখানেক দাঁত বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, "আসুন, আসুন, আমার আজ কি সৌভাগ্য!"

বলিলাম, "সেটা আপনার নয়, আমার। ভূস্বামী নারায়ণতুল্য—তাঁর দর্শন দেবদর্শন! কি করি, নানা কাজে ব্যস্ত; নইলে মশায়, আমিও ত হিন্দু; হাজার হোক্ কুলীন বংশের ছেলে, নিজে নাস্তিকও নই।"

তিনি সন্তুষ্টই হইলেন; গালভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা' জানি, তা' জানি! আপনাদের মত উচ্চবংশের ভদ্রলোককে পেয়ে আমাদের বাটী পবিত্র!"

দেখিলাম, কথায় কথায় দাম চুকাইতে এ বুড়া কম ওস্তাদ নন; কাজেই আর অধিক বাড়িতে না দিয়া একেবারে আসল কথাটা পাড়িয়া বসিলাম; বলিলাম, "এ মাসে একটা গরু আনব মনে করছি?"

তিনি আনন্দের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ! কথায় বলে 'গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।' যে গৃহে গরু আর দেবতা নেই, সে ঘর কি ঘর? আমি তাই বলব বলব মনে করছিলুম। এতবড় ধার্ম্মিককুলের সন্তান হ'য়ে বাবাজী এত ভুল করছেন কি করে'?"

বলিলাম, "সাধে কি আর এতদিন আনি নি; গরু আমরা বরাবরই পেলে এসেছি—কিন্তু এখানে যে স্থানাভাব, রাখা যায় কোথায়?"

উদ্দেশ্যটা বুঝিতে তাঁর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। তিনি বেশ চিন্তান্বিতভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তা' একটা কথা বটে। তবে রাখতেই যদি হয়, ময়দানটার পশ্চিম কোণে একটা চালা তৈরি করিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ত দেখছি না?"

বলিলাম, "সেই ভারটাই আপনাকে নিতে হচ্ছে।"

তিনি 'ফস্' করিয়া একখানা কাগজ টানিয়া অঙ্ক পাতিয়া বসিলেন; বলিলেন, "দাঁড়াও দেখছি।" খানিক পরে কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না, এর কমে হয় না বাবাজী; তোমার গোটা আশি টাকা খরচা পড়বে। তৈরী অবশ্য আমি নিজে দাঁড়িয়ে করে' দেব। বেচু ঘরামী আমার আপনার লোক; একটী দামড়িও বেশী নেবে না।"

দেখিলাম, গতিক ভাল নয়; হাওয়া অন্যদিকে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; বলিলাম, "বল্লুমই ত সে ভার আপনার; বাড়ী যাঁর, তাঁরই না খরচ করা উচিত?"

মুখে তাঁর বেশ একটু অপ্রসন্নতার ছায়া ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন, "ফলভোগ তোমরা করবে বাবাজী, আমি নয়। যে বাড়ী তিরিশ টাকায় ছেড়েছি, তাতেই ঠকা; এর ওপর খরচ-পত্র আমার দিয়ে পোষাবে না। তবে আমাকে

যদি পাঁচটা করে' টাকা বাড়িয়ে দাও, আলাদা কথা।"

কথাটা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর অধিক কথা বাড়াইলে সেদিন অফিস যাইবার সম্ভাবনা মোটেই থাকে না; কাজেই বিবেচনার সময় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

তিন

হাঙ্গাম-হুজ্জত—অর্থদণ্ড

শনিবার রাত্রে স্ত্রী বলিলেন, "কাল যাচ্ছ ত? অমনি চাকদ' ঘুরে যাও। ঠাকুরদা'কে জানিয়ে একখানা বিচিলি-কাটা বঁটি, আর যা' যা' পাও এন; সঙ্গে-সঙ্গে গরুপোষার উপদেশও একটু-আধটু শিখে এস।"

এ সাহেবি-যুগে স্ত্রীর আজ্ঞা; কাজেই তথাস্তু বলিয়া অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য, সহধর্ম্মিনী ধর্ম্মকার্য্যের নিদর্শন নির্মাল্য সঙ্গে দিতে ভুলিলেন না; আমিও রক্ষাকবচেরই মত বারবার তাহা মাথায় ঠেকাইয়া অর্থশাস্ত্রের প্রতিকারে চলিলাম।

* * *

বৃদ্ধ ঠাকুরদা' ত অবাক! বলিলেন, "বলিস কি রে—তোরা সহরের লোক গরু পুষবি!"

বলিলাম, "কি আর করি বলুন না, আপনার নাত-বউয়ের সখ্।"

তিনি খুব খানিকটা উৎসাহের সহিত নিজের সুবুদ্ধির তারিফ করিয়া বলিলেন, "আ রে, হবে না—দেখে-শুনে করেছে কে? ও মেয়ে স্বয়ং লক্ষ্মী। আমার বাছাই মেয়ে কখন ভিন্ন হয়। সুখী হও!"

দেখিলাম, বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ কাল্পনিক নয়; কারণ, তাঁহার চোখে জল টলটল করিতেছিল।

আবশ্যক বিষয়ে উপদেশ দিয়া, তিনি গৃহিণীকে, অর্থাৎ আমার দিদিমাকে হুকুম করিলেন, গোলার নীচের বঁটিখানা বাহির করিয়া দিতে। হাজার হোক্ স্ত্রী জাতি ত, দাদার উদারতার অর্থ তিনি বুঝিলেন ভিন্নরূপে; বলিলেন, "বলছ ত, কিন্তু রাত পোয়ালে—না ভাই, বাড়ীতে গরু রয়েছে যখন, 'হেখিয়ার' ছেড়ে দে' কার বাড়ী ছুটে মরব। তোমাদের কোলকাতার সহর, অভাব কি, কত পাবে; কি বল? এাঁ!"

ঠাকুরদা' বেশ একটু তাতিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোর বাবার ঘরের জিনিষ আমি দিতে বলেছি রে মাগি! বেশ, তোর বুকে যদি এত বাজে, আমিই দিচ্ছি। আহা, নাত-বউ আমার বড় মুখ করে' চেয়ে পাঠিয়েছে, দেব না!"

দেখিলাম বৃদ্ধের কণ্ঠ আবেগে গদগদ হইয়া উঠিল।

'পোষাণ'-গ্রহিতার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। লোকটী চোখ ছোট করিয়া চাহিয়া বলিল, "কে গা, কোথা যাবে?"

বলিলাম, "যাব না কোথাও ভজহরি; এই তোমার কাছেই এসেছি।"

দরকার বলিতেই কিন্তু যুদ্ধের তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইল। তবে সেটা একই পক্ষে। স্বামী-স্ত্রী প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া সুসভ্য ভাষা প্রয়োগে যাহা বলিলেন, তাহা প্রকাশ করা চলে না; লেখনীও লজ্জা পায়।

দেখিলাম, স্ত্রীলোকটা অবশেষে বুক পিটিতে লাগিল; মুখে অভিসম্পাতের অগ্নিবর্ষণ, "হে ঠাকুর, যারা এমন করে' ঠকিয়ে আমার বুকের রক্ত নিলে, তাদের ভাল তুমি কোর না, কোর না, কোর না!"

মহাসমস্যা উপস্থিত! অবশেষে তাদেরই চেষ্টায় পঞ্চায়েতের কর্ত্তা উপস্থিত হইলেন।

বিচারে গরু পাইলাম বটে, কিন্তু খোরপোষের জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হইল। ভাবিলাম, এ সামান্যই, যাক্ গে !

পথে আর এক বিপদ ! গো-পরিচালকের হাত ছিনাইয়া গরু এক ক্ষেতে গিয়া পড়িল। কিছু তছরূপ যে না করিল, তা' নয়। আমরা দুইজনে তাড়াইয়া তাহাকে বাহিরে আনিলাম। কিন্তু ক্ষেত্রপাল ছাড়িল না ; বেশ রুকিয়া চড়াগলায় শুনাইয়া দিল, হয় দণ্ড দিতে হইবে, নয় গরুটীর মায়া চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দু'-চারজন তার পক্ষ লইয়া দাঁড়াইল। পল্লীগ্রামের নিয়ম জানিতাম না ; কাজেই এক্ষেত্রেও কিছু অর্থদণ্ড ঘটিল। তখন গরু আনিবার জন্য একজনের পরিবর্ত্তে দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়া রেলে করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

চার

বিপদের রকমফের—ঝকমারীর মাশুল

ভোরে গরু পৌছিবার কথা—কিন্তু দশটা বাজিয়া গেল না আসিল গরু, না আসিল তাহার সঙ্গের দুইজন রক্ষক। অফিসের বেলা হইতেছিল ; কাজেই দাঁড়াইতে পারিলাম না, বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুপুরবেলা সাহেবের ঘর হইতে 'কল' আসিল। শুনিলাম, আমায় না কি কে 'ফোনে' ডাকিতেছে। সভয়ে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে চলিলাম। সাহেব সহাস্য-মুখে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ডাকছে বাড়ী থেকেই ; তোমার স্ত্রীই হবেন—নব-বিবাহিতা বধূ নিশ্চয় !"

আমি স্থান-কাল-পাত্র বুঝিয়া আবশ্যক জবাব দিয়া ফোন ধরিলাম। শুনিলাম, সহরের পথে গরু হারাইয়া বাহক দুইজন ফিরিয়াছে। বলিতেছে, মোটর দেখিয়া গরুটা না কি ক্ষেপিয়া যায় ; ঠিক সেই সময় পিছনে একখানি 'বাস' আসিয়া পড়ায় শত বাধাতেও সে হাত ছিনাইয়া এমন উন্মত্তভাবে ছুটিয়া চলে যে, পড়িয়া গিয়া টানা-হেঁচড়ায় বেচারীদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

সাহেব মাথা তুলিয়া পরিহাস-স্বরে বলিলেন, "ও বাবু, দেখছি তোমাদের কথা ফুরুবেই না ! তা' কাল থেকে এক কাজ করো ; তাঁকে সঙ্গে করেই অফিসে নিয়ে এস—আমি আজই একটা 'সিটে'র ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

বলিলাম, "সাহেব বিপদ !"

সাহেব হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বিপদ ! বাড়ীর কেউ কি বেয়রামি ?"

সত্য কথাই বলিলাম। সাহেব কহিলেন, "তারপর গোরুটা গেল কোথায় ? লোক দুটো দেখেছে ?"

আমিও ফোনে সেই প্রশ্নই করিলাম। উত্তর আসিল, "হ্যাঁ, পুলিশের হাতে পড়েছে। পাহারাওয়ালা ধরে' লোক দু'টোর হাতে গরু দিতে চেয়েছিল ; কিন্তু পরিবর্ত্তে দু'টাকা ঘুষ চায়। ওরা গরীব, পাবে কোথা যে দেবে ; তাই শুনলুম, নিয়ে গিয়ে ফাঁড়িতে জমা দিয়েছে।

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "নম্বর—যে পাহারাওয়ালা ঘুষ চেয়েছিল, তার নম্বর ?"

দেখিলাম, এও বড় কম বিপদ নয় ; বলিলাম, "পাড়াগেঁয়ে চাষাভুষো গেঁয়োলোক, তারা নম্বরের ধার ধারে, না বোঝে সাহেব, কাজেই সেটা অজ্ঞাত।"

সাহেব খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তার জন্য আটকাবে না ; ফাটকওয়ালা নম্বর রেখেছে নিশ্চয়ই !"

গরু পাইলাম। এখানেও অর্থদণ্ডের উপর দিয়াই কাজ হাসিল হইল। কিন্তু সাহেবের জিদ্ বজায় রাখিতে গিয়া আদালতে আর একতরফা অর্থদণ্ড। প্রমাণ হইল, মারমুখো

গরু কয়জনকে না কি আহত করিয়াছে ; সঙ্গে-সঙ্গে আহতদের নামের ফর্দ্দও পেশ হইল।

সাহেব পল্লীর অশিক্ষিত লোকদিগের বিরুদ্ধে এক লম্বা লেক্‌চার দিয়া নিরস্ত হইলেন ; কিন্তু আমি বিনা অর্থদণ্ডে নিষ্কৃতি পাইলাম না। তবে অনুগ্রহ করিয়া টাকাটা সাহেবই অফিস হইতে পাঠাইয়া দিলেন। আমি আদালতের খাতায় নাম লিখাইয়া আপাততঃ রেহাই পাইলাম বটে, কিন্তু মাসকাবারে মাহিনা কাটা যাইবে কি না সে বিষয় কেবলই ভাবিতে ভাবিতে দিন গণিতে লাগিলাম।

পাঁচ

গ্রহ কাটিয়াও কাটিতে চাহে না—অবশেষে বোঝা নামিল—পরিহাসের পরিসমাপ্তি হইল

এক চক্ষু হরিণের গল্প মিথ্যা নয় ; কারণ, যে দিক্ দিয়া যা' অসম্ভব জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, অবশেষে তাহাই ঘটিয়া গেল ; আমার বরাতে এক নিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় রহিল না ; কাজেই প্রাণভরিয়া তাই ছাড়িলাম—তবে সেটা আরামের নয়, সন্তাপের।

ঘটনাটা এই,—অফিস হইতে ফিরিয়া মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। মনটা আনন্দে যে নৃত্য করিয়া উঠিল না, এটা সহজেই অনুমেয়। কাজেই বিষণ্ণ-মুখে কাঁধের গামছা নামাইয়া রাখিয়া আবার জামা গায়ে তুলিলাম। গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "কি গো, রাত্রে আবার চল্‌লে কোথায় ?"

হাসিয়া বলিলাম, "ভাগ্যের জোয়ার যেখানে টেনে নিয়ে যায় গিন্নি, আর কোথায় ?"

তিনি মুখভার করিয়া বলিলেন, "কথা বল্‌তে গেলেই হেঁয়ালী ; একটা সাদা সত্য কথা যদি কোনদিন তোমার কাছে পাওয়া যায় !"

বলিলাম, "খুব পরিষ্কার বাঙলাতেই সত্য প্রকাশ করেছি ; এর মধ্যে ঘোরপ্যাচ মোটেই নেই। আবার গরু—"

প্রিয়তমা চকিত হইয়া বলিলেন, "কি করলে ?—ও দিন-রাতই ত বাঁধা রয়েছে।"

বলিলাম, "তা' রয়েছে ; আর সেই থাকাতেই বিপদ এনেছে। এটা যে সহর, পল্লী মোটেই নয় ; কাজেই নিজের ইচ্ছেয় কাজ করতে একেবারেই পারা যাবে না। আইন যখন যেটুকু প্রসার দেবে, সেই টুকুতেই উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে হবে—তার একচুল এদিক-ওদিক পা বাড়ালেই বিপদ ! হয়েছেও তাই। তারই জবাব দিতে পরশু যেতে হবে। দেখি, উকিল-বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে' যদি কিছু হয়।"

অর্থদণ্ড দিতে হইল। বলিদানের খাঁড়া তুলিয়া হাকিম আরক্ত-চক্ষে শিক্ষা দিলেন, "আপনারা শিক্ষিত হ'য়ে যখন আইনের বিপরীত পথ নিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন উচিত আপনাদের বেশ রীতিমতই সাজা দেওয়া। এ যা' সামান্য দণ্ড দিলাম, অবহেলার তুলনায় তা' অতি তুচ্ছ।"

তা' বটে ! কিন্তু এই তুচ্ছতেই আমার মত লোকের অনেকখানি জিবই বাহির হইয়া পড়িল।

গৃহিণী পরামর্শ দিলেন, "এক কাজ কর, কিনতে ত পয়সা লাগত, একটা গোয়াল সেই খরচায় তৈরী করে' নাও।"

বলিলাম, "তার চেয়ে ওকেই কারও হাতে তুলে দিলে ভাল করতে গিন্নি !"

দেখিলাম, কথাটা অর্দ্ধাঙ্গিনীর মোটেই মনের মত হইল না। তিনি বিষাদ-জড়িত চিন্তিত-কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার অনেক খরচা হচ্ছে তা' দেখছি ; কিন্তু তবু কি জান, ভরা-পোয়াতি গরু কাউকে দিতেও যে প্রাণটা কেমন করে ! এতদিন রেখে, শেষে—"

বলিলাম, "কিন্তু আর যে কষ্ট সহ্য হয় না।

খুড়োর কি দশা হ'য়েছে, দেখেছ? খড় বয়ে বয়ে দমবন্ধ ; হাতের কোন আঙুলটাই অক্ষত নেই—খড় কাটতে সব কটারই কিছু-না-কিছু জখম করে' বসেছেন ! লাভের মধ্যে ত শুধু ওই গোবরটুকু ?"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "না, তাও আমাদের জন্যে নয়। পাড়া-পড়শীর পাঁচজন গাইয়ের গোবর শুদ্ধ জেনে হাত পেতে নিয়ে যান, বারণ করা চলে না ; কি করেই বা বলি, 'এই তুচ্ছ জিনিষ তোমরা নিও না।"

"তা বটে ! কিন্তু বিদায় করা যখন সম্ভব নয়, তখন গোশালা নির্ম্মাণ ছাড়া আর উপায়ই বা কি ?"

ভাবিলাম, বাড়ীওয়ালার আর একবার শরণাপন্ন হই ; কিন্তু খুড়ো বাধা দিলেন। তাহার পরদিনই বাঁশ কাটা আরম্ভ হইয়া গেল ; গোলা আসিয়া পড়িল এবং গো-রক্ষণী গৃহ নির্ম্মাণ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। কিন্তু যাক্, স্ত্রীর পরিভাষণেই তুষ্ট রহিলাম—দুধে এ সব কিছুর পরিশোধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু দশ মাসের স্থলে বৎসর ঘুরিয়া গেলেও গাভিন গরুর সন্তান প্রসবের কোন চিহ্নই লক্ষীভূত হইল না ; এদিকে মঙ্গলার নধর দেহ বেশ খানিক শুখাইয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি এবার নিজেই প্রস্তাব করিলেন, "কাজ নেই, ও সব আমাদের সইবে না। মামা নিতে চাচ্ছেন, তাঁকেই দিয়ে দিই—কি বল ? তা' ছাড়া, খুড়োর কষ্টও আর দেখা যায় না।"

হাঁফ্ ছাড়িয়া বলিলাম, "তথাস্তু !"

কিন্তু এ সুবুদ্ধিটা যদি কিছুদিন পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে আমার এই দুই বৎসরের মধ্যে খুব কমপক্ষে শ' তিনেক টাকার দেনার দায় মাথায় বহন করিতে হইত না। কথাটা কিন্তু প্রকাশ্যে বলা চলে না—তাই চাপিয়া গেলাম।

স্ত্রীর অজ্ঞাত কিছু নাই ; দোষ ঠিক্ ঠিক্ তাঁরও নয় ; কারণ,—অলক্ষ্যে থাকিয়া একজন অদৃষ্ট-দেবতা তাঁহার কর্ণে সর্ব্বদা যে গুরুমন্ত্র পড়িতেছিলেন, গুরু বলিয়াই তা' অবহেলার উপায় ছিল না, কাজেই—

বলিলাম, "মামাবাবুকে শুধু হাতে দেওয়া ভাল দেখাবে ত ?"

স্ত্রী ভড়কাইয়া গেলেন ; বলিলেন, "মা বলছিলেন, পাঁচটা টাকা দক্ষিণে হিসেবে দিতে ; তা'তে না কি গো-দানের পুণ্য হবে !"

কাজেই পুণ্যের পিছনে যে অর্থ খরচ, তা' না করি কি করিয়া ?

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তের

আমার কথা শুনে চন্দ্রা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—অন্য কোন সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না? কিন্তু তাঁর এ আচরণ আমি আশা করি নি। তিনি এখানকার আচার্য্য, জ্ঞানী লোক; শেষ সময়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নেব বলে' এসেছিলাম, কিন্তু ··

বল্‌লাম—দেখুন, আপনি দুঃখিত হবেন না। বাবা একে অনেকদিন ধরেই অসুস্থ হ'য়ে রয়েছেন; তার ওপর এই ব্যাপারে তিনি ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। তার দরুণ তাঁর শরীর আরও খারাপ হয়েছে। সেই জন্যেই তিনি স্থির করেছেন, এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না। তিনি আমায় বলেছেন, তাঁর আন্তরিক সমবেদনা এবং সহানুভূতি আপনাকে জানাতে।

ধীরে ধীরে চন্দ্রা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দৃঢ় মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—বেশ, তিনি যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন, না-ই করবেন। আমার ত আর জোর নেই! কিন্তু এ ব্যাপারে আমার নিশ্চেষ্ট থাকা চলবে না। শেষ পর্য্যন্ত আমি অনুসন্ধান করবই। কোলকাতায় আমার একজন পরিচিত বন্ধু আছেন—অনেকদিনের পুরণো পুলিস অফিসর—ডিটেক্‌টিভের কাজে হাত পাকিয়েছেন। তাঁকে আমি টেলিগ্রাম করে' আনাবো। দেখা যাক, কতদূর কি হয়। আচ্ছা, নমস্কার!

চন্দ্রা ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর গেট্‌ পার হ'য়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'ল। আমি বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। চন্দ্রার প্রতি আমার মন সহসা রাগে বিদ্বেষে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

দু'-তিনবার দরজায় আঘাত করবার পর ভিতর থেকে বাবা প্রশ্ন করলেন—কে, কেতকী?

—হ্যাঁ, বাবা, আমি। ভেতরে আসবো?

বাবা পুনরায় প্রশ্ন করলেন—স্ত্রীলোকটি গেছে?

—হ্যাঁ, গেছে।

তখন বাবা দরজা খুলে দিলেন।

ভিতরে ঢুকে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমার কান্না পেল—অসুস্থতার আক্রমণে তাঁর সর্ব্বশরীর যেন ভেঙ্গে পড়েছে! ঘরের অদূরে বিছানার দিকে চেয়ে বুঝলাম—বাবা এতক্ষণ কি করছিলেন।

দরজা বন্ধ করে' দিয়ে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তা' হ'লে সে চলে' গেছে?

মাথা নেড়ে বল্‌লাম—হ্যাঁ, চলে গেছে।

—আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম না বলে' সে কি রাগ করেছে?

—না, রাগ আর কি করবে। তবে বিশেষ

রকম হতাশ বোধ করলে। ভারী একগুঁয়ে মেয়ে—বদমেজাজী! তাকে আমার একটুও ভালো লাগে নি।

বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তুমি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলে ত যে, আমি একান্ত অসুস্থ—কারুর সঙ্গে দেখা করবার মতো অবস্থা আমার এখন নয়?

—আমি যথাসাধ্য বলেছিলাম; কিন্তু আমার কথায় সে মোটেই খুসী হ'ল না। যাবার সময় স্পষ্টই রাগ প্রকাশ করে' গেল।

বাবা ধীরে ধীরে বিছানার ওপর বসে' প্রশ্ন করলেন—সে কি কোল্‌কাতা চলে' গেল?

—সম্ভব নয়। যাবার সময় সে বলে' গেল—তার দাদার শত্রুকে সে খুঁজে বার করবেই; এবং সেই জন্য সে কোল্‌কাতা থেকে তার একজন পরিচিত পুলিশের ডিটেক্‌টিভকে এখানে আনাচ্ছে।

আমার কথা শুনে বাবার মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হ'ল। দুই চোখ মুদ্রিত করে' তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন হ'য়ে পড়লেন।

বল্‌লাম—মেয়েটা ভারী জেদী। আমার বোধ হয়, প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

বাবা ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে তাঁর টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কয়েকখানা চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌লেন—কেটি, তুমি এখন যাও, আমি চিঠি লিখবো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেউ যেন এসে আমায় বিরক্ত না করে।

ধীরে ধীরে বাবার ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিয়ে বারান্দা পার হয়ে বাড়ীর সুমুখে বাগানের মধ্যে নেমে এলাম। বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তা। পথের প্রান্তে মন্দির—যার ভিতরকার দুর্ঘটনার স্মৃতি আজো আমার চোখের সুমুখে জীবন্ত হ'য়ে ফুটে রয়েছে! আশে-পাশে কাছে এবং দূরে সারা প্রকৃতির অঙ্গে যেন খুসীর হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে আতঙ্কের কালো ছায়া! চন্দ্রার প্রতিহিংসা-কঠিন মুখের ছবি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না! মনে হচ্ছে যেন, আকাশের গায়ে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে—এইবার বিদ্যুচ্ছটার সঙ্গে পৃথিবীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে!

সহসা আমার পিছনে ভারী পদশব্দ শুনে চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পথের ওপার দিয়ে নিশীথবাবু চলেছেন। গাছের অন্তরালে আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি।

এগিয়ে গিয়ে বল্‌লাম—নমস্কার নিশিবাবু।

ঈষৎ চকিত হ'য়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখে বলে' উঠলেন—নমস্কার, নমস্কার! আপনি আমায় দস্তরমতো চমক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বল্‌লাম—তাই না কি! তাই তো! ভারী দুঃখিত হলাম।

আমার মুখের পানে তাকিয়ে নিশীথবাবু সশব্দে হেসে বল্‌লেন—দুঃখিত হলেন না কি? কিন্তু মুখ দেখে ত তা' বোধ হচ্ছে না। যাই হোক, আপনি সুস্থ হয়েছেন দেখে ভারী আনন্দিত হলাম।

বল্‌লাম—ধন্যবাদ! আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'ল—ভালই হ'ল! আপনি যে আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করে' সুন্দর ফুলগুলি পাঠিয়েছিলেন, তার পরিবর্ত্তে আমার মুখের কৃতজ্ঞতা কিছুই নয়; তবুও...

নিশীথবাবু কথার মাঝেই ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠলেন—অতি সামান্য জিনিষ, এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, ভালো কথা, মনীষী দেবী আপনার সম্বন্ধে খোঁজ করছিলেন।

—তাই না কি! আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে' আসবো।

নিশীথবাবু হাসিমুখে বললেন—যাবেন। আপনি গেলে তিনি ভারী আনন্দিত হবেন।

বললাম—আপনি কি ঠিক জানেন, আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি খুশী হবেন?

—নিশ্চয় হবেন। আপনি হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন যে?

বললাম—আপনি জানেন না, কয়েকদিন আগে যখন আমি তাঁর বাড়ী গিছলাম, তখন আমার বাবা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে আমায় তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে' আসতে বলেন। তা'তে তিনি হয় ত আমাদের প্রতি রাগ করেছেন।

নিশীথবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—এ কথা আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার প্রতি মনীষা দেবীর মনে কোন রাগ নেই। তিনি আপনাকে খুব স্নেহ করেন। আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন।

বললাম—তা' হ'লে আমি কাল তাঁর কাছে যাব। মনীষা দেবীকে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে তাঁর মত আর কেউ নেই।

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে নিশীথবাবু বললেন—কেন, লেডী মিত্র, রমা দেবী?—তাঁকে আপনার ভাল লাগে না? তাঁর সঙ্গে ত আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়!

বললাম—রমাপিসি আমাদের অতিশয় স্নেহ করেন।

নিশীথবাবু প্রশ্ন করলেন—আপনাদের কাছে আমাকে তিনি নিশ্চয় খুব জঘন্য প্রকৃতির লোক বলে' চিত্রিত করেছেন?

বললাম—জঘন্য প্রকৃতির লোক না বললেও রমাপিসি আপনার অনেক নিন্দে করেছেন। এবং আমার মনে হয়, সেগুলি আপনার প্রাপ্য। তিনি বলেন, আপনি না কি অত্যন্ত অলস এবং অপব্যয়ী। আপনি সে কথা অমান্য করেন?

নিশীথবাবু হেসে উঠে বললেন—গুরুজনদের কথা অমান্য করতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আলস্য আমার কোথায়! আর, অপব্যয়ের কথা?—তা' ও আমি ঠিক্ বুঝতে পারি না—খরচ কোথা দিয়ে কেমন করে' বেশী হচ্ছে।

মনে মনে অকারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠে বললাম—আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে—এ-কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। তা' ছাড়া, আপনার পোষাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে আপনি যে একান্ত অমনোযোগী, এ-কথা অস্বীকার করবার ত আর কোন উপায় নেই।

নিজের দেহের প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত করে' নিশীথবাবু হাসিমুখে চুপ করে' রইলেন—আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। সহসা চকিত হ'য়ে উঠে মনে মনে ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম। এক স্বল্পপরিচিত পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার এতখানি সাগ্রহ আলোচনা, মোটেই সমাচীন হয় নি। কেউ যদি আমার কথাগুলো শোনে, তা' হ'লে কী ভাববে! ছি ছি!

কথার স্রোত ফিরিয়ে বললাম—গত রবিবার মন্দিরে যে ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে গেল, সে সম্বন্ধে সব কথা জানতে আমার ভারী কৌতূহল হচ্ছে। আপনি নিশ্চয় সব জানেন?

নিশীথবাবু মাথা নেড়ে বললেন—ও সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি কোন কথা কইতে পারবো না।

—কেন পারবেন না?

—কারণ আবশ্যক আছে। যাই হোক্, আমি অক্ষম বলে' মার্জনা করবেন।

বললাম, নমস্কার!

পাছে, আমি ওই বিষয়ে আরো প্রশ্ন করে' তাঁকে বিব্রত করে' তুলি, সেই ভয়ে তিনি তাড়া-

তাড়ি আমায় নমস্কার করে' দ্রুতপদে পা চালিয়ে দিলেন।

চৌদ্দ

পরদিন।

সকালবেলা বাবা আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আজ কিছু খাবেন না। অতসী তাঁকে তাঁর ঘরে এক কাপ দুধ দিয়ে এল। সেই দুধ-টুকু ছাড়া তিনি আর কিছুই খেলেন না। অতসী বল্‌লে—বাবা শুয়ে আছেন। বিকেলের আগে উঠ্‌বেন না। তাঁর মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। নিশ্চয় খুব অসুখ করেছে। একজন ডাক্তার আন্‌লে ভাল হ'ত।

চুপ করে' রইলাম। নানা ধরণের এলোমেলো চিন্তায় আমার মাথা ভারী হ'য়ে উঠেছে। এমনি সময় মানুষ এমন একজনের প্রয়োজন বোধ করে, যার কাছে মনের সব কথা সে নিঃশেষ উজাড় করে' দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! কিন্তু আমার চার পাশে এমন কেউ-ই নেই, যার কাছে মনের রুদ্ধ দুয়ারের আগল আমি খুলে দিতে পারি। আমার দুঃসহ গোপন চিন্তার গুরুভার আমায় একাই বহন করতে হবে—চিরদিন!

ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক থেকে সকাল-বেলাকার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য মধ্যাহ্নের বিদগ্ধ রুক্ষতায় মলিন হ'য়ে গেল। চাষীর দল ঘর্ম্মাক্ত দেহে ঘরে ফিরছে। ধূসর আকাশ সূর্য্যের তেজে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে। আজকের স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমি যেন একান্ত নিঃসহায় বোধ করছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাবার ঘরে গেলাম। নম্রপদে ভিতরে প্রবেশ করে' দেখলাম, বাবা বিছানার ওপর নিস্পন্দভাবে শুয়ে আছেন। প্রথমে মনে হ'ল, বোধ হয় তিনি ঘুমিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর হিম হ'য়ে গেল!—বাবার গায়ের যে চাদরখানা জড়ানো ছিল, সেখানা অসম্বৃত হ'য়ে পড়েছে এবং তাঁর বুকের ডান দিকে পাজরার উপরে একটি আধ-বাঁধা ব্যাণ্ডেজ রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠেছে! বাবা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন।

ভীতস্পন্দিত অন্তরে তাঁর মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তিনি চোখ উন্মীলিত করে' আমার দিকে তাকালেন।

বল্‌লাম—তুমি নড়াচড়া কোরো না। আমি ব্যাণ্ডেজ ঠিক করে' বেঁধে দিচ্ছি।

বাবা বিবর্ণ ক্লিষ্টমুখে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে রইলেন। আমি সন্তর্পণে সতর্কতার সহিত ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করলেন।

বল্‌লাম—আমি এখুনি ডাক্তারবাবুকে খবর দিচ্ছি।

বাবা ত্রস্ত হ'য়ে আমার হাত চেপে ধরে' বল্‌লেন—না; একবারে না। আমি নিষেধ করছি। খবরদার, এমন কাজ কোরো না।

— কিন্তু, এমন ভাবে অবহেলা করলে যে, অসুখ বেড়ে উঠ্‌বে বাবা!

—না, বাড়বে না। চামড়ার ওপর একটু কেটে গেছে মাত্র। কোন ভয় নেই।

প্রশ্ন করলাম—কবে এ আঘাত লেগেছে? কোথায় এ দুর্ঘটনা ঘট্‌ল বাবা? কই, আমরা ত কিছুই জানি না।

রুদ্ধকণ্ঠে বাবা বল্‌লেন—কোলকাতায় যখন গেছলাম, সেই সময় রাত্রে একজন আমায় কাপুরুষের মতো আক্রমণ করেছিল।

তাঁর কথা শুনে বিহ্বল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! এ কী দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা!

বাবা গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—আমার কাছে

শপথ কর কেতকী, আমি যতক্ষণ না বল্‌ব, ততক্ষণ তুমি ডাক্তারকে খবর পাঠাবে না!—শপথ কর!

বল্‌লাম—কিন্তু তুমি বল যে, আমি রোজ তোমায় শুশ্রূষা করতে পারবো!

—বেশ! আমি তোমায় সে অনুমতি দিলাম। আজ রাত্রে আমার ব্যাণ্ডেজ বদল করে' দিও। তুমি এখন যাও। আমি ঘুমুব।

অপরাহ্নবেলায় সহসা অকালে আকাশে মেঘের সমারোহ সুরু হ'ল।

অতসী বেলাবেলি ঘর-সংসারের কাজ সেরে ফেলবার জন্যে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বুধুয়াকে তাড়া দিচ্ছে। চাকর-বাকরেরা আমার চেয়ে ছোটদিদিমণিকে ভয় করে বেশী। সবাই জানে সংসারের সকল কাজে অতসী আমার চেয়ে ঢের পটু।

একবার ইচ্ছা হ'ল, অতসীর সঙ্গে আমিও কাজে লাগি; কিন্তু মন আমার অশান্ত হ'য়ে রয়েছে; কোন কাজে মন লাগানো আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

ধীরে ধীরে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তারপর কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণের বশীভূত হয়ে মনীষা দেবীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম।

কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় নিশীথবাবুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী দেখা হ'য়ে গেল। তিনি আমায় দেখে সবিস্ময়ে আমার পানে তাকিয়ে নম্রকণ্ঠে বল্‌লেন—এই দুর্যোগ মাথায় করে' বেরিয়েছেন! আপনার ভয় করল না?

বল্‌লাম—এ দুর্যোগের চেয়ে বেশী ভয় করি এমন অনেক জিনিষ আমার চোখের সুমুখে ফুটে রয়েছে। আপনিও কি মনীষা দেবীর বাড়ী যাচ্ছেন?

মাথা নেড়ে নিশীথবাবু—বল্‌লেন হ্যাঁ, এখুনি যাবো। ইতিমধ্যে আপনার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে' যাব।

—বাবার সঙ্গে দেখা করবেন? কেন?

তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকালেন। তাঁর এই গভীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন—একান্ত দুরভিগ্রহ! প্রশান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—দু'-একটা দরকারী কথা আছে। যদি প্রশ্ন করেন, কি কথা? তার উত্তরে বল্‌ব—সে-কথা আপনাকে বলতে পারলে, খুবই খুসী হতাম; কিন্তু বলবার কোন উপায় নেই। আমি জানি, আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে; সুতরাং, বাবা না থাকলে আপনাকে বলতাম।

আমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি এই সদয় কটাক্ষপাতে আমার রাগ হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু রাগের পরিবর্ত্তে খুসী হ'য়ে বল্‌লাম—হ্যাঁ, আপনাদের কথা শোনবার যোগ্যতা আমার আছে; কিন্তু বাবা কিছুতেই আমাকে বলবেন না কোন কথা। চারিদিকে যেন রহস্য ঘনিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন, বিপদ ঘটল বলে'। বাবার মুখ দেখে তা' বুঝতে পারছি—আপনার মুখ দেখে তা' বুঝতে পারছি—আকাশে-বাতাসে সে কথা যেন ধ্বনিত হচ্ছে! সেই লোকটির মৃত্যুর জন্যেই এত ব্যাপার! এ সবের মানে কি? আমি জানতে চাই। দয়া করে' আপনি আমাকে বলুন।

নিশীথবাবু মৃদু নিঃশ্বাস মোচন করে' বল্‌লেন—আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা। আপনাকে কোন কথা বলার অধিকার আমার নেই। আপনি নিজেই একদিন সব জানতে পারবেন। ও-সব কথা যাক্। এখন বলুন, আপনার বাবা কি বাড়ীতে আছেন?

—হ্যাঁ। তিনি ঘুমুচ্ছেন। তাঁর অসুখ

করেছে। আজ তিনি বিছানা ছেড়ে যে বাইরে আসবেন, এমন মনে হয় না।

আমার কথায় হতাশ হবার পরিবর্ত্তে নিশীথবাবু যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। বল্‌লেন—শুনে, সুখী হলাম।

—কেন ?

—তাঁর এখন বাড়ীতে থাকাই সব দিক্ থেকে ভালো। লোক পরম্পরায় শুন্‌লাম, এখানে না হ'য়ে, রূপনারায়ণপুরে স্কুল স্থাপিত হবে এবং তার জন্যে জগদীশবাবুকে কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকতে হবে। তিনি কবে সেখানে যাবেন ?

—এখনো ঠিক কিছু হয় নি। মাসখানেকের আগে নয়।

মনের মধ্যে এক সঙ্গে একশো প্রশ্ন তোলপাড় করছিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লাম—নিশীথবাবু, আপনাকে একটা প্রশ্ন কর্‌ব। দয়া করে' তার উত্তর দেবেন ?

নিশীথবাবু মাথা নেড়ে বল্‌লেন—আমাকে কোন প্রশ্ন না করাই ভাল। আমরা কি অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারি না ?

—না, পারি না। শুনুন।

তাঁর নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম—একান্ত নিকটে! তারপর দুই চোখ তাঁর চোখের ওপর ন্যস্ত করে' অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলাম—আমায় বলুন সে লোকটা কে এবং কে-ই বা তাকে খুন করেছে ?

ত্রস্ত চকিত নেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে নিমেষের জন্যে তিনি বিহ্বল হ'য়ে গেলেন। তারপর স্থির অবিচলিত স্বরে বল্‌লেন—মিস্ মিত্র, আমার কথা শুনুন, ও-সব বিষয়ের সমস্ত চিন্তা মন থেকে দূর করুন। আপনার ভালোর জন্যে বলছি—যা' ঘটেছে, তা' নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে নিজেকে উৎপীড়িত করবেন না। আমাকে আপনার একজন শুভানুধ্যায়ী বলে' মনে করবেন।

শেষের দিকে নিশীথবাবুর কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় কোমল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু আমার উত্তেজিত অন্তরের ওপর তাঁর কোমল কণ্ঠ তখন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারলে না। তপ্তকণ্ঠে বল্‌লাম—আপনি বলবেন না, না ?

নিশীথবাবু মাথা হেলিয়ে বল্‌লেন—না, আমি বলব না; কারণ, আমি জানি না। ঈশ্বরের দোহাই, আর আমাকে প্রশ্ন করে' বিপর্য্যস্ত করবেন না। চলুন, মনীষা দেবীর বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্। আপনি সেখানে যাবার জন্যেই বেরিয়েছিলেন; নয় কি ?

নিজের অসঙ্গত উষ্মায় নিজেই মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাচ্ছিলাম; মৃদুকণ্ঠে বল্লাম—হ্যাঁ।

—চলুন; দু'জনে একসঙ্গেই যাওয়া যাক্। আপনাকে দেখে, তিনি নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন। দেখবেন, সাম্‌নে কাদা; ওখানটা ভারী পিছল। এইদিক্ দিয়ে আসুন।

পিচ্ছিল পথ কাটিয়ে নিশীথবাবুর সঙ্গে মনীষা দেবীর বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। মাথার ওপর ঘন হ'য়ে মেঘ জমেছে। আসন্ন বৃষ্টির বার্ত্তা বহন করে' শীতল বাতাস বইছে! বৃষ্টির আশঙ্কায় পথে বা মাঠের ওপর জনমানুষের চিহ্ন নেই।

সেই আসন্ন ঝড়-বাদলকে উপেক্ষা করে' আমরা দু'টী পথিক একেলা চলেছি যেন কোন তীর্থ-মন্দিরের উদ্দেশে!

নিশীথবাবু আমার পাশে চলেছেন, একান্ত যন্ত্র-চালিত ভাবে! তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন, কথা বলবার ভাষা তিনি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছেন।

এই স্তব্ধ মৌনতা আমার অসহ্য লাগলো। প্রশ্ন করলাম—আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে

যাচ্ছিলেন—আমার জন্তেই যাওয়া হ'ল না। আপনার হ'য়ে তাঁকে কিছু বল্‌ব ?

নিশীথবাবু ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করে' অবশেষে বল্লেন—তাঁকে জানাবেন যে, তাঁর অসুখের কথা শুনে দুঃখিত হয়েছি। এ সময় দিনকাল ভারী খারাপ পড়েছে। শরীরের সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ যত্নবান হন। শরীর খারাপ—এখন যেন কোনক্রমেই তিনি বাড়ীর বা'র না হন।

মুখ তুলে দেখি আমরা মনীষা দেবীর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। বাবার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে নিশীথবাবুর এই আকুল অথচ দুর্ব্বোধ্য অনুরোধের কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। সে বিষয়ে তাঁকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর পাওয়া গেল না। নিশীথবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

দালান পার হ'য়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে' দেখ্‌লাম, মনীষা দেবী অন্য একটি অভ্যাগত মহিলার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে কথা বলছেন।

আমাদের দেখে তিনি ঈষৎ চকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। দেখাদেখি মহিলাটিও দাঁড়িয়ে উঠে পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালেন।

সবিস্ময়ে দেখলাম, মহিলাটি আর কেউ নয়, —নিহত বিজয় দত্তের বোন্ চন্দ্রা।

আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই চন্দ্রা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। তারপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, নিশীথবাবুর ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের অদ্ভুত ভাবান্তর ঘট্‌ল। দুই চোখ তার যেন আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। বহুদিন পরে কোন হারানো নিকট আত্মীয়কে ফিরে পেলে মানুষ যেমন উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, চন্দ্রার আচরণেও তেমনি উত্তেজনা ফুটে উঠ্‌লো। তার সারা মুখ আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। চঞ্চল চরণে নিশীথবাবুর সন্নিকটে উপস্থিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—তুমি ! আপনি ! এখানে ? কি আশ্চর্য্য ! ভগবানকে অসংখ্য প্রণাম। এতদিন পরে অবশেষে আপনার দেখা পেলাম।

চল্‌বে
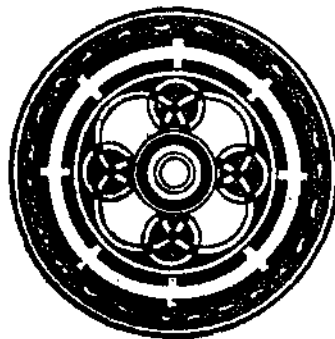
আলোর আলেয়া

শ্রীমতী মাহ্‌মুদাবানু

এক

বিকালবেলায় পার্কে বেড়াচ্ছিলুম।

প্রজাপতির মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি দেখ্‌তে আমার বেশ লাগে; এদের হাস্য কোলাহল, ছুটোছুটি ভারী চমৎকার! এদের জন্য আমি প্রায় রোজই পার্কে আসি। এখানে অনেকেই আসেন—যত তরুণ-তরুণীর দল বেড়িয়ে বেড়ায়।

একটী বটগাছের চারদিকে বেঞ্চ্ পাতা—এরই একটাতে আমি রোজ বসি।

সেদিনও বেড়িয়ে এসে বসেছিলুম। 'হর্ণে'র শব্দে চেয়ে দেখি,—একটি মস্ত 'অবার্ণকার' এসেই কাছে থামলো এবং দরজা খুলে বেরিয়ে এল সুন্দরী সুবেশা দু'টী তরুণী। তারা গাড়ী থেকে নেমে পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ালে—তারপর বটগাছের তলে অপর ধারে বেঞ্চে গিয়ে বসলো।

যে মেয়েটি বেশ সুন্দরী, তার পরণে গাঢ় ব্লু-রংয়ের জর্জ্জেটের শাড়ী; হাতে গলায় মূল্যবান গহনা ঝকমক্ করছিল। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—একা একা বেড়াতে এসেছে এত গহনা পরে! সঙ্গে ত একজনও পুরুষমানুষ নেই! আধুনিক সাহসিকা মেয়ে দু'টী। অপরা মেয়েটিরও সবুজ জর্জ্জেটের শাড়ী ঝলমল্ করছিল—এতে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুক্ষণ বসে' প্রথমা মেয়েটী বলে' উঠল, তাই ত জোবেদা, মিঃ আলিরা ত এখনও এলেন না। কারণ কি?"

নামগুলি শুনে চমকে উঠ্‌লুম—এরা মুসলমান? কি আশ্চর্য্য! মুসলমানের মেয়ের সে লজ্জা-সঙ্কোচ—সে পর্দ্দা কই? বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, এরা আমারই স্বজাতি মুসলমানের মেয়ে! বিবাহিতা কি কুমারী তা' বুঝতে পারলুম না।

জোবেদা নাম্নী মেয়েটি বললে, "কি জানি ভাই, কেন আসছেন না। আচ্ছা রোকেয়া, মিঃ আলির সঙ্গে তোর কি করে' আলাপ হ'ল?

রোকেয়া হেসে বললে, শুনবি সে কথা? "সেদিন রাত্রি সাড়ে ন'টার 'সো'তে ম্যাডানে গিয়েছিলুম। সবাই বল্‌লে, 'লনচ্যানি'র খুব 'প্যাথেটিক' প্লে আছে। সাড়ে এগারোটায় বেড়িয়ে এসে দেখি ড্রাইভারটা দিব্বি ঘুমুচ্ছে। তাকে তুললুম; কিন্তু সে যে কি করলে মোটরে 'ষ্টার্ট' আর হয় না। আধঘণ্টা প্রায় দাঁড়িয়ে রইলুম। বেচারার গলদঘর্ম্ম অবস্থা! এমন সময় মিঃ আলি ও মিঃ খান্ দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন। মিঃ আলি কাছে এসে বল্‌লেন, 'আমি একবার চেষ্টা করে' দেখতে পারি।'

"আমি সম্মত হ'লে তিনি সব খুলে পরীক্ষা করে' গাড়ী ষ্টার্ট করে' দিলেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লুম—'আপনারা কোথায় যাবেন এখন? গাড়ী আছে সঙ্গে?'

"মিঃ খান্ বল্‌লেন, 'আমরা ভবানীপুর যাব—এসেছিলুম ট্রামে, এখন ত ট্রাম-বাস সব বন্ধ—হেঁটেই যেতে হবে।'

"আমি বল্‌লুম, 'তা' হ'লে চলুন আমার গাড়ীতে—আপনাদের ভবানীপুরে নামিয়ে দেব।'

"তাঁরা দু'জনে তখন ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লেন এবং সেখানে দু'পক্ষের পরিচয়াদি হ'ল। এই ত আলাপের সূত্রপাত, বুঝলি ?"

জোবেদা বল্লে, "আচ্ছা ভাই, তুই যে মিঃ আলিদের সঙ্গে এত মিশিস্, ওদের সঙ্গে বায়স্কোপে যাস, এতে মিঃ সেথ্ কিছু বলেন না ?

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্‌টিয়ে রোকেয়া বল্লে, "হুঃ, বল্‌বে আবার কি ? বিয়ের সময়ই ত সর্ত্ত হয়েছে যে, আমার স্বাধীনতায় সে বাধা দিতে পারবে না।"

জোবেদা বিস্ময়ের সুরে বল্লে "বলিস্ কি ! সত্যি না কি ? তুই কিন্তু বেশ আছিস্ ভাই। দেখ্ ত ওঁরাই মিঃ আলি না কি, ঐ যে--"

"হ্যাঁ ওঁরাই আস্‌ছেন।"

রোকেয়া উঠে দাঁড়িয়ে পরম সমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করলে, "আসুন, আসুন, অনেক 'লেট' করে' ফেলেছেন" বলেই সে মিঃ আলির সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করলে ; তারপর মিঃ খানের সঙ্গে।

আমি অবাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম ! পাশ্চাত্যের ছায়া ওই নারীর মনে এমনই বিস্তার লাভ করেছে যে, নিজের দেশের, নিজের জাতির রীতি-নীতি সব সে ভুলে গেছে ! এই কি আমাদের দেশের মুস্‌লিম্-কন্যা ! পরপুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভ্যর্থনা করতে একটুও দ্বিধা বোধ করলে না !

রোকেয়া বল্লে, "বসুন। এই হ'ল আমার বন্ধু জোবেদাবানু—সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এক বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে।"

মিঃ আলি ও মিঃ খান্ দু'জনে সমস্বরে বলে' উঠলেন, "বেশ, বেশ, শুনে সুখী হলাম—আপনাদের মিলন শুভ হোক্ !"

রোকেয়া জোবেদার দিকে ফিরে বল্লে, এঁদের পরিচয়ও তুই শুনেছিস্। মিঃ আলি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছেন ; আর মিঃ খান্ 'ল' পড়্‌ছেন। এখন বলুন তো মিঃ আলি, আপনাদের এত বিলম্বের কারণ কি ? কখন থেকে আমরা বসে' আছি।"

"ওঃ, 'সরি' মিসেস্ সেথ কিছু মনে করবেন না ; একটা কাজে আট্‌কে পড়েছিলুম।"

মিঃ খান্ বল্লেন, "এই পার্কটা ত মন্দ নয় ; বেশ খোলা জায়গায়—কি বলেন মিসেস সেথ্ ?"

রোকেয়া বল্লে, "হ্যাঁ, আমারও খুব ভাল লাগে—কিন্তু এর চেয়ে বেশী লোভনীয় ঢাকুরিয়া লেক্—কি চমৎকার জায়গা ! একেবারে শান্ত, নির্জ্জন !"

উৎসাহিত হয়ে মিঃ খান্ বল্লেন, "তা' হ'লে চলুন না, সেইখানেই যাওয়া যাক্।"

"বেশ ত চলুন" বলে' রোকেয়া উঠে দাঁড়াল। মিঃ আলি বল্লেন, "আজ কাল মিঃ সেথের শরীর কেমন ? জ্বর কি হচ্ছেই ?"

রোকেয়া অবহেলাভরে বল্লে, ওর আর ভালমন্দ কি ! রোজ বিকাল হলেই জ্বর আসে, আর কাশীও বাড়ে।"

জোবেদা জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তারেরা কি বলেন ? সারবেন ত ?"

"আর সারবে ! ঐ রোগ হ'লে কি লোকে সারে ? 'হোপ্‌লেস্' !"

জোবেদা বল্লে, "চেঞ্জে যান্ না কেন ? আলমোরা বা নইনিতাল—এই সব 'থাইসিস্' রোগীদের পক্ষে খুব উপকারী জায়গা।

"যেতে ত ডাক্তাররাও বল্‌ছেন। কিন্তু এই মাসে আমার ছোট বোনের বিয়ে—আমি থাকবো না, তা' কি হয় ? বিয়েটা হ'লে তবে যাব।"

মিঃ আলি বল্লেন, "আপনি নাই বা গেলেন ; ওঁকে পাঠিয়ে দিন্ না ?"

রোকেয়া হতাশভাবে বললে, "তা' হলেই

হয়েছে ! আমি না গেলে ওকে একা পাঠাবে এমন সাধ্য কার !"

"মিঃ খান্ বল্‌লেন, "মিঃ সেখ্ নিশ্চয় আপনাকে খুব ভালবাসেন, না ?"

রোকেয়া তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে বল্‌লে," হুঁঃ, মূর্খদের আবার ভালবাসার জ্ঞান আছে না কি ?"

মিঃ আলি বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কেন মিঃ সেখ্ কি লেখাপড়া করেন নি ?"

"মোটেই না—ঐ স্কুল পর্য্যন্ত। জমীদার সে—তার আর লেখাপড়ার আবশ্যক কি ? জানেন ত ধনীলোকদের 'থিওরি'—'বড়লোকের ছেলেরা ত আর চাকরী করবে না—তারা লেখাপড়া করবে কেন' ?"

জোবেদা বল্‌লে, "সত্যি ভাই, তুই বি-এ পাশ করে' শেষে মিঃ সেখ্‌কে বিয়ে করলি কেন ?"

রোকেয়া হতাশার স্বরে বল্‌লে, "বিয়েটা ত আমার হাতে ছিল না ! তখন বাবা বেঁচে-ছিলেন ; জমীদার বলে' তিনি বিয়ে দিলেন।"

মিঃ আলি বল্‌লেন, "মিঃ সেখের অসুখটা কতদিন হ'ল ?"

রোকেয়া বল্‌লে, "হবে বছরখানেক। উঃ, সমস্ত দিন রোগী ঘেঁটে আমার হাঁফ্ ধরে গেছে ! বিকালে জ্বর এলে ডাক্তাররা আসেন ; আমিও তখনই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

মিঃ আলি বল্‌লেন, "তাই উচিত ; নইলে আপনার শরীর টিঁক্‌বে ক'দিন ?"

"যাক্ গে, চলুন" বলে' রোকেয়া এগিয়ে গেল। সবাই তার পেছনে পেছনে গিয়ে গাড়ীতে উঠ-লেন। গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে পূর্ণবেগে চলে' গেল।

আমি স্তব্ধবিস্ময়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিলুম ! তারা চলে যেতে আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়া-লুম। শিক্ষার বিকৃত মূর্ত্তি এই সব মেয়েদের উপর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় মন তিক্ত হয়ে উঠল—উচ্চ-শিক্ষার কি এই পরিণাম ! রোকেয়ার কি হৃদয় নাই ? স্বামী তার রোগশয্যায়—পরপারযাত্রী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—আর সে বেশ স্বচ্ছন্দে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ করে' বেড়াচ্ছে ! স্বামী অশিক্ষিত বলে' ঘৃণা করে—তাকে মৃত্যুশয্যায় দেখেও তার হৃদয়ে নারীসুলভ করুণার উদ্রেক হয় না ?... স্বামীর অলক্ষ্যে এই সকল নিদারুণ কথা কি বলে' সে বন্ধুদের নিকট প্রচার করে' নিজে গর্ব্বানুভব করলে ! লেখাপড়া শিখে নারীর এতদূর অধঃপতন ! এ যে ধারণাতীত ! কোথায় তাদের সেই স্বভাবজাত লজ্জা-সরম ? রোকেয়ার অন্তরে তার কি কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নাই ? অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা যে ঘোরতর অন্যায়, সে জ্ঞানও কি তার হয় নাই ?

নারীর কাছে লোকে স্নেহ চায়, ভালবাসা চায়, সেবা চায় ; তাদের ওপর নির্ভর করে' স্বামীরা শান্তি পেতে চায়—কিন্তু সেই নির্ভরতার মর্য্যাদা কি রোকেয়া রাখ্‌তে পেরেছে ?

সহসা এক আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। শুনলুম, আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। পাত্রী কোলকাতা সহরের ; আর সব চেয়ে সর্ব্বনাশ এই যে,—সে ম্যাট্রিক পাশ !

আজ শিক্ষিতাদের ওপর আমার আর আস্থা নাই। পূর্ব্বে এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'লে আমি খুবই আনন্দিত হতুম। শিক্ষিতা মেয়েদের উপর আমার খুবই শ্রদ্ধা ছিল ; তাদের আমি ভদ্র, মার্জ্জিত ভাবতুম। তাদের কথা ভেবে কত আকাশকুসুমই না রচনা করেছি !

আমি যাকে বিয়ে করবো, সেও ত এই রকম স্বাধীনতা চাইবে—তা' আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না ! উঃ, কী সাংঘাতিক !

পার্কে ছেলেদের হাসি-খেলা কিছুতেই আর আমার মন আকর্ষণ করলে না। ভারা-ক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

দুই

কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার কোন ওজর-আপত্তি কেউ শুনলে না। বিয়ে করতে যেতেই হ'ল

মনকে প্রবোধ দিলুম, এত আর বি এ পাশ করা মেয়ে নয়; আর একজন হলেই যে সবাই হবে,তারও কোন অর্থ নাই। সবাই ত আর পর্দ্দা 'সিস্টেম' উঠিয়ে দেয় নাই; তাদের বাড়ীতে হয় ত পর্দ্দা আছে। নানাভাবে মনকে বোঝাতে লাগলুম। একটি মাস এই সব নিয়ে আলোচনা করবার পর কতকটা আশ্বস্ত হলুম। রোকেয়ার কথাও প্রায় ভুলে গেলুম।

বিয়ে হ'ল। সচরাচর যেমন হয়, তেমনই। সোরগোল ধমধাম কিছুই বাদ গেল না। যখন আমায় শুভদৃষ্টির জন্য অন্দরপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, আমার মন তখন আশা-আশঙ্কায় দুলছিল—না জানি আমার স্ত্রী কেমন? না দেখে-শুনে বিয়ে করা—কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে'। আমার ভাগ্য কেমন, কে জানে! যেমনই হোক, তাকে নিয়েই সারা জীবন কাটাতে হবে—তাতে ত কোন ভুলই নাই!

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে চমকে উঠলেম, "এদিকে আয় রোশেনা। লক্ষীটি, বড় বোনের কথা শোন।"

সর্পাহতের ন্যায় চমকে উঠলুম—কী সর্ব্বনাশ! এ যে রোকেয়ার গলা— তবে কি আমি রোকেয়ার বোনকে বিয়ে করলুম? যা' আমি কল্পনাও করতে পারি নি, শেষে—

আর ভাবতে পারলুম না। চোখের নিমিষে ভেসে উঠলো,—রোকেয়ার বোন রোশেনা খোলা মাঠে আঁচল উড়িয়ে বেড়াচ্ছে; আর আমি রোগশয্যায় পড়ে' আছি।...সমস্ত মন ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে' উঠলো; আচ্ছন্নের মত পড়ে করে' রইলুম। কোথা দিয়ে যে কি হ'ল, কিছুই লক্ষ্য করি নি।

সব গোলমাল মিটে যেতেই উঠে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালুম। কোথা থেকে রোকেয়া ছুটে এসে বললে, "যাচ্ছেন কোথায়? এখন আর বাইরে গিয়ে কাজ নাই; অনেক রাত হয়ে গেছে।"

বিদ্রোহে মন বেঁকে দাঁড়াল। বিরক্তির স্বরে বললুম, "আমি গোলমাল সইতে পারি না। আমার শরীর ভাল নয়; আমি বাইরে শোব।"

ভুরু কঁচকে রোকেয়া বললে, "সে কি! বাইরে শোবেন কেন? ঘরে শোবেন চলুন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।"

চার-পাঁচটা মহিলাও এসে পড়লেন; বললেন, "ছি, আজ কি বাইরে শুতে হয়!"

সকলে প্রায় জোর করে' আমায় ধরে' নিয়ে গেলেন। আমায় ঘরে দিয়েই তাঁরা দ্বার বন্ধ করে' দিলেন। মহাবিপদ! আমি নিরুপায় হয়েই চুপ করে' রইলুম। কিছুক্ষণ পরে চেয়ে দেখলুম,—মস্ত খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা; তারই একপাশে জড়সড় অবস্থায় রোকেয়ার বোন্ রোশেনা বসে'।

দেখেই বিরক্ত ধরল। লজ্জায় তার ঘাড় নুয়ে পড়ছে। মনে মনে হাসলুম—এ লজ্জা কতদিন থাকবে? স্বাধীনতার ডানা গজাবে ত খুব শীঘ্রই!

বিছানায় গিয়ে 'ধপ' করে' শুয়ে পড়লুম। একটু বাঁকা-মাপা-স্বরে বললুম, "আর বসে' কেন? শুয়ে পড়ুন দয়া করে" বলেই চোখ বুজে পড়ে রইলুম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিছুই জানি না।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, ঘরে কেউ নাই। মনটা হাল্কা হ'য়ে গেল। ভাবলুম, এই ত সুযোগ! চট করে' পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দ্বার খুলে বেরিয়ে বাইরে চলে গেলুম। সেখানে

সবাই ঘুমুচ্ছে। আস্তে আস্তে রাস্তায় এসে দেখি, বাস্ চল্‌তে আরম্ভ করেছে। একটা ডেকে থামিয়ে তা'তে চড়ে' বসলুম এবং সোজা হাওড়ায় গিয়ে নাম্‌লুম।

'ওয়েটিং রুমে' বসে' বসে' ভাব্‌তে লাগলুম, —এখন কোথায় যাই? এখানে নিস্তার পাব না; আমায় ধরে' ফেল্‌বেই। বিয়ের যৌতুক যা পেয়েছিলুম, সব পকেটেই ছিল। সেগুলো বা'র করে' গুণে দেখি—গিনি, মোহর, টাকায় মিলে প্রায় তিনশো হবে। মনটা খুশী হয়ে উঠ্‌লো। যাক্, কিছুদিন নিরুপদ্রবে কেটে যাবে। দেশ-ভ্রমণের সাধ ছিল অনেক দিন থেকেই—এই সুযোগে এবার সেটা সম্পন্ন হবে; তারপর, যা' থাকে কপালে! একটা চাকরী অন্ততঃ জুটিয়ে নেবই। বি-এ পাশ করেছি খুব সম্মানের সঙ্গেই—একটা স্কুল-মাষ্টারী কি পাব না?

পকেট থেকে একটা কলম বা'র করে' পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটা কার্ড কিনে মায়ের কাছে লিখলুম, "কোন কারণে দেশ ছেড়ে চল্‌লুম। যদি বিপদে পড়ি, তোমায় জানাবো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না।"

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে আবার ওয়েটিং রুমে ফিরে এলুম। যথাসময়ে পশ্চিমের ট্রেণ এল এবং তা'তে চড়ে' তবে হাফ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

তিনমাস ধরে' দিল্লী, আগ্রা, আজমীর সরিফ্, নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে শেষে এলাহাবাদে এসে উপস্থিত হলুম। টাকা তখন নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। ভাবলুম, এইবার একটা চাকরী করবো। অনেক খুঁজে খুঁজে একটা গভর্ণমেণ্ট স্কুল দেখে চাকরীর জন্য আবেদন করলুম। ভাগ্য হয় ত ভালই ছিল। একটা শিক্ষকের পদ তখন খালি থাকায়, আমার আবেদন মঞ্জুর হ'য়ে গেল; আমি স্কুল-মাষ্টার হলুম। মাইনে তেমন বেশী কিছু নয়; কিন্তু আমার অধিক টাকার দরকারই বা কি?

মেসে একটা ঘর ভাড়া করে' একজন চাকর ঠিক করলুম। স্কুলে গিয়ে সব বুঝে নিয়ে আমি নূতন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করলুম। সমস্তদিন স্কুলে ছেলেদের নিয়ে হৈচৈ করে' কাটাতুম। ছুটী হ'লে বিকালবেলায় তাদের নিয়ে খেলাধূলায় দিন বেশ কেটে যেতে লাগ্‌ল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বাড়ীর কথা মনে হ'ত। মায়ের স্নেহ-বিগলিত সৌম্য আস্য, ভাবীর (বৌদি') মমতা-মাখা সুন্দর মুখচ্ছবি সব চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ত! কতদিন তাদের দেখি নি! ইচ্ছা করে' আজ আমি ঘরছাড়া! পরের চাকরী করছি—নয় ত আমার চাকরীর কোন দরকারই ছিল না। আমার বাবা বড় জমিদার ছিলেন। তিনি মারা গেলে আমার বড় ভাই-ই সমস্ত দেখাশোনা করছিলেন। তাঁর সুব্যবস্থায় আমার কোন ভাবনাই ভাব্‌তে হয় নি। সুখের সংসার! শান্তিময় ছিল আমাদের গার্হস্থ-জীবন! আমার ভাবী পল্লীগ্রামের মেয়ে স্নেহ-সেবায় অদ্বিতীয়া; গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। লেখাপড়া জানে না বলে' আমি তা'কে কত ঠাট্টাই না করেছি! যখন-তখন বলেছি, "ভাবী, আমার যখন বউ আসবে, তখন দেখো, তোমার চেয়ে সে কত চালাক, কত লেখাপড়া জানা, কথায় যুক্তিতে তুমি তার সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বে না।"

সে মোটেই রাগ কর্‌তো না; স্নিগ্ধ হেসে বল্‌তো, "বেশ ত ভাই, শীগ্‌গির করে' একটী বউ আন না। আমি তার কাছেই সব শিখে নেব।"

অনেক সময় আমি দেশ-বিদেশের নতুন খবর তা'কে বল্‌তে গেছি; ভাবী রান্নায় ব্যস্ত থাকায় বলেছে, "এখন না ভাই, অন্য সময় বোলো।"

বিরক্ত হ'য়ে বলেছি, "বৃথা তোমার নারীজন্ম!

দেশের কোন খবরই জানতে চাও না—কেবল রান্নাঘর আর ভাঁড়ার-ঘরই চিনেছ !”

ভাবী সুমধুর-স্বরে বল্‌ত—“দেশের খবরে আমার কাজ কি ভাই? আমার রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘরই অক্ষয় হোক্ !”

সেদিন কত কথাই না শুনিয়েছি তা'কে! আজ কিন্তু ভাবি, এরকম শিক্ষিতার চেয়ে আমার পাড়াগেঁয়ে ভাবী সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ! দেশের অমন মেয়েই ত সবার বরণীয়া!

এ কালের মেয়েরা গৃহকর্ম্ম ভুলে যেতে বসেছে। ভোলাটাই যেন গৌরবের বিষয়! রান্না করা তারা দারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখে। পর্দ্দাপ্রথা যে নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তা' তারা বোঝে না। ভাবে, জোর করে' যেন তাদের বন্দী করা হয়েছে। রোকেয়াই ত তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ!

মাঝে মাঝে রোশেনার কথা ভাবি। তা'কে হঠাৎ ছেড়ে এসে কি আমি অন্যায় করেছি? দু'দিন সেখানে থেকে তার মনের পরিচয় জানা উচিত ছিল না কি? রোকেয়ার বোন্ সে—তার অন্য পরিচয় আর কী হ'তে পারে? যে বাড়ীর এক জন মেয়ে অত স্বাধীন, সে বাড়ীর অপরটীর অন্যরূপ হওয়া কি সম্ভব? রোশেনার পরিচয় জানা অনাবশ্যক। আচ্ছা, আমি চলে' আশায় সে কি দুঃখিত হয়েছে? দিনান্তেও আমার কথা কি মনে করে? কে জানে!

তিন

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসেই শুয়ে পড়লুম। শরীরটা বড় ব্যথা করছিল; মাথাটাও ঘুরছিল।

চাকর আবদুল এসে বল্‌লে, “কিছু খাবেন না হুজুর?”

আমি “খাব না” বলায় সে চলে' গেল।

কিছুক্ষণ পড়ে' থাকার পর এমন জ্বর এল যে, আমি যন্ত্রনায় ছটফট কর্‌তে লাগ্‌লুম। গায়ের ব্যথাটাও খুব বেড়ে উঠ্‌ল। সমস্ত রাত বিনিদ্র অবস্থায়ই কাটলো। ভোরবেলা পাশ ফিরতে পারি না, এমনই অবস্থা। আব্‌দুল এসে বল্‌লে, “হুজুর, ডাক্তার-সাবকে ডেকে আনব কি?”

আমি বল্‌লুম, “যা; আর সেই সঙ্গে স্কুলে খবর দিস্ যে, আমার অসুখ।”

“আচ্ছা” বলে' আবদুল ছুটে চ'লে গেল। মনে হ'ল ও ভয় পেয়েছে। যে রকম করে' আমার দিকে চাইছিল! কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়েছিলুম, জানি না। জুতোর শব্দে চেয়ে দেখি স্কুলের হেড্ মাষ্টার সুরেনবাবু ও ডাক্তার-সাহেব দু'জনেই এসেছেন। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা করে' দেখে সুরেনবাবুর দিকে ফিরে বল্‌লেন, “এঁর বাড়ী খবর দিন্, এঁর 'পক্স' হয়েছে।”

পক্স্! চোখের সাম্‌নে বিশ্বভুবন দুলে উঠ্‌লো।

সুরেনবাবু বল্‌লেন, “আপনার আত্মীয়-স্বজন কে আছেন? বাড়ীর ঠিকানা দিন্; আমি 'তার' করে' দিই।”

আবদুল্ গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে কাগজ-কলম নিয়ে এল। আমি অতিকষ্টে আমার বড় ভাইয়ের নাম ও ঠিকানা লিখে দিলুম। সুরেনবাবু তার লিখে আবদুলের হাতে দিলেন। সে ছুটে চলে' গেল।

ক্রমে ক্রমে আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। তারপর রোগ-যন্ত্রনায় কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লুম, কিছুই মনে নাই।

* * *

জ্ঞান হ'তে চোখ মেলে চাইলাম। অরুণ আলোয় আকাশটা রঙিন হ'য়ে উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—মনে হ'ল, যেন

দীর্ঘকাল পরে বাইরের ওই সব দৃশ্য দেখ্ছি! কতদিনই না জানি ঘুমিয়েছি!

গায়ে তখন ব্যথা ছিল না—কিন্তু এমন দুর্ব্বল বোধ হচ্ছিল যে, এর পূর্ব্বে কোনদিন এতটা দৌর্ব্বল্য অনুভব করি নি। পাশ ফিরতে পারি না।

চেয়ে দেখি মাথার কাছে খাটের বাজুতে মাথা রেখে একটি মেয়ে বসে'। ভাব্লুম, 'নার্শ' হবে। ক্ষীণকণ্ঠে বল্লুম, "একটু জল!"

ধড়মড় করে' উঠে মেয়েটি গ্লাসে করে' জল নিয়ে এল এবং চাম্‌চে করে' আমার মুখে ঢেলে দিতে লাগ্‌ল। তার মুখের পানে চেয়ে আমি চম্‌কে উঠ্লুম—মুখ যেন চেনা চেনা! এ রোশেনা নয় ত? বিবাহের রাত্রে একবার মাত্র তা'কে দেখেছিলুম। এ মুখ যে ঠিক সেই রকম!

আমি বল্লুম, "তুমি কে? তুমি কি রোশেনা?"

মেয়েটির মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে সে নতমুখে বল্লে, "হ্যাঁ, আমিই রোশেনা।"

"তুমি রোশেনা? তুমি কি করে' এখানে এলে? আর কেউ এসেছেন কি?"

রোশেনা সলজ্জকণ্ঠে বল্লে, "আপনার বড় ভাই এসেছেন। পরে সব শুনবেন; এখন বেশী কথা বল্‌বেন না।"

আমি ক্লান্ত হ'য়ে চোখ বুজলাম। আবার কতক্ষণ তন্দ্রা অথবা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলুম, জানি না।

ঘুম যখন ভাঙ্‌লো, তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। চোখ খুলে দেখি,—রোশেনা ব্যগ্র-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। আমায় জাগ্‌তে দেখে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি দুধ এনে আমায় খেতে দিলে। দুধ খেয়ে শরীর অনকটা সুস্থ বোধ করতে লাগ্‌লুম। আমি তা' হ'লে এ যাত্রা বেঁচে উঠলাম!

দুয়ারে পদশব্দ শুনে রোশেনা মাথায় কাপড় দিয়ে জানালার নিকট সরে' গেল। আমার বড় ভাই ও ডাক্তার-সাহেব ঘরে প্রবেশ করলেন। দাদা স্মিত-হাস্যে বল্লেন, "শরীরটা কেমন বোধ করছিস্, আমিন?"

মাথা নেড়ে জানালুম, "ভালই।"

ডাক্তার-সাহেব ঔষধ পরিবর্ত্তন করে' দিয়ে চলে' গেলেন। দাদা বল্লেন, "তুই আরও সুস্থ হ'লে তোকে নিয়ে যাব; তোর আর চাকরী করা চলবে না। উঃ, কী ভাবনাটাই ভাবিয়েছিলি! ভাগ্যে তোর এই সুমতিটা হয়েছিল যে, অসুখের খবরটা জানাতে ভুলিস নি। নইলে কি যে হ'ত, তা' খোদাই জানেন! এমন করে' কেন পালিয়ে এলি বল্ ত? বউ কি তোর পছন্দ হয় নি?"

অনুতপ্ত অন্তরের ভাষা মুখে কি প্রকাশ করা যায়!

"যাক্, এখন তুই কার প্রাণঢালা সেবায় ভাল হয়েছিস জানিস?"

আমি ইঙ্গিতে রোশেনাকে দেখিয়ে দিলুম।"

"হ্যাঁ, উনি দিনরাত জেগে বসে' তোর সেবা করেছেন। আমাদের কিছুই করতে দেন নি। আজ পাঁচদিন হ'ল আমরা এসেছি। তোর গা সব শুকিয়ে এসেছে। এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে।" কিছুক্ষণ থেমে আবার দাদা বল্লেন, "তোর অসুখের খবর পেয়ে বউমা ওঁর ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে পড়লেন। আমি তখন রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছি। উনি আমার সঙ্গে আসতে চাইলেন। কত বোঝালুম; কিছুতেই শুনলেন না। কেঁদে কেটে অস্থির! মা

বললেন, 'নতুন বউ কি করে' যাবে?' তা' বউমা কোন আপত্তিই শুনলেন না। তুই কি আমাদের ওপর রাগ করেছিস, আমিন?"

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, "রাগ আমি কিছুমাত্র করি নাই।"

দাদা সন্তুষ্ট হয়ে চলে' গেলেন। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগলুম,—এই রোকেয়ার বোন্ রোশেনা! একে যে আমি এভাবে মোটেই কল্পনা করি নি! এই কাল বিসূচিকা রোগকে একটুও ভয় না করে' প্রাণ-ঢেলে আমার সেবা করা রোশেনার পক্ষে কি করে' সম্ভব হ'ল?

তার উপর আমি কী অবিচারই না করেছি! এক বোনের দোষে আর একজনকে শাস্তি দিয়েছি! দু' বোনের মতিগতি যে এত বিভিন্ন, তা' পূর্ব্বে কে জানতো! কোমল-স্বরে ডাকলুম, রোশেনা!"

রোশেনার মাথার কাপড় সরে' যাওয়ায় কানের কাছে তার এলোমেলো চুলগুলি বাতাসে কাঁপছিল। গোধূলি আলোয় সে মুখ বড় করুণ, বড় সুন্দর!

আমার ডাকে চম্‌কে উঠে সে আমার কাছে এল। আমি তার হাত দু'টী ধরে' বললুম, রোশেনা, আমার জন্য তুমি কেন এত করলে? আমি তোমার কে—আমার সঙ্গে তোমার কি-ই বা পরিচয়?

রোশেনা মাথা নত করলে। তার চোখ দু'টী জলে ভরে' উঠলো। আমি পুনরায় বললুম, "আমার এ সাংঘাতিক অসুখ শুনে তুমি যে এতদূর চলে' এলে; তোমার ভয় হ'ল না—যদি তোমার হয়?"

দৃপ্তকণ্ঠে রোশেনা বললে, "ভয় কি আমার! হোক্ না! আপনি ভাল হয়েছেন, এতেই আমার পরম আনন্দ! আমার জীবনের মূল্য কি?

আমি বললুম, "বল কি রোশেনা! তোমার জীবনের মূল্য আজ সব চেয়ে বেশী—তুমি যে আমার জীবনদাত্রী!"

রোশেনা ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "না না, ওকথা বলবেন না। খোদা আপনাকে বাঁচিয়েছেন!"

আমি একটু হেসে বললুম, "খোদা বাঁচিয়েছেন তা' জানি—কিন্তু তোমার কল্যাণ হস্তের সেবা না পেলে আমি কি ভাল হতাম।" একটু নীরব থেকে পুনরায় বললুম, "তোমায় অমনভাবে ছেড়ে এসে আমি কী অন্যায়ই না করেছি! সে জন্য আজ আমি সত্যই অনুতপ্ত! আমায় ক্ষমা করবে কি রোশেনা?"

রোশেনা করুণ কণ্ঠে বললে," আমি ত আপনার ব্যবহারে রাগ করি নি। রাগ করলে কি এখানে আসতুম?"

আনন্দিত হয়ে আমি বললাম, "তুমি করুণাময়ী, তাই রাগ কর নাই; কিন্তু কেন আমি হঠাৎ চলে' এলুম জানো?"

রোশেনা নীরবে মাথা নাড়লে।

আমি একটু থেমে বললুম, "তুমি রাগ কোরো না। তোমার বড় বোন্ রোকেয়াকে যথেচ্ছায় বেড়াতে দেখে শিক্ষিতা মেয়েদের ওপর আমার মন চটে গিয়েছিল। স্বামীকে অসুস্থ ফেলে যে মেয়ে বেড়াতে যায়, তুমি ত তারই বোন্। কাজেই তোমার ওপরও আমার মন্দ ধারণা জন্মে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হ'লে হয় ত ও চিন্তাও মনে আসতো না। কিন্তু ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, তারই বোন্ হ'য়ে তুমি কি করে' এমন হ'লে! আজ আমার ভুল ভেঙেছে! বুঝেছি,—জগতে সব শিক্ষিতা মেয়েই রোকেয়া নয়!"

রোশেনা একটু হেসে বললে, "তা'কে মা কত বকেন, তার জন্যে কত দুঃখ করেন, কিন্তু

সে শোনে না। ছোটবেলা হ'তে বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করেছে কি না—তাই সে অত স্বাধীন; আমাদের মত হতে চায় না।"

আমি বললুম, "কিন্তু মুসলমানের মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি ত উচিত নয়।"

রোশেনা মাথা নত করে' বসে' রইল। আমি তার সুন্দর হাত নিয়ে খেলা করতে লাগলুম। রোগ-যন্ত্রণা কোথায় যে অন্তর্হিত হয়ে গেল, বুঝতেই পারলুম না! অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মনটা ভরে' গেল—রোশেনা যে আমারই স্ত্রী!

চার

শরীর সুস্থ হ'লে আমরা কোল্‌কাতায় ফিরে এলুম। হারানিধি বুকে ধরে' মা চোখের জলে ভাস্‌তে লাগলেন। ভাবী এসে রোশেনার গলা ধরে' ভেতরে নিয়ে গেল। বাড়ীময় কলরব পড়ে' গেল। লোকজন সব আনন্দে আত্মহারা! নতুন-বউ এসেছে; বাড়ী বাড়ী আত্মীয়-স্বজনদের 'ওলিমার দাওয়াত' করা হ'ল।

সন্ধ্যাবেলা হাজার বাতির আলোয় বাড়ী ঝল্‌মল্ করছে। রোশেনাকে ভাবী মনের মত করে' সাজিয়ে-গুছিয়ে এনে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে গেল। নীচে অনবরত হর্নের শব্দ হচ্ছে—নিমন্ত্রিতেরা সবাই আস্‌ছেন। আমার শরীর অসুস্থ দুর্ব্বল বলে' আমি কোন হাঙ্গামায় যাই নাই। অভ্যর্থনার ভার দাদার ওপর। আমি খাটে বসে' কাগজ পড়ছিলুম। রোশেনা পান সাজ্‌ছিল। আমি মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলুম। যাকে কেন্দ্র করে' এই আনন্দোৎসব, তার মুখ আজ আনন্দে উজ্জ্বল!

সহসা পর্দ্দা সরিয়ে কে একজন ঘরে প্রবেশ করলে। তা'কে দেখে আমি ও রোশেনা একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌লুম! রোশেনা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' তা'কে জড়িয়ে ধরলে।

এই রোকেয়া! কোথায় তার সেই অপূর্ব্ব সজ্জা! আজ পরণে শুভ্র থানের কাপড়—তার গায়ের রঙে যেন মিশিয়ে গেছে! মুখের সেই গর্ব্বিত হাসি, সেই বিদ্যাভিমান আজ কোথায়! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! রোকেয়াকে এ বেশে যে কল্পনা করা যায় না—এ যে বড়ই অস্বাভাবিক!

রোকেয়া রোশেনাকে ম্লানমুখে বল্‌লে, "কি দেখ্‌ছিস্ বোন? তোর স্বামীকে তুই মরণের মুখ থেকে থেকে ফিরিয়ে আনলি; আর আমি অসুস্থ স্বামীকে জোর করে' পাহাড়ে পাঠালুম, সঙ্গে গেলুম না! রাক্ষসী কি না, তাই সে আমার ভয়ে পালিয়ে গেল!"

রোকেয়ার ব্যথিত অনুতপ্ত কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠলুম! চেয়ে দেখি, তার চোখ হ'তে অজস্র ধারা নেমে আস্‌ছে! তার বিষাদ মুখ দেখে আমার করুণা হ'ল। যে নারীকে এতদিন ঘৃণা করেছি, আজ তার বিষাদপূর্ণ কথা শুনে আমার মন ব্যথায় ভরে' উঠল। অন্যায় স্বাধীনতার চাপে যে এতদিন চাপা পড়েছিল—আঘাত পেয়ে তার অন্তরবাসিনী নারী আজ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে! কিন্তু এর জন্য কী কঠিন মূল্যই না তা'কে দিতে হ'ল!... সারাজীবন ভুগের আগুণে একটু একটু করে' তা'কে পুড়িয়ে খাক্ করে' দেবে!

রোকেয়ার ওপর আর আমার রাগ নেই—সত্যই আজ আমি তা'কে অন্তরের সহিত ক্ষমা করলুম।

বাইরে সানায়ের করুণ সুর রোকেয়ার গভীর মর্ম্মবেদনা তখন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছিল!

পান্নার চেন

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ

হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনের বালীগঞ্জে নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদোপম গৃহে আজ মহা উৎসব। গৃহপ্রবেশোপলক্ষে আজ কলিকাতার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত সেন-ভবন আজ ইন্দ্রালয় বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

আহারের জন্য সেন-সাহেব নিমন্ত্রিতগণকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। অভ্যর্থনা-গৃহে বসিয়া রহিলেন প্রৌঢ়বয়স্ক ইঞ্জিনিয়ার মহেশ চাটুয্যে—যিনি এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আধুনিকতম আবিষ্কারসমূহের সহিত প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়াছেন এবং য়ুরোপীয় স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদগণেরও বিস্ময় উৎপাদিত করিয়াছেন। ইঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া ইনি আহার করিতে গেলেন না। সেন-সাহেবের নিমন্ত্রণ-রক্ষা না করিলেই নয়, তাই তিনি এখানে আসিয়াছেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। কাহারও আর আসিবার সম্ভাবনা নাই। মহেশবাবু একাকী সেই বিদ্যুতালোকিত কক্ষে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন। সম্প্রতি তাঁহার ভাবনার অনেক কারণও ঘটিয়াছে।

হঠাৎ একটি সোফার নীচে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল—কি একটা জিনিষ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তিনি হেঁট হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইলেন। একটি পান্নার চেন ও হীরকখচিত ঘড়ি। সেন-সাহেবের বড় মক্কেল—উড়িষ্যার কোন্ এক করদ রাজ্যের অধিপতি এই চেনটি পরিয়া আসিয়াছিলেন। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিবার সময় বোধ হয় কোনও রকমে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

মহেশবাবু একবার চারিদিকে চাহিলেন। কেহ কোথাও নাই। চেনটি বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি দেখিলেন। এ রকম পান্না প্রায় দেখা যায় না। যেমন করিয়া হউক উহার মূল্য ত্রিশ হাজার টাকার কম নহে।

ত্রিশ হাজার টাকা! হ্যাঁ, মাঘ মাস পর্য্যন্ত কোনরকমে চালানো চাই-ই! হাত কাঁপে—কাঁপুক! বিবেকের দংশন অসহ্য হইলেও সহ্য করিতেই হইবে! মহেশবাবু আর একবার চারি-দিক চাহিয়া ঘড়ি ও চেন পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন।

এই মহেশ চাটুর্য্যে—যাঁর সাধুতার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত? ব্যবসায়ে সততার জন্য যাহাকে সকলে বিশ্বাস করে এবং যে বিশ্বাসের ফলে তিনি পল্লীগ্রামে পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী? যাঁহার অধীনে শত শত লোক খাটিতেছে?

হ্যাঁ, ইনিই। লোকে এখনও জানে না যে, তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপিনী সহধর্ম্মিনী স্বর্গারোহনের পর সত্য-সত্যই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—তাঁহার সর্ব্বস্ব যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, সেই ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালিয়াছে। লোকে জানে না বলিয়াই বহু

লক্ষপতি মহেশ চাটুয্যেকে এখনও কোটিপতি বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাঁহার প্রাসাদোপম বাটী কয়েক মাসের মধ্যেই পরহস্তগত হইবে।

উদ্ধারের আশা নাই? আশা মরণোন্মুখ মানবকেও ছলনা করে। মহেশবাবুও একটী আশার ক্ষীণ আলোক রেখার দিকে চাহিয়া আছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং-জগতে তাঁহার সমকক্ষ সহযোগী জিতেন মুখুয্যেই তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। মহেশবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র সুধীনকে জার্ম্মান হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইয়া আনিয়াছেন। বহুলক্ষপতি জিতেন মুখুয্যে তাঁহার একমাত্র কন্যা রেবাকে সুধীনের হস্তে সমর্পণ করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী মাঘের প্রথমে বিবাহের কথা। সুধীনের একটা গতি হইয়া গেলে, তিনি বারাণসী-ধামে শেষজীবন বিশ্বনাথের আরাধনায় কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু মাঘ মাস পর্য্যন্ত যে কোনরকমে 'ঠাট' বজায় রাখিতেই হইবে। পান্নার চেন ও ঘড়ি ভগবানের দান। ভগবান! লোকে পাপকার্য্যেও ভগবানের নাম লয়!

অনভ্যস্ত লোক পাপকার্য্য করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। মহেশবাবু কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া এদিক-ওদিক অস্থিরভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিকে একটা বারাণ্ডার কোণে দেখিলেন, জিতেনবাবু সাদরে তাঁর পুত্রের পিঠ চাপড়াইতেছেন। মহেশবাবু অগ্রসর হইতেই জিতেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য স্থপতি-বিদ্যায় আপনার মাথা! আমরা বাইরে থেকে এ বাড়ীটা ভাল করেই দেখিছি। কি সুন্দর সব বন্দোবস্ত! আমার মনে হয়, আমারা বহুযুগ আপনার পদতলে বসে' স্থপতি-বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি।"

মহেশবাবুর শিষ্টাচারানুমোদিত ভাবায় কিছু বিনয় প্রকাশ করা উচিত ছিল; কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কয় মিনিটের মধ্যেই তাঁহার যেন কি এক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল।

জিতেনবাবু বলিলেন, "আপনার চেহারাটা কি রকম কি রকম দেখছি। আপনি কি অসুস্থ?"

মহেশবাবু বলিলেন, "হাঁ, শরীরটা নিতান্তই অসুস্থ ছিল; না আস্‌লে নয়, তাই সেন-সাহেবের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে আসা। সম্প্রতি মাথাটা এমন ঘুরছে যে, মনে হয় পড়ে' যাব।"

জিতেনবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে আপনি এখনই বাড়ী ফিরে যান। সুধীন, তোমার বাবাকে বাড়ী নিয়ে যাও। ওঁর জীবন বহুমূল্য। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উনি আমাদের—বাঙালীর আদর্শ।"

মহেশবাবু পলাইবার পথ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের সঙ্গে তাঁহার মোটরে উঠিলেন। জিতেনবাবু তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মহেশবাবু বৈদ্যুতিক পাখার নীচে একটি সোফায় বসিয়া পড়িলেন। সুধীন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখন আপনি একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?"

"হাঁ। জিতেনবাবু তোকে বিবাহের দিন সম্বন্ধে কিছু বল্লেন কি?"

"বাবা, বিয়ে আমি করব না। আজ জিতেনবাবুকে আমি স্পষ্ট বলে' দিয়েছি—আমি আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করব।"

"সে কি! তুই জানিস্, তোর মায়ের (মহেশবাবুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল) কত

ইচ্ছা ছিল রেবার সঙ্গে তোর বিয়ে দেখে যান। জিতেন তখনও এত বড়লোক হয় নি। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটিকে নিয়ে আসত আমাদের বাড়ী। তোর মা তা'কে কত আদর করতেন। আমি ত বরাবরই জানতুম, তোর এ বিয়েতে অমত নেই।"

"অমত ছিল না—কিন্তু এখন বিয়ে হওয়া অসম্ভব।"

"তুই সব কথা জানিস্‌ কি না বল্‌তে পারি না। আমি আজ পথের ভিখারী—কয়েকদিন পরে আমাদের বাসগৃহখানিও পরহস্তগত হবে।"

"সেই জন্যেই বাবা, লক্ষপতির কন্যাকে বিবাহ করা অসম্ভব।"

"তা' হ'লে ভবিষ্যৎ ?"

"ভবিষ্যতে পিতামহ-প্রপিতামহদের মত আমাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সরল জীবন যাপন করাই উচিত। তাঁরা ত সেই রকমেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। আপনিই অদৃষ্টক্রমে কোল্‌কাতায় প্রতিষ্ঠা করে' প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেটা এখন স্বপ্নের মতই ভাব্‌তে হবে।"

মহেশবাবু সোফায় হেলিয়া পড়িয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার চিন্তার ধারা ভঙ্গ করিয়া পুত্র প্রশ্ন করিল, "বাবা, পান্নার চেনটা কোথা ? সেটা আমাকে দিন।"

"পান্নার চেন ! সে আবার কি ?

"উড়িষ্যার মহারাজা যে চেনটা পরে' এসেছিলেন। সেটা আপনি মেঝে থেকে তুলে খানিকক্ষণ দেখে পকেটে পুরলেন।"

মহেশবাবুর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পুত্র কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিল, "বাবা, আপনি কেন এরকম করলেন ? এর চেয়ে যে আমাদের দেশে পর্ণকুটীরে ফিরে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। আপনি যখন চেনটা পকেটে পুরলেন, তখন বারাণ্ডায় আমার কাছে নিতাই পাল ছিল। সে দেখেছে। সে শাসিয়েছে,—তোমার বাবার সাধুগিরি কাল সহরময় রাষ্ট্র করে' দেব !"

মহেশবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পান্নার চেন ও ঘড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিলেন। পুত্রের সুখ ও উন্নতির আশা—নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষার শেষ আশা বুঝি বিলুপ্ত হইল !

সুধীন ঘড়ি ও চেন তুলিয়া লইয়া গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিল।

মহেশবাবু বলিলেন, "কোথা যাও ?"

"এর মালিককে ফেরত দিতে।" তাহার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মোটর ছাড়িবার শব্দ শুনা গেল।

তিন

সুধীন গভীর রাত্রিতে মহারাজার পান্নার চেনটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, চেনটি তাঁহার পিতা কুড়াইয়া পাইয়াছেন এবং সেন-সাহেবের বাটিতে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সেই রাত্রিতেই তাহাকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। মহারাজা স্মিতমুখে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তাহার পিতার সাধুতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি অবগত আছেন যে, সাধুতার জন্যই তিনি ব্যবসায়ে এইরূপ উন্নতি করিয়াছেন। সেন-সাহেবের গৃহনির্ম্মাণে তাঁহার যে অসাধারণ স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া তিনি বলিলেন, দুই লক্ষ টাকায় যে এরূপ সুন্দর বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি শীঘ্রই তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এইরূপ ইচ্ছা জানাইলেন।

সুধীন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুনিল, তাঁহার পিতা শয়ন-গৃহে। সে নিজেও শ্রান্ত হইয়াছিল; নিদ্রাদেবীর উপাসনার জন্ম নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিদ্রা কোথায়? বাল্য-কাল হইতে সে রেবাকে দেখিয়াছে, তাহাকে ভালবাসিয়াছে। মাতাপিতার ইচ্ছা এবং কন্যারও মাতাপিতার ইচ্ছা সে উত্তমরূপেই অবগত ছিল। সে ও রেবা উভয়ে জানিত, তাহারা শীঘ্রই পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিতে হইয়াছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন সে দুঃখকেই বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

মহেশবাবুরও সমস্তরাত্রি অনিদ্রাতেই কাটিল। তিনি কি করিলেন? তাঁহার এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহার আজীবন অর্জ্জিত সাধুতার খ্যাতি, পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখ ও উন্নতির আশা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল! নিতাই পাল, যে তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিত এবং অসাধুতার জন্য অপমানিত হইয়া তাঁহার কার্য্যা-লয় হইতে বহিষ্কৃত হয়, সে আজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হারাইবে না—সে সর্ব্বত্র তাঁহার দুর্ব্বলতার কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিবে। তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর মন্দ হইয়াছে যে, সে সেদিনও তাঁহার নিকট কাতরভাবে একটি কর্ম্মের জন্য প্রার্থনা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি সে প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই।

চার

অতি প্রত্যূষে মহেশবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। তখনও সুধীনের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। 'শফার'কে তাঁহার গাড়ী আনিতে আদেশ দিলেন। গাড়ী আসিল। তিনি উঠিয়া আদেশ দিলেন, "জিতেনবাবুর বাড়ী।"

জিতেনবাবু এত ভোরে মহেশবাবুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন! বলিলেন, "এত সকালে! ব্যাপার কি?"

মহেশবাবু বলিলেন, "চল, বল্‌ছি।"

জিতেনবাবুর অফিস-ঘরে উভয়ে বসিলেন। মহেশবাবু জিতেনবাবুর হাত দুইটী ধরিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, আমি মহা অপরাধী! কিসে সবদিক্ রক্ষা পায়, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তোমার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য আমি তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। তাই তোমার কাছে দৌড়ে এলাম।"

জিতেনবাবু বলিলেন, "আপনি কি বলেন? আপনাকে আমি গুরুর মত দেখি। আপনার দৃষ্টান্ত দেখেই আমি আমার ব্যবসায়ে এত উন্নতি কর্‌তে পেরেছি। আপনার সাধুতার আদর্শ বাঙালীর ঘরে ঘরে অনুসৃত হোক্!"

"সাধুতা!" মহেশবাবু একপ্রকার অস্বা-ভাবিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সাধু কে? আমি চোর, আমি জুয়াচোর, আমি প্রতারণা করে' সকলকে ঠকাতে যাচ্ছিলাম—বিশেষতঃ, তোমাকে। সুধীন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমি কতদূর অন্যায় কর্‌ছিলাম। আমার গৃহিণীর শেষ মিনতি অনু-সারে তোমার কন্যাকে আমি গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ কর্‌বার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এ লক্ষ্মী-ছাড়া যে মা-লক্ষ্মীকে বরণ করে' নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তা' সুধীন ভালরূপেই বুঝিয়ে দিয়েছে।"

"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। রেবা নিশ্চয়ই আপনারই পুত্রবধূ হবে। সুধীন কাল বল্‌ছিল বটে, সে চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বে—কিন্তু সব ছেলেরাই ওই.

রকম বলে' থাকে। আমি জানি সে তার মত পরিবর্ত্তন করবে।"

মহেশবাবু বলিলেন, "তাহার বিবাহ অসম্ভব এবং সে আমারই জন্য। সব কথা শোন।" এই বলিয়া মহেশবাবু জিতেনবাবুকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। তারপর কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমার সব গিয়েছে—আমি পথের ভিখারী! আমার ব্যবসা কাল উঠিয়ে দিতে হবে! আমার নিজের জন্য ভাবি না। কিন্তু ছেলেটাকে কি কোনরকমে তুমি মানুষ করে' নিতে পার না? আমি জানি, সে রেবাকে ভালবাসে এবং সে যে আমার জন্য এই বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে' আজীবন দুঃখকে বরণ করে' নেবে একথা মনে করে' আমি কিছুতেই স্থির হ'তে পারছি না। আমার মাথার ঠিক নেই। তুমি একটা উপায় করতে পার কি?"

জিতেনবাবু বলিলেন, পাঁচমিনিট্ অপেক্ষা করুন। টেলিফোন্‌টি তুলিয়া লইয়া একটা নম্বর দেখিয়া বলিলেন, "হ্যালো, হজুরীমল জুয়েলার্স! জিতেন মুখার্জ্জী স্পিকিং। গুড মর্ণিং। দেখুন, একটা ভাল পান্নার চেন ও হীরা-পান্না বসান ভাল ঘড়ি দিতে পারেন? তৈরী আছে? পাতিয়ালার মহারাজা অর্ডার দিয়েছিলেন; য়ুরোপে গেলেন বলে' ডিলিভারি নেন নি? পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম? এখুনি আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন? বাড়ী ত জানেন? অল রাইট।"

মহেশবাবুর এমন একটা ঘড়ি-ঘড়ির চেন থাকা উচিত, যাহা দেখিয়া কেহ স্বপ্নেও বিশ্বাস করিবে না যে, তিনি ত্রিশ হাজার টাকার একটা চেন অপহরণ করিতে যাইবেন।

জিতেনবাবু পুনরায় আর একটা নম্বর দেখিয়া লইলেন, "হ্যালো! নিতাই পাল? জিতেন মুখার্জ্জী স্পিকিং। একটা পুরাণো বাড়ী মেরামতের ভার নিতে পারেন? হাজার ছয়েক টাকার কাজ। আমার হাতে কতকগুলা বড় 'বিজ্‌নেস' আছে; ওরকম ছোট কাজ হাতে নেবার সুযোগ নেই। মহেশবাবু আপনাকে আমার কাছে সুপারিশ করেছেন। শুনলাম, আপনার হাতে এখন কোন কাজ নেই। মহেশ-বাবুর 'ফার্ম' ওঠ ওঠ হয়েছে? কে বলে? হাঃ হাঃ হাঃ! আপনি শোনেন নি বুঝি? ওঁর ফার্ম ও আমার ফার্ম্ম একসঙ্গে সম্মিলিত করা হচ্ছে। হ্যাঁ, উনিই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হবেন বৈকি। আমাদের লাইনে এঁর মত অভিজ্ঞতা আর কার?"

আবার টেলিফোন্ ধরিয়া জিতেনবাবু বলিলেন, "কে? 'এসোসিয়েড প্রেস?' একটা সংবাদ ঘোষণা করবেন। মহেশ চাটুয্যের বিখ্যাত ফার্ম্ম শীঘ্রই জিতেন মুখুজ্যের ফার্ম্মের সঙ্গে সম্মিলিত হচ্ছে। এটাও ঘোষণা করতে পারেন যে, মহেশবাবুর জার্ম্মাণ-প্রত্যাগত পুত্র সুধীনের সঙ্গে জিতেনবাবুর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রেবারাণীর শুভ-বিবাহ কার্য্য আগামী মাঘের প্রথমেই সম্পন্ন হবে।"

মহেশবাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে জিতেনবাবুর টেলিফোনে কথাগুলি শুনিতেছিলেন! আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এতকাণ্ডও হইতে পারে!

যথাসময়ে সুধীনের সহিত রেবারাণীর বিবাহ হইয়াছিল। এবং কলিকাতায় এমন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাই, যিনি এই বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান নাই। বরকন্যার অসংখ্য যৌতুকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যৌতুক ছিল বরকে প্রদত্ত বরের পিতার আশীর্ব্বাদোপহার একটী পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পান্নার চেন ও হীরকাদিখচিত ঘড়ি।

জ্বালাতন

শ্রীঅসিতকুমার সেন

বিবাহিত জীবনে রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমোবার যো নেই। তবু আমার এক সুবিধা 'চ্যাঁ ভ্যাঁ' করবার জীব নেই এবং গিন্নীর গহনার ফরমাশও তেমন জোরাল নয়। তবুও—

এই দেখুন না সেদিন।

অফিস থেকে এসে কিছুই শুনি নি। বৃহস্পতিবার—মেল ডে—রাত সাতটায় ফিরে চা ও জলখাবার খেয়ে পাড়ায় 'ব্রিজে'র আড্ডায় খেলে বাড়ী ফিরলাম রাত দশটায়। ঠাকুরের কাছে শুনলাম—"মা-ঠাক্‌রুণ বায়স্কোপ গেছেন, মামাবাবুর সঙ্গে।"

মামাবাবুটী হচ্ছেন 'জগু'—আমার বড় কুটুম্ব। পাটনায় ওকালতী করেন—স্বাধীন ব্যবসা! খুশীমত বেড়াতে এসেছেন কোল্‌কাতায়, এবং বায়স্কোপ-থিয়েটার, উদয়-শঙ্করের নাচ—সব দেখে বেড়াচ্ছেন।

যা' হোক্, খাওয়া-দাওয়া সেরে জেগে থাকবার জন্যে রোমাঞ্চকর এক ডিটেক্‌টিভ উপাখ্যান পড়ছি—মনে হচ্ছে খুব পড়ছি—কিন্তু কখন যে চোখের দু'টি পাতা এক হয়ে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌তে গিন্নী বল্‌লেন—"বায়স্কোপ দেখে এলুম।"

বল্‌লাম—"ধন্য হলাম। আমি ভেবেছিলুম, ডাকাত পড়েছে বুঝি।"

গিন্নীর মনোহারী সাজ—গায়ে মাখা এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরপুর। দেখলাম—ঘুমন্ত চোখে; মনে হ'ল, বেশ! পাশ বালিশটা জড়িয়ে অন্ধকারে কাৎ হ'য়ে শুতে যাচ্ছি, গিন্নী বল্‌লেন —"বাবারে, বাবাঃ—কি ঘুম-কাতুরে! শোন না।"

হতাশভাবে বল্‌লাম—"ইচ্ছা কর, শোনাও। তবে সারাদিন অফিসে বড়বাবুর খেচামেচি—তার ওপর আবার আজ নিষেধের খেলায় জিৎ—মনে হয়, তুমি যদি আমার ওপর একটুখানি দয়া কর, তা' হ'লে বাঁচি। রাত একটা বাজে—তুমিও ছবির উত্তেজনা কাটাবার জন্যে মাথায় 'ওডিকলোন' দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে শুয়ে পড়।"

গিন্নীর মুখ গম্ভীর

নিরুপায়। প্রশ্ন করলাম—"কোন থিয়েটারে গিছলে?"

—"কালা না কি? বলেছি তো বায়স্কোপ।"

—"বাইশকোপ না তেইশকোপ?"

—"সে আবার কি?"

—"যে বায়স্কোপ কথা বলে তাকে তেইশস্কোপ বলি আমরা।"

—"এত রঙ্গও জান।"

—"তা' কোন্‌খানে গেলে?"

—"তা' মনে নেই—নামটা ছাই কি যেন—ওই যে হগ্ সাহেবের বাজারের কাছে।"

—"সেখানে তো অনেক বায়স্কোপ।"—

"জানি না অতশত—ভগবান বাঙালী মেয়ে করে' সব পথ বন্ধ করেছেন। তোমাদের মতন তো রোজ রোজ এটা-ওটা খেচ্ছে, স্ফূর্ত্তি করছে

ওখানে যাবার আমাদের সুযোগ-সুবিধা বা প্রভুর অনুমতি নেই। আমরা দাসী-বাঁদীর জাত—"

কথা কইলে তর্ক বাধবে। বল্‌লাম—"বক্তৃতা পরে শুনব। বল না, কোথা গিছলে ?"

—"কি করে' বলব ? প্রোগ্রাম কেনা হয় নি। বললুম জগুকে। সে বল্‌লে—'কিনে কি হবে; সব বুঝবে কি ?' যা' হোক্‌, ছেলেটার, মানে নায়কের কী গলা! ভয়ানক মোটা—খাদে যখন নামে, তখন ভাব্‌ছিলাম কি করে' গলা বা'র করে। কিন্তু কী বিশ্রী গলা কাঁপায়! হেসে মরি। মুখে রুমাল গুঁজে হাসির শব্দ থামাই। ষ্টেজের উপর লাল আলোয় ইংরিজিতে লেখা ছিল না কি—'চুপ কর'।"

—"ছেলেটার নাম কি ?"

—"বলেছি তো প্রোগ্রাম কেনা হয় নি।"

—"ওঃ! ভাবলাম—এবার বোধ হয় গিন্নী থামলেন। কিন্তু নাঃ—

—"কী সুন্দর বাজনা! আইসক্রিম খেলুম। ওদের হাতে খেতে কেমন লাগছিল। কিন্তু বাস্তবিকই ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর তোমাদের সেই বাঙালীর চির-পরিচিত দোকানে গিছলাম সেদিন—ছিঃ, আলগা গায়ে পরিবেশন করছে,—গায়ের ঘামে আর ঝোলে একাকার! খাও কি করে' ও সব জায়গায়। হ্যাঁ, তারপর শোন—জগু যখন 'বয়' বলে ডাকল, দেখি ইয়া লম্বা চওড়া একগাল দাড়িওয়ালা এক পঁয়তাল্লিশ বছরের জোয়ান এসে হাজির! বয় মানে তো জানি ছোট ছেলে। বিশ্রী কাণ্ড! তারপর আমাদের সামনের সিটে একটা গোরা আর একজন মেম বসেছিল—ব্যাপার দেখে লজ্জায় মরি! আমি আবার বেঁটে মানুষ—একবার এধারে মাথা ঘোরাই, একবার ওধারে ঘোরাই,—ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, অনেক লোক আছে, যারা পরের অসুবিধা বোঝে না—বা বুঝেও বুঝতে চায় না।"

"তা যা' বলেছ ঠিক। আবার অনেক ব'ঙালীকে দেখলুম' ছবি না দেখে ওদের দিকেই চেয়ে আছে। হ্যাঁ গা, তোমরা কি ওইজন্যেই যাও না কি বায়স্কোপে ? কী যে দেখ্‌তে! মা গো:—ঠোঁটে লাল রঙ, তোবড়ানো গালে একপুরু পাউডার, রুজ—হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত খোলা—ঘেন্না লজ্জা বলে' কিছু নেই। বলিহারি নজর তোমাদের!

—"তা' বটে। তা'হ'লে তুমিও দেখেছি ঐ সব দেখেছ, ছবি দেখ নি।"

—"মরণ আর কি আমার।"

—"আচ্ছা, গল্পটা কি বল এবার।"

—"গল্পটা কিছু কি বুঝেছি। ইংরিজি কথা—ইংরিজি পড়া তো ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত। তার-পর তোমার পাল্লায় পড়েছি—পড়াশুনো চুলোয় গেছে—ঘরসংসার নিয়েই—"

—"ঘর আছে, সংসার তো—মা ষষ্ঠীর কৃপা হ'ল না।"

—"যাওঃ।" ছাই গল্প—তার আবার বোঝা-বুঝি। দেখলাম একটা ছেলে আর মেয়ে প্রেমে পড়েছে। পড়ে' কেবল ফষ্টিনষ্টি কর্‌ছে—গান আর গান। শেষে নায়িকা মরে' গেল।"

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম; প্রশ্ন করলাম—"কে মরল ?"

—"নায়িকা। হাঁ—না না, নায়িকা তো মরে নি—সে অন্য এক বায়স্কোপে। গণ্ডগোল হ'য়ে গেছে—এর নায়িকা মরে নি।"

আর পারি না। ঢং করে' সেড়টা বাজল। বল্‌লাম—"নায়িকা হতভাগিনী।"

—"কেন ?"—গিন্নী প্রশ্ন করলেন।

—"কেন! মরলে সবার হাড় জুড়োত; তুমিও সকাল সকাল ফিরতে, আমিও একক্ষণ ঘুমুতে

পারতাম। আর নায়কও বাঁচত; তার হাড়ে বাতাস গেল।"

—"কেন গো, তাদের অত ভালবাসা।"

—"ভালবাসা! দেখতে, নায়িকা মরে' গেলে, আর একটা মেয়েকে নিয়ে ঠিক এমনই প্রেম-লীলা চলছে।"

"তা' তোমরা পার।"

—এবং তোমরাও পার। না না, চেও না। মানে তুমি না, তুমি বাদ দিয়ে; অর্থাৎ, বল্‌ছিলাম কি, ওদের দেশের মেয়েরা পারে—

গিন্নী চটে' উঠেছেন।

আবার বল্লাম—"দেখ, তুমি অন্যায় রাগ করছ। এ দেশ সতীর দেশ। তোমাদের জন্যেই তো ভারত এখনও ম্যাপে আছে। আমরা কি জানি না—'সতীত্ব সোণার নিধি বিধ-দত্ত ধন'—আমরা মরেও বেঁচে আছি, সে তোমা-দেরই জন্যে—আমার বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা হচ্ছে চেঁচিয়ে—তবে কি না দেড়টা বেজে গেছে—আর পাড়ার লোক খারাপ—"

—"যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না।"

মনে মনে বল্‌লাম, "তা' হ'লে ত বাঁচি; ঘুমুতে পারি।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে কাটল। গিন্নীর মাথায় তখন বায়স্কোপের ছবি ঘুরছে। তিনি গা ঠেলে বল্লেন—"শোন, কে একজন মরল। একজনকে মরতে হবেই, নয়?"

—"একজনকে নয়, সবাইকে মরতে হবে।' তবে তোমার বোধ হয় কনসার্টপার্টির যে কর্ণেট বাজায়, সেই মরেছিল।"

—"না তুমি ভারী ফাজিল। কিন্তু একটা ছেলেকে দেখলাম, চমৎকার দেখতে। আমারও মনে হয়েছিল, আর জগুও বল্‌ল, সেও মেয়েটার প্রেমে পড়েছে। ভারী সুন্দর দেখ্‌তে। প্রোগ্রাম থাক্‌লে দেখ্‌তে তার ছবি। আমার তাকে—"

কৃত্রিম বিস্ময় ও রাগ দেখিয়ে প্রায় বিছানা থেকে উঠে বসলাম—"এঁ্যা, তাকে ভালবেসেছ! উঃ—তাকে আমি, হাঁ্যা হত্যা করব! এক মেয়েরা দু'জনকে ভালবাসতে পারে না—হয় জগৎসিংহ নয় ওসমান। আমি কালই তাকে চ্যালেঞ্জ করে' পত্র লিখ্‌ব।"

গিন্নী যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। আর চুপিচুপি বলি, তিনি একটু বোকা ধরণের। বল্লেন—"এঁ্যা, বল কি! চিঠি পাঠাবে! তুমি কি পাগল হ'লে না কি। তাকে চেন?"

বেশ গম্ভীরভাবে আবার পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে বললাম—"হাঁ, পাঠাতুম চিঠি। সে থাকে নিশ্চয়ই হলিউডে—কিন্তু তার নাম বা ঠিকানা জানি না—আর প্রোগ্রামও নেই—এবং কেরাণীর পক্ষে আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।"

বুড়ো-বুড়ী

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

বুড়ো আর বুড়ী।

জীবন-যাত্রার পথ চলিতে চলিতে তাহারা পথের প্রায় শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। আর মাত্র একটু বাকী—এইটুকু চলিতে পারিলেই তাহাদের এই পথচলার শেষ হইয়া যায়!

দিনরাত বুড়ো বসিয়া বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক টানে। সূতা দিয়া বাঁধা, হাতল ভাঙা চশমাটা নাকের ডগায় আসিয়া বাধিয়া থাকে; তাহারি মাঝ দিয়া সে মাঝে মাঝে বুড়ীর দিকে চায়। সে দৃষ্টিতে কোন চঞ্চলতা নাই—সে দৃষ্টি কোন নীরব কথাও বলে না। উদ্দেশ্যহীন স্থির সে দৃষ্টি।

বুড়ো খাইতে বসে। বুড়ী আসিয়া বলে, এটা খাও, ওটা খাও।

না খাইলে বুড়ী অনুযোগ করে। বলে, আমার মাথা খাও—

বুড়োকে খাইতেই হয়।

সন্ধ্যার পরই সামান্ত একটু কিছু মুখে দিয়া বুড়ো শুইয়া পড়ে. নিদ্রা যাইতেও হয় ত বেশী দেরী হয় না!

বুড়ী সেই ঘরের নীচে বসিয়া মালা জপে আর মাঝে মাঝে তন্দ্রায় ঢুলিতে থাকে। আবার সোজা হইয়া বসে—আবার মালা ঘোরায়—আবার তন্দ্রায় ঢুলে।

এমনি করিয়াই বুড়ো-বুড়ীর দিন কাটিয়া যায়।

ইহাদের দিকে চাহিয়া হাসে অনুপম, হাসে অঙ্গুরিমা। বলে, আমাদেরও কি এমনই হবে?

অঙ্গুরিমা বলিয়া ওঠে, ধ্যৎ,আমি কিন্তু ঠাকুরমার মত এমন বুড়ী হ'তে পারব না।

অনুপম তাহার সোনার চশমাটা নাকের ডগা পর্য্যন্ত টানিয়া আনে; তাহার পর একটু কুঁজো হইবার ভঙ্গী করিয়া বলে, ঠাকুরদা'র মত আমি কিন্তু দিনরাত অমনি ফুড়ুক ফুড়ুক করেই তামাক টানব।

অনুপম তামাক টানিবার অভিনয় ক'রে।

অঙ্গুরিমাও তাহার হাসিমাখা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলে, বেশ, তা' হ'লে আমিও ঠাকুরমার মত এমনই ঠক্ ঠক্ করেই মালা ঘোরাব।

অঙ্গুরিমা চক্ষু বুজিয়া মালা ঘুরাইবার ভঙ্গী দেখায়।

অনুপম হাসিয়া বলে, কিন্তু তোমার ও ঠাকুমার মালা ঘোরাবার মাঝে একটু পার্থক্য রাখতে হবে।

অঙ্গুরিমা তাহার দিকে চায়।

অনুপম বলে, ঠাকুরদা' থাকেন বিছানায় ঘুমিয়ে, আর ঠাকুরমা বসেন ঘরের এক কোণে—এ কিন্তু তখন হবে না।

অঙ্গুরিমা জিজ্ঞাসা করে, তবে?

অনুপম উত্তর দেয়, বিছানার ওপর আমার কোলের কাছে বসে', বসে' তোমায় তখন মালা জপতে হবে।

ঠোঁট উল্‌টাইয়া অঙ্গুরিমা বলে, হ্যাঁ, বুড়োর কোলের কাছে বসতে আমার দায় পড়ে গেছে আর কি?

হাসিয়া অনুপম বলে, হ্যাঁ, আমিই বুড়ো হব, আর উনি কচি খুকিটাই থাক্‌বেন।

অনুরিমা একটু গম্ভীর ও চিন্তার ভাব দেখাইয়া বলে, তাও ত বটে।

তারপর তাহার মুখের উচ্ছ্বসিত হাসির ছটাকে যথাসম্ভব চাপিয়া অনুপমের মুখের কাছে মুখ লইয়া তাহাকে ডাকে, এই বুড়ো!

অনুপমও অমনি করিয়া উত্তর দেয়, কি বুড়ী?

ধ্যৎ, বলিয়া অনুরিমা হাসিতে হাসিতে অনুপমের কোলের উপর শুইয়া পড়ে। তাহার পর তাহার দুই মৃণাল বাহু দিয়া অনুপমের গলাটা জড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে—শেষে গলাটা নিজের দিকে একটু টানিয়াও আনে বোধ হয়।

নীচু হইয়া অনুপম তাহার এই ছোট্ট বুড়ীর মুখে আঁকিয়া দেয় তাহাদের ভালবাসার ছোট্ট একটী চিহ্ন!

তেমনি ভাবে থাকিয়াই অনুরিমা বলে, কে চায় বুড়ো-বুড়ী হ'তে! এমনি থাকুক, ও গো, আমাদের চিরকাল এমনিই থাকুক!

বর্ত্তমানের উপাসক তাহারা, তাহারা খেলিতে চায় শুধু যৌবনের খেলা, অতীতের স্বপ্ন তাহরা দেখিতে চায় না—ভবিষ্যৎ তাহাদের কাছে শুধু অন্ধকার। এই যৌবন, এই মোহ, এই রস এরও যে শেষ হইতে পারে, তাহারা তা' ভাবিতে পারে না। তাই বুড়ো-বুড়ী তাহাদের চক্ষে শুধু বুড়ো-বুড়ী। কিন্তু তাহারা যদি নিমেষের জন্য এই বুড়ো বুড়ীর অতীত জীবনটা একবার দেখিতে পাইত! সেই জীবনের পরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে যবনিকা পড়িয়া রহিয়াছে, সে যবনিকা এই তরুণ দম্পতী আজ তুলিতে পারে না। যদি পারিত, তবে তাহারা আজ বুঝিত যে ওই বুড়ো-বুড়ীর চিরদিনই শুধু বুড়ো-বুড়ীই ছিলনা। যৌবনের রূপ-রস-গন্ধে উহাদের জীবনও একদিন পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের যৌবনের সেই মত্ততা ইহাদের যৌবনের এই মত্ততায় চাহিতে একটুও ত কম ছিল না—

পাড়াগাঁয়ের বিয়ে বাড়ী।

একটি ছেলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া চারিদিক দেখিতেছে। সকলের মুখেই তাহার প্রশংসা। কর্ত্তারা একবাক্যে বলিতেছেন, রমেশ যেন একাই একশ'। তার জন্য কোনদিকে কোন ত্রুটীই হচ্ছে না; নইলে ত্রুটী-বিচ্যুতির অবধি থাকত না। আর সব ত কেবল ফক্কিবাজ!

কথাটা মিথ্যা নয়; রমেশ একাই চারিদিক নজর রাখিয়াছে। বিয়ের আসর সাজান হইতে পরিবেশন পর্য্যন্ত সব স্থানেই সে আছে।

কন্যার বিবাহে গৃহস্থের ঝক্কি ত কম নহে!

একদলের পরিবেশন শেষ হইয়া গেল। লুচির ঝাঁকাটা নামাইয়া রমেশ ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, বৌদি', আমায় দুটো পান।

রমেশ এ বাড়ীর ছেলে নয়। ও পাড়ার রায়েদের ছেলে। এই বৌদি'টিও রমেশের সম্মুখে তেমন করিয়া বাহির হয় না। তাহার উপর ভাঁড়ারের কাজে তখন সে ব্যস্ত। তাই কমলাকে বলিল, যা ত ভাই, রমেশ ঠাকুরপোকে দু'টো পান দিয়ে আয়।

সিঁড়ির পাশেই ভাঁড়ার-ঘর। সিঁড়ির উপরে রমেশ দাঁড়াইয়াছিল। পান লইয়া কমলা সেখানে আসিল এবং রমেশের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নিন্।

কমলাকে দেখিয়া রমেশের মাথায় একটা খেয়াল আসিল। একটু হাসিয়া তাহার হাত দুটো দেখাইয়া বলিল, এ দুটো-ই এঁটো,

কাজেই—এই বলিয়া রমেশ নির্ব্বিকারচিত্তে হাঁ করিল।

কমলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সেও এ বাড়ীর মেয়ে নয়। এ তার পিসীমার বাড়ী। এই বিবাহোপলক্ষ্যে এখানে সে আসিয়াছে। আসিয়া অবধি রমেশকে সে বহুবারই এ বাড়ীতে দেখিয়াছে। তাহার সম্মুখে নানাকাজে তাহাকে আসিতেও হইয়াছে হয় ত অনেকবার। সুতরাং, রমেশ তাহার নিতান্ত অপরিচিত না হইলেও তেমন পরিচিয় নাই।

কিন্তু একজন তাহার দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহারই সম্মুখে সে পান হাতে করিয়া নীরবে শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবে ইহাও ত চলে না। তাই নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই কমলা একটা পান ধীরে ধীরে রমেশের মুখে উঠাইয়া দিল।

মুখের মধ্যে পানটা লইয়া আর একটা বলিয়া রমেশ আবার হাঁ করিল।

এবার কমলা তাহার পানে চাহিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। পানটা লইয়া মুখ বুজিতে গিয়া রমেশ কমলার একটা আঙুলই কামড়াইয়া বসিল।

কমলা উহু বলিয়া হাতখানা টানিয়া লইল।

রমেশ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়াই এঁটো হাত দিয়া কমলার সেই হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই ত, লাগল ?

কমলার চোখ মুখ আরও লাল হইয়া উঠিল। না, লাগে নি বলিয়া হাতখানা টানিয়া লইয়া ত্রস্তে সেখান হইতে এক প্রকার ছুটিয়া পলাইল।

রমেশ সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সারা মুখখানা তাহার এক আনন্দের হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার পর মুখের পান দু'টো পকেটে রাখিয়া নিজমনেই বলিল, রইল এ দুটো স্মৃতিচিহ্ন হয়ে—

বিয়ের গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে। বর-কনে বাসরে। বাহিরের সকলের আহার শেষ হইয়াছে। বাড়ীর লোকেরাও বাকী নাই। এই বার মেয়েদের—সেখানেও রমেশ।

বৌদি'র পাশেই বসিয়াছিল কমলা। অনেক জিনিষ দিয়াই রমেশ তাহার পাতটা একেবারে ভরিয়া দিয়াছে। তথাপি ঘুরিয়া-ফিরিয়া যাচাই করার আর শেষ হইতেছিল না। অবশেষে যখন বৌদির পাতে দিতে গিয়া মাছের প্রকাণ্ড মুড়োটা কমলার পাতে দিয়া বসিল তখন বৌদি' বেশ একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিল। অন্য মেয়েরাও সে হাসিতে নীরবে যোগ দিল।

কমলার মনে হইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া পাতের এই মাছের মুড়োটাও যেন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে !

ইহার দিনকয়েক পরের কথা। এবাড়ীর মেয়ে-মহলে তখন রমেশেরই কথা আলোচনা হইতেছিল। গৃহিণী বলিতেছিলেন, সত্যি, ছেলের মত ছেলে এই রমেশ। সুন্দর চেহারা, পাশও করেছে অনেকগুলো—মনে কোন অহংকার নেই, শান্ত সুবোধ ছেলেটী। তার ওই মিষ্টি-স্বভাবের জন্য ও সকলের প্রিয়।

কমলার মা বলিলেন, এমন ছেলের আশা করাই ত আমাদের পাগলাম ঠাকুরঝি।

একথা কমলাকে ইঙ্গিত করিয়া; সুতরাং, তাহার এখানে আর বসিয়া থাকাও চলে না—অথচ, এখান হইতে উঠিতেও যে মন চাহে না।

সেই বৌদি'টী কহিল, রমেশ ঠাকুরপোর মায়ের কাছে একবার কথাটা পেড়ে দেখুন না মা। হয়ত সুন্দর বউ পেলে বুড়োর টাকার খাঁই কমলে কমতে পারে।

কমলার মা কহিলেন, হ্যাঁ ঠাকুরঝি, একবার চেষ্টা করে' দেখলেই বা ক্ষতি কি ?

যাহাকে লইয়া কথা তাহাকে তখন দেখা গেল গৃহের বাহিরে। বারাণ্ডা দিয়া রমেশ তখন এই বাড়ীর বড় ছেলের গৃহের দিকে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই গৃহিণী ডাকিলেন, রমেশ।

কাকীমা, বলিয়া রমেশ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকলের পানে একবার করিয়া চাহিয়া লইল! কমলার পানে চাহিল তিনবার।

গৃহিণী বলিলেন, আয়।

রমেশ তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কমলাকে দেখাইয়া গৃহিণী বলিলেন, দেখ্ ত এ মেয়েটী কেমন রমেশ?

কমলার পানে আর একবার চাহিয়া রমেশ বলিল, বেশ।

গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, করবি বিয়ে আমার এই ভাইঝিটীকে?

এতগুলি মেয়েদের সম্মুখে বিনা দ্বিধা-সঙ্কোচে সে বলিয়া ফেলিল, করব।

গৃহিনী অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন; আর সকলেও ইহাতে যোগ দিল।

ছোট্ট একটী মেয়ে, সে ত হাসিতে হাসিতে একেবারে উল্টাইয়া পড়িল। আর বলিতে লাগিল, ওমা, রমেশদা' নিজেই নিজের বিয়ের কথা বলে!

কমলার মাথাটা ক্রমেই মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে লইয়া রমেশ সেখান হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ইহারই ঘণ্টাখানেক পরে রমেশ যখন সিঁড়ি দিয়া নীচের দিকে নামিতেছিল, তখন অৰ্দ্ধপথে তাহার দেখা হইয়া গেল কমলার সঙ্গে, সে তখন সিঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল। রমেশের কোল হইতে সেই ছোট মেয়েটি বলিয়া উঠিল, এই যে তোমার বউ রমেশ দা'।

লজ্জায় কমলার সমস্ত মুখখানাই লাল হইয়া উঠিল। রমেশের মুখের দিকে কমলার চক্ষু পড়িল; দেখিল, সে মুখ টিপিয়া দিব্য হাসিতেছে। কমলার কান পর্য্যন্ত এবার লাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু কিছুই হইলনা।

রমেশের মা বলিলেন, কমলার মত বউ ঘরে আন্‌তে কার না সাধ। রমেশের বাপের যে অসাধ তাহাও নয়। কিন্তু বুড়ো হাঁকিয়া বসিল তিন হাজার। এর একটী পয়সাও কম চলিবে না।

তিন হাজার ত দূরের কথা। কমলার মায়ের তিনশ' দিবারও সঙ্গতি ছিল না। আশা ছিল, মেয়ের রূপ দেখিয়া যদি বুড়ার মন গলে। কিন্তু রূপ দেখিয়া গলার মত মন রমেশের পিতার ছিল না। যাহাতে মন গলিতে পারিত, কমলার মায়ের তাহা ছিলনা।

তাই অনেকের মনের আশা মনেই রহিল।

কমলারা আজ এখান হইতে চলিয়া যাইবে। এ কয়দিন রমেশ আর এ বাড়ীতে আসে নাই। ইচ্ছা করিয়াই আসে নাই। কমলার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ তাহার যেন সঙ্কোচ হয়; মনও তাহার শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে! স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে! পিতার উপর কোনদিন কোন কথা সে বলিতে পারে নাই—আজও তাহা পারিবে না।

কমলাদের যাত্রার দিনে অনেক চেষ্টা করিয়াও সে নিজের সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার পা দু'টা যেন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া এই বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দিল।

বৈকালের গাড়ীতে কমলারা যাইবে। দুপুর রৌদ্রের মাঝ দিয়া এতটা পথ ভাঙ্গিয়া দেখা করিতে আসার সময় এ নয়। একবার ভাবিয়াছিল ফিরিয়া যায়; কিন্তু যাই যাই করিয়াও সে যাইতে পারিল না।

সেই সিঁড়ি—ঠিক সেইদিনকার মতই আজও অপ্রত্যাশিতভাবে অর্দ্ধপথে তাহার দেখা হইয়া গেল কমলার সঙ্গে।

কিন্তু কমলাকে দেখিয়া আজ তাহার মুখের হাসি ফুটিয়া উঠিল না। তাহাকে দেখিয়া কমলারও চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল না। সে কেবল স্থিরদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে চোখে যেন কিসের প্রশ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। ওই উদাস-দৃষ্টির মাঝে কি সে প্রশ্ন? সে কি বলিতে চায় আজ রমেশকে?

হয় ত কিছু নয়—হয় ত রমেশেরই দেখিবার ভুল। কিন্তু তখনও ত কমলা রমেশের মুখের উপর হইতে তাহার সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় নাই।

রমেশের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। তাহার স্বপ্ন কি স্বপ্নই রহিবে!

কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কমলাকে আজ যেন তাহার নূতন করিয়াই মনে হইতে লাগিল। এই যে মেয়েটী ইহাকে সে ত হারাইতে পারিবে না—ইহাকে হারান তাহার চলিবেও না।

দূরের কি একটা গাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘুঘু নিরন্তর ডাকিয়া চলিয়াছে। এমনি দুপুরে ঘুঘুর এমনি ডাক সে ত অনেকবারই শুনিয়াছে। কিন্তু ওই ডাকের মাঝে কোন অর্থ কোনদিনই সে ত খুঁজিয়া পায় নাই। তবে আজ কেন তাহার মনে হয়, ও যেন নিরন্তর ডাকিতেছে ওর কোন হারাণ প্রিয়াকে, ও ডাক যে শুধু ব্যথায় ভরা!

কমলাকে হারাইলে রমেশের বুকখানাও ব্যথায় কি এমনই ভরিয়া যাইবে? না,—পাইয়া সে হারাইতে পারিবে না—হারাইয়া অমন করিয়া খুঁজিতেও সে পারিবে না।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কমলা সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল। রমেশ কোন কিছু ভাবিয়া দেখিল না—হয় ত দেখিবার অবসরও পাইল না। ব্যাকুল হইয়া ডাকিল কমলাকে।

রমেশের ডাকে কমলা আবার দাঁড়াইল।

দু'টা সিঁড়ি ভাঙিয়া কমলার একটু নিকটে আসিয়া রমেশ কহিল, চল্‌লে তা' হ'লে কমলা?

অর্থহীন এ প্রশ্ন—কি-ই বা এর উত্তর!

রমেশ আবার কহিল, কিন্তু যদি তোমায় যেতে না দেই?

যেতে না দেই—কমলা চাহিল রমেশের পানে, কি বলিতে চায় রমেশ তা' হ'লে?

যে চওড়া ধাপটার উপর কমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই উপর আসিয়া কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রমেশ বলিতে লাগিল, বাড়ী যাচ্ছ, যাও—কিন্তু সে ত তোমার বাড়ী নয়। বাড়ী তোমার এখানে···তোমার বাড়ীতে ফিরিয়ে তোমায় আমি আনবই—

এবারও কমলা কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ে সে চাহিয়া রহিল, রমেশের পানে!

রমেশ তেমনিই আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল; তোমাকে ফিরিয়ে আনতে হয় ত আমার দেরী হবে—হয় ত আজ হবে না—হয় ত কালও নয়। কিন্তু যে দিনই হোক্ না কেন, তোমার সত্যিকারের গৃহে তুমি একদিন ফিরে আসবেই।

রমেশের দিকে চাহিয়া, তাহারা কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া কমলার অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত রহিয়া রহিয়া আশায়, আনন্দে বারবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

রমেশ বলিতে লাগিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয় ত আমার দু'দিনের। কিন্তু মনে হয় দু'দিনের ত নয়, এ পরিচয় যেন যুগ-যুগান্তের। যাবার আগে তুমি শুধু এইটুকু বলে' যাও কমলা, যে দিনই হোক না কেন তোমায় আনতে গিয়ে ফিরে আমায় আসতে হবে না। বল কমলা, আজ শুধু এইটুকু বলে যাও!

কমলা কি বলিবে! বলিবার শক্তি তাহার কোথায়! রমেশের কথায় সে আত্মহারা হইতেছিল—মনে হয় আজ যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু রমেশ? রমেশ কি তাহার মুখের ভাষাও পড়িতে পারে না?

মুখের ভাষা রমেশ পড়িতেই পারিল। মুহূর্ত্তের জন্য হয় ত একবার দ্বিধা করিল—হয় ত করিল না। দুই হাত বাড়াইয়া কমলার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে সে তাহার ব্যগ্র ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল, আমার দাবী আমি পাকা করে' নিলুম। কিছুতেই যেন এ দাবীর কথা তুমি আমি কোনদিনই না ভুলি!

উপন্যাসের নায়িকাদের মত রমেশের চুম্বনে কমলা আবেশে রমেশের বুকের উপর একেবারে এলাইয়া পড়িল না। শুধু নীরবে নীচু হইয়া রমেশের পায়ের উপর একবার মাথা ছোঁয়াইল।

ইহার দুই-একদিন পরের কথা নয়—অনেক দিন পরের কথা। রমেশের বাবা মরিয়া গিয়া টাকার দাবী ছাড়িয়া গেলেন। তখন কমলাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনায় রমেশের আর কোন বাধা রহিল না। তারপর এক শুভদিনে রমেশ কমলাকে বধূ করিয়া ঘরে লইয়া আসিল।

তারপর তাহাদের বিবাহিত জীবন। তাহার দিনগুলি যে কি করিয়া কোনদিক্ দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাহা তাহাদের কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কমলা ভাবে, কবে, কোন্ জীবনে সে কি পুণ্য করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার জন্য তাহার আজ এই সুখ!

রমেশ ভাবে, মানুষের জীবনে ইহার চাইতে আর কি-ই বা বেশী কামনা থাকিতে পারে!

কমলাদের সেই বিদায়-দিনের কথা যখন ওঠে, কমলা তখন হাসিতে থাকে। তাহার পর বলে, তোমার সেই আশীর্ব্বাদ কোন মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ভুলি নি। তাই ত যখন অন্যস্থানে বিয়ের কথা উঠল, তখন মায়ের পায়ের কাছে বসে' তোমার কথা, বল্লাম—তোমার আশ্বাসের কথা। শুনে মায়ের আমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুই সুখী হবি কমলি! সে কথা আজ ভাবি; মনে হয়,—ভাবি, আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হয় নি।

রমেশের সেই মুখের পান পকেটে রাখার কথা উঠিলে, কমলা হাসিতে হাসিতে একেবারে গড়াইয়া পড়ে। বলে, তুমি কি গো?

উঁহাদের ছেলেখেলারও অন্ত ছিল না। হয় ত কোনদিন দিনে কমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, রমেশ ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিল। তাহার পর তাহার মাথায় আসিল এক বিচিত্র খেয়াল। কালি দিয়া বধূর মুখে ছোট করিয়া একটী গোঁফ চিত্র করিয়া দিল; তাহার পর তাহাকে জাগাইয়া গম্ভীরভাবেই বলিল, মা তোমায় অনেকক্ষণ ধরে' ডাকছেন, শীগ্গির যাও।

কমলা শাশুড়ীর কাছে গিয়া বলিল, আমায় ডাকছেন মা?

বধূর পানে চাহিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, না রমেশটা দেখ্ছি দিন দিন নিতান্ত পাজি হ'য়ে উঠছে। তাহার পর বধূকে কহিলেন, না মা ডাকি নি। তুমি যাও মা, তোমার মুখটা ধুয়ে ফেল গে।

বধূ চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। পুত্র পুত্র-বধূর দিকে চাহিয়া তাহার সারা অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া যাইত। পুত্র সুখী হইয়াছে ভাবিয়া তাহার সুখের আর সীমা থাকিত না!

কমলা কিন্তু বুঝিতে পারিল না শাশুড়ী মুখ ধুইবার কথা কেন বলিলেন। বুঝিতে না পারিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া নিজের মুখখানা দেখিয়া প্রথমে সে লজ্জিত হইল; তাহার পর ক্রোধ, শেষে হাসিতে হাসিতে একেবারে গড়াইয়া পড়িল।

কমলাও একদিন ইহার প্রতিশোধ দিল। তাহার মত রমেশও সেদিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কমলা আসিয়া তাহার গালের পাশে মাখাইয়া দিল একটুখানি সিন্দুর। তাহার পর তাহাকে তুলিয়া দিয়া বলিল, ও গো, তুমি পিসীমার বাড়ীতে ছুটে যাও। সিঁড়ি থেকে পড়ে' গিয়ে বৌদি' যেন কেমন হ'যে পড়েছেন। দাদা তোমাকে এ খবর দিয়ে ডাক্তার বাড়ীতে গেছেন। যাও তুমি, আর দেরী কর না।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া ছুটিল! কিন্তু সে গৃহে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে দেখিতে পাইল সেই বৌদি'টিকেই! আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ব্যাপার কি বৌদি', আপনি না কি সিঁড়ি থেকে পড়ে' গেছেন?

বিবাহের পর রমেশের সঙ্গে বৌদি' কথা কহিত; অবাক্ হইয়া বলিল, আমি?

রমেশ কহিল, হাঁ, কমলা ত তাই বলে।

রমেশের মুখের সিঁদুরের চিহ্নটী এইবার ধুনুটির চক্ষে পড়িল। কৌতুক হাসিতে তাহার সমস্ত মুখখানাই ভরিয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে একখানা ছোট আয়না আনিয়া সেখানা রমেশের হাতে দিয়া বলিল, দিন দিন তোমরা হ'লে কি ঠাকুরপো?

মুখ দেখিয়া রমেশ বুঝিতে পারিল, এ তাহার সেইদিনকার কার্য্যেরই প্রতিশোধ।

এমনি করিয়াই হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ করিয়া তাহাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

ইহার পর যেদিন রমেশ জানিতে পারিল যে, তাহাদের গৃহে আসিতেছে একটী নূতন অতিথি, সেদিন রমেশ যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কমলাকে বুকে ধরিয়া, আদর করিয়া, সোহাগ জানাইয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল—তাহাকে আদর করিয়া তাহার যেন আর আশা মেটে-না। কমলা যেন তাহার চক্ষে আজ এক রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে!

তাহার পর যখন একটি শিশুর জন্ম হইল, তখন রমেশ যেন আবার নূতন করিয়াই মাতিয়া উঠিল। এই শিশু, এ যেন রমেশের চক্ষে আজ এক পরম বিস্ময়! তাহার পুত্র তাহার রক্তের একটি ধারা, একথা ভাবিতেও যে তৃপ্তিতে তাহার চিত্ত একেবারে ভরিয়া উঠে।

রমেশ পুত্রের নাম রাখিল চিত্তপ্রিয়।

তাহার পর এই শিশুকেই কেন্দ্র করিয়া রমেশ আর কমলার ভালবাসা যেন দিন দিন আরো গাঢ় হইতে লাগিল।

ইহার পর পঁচিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। চিত্তপ্রিয় বড় হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে। রমেশ রায় পুত্রের বিবাহ দিয়া একটী লক্ষ্মী পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছে। বধূর সেবায়, তাহার যত্নে রমেশ রায়ের সমস্ত প্রাণ ভরিয়া থাকে। কমলার মুখে পুত্রবধূর প্রশংসা আর ধরে না। বলে, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

কিন্তু সংসারে হয় ত পরিপূর্ণ সুখ কাহারো চিরকাল থাকে না—রমেশ রায়েরও তাহা রহিল না। তাই দু'দিনের আগে পিছে পুত্র আর পুত্র-বধূ দুরন্ত রোগে সংসার ছাড়িয়া অনন্তের পথে

যাত্রা করিল। যাত্রার পূর্ব্বে তাহারা রাখিয়া গেল, ক্ষুদ্র এক শিশু।

এ আঘাত কমলা সহ্য করিতে পারিল না। সে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রমেশ রায় বুকের আগুন বুকে রাখিয়াই পৌত্রটীকে বুকে তুলিয়া লইল। ওর মাথায় দু'-চারটি সাদার পাশে যে সমস্ত কালো চুল ছিল, দুই দিনের মধ্যেই তাহা পাকিয়া একেবারে সাদা হইয়া গেল।

তাহার পর?

তাহার পর আর কি?

দিন যায়, মাস যায়,বছর যায়, কালের ঘড়িও থামে না, সে চলিতেই থাকে।

পৌত্র খেলিয়া বেড়ায়। সঙ্গী সেনেদের মেয়ে অনু। অনুর সঙ্গে সে খেলা করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে, অভিমান করে, আবার ভালও বাসে।

ঝগড়া হইলে রমেশ রায় তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দেয়। তখন রমেশ রায়কেই চোর সাজাইয়া চোখ বাঁধিয়া তাহাদের আবার খেলা সুরু হয়।

খেলার জীবন শেষ হইল; স্কুলের জীবনও ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। এইবার সহরে যাইতে হইবে। কিন্তু জীবনের এই একমাত্র বন্ধনকে ছাড়িয়া থাকিতে কমলা চাহে না। কিন্তু পৌত্রের ভবিষ্যৎ! অন্ধ মায়ায় তাহাও ত নষ্ট করা চলে না।

সুতরাং চক্ষের জলের মধ্য দিয়াই একদিন পৌত্রকে বিদায় দিতেই হয়।

কলেজের ছুটী হইলেই পৌত্র ঠাকুরদা'র ও ঠাকুরমার কাছে ফিরিয়া আসে। ছুটির দিনগুলো তাহাদের কাছে কাটাইয়া ছুটি ফুরাইলে আবার সহরে ফিরিয়া যায়।

সেনেদের অনুর বিয়ে। হয় ত শীঘ্রই—দিন এখনও ঠিক হয় নাই। পাত্র নিজে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে এবং পছন্দও হইয়াছে। এইবার দেনাপাওনার কথা মিটিলেই সব ঠিক হইয়া যায়।

পরীক্ষার পূর্ব্বে ছুটি না পাইয়াও পৌত্র বাড়ী আসিল। আসিয়া পূর্ব্বের মত হাসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইল না। মুখ তাহার গম্ভীর, তাহাতে চিন্তার রেখা।

ঠাকুরদা' জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল দাদু?

পৌত্র কথা কহেনা। নীরবে চাহিয়া থাকে।

সে চাহনি ঠাকুরদা'র ভাল লাগে না। অস্থির হইয়াই আবার জিজ্ঞাসা করে,কি হয়েছে দাদু ভাই?

ঠাকুরদা'র পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে পৌত্র ধীরে ধীরে বলে, অনুকে কি তোমার ঘরে নিয়ে আস্‌তে পার না দাদু?

ঠাকুরদা' চাহিয়া থাকে পৌত্রের মুখের পানে। তাহার চক্ষের সম্মুখে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে বহুদিন পূর্ব্বের একখানা ছবি—সেই রমেশ, সেই কমলা, দুইজন দুইজনকে পাইবার মনে মনে সেই কামনা। পাইবেনা ভাবিয়া সেই ব্যথা, আবার পাইয়া সেই আনন্দ, নরনারীর সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা···

ঠাকুরদা হাসিয়া বলে, এই কথা? এর জন্য এত ভাবনা চিন্তা! আচ্ছা, অনুদিদিকে আমি তোমার হাতেই এনে দেব।

পৌত্রের সারা মুখখানা আনন্দে ভরিয়া যায়। ঠাকুরদা'র পায়ের উপর মাথাটা তাহার নামিয়া আসে।

তাহার পর একদিন কমলার মত অনুও এই বাড়ীর বউ হইয়া আসে।

* * *

কিন্তু আজ এই বুড়ো-বুড়ীদের দেখিয়া কেউ হয় ত একবার ভুলিয়াও ভাবিতে পারেনা যে, ইহারাই বহুদিন পূর্ব্বের সেই রমেশ আর সেই কমলা।

স্নেহের পরশ

শ্রীশৈলেশ রায়, বি-এ

দু'দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার উপায় নাই।

সকালবেলায় মনীশ তাহার বসিবার ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া পর পর পাঁচটা সিগারেট নিঃশেষ করিয়া ষষ্ঠটা ধরাইয়া ফেলল, এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে হাঁকিল,—মধু, চা দিয়ে যারে।

বাসায় মনীশ ও পুরাতন ভৃত্য মধু ছাড়া আর কেহ নাই। মা এখানে থাকেন না, ছেলের উপর রাগ করিয়াই ইদানীং দেশের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তাই এখানে মনীশ বাড়ীর আরাম পায় না—কোনমতে দু' হাত দিয়া দিন ঠেলিতেছে, এই মাত্র।

ভৃত্য এক হাতে চায়ের পেয়ালা এবং অন্য হাতে একখানি রেকাবিতে করিয়া সাজান কতকগুলি খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। মনীশ কাগজ হইতে চোখ ফিরাইয়া খাবারগুলির উপর নজর পড়ায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল! কারণ, ইহা তাহার দৈনন্দিন রুটিনের বহির্ভূত। কহিল, আ রে! এ সব তুই করেছিস্ কি? এতগুলো—

পাত্রগুলি টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে মধু উত্তর দিল, আমি কি করবো বাবু, ওবাড়ীর দিদিমণি দিয়ে পাঠালেন যে।

মনীশ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত কহিল, দিয়ে পাঠালেন কি রকম? তুই চাইতে গিয়েছিলি না কি?

কথায় বেশ একটু ঝাঁজ ছিল। মধু পুরাতন লোক। বাবুর রাগ হইলে যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তাহা তাহার জানিতে বাকী নাই। তাই এতটুকু হইয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি চাইতে যাব কেন? দিদিমণি এ সব নিজে তৈরি করেছেন কি না—তা' ছাড়া, বাজারের জিনিস ত আপনি খানও না।

কাল অনেক রাত্রেই মনীশকে বাসায় ফিরতে হইয়াছিল এবং পাচকের সহসা অন্তর্দ্ধানে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাও বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তাই মধুর উপর অত্যন্ত বিরক্তি এবং ক্রোধ প্রকাশ করিবার পর সে যখন শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনীশ বিরক্তির সঙ্গে বলিল, নিয়ে যা এ-গুলো আমার চোখের সাম্‌নে থেকে।

মধু অনুতপ্তভাবে বলিল, আমার অপরাধ হয়েছে বাবু। আপনি এগুলো খেয়ে নিন। নইলে—বলিয়া সে একবার ওপাশের জানালার দিকে চাহিল। মনীশ তাড়াতাড়ি কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ দিয়া বলিল, নিয়ে যা' বল্‌ছি হতভাগা।

মধু এক পা আগাইয়া আসিয়া কহিল দিদিমণি—

ক্রুদ্ধমনীশ আর একবার এই বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাইতে গিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ওপাশ হইতে পনের-ষোল বছরের একটী মেয়ে হাতে মসলার পাত্র লইয়া তাদেরই দিকে আসিতেছে। তার সারা মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই হাস্যধারায় যেন হঠাৎ এখানকার এতক্ষণের ক্রোধের উচ্ছৃঙ্খল ধোঁয়াটে বাতাস এক নিমিষে শান্ত হইয়া গিয়াছে।

মসলার পাত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মেয়েটি হাসিয়া কহিল, আপনার চেঁচামেচি শুনে মা আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন, ব্যাপার কি বলুন ত?

মধু সোৎসাহে কহিল, তুমি ত জান বাবু বাজারের জিনিষ খান না, তাই আমি বললুম, দিদিমণি এসব নিজে—

মধুর নির্ব্বুদ্ধিতাকে মনীশ মনে মনে ভয় করিত। পাছে সে এ মেয়েটির কাছে সব কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এগুলো কি মানুষে খেতে পারে।

মেয়েটি আবার হাসিল, কহিল, পারে। আপনি ত রাত্রে কিছুই খান নি। খেয়ে ফেলুন। চায়ের পেয়ালার দিকে চোখ পড়িতেই কহিল, চা-টা ত জল হয়ে গেছে দেখছি। আমার সঙ্গে এস ত মধু, আমি চা তৈরী করে' দি, বলিয়াই সে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে তেমনি ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এবং দুরন্ত বাতাস পশ্চিমদিকের বড় অশ্বত্থ গাছটাকে লইয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিল।

দুই

মাস ছয়েক আগের একটা দিনের কথা মনীশের মনে পড়িল —যে দিন প্রথম এ মেয়েটি তার চোখে পড়ে। সে সময় মা এখানে। দুপুরবেলা কি একটা পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে কলেজ বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল এবং বই হাতে নীচের সিঁড়িগুলি পার হইয়া উপরের ঘরে ঢুকিতেই যে জিনিষটি প্রথম তাহার চোখে পড়িল, তা' তাহাকে শুধু বিস্মিত নয়, অভিভূত করিয়া ফেলিল। একহারা সুন্দরী একটি মেয়ে, তাহার সেল্‌ফের বইগুলি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র মেয়েটি বেশ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং তাহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাহার অবস্থা সঙ্কট দেখিয়া মনীশের বারংবার এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল যে, আজ তাহার নিজেরই ঘরে সে যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে।

সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইতেই মেয়েটি কোনমতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। বইগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া মনীশ খাটের উপর এলাইয়া পড়িল এবং তাহার চোখের সামনে বারবার সেই লজ্জারুণ মুখখানি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ওপাশের ঘর হইতে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বলিতেছেন, এ কি অনু, এর ভেতরেই তোমার ও ঘরের কাজ হয়ে গেল মা?

মেয়েটী কহিল, আজ আর বই গোছান হ'ল না মা, আর একদিন হবে। আজ আর ইচ্ছে করছে না।

ঘন্টাখানেক পরে মা আসিয়া মনীশকে দেখিয়া বলিলেন, তুই কখন এলি মন্ট?

মনীশ হাসিয়া কহিল, আমি ত অনেকক্ষণ এসেছি মা। কিন্তু যে মেয়েটিকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলে আমার পুঁথি-পত্তর তল্লাস করতে, তা'কে কিন্তু বমাল শুদ্ধ গেপ্তার করেছিলুম। বেচারা শেষটা চোরের মত পালিয়ে রক্ষা পেলে, নইলে—

মা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, নইলে কি করতে শুনি? পুলিসে দিতে?

মনীশ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, না, পুলিশে দিতাম না—তোমার কাছেই নিয়ে যেতাম বিচারের জন্য।

মা হাসিয়া বলিলেন, বিচারে আমি কি রায় দিতুম জানিস্? ওকে বেকসুর খালাস দিয়ে, ঘরের লক্ষ্মী করে'—

সখানে ঘরে তুলে নিয়ে আসতুম। তারপরেই সহসা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, না বাপু, তোর হাসবার শ্রী দেখে গা আমার জলে যায়। আমার একটা ছাড়া ছেলে নেই; আমার কি ইচ্ছে করে না একটি সুন্দর বউ এনে মনের সাধ-আহ্লাদ মেটাতে? ওকেই তোকে বিয়ে করতে হবে।

চকিতে একবার সে স্নিগ্ধ-সুন্দর মুখখানি মনীশের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; তবু সে গম্ভীর হইয়া কহিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা? সামনেই একজামিন, আমার কি ছাই ওসব ভাববারও সময় আছে?

মা বলিলেন, বেশ মেয়েটি! আমি রোজই ওকে ডেকে নিয়ে আসি। দেখতেও যেমন সুন্দর, লেখাপড়াও তেমনি ভাল—এবার ফার্ষ্ট হয়ে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। ওর বাবা-মাও বড় ভাল-মানুষ। তাঁরাও বড় ধরে' পড়েছেন। এ কাজ তোকে করতেই হবে বাপু, তা' 'কিন্তু বলে' দিচ্ছি, বলিয়াই শেষের দিকটায় তিনি যেন রাগ করিয়াই উঠিয়া গেলেন।

তারপর মনে পড়িল সে কেমন করিয়া মায়ের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ এবং ক্রোধের বাণ তাহার একজামিনের পড়ার দুর্ভেদ্য রক্ষাকবচের দ্বারা প্রতিহত করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। মা শেষে বিরক্ত হইয়াই দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং শেষবার বলিয়া গেলেন, আমি কথা দিয়ে এসেছিলুম; কিন্তু এমুখ আমি আর তাদের দেখাতে পারব না।

কি-একটা দরকারী কাজের জন্য মাকে লইতে বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছিল। গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া আর একবার মনীশ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, আমাকে না বলে' তুমি এদের কেন কথা দিলে মা!

মা ম্লান হাসিলেন; বলিলেন, যে অধিকারে দিয়েছিলুম, তার মর্য্যাদা ত তুই রাখলি নে মনু! বলিয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি বা চোখের জল রোধ করিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তিন

যতদূর দেখা যায় সেই দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময় মনীশের মনে হইল, গাড়ী বহুক্ষণ তাহার চোখের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল এবং যে রাস্তাটা বরাবর ময়দানের দিকে গিয়াছে সেই দিকেই চলিতে লাগিল। আজ মাতৃত্বের অভিমান, ব্যথা এবং সর্ব্বোপরি মায়ের চোখের জল গোপন করিবার চেষ্টা সমস্তই তাহার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এবং যে কারণটীতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারই রূঢ়তা আজ তাহাকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। ইহারই সূত্র ধরিয়া। তাই বারংবার এই কথাটাই তাহার মনে হইতে লাগিল—সে ভাল কাজ করে নাই। মায়ের সমস্ত সম্ভ্রমটুকু সে দু'পায়ে দলিত করিয়া দিয়াছে!

মাঠের নীচে শীর্ণকায়া নদী বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই পাড়ে ঘাসের উপর সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িল এবং নিরতিশয় ব্যথিতের মত সে মায়ের কাছে প্রার্থনা করিল, আমায় ক্ষমা কর মা! আমার এই অবাধ্যতা তোমার বুকে যে কতখানি আঘাত করেছে, তা' আমি তখন বুঝতে পারি নি! আমার এত স্পর্দ্ধা কিসের যে, তোমাকে পর্য্যন্ত অপমান করতে পারি!

আজ একজামিনের পড়া তার কাছে অসার এবং তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে ছিল এবং মায়ের

শেষ কথাগুলি অমোঘ সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মনীশ চিরদিনই মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, এবং অমন মায়ের সন্তান হওয়ার জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিত। কিন্তু তাহার এই ক্ষণিক অসাবধানতার জন্য সে যে তাঁহাকে কতখানি অপমানিত করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তখন হইতেই তাহার ব্যথিত ক্ষুব্ধ হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল।

রাত্রের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে সে নিস্তব্ধ নদীতীর হইতে উঠিয়া পড়িল এবং কোনমতে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত বাড়ীখানা যেন উদাসীন এবং নিস্পৃহের মত পড়িয়া রহিয়াছে! সে আসিয়াছে বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহাদের আর কিছুই নাই, এমনিই মনে হইতে লাগিল।

সে টলিতে টলিতে মা যে ঘরে শুইতেন, সেই ঘরের মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। তার মায়ের হাতের সাজান সংসারে সমস্ত ছোটবড় কাজগুলি তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। ওপাশের দরজা খুলিলেই অন্নুদের বাড়ী যাওয়া যায়। ওই পথ দিয়াই মেয়েরা এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত করেন। আজ মা যাইবার সময় মেয়েটি যে কিভাবে চোখের জল ফেলিয়াছিল, তাহা ভাবিতে ভাবিতে তার নিজের চোখ দিয়া যে কখন এক সময় জল বাহির হইয়া পড়িল, তাহা সে নিজেও জানিতে পাইল না।

মধু কি একটা কাজে বাজারে গিয়াছিল। এ ঘরে আলো দিতে আসিয়া বাবুকে এ অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল! কহিল, এ কি বাবু, এখানে শুয়ে যে? উঠুন, ও ঘরে বিছানা করা হয়েছে।

আচ্ছা চল, বলিয়া মনীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং ঘর হইতে বাহিরে যাইবে, এমনি সময় মনে হইল, ওবাড়ী হইতে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতেছে। মধু তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিতেই মন্নুর মা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, দিদি আজ চলে' গেলেন, তাই তোমার খাবার বন্দোবস্ত আমাদের এখানেই করেছি। তুমি এস।

মনীশ ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, আপত্তি করলে শুনবো না বাবা। অন্নু সারা সন্ধেটা ধরে' কি সব তৈরী করেছে, তোমায় যেতেই হবে।

মনীশ প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, চলুন, বলিয়া তাঁহারই সহিত দরজা পার হইয়া ওবাড়ীতে প্রবেশ করিল।

চার

এমনি করিয়া একদিন অপরিচিতের সঙ্কোচ দূর হইয়া এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার যেরূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা মনীশকে আনন্দই দান করিল, এবং তাঁহাদের স্নেহের স্নিগ্ধ অবলেপে কখন যে তাহার অনুশোচনায় ব্যথিত চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কাল বাড়ী হইতে মায়ের চিঠি আসিয়াছে। সেখানকার সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি খবরে তাহা পরিপূর্ণ; অথচ, তাহার সম্বন্ধে মাত্র সে শারীরিক কেমন আছে, ইহাই তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। নিজের শরীর ও মন সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখেন নাই। মনীশ অনেকবার চিঠিখানি পড়িয়াছে। এখন উহা চোখে পড়িতেই সে একটি নিশ্বাস ফেলিল; বুঝিল, মায়ের অভিমান ইহার প্রতি ছত্রে আত্মপরিচয় দিতেছে, এবং মনীশের সুখ দুঃখ, হাসি উল্লাস কিছুই যেন তাহার আর জানিবার আবশ্যক নাই—অথচ, আজ মায়ের শেষ কথা কয়টি তাহার মনে যে দাগ কাটিয়া দিয়াছে

তাহা ত তাঁর জানা নাই! এ দাগ যেমন সত্য, তেমনি আকস্মিক। মুহূর্ত্তের মধ্যে সামান্য ঘটনায় মানুষের মনের যে কতখানি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা মনীশ বিশ্বাস করিতে পারিত না; হাসিয়া বলিত, ওটা মানুষের দুর্ব্বলতা। কলেজে তাহার সমপাঠী একটি ভাল ছেলের কথা তাহার মনে পড়িল। জীবনে হঠাৎ একটি সামান্য কারণে তাহার যে কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহারই দৃষ্টান্ত দিতে সে নিজের প্রথম জীবনের একটি দিক্ দেখাইয়া বলিয়াছিল, এন্ট্রান্স পাশ করতে পারলুম না—পড়তুম না বলে, আড্ডা মেরে বেড়াতুম বলে। ফেল্ হওয়ার জন্যে অনুশোচনাও আমার কিছু হয় নি। রাত্রে ঘুমিয়েছিলুম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাবা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি মাকে বল্‌ছেন, কানুর ফেল্ হওয়ায় আমার পাঁজরার একখানা হাড় যেন ভেঙ্গে গেল। সহসা আমার মনের কি জানি কি অবস্থা হ'ল—চোখের জল আর কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। সেই রাত্রে উঠে তাঁর পায়ে মাথা রেখে বললুম, আপনার অবোধ ছেলেকে ক্ষমা করুন! আজ থেকে আমি আর আপনার কোন কষ্টের কারণ হব না।

মনীশ চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে বলিল, হয়ই ত, এমনিই হয়। তাহারও এমনিই হইয়াছে, অনেকেরই এমনিই হয়।

সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরী নাই। ওবাড়ী দু'দিন যাইতে পারে নাই বলিয়া একমাত্র অনুর বাবা খবর লইতে আসিয়াছিলেন। উঠিবার সময় একপ্রস্থ আশীর্ব্বাদ করিয়া আসল কথাটীর ইঙ্গিত এবং মায়ের খবর ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত নীচের রাস্তায় নামিয়া তাহাকে একেবারে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া মনীশ আবার ফিরিয়া আসিল এবং পাশের পড়ার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল।

মায়ের অভাবে সংসারের বিশৃঙ্খলা তাহার আর কিছুই চোখে পড়ে না। তাই সে নিজের পাঠের অবকাশে মাঝে মাঝে ভাবে, মধু ক্রমশঃ উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে; কখনও হাসিয়া বলে, তোর সংসারে সুখেই আছি মধু; বেশ, বেশ! বলিয়াই চায়ের কাপটায় চুমুক দেয়। মধু নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়া হাত কচলাইয়া বলে, না বাবু, আমি আর কি করছি, ওবাড়ীর অনু দিদিই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেন।

বস্তুতঃ মা যাইবার পর হইতে অনুই এ সংসারের অনেকখানি ভার লইয়াছে। এই উদাসীন লোকটির একক জীবন তাহার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে এবং ইহারই সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলি করিতে তাহার আনন্দই হয়।

মধুর কথা শুনিয়া মনীশ রুক্ষ হইয়া বলে, না না, এতটা ভাল নয় রে। তাকে কেন আবার এর ভেতরে টেনে আনিস্? নিজে ত এ সংসারেই চুল পাকালি; নিজেই কেন তুই এসব দেখে-শুনে নিতে পারিস না?

মধু জবাব দেয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে নিজের কাজ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া যায়।

পাঁচ

কাল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে উৎকণ্ঠার বোঝাটা তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল, তা' আজ তার মন হইতে অপসারিত হইয়া শরীরটাকে হাল্কা করিয়া দিয়াছে। তাহার আর যেন ভাবিবার কিছুই নাই, বুঝিবার কিছুই নাই—একটানা অবসাদ তার সারা দেহমনকে আবরিত করিয়া রহিয়াছে।

পাঁচ-সাতদিন পরে সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল এবং সকালবেলায় চা পান করিতে করিতে মধুকে সংসার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিল।

আকাশ আজ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; কোথাও আর কাল মেঘের টুকরা দেখা যাইতেছে না। এতদিনকার অবিচ্ছিন্ন একঘেয়ে বৃষ্টির পরে আকাশের এই নির্মলতায় তার চিত্তের গ্লানি যেন অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালবেলায় মনীশ যেমন মধুকে চায়ের জন্য তাগাদা দেয়, আজ তা' দিল না। হাসিয়া কহিল, চল মধু, আর কেন, এবার বাড়ী যাওয়া যা'ক্। জিনিস-পত্রগুলো বেঁধে নে; আজই যাব। বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আমি ও বাড়ীতে চা খেতে যাচ্ছি, অমনি বাড়ী যাওয়ার কথাও বলে আসব। বলিয়াই বিস্মিত পুরাতন ভৃত্যের দিকে আর না চাহিয়াই বাহির হইয়া গেল। চা খাবার এবং বিদায় সমস্তগুলি সারিয়া বাসায় ফিরিয়া বেলা বারটায় যখন সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন একই সময় অমূর এবং তার নিজের মায়ের মুখখানি তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

গাড়ী বাঁশি বাজাইয়া ছাড়িয়া দিল। মনীশ মনে মনে একটু হাসিয়া কহিল, ভালই হইল—মায়ের অভিমান এবং অমূর ব্যথা উভয়ই সে একই সঙ্গে মিটাইয়া ফেলিতে পারিবে। বলিয়াই সে পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ম্যাচবাক্সের উপর বার দুই ঠুকিয়া ধরাইয়া ফেলিল এবং সজোরে টানিতে টানিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও কৃষক লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চাষ করিতেছে, কোথাও উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ বালকের দল হাত দিয়া গাড়ীর দিকে দেখাইয়া হাসিতেছে, কোথাও গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় ছেলেমেয়ের দল ডালে ঝুলনা বাঁধিয়া ঢুলিতেছে। এই সব এবং এমনি আরও কত কি সে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। ইহাদের এই অতি সাধারণ ব্যাপারগুলিও মনীশের চিত্তে আনন্দের ধারা বহাইয়া দিল।

সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময় তাহাদের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই মনীশ নামিয়া পড়িল এবং মধুকে জিনিস-পত্রের ভার বুঝাইয়া দিয়া সে বরাবর বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া চলিল।

বাড়ীর অঙ্গনে পা দিয়াই মনীশ 'মা' বলিয়া ডাকিল।

কে মণ্ড, এলি বাবা? বলিয়াই মা আজ মনীশকে কচি ছেলের মত বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁর মাতৃত্বের অভিমান যে সন্তানের স্পর্শে অশ্রুধারায় রূপান্তরিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতেও পাইলেন না!

মনীশ মায়ের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, আমার সে অপরাধের জন্য অভিমান করে' তুমি আমায় ছেড়ে চলে এলে, সে অপরাধের শাস্তি আমি যথেষ্ট পেয়েছি মা, আমায় তুমি ক্ষমা কর! তা' ছাড়া ওদের আমি জানিয়ে এসেছি, তোমার কথার আর নড়চড় হবে না। বলিয়াই সে মুখ নীচু করিল।

মার সজল চোখের কোণে হাসির ঝলক ফুটিয়া উঠিল। তিনি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

অন্তরাল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

নিতান্তই চিন্তাহীন অন্যমনা। হেমন্তের সান্ধ্য-আকাশের মত মেঘের উপদ্রবও নাই; কিন্তু সেই নির্মেঘ স্বচ্ছতার মাঝে অবসন্নতা আছে অনেকটুকুই।

এম্‌নি শূন্যমনে প্রকাশ জানালা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যা অনেকখানি রাত্রির কোলে গড়াইয়া গিয়াছে। অফিস্-ঘর বন্ধ করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া গেলেও চলে; তবু সে আগ্রহও প্রকাশের ছিল না। তার কারণও একটু ছিল। অফিস-ঘরে আর শয়ন-গৃহে তার সত্যকারের পার্থক্য বিশেষ কিছুই ছিল না।

—নমস্কার!

প্রকাশ চমকিল 'নমস্কার' কথাটায় নয়, যে মোলায়েম মিহি সুরটুকু ওই অতি-সাধারণ কথাটাকে বহন করিয়া আনিল, তাহাতেই তার চমক্ লাগিল!

দরজার সাম্‌নের যুবতীটি বলিল,—দয়া করে' যদি আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে দেন একবার—

প্রকাশ একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। আরে এই যে বলিয়া সে টেলিফোনের হোল্ডারটা তুলিয়া মেয়েটার দিকে আগাইয়া দিল।

মেয়েটী টেবিলের এ-দিকের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেলিফোন্ কাণে লাগাইয়া ডাকিল হ্যালো!

প্রকাশ যেন কোনো কথাই শুনিতেছেন না, মুখের এম্‌নি একটা নির্লিপ্তভাব করিয়া সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কোন্ অজ্ঞাত বন্ধুর সহিত কথা বলা শেষ করিয়া মেয়েটী টেবিলের উপর একটী চৌকোনা দুয়ানি রাখিয়া দিয়া বলিল, ধন্যবাদ আপনাকে—

প্রকাশ যেন হতভম্ব হইয়া গেল! তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বলেন কি! আপনি দরকারে পড়ে' একবার—তার জন্যে আমাকে পয়সা নিতে হবে? এতখানি শাস্তি নাই বা দিলেন!

মেয়েটী খুব মিষ্ট একটুখানি হাসিয়া দুয়ানিটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। উঃ, তুচ্ছ একটা দুয়ানির মোহে সে ওই অমূল্য হাসিটুকু হইতে বঞ্চিত হইতেছিল! প্রকাশ যেন তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিল।

বাড়ীখানা প্রকাশেরই। তিনতলা বাড়ীর অধিকাংশই ভাড়াবিলি করা; অর্থাৎ, দোতলার ফ্ল্যাট্ লইয়া থাকেন একটী পরিবার; আর তেতালার চারখানি ঘরের দু'খানি প্রকাশের খাসদখলে; বাকী দু'খানি ঘর খালিই ছিল—সম্প্রতি মাস দুই হইল ওই মেয়েটী এবং তাহার স্বামী আসিয়া অধিকার করিয়াছেন।

মেয়েটী চলিয়া যাওয়ার পর প্রকাশ আর অনর্থক অফিস-ঘরে বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করার কোনো অর্থই দেখিতে পাইল না 'কলিং বেল্ টিপিয়া উপরতলা হইতে চাকরকে ডাকিয়া তাহাকে অফিস ঘর বন্ধ করিতে বলিয়া নিজে উপরে উঠিয়া গেল।

শোবার-ঘরে আসিয়া ইজি-চেয়ারে পা ঢালিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে মেয়েটী বারান্দা হইতে বলিল—আপনাকে

আবার একটু বিরক্ত করবো প্রকাশবাবু, যদি কিছু মনে না করেন।

প্রকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

—আজ্ঞে, এই যে, আসুন না।

মেয়েটী ঘরের ভিতর আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—দেখুন—

প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

বলিয়াই কিন্তু নিজের কথায় নিজেই সে ভারী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; কারণ, বসিবার ঘরে ইজি-চেয়ার ছাড়া আর কোনো চেয়ার ছিল না। ঐ ইজি-চেয়ার, আর শুইবার জন্য বিছানা পাতা ওই খাটখানি!

প্রকাশ হঠাৎ চড়া-গলায় চাকরটাকে হাঁক্ দিল। তারপর তেমনি উষ্মার সহিতই বলিল—ব্যাটাকে একশোদিন বলেচি, অন্ততঃ একখানা চেয়ার এ-ঘরে এনে রাখ্‌তে, তা' যদি…

মেয়েটী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল—যেন সে প্রকাশের এই অপ্রস্তুত ভাবটুকু বেশ রসিকতার সঙ্গেই উপভোগ করিতেছে। আস্তে আস্তে সে বলিল—নাই বা হ'ল চেয়ার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার কথাটা শেষ করে' ফেল্‌তে পার্‌বো। অর্থাৎ, সে যেন বলিতে চায়—এখানে জাঁকিয়া বসিয়া সে গল্প করিতে আসে নাই। তা' সত্যই। লজ্জায় প্রকাশের মুখও কাণ দুটা লাল হইয়া উঠিল।

মেয়েটী বলিল—আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আমার স্বামী আজ সমস্তদিন বাড়ী ফেরেন নি। সেই সকালবেলা বেরিয়েচেন, ভাত খেতে পর্য্যন্ত আসেন নি। টেলিফোনে খবর নিলুম, তারাও কিছু বল্‌তে পার্‌লে না।

প্রকাশ বলিল—বলেন কি? সমস্ত দিন বাড়ী ফেরেন নি?…কোনো কিছু বিপদ হ'ল না ত?

মেয়েটী বলিল—না হওয়াটাই আশ্চর্য্য—বিশেষ করে' তাঁর মতো লোকের! বলিয়া সে খুব ক্ষীণ একটুখানি হাসিল।

প্রকাশ রীতিমত উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রশ্ন করিল—তা'—তা'—বলুন, আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।

মেয়েটী বলিল—করবার কী-ই যে আছে, তা'ও ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

—তবে?

বাবুর হাঁক-ডাক শুনিয়া চাকরটা একেবারে একখানা চেয়ার সমেত আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

প্রকাশ তাহার পানে চোখ পাকাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই মেয়েটী বলিল, উঃ আপনি এমন ব্যস্তবাগীশ! আচ্ছা, এই বস্‌চি—বলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া কহিল, ভাগ্যিস্, আজ এই বিপদের দিনে আপনার মতো লোকের আশ্রয়ে এসে পড়েছিলুম—

প্রকাশ রীতিমত অপ্রতিভের স্বরে কহিল—কী যে বলেন!—

মেয়েটী বলিল—তা' সে যাক্! এখন কি করা যায় বলুন ত? সেই পরামর্শই চাই আপনার কাছে!

পরামর্শ? প্রকাশ পরামর্শ কী-ই বা দিবে? ইহাদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা সে জানে!

সে হতবুদ্ধির মতো বলিল, তা'—তা'—আপনার স্বামীর কোথায় থাকা সম্ভব তা' ত আমি জানি নে।

মেয়েটী হাসিয়া বলিল—আমিও যে জানি নে; তাই ত হয়েচে মুস্কিল! এই কোল্‌কাতা সহরের ভেতর কোথায় যে তিনি থাক্‌তে পারেন, আর কোথায় যে না পারেন, তা' কেউ বল্‌তে পার্‌বে না।

—তবে ?

মেয়েটী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—আমি ত মেয়েমানুষ। ওই 'তবে'র জবাব আমিই ত চাই আপনার কাছে।

প্রকাশ বলিল—বলেন ত টেলিফোন্ করে' দিই—

মেয়েটী বলিল কোথায় ? কোল্‌কাতার অলিতে গলিতে পাগ্‌লা-ঘণ্টি বাজিয়ে দেওয়া সম্ভব না' ; আর তাতে লাভও কিছু হবে না ত।

প্রকাশ একেবারে চুপ্। তবে আর কী-ই বা সে করিতে পারে ? কী সাহায্য চায় ওই নারী ?

মেয়েটীও খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া পরে মাথা তুলিয়া একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাঃ, এ নিছক্ আপনাকে বিরক্ত করাই হচ্চে। খোঁজাখুঁজির কোনো পথই যখন খুঁজে পাচ্চি নে, তখন আপনিই বা কী করবেন ? নমস্কার !

বলিয়া সে আর একটুও অপেক্ষা না করিয়া বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার চির-জাগ্রত চির-বিক্ষুব্ধ পল্লীর বুকেও অনেকখানি অবসাদ নামিয়া আসিয়াছে—চির-অশান্ত সাগরের বুকে ভাঁটার অবসন্নতা ! শুধু দূরে এবং অদূরে কোথায় একখানা রিক্‌শা গাড়ীর টুং টুং শব্দটি সেই নিস্তব্ধতার মাঝে প্রাণের স্পন্দনটুকু জানাইয়া দিতেছে মাত্র !

প্রকাশের চোখে ঘুম ছিল না ; থাকা সম্ভবও নয়। বয়স ত তার মোটে পঁচিশ-ছাব্বিশ। বিবাহ করে' নাই ; করিবেই না বলিয়া মনস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এ-হেন নিঃসঙ্গতার মাঝে আজিকার ঘটনাগুলা তাহার কাছে দস্তরমত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিছানায় পড়িয়া থাকা সম্ভব নয়। বারাণ্ডায় আসিয়া সে পায়চারি শুরু করিল।

চৈত্র-রাতের এলোমেলো বাতাস তার মুখে চোখে ঝাক্‌ড়া চুলগুলিতে আঘাত করিতে লাগিল। সেই উতল বাতাসের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আজ কেমন করিয়া তার মনে হইতে লাগিল, বাঁধা-ধরা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে জীবনের পথ চলা, তার ত সত্যিকারের কোনো মাধুর্য্যই নাই। প্রকৃত মাধুর্য্য যা' কিছু, আনন্দ যা কিছু, তা' ওই এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খলতায় ! নহিলে, দক্ষিণা বাতাস আজ শুধু দক্ষিণেই না বহিয়া এত উদ্দাম হইয়া এমন দিশাহারা হইয়া ছুটোছুটি করিতেছে কেন ? আর, কেবল ওই টুকুর জন্মই আজ সে তাহাকে দেহে নয়, সারা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে ! সত্যই, বাতাসকে প্রকাশের কোনোদিনই এতখানি ভাল লাগে নাই, যেমন আজ লাগিতেছে।

সামনের রাস্তা দিয়া একখানা মোটর ছুটিয়া গেল। কী উদ্দাম গতিতেই না ছুটিতেছে ! মোটরে বসিয়া একটি পুরুষ আর একটি নারী ! না, চোখের ভুল নয়, ঠিক সে দেখিয়াছে। কী উদ্দামতা তাহাদের প্রাণে !...এই ত সত্যিকারের আনন্দ !

প্রকাশের মনে হইল, তার নিজের অন্তরাত্মাও আজ অমনি উল্কার মত ছুটিয়া চলিতে চায়। কোথায় ? তা' সে জানে না। জানিবার প্রয়োজনই বা কী ? শুধুই ছুটিয়া চলার আনন্দ বই কিছুই নয় !

...নাঃ, একখানা মোটর না কিনিলে তার কোনোরকমেই আর চলে না ! আজ তার নিজের মোটর থাকিলে এই মুহূর্ত্তে সে গ্যারেজ হইতে তাহা লইয়া নিজেই হাঁকাইয়া রাস্তায়

বাহির হইয়া পড়িত।···চাই কি, মোটরে করিয়া সে ত ওই বিপন্না মেয়েটীর স্বামীর খোঁজে পথে পথে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে পারিত! হয় ত মেয়েটীও তার সঙ্গে থাকিত, পিছনের কেউ সে...হয় ত বা ঠিক তার পাশে বসিয়াও···

নিজের অসংলগ্ন চিন্তার গতিতে প্রকাশ আপনার মনেই হাসিল। তারপর কিছুক্ষণ রেলিঙে ভর দিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে ওদিকের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

জানলায় শার্সি আঁটা ফিকে নীল আলোতে ঘরের ভিতর একটা স্বপ্নের আবেষ্টনী। মেয়েটী বিছানার উপর নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে—যেন কোন্ রূপকথার নির্য্যাতিতা রাজকন্যা হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—সারাদিনের দুশ্চিন্তায় —হয় ত বা অনাহারে অতিরিক্ত ক্লান্তিতে···

কিন্তু, কে, তা'ত নয়! হঠাৎ ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ দেয়ালের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তেমনি চোরের মত দাঁড়াইয়া যখন সে নিজের ঘরে ফিরিবে, অথবা কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, সেই সময় সশব্দে দরজাটা খুলিয়া গেল এবং প্রকাশ নিজের ঘরে পলাইবার আগেই মেয়েটী একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিব্য সহজ সপ্রতিভ-কণ্ঠে মেয়েটি বলিল—থাক্, ভালোই হয়েচে যে, এখনো আপনি জেগে। কি বলে' যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো!···

অর্থাৎ, সে নিশ্চিত বুঝিয়াছে, তাহারই জন্য আজ প্রকাশের চোখে নিদ্রা নাই!···প্রকাশ মরমে মরিয়া গেল।

মেয়েটী বলিল—আমি আপনার ঘরেই যাচ্ছিলুম। একা মেয়েমানুষ আমি এই ঘরে! আমাদের ত বিশেষ কিছু নেই—সম্বলের মধ্যে এই গয়নার বাক্সটী। তাই এটা আপনার কাছে রাখতে চাই। বলিয়া ছোট একটী হাত বাক্স আঁচলের তলা হইতে বাহির করিয়া প্রকাশের দিকে আগাইয়া দিল।

প্রকাশ সেটী হাতে লইতেই মেয়েটী বলিল—ঘরে যান্, ঘুমোন্ গে, রাত হয়েচে।

বলিয়া আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ঘরে আসিয়া প্রকাশের মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ছি ছি ছি, এতবড় নীচ সে কেমন করিয়া হইল! ভদ্রলোকের মেয়ে, পরস্ত্রী—স্বামী তার একটা দিন ঘরে নাই বলিয়া···

সকালে যখন চাকর তাহার ঘুম ভাঙাইল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। চাকর বলিল, একটী বাবু—পুলিশের লোক না কি—ও-ঘরে ডাক্‌ছেন আপনাকে।

পুলিশের লোক? ও-ঘরে?···

প্রকাশের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে কোন-রকমে মুখে-চোখে জল দিয়াই আঁচলে মুছিতে মুছিতে বারান্দা ঘুরিয়া একেবারে এ-ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

সত্যই, পুলিশই ত!

সব-ইন্সপেক্টার বলিলেন, নমস্কার! এটা বিভূতিবাবুর ঘর ত!···আমি এঁর ঘর সার্চ্চ করবো। বসুন্।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? বিভূতিবাবু কোথা?

সব-ইন্সপেক্টরবাবু সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন, তিনি উপস্থিত হাজতেই আছেন।

—সার্চ্চের কারণটা কি ?

—কারণ আর এমন কি! আমাদের 'ইন্‌ফরমেসন' হচ্চে, এ ঘরে একটা ডাকাতির মাল আছে।

ডাকাতির মাল !

দরজার আড়ালে বিভূতির স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিল। প্রকাশ তাহার দিকে চাহিতে গিয়া দেখিল, সেও তাহারই মুখের পানে চাহিয়া। মেয়েটী ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

ওই আশুদৃষ্টি দিয়া সে সব কথাই বলিয়া ফেলিল না কি ?

প্রকাশ বুঝি আর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না!—মুখখানা তার ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্ করিতেছে। নিজের ঘরে যাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু তাহারও উপায় নাই যে! কোনো দোষে দোষী না হইয়াও সেই যে এখন সত্যিকারের আসামী! বিভূতির সহিত তাহাকেও হাজতে পচিতে হয় বুঝি! আর পুলিশ ত বিভূতির ঘরে কোনো কিছুই পাইবে না—কিন্তু তার নিজের ঘরে ?

জোর করিয়া নিজেকে অনেকখানি ঝাঁকানি দিয়া লইয়া প্রকাশ চাকরকে ডাকিল এবং বলিল, ওরে, এঁদের সকলের জন্তে চা তৈরী করে' আন্ দেখি। আর চুরুটের বাক্সটা—

সার্চ্চ শেষ হইয়া গেল। সব্-ইন্সপেক্টার-বাবু হতাশ হইয়া বলিলেন, যাক্, বেঁচে গেলেন ভদ্রলোক।

পরে একবার দরজার পাশে যেখানে বিভূতি দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া লইয়া কতকটা যেন কৈফিয়তের কণ্ঠে বলিলেন,—বড় জঘন্য আমাদের কাজ, জান্‌লেন প্রকাশবাবু। দেখুন্ না, ভদ্রলোককে অনর্থক কতখানি হায়রাণ হ'তে হ'ল।

প্রকাশ বলিল—তা' ত বটেই!

পুলিশ বিদায় হইয়া গেলে প্রকাশও আর সেখানে মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল, এবং বিছানার উপর কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

কাল ওই মেয়েটার জন্য প্রকাশের মনে কতই না উদ্বেগ, কতই না দুশ্চিন্তা! উহারই এতটুকু দুঃখ ঘুচাইতে পারিলে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিত! কিন্তু এত নীচ—এত কুটীল সে! জানিয়া-শুনিয়া এ কী বিপদের মেঘ তাহার চারিপাশে পুঞ্জীভূত করিয়া দিল!...আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! ঐ রূপের আড়ালেএতখানি ছলনা!...

আজ সমস্ত দিনের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করিবার, এমন কি, তাহার এতটুকু খবর লইবারও তার স্পৃহা রহিল না। কিন্তু, এমন রাগ করিয়া বসিয়া থাকিবারও উপায় নাই।

এখনোও যে সেই জিনিষগুলো তাহারই ঘরে! তাহাদের বিদায় না করিলে নিস্তার নাই! তাই, নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও আবার তাহাদের ঘরে আসিতে হইল। সঙ্গে লইল সেই হাত-বাক্সটি।

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে। অন্ধকারের ধূসরতা ঘরের ভিতর পাখা মেলি-তেছে; অথচ আলো জ্বালিবার সময় হয় নাই।

মেয়েটী বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া-ছিল। পায়ের শব্দে একেবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—এই যে, প্রকাশবাবু, বাক্সটাও এনেছেন যে! বলিয়া সে যেন বহু-কাল পরে প্রাণ ভরিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

রাগে বিরক্তিতে প্রকাশের অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তবু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

—না, বসবো না। এটা রেখে দিন।

—তা' ত রাখ্‌বোই। আমার গুণধর স্বামী সিকি দামে ডাকাতির মাল কিনেছেন; বিস্তর লাভ করবেন। কিন্তু আপনি না থাক্‌লে এর সবটুকু ভেস্তে যেতো, তাই বা ভুলি কেমন করে' বলুন ত? ...বসুন, বসুন, আপনি বিছানাতেই বসুন; আমি ওই মেঝের ওপরেই—বলিয়া সে একেবারে প্রকাশের হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দিল।

প্রকাশ হতভম্বের ন্যায় বসিয়াই রহিল। মেয়েটি হঠাৎ একটুখানি সশব্দে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—সারাদিন আমি তাই ওই কথাটাই ভেবে হাসি চাপতে পারচি নি প্রকাশবাবু। আপনি সত্যিই আমার স্বামীকে বাঁচালেন বটে; আসলে কিন্তু উপলক্ষ ত আমি। আমি যদি আমি না হতুম, তা'হ'লে কাল আপনি যা' করেচেন, তা' কখনই সম্ভব হ'ত না। সেই জন্যেই ত ভাবি, বঙ্কিমবাবু 'সুন্দর মুখ' সম্বন্ধে ওই যে কি-একটা কথা বলে' গেছেন, সেটা মিথ্যে নয়।...

ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে প্রকাশ বাঁচিয়া যাইত। এমন চাবুক বোধ হয় সে ছেলেবেলায় মাষ্টারের হাতেও খায় নাই।

মেয়েটি বলিল—না যাক্, অনর্থক আপনাকে লজ্জায় ফেলব না। আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব চিরকাল।

সিঁড়িতে কার জুতার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু দু'জনের কাহারো সেদিকে খেয়াল ছিল না যে,শব্দটা বারান্দা ঘুরিয়া একেবারে সেই ঘরেরই দ্বারে আসিয়া থামিয়াছে।

ভিতরের দুইজনেই চিনিল দরজার সামনে বিভূতি দাঁড়াইয়া।

তাহার স্ত্রী বলিল—এই যে এসেছ তুমি! জামিন পেয়ে গেলে বুঝি?

কিন্তু সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়াই রহিল; আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল না।

বিভূতি বলিল—হুঁ। তবে এসে ভুল কর্‌লুম নিশ্চয়! সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃতজ্ঞতার ষোল আনা পূর্ণ হ'তে পেলে না ত!

বিদ্যুতের মত তার স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং পাশের দেয়ালে হাত বাড়াইয়া আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিল। সেই উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশ দেখিল, স্বামী আর স্ত্রী দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। উভয়েরই মুখে তীব্র ঘৃণা!

মেয়েটী বলিল—মানুষ ত নওই তুমি, তবু যদি এখনো কিছু পদার্থ থাকে, তা' হ'লে ক্ষমা চাও ওঁর পা দুটো ছুঁয়ে! আর এই নাও তোমার জাহান্নমের গয়নার বাক্স—

বিভূতি তার ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিয়া বলিল—আরে, চুপ্ চুপ্ পাগ্‌লী—বলিতে বলিতে হাত-বাক্সটাকে তুলিয়া লইয়া বগলদাবা করিয়া বলিল—আমি ত আর বিশেষ কিছুই বলি নি। শুধু ভাব্‌চি,আজ রাত্তিরটা বাদ দিয়ে আমি আস্‌তে পার্‌লেই ভাল হ'ত!...

মেয়েটী অধিকতর দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়ই হ'ত! একেবারে না এলেও ত জানা উচিত, তোমার সত্যিকারের অধিকার কতটুকু! সব জেনে-শুনে স্বামীগিরি ফলাতে এসো না অমন করে'!

বিভূতি ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া হাসি ফুটাইয়া বলিল—তার মানে, ওঁকে ভালো করে' শুনিয়ে রাখা হচ্চে যে, আমি তোমার স্বামী নই?

—একশোবার!

বিভূতি এবার রীতিমত শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, চট্ করে' আমি এটার একটা কিনেরা করে' আসি। এই

এলুম বলে'। আজ ভালো করে' রান্না-বান্না করো দেখি। প্রকাশবাবুকে আমিই নেমন্তন্ন করে' যাচ্ছি। বলিয়া সে আর কাহারো কোনো কথার অপেক্ষা না করিয়া সটান্ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তাহার স্ত্রী তখনো তেমনি রাগে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। প্রকাশ আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

—দাঁড়ান্ প্রকাশবাবু। বলিয়া মেয়েটী প্রকাশের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—রাগের মাথায় যা' কিছু বলা যায়, তাই সব সময় সত্যি হয় না প্রকাশবাবু। ও আমার স্বামীই। যদিও ওকে আমি ঘেন্না করি দস্তুরমত!

প্রকাশের মাথার ভিতর রাশি-রাশি ধোঁয়া একসঙ্গে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল।

বিভূতির স্ত্রী বলিল —খেতে বল্‌বার সাহস নেই ওর মতো, অধিকারও নেই একেবারে। তবে যদি খান্, সেটা আপনার অনুগ্রহ-ই হবে। এখুনি আমায় আবার রান্না চাপাতে হবে; শুন্‌লেন ত, সমস্ত দিনটা না খেয়েই কেটেচে! সত্যি খাবেন?

প্রকাশের মুখ দিয়া কে যেন কথাটাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিল—খাবো।

মেঘের আড়াল সরিয়া গিয়া মেয়েটীর মুখে-চোখে এক ঝলক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিস্ময়

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পরীক্ষার দিনেও পাঠ্য-পুস্তককে যে এড়াইয়া চলিয়াছে, সেই সন্তোষ সহসা পড়ার বইয়ে এ কয়দিন এত অধিক মন দিয়া বসিয়াছে যে, তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে।

কাত্যায়নী দেবী ছেলের পাশ-ফেলের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিতেন না। এই অনাচরিত এত অধিক পরিশ্রমের ফলে যে কি কুফল ফলিতে পারে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াই বিশেষ ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন।

সেদিন শৈলেশ যখন 'মাসীমা' বলিয়া সন্তোষদের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কাত্যায়নী দেবী নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাবা শৈল, আমার কেন জানি বড় ভয় হয় সন্তুকে অত পরিশ্রম করতে দেখলে। তোর মেসোমশায় ঠিক এমনটি করেই প্রথম-বার বি-এ ত দিতে পারলেনই না,—না দেওয়াতো দূরের কথা, সেবার নেহাতই কপাল-গুণে তাঁকে ফিরে পেলাম। অমন অসুখ হ'তে কারও আমি আর দেখি নি শৈল।

শৈলেশ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিয়াছিল, সে জন্ত কিছু ভেব না মাসীমা। আমরাও অমন আঁট-সাঁট হ'য়ে দু'দিন পড়া আরম্ভ করি —আবার দু'দিন পরে যে-কে-সেই। বই-পত্তর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাই না।

কাত্যায়নী দেবীর ভয় ভাবনা শৈলেশের সান্ত্বনায় একটুও দূর হইল না। তিনি কহিলেন, ও কার রক্তে মানুষ, সে কথাও ত আমি ভুলতে পারি না শৈল।

শৈলেশ সেদিন মৌখিক পরাজয় স্বীকার করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। দিন দশ কাটিয়া গেলে শৈলেশ একদিন হাসিয়া ফেলিয়া সন্তোষকে বলিয়াছিল, বাপ্ কো বেটা একেবারে—

সন্তোষ সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারে নাই।

দিনকয়েক সন্তোষ একটা আকস্মিক উপদ্রবের জন্য সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিত। ক্রমে সে আশঙ্কা তাহার দূর হইলে একদিন বীণা আসিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। সন্তোষ সযত্নে যাহাকে এড়াইয়া চলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহাকে এমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে বিশেষ বিচলিত হইল না। যে মুহূর্ত্তকে সে প্রাণপণে চিরদিন দূরে দূরে রাখিবার সংকল্প করিয়াছিল, তাহাকে আগত দেখিয়া সে ভয় পাইল না, একটুও অপ্রতিভ হইল না, বরং এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষায়ই সে যেন উন্মুখ হইয়াছিল—এমনভাব তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

সন্তোষ চেয়ারে বসিয়া সম্মুখের টেবিলের উপর পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া রাখিয়াছিল। বীণা ইতিপূর্ব্বে ওই স্থানটিতে কতদিন কত অদ্ভুত

জ্ঞাত-অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত লেখকের সুদৃশ্য উপন্যাস খোলা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে, কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের এমন দুর্দ্দশা সে কোনদিন দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না।

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিতেই বীণা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ওগুলোর ধুলো ঝেড়ে-পুঁছে একবার যখন খুলে বসেছ, তখন আর বন্ধ করো না, বরং আমিই ফিরে যাচ্ছি।

সন্তোষ বীণার এ কথার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। আর এমনটির জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। বীণা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, বৌদি', এখানা উপন্যাস নয়।

তাহার ভিতরের কথা বীণা বুঝিল; বলিল, উপন্যাস হ'লে বোধ হয় আমি চলে' গেলেই তুমি খুসি হ'তে, ঠাকুরপো?

না, তাও না।—বলিয়া সন্তোষ মেহাগিনি কাঠের টেবিলের উপরকার চক্‌চকে পালিশের উপর দৃষ্টি পাতিয়া বসিয়া রহিল।

বীণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া টেবিলের উপর একটা হাত রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল।

এই অনুভব্য নীরবতা উভয়ের মধ্যে কাজ করিয়া যাইতেছিল। মৌনতা যে কখনও প্রগল্‌ভ বাক্যালাপকেও ছাপাইয়া উঠিতে পারে, তাহা ইহার পূর্ব্বে সন্তোষের কোনদিন ধারণা ছিল না। কত সম্ভব-অসম্ভব, সুস্পষ্ট-অস্পষ্ট কথার আলোড়নে তাহার অন্তর বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল। বীণা তাহার কাছে নীরব থাকিয়াই যেন আরও প্রগল্‌ভা মুখরা হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরপো!

আর মুহূর্ত্তের বিলম্বে সন্তোষ হয় ত উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিত, বৌদি', কথা কও না যে?—এখন তাহার এই বিপুল উৎকণ্ঠা ঠেলিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সময়ে সময়ে নীরবতার বেদনা যে কতখানি তীব্র হইয়া উঠিতে পারে, তাহার পরিচয় জীবনে সে এই প্রথম পাইল।

বীণা সন্তোষকে পূর্ব্ববৎ নীরব দেখিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একটা কথা বলব' বিশ্বাস করবে?

বীণা যে তাহাকে কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়াই সে নীরব হইয়া রহিল। বীণা চেয়ারের হাতলের উপর একটা হাত রাখিয়া সন্তোষের অতি কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, ঠাকুরপো, আমি যে তোমাকে সত্যি ভালবাসি একথা তুমি বিশ্বাস করতে পার?

সন্তোষ দেহের উপর একটা উগ্র উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। এমন কিছুর জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, কে যেন তিল তিল করিয়া তাহাকে জাঁতায় পিষিয়া মারিতেছিল। চতুর্দ্দিক হইতে যেন রন্ধ্রহীন বিপুল অন্ধকার ধীরে ধীরে তাহাকে ছাইয়া ফেলিতেছিল।

বীণা ঠোঁটের সীমান্তে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বলিল, নেহাতই উপন্যাসের মত শোনায় বটে, না?

সন্তোষ কম্পিতকণ্ঠে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেই যেন ডাকিল, বৌদি'!

বীণা সংযতকণ্ঠে বলিয়া চলিল, ঠাকুরপো, কথাটা যখন একবার উঠে পড়েছে, তখন তা' শেষ করে' ফেলাই ভাল। আমার রূপের না কি আর তুলনা হয় না! একথা আমি প্রথম জানতাম না। লোকের মুখে শুনে-শুনেই ক্রমে আমার মধ্যেও কেন জানি না ওই ধারণাই জন্মে গেল। কস্তুরী মৃগ শুনি তার নিজের নাভীগন্ধে পাগল পাগল হ'য়ে যায়; কিন্তু যার জন্তে সে পাগল, তার সন্ধান সে কিছুতেই পায় না। আমার

মধ্যেও উন্মাদনা এসেছিল ; কিন্তু রূপের সন্ধান পাই নি এমন কথা আর বলা চলে না। পর-রূপকে মানুষ চিরদিন সুন্দর দেখে, কিন্তু আমি তা' দেখতে পারি নি। আর কেমন করে' আমি আমার নিজের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে উঠেচি, সে কথাই ত তোমাকে বলতে চাই। কোন্ একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম ঠাকুরপো, যে, সুন্দরের মধ্যে সৃষ্টি করার বাসনা অত্যন্ত প্রবল। আজ নিজের সঙ্গে মিলিয়ে কথাটাকে খুব বিশ্বাস করি।

সন্তোষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বীণা কথার মোড় ঘুরাইয়া আবার সুরু করিল, তোমার গুরুজীর কথাই বলি ঠাকুরপো—

সন্তোষ বাধা দিয়া বলিল, থাক্, তার কথা আর তুলো না বৌদি'।

বীণা চপল হাসিতে সন্তোষকে বিঁধিয়া বলিল, গুরুদেবের অপমান শিষ্য সইতে পারে না, সে বুঝি। কিন্তু ঠাকুরপো, তোমাদের দু'জনের একজনকেও বাদ দিয়ে আমার নিজের কথা আর বলা চলে না। তোমার ভক্তি-বিশ্বাসের পাত্রটিকে আজ যদি তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনি ত আমাকে দোষ দিও না ঠাকুরপো। আর তা' করতে গেলে আমি নিজেকেও কম নীচে নামিয়ে আনব না। কিন্তু মানুষ জেনেশুনে নিজেকে ছোট করতে পারে না, তবে আর ভয় পাবার কি আছে ঠাকুরপো? এতবড় জাতটাই যদি দিতে পারলে ত আর পৈতের মায়াটা কাটাতে পার না?

ওসব কথা থাক্ না বৌদি'। বলিয়াই সন্তোষ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ছাই-পাঁশ চাপা দিয়ে এ সব রাখা যায় না ঠাকুরপো। যে কথাটা তুমিও ভাব, আমিও ভাবি, দশজনেও অনুমান করে, সে কথাটার যদি আজ একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া করে' ফেলতে চাই ত সে কি আমার অন্যায়? বলিয়া সন্তোষকে ভাবিবার জন্যই যেন বীণা সময় দিল।

সন্তোষ ভাবিয়া পাইল না, বীণা আজ তাহাকে কি এমন স্পষ্ট করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে চায়। অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া কোন্ কূলে যে বীণা তাহাকে ঠেলিয়া তুলিতে চায় তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। নিতান্ত অসহায়ভাবে সন্তোষ বীণার মুখের পানে চাহিল। বীণা যে এতখানি উগ্র হইয়া উঠিতে পারে, তাহা সন্তোষ ইহার পূর্ব্বে কোনদিন বিশ্বাস করিত না।

বীণার চোখের উপর পড়িয়া যে চূর্ণ কুন্তল-রাশি একটা বাধার সৃজন করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এক হাতে সরাইয়া দিয়া বীণা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতায় যে মানুষটি সবার উচ্চ আসন লাভ করে'বসেছেন, তিনি যে আমারই স্বামী, আর আমি যে সতী-সাবিত্রীর দেশেরই মেয়ে তা' তুমি ভুলে যাও কেন?

সতী-সাবিত্রীর কথা উঠিয়া পড়ায় সন্তোষ বিব্রত হইয়া বলিল, বৌদি', সতী-সাবিত্রীর কথা তুলো না, তাদের আমি ভাল করে' বুঝিই না।

বীণা বুঝিল, সতী-সাবিত্রীর কথা তাহার অন্তরের কোন্ স্থানটিতে গিয়া আঘাত করিল। ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বীণা বলিল, ঠাকুরপো, সতী-সাবিত্রীর নামও কি আমার মুখে শোভা পায় না না কি?

সন্তোষ বলিল, সে কথা ত আমি বলি নি বৌদি'।

আচ্ছা বেশ—বলিয়া বীণা আবার আরম্ভ করিল, এ বাদ-প্রতিবাদের কথা নয় ঠাকুরপো। এমন অভ্রান্ত সত্যকে গলা টিপে মারতে চাওয়া

কি কোন কাজের কথা? এর মার নেই কোন কালে! একদিন-না-একদিন বীভৎস রূপ নিয়ে প্রকট হ'য়ে উঠবেই। একটা নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বীণা দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া চলিল, তোমার দাদা একদিন বলেছিলেন, 'এত রূপকে আমার কেন জানি ভারী ভয় হয়।' তার পূর্ব্বে অবশ্য রূপের ওজন আমি কোনদিন করে' দেখি নি। একটা আয়না সামনে পেতে সেদিন আমি সমস্ত রাত জেগে বসেছিলাম, বিশ্বাস করতে পার? কিন্তু তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি, নিবৃত্তির চেয়ে প্রবৃত্তি, দিন দিন খরতর হ'য়ে উঠেচে। তারপর এক মুহূর্ত্তের সাফল্যের জন্যে ঘরের স্তিমিত দীপালোকে নিজের জাগ্রত যৌবনকে নিষ্ফলতার চাবুক মেরে মেরে জাগিয়ে রেখেচি। আমার উন্মাদনা দেখে তাঁর কেমন ভয় হ'ল জানি না, বল্লেন, 'এমন করে' মানুষ সুখী হয় না বীণ্। নিজেকে জয় করার মধ্যেই মানুষের সার্থকতা।' নিজেকে জয় করতেই বোধ হয় তোমার গুরু-জীকে দেশ-ভ্রমণে বেরুতে হ'ল—কিন্তু আমার পথ রইলো কোথায় ঠাকুরপো? তারপর নিজের আগুণে নিজে অহোরাত্র পুড়েছি—কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সমাধি ত কই কিছুতে হয় না। নিজেকে জয় করা এত সোজা কথা নয় ঠাকুর-পো। কাজেই আমাকে সার্থক করে' তোলবার জন্যে অতৃপ্ত ক্ষুধার পীড়নে তোমার দোরে এসে ঘা মারতে হ'ল। এখন তোমার বিশ্বাস হয় যে, আমি তোমাকে ভালবাসি?

সন্তোষ একটা চাবুক খাইয়া যেন রুখিয়া দাঁড়াইল—না, বিশ্বাস করি না। ধ্রুবেশ-দা'কে যে পেয়েছে, জেনেছে,—সে আর কাউকে কোনদিন ভালবাসতে পারে বলে' আমার ধারণা নেই।

বীণা তাহার মুখের 'পরেই হাসিয়া বলিল, পাওয়ার কথা বলচ'? কই, তাঁ'কে ত আমি কোনদিনই পাই নি। আর জানার কথা যদি বল, তবে সবাই কি আর একজনকে একরকমে জানে? এই দেখ না, তুমি তোমার দাদাটিকে যেমন ভাবে জান, আমি ঠিক তেমনভাবে জানি না। আমি জানি, তিনি তাঁর সৃষ্টি করার প্রবৃত্তিকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করচেন—আর একেই হয় ত তিনি মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলে' ঠিক করে' বসে' আছেন; কিন্তু এও আমি জানি যে, একদিন তাঁর এ ভুল ভেঙে যাবে—আমার কাছে ছুটে আসতেও তাঁকে হবে। সেই অসময়ের সাফল্যের জন্যে নিজেকে তিল তিল করে' ক্ষয় করতে পারি না। এমনও হ'তে পারে যে, তাঁর আদর্শকে আমি ভুল করেচি। ভালবাসা তাঁকেই যায় ঠাকুরপো, যে নাগালের বাহিরে নয়। তা' ছাড়া, এত রূপ-যৌবন নিয়ে যাঁর সংযমের বাঁধ আজও এক মুহূর্ত্তের জন্য টলাতে পারি নি, তাঁকে ভালবাসি কি করে'? কিন্তু ভক্তি না করেও ত পারি না।

বীণা সন্তোষের পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে বীণার রূপ-যৌবনের সমস্ত রস যেন ক্ষরিয়া পড়িল।

এতক্ষণ সন্তোষের সঙ্গে এ জগতের সমস্ত সম্পর্কই যেন চুকিয়া গিয়াছিল। বীণার কোমল স্পর্শে সহসা তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি এখনও যাও নি বৌদি'?

যাকে ভালবাসা যায়, তা'কে ছেড়ে যাওয়া কি এতই সহজ ঠাকুরপো?—বলিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

এতবড় পরিহাস সমগ্র চেতনা শক্তিকে একত্রিত করিয়া সন্তোষকে সহ্য করিতে হইল।

বীণা আবার বলিল, ঠাকুরপো, তোমাকেও ভাল করে' ভেবে দেখতে বলি, তুমিও আমাকে ভালবেসেছ। একথার উত্তর আর একদিন এসে না হয় শুনে যাব। আজ আসি।—বলিয়া বীণা

।কখানি কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা সন্তোষের চোখের ।াম্নে তুলিয়া দিয়া সরিয়া গেল। সন্তোষ হাত ।াড়াইয়া টেবিলটা চাপিয়া ধরিল।

নিবিড় অন্ধকারে বন-জঙ্গলের পাশে মশার গুণগুণাণি গানে ও কামড়ে অতিষ্ঠ হইয়া দুঃখী- ।াম ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—দাদাবাবু, এ কি ।াথা ব্যথা তোমার বল ত ?

তুই থাম্ আকাট।—বলিয়া শৈলেশ একটু ।ড়িয়া-চড়িয়া মশার দল যে সপ্তরথীর ব্যূহ ।াহাকে ঘিরিয়া রচনা করিয়াছিল, তাহা হইতে ।ুক্তি পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

কিছুক্ষণ পরে নিশীথের নীরব নিস্তব্ধ বুকে ।া মারিয়া একটা শব্দ হইল, হয়েচে।

কি হয়েচে রে ?—বলিয়া শৈলেশ আগাইয়া গেল।

দুঃখীরাম অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওই শালাই ত দাদাবাবু ?

শৈলেশ আস্তে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল— আঃ, সব পণ্ড করে' দিবি দেখচি! অমন ষাঁড়ের মত গাঁক্ গাঁক্ করে' চীৎকার করচিস কেন ?

শৈলেশ পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছিল, দুঃখীরাম কি-একটা আশঙ্কা করিয়া বলিল, সাবধান দাদাবাবু, এসব লোককে একটুও বিশ্বাস নেই।

তা' হ'লে লাঠি ধরতে পারবি নি ? কি শিখ্‌লি তবে এতদিন ?—বলিয়া শৈলেশ তেমন- ভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শৈলেশ বাড়ীর বৃদ্ধ দরওয়ান হিম্মৎ সিংএর কাছে অতি শৈশব হইতেই লাঠি খেলায় হাত পাকাইয়াছে এবং দুঃখীরামকে নিজের উপযোগী করিবার জন্য তাহাকেও হাত ধরিয়া শিখাইয়াছে।

দুঃখীরাম বিশেষ লজ্জিত হইয়া চুপ করিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে লোকটি ছায়ার মত সরিয়া যাইতেছিল, তাহারই কাঁধের উপর শৈলেশ একটা হাত রাখিতেই সে 'ও বাবা গো' বলিয়া দশহাত ছিটকাইয়া গেল।

শৈলেশ তাড়াতাড়ি কহিল, ভূত নয়, প্রেত নয়, আপনারই মত একজন মানুষ—আমি শৈলেশ, চক্কোত্তি-মশায়।

শৈলেশ !—কানের মধ্যে 'ছ্যাং' করিয়া খানিকটা উত্তপ্ত লোহা কে যেন প্রবেশ করাইয়া দিল। নিমিষে মুখের চেহারা এমন ফ্যাকাসে হইয়া গেল যে, আলো থাকিলে শৈলেশ ধারণা করিয়া লইত, দেহে প্রাণ নাই।

শৈলেশ প্রত্যুত্তরের আশায় নীরব হইয়াছিল, কিন্তু অতুল চকোত্তি যে ভূত-প্রেতের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া আরও বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বিলম্বে বিব্রত হইয়া শৈলেশ আবার কহিল—অন্ধকারে কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না। কই, সরে' পড়লেন না কি চক্কোত্তি মশায় ?

দুঃখীরাম ইহারই মধ্যে শৈলেশের দেহরক্ষী- রূপে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে গর্জ্জিয়া উঠিল—ঠাকুর, সাড়া দেবে ত দাও,নইলে লাঠির ঘায়ে ঘায়েল করে' ছেড়ে দেব।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া লোক চিনিবার মত অবস্থা অতুল চকোত্তির তখন ছিল না। তবে এটুকু সে নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিল যে, শৈলেশ একা আসে নাই।

অতুল চক্কোত্তি সকাতরে কহিল—বাবা, শৈলেশ—

শৈলেশ এতক্ষণে টর্চ্চ লাইট্‌টা জ্বালাইয়া অতুল চক্কোত্তির মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ভয় নেই চক্কোত্তি—মশায়, আপনার মত একটা আধমরা জীবকে মেরে লাঠির আমরা অমর্য্যাদা করব না।

অতুল চক্কোত্তি উদ্গত আবেগ সাম্‌লাইয়া লইয়া শৈলেশের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—বাবা শৈল, এর পরেও কি আমার আর কিছু বাকী রইল? বুড়ো বয়সে দশজনের সামনে আর আমাকে অপদস্থ করিস্ না। তুই আমার ছেলের মত তাই, নইলে পা ছুঁয়ে শপথ করতাম,এ গ্রামে আর ইহজীবনে মুখ দেখাব না।

অতুল চক্কোত্তির অনেক কীর্ত্তিই শৈলেশের জানা ছিল, কিন্তু এ কীর্ত্তিটি নবাবিষ্কৃত বলিয়াই গ্রামের কেহই জানে না, শৈলেশও জানিত না। সেদিন অপরাহ্নে গাঁয়ের বৃদ্ধ চৌকিদার রামলাল এক ছিলিম তামাকের লোভে দুঃখীরামের ঘরে আসিয়া বসিল। কথায় কথায় গাঁয়ের বড় বড় ঘরের বড় বড় কথা উঠিয়া পড়িল। রামলালের বয়সের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দুঃখীরাম নিজের স্বল্পকালের অভিজ্ঞতা একে একে প্রকাশ করিতেছিল। দুঃখীরামের কি-একটা কথা রামলালের অপছন্দ হওয়ায় সে বলিয়া উঠিল—দেখ্ দুঃখী, আজ চল্লিশ বছর এমনই এ গাঁয়ে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি। কারও ভাল মন্দ জান্‌তে আর বাকী নেই। তুই কা'কে কি শেখাচ্ছিস্ দুঃখী, আমি এমন সব লোকের নাম করতে পারি যে, তুই শুনে চম্‌কে যাবি। এই অতুল চক্কোত্তির কথাই ধর না,—অমন হাড় হারামজাদা মানুষ গাঁয়ে আর একটিও নেই জানবি। বেন্দা বাঁড়ীর মেয়ে চিনুকে যে ঘরের বার করে' নিয়ে গেল সে ত সবাই জানে, কিন্তু চিনু ত আর হাবা মেয়ে নয়—দু'দিন পরেই আর একজনার সঙ্গে সরে' পড়ল। পাষণ্ডটা আবার একদিন গাঁয়ে ফিরে এল……এ পর্য্যন্ত ত গাঁয়ের সবাই জানে।

রামলাল সহসা নাক সিঁটকাইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া আবার বলিতে লাগিল—কিন্তু এ খবর কি কেউ রাখে যে, মেয়েকে চুলোর দোরে পাঠিয়ে এখন ওই বেন্দা বাঁড়ীর……আরে ছ্যা ছ্যা, এতবড় ঘেন্নার ব্যাপার…… ওই চামাড়টাই আবার ভদ্দর লোক বলে' বড়াই করে।

দুঃখীরামের স্বল্পকালের অভিজ্ঞতা এবং সংস্কারে কথাটা কেমন জানি বাধিয়া গেল; সে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিল—আমায় কেটে ফেললেও এ আমি বিশ্বাস করব না।

করবি না বলেই ত কোন কথা তোদের বলতে চাই না। বলিয়া রামলাল কলিকাটির মায়া ত্যাগ করিয়া উঠিতেছিল।

দুঃখীরাম সোৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এমনও হয় তা' হ'লে?

—হয় কি না হয় রাত ক'রে একদিন আমার সঙ্গে চলিস্ বেন্দার বাড়ীতে—রাসলীলা দেখিয়ে ছেড়ে দেব। বলিয়া নিজ রসিকতায় বৃদ্ধ রামলাল হাসিয়া ফেলিল।

শৈলেশ অতুল চক্কোত্তিকে একদিন বাগে পাইলে রীতিমত শিক্ষা দিয়া দিবে—এ সংকল্প কয়েকদিন হইতেই তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। দুঃখীরামও সে খবর আভাষে-ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছিল। এতবড় অপ্রত্যাশিত সংবাদ সে শৈলেশের গোচর না করিয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। শৈলেশের দেখা পাইয়াই সর্ব্বপ্রথম সে রামলালের প্রত্যেকটি কথা তাহাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইল।

শৈলেশ ও দুঃখীরাম এতক্ষণে রামলালের কথা দ্বিধাশূন্য হইয়া বিশ্বাস করিল।

শৈলেশ অতুল চক্কোত্তির প্রত্যুত্তরে শ্লেষ হানিয়া বলিল—এত সহজে পরিত্রাণের আশা করাই ত আপনার ভুল চক্কোত্তি-মশায়।

অতুল চক্কোত্তি ব্যাকুলতায় শৈলেশকে একপ্রকার জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এক ফোঁটা

তপ্ত অশ্রুর স্পর্শে শৈলেশ চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—একজনকে অকারণে সেদিন গাঁয়ের লোকের সামনে আপনি কাঁদিয়েছিলেন মনে আছে ? আজই তার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাক্।

—তার জন্যে আমি তোর হাত ধরে' ক্ষমা চাইচি শৈল।

শৈলেশ সহসা উগ্র হইয়া উঠিয়া বলিল—আপনি সব পারেন চক্কোত্তি-মশায়।

ততক্ষণে অতুল চক্কোত্তির শীর্ণ দেহ শৈলেশের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামময় সেই রাত্রের অপ্রিয় ব্যাপারটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। অতুল চক্কোত্তি জীবন্ত সমাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোথায় যে রাত্রেই সরিয়া পড়িল, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না।

শৈলেশ নৌকার বৈঠা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ইচ্ছে ছিল, গাঁয়ের লোক জড়ো করে' সকলকে দিয়ে এক এক ঘা জুতো মেরে গাঁ ছাড়া করি।

সন্তোষ শৈলেশের মুখে পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা শুনিয়া কেমন জানি একটা অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শৈলেশ তাই যখন নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ করিতেছিল, তখন সন্তোষ সেদিকে কাণ দিতে পারিল না। কিন্তু শৈলেশ কিছু বলিয়াছে বুঝিয়া সে প্রশ্ন করিল—হুঁ, কি বলছিলি ?

শৈলেশ 'ঝুপ্' করিয়া বৈঠাটা জলে ফেলিয়া একটা চাপ দিয়াই বলিল – বলছিলাম, ঐ রাস্কেল চক্কোত্তিটাকে এত সহজে ছেড়ে দেওয়াটা ভাল হয় নি।

মন্দও হন নি। বলিয়া সন্তোষ খালের উজ্জ্বল জলরাশির পানে অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সন্তোষের ভাবনাটা যে কোন্‌দিক দিয়া খেলিতেছিল, তাহা শৈলেশও অনুমান করিতে পারিতেছিল না—কিন্তু তাহার নীরব দৃষ্টির মধ্যে একটা কৌতূহলী জিজ্ঞাসা যে বিরাজ করিতেছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

খালটা সেখানে আসিয়া বাঁকিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শৈলেশ নৌকা হাল ঘুরাইয়া বাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইতেই সন্তোষ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল—এখনই বাড়ী ফিরে কি হবে ? বরং এদিক-সেদিক একটু ঘুরে আসা যাক্।

শৈলেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—বাড়ী ফের্‌বার গরজ আমার মোটেই নেই, তবে তোর পড়ার ক্ষতি হবে ভেবেই যা'—

সন্তোষ বাধা দিয়া বলিল—আমার ক্ষতির জন্য তোর এত ভাবনা কিসের ? বলিয়া ফেলিয়াই সন্তোষের সহসা মনে পড়িয়া গেল, আজ শৈলেশের স্ত্রী চৈতীর আসিবার কথা আছে।

ক্রমশঃ

কলঙ্ক-ভঞ্জন

শ্রীহরিপদ গুহ

পৌষের সন্ধ্যা।

কয়েকজন উদীয়মান যুবক-লেখক 'কল্লোলিনী' অফিসে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সেদিন বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল; গল্প যেন কিছুতেই জমিয়া উঠিতেছিল না।

ঠিক সেই সময় ভিতর হইতে পাঁপরভাজা ও চা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে সানন্দে এক-একটি ডিস্ তুলিয়া লইয়া তপ্ত পেয়ালার চুমুক দিয়া বলিয়া উঠিল—'আঃ!'

গরম চা পানের সঙ্গে সঙ্গে রক্তও ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিল; সুতরাং, সহজেই গল্প জমিয়া গেল।

পল্লী-সম্বন্ধেই তখন আলোচনা চলিতেছিল। ভুবন বলিল—'চিরকাল বইয়েতেই পড়ে' এলুম, পাখীডাকা, ছায়ায় ঢাকা শ্যামস্নিগ্ধ শান্তির নীড় পল্লী-জননী। কিন্তু আমার অদৃষ্টে আর সেই জননীর মুখ দর্শন হলো না।

সহরের ছেলে সে; চিরকাল এখানে থাকিয়া মানুষ—কাজেই, সুষমা-মণ্ডিত পল্লী-শ্রী দর্শন সত্যই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। তাহার খেদোক্তি শুনিয়া অপূর্ব্ব বলিল—'বেশ ত, চল একদিন আমাদের দেশে। কিছুদিন থেকে, বেড়িয়ে সব দেখে-শুনে আসবে। পাড়াগাঁ সম্বন্ধে তোমার 'আইডিয়াটা' হয় ত তখন বদ্‌লে যাবে।

সে রাজী হইয়া গেল; স্থির হইল, আগামী বড়দিনের ছুটিতে তাহারা রওনা হইবে।

উকিল-লেখক রাধিকাবাবু একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—'কেতাবে পড়্‌তে মন্দ লাগে না। 'পাখীডাকা, ছায়ায় ঢাকা' একথা সত্য বটে, কিন্তু সেখানে দু'দিন বাস করলেই তোমার ধারণা বদলে যাবে। শান্তির লেশ মাত্র সেখানে নেই; রাত-দিন ঝগড়া-মামলা লেগেই আছে। সামান্য একটা কারণে এ ওকে একঘরে করছে, ও তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করছে।

'পল্লী-সম্বন্ধে আমার ধারণাও আগে তোমার মতই ছিল; কিন্তু কি করে' সেটা বদ্‌লে গেল, তাই বল্‌ছি শোন। অবশ্য বঙ্গের সমস্ত পল্লীরই যে এই অবস্থা, তা' বল্‌ছি না। হয় ত কোন কোন শিক্ষিত পল্লীতে এর ব্যতিক্রমও আছে।

'পল্লীতে জন্ম হলেও আমি চিরকাল সহরের বুকেই মানুষ; দৈবাৎ কখনো দু'-চারদিনের জন্য দেশে যেতুম। ছেলেমানুষ, ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তিও তখন আমার ছিল না। তারপর যখন বড় হলুম, তখন অনেকদিন পর্য্যন্ত আর দেশে যাই নি। ওকালতি পাশ করে' এখানে প্র্যাক্‌টিশ্ কর্‌ছিলুম; দেশের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই ছিল না। দেশের বাড়ীতে এক বৃদ্ধা পিসিমা থাক্‌তেন। তিনিই সব দেখা-শোনা কর্‌তেন।

'অনেক দিন পরে।

'কিছুকাল রোগভোগের পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। শরীর আর সার্‌তে চায় না। যে ডাক্তার দেখ্‌ছিলেন, তিনি বল্‌লেন—স্থান

পরিবর্ত্তন করা দরকার। কোথায় যাব কিছুই ঠিক্ করতে পারলুম না। গিন্নী গম্ভীরভাবে হুকুম করলেন—'অত ভাবতে গেলে চলে না। পুরী কিম্বা মধুপুর যেথা হোক্ চলো!

'আমি হাসলুম। মনে মনে বল্লুম—'ওখানে অনেক খরচ, ও সুবিধা হবে না।' কিছুক্ষণ ভেবে বল্লুম—'দেশে যাব স্থির করেছি। এখন ওখানে দুধ-মাছ খুব সস্তা; দু'দিনেই স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।'

'গিন্নী খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেও কখনো দেশ দেখে নি। বল্‌লে—'বেশ, তাই ভাল।'

'তারপর একদিন স-স্ত্রীক দেশের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা গেল।

'দিন কয়েকের মধ্যেই শরীর অনেকটা ভাল হ'য়ে গেল; বেশ বল পেলুম। রোগ-মুক্ত হওয়ায় আনন্দে মন ভরে' উঠ্‌ল। খাঁটী দুধ আর প্রচুর মাছ খেতে পেয়ে শ্রীমতীও কড় কম খুসি হলো না।

'সেদিন সকালে বাইরের ঘরে বসে' জনকয়েক প্রজার সঙ্গে বাকী খাজ্‌নার হিসেব করছিলুম, হঠাৎ শ্রীধর এসে খবর দিলে—'বোস-মশায়ের বাড়ীতে দারোগা এসেছেন, লোকে লোকারণ্য।'

'কি ব্যাপার জানতে বড় কৌতূহল হলো। গ্রামের মধ্যে বোস-মশায় নিরীহ, ধার্ম্মিক লোক; তাঁর বাড়ীতে পুলিশের হানা কেন? প্রজাদের বিদায় করে', তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেলুম।

'গিয়ে দেখ্‌লুম, তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে দারোগাবাবু বসেছেন; তাঁর আশে-পাশে গ্রামের মাতব্বর লোকেরা দাঁড়িয়ে। সকলের চোখে-মুখেই একটা ক্রূর নিষ্ঠুর হাসি। ফিস্‌ফিস্ করে' নিজেদের মধ্যে তারা কি বলাবলি করছিল।

'বোস-মশায় দারোগার সাম্‌নে নতমুখে চুপ করে' বসেছিলেন; আর মাঝে মাঝে কাপড় দিয়ে চোখ মুছ্‌ছিলেন। বোস-মশায় কাতর-স্বরে দারোগাবাবুকে বল্‌ছিলেন—'আমার বিরুদ্ধে যখন অতগুলি প্রমাণ পেয়েছেন, তখন ত আমার কোন যুক্তিই চলে না। যা' শাস্তি দেবার আমাকেই দিন; দয়া করে' বৌমার জবানবন্দী আর নেবেন না।'

'দারোগাবাবু তাঁর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করে' বললেন, 'হুঁ'।'

'আমি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলুম—'ব্যাপার কি দারোগাবাবু?'

'তিনি একবার বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। ভাব্‌টা এই যে,—তুমি কে হে বাপু? বৃদ্ধ রায়-মশায় এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'এঁকে চিন্‌লেন না হুজুর? এ আমাদের রজনীদা'র ছেলে। একেবারে রত্ন। সহরে ওকালতি করে; দু'-চারদিনের জন্য দেশ দেখতে এসেছে।'

'দারোগাবাবু বাবাকে যেন খুবই চিন্‌তেন, এমনি মুখ-ভঙ্গী করে' বল্‌লেন—'ও।' তারপর আমার দিকে সুপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন—'বলেন কেন মশায়, স্যাষ্টি কেস। 'কালপেবেল হোমিসাইড' এই বোস-মশায়ের বিধবা ভাত্রবধূ পরশু রাত্রে একটি পুত্র প্রসব করেছিল; আর ইনি তাকে হত্যা করে' ওই গাবগাছটার নীচে পুঁতে ফেলেছেন। অবৈধ প্রণয়ের ফলে যে পাপের সৃষ্টি, তার হাত থেকে কি অত সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়?'

'এই বলে' তিনি হাসতে লাগ্‌লেন। কী বীভৎস সে হাসি! বোস-মশায় আমার দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাইলেন।

'সাক্ষীদের জবানবন্দী দারোগাবাবু পূর্ব্বেই নিয়েছিলেন; আমার দিকে চেয়ে বললেন—'মায় লাস্ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে—প্রমাণের ত আর

কিছুই বাকী নেই। ব্যাপার বড় সাংঘাতিক দাঁড়িয়েছে এখন।'

'আমি বিনীতকণ্ঠে বললুম—'কোন উপায়ই কি করতে পারেন না আপনি ?'

'কোন কোন কেসে হয় ত পারি—কিন্তু এতে দন্তস্ফুট করবার উপায় নেই। তা' হ'লে কি আমার চাকরী থাক্‌বে মশায় ?'

'তিনি উঠ্‌লেন। যাবার পূর্ব্বেএ কজন কনেষ্টবলকে বাড়ীতে পাহারায় বসিয়ে রেখে গেলেন। বোস-মশায়কে বললেন—'আপনি ঠিক হ'য়ে নিন—পরশুই আপনাকে সদরে যেতে হবে। এ কেস ত ফেলে রাখলে চলবে না। কাল আমাকে আর একটা খুনের তদারকে যেতে হবে, নইলে কালই যেতুম।'

'প্রানটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটাই আমার কাছে একটা রহস্য বলে' মনে হচ্ছিল। পিসিমাকে বললুম। তিনি বললেন—'তুই ওদের কোন কথায় থাকিস্ নি বাবা! সব মিথ্যে, সব চক্রান্ত! গ্রামে এই চল্‌ছে—কে কার সর্ব্বনাশ করবে, এই চেষ্টা দিন-রাত্রি।'

'মনের কোণে একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্ করছিল। এত প্রমাণ সবই কি মিথ্যে ?

'গিন্নীর শরণাপন্ন হলুম। বল্‌লুম—'তোমাকে আজ একবার বোস-মশায়ের ভাত্রবধূকে দেখে আস্‌তে হবে। তিনদিন পূর্ব্বে যার ছেলে হয়েছে, তা'কে তুমি দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে।'

'সন্ধ্যের আগেই সে আমাকে এসে বল্‌লে—কী সাংঘাতিক দেশ গো! ষড়যন্ত্র করে' মিছি-মিছি ওই ভদ্রলোকের এমন সর্ব্বনাশ করছে! বউটী বড় ভাল গো—তার কলঙ্ক একেবারে মিথ্যে! তুমি ওদের রক্ষে কর!'

'বড় কষ্ট হলো। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি কি করতে পারি! অনেকক্ষণ ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলুম না। মানুষ এত নীচ হয়! অযথা একজনের এতবড় সর্ব্বনাশও করে? ছি, ছি!

'অবশেষে ঠিক্ করলুম—পুলিশের বড়-সাহেবের শরণাপন্ন হ'লে হয় ত কোন উপায় হ'তে পারে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে' তখনই তাঁকে একখানি টেলিগ্রাম করলুম। কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম না। যদি তিনি কোন 'অ্যাক্‌সান' না নেন—তবে? আমি নিজে যাওয়াই স্থির করলুম। সেই দিনই বেরিয়ে পড়্‌লুম।

'পুলিশ-সাহেব বড়ই অমায়িক লোক। কি জানি কেন আমার কথা তিনি বিশ্বাস করলেন। টেলিগ্রাম পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন জানালেন। তিনি তখনই গুপ্ত-বিভাগের একজন ইনাস্‌পেক্টরকে আমার সঙ্গে তদন্তের ভার দিয়ে পাঠালেন। পুলিশের লঞ্চে চড়ে খুব শীগ্‌গিরই আমরা গ্রামে এসে পৌছুলুম। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুকে নিষেধ করে' দিলুম—তিনি যেন দারোগা-বাবুকে আমার কথা কিছু না বলেন।

'ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর যথেষ্ট খ্যাতি। তাঁকে দেখেই দারোগাবাবুর আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল! কি করে' যে এই অঘটন ঘট্‌ল, তিনি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না। বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্! তিনি ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুকে সমস্ত কেসটার চার্জ্জ বুঝিয়ে দিলেন।

'যাদের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল, সেই সব সাক্ষীদের পরদিন সকালে হাজির করা হলো।

'প্রথম সাক্ষী দু'জন জেলে—গদাই ও নিতাই। তারা বল্‌লে—চার-পাঁচদিন আগে যখন তারা খিড়কীর পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল, তখন তারা বৌটীকে ঘাটে দেখে। তার চেহারা

দেখেই তাকে আসন্নপ্রসবা বলে' বুঝ্‌তে পারে।

'ইনস্‌পেক্টরবাবু তাদের প্রশ্ন করলেন—'ভদ্রলোকের খিড়কীর পুকুরে তোমরা কেন গিয়েছিলে? তারা আম্‌তাআম্‌তা করতে লাগ্‌ল।

'গ্রামের যে সব গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মুখ একেবারে শুকিয়ে আম্‌সী! শুধু আমাকে রেখে একধার থেকে সব হটিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁরা একে একে সব সরে' পড়্‌লেন।

'ইনসপেক্টরবাবু আবার সাক্ষীদের প্রশ্ন করলেন—'তোমরা কখন মাছ ধরছিলে?'

'গদাই বল্‌লে—'সকালে।'

'নিতাই বল্‌লে—'সন্ধ্যের দিকে।'

'তিনি একটু হেসে জিগ্‌গেস্‌ করলেন—'বৌটী যে ঘাটে বসেছিল, সেটা কোন দিকে?'

'মনে মনে হিসেব করে' গদাই বল্‌লে—'দক্ষিণ দিকে।'

'নিতাই বল্‌লে—'পশ্চিম দিকে।'

'ঘাটটা কিন্তু পুবদিকে।

'ব্যাপারটা বুঝতে ইন্‌সপেক্টরবাবুর দেরী হলো না। তারা কিছুই জানে না—ধরে' এনে দাঁড় করান হয়েছে। তবু তিনি জিগ্‌গেস করলেন—'বউটীর বয়স কত?'

'নিতাই বল্‌লে—'ত্রিশ-বত্রিশ।'

'গদাই বল্‌লে—'বছর পনের-ষোল হবে।'

'ইনসপেক্টরবাবু উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌লেন। বউটীর বয়স বছর বাইশ।

'দারোগাবাবুর মুখ ক্রমে সাদা হ'য়ে যাচ্ছিল।

'তাদের ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় সাক্ষীকে ডাকা হলো। সে গ্রামের চৌকীদার, নাম হারাণ মণ্ডল। সে বল্‌লে—'হুজুর, কি ব্যাপার তা' ত জানি না। আমি যখন পাহারায় বেরিয়েছি, তখন হঠাৎ ওনাদের বাড়ী থেকে কচি ছেলের কান্না শুনতে পেলুম। আর কিছু জানি না হুজুর।'

সে যে স্থানটী দেখালে, সেখান থেকে ছোট ছেলের কান্না কিছুতেই শোনা যায় না।

'তৃতীয় সাক্ষী পরেশকে ডাকা হলো। সে ছিল বোস-মশায়ের বাড়ীর চাকর। সে বল্‌লে—'হুজুর, পরশু রাত্রে বাবু এসে আমায় বল্‌লেন—'আমার বড় বিপদ—তুই আমায় সাহায্য কর পরেশ!' নিমক খেয়েছি, মনিব ত। বল্‌লুম—'আজ্ঞে করুন কর্ত্তা।' 'তিনি আমায় বাড়ীর ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে একটা খন্তা ও হ্যারিকেন দিলেন। তিনি আমার পেছন পেছন একটা রক্তমাখা মরা ছেলে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লেন। ওই গাব গাছটার তলা খুঁড়ে ছেলেটাকে পুঁতে ফেলা হলো। যা' হ'য়ে গেছে তার ত আর কোন চারা নেই। আমি কিন্তু সেদিনই বাবুর বাড়ীর চাকরী ছেড়ে দিলুম। ওই অধর্ম্মেতে আমি নেই হুজুর।'

'ইনস্‌পেক্টরবাবু আগেই তদন্ত করে' এসেছিলেন। গর্ত্ত খন্তা দিয়ে হয় নি—হয়েছিল কোদাল দিয়ে।

'সব ক'টা সাক্ষী দেখেই তিনি বুঝ্‌লেন যে, একেবারে ফক্কিকার! মরা ছেলেকেও তিনি পরীক্ষা করেছেন—স্থানে স্থানে মাংস পচে গলে গেছে; দেখে কিছুই চেন্‌বার উপায় নেই। তবে সন্দেহ হয়,—তিন-চারদিনের ছেলে অতবড় হ'তে পারে না। তিনি খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন। দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—'কি রকম মনে হচ্ছে কেস্‌টা?'

'দারোগাবাবু জোর করে' হেসে বল্‌লেন—'বড় সিরিয়াস কেস্‌; কিছুই ঠিক করে' বলা যায় যায় না এখন।'

'সেদিন ছিল গ্রামের মোড়লদের একটা সামাজিক সভা। রাজদ্বারে বোস-মশায়ের যা

শাস্তি হবার তা' হবে। সমাজের শৃঙ্খলা মান্‌তে হ'লে, তাঁ'কে ত আর ছাড়্‌লে চল্‌বে না। যে অবৈধ অন্যায় কাজ তিনি করেছেন, তার শাস্তি তাঁকে নিতেই হবে। সমাজপতি-মশায় সকলকে এই কথাগুলো বুঝিয়ে বল্‌লেন।

অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থির হলো,—এখন তাঁর শাস্তি স্থগিত থাক্‌। যেভাবে জেরা চল্‌ছে,—কেস্‌টা ফেঁসে না গেলে হয়।

'ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ওস্তাদ লোক। তিনি জান্‌তেন যে, কোন সভা-সমিতি থেকে ফের্‌বার সময় লোকে সেখানকার বিষয় নিয়েই আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে যায়। তাই তিনি চল্‌তি-পথের মধ্যে একটা গাছে উঠে বসে' রইলেন—যদি কোন রহস্য বার করতে পারেন।

'একে একে অনেকেই সেখান দিয়ে চলে' গেল। বিশেষ কোন কথা হলো না। তিনি হতাশ হ'য়ে পড়্‌লেন। মনে মনে ঠিক কর্‌লেন যে, এবার নেমে পড়্‌বেন। হঠাৎ তিনি দেখ্‌তে পেলেন,—দু'জন লোক কথা কইতে কইতে সেই দিকেই আসছে। তিনি একেবারে কাণ খাড়া করে' রইলেন।

'একজন বল্‌লে—'যাই বল না কেন, মিত্তির-মশায় বাহাদুর বটে! ঘোসবাবুকে হিমসিম্‌ খাইয়ে দিলেন! খুব জব্দ হ'য়ে গেল কর্ত্তা এবার—আর খোঁচাখুঁচি করতে সাহস পাবেন না! মিত্তির-মশায় টাকাও খরচ কর্‌ছে জলের মত! দারোগা বেটাও কি কম টাকা খেয়েছে!'

'আর একজন বল্‌লে—'সব চেয়ে বাহাদুর রতনা বেটা। রাতারাতি কবর থেকে সে করিম সেখের মরা ছেলে চুরি করে' এনে গাব্‌-গাছ তলায় পুঁতে রাখ্‌লে ত!'

'আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে তারা চলে' গেল।

'ইনস্‌পেক্টরবাবু তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়্‌লেন। তাঁর কার্য্যসিদ্ধি হলো—মূহূর্ত্তে তিনি সকল রহস্য ভেদ করে' ফেল্‌লেন।

'পরদিন সকালেই সব ক'জন আসামীকে গ্রেফ্‌তার করা হলো। ধরা পড়ে' তারা নিজেরাই সমস্ত কথা স্বীকার করলে।

'মিত্র-মশায় শুদ্ধ সব ক'জন আসামীকে সদরে চালান দেওয়া হলো। বিচারে সকলেরই অনেক দিন করে' শ্রীঘর বাস হ'য়ে গেল—আর ওই ঘুস-খোর দারোগাকে কয়মাসের জন্য সস্‌পেণ্ড করা হলো।'

রাধিকাবাবুর গল্প শেষ হইতেই ভুবন বলিল—'বাবা কি সর্ব্বনেশে দেশ মশায়! মানুষ এত ভয়ানকও হ'তে পারে!'

সুরেন্দ্রমোহন বলিল—'তা' হয় বই কি! সহরের ছেলে হলেও বায়স্কোপ নিয়ে আমায় অনেক পল্লীগ্রামে ঘুর্‌তে হয়েছে। এ বিষয়ে আমারও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আর একদিন বলা যাবে সে সব কথা।'

তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, কাজেই সকলে উঠিয়া পড়িল।

ভূপতি বলিল—'ভারি চমৎকার একটা প্লট পাওয়া গেল।'

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪০ | দশম সংখ্যা

রেলপথে

শ্রীসুরপতি বসু

অবাধ্য চক্ষু তবুও মুদিয়া আসিতেছিল।

স্থান যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সেটি যিনি দখল করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি নিজের ব্যবস্থা এতটাই আরামপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, অন্যের পক্ষে শয়ন ত দূরের কথা, সামান্য একটু বসিবার স্থানের জন্য কতই না তোষামোদের মধুময় পুষ্পবর্ষণ করিতে হইতেছিল! ফল কিন্তু কিছুই হইতে ছিল না। আমার কথা যাত্রীটির কাণেই পৌঁছাইতে ছিল না; অথবা শুনিয়া যদিই বা তিনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেছিলেন, সেটা ঠিক স্থান সঙ্কোচের জন্য নহে, বরং অতিমাত্রায় দেহ বিস্তারে সেটাকে আরও আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে।

নূতন একজন আসিলেন। তিনি বেশ মিলিটারী মেজাজের। আসিয়াই একব্যক্তির ঘাড় ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন, "আরে উঠো, উঠো, জল্‌দি উঠো।"

কিন্তু সে কথার সাড়া মিলিল না; পরিবর্ত্তে নিদ্রাতুরের একটা মুষ্ট্যাঘাত বাবুটীর মুখের উপর এমনভাবে সাড়া জানাইল যে, যন্ত্রণায় কয়পদ পিছানো ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। তাহাতে মিলিটারীর মিলিটারী গর্ব্বে বেশ-একটু আঘাত লাগিল। তিনি খুব খানিক রুখিয়া হাতের ছড়ি ঘুমাইয়া আবার সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। পিছন হইতে একটী প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া

বলিলেন, "দেখবেন মশায়, একটু বুঝে-সুঝে এগোবেন—লোকটা কিন্তু খাস কাবুলবাসী!"

আমাদের মিলিটারী বন্ধু আর একবার সেই পেশীবহুল হস্তের দিকে চাহিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্তর কাঁপিয়া উঠিল কি না জানা নাই, কিন্তু তিনি যে অগ্রগমনের সাহস হারাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল। ফিরিয়া প্রৌঢ় লোকটীর দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "যত সব—আরে মশায়, পথ চল্‌তে গেলে অমন একটু-আধটু বিপদ সাম্‌নে নিয়ে এগুতেই হয়, নইলে সংসারে থাকাই চলে না যে।"

প্রৌঢ় লোকটী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "তা' বটে! তবে জলজ্যান্ত আগুন, সেই জন্তেই বলা। বেশ ত পারেন, এগিয়ে যান।"

কিন্তু এবার আর মিলিটারী মহাশয় কোন প্রকার কসরতের খেলা ত দেখাইলেন নাই, এমন কি একবার পিছন দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না; মৃদুস্বরে কেবল একটা স্বগতোক্তি করিলেন মাত্র, "তা' হ'লে বসা যায় কোথায়? কোলকাতা ত আর চারটী খানিক পথ নয়! সারাটা রাত এমন বাঁকা কেষ্টঠাকুর হওয়াও ত পোষাবে না।"

কথাটা শেষ করিয়া তিনি নীরবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। একটী ব্যায়রামী রোগী একপার্শ্বে পড়িয়াছিল। তাহারই এক নিকট-আত্মীয় নিকটে বসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাতাস করিতেছিল এবং অবসর সময়ে ঢলিয়া পড়িয়া নিজের অবসাদ ভাষাহীন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে যেন বুঝাইয়া দিতেছিল।

মিলিটারী বন্ধুর দৃষ্টি সেইদিকে পড়িতেই তিনি তড়িৎ-গতিতে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া সঙ্গী লোকটী তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। হাতের পাখাটা একপাশে রাখিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, "বাবু ব্যায়রামী—যক্ষ্মা—এখুনি রক্ত ছুটবে!"

মিলিটারী দাঁত-মুখ খিচাইয়া বলিলেন, "কিন্তু ব্যায়রামীর জন্যে এ গাড়ী নয়; আর এটা শ্বশুরবাড়ীও নয়। সুতরাং—

অগত্যা বেচারী ব্যায়রামীকে উঠিতেই হইল। মিলিটারী নিজেই শুধু বসিলেন না, তাঁহার গাঁটরীগুলোকেও সঙ্গের সাথী করিলেন। উক্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "ওগুলো নীচে রাখলেই বা ক্ষতি কি ছিল?"

কিন্তু একটা বক্র হাসিতে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল। সঙ্গী লোকটি পুনরায় হাতযোড় করিয়া বলিল, "মশায়, ও বড় রোগা, একটু দয়া করে' গাঁটরী ক'টা—"

"নাঃ, নীচে যে ময়লা, এই বেশ আছে।" বলিয়া লোকটী 'কেস' হইতে একটা সিগারেট লইয়া ধরাইলেন। মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, মোকামা জংশন। সন্ধ্যা বা প্রথম রাত্রি বলিলেও চলে, তাহাতেই এই ব্যাপার—এখনও যে ভবিষ্যৎ অনেক বাকী!

সে ভবিষ্যৎ কিন্তু গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হইল। রোগীর রক্ত বমনে মিলিটারীর আসবাব-পত্র একপ্রকার ভাসিয়াই গেল। তিনি ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে সেই অভদ্রতার প্রতি-শোধ লইবার জন্য নির্জীব লোকটীর দিকে ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইলেন। পাঁচজনে পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া ধরিয়া বসাইল।

এদিকে এই; অন্যদিকে কাবুলীর শ্রীচরণ বিস্তারিত হইয়া এক পশ্চিমা মুসলমানের মুখে গিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের ঘোরে লোকটা কাবুলীর অঙ্গস্পর্শের সুখ অনুভব করিল কি না জানা নাই; তবে জাগিয়া এক তুমুল কাণ্ড যে বাধাইল, তাহা স্বচক্ষেই দেখিলাম। তাহাদের উচ্চারিত অনর্গল দুর্বোধ ভাষার ফাঁকে মিলিটারী বন্ধু

বেশ একটু চুমকুড়ি দিয়া বলিলেন,"কাবুলী বলে' কি পীর না ;কি ! সত্যই ত মুখের ওপর পা ছড়িয়ে দেবে কেন ; আর ও সহ্-ই বা কর্‌বে কেন—বাপের বেটা নয় ?"

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "তা' বটে ! তবে কি জান ভায়া, কাঠে কাঠে পড়েছে তাই রক্ষে, নইলে—"

অন্যদিকে একজনের হঠাৎ প্রেমানুরাগ জাগিয়া উঠিল। কর্কশ কণ্ঠে সে আরম্ভ করিল, "এ সেঁইয়া হামারা লালী সাড়ী রঙা দে।"

পার্শ্বেই একজন বৃদ্ধ মুসলমান অন্য একজনকে বলিতেছিল, "রে, তুম মুসলমান হো ন হারাম ! পানি বেগর পিসাব—ক্যা, একঠো ডেলা ভি ন জুড়া ! কোরাণ সরিফমে লিখা হ্যায়—বাকী এ তোরে নেহি ; দিনকালকা নিশানা হ্যায় !"

অথচ কোরাণ সরিফের বয়েৎ সে নিজেই যে কত জানে, তাহা তাহার দু'-একটা কথার ফাঁকেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অন্য একজন হিন্দু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তুম আপনে কোরাণ সরিফ মান্‌তে নেহি—দুসরকো কেয়া বাতলাতে হো।"

বলিয়া হিন্দু হইয়াও তিনি যে একজন কোরাণ সরিফের পাকা ওস্তাদ তাহা বুঝাইবার জন্যই বলিতে লাগিলেন, "কোরাণ সরিফের প্রথম অর্থ, ত্যাগ—ক'জন মুসলমান তা' করে? রোজগারী হিস্বার বারআনা কে কোথায় অতিথ-ফকিরকে বিলিয়ে দেয় ? অথচ মুখে বলে, 'মুসলমান হ্যায়'।' কিন্তু, যথার্থ মুসলমান এক মহম্মদ ছাড়া আর কোথায় ?"

দেখিলাম এদিকের মল্লযুদ্ধোন্মুখ কাবুলী ও পাঞ্জাবী মুসলমান কাণ পাতিয়া বন্ধুর ওই অমূল্য উপদেশ শুনিল ; সঙ্গে সঙ্গে একটা শান্তির ভাব হঠাৎ তাহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠায় উভয়েই ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল—তবে থাকিয়া থাকিয়া পরস্পরের দিকে ভ্রূকুটী করিতে বিরত হইল না।

পাশের একখানা বেঞ্চ হইতে শব্দ আসিল, "রে, উঠ্‌ না, কেতনা শুতবে ভর রাত ?"

অর্থাৎ, সঙ্গী উঠিলে সে তাহারই স্থানটায় একটু গড়াইয়া বাঁচে। তাই বলিতেছিলাম, এত কাণ্ডের পরও অবাধ্য চক্ষু একটু শান্তির হাওয়া দেখিয়াই বুজিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ কাণের কাছে একটা মিহি স্বর ভাসিয়া আসিয়া আমায় চেতনারাজ্যে ফিরাইয়া আনিল। কে একজন সাহেবী-ঢঙ্গে বলিতেছিল, "ইধার রোকো, এ চিজ হঠা দো, হামারা চিজ হিঁয়া রাক্‌খো। বিস্তারা কাঁহা ? হ্যায়, হিঁয়া ধরো।"

বিস্ফারিত নেত্রে শুধু আমি নই, অনেক বন্ধুই আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমাদের মিলিটারী বন্ধু ত উঠিয়া গিয়া কুলিকে সাহায্য করিতেই লাগিয়া গেলেন। অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, একজন রমণী—কমনীয়াঙ্গী না হইলেও যুবতী !

যুবতী বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া মিলিটারী বন্ধুকে অভিনন্দিত করিলেন। মুখে বলিলেন, "ট্যাঙ্কস্ !"

অতঃপর দেখিলাম, নীচের ময়লা জমির উপরেই বাবুর গাঁটরী কয়টি স্থান লাভ করিল। তারপর সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়া মিলিটারী যুবতীকে বলিলেন, "টেক ইওর সিট্ প্লিজ। আসুন, অনুগ্রহ করে' বসুন।"

যুবতী আর একবার বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, "ট্যাঙ্কস্।" তারপর বিনা দ্বিধায় অপরিচিত যুবকের পাশে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিজয়ী মিলিটারী তখন উৎফুল্ল হৃদয়ে বেশ কটাক্ষ করিয়াই প্রৌঢ়ের দিকে চাহিলেন।

বেচারী মুটে মাল তুলিয়া দিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা

করা চলে না, গাড়ী তখনই ছাড়িবে ; তাই একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, "মেম-সাহেব—"

মেম-সাহেবের হুঁস হইল। তিনি ট্যারা-বাঁকা কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চায়, এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছে ?"

লোকটা ভড়কাইয়া গিয়া বেশ নরম সুরেই বলিল, "পয়সা মিলা নেহি।"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া মেম-সাহেব বলিলেন, "মিলা নেহি! ক্যা, সাহাব নেহি দিয়া? তাজ্জব! আচ্ছা, নোটকা চেঞ্জ হ্যায় ?"

বেচারী দু'-চার পয়সার মোট মাথায় করিয়া ফেরে, চেঞ্জের টাকা পাইবে কোথায় ? মাথা নাড়িয়া সে বিনীতভাবে জানাইল, 'না, নাই।"

মেম-সাহেব বলিলেন, "আপশোষ! হামারে পাশ নোট হ্যায় ; খুচরা কুছ নেহি হ্যায়। আচ্ছা, ভেজ দেগা—নাম, তুহারে নাম ?"

কিন্তু ততক্ষণ ট্রেণ ছাড়িতেছিল ; কাজেই বেচারী কুলি মুখ কাচুমাচু করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। যুবতী দুইপদ আগাইয়া গিয়া আশ্বাস দিলেন,"ডরো মাৎ। সাহাব দেগা জরুর। নেহি ত হাম্ হি তোমারা ভাড়া বড় কুলিকা নামমে মণিঅর্ডার ভেজ দেগী!"

কুলি তাঁহার কথা নীরবেই সমর্থন করিয়া লইল—নতুবা তখন আর উপায়ই বা কি ?

খানিক পরে চাহিয়া দেখিলাম, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মুখে-চোখে বিষণ্ণতার বান ডাকাইয়া মেম-সাহেব বলিলেন, "দেখুন, আমি বড়ই বিপন্ন! টিকিট করেছিলুম, আমার ঠিক মনে আছে। কিউল থেকে কোলকাতার টিকিট করে' তবে ভেতরে এসেছি। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না! কোথায় যে রাখলুম—"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তল্লাসের ধুম লাগিয়া গেল। অবশেষে নিরাশ-কণ্ঠে যুবতী বলিলেন, "না, কিছুতেই পাচ্ছি না—কি হবে তা' হ'লে ?"

মিলিটারী বন্ধু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন দেখিলাম। এবার প্রৌঢ়ের পালা। তিনি বলিলেন, "ভয় কি, হয়ে যাবে 'খন।"

মেম-সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, "কি করে' বলুন ত ? এ যাত্রা যদি রক্ষে করেন, চিরজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব!"

"তা' ত থাকতে হবেই" বলিয়া প্রৌঢ় ঈষৎ হাসিলেন।

তখন দেখি—প্রৌঢ় কি করিয়া বেচারীকে রক্ষা করেন, গাড়ীশুদ্ধ লোক তাহাই দেখিতে একান্ত উৎসুক।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "গাড়ীর সবার মন ত এঁকে বাঁচাবার ?"

সকলেই সাগ্রহে সে কথা স্বীকার করিয়া লইল। প্রৌঢ় তখন হাত পাতিয়া বলিলেন, "বেশ, সবার টিকিট আমার হাতে দাও।"

বুঝিয়া না বুঝিয়া সকলেই নিজের টিকিট প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীর হাতে দিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি জানি এ গাড়ীর চেক লিলুয়ায় হয়, হাওড়ায় নয়। সেখানে ওঁকে নামিয়ে কলের কাছে মুখ ধোয়াতে নিয়ে গেলেই চলবে। আর আপাততঃ যদি 'ফ্লাইং চেকার' ওঠে, এক-সঙ্গে এতগুলো টিকিট পেলেই সে সন্তুষ্ট হবে—আর কিছুই বলবে না।"

শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইল দেখিলাম। কেবল কাবুলী ও পাঞ্জাবীর মত অন্যরূপ। কাবুলী বলিল, "নেহি, গাড়ীকা কিরায়া হাম দেগা।

পাঞ্জাবী বলিল, "নেহি, মেরী।"

কিন্তু যুবতীর অবস্থা তখন চঞ্চলা হরিণীরই মত।

সকালে এক ভদ্রলোকের ডাকে চাহিয়া দেখিলাম। তিনি বলিতেছেন, "দেখ্ছেন

মশায়, বেশ্যার ঢং! আচ্ছা ও বুড়োরই বা কি আক্কেল! তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, নাতনীর বয়সী—একেই না বলে কলিকাল!"

বলাবাহুল্য, প্রৌঢ় ভদ্রলোক কথানুযায়ী কাষ্য করিতে একতিলও এদিক-ওদিক করেন নাই। লিলুয়ায় দেখিলাম, তিনি নামিয়া নিজে আগে আগে চলিয়াছেন। পশ্চাতে ব্রীড়াবনতা যুবতীর মাথায় হিন্দু কুলবধূর অবগুণ্ঠন। পায়ের জুতা-মোজা অন্তর্হিত। বেশ নিবিষ্টচিত্তে যুবতী মুখ ধুইতে লাগিলেন। চেকার আসিলে প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া নিজে সব টিকিট তাহার হাতে দিতে দিতে বলিলেন, "আপনার বোধ হয় অনেকটা 'ট্রবল' কমান গেল।"

লোকটী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ট্রবল আর কি মশায়? কর্ত্তব্য। সব ঠিক আছে ত?"

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন—একেবারে অলরাইট্!"

চেকারও চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, ধন্যবাদ!"

যুবতী তখন নির্ব্বিঘ্নে আবার গাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া বসিয়াছেন।

হাওড়ায় নামিয়া দেখিলাম একটা কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া যুবতীটি সগর্ব্বে অগ্রসর হইতেছেন। পশ্চাতে দুই মুসলমান যুবক—পেশোয়ারী ও পাঞ্জাবী। আমি হিন্দু নিবৃত্তি-মার্গের পথিক কাজেই ও প্রবৃত্তির দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম।

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পনের

চন্দ্রার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না—তার উচ্ছ্বসিত কথাগুলো আমার ছুই কানে যেন কী এক অশুভ বারতা বহন করে' নিয়ে এল। বিহ্বলের মতো নিশীথবাবুর মুখের পানে তাকালাম। দেখলাম, তিনিও যারপরনাই বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন।

চন্দ্রা বলতে লাগলো—বাস্তবিকই আপনি? আশ্চর্য্য! কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি নে...

মুখের উপর পরিপূর্ণ সার্থকতার তৃপ্তি নিয়ে চন্দ্রা একেবারে নিশীথবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো; তার বিরামহীন প্রগল্‌ভতা যেন আজ আর রোধ হবে না···

—আমি জানতাম, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে যে কথা বিশ্বাস করে' এসেছি—সে বিশ্বাস আমার ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু এখানে, এভাবে আপনার দেখা পাবো, তা' কল্পনাও করি নি।

নিশীথবাবু নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন—পৃথিবীর পরিধি যে খুব প্রশস্ত নয়, এর থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যে আবার একদিন হবে, এ ধারণা আমারও ছিল।

—আপনি কিন্তু ঘোরতর অপরাধে অপরাধী! কেন? আপনি আপনার কথা রাখেন নি। সেদিন আমাদের বাড়ী আসবেন বলে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি। কতদিন আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম! কেন দেখা করেন নি, বলুন!

নিশীথবাবু বল্‌লেন—আমাকে তার পরের দিনই শিলং পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, তাই দেখা করতে পারি নি।

চন্দ্রা এতক্ষণে আমাদের (আমাকে এবং মনীষা দেবীকে) দেখবার ফুরসৎ পেল। খুসী মুখে বল্‌লে—আপনারা আমার আচরণে অবাক্ হ'য়ে গেছেন? হবারই কথা: আপনারা ত জানেন না কোন কথাই! নিশীথবাবু একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন···

নিশীথবাবু সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তখন চন্দ্রার বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাসের গতি রোধ করে, কার সাধ্য। সে বলতে লাগলো—হ্যাঁ, নিশীথবাবুর জন্যেই আমি এখনো এ পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছি—উনি আমাকে জীবন দান করেছেন। কি হয়েছিল শুনুন। একদিন সন্ধ্যার সময় রিক্‌শ করে' বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় পিছনে ভীষণ গোলমাল শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড ওয়েলার ঘোড়া পাগলের মতো ছুটে আসছে। চারিদিকে লোকজনেরা 'গেল গেল' শব্দে চীৎকার করছে! সে-দৃশ্য দেখেই ভয়ে আমার ছুই চোখ মুদে এল—মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু আমার সামনে ধেয়ে আসছে, এ-যাত্রা রক্ষে নেই! রিকশাওয়ালা দু'জন আগেই চম্পট দিয়েছিল। অসহায়ের মতো আমি একা রিক্‌শার মধ্যে বসে' কাঁপ্‌ছিলাম—সমস্ত পৃথিবী তখন

আমার চোখের সামনে যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে' দিয়েছে! কোথা দিয়ে, কেমন করে' কি হ'ল মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখ্‌লাম একটি ভদ্রলোক পথের পাশে আমাকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিচ্ছেন। বুঝলাম, ইনিই আমায় রক্ষা করেছেন; ঘোড়াটা আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার আগেই ইনি ছুটে গিয়ে রিক্শার ওপর থেকে, আমায় তুলে নিয়ে আসেন। উঃ! সে-দৃশ্য আমি কখনো ভুলবো না, কখনো না! ভাগ্যে সেদিন ইনি ছিলেন!

চন্দ্রার কঠিন মুখ ক্ষণকালের জন্য কৃতজ্ঞতার আভায় স্নিগ্ধ নমনীয় হ'য়ে উঠ্‌লো। নিশীথবাবু যেন ঈষৎ অধীর হ'য়ে উঠেছেন—ক্ষিপ্রহস্তে একখানা মাসিক-পত্রের পাতা উল্‌টে তিনি তার ছবিগুলি দেখতে লাগলেন।

চন্দ্রা বল্‌লে—সেদিনের পর আপনি কেন এলেন না, বলুন ত?

নিশীথবাবু শ্রান্তকণ্ঠে বল্‌লেন—বিশেষ দরকার বিবেচনা করি নি। তা' ছাড়া, পরের দিন হঠাৎ জরুরী কাজে পড়ে' আমায় কোলকাতায় চলে' যেতে হয়, তাই দেখা করতে পারি নি।

চন্দ্রা বল্‌তে লাগলো—নিশীথবাবু যে শুধু সাহসী, তাই নন, নিজের কাজের জন্যে উনি কোন ধন্যবাদও গ্রহণ করতে চান না। আমি দিনের পর দিন ওঁর প্রতীক্ষা করেছিলাম; কত জায়গায় ওঁর অন্বেষণ করেছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নি। কিন্তু, ভগবানের বিচিত্র বিধানে, আজ কি অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা হ'য়ে গেল!

মনীষা দেবী এইবার কথা কইলেন; মুখের উপর ক্ষীণ একটি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—হ্যাঁ, এ যেন একখানা রোম্যাণ্টিক নভেলের গল্প। ভাগ্যে তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে নিশীথ, তাই ত এঁর দেখা পেলে!

নিশীথবাবু বল্‌লেন—তা' পেলাম। কিন্তু তুমি কি শুধু মুখের কথা দিয়েই আমাদের আপ্যায়িত করবে?—এক-আধ পেয়ালা চা-ও কি জুটবে না?

মনীষা দেবী ত্বরিত পদে ভিতরের দিকে প্রস্থান করলেন। আমরা পরস্পর কি কথা বলে' আলোচনা চালাব, নীরবে তাই ভাবতে লাগলাম।

কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রা আমাকে প্রশ্ন করল—আপনার বাবা কেমন আছেন?

বল্‌লাম—ভাল নেই। তিনি ভারী অসুস্থ। বাড়ী থেকে একেবারেই কোথাও বার হচ্ছেন না—ডাক্তারের মানা আছে। কয়েকদিন এখনো তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

আমার কথার ওপর চন্দ্রা বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করলে না। নম্রকণ্ঠে বল্‌লে—তাই ত! ভারী দুঃখের কথা! যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করে' কোন লাভ নেই। আমি ইতিমধ্যে এখানকার অনেক লোকের কাছেই খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু তাঁরা সবাই বলেছেন যে, এ-গ্রামে ফণি মজুমদার নামে কোন লোক কখনো ছিল না।

ইত্যবসরে মনীষা দেবী ফিরে এসে চা পরি-বেশন করতে আরম্ভ করেছিলেন। স্পষ্ট দেখলাম, চন্দ্রার শেষ কথায় তিনি চকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন; তাঁর হাতে চায়ের জল-ভর্ত্তি টি-পট্ কেঁপে উঠ্‌ল। নিশীথবাবুর সঙ্গে নিমেষের জন্য তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। দু'জনের চোখের ভাষাই অর্থপূর্ণ!

সহসা চন্দ্রা নিশীথবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে' উঠ্‌লো—আপনি জানেন না?

—কি জানবো?

—ফণি মজুমদার নামে কোন লোককে!

যদি জানেন ত বলুন, আমার জানা বিশেষ দরকার।

চন্দ্রার কণ্ঠস্বরে আগ্রহ এবং মিনতির স্বর বেজে উঠ্‌লো। নিশীথবাবু কি উত্তর দ্যান তা' শোনবার জন্য আমি উৎকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লাম।

নিশীথবাবু ক্ষণকাল নীরব থেকে বল্‌লেন—বহু, বহুদিন আগে ওই নামে একজন লোককে আমি জানতাম; কিন্তু তার সঙ্গে ত এ-ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই!

চন্দ্রা সনিশ্বাসে বল্‌লে—বোধ হয় আপনারা জানেন না, কে আমি এবং কেনই বা এখানে এসেছি। সেদিন এখানে যিনি গুপ্ত-শত্রুর হাতে খুন হয়েছেন, সেই বিজয়লাল দত্ত আমার দাদা!

নিশীথবাবু সহানুভূতিসূচক গুটিকয়েক কথা বল্‌লেন; কিন্তু বিশেষ কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। আমার বোধ হ'ল, তিনি যেন পূর্ব্বে থেকেই জানতেন চন্দ্রা কেন এখানে এসেছে।

চন্দ্রা বল্‌লে—আমার দাদার হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বার করব; আমি তা'কে শাস্তি দেব। তবেই আমার মন শান্ত হবে! ফণি মজুমদারের কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে, সে ছিল আমার দাদার পরম শত্রু; আমার বিশ্বাস, সেই দাদাকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখানে অনেক অনুসন্ধান সত্ত্বেও তার কোন খোঁজ পাই নি। বোধ হয়, সে এখানে নেই। কিন্তু আমি সহজে ছাড়বো না। আমি এখানে এখন কিছুদিন থাকবো; অপেক্ষা করে' দেখবো, দাদার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারি কি না।

তার এই নাতিদীর্ঘ ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাসের উত্তরে কেউ-ই কোন কথা বল্‌লে না। সে বুঝতে পারলে, তার সামনে যে শ্রোতা তিনজন রয়েছে, তারা কেউ-ই তার কথায় বিশেষ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ছে না। সে প্রথমে আমার, তারপর মনীষা দেবীর, অবশেষে নিশীথবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে দেখে তাঁকেই উদ্দেশ করে' বলে' উঠ্‌লো—কিন্তু আমি কি কিছু অন্যায় করছি; আপনি পুরুষ মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি আমার দাদার হত্যাকারীর শাস্তি কামনা করে' কোন অন্যায় কাজ করি নি। এ পৃথিবীতে দাদাই ছিল আমার একমাত্র আত্মীয়। তা'কে যে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে, তা'কে আমি শাস্তি দেবই—যেমন করেই হোক্!

নিশীথবাবু গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—কিন্তু ফণি মজুমদারকে এখানে খুঁজে পাবেন না; চারিদিকে খবর নিয়ে ত দেখ্‌লেন, ও-নামে কোন লোক এখানে নেই।

চন্দ্রা বললে—আমি কৃতকার্য্য হই নি; সেই জন্যে আমি কোলকাতা থেকে একজন ডিটেক্‌টিভকে আনতে পাঠিয়েছি; দেখি, সে এলে কি হয়!

তার কথা শুনে মনীষা দেবী যেন চকিত হ'য়ে নিশীথবাবুর মুখের পানে তাকালেন। চন্দ্রা বুঝলে, তার শেষ কথায় আমরা তিনজনেই তার ওপর বিরক্ত হয়েছি।

চন্দ্রা চালাক মেয়ে। সে-কথা বুঝতে পারা মাত্র সে অন্য আলোচনার অবতারণা করলে। নিশীথবাবুকে দুই-একটা বিষয়ে প্রশ্ন করে' তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে আলাপ সুরু করে' দিলে। নিশীথবাবুও তার পাশে উপবেশন করে' যথাসাধ্য তার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। আমি মৌনমুখে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

এক সময়ে শুনতে পেলাম চন্দ্রা বলছে—আমার দাদা পুরনো ফার্ণিচার কিনতে ভারী ভালবাসতেন। আর্টকিউরিও সংগ্রহ করা

তাঁর একটা বাতিক ছিল। ও বাতিক আমারও কিছু কিছু আছে। তিনি গত বছর আমার জন্মদিনে আমায় ঠিক এই রকম একটি ল্যাকার-এর কাজ করা দেরাজ উপহার দিয়েছিলেন।

এই বলে' তার হাতের কাছে যে কারুকার্য্য-খচিত দেরাজটি ছিল, চন্দ্রা সকৌতুকে সেটি নিরীক্ষণ করতে করতে বললে—আমার দেরাজটির রং ছিল কালো। তার মাথার কাছে এমন একটা গুপ্ত-স্প্রিং ছিল, যেটি টিপে দিলেই পিছন দিক থেকে একটি ছোট্ট বাক্স বেরিয়ে আসতো—তার ভিতর আমি আমার চিঠিপত্রগুলি রাখতাম। দেখি, এ দেরাজ-এও সে-রকম স্প্রিং আছে না কি!

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই তার হাত একটি ছোট বোতাম স্পর্শ করল এবং তার ওপর চাপ দিতেই দেরাজের ভিতর থেকে একটা ছোট টানা বার হ'য়ে এলো। চন্দ্রা অস্ফুট বিস্ময়োক্তি সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সেটি নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

কৌতূহলবশতঃ আমিও নিকটে এসে দাঁড়ালাম। গুপ্ত-বাক্সের মধ্যে একখানি ফুল-সাইজের ফোটোগ্রাফ রয়েছে; চন্দ্রা একাগ্রচিত্তে সেইটি দেখছে! কার ছবি? মুখ বাড়িয়ে দেখে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো সবিস্ময়ে বলে' উঠলাম—এ কী! কী দেখছেন আপনি!

চন্দ্রা কম্পিত ক্রুদ্ধমুখে মনীষা দেবীর দিকে ফিরে বলে' উঠ্‌লো—আপনারা সবাই এতক্ষণ আমার সঙ্গে প্রতারণা করছিলেন। গোড়া থেকেই আমার মনে সে সন্দেহ হয়েছিল। এখন সমস্তই বুঝতে পারলাম।

উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—কী বুঝতে পারলেন?

চন্দ্রা ফোটোখানির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—আপনারা এতক্ষণ সবাই মিলে বলছিলেন, ফণি মজুমদারকে আপনারা জানেন না। মিথ্যা কথা! সেই লোকটার ফোটো ওই দেরাজের মধ্যে রয়েছে। আপনারা সকলে নিশ্চয়ই তা'কে জানেন!

(চলবে)

পলায়ন*

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম্-এ

অদ্ভুত বুদ্ধি তার। কতবার কত রকমের সাংঘাতিক কাজ করেছে সে, পুলিস তার কিছুই করতে পারে নি। এমন সাবধানে কাজ করে সে, যে, পুলিশ তা'কে কোনমতে সন্দেহ-ই করতে পারে না। মনে তার গর্ব্ব ছিল,—কাজে তার ভুল হয় না কোনদিন। বাস্তবিক তার মত বুদ্ধিমান লোক যে কাজেই হাত দিক্ না কেন, চেষ্টা তার ব্যর্থ হবার নয়। শহরের পাকা ব্যবসাদারেরাও তার মত বুদ্ধি ধরে কি না সন্দেহ। সে যদি এ পথে না এসে জীবিকা-অর্জ্জনের অন্য কোন পথ নির্ব্বাচন করত, তা' হলেও অনায়াসে সে আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে যেত—এমনই ছিল তার বুদ্ধির প্রাখর্য্য। তার বুদ্ধি দেখে তার সঙ্গীরা অনেক সময় স্তম্ভিত হ'য়ে যেত!

একখানা খোলা চিঠির উপর দৃষ্টি রেখে সে চুপ করে' চেয়ারের উপর বসেছিল। মাথায় তার নানা রকমের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ যে এই বিপদটা এসে পড়বে, তা' সে ভাবতেই পারে নি। আর বিপদটাও বড় সোজা নয়। যদি সে সেটা কাটাতে না পারে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে। ক'মাস ধরে' সে এই কুটীরে লুকিয়ে আছে—শহর থেকে বহুদূরে। কেউ তার সন্ধান পায় নি। দলের একজন এসে মাঝে মাঝে দেখা করে। যা' কিছু তার দরকার, সেই গোপনে দিয়ে যায়। নিকটে লোকের বসতি নেই। মাইল দেড়েক তফাতে এক গোরস্থান; সেখানেও একজন চৌকিদার ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

গোরস্থানের কথা মনে হতেই সে চঞ্চল চিন্তাগুলোকে জড় করে' নিয়ে কি যেন ভাববার চেষ্টা করলে। ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। গোরস্থান। শব্দটা মাথার মধ্যে যেন বিচিত্রসুরে বাজতে লাগল! কি-একটা অস্পষ্ট কল্পনা ক্রমশঃ যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে' সে একটা চুরুট ধরিয়ে নিলে। চুরুট টানতে-টানতে ঘরের চারিদিক একবার বেশ করে' দেখে নিলে; যা' কিছু তার দরকার হ'তে পারে সবই আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিসের চোখে সে অনায়াসেই ধুলো দিতে পারবে। জীবনে কোন কাজে সে কোনদিন বিফল হয় নি, আজও হবে না।

ভাবতে ভাবতে তার চিন্তার ধারা ভিন্ন দিকে চল্‌ল। এবার তা'কে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। সামান্য একটু ত্রুটির জন্যে আজ এই বিপদ। দীর্ঘকাল সে এই পথে আছে, কখন ধরা পড়ে নি। তার চেহারাও পুলিশের লোক কখন ভালো করে' দেখবার সুযোগ পায় নি। সেই ধনী মহাজনকে হত্যা করার পরদিনই সে শহর ত্যাগ করেছে। পুলিশ তার খোঁজ পেয়েছে সত্য, কিন্তু তা'কে ধরা তাদের কর্ম্ম নয়।...সেই বিপদের মধ্যেও সে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করে' পারলে না। এমন চমৎকার তার ব্যবস্থা যে, পুলিশ তার সন্ধান পেতে-না-পেতেই তার কাছে ওই সংবাদ চলে' এসেছে! টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা নিয়ে সে একটু নাড়াচাড়া করলে।

---

*বিদেশী গল্পের অনুসরণে

এখানে তার বেশীক্ষণ থাকা চলতে পারে না—শীঘ্রই পালাতে হবে। কিন্তু যদি তার চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হয়, যদি সে পুলিসের হাতে ধরাই পড়ে, কি হবে তা' হ'লে? তার চোখের সামনে অমনি ভেসে উঠল বিচারালয়ের ছবি। কাঠগড়ায় সে দাঁড়িয়ে—সামনে বিচারের আসনে বসে' লাল পোষাকপরা গম্ভীর বিচারক। গাউনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা সরকারী উকিল। শ্রান্তি-মলিন জুরারের দল।...ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। অসম্ভব উত্তেজনায় তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত! কিন্তু দু'-চার মিনিটের মধ্যেই সে নিজেকে সংযত করে' নিলে। নাঃ, কাজে ভুল করে যারা, তারাই শুধু দণ্ড পায়।... তার ভয় কিসের? ভুল সে করবে না কখনও। হাতঘড়ির দিকে একবার চেয়ে সে চেয়ারে বসে' পড়ল। চিঠিখানা যে পাঠিয়েছে, তার পরামর্শ-মত কোথাও সরে' পড়লে আপাততঃ নিরাপদ হওয়া যায় বটে, কিন্তু এভাবে পালিয়ে বেড়াবে সে কতকাল! এবার এমন একটা কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, যা'তে পুলিসের লোক আর তার খোঁজ না করে—এই লুকোচুরি খেলার অবসান হয়।

প্রায় মাইল দেড়েক দূরে গোরস্থান। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে' সে ভাবতে সুরু করলে। ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে সে দাঁড়িয়ে উঠে চঞ্চল-ভাবে ঘরের চারিদিকে পায়চারি করতে লাগ্‌ল। তার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন—চোখ দুটো যেন জলছে! দারুণ উত্তেজনায় তার সর্ব্বশরীর যেন কাঁপতে সুরু করল।...খাসা একটা মতলব মাথায় এসে গেছে—আর তা'কে পায় কে? ঘরের কোণে মাটির পাত্রে জল ছিল, এক গ্লাস ঢেলে নিয়ে সে নিঃশেষে পান করলে। তারপর সে দরজাটা খুলে বাইরের দিকে তাকালে। দম্‌কা হাওয়ায় জোরে দরজাটা তার হাতের উপর আছড়ে পড়ল। বৃষ্টির ঝাট্‌ মেঝের খানিকটা ভিজিয়ে দিলে। বাইরে ঘুরঘুটে অন্ধকার। জোরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ কাণে তালা লাগিয়ে দেয়। দরজাটা বন্ধ করে' সে আবার ঘড়ির দিকে তাকালে। ন'টা বেজে পনেরো মিনিট। এখনও যদি সে বেরিয়ে পড়তে পারে, তা'হ'লে বারোটা বাজবার আগেই সে কাজ হাঁসিল করে' পালাতে পারবে। বারোটার এদিকে পুলিসের লোক যে আসবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লণ্ডনের কোন ট্রেণই রাত দেড়টার আগে এখানে পৌঁছয় না। কুটীরের পিছন দিকে একটা চালার মধ্যে দু'জনের বসবার মত একখানা ছোট মোটর গাড়ী লুকোনো ছিল। হঠাৎ যদি পালাতে হয়, তারই জন্যে এখানা সে সঙ্গে এনেছিল। যদিও, সত্য কথা বলতে কি—এমনি ধারা যে একটা বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে, এ ধারণা তার একেবারেই ছিল না। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে' সে দরজা খুলে চালার দিকে পা চালিয়ে দিলে। মিনিট কয়েক পরেই আলো না জেলে অন্ধকার পথে গাড়ী নিয়ে সে অগ্রসর হ'ল গোরস্থানের দিকে। কিন্তু পথ এমনই অন্ধকার যে, কিছুদূর গিয়েই তা'কে আলো জালতে হ'ল—কে জানে, যদি কোথাও খানাডোবা থাকে, পড়তে কতক্ষণ! খানিক পরেই গাড়ী একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের কাছাকাছি হ'ল। গোরস্থানের নিকটে পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরে, সে গাড়ীর বেগ কমিয়ে দিলে—গাড়ী ধীরে ধীরে ফটকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে আস্তে আস্তে নেমে চতুর্দ্দিকে সে সতর্কভাবে দেখলে, বেশ করে' কাণ পেতে শুনলে কোনোদিক্‌ থেকে কোনো আওয়াজ আসচে কি না। গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পেলে

না। পকেট-ল্যাম্পের আলো ফটকের উপর ফেলে সে পকেট থেকে একটা যন্ত্র বা'র করলে —তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে ফটকের তালা খুলে ফেল্‌লে। চারিদিকে আর একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করে' সে গাড়ীর কাছে ফিরে এল। তারপর গাড়ীর ভিতর থেকে একখানা কোদাল বা'র করে' সে ফটক খুলে গোরস্থানের ভিতর ঢুকল। চারিদিকে কবর —কবরের পাথরগুলো অন্ধকারের মধ্যে যেন তার পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে! শেওলা-ঢাকা একখানা পাথরে হোঁচট পেয়ে একবার পড় পড় হ'ল, তাড়াতাড়ি কবরের শিকলটা ধরে' ফেলে কোনমতে সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলে। পকেট-ল্যাম্পের আলো চারিধারে ফেলে সে কবরগুলোর মাটি পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল। এক জায়গায় এসে সে দাঁড়াল। ল্যাম্পের আলো একখানা পাথরের উপর ফেলে সে নীচু হ'য়ে কি লক্ষ্য করতে লাগল। পাথরের উপরকার লেখাটা সে মনে-মনে পড়লে। স্নেহের কন্যা মার্জ্জোরীর মধুময় স্মৃতির উদ্দেশে—

এই পর্য্যন্ত পড়েই বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গী করে' সে সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। দু'-চার পা এগিয়েই সে আবার থাম্‌ল। ল্যাম্পের আলো পড়ল একটা কাঠের ক্রশের উপর। তা'তে লেখা—

স্যামুয়েল মার্টিনের পবিত্র স্মৃতিতে—

মৃত্যু ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

বয়স ৩৫

কয়েকছত্র কবিতাও নীচে লেখা আছে; কিন্তু সেদিকে সে মনোযোগ দিলে না। তার দৃষ্টি স্থির হ'য়ে আছে লেখার একজায়গায়—বয়স পঁয়ত্রিশ। ভাগ্য তার প্রতি সত্যই প্রসন্ন।...আর সাতই ডিসেম্বর, উনিশশো—মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে লোকটার মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ, এই মৃতদেহের সাহায্যেই তার কাজ হাসিল হবে। পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে—মুখখানাও চেনা যাবে না নিশ্চয়। কবরের লেখাটা সে আর একবার পড়ল—না, ঠিকই দেখেছে সে।

আশপাশের কবরগুলোর দিকে একবার তাকালে—হঠাৎ তার সর্ব্বশরীর যেন ভয়ে ভারী হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, যেন কবরের পাথরগুলো হঠাৎ জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে—তাদের ক্রুদ্ধদৃষ্টি তারই মুখের পানে নিবদ্ধ!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে' যেতেই তার ভয় কেটে গেল। গাড়ীটা যে রাস্তায় পড়ে' আছে! যদি কারো নজরে পড়ে' যায়!...ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সে ফটকের দিকে ছুটল। মনে তার ধিক্কার এল—এতবড় মূর্খ সে, যে, কবরের পাথর দেখে ভয়ে জ্ঞানহারা হ'য়েছিল!...রাস্তার চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করে' সে গাড়ীতে উঠল—তারপর গাড়ী নিয়ে আস্তে আস্তে ফটক পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। গাড়ী থেকে একখানা কুড়ুল বা'র করে' সে স্যামুয়েল মার্টিনের কবরের কাছে এল। তারপর ওভারকোটের বোতাম এঁটে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে সুরু করলে। উপরকার মাটি সে খুব সাবধানে সরিয়ে ফেললে—পরে আবার ওই মাটি উপরে চাপা দিতে হবে বলে'। তারপর কোদালে করে' ঝপাঝপ্ মাটি তুল্‌তে লাগ্‌ল। সেই শীতের রাত্রেও তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে সুরু হ'ল। বৃষ্টির তেজ ক্রমশঃ কমে এল। তখনও চারিদিক্ নিস্তব্ধ। বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। ঘণ্টাখানেক সে কাজ করে' গেল—মুহূর্ত্তের বিশ্রাম না নিয়ে। একবার কাজ বন্ধ করে' ক্ষণকাল সে কি ভাবলে—মনে হ'ল যেন একটা ভয়াবহ চিন্তা তার মনকে ক্রমশঃ অধিকার করছে। লোকটা যদি খর্ব্ব-কায় বা বিকলাঙ্গ হয়, তা' হলেই ত সর্ব্বনাশ!

তার নিজের দেহের গঠন ও দৈর্ঘ্য সাধারণেরই মত। দৈর্ঘ্যে সে পাঁচফুট ন' ইঞ্চি। যাই হোক্, ভাগ্য পরীক্ষা করতে দোষ কি?...এটাও ত ঠিক্ যে, অধিকাংশ লোকের দেহের গঠন অনেকটা একরকমের। আর তা' ছাড়া, পাঁচ সপ্তাহ পরে···চিন্তাটাকে অসম্পূর্ণ রেখে সে আবার মাটি খুঁড়তে সুরু করলে।

খানিক পরেই তার পা একটা শক্ত জিনিষে ঠেক্‌ল। কুড়ুলখানা নিয়ে সে জোরে জোরে তার উপর আঘাত করতে লাগল। দু'-চার ঘা মারতেই বাক্সের ডালা চৌচির হ'য়ে গেল। দু'এক মিনিট পলকহীন নেত্রে সে বাক্সের ভিতর দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে একটা ভারী জিনিষ টেনে উপরে তুলতে লাগল। একখণ্ড শাদা কাপড়ে দেহটা ঢাকা—মুখখানা এমনি বিকৃত হ'য়ে গেছে যে, তা' দেখে মানুষের মুখ বলে' চেনা দুষ্কর। শ্রান্তভাবে মরা লোকটাকে টেনে এনে সে গাড়ীর উপর বসালে। তারপর কবরের কাছে ফিরে এসে মাটি দিয়ে সেটা ভরাট কর্‌তে সুরু করলে।

এমন করে' সে কবর ভরাট কর্‌লে যে, সেখান থেকে মৃতদেহ সরানো হয়েছে এ সন্দেহ করার কোনো চিহ্নই রইল না। রাস্তার চারিদিক ভালো করে' দেখে নিয়ে সে গাড়ী চালিয়ে দিলে। গাড়ী যখন কুটীরের কাছাকাছি হ'ল, তখন সে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে সাড়ে এগারোটা। কিছুদূরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে সে সাবধানে কুটীরের দিকে চল্‌ল। কি জানি, পুলিসের লোক যদি এরি মধ্যে এসে থাকে। তারপর ফিরে এসে গাড়ী নিয়ে দরজার সামনে হাজির হ'ল। ওভারকোটটা খুলে রেখে মরা লোকটাকে টান্‌তে টান্‌তে সে ভেতরে নিয়ে চল্‌ল।

*　　*　　*

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে পোষাক বদ্‌লে ফেলেছে। সামনে মেঝের উপর সেই মরা লোকটা—তার দেহে তারই পরিত্যক্ত পোষাক। কবরের পোষাকগুলো গাড়ীর মধ্যে। মরা লোকটার দিকে চেয়ে সে একটু হাসল।... ভাগ্যের উপর নির্ভর করে' সে এই ভয়াবহ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল—অদ্ভুত বুদ্ধি তার, তাই সে কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছে! মনে-মনে সে বল্‌লে, ওই শীর্ণ কদর্য্য মুখখানা যে তার নয়, একথা এখন কে বলবে জোর করে'? মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে—তার মুখ দেখে তখন তা'কে চেনা কখনও কি সম্ভব হ'তে পারে?...আশ্চর্য্য, লোকটার দেহের গঠনও কি তারই মত! পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে এই কুটীরে সে যদি মারা যেত, তা' হ'লে আজ তা'কে দেখ্‌তে হ'ত অবিকল ওই লোকটার মত। হঠাৎ নীচু হ'য়ে সে শবটাকে ভালো করে' লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল—পোষাকের দিক্ থেকে কোনো কিছু বাদ পড়ে নি ত?

তারপর সে নিজের পকেট থেকে নানারকম জিনিস মরা লোকটার পকেটে ভরে' দিতে লাগল। যে-সব জিনিস সচরাচর তার সঙ্গে থাকে, তার কোনোটাই যেন দিতে ভুল না হয়! পকেট-বুক, ফাউণ্টেন-পেন, বন্ধুদের লেখা খানকয়েক চিঠি, সিগারেট-কেস, হাতঘড়ি, ছুরি—সবই সে একে একে তার পকেটে ভরে' দিলে। মণিব্যাগ থেকে খানকয়েক নোট বা'র করে' নিয়ে সেটাও তার বুক-পকেটে রেখে দিলে। যা' কিছু তার সঙ্গে ছিল, সবই এখন মরা লোকটার কাছে।

কাজ আর বাকী কিছু আছে কি না স্থির করবার জন্যে সে ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে। এখনো একটা কাজ বাকী। ঘরের

কোণ থেকে সে তরল কোকেনের একটা বোতল নিয়ে এল। হত্যা-সংক্রান্ত নানাকাজে সে এই কোকেনের ব্যবহার করেছে। হিসাব করে' খানিকটা কোকেন সে একটা 'সিরিঞ্জে' ঢাল্‌লে। তারপর নীচু হ'য়ে মেঝেয় রাখা শবটার হাতে সিরিঞ্জের মুখটা বসিয়ে 'পিষ্টন'টা টিপে দিলে। তারপর মৃতব্যক্তির হাতে সাবধানে সিরিঞ্জটা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে সে আপন-মনে বললে, "কোকেনে শোচনীয় মৃত্যু!"

মুখে তার কৌতুকের হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

মিনিট পাঁচেক পরে নির্জ্জন পথে তার গাড়ী তীরবেগে ছুটছে।

* * *

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন, "লোকটা অন্ততঃ তিন-চার সপ্তাহ আগে মারা গেছে।"

"আমিও ভেবেছিলুম তাই। আমাদের আশাটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী মন্তব্য করলেন, "কাগজওয়ালাদেরও খুব ক্ষতি হ'ল যা' হোক্! এমন একটা খুনী আসামীর বিচার আরম্ভ হ'লে কাগজ বিক্রী হ'ত বিস্তর।"

ডাক্তার চেয়ারে বসে' রিপোর্ট লিখতে সুরু করলেন।

সিরিঞ্জের দিকে চেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বল্‌লেন, "আমার মনে হয় এ মৃত্যু স্বেচ্ছাকৃত নয়—আকস্মিক।"

ডাক্তার মুখ ফেরালেন। "হ্যাঁ, সম্ভবতঃ তাই। 'পোষ্টমর্টেম' পরীক্ষায় কোকেনের পরিমাণটা জানা গেলেই বলতে পারা যাবে আত্মহত্যা করা এর উদ্দেশ্য ছিল কি না।"

* * *

ঠিক যে-সময় ডাক্তার কুটীরে বসে' রিপোর্ট লিখ্‌ছেন, সেই সময় প্রায় সত্তর মাইল দূরে রাস্তার ওপর একখানা মোটর গাড়ী থাম্‌ল। মোটর-চালক একটা সিগারেট ধরালে। সারারাত সে গাড়ী চালিয়েছে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সম্ভবতঃ কোনো হোটেলে পৌঁছুতে পারবে। সময়টা কত জানবার ইচ্ছা হতেই অভ্যাসমত সে বাঁ হাতের দিকে চাইলে। মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনা। একটু হেসে সে গাড়ীতে 'ষ্টার্ট' দেবার উপক্রম করলে। হঠাৎ কি-একটা কথা স্মরণ হওয়ায় তার দেহ যেন শক্ত অসাড় হ'য়ে গেল। ভয়ে দুঃখে ক্ষোভে সে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ, কি নির্ব্বোধ আমি!"

তারপর হিংস্র-দৃষ্টিতে চারদিকে একবার চেয়ে ভীষণবেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।

* * *

ডাক্তারের রিপোর্ট লেখা তখনও শেষ হয় নি। মৃতব্যক্তির কোটের পকেট থেকে যে-সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই-গুলো আবার পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ওয়েষ্টকোটের পকেট সন্ধান করা হয় নি। মৃতব্যক্তির শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসে' তিনি ওয়েষ্টকোটের ডানদিকের পকেটে হাত দিলেন। একটা কলম ছাড়া সেখানে আর কিছু পেলেন না। বাঁ-দিকের পকেটে হাত দিতে গিয়ে হঠাৎ তিনি স্থির হ'য়ে কি যেন শুনতে লাগ্‌লেন। মৃতব্যক্তির বাঁ হাতের কব্জির দিকে ধীরে ধীরে তাঁর মুখখানা ঘুরে গেল। বিস্ময়ে তাঁর চোখ দুটো ক্রমশঃ বড় হ'তে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ডাক্তারের দিকে ফিরে তিনি বল্‌লেন, "এই লোকটা কতদিন মারা গেছে আপনি বল্‌ছিলেন?"

ডাক্তার একমনে রিপোর্ট লিখছিলেন, কাগজ থেকে চোখ তুলে বল্‌লেন, "প্রায় তিন সপ্তাহ।"

"তা' হ'লে এটার সম্বন্ধে আপনি কি বল্‌তে চান্?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৃতব্যক্তির বাঁ হাতখানা উঁচু করে' তুলে ধরে' বল্‌লেন, "শুনুন।"

নিস্তব্ধ কক্ষের মধ্যে তিনজনেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন—মৃতব্যক্তির কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীবিমল সেন, বি-এস-সি

বেলা প্রায় একটার সময় শেষ 'কল্' সারিয়া শ্রান্তদেহে বাড়ী ফিরিলাম। 'কন্সলটিং রুমে' ব্যাগটা রাখিতে গিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম, বিকালে আর কোন 'কলে' বাহির হইব না। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

বয়সও অনেক হইল—পূর্ব্বের মত সামর্থ্য আর নাই। তাহা ছাড়া, দিনের পর দিন একটানা হাড়ভাঙা খাটুনির পর দুই-একদিন যদি বিশ্রাম গ্রহণ করি, তাহা হইলেই বা আমার কিসের ক্ষতি।

ব্যাঙ্কের টাকা মাসের পর মাস ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এত বড় বাড়ী, মোটর-কার, ঘরে প্রেমময়ী সাধ্বী স্ত্রী সুনীতি। সুনীল আর সুকৃতি—আমাদের দু'টি ছেলে-মেয়ে। কিছুরই ত অভাব নাই।

সকালবেলার ডাক্ টেবিলের উপর পড়িয়া থাকে। সেগুলি দেখিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া থাকি। আজও বসিলাম। পড়িবার নূতন বড়-একটা কিছু থাকিবে না জানিতাম। দুইটী অনাথা দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সাহায্য-ভিক্ষার পত্র; কয়েকজন রোগীর উপস্থিত অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ—নিত্যই এই ভাবের দুই-চারিখানা চিঠি আসিয়া থাকে।

শেষে যে চিঠিখানা লইলাম, তাহা পাঠ করিয়া সহসা যেন আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্থির হইয়া গেল! চোখে অন্ধকার দেখিলাম। ওঃ, ইহা যে স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি নাই!

নারী-হস্তের বড় বড় অথচ সুন্দর অক্ষরগুলি। কিন্তু, প্রত্যেকটি অক্ষর যেন আগুনের ফুল্কির মত আসিয়া আমার বুকের ভিতর ছ্যাকা দিতে লাগিল। চিঠিতে লেখা—

শ্রীচরণকমলেষু,

অভাগিনী কনকলতাকে মনে পড়ে? প্রায় পনের বছর পূর্ব্বে, তোমাদের কেশবপুরের বাড়ী হইতে একদিন রাত্রের অন্ধকারে সব কলঙ্কের বোঝা সম্পূর্ণ নিজের ঘাড়ের উপর লইয়া যে একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে আজও ভুলিতে পার নাই?

আজ সারা কলিকাতায় তোমার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তোমার ঘরে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে। জানি, তোমার হৃদয় কত উচ্চ। তাই বিশ্বাস, অভাগিনী কনককে তুমি হয় ত ভোল নাই।

যখন তোমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসি, তখন আমার কি অবস্থা ছিল, তা'-ও বোধ হয় স্মরণ আছে? যেদিন সে সংবাদ প্রথম তোমাকে জানাই, সেদিন তোমার মুখে মর্ম্মপীড়ার যে ছবি দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি সহিতে পারি নাই। তাই, সেই রাত্রেই তোমাকে সব কলঙ্কের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজেই চলিয়া আসিয়াছিলাম।

সেদিনের কথা স্মরণ করিতে আজও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! এমন দুর্দ্দিন মানুষের যেন কখনও না আসে! যাক্, সে সব কথা এখন আর বলিয়া কোন লাভ নাই।

তাহার মাস কয়েক পরেই কোথায়, কেমন

করিয়া আমার কোলে চাঁদের মত টুক্‌টুকে একটি খোকা আসিল, কি ভাবে এই পনের বৎসর ধরিয়া তাহাকে মানুষ করিলাম এবং নিজেও বাঁচিয়া রহিলাম, তাহা লিখিয়া তোমার এই বয়সে আর দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়াইয়া তুলিব না।

আমি জানিতাম, তুমি মস্ত বড়লোক হইবে। সেই ক্ষণিক ভুলের কলঙ্ক তোমার উন্নতির পথে বাধা না দেয়, সেই জন্যই নিজেকে এতদিন দূরে রাখিয়াছি। ভুলিয়া কাহারও কাছে তোমার নাম করি নাই। কিন্তু আমার দিন ফুরাইয়াছে! এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌছিবে, তখন আমি পৃথিবীর বুক হইতে চির-বিদায় লইয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া যাইব!

কোনদিন তোমার নিকট কিছু চাহি নাই। আজ কিন্তু সকাতরে একটি ভিক্ষা চাহিতেছি। এই প্রথম ও এই শেষ! আমার দীনু, মাত্র পনের বৎসরের অবোধ বালক। আমি চলিয়া গেলে, সে একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়িবে! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার বুক ভাঙিয়া যাইতেছে! তুমি ছাড়া তাহার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না! সে-ত তোমারই সন্তান! তাহার ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি! পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, এ চিন্তাটা বারবার মনে পড়ায় আজ আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না!

যে ক'দিন জীবনের মেয়াদ ছিল, সে ক'দিন বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার যতটুকু সুযোগ পাইয়াছি, তাহা করিয়াছি। এইবার তাহাকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

ভুল বুঝিও না। তাহাকে তোমার সত্যকার পরিচয় কিছুই দিই নাই। সে জানে না,—তুমি তাহার কে। দয়ালু, গরীব-দুঃখীকে সাহায্য কর, তোমার কাছে গেলে, তাহার একটা উপায় হইবেই—এই বলিয়া তাহাকে তোমার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছি।

রাগ করিও না। আমি ত চলিলাম। পৃথিবীতে আর কেহ-ই ত এ ঘটনা জানে না। সুতরাং, ভয় কিম্বা দ্বিধা করিবারও কিছু নাই।

আমার দীনুকে দেখিও। সে আমার নয়নের মণি! তাহাকে বুকে পাইয়া আমি আমার সব দুঃখ জ্বালা ভুলিয়াছিলাম!

এইবার আসি! আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিও। স্বর্গ কিংবা নরক—যেখানেই থাকি, আমার দীনুকে সুখী দেখিতে পাইলে শান্তি পাইব। ইতি,

চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন
কনক

দীর্ঘ পনের বৎসর পূর্ব্বের আমার জীবনের যে নিকৃষ্টতম ঘোর কলঙ্কের কাহিনী এতদিন একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, আজ একে একে আবার সব চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ভয়-ভাবনাহীন, অদূরদর্শী যুবক তখন আমি। যৌবনের উষ্ণ রক্ত শিরায় শিরায় বহিয়া চলিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের সেটা আমার শেষ বৎসর।

বাবাও ছিলেন ডাক্তার। কেশবপুরে প্রাক্‌টিস্ করিতেন। এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, আমাদের গ্রামের কনকের একমাত্র আশ্রয় তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

একই পাড়ায় বাড়ী। কনকদের সহিত আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাহার উপর একটা কুঁড়ে ঘরে একাকী অভিভাবকহীনা বিধবা তরুণী কনক। সে যে কী দুর্দ্দিনের ভিতর পড়িয়াছে, বাবা তাহা

ভালরূপই বুঝিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই সে আসিয়া আমাদের কেশবপুরের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। মা অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে তাহাকে সমাদরে ঘরে তুলিয়া লইলেন।

সেই কনক! অমন শান্ত, সুন্দর লাবণ্যময় মুখ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাহার অন্তরটি ছিল স্নেহপ্রবণ, অত্যন্ত কোমল। মুখ ফুটিয়া কোনদিন কিছু চাহিত না। কখনও তাহার মুখে কোন অভাবের অভিযোগও শুনি নাই।

তাহার সহিত পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু, এখন যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কনক আমাকে চোখের আড়াল করিতে পারিত না। একদিন বুঝিলাম, আমার বুকের অনেকখানি সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার শেষ পরীক্ষার মাস ছয়েক পূর্ব্বে কয়-দিনের ছুটিতে কেশবপুরে গিয়া একদিন কনকের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ভাবনা, ভয় এবং তীব্র অনুশোচনায় আমার সমস্ত অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল।

কনককে সত্য-সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম। ওই অসহায়া ক্ষীণা কনক, যাহার সৌন্দর্য্য এবং মিষ্টত্ব বৃন্তে ফোটা ছোট্ট একটি ফুলের সহিতই উপমেয়—শুধু দূরে দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতে হয়। তাহার এতবড় সর্ব্বনাশ আমি কিরূপে করিয়া বসিলাম? ওঃ, কী সে তীব্র আত্মদাহ!

আমি পাপী, সন্দেহ নাই। কিন্তু কনকের এতবড় সর্ব্বনাশের কথা ধারণাও করিতে পারিতাম না। সে রাত্রে চোখে একটুও ঘুম আসিল না। পরদিন সকালে শুনিলাম, কনক বাড়ীতে নাই। সকলে অন্তরূপ বুঝিল। দুঃখে, ঘৃণায় মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবা বাহিরের ঘরে গিয়া গম্ভীর-মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী আমি, আমার মসীলিপ্ত মুখ লইয়া কোথায় গিয়া যে লুকাইব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

ধীরে ধীরে পনের বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইহার ভিতর কনকের আর কোন সংবাদ পাই নাই—লইবার চেষ্টাও করি নাই।

এখন বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আজকাল কখনও কখনও রাত্রের অন্ধকারে কিংবা কোনও সঙ্গহীন মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে—দু' ফোঁটা অশ্রু অতি সঙ্গোপনে গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়ে!

সেই কনক এতদিন বাঁচিয়াছিল! আমার যশ, মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই জন্ত কাহারও কাছে আমার কলঙ্কের কথা ব্যক্ত করে নাই। বুকের রক্ত দিয়া এতদিন সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে!

কিন্তু, আমি কি করিয়াছি? আমার অপরাধ যে তাহার চেয়েও বেশী! সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া কে যেন বারবার বলিতে লাগিল—কনক, তোমার দীনুর ভার আমি লইলাম! যেখানেই থাক, দেখিয়া সুখী হইও!

*　*　*

পরদিন বিকালে বাহিরে যাইবার জন্ত ফটকের সম্মুখে 'কারে' উঠিতে যাইতেছি, সহসা পিছন হইতে ক্ষীণ, আর্ত্তকণ্ঠে কে ডাক দিল—ডাক্তারবাবু!

সকাল হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই দীনুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যাহাকে দেখিলাম, তাহাকে পূর্ব্বে কখন না দেখিলেও চিনিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না।

সুন্দর, ফুটফুটে পনের বৎসরের বালকটির মুখের সহিত আমার ওই বয়সের আশ্চর্য্য

সাদৃশ্য রহিয়াছে! যেন আমারই 'কটো'! ছেঁড়া হইলেও পরণে একখানি পরিষ্কার ধুতি ও একটি পাঞ্জাবী। পায়ে কিছু নাই।

বুকের ভিতরটা হঠাৎ তোলপাড় করিয়া উঠিল। একহাতে 'কার্ড'টা ধরিয়া ফেলিয়া মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— কি চাই তোমার?

দীনু একবার আমার প্রতি চাহিয়া সহসা মাথা নত করিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে? কারও অসুখ?

সে অতিকষ্টে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল— না ডাক্তারবাবু, আমার মা কাল···

বলিতে বলিতে সে আবার ভাঙিয়া পড়িল।

কনক তবে সত্যই মরিয়া জুড়াইয়াছে! হায় হতভাগিনী! সে কি কোনদিন আমায় ক্ষমা করিতে পারিয়াছিল! আমার সারা অন্তর আর্ত্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেহ যদি আমার এ পরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলে!

ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লই; চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলি —দীনু, ওরে দীনু, জানিস আমি তোর কে?

সন্তান যে কি বস্তু, তাহা এখন যে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি! নিজেকে হয়ত সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিব না ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম —আচ্ছা, তুমি আমার ওই বাইরের ঘরে বসো গিয়ে। এখন 'কলে' বেরুচ্ছি; ফিরে এসে তোমার সব কথা শুনব।

দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া দীনুকে বসাইতে বলিলাম।

রোগী দেখিতে গিয়া সবই গোলমাল হইয়া গেল। কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না। যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বুকের ভিতরকার ঝড়টা অনেকটা কমিয়াছে।

দীনু এককোণে বসিয়াছিল। অন্যান্য রোগী-দের বিদায় করিয়া, তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—এইবার বল। কি হয়েছে তোমার মায়ের?

দীনু ধীরে ধীরে বলিল—মা কাল মারা গেছেন। কাল থেকে কিছু—

বলিয়া সে মাথা নত করিল।

—কাল থেকে কিছু খাও নি?

—না।

বলিলাম—তা' এখন কিছু খেতে চাও?

দীনু একবার একটু ইতস্ততঃ করিল; তার-পর হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—ডাক্তারবাবু, আমার আর কেউ নেই! মা মারা যেতে তারা আমার ঘর ছেড়ে চলে' যেতে বলে' দিয়েছে। বলেছে—ভিক্ষে করে' খেগে যা'। আমি কক্ষনো ভিক্ষে করি নি ডাক্তারবাবু। মা একদিন বলেছিল—আপনার কাছে আসতে। বলেছিল—তাঁর পায়ে ধরে' বলিস, তা' হ'লে তোর আর কোন দুঃক্ষু থাকবে না। তাই আমি আজই চলে' এসেছি। আমাকে এখানে থাকতে দিন ডাক্তারবাবু। আমি আপনার ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে দেব, ছেলেপুলে রাখব, যা' বল্‌বেন, তাই করব। মা বলে' গেছে—তুই ভিক্ষে করিস নি কক্ষনো।

বলিয়া আবার আমার পা দুইটা সজোরে বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিল।

ভগবান এ কী কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলে! এতবড় দণ্ড সহিতে পারিব বলিয়া যে মনে হয় না!

যাহার ব্যাঙ্কভরা টাকা, সুনামে যাহার দেশ ছাইয়া গিয়াছে, সংসারে কোন কিছুরই অভাব

যাহার নাই, তাহার ঔরসজাত সন্তান দুইদিন অনাহারের পর তাহারই বাড়ীতে আসিয়া এই-ভাবে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে! এ কি কেহ কখনও দেখিয়াছে! এ কি কেহ কল্পনা করিতে পারে!

অথচ, আমি তাহাকে একটু আদর দেখাইতে পারি না! পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না! আমার এতদিনকার অর্জ্জিত যশ, মান সব তাহা হইলে মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে! আমার স্নেহময়ী স্ত্রী ঘৃণায় হয় ত আত্মঘাতিনী হইবে। ছেলে-মেয়ে দু'টির লজ্জার আর সীমা থাকিবে না!

দীনু আবার বলিল—আমি এখান থেকে কোথাও যাব না ডাক্তারবাবু!

সেই সময় আমার স্ত্রী সুনীতি বুঝি বা দীনুর কান্নাকাটি শুনিয়াই সে ঘরে প্রবেশ করিল। প্রমাদ গণিলাম! সর্ব্বনাশ! দীনুর যদি সব কথা জানা থাকে? যদি সে সমস্ত সুনীতির কাছে ব্যক্ত করিয়া দেয়? আমার অপরাধী অন্তর তাহার চোখের সম্মুখ হইতে দূরে পলাইয়া যাইতে চাহিল।

কিন্তু বড় ভাল মেয়ে সুনীতি। কনকেরই মত স্নেহপ্রবণ তাহার হৃদয়। তাহার ভিতরকার মায়ের প্রাণ সর্ব্বদাই সব কিছুকে স্নেহের বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়। সে ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে গা—কে ও ছেলেটি?

যথাসম্ভব মুখ আড়াল করিয়া বলিলাম—এই যে, তোমাকে ডাকব ভাবছিলুম। এই ছেলেটি বল্‌ছে, কাল ওর মা মারা গেছে। ওর আর কেউ নেই। এখানে এসেছে কাজের খোঁজে। কিছুতেই যেতে চায় না; কান্নাকাটি লাগিয়েছে। দু'দিন কিছু খায়ও নি বল্‌ছে।

সুনীতির চোখে-মুখে অমনি স্নেহের আভা ফুটিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া দীনুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তোমার নাম কি বাবা?

—দীনু।

—আহা, তোমার মা মারা গেছে! কাল? কি হয়েছিল?

দীনু বলিল—জ্বর। অনেকদিন থেকে জ্বরে ভুগছিল।

—কি কর্‌ত তোমার মা? এতদিন তোমরা কোথায় ছিলে?

—বাগবাজারে। দত্তদের বাড়ী মা রান্না করত।

—তোমার বাপও নেই না কি?

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

দীনু জবাব দিল—আমি ছোট থাক্‌তে বাবা একদিন কোথায় যে চলে' গেল, আর এল না। মা বলত—আসবে সে নিশ্চয়ই একদিন!

সুনীতি আবার জিজ্ঞাসা করিল—এখানে আস্‌তে তোমায় কে বলে' দিলে?

—মা একদিন বলেছিল—ডাক্তারবাবু কত বড়লোক; সবাই তাঁকে চেনে। তোকে তিনি কিছুতেই ফেল্‌তে পার্‌বেন না।

সুনীতি এইবার ক্ষণকাল দীনুর মুখের প্রতি চাহিয়া যেন একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি বলছ? বাড়ীতে ঝগড়া-টগড়া করে' চলে' আসনি ত?

দীনু তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চাহিয়া বলিল—না ডাক্তারবাবু, আপনি চলুন আমার সঙ্গে দেখিয়ে আনি—মা যে ঘরে মরেছিল, সে ঘরে তার কাপড় আর আমার দু'খানা বই এখনও পড়ে' আছে। তারা আমার তাও নিয়ে আসতে দেয় নি।

আবার তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝড়িয়া পড়িল। বলিল—মা কত কষ্টে পয়সা

বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমার বই কিনে দিত, তা' আনতে পারলাম না !···

চাহিয়া দেখিলাম, সুনীতি অঞ্চলে চোখ মুছিতেছে। কিন্তু অভিশপ্ত আমি, মুখে বিষাদের ছায়ামাত্র না পড়ে, প্রাণপণে শুধু সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলাম!

সুনীতি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া শেষে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল—থাক্ এখানে, কি বল? আহা, বেচারীর কেউ নেই! মা-টাও কাল মারা গেছে! কোথায় বা যাবে!

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দীনু ছুটিয়া গিয়া সুনীতির পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। এত দুঃখের পর এই সাফল্যে সে বুঝি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, এখানেই থাকি। নইলে পথে পথে ঘুরে, ফুটপাতের ওপর মরে' পড়ে' থাকতে হবে। আমি আপনাদের সব কাজ করে' দেব; যা' বলবেন, তাই। বেশী খাইও না; একবেলা খেতে দিলেই চল্‌বে।

বলিয়া সুনীতির পায়ের উপর পুনরায় মাথা নত করিল। চোখ মুছিয়া বলিল—কি কি কাজ কর্‌তে হবে, বলে' দিন।

সুনীতি মুখ ফিরাইয়া আর একবার চক্ষু মুছিয়া লইয়া বলিল—দু'দিন খাওয়া হয় নি, আগে চাট্টি খেয়ে নাও। তারপর, কাজ-কর্ম্ম বলে' দেব 'খন।

বলিয়া সম্মতির জন্যই বুঝি একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দীনুকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে যাইবার পথ দেখাইয়া বলিল—এস, আমার সঙ্গে।

* * *

একমাস গত হইয়া গেল।

দীনুর জন্য উদ্বেগ, আশঙ্কা তখন অনেকটা কমিয়াছে। বাড়ীর সবাই তাহাকে ভালবাসে। সুনীতি কিন্তু তাহার প্রতি একটু বেশী স্নেহশীলা। সে তাহার কাজ ঠিক করিয়া দিয়াছে—নিত্য আমাদের চারিজনের ঘরের জিনিষ-পত্র সাজান-গোছান, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাজার হইতে এটা-সেটা আনা, এবং সকাল-সন্ধ্যায় আমার কন্‌সল্টিং রুমের বয়গিরি করা।

দীনু উৎসাহের সহিত নিত্য দুইবেলা নিজের কাজ করিয়া যায়। কখনও কোন কাজ সে ফেলিয়া রাখে না, বা তাহাকে মনে করাইয়া দিতে হয় না। তাহার দাদাবাবু এবং দিদিমণির ঘর দুইটা লইয়াই সে বেশী ব্যস্ত। তাহাদের সহিতও তাহার বেশ সদ্ভাব। আমি মাঝে মাঝে রাত্রে কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া বিছানায় শ্রান্ত দেহটা এলাইয়া দিয়া ডাক দিই—দীনু, মাথাটা একটু টিপে দিয়ে যা'।

সে হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসে। কোমল হস্তে পরম যত্নে আমার মাথা ও গা টিপিয়া দেয়। মনে মনে ভাবি, যাক্, কাছে আছে, সুখে আছে। এইটুকু প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগও যে পাইয়াছি, তাহার জন্য ভগবানের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই। ও যে চোর ডাকাত হইয়া কিংবা ভিক্ষা করিয়া পথে পথে বেড়ায় নাই, ইহাই এখন আমার পরম শান্তি।

কোন কোনদিন জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁরে দীনু, মায়ের জন্যে আর মন কেমন করে না ত?

সে জবাব দেয়—করে বাবু। মনে হয়,—মা যেন এখনও আমার কাছে কাছে ঘুরছে।

জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁরে, অসুখের সময় তোর মা অষুধ-টষুধ কিছু খায় নি বোধ হয়?

—না, কিছুতেই খেতে চাইত না! ...

পেলে বলতুম—মা তুমি ওষুধ খাও। মা বলত—ওষুধ কিনে খেলে শেষে মাস চলবে কি করে' বাবা?

দুই-চারিটি কথার বেশী জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই না। কিন্তু তাহার জবাবে যাহা শুনি, তাহাতে মনটা আমার হাহাকার করিয়া ওঠে! তখন হঠাৎ কেহ ঘরে আসিয়া পড়িলে, চতুর অভিনেতার তৎক্ষণাৎ মত প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লই।

একদিন ওইভাবে মাথা টিপিতে টিপিতে দীনু যেন কিছু বলিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। কথাটা কিছুতেই বলিতে পারিতেছে না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কিরে, কিছু বল্‌তে চাস? বল্ না।

দীনু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া চাপাকণ্ঠে যাহা শুনাইল, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! বলিল—বাবু, দাদাবাবু মদ খায়।

শুইয়াছিলাম, উঠিয়া বসিলাম। অন্য কেহ হইলে একটি প্রশ্নও না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দিতাম। কিন্তু দীনুর কথা ত ও-ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলাম—বলিস কিরে! কি করে' জানলি? দেখেছিস?

সে বলিল—হাঁ্যা, দেখেছি বাবু। দেখুন গিয়ে দাদাবাবুর বইয়ের আলমারীর পেছনে বোতল আর গেলাস লুকোন আছে। রাত্রিরে আপনারা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েন, তখন ঘরের দোর-জান্‌লা বন্ধ করে' বসে' মদ খায়। আমি সেদিন দেখ্‌তে পেয়ে কত বারণ করলুম; তা' আমায় কাণ মলে' তাড়িয়ে দিলে।

এ কী সর্ব্বনাশের কথা! এ যে বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই ঠিক দেখেছিস্ ত?

—হাঁা। নিজের চোখে না দেখ্‌লে কখনও আপনাকে বলতুম না।

আমার মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

সুনীলের জন্য ইদানীং অবশ্য মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলাম। ওই অল্পবয়সের বালক, কিন্তু কথা কয় যেন চল্লিশ বছরের পাকা লোকের মত। সে না জানে পৃথিবীর এমন জিনিষ নাই। থিয়েটার বায়স্কোপ লইয়া এবং পাড়ার হতভাগা ছেলেদের সহিত আড্ডা দিয়াই সে বেশীর ভাগ সময় কাটায়। লেখাপড়ার প্রতি তাহার আদৌ মন নাই। লোকের সহিত ভালভাবে কথা কহিতেও জানে না। সে যে একজন বড়লোকের ছেলে, এ কথা সর্ব্বদাই মনে পোষণ করিয়া রাখে। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে তাহা যে আমি, তাহা ধারণাও করিতে পারি নাই!

দীনু মিনতির সুরে বলিল—আমি যে বলেছি, তা' যেন দাদাবাবু জানতে না পারে। তা' হ'লে আমায় বড্ড মারবে। আপনি গিয়ে বোতলটা ফেলে দিয়ে খুব করে' বকে দেবেন।

তাহার সব কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। ক্রোধে তখন আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে-ছিল। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে এইরূপে অধঃপাতে গিয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু আমি ও-সব একেবারেই সহিতে পারি না।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দীনু আবার বলিল—বাবু, আমার কথা—

—না, তোর কোন ভয় নেই।

সুনীল সে সময় প্রায়ই ঘরে থাকে না; কিন্তু

সেদিন ছিল। আমাকে তাহার ঘরে দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল!

বিস্মিত হইবারই কথা। কারণ, সাধারণতঃ রাত্রি ন'টার সময় আমি দোতালায় উঠিয়া যাই; তারপর বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আর নীচে নামি না।

তাহার চোখের প্রথম দৃষ্টিতেই যেন মনে ধারণা হইল, দীনু ঠিকই বলিয়াছে। নিজেকে যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া পুত্রের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পড়াশুনো করছিস ত? একজামিন এসে পড়ল মনে আছে? এবারেও যদি ফেল—

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়াই সে রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল—পড়চি না ত কি—এই দেখুন না। বলিয়া সে হাতের বইটা 'দুম্' করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

তাহার কথা কহিবার ধরণই ওই। বিশেষ করিয়া সেদিন অসময় আমি ঘরে আসায় সে খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। আমি কিন্তু তাহার ব্যবহারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বইখানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলাম—ইংরিজি। আচ্ছা, দেখি কেমন পড়া হয়েছে। বলিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে দুই-চারিটা প্রশ্ন করিয়াই বুঝিলাম, সে কিছুই পড়ে নাই।

আলমারীটার প্রতি প্রথম হইতেই আমি দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। সেটা খোলাই ছিল। দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানা অতি কুখ্যাত বাঙলা উপন্যাস অন্যান্য বইয়ের মধ্যে গোঁজা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এটা কি বই রে?

বলিয়া বইখানা টানিয়া বাহির করিতেই পিছনের বোতলটা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু, তাহাতে হাত দিবার পূর্ব্বেই সুনীল যেন বাঘের মত লাফাইয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ও কিছু নয়, ও কিছু নয় বাবা। ওতে হাত দেবেন না।

আর কোন সন্দেহ রহিল না। বোতলটা বাহির করিয়া আনিয়া কঠোর-কণ্ঠে বলিলাম—হুইস্কি খাওয়া ধরেছ?

—আমি নয়, বাবা। ওই ও বাড়ীর যতীন খায়। বাড়ীতে সুবিধে হয় না বলে' এখানে—

—ও বাড়ীর যতীন খায়, কেমন?

বলিতে বলিতে র‍্যাকে ঝোলান বেত গাছটা টানিয়া লইয়া প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলাম।

সে চীৎকার করিল না, একটুও কাঁদিল না। শুধু বারবার আমার হাত হইতে বেত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—দীনে হারামজাদা বলেছে বুঝি? জুতো মারব তা'কে, খুন করব—

প্রহার শেষ করিয়া, বোতলটা হাতে লইয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বলিয়া গেলাম—কাল থেকে স্কুল ছাড়া বাড়ীর কম্পাউণ্ডের বাইরে যেতে পাবি না—মনে থাকে যেন।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই ক্রোধের পরিবর্ত্তে বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল। চোখের জল কিছুতেই বাধা মানিল না। আমার সে সময়কার মনোভাব, যাঁহারা সন্তানের পিতা শুধু তাঁহারাই বুঝিবেন।

ক্ষিপ্রপদে উপরে আসিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

* * *

কিন্তু তখনও বুঝি নাই, সুনীল কতদূরে নামিয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার ঠিক দিন দুই পরেই সন্ধ্যাবেলা 'লনে' বসিয়া

আছি। সুনীতি এবং দুই-চারিজন ভদ্রলোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় সুনীল আসিয়া জানাইল—বাবা, টেবিলের ওপর আমার ঘড়িটা ছিল, পাচ্ছি না।

সুনীতি বিস্মিত হইয়া বলিল—সেকি রে! টেবিলের ওপর থেকে ঘড়ি কি উড়ে যাবে? খুঁজে দেখ গিয়ে, কোথায় রেখেছিস।

দামী সোণার ঘড়ি—প্রায় পাচশো টাকা ব্যয় করিয়া এই সেদিন কেনা হইয়াছিল।

—না মা, আমি সেই দুপুর থেকে খুঁজছি। কোথাও নেই। এ নিশ্চয়ই সেই দীনে হারাম-জাদার কাজ। আর কে নেবে? সে ছাড়া আর ত কেউ আমার ঘরে যায় না।

সুনীতি রাগে জলিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ হুকুম দিল—বটে! কই ডাক ত তাকে, দেখ্ছি আমি।

—তোমাকে আর দেখতে হবে না। আমি থানায় 'ফোন্' করে' দিয়েছি। এক্ষুনি ঘড়ি বেরিয়ে পড়বে, দেখো। দীনে ছাড়া আর কেউ নিতেই পারে না। তুমি এখন কিছু বলো না।

থানায় সংবাদ দেওয়াও হইয়া গিয়াছে! ছেলে যে আমার এত বুদ্ধি রাখে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না! মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলাম!

সেদিন সুনীলকে প্রহার করিবার পর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সুনীতি এমন একটা ভাব ধারণ করিয়াছিল, যাহার অর্থ—তাহার পুত্র আর এমনই কি বেশী অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্ত তাহাকে অমন করিয়া মার-ধোর করা? এবং সেদিন হইতে তাহার মনটাও দীনুর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

হায় সুনীতি, যে সন্তানের প্রতি মমতায় অন্ধ হইয়া তুমি তাহার অতবড় অপরাধটাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিলে না, ওই দীনুও যে আমার সেই সন্তান, তাহা তোমাকে আজ বোঝাই কি প্রকারে! কেমন করিয়া বলি যে,—দীনু এমন কাজ কখনও করিতে পারে না! তোমার পুত্র সুনীল তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্ত তাহার মাথা হইতে এই শয়তানী ফন্দী বাহির করিয়াছে। তাহা তুমি না বুঝিলেও, আমি পরিষ্কার জানিতে পারিয়াছি। অথচ, আমি এস্থলে কি-ই বা করিতে পারি?

সুনীল আমার সন্তান—যাহাকে আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই চেনে, জানে। তাহার ঘড়ি চুরির ব্যবস্থা ত করিতেই হইবে! আর দীনু, সে একটা চাকর বৈত অন্ত কিছুই নয়! এ যে কত সূক্ষ্ম বেড়াজাল, তাহা অপর কাহারও বুঝিবার ত উপায় নাই! ইহার পর কি কি যে ঘটিবে, তাহা সব যেন চোখের সম্মুখে পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। হইলও তাহাই।

অনতিবিলম্বে পাড়ার থানার দারোগা সতীশ ঘোষ দুইজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুনীতি এবং সুনীলের মুখে সমস্ত শুনিয়া আবশ্যকীয় প্রশ্নাদি করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—তা' হ'লে চাকর-বাকরদের সবাইকে একবার এখানে ডাকা দরকার।

মাথা নত করিয়া হুকুম দিলাম। তারপর কি কি যে ঘটিল, তাহা সব স্মরণ করিয়া উঠিতে পারি না। তখন যে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়া-ছিলাম। সতীশ ঘোষ সবাইকে প্রশ্ন করিল। সুনীল এবং সুনীতির সন্দেহ দীনুর উপর; সুতরাং, তাহাকে কিল-চড় মারিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে, উপস্থিত ভদ্রলোক দুইজনকে সঙ্গে লইয়া পুলিশ যখন চাকরদের ঘর সার্চ করিতে গেল, তখন আমাকেও বাধ্য হইয়া সঙ্গে যাইতে হইল।

প্রথমেই দীনুর ঘরে সার্চ্চ চলিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তারপর কোণে জড়ো করা একগাদা খবরের কাগজের ভিতর যখন ঘড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তখন দীনু পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া একবার সুনীতির এবং একবার আমার পায়ে ধরিয়া ভীত আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল—মা, আমি ঘড়িতে হাতও দিই নি! এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি চুরি করি নি! বাবু, আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন না—আমি মরে' যাব! সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি, আমি নিই নি!..

সুনীলের কণ্ঠস্বর কানে আসিল—তুমি নাও নি! ঘড়ি ওখানে উড়ে এল হারামজাদা? মারুন ত দারোগাবাবু, বেত মেরে ওকে সোজা করে' দিন্।

সাক্ষীদের সহি লইয়া সতীশ ঘোষ দীনুকে থানায় ধরিয়া লইয়া চলিল। আমরা কেহই কিছু করিলাম না দেখিয়া সে শেষে আকুল-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল—মা, মাগো, পুলিশে যে আমায় মেরে ফেলে দেবে গো! তুমি কোথায় মা! তুমি থাকলে...

সুনীতি বোধ হয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

আমি একটি কথাও কহিলাম না। মাথা তুলিতে সাহস হইল না। কনক নিশ্চয়ই এখন এখানে আসিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিবে! হয় ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব!

অচল, অটল, বিস্মিত বিহ্বল-দৃষ্টিতে শুধু সুনীলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম! সুনীল, সে যে আমার পরম স্নেহের পাত্র—আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র!

যন্ত্রকীট

শ্রীপ্রতুল রায়

বিবর্ণ ম্লান আকাশখানা অফিস-ঘরের জানালাটার মাপে মাপ মিলিয়ে চৌকো হ'য়ে এসে যেটুকু ধরা দেয়, উদ্ধত উন্নতশির প্রাসাদ-চূড় প্রচণ্ড আস্ফালনে তার দিকে তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনতিপরিসর কামরার চারিদিক ঘিরে টেবিল-চেয়ার আর আলমারির ঠাসাঠাসি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের টেবিল দু'খানা দীর্ঘায়তন ক্যাসিয়ারের টেবিলটাকে তার ন্যায্য পরিসরটুকু ছেড়ে দিয়ে উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে কণামাত্র কার্পণ্য বোধ করে নি।

অপূর্ব্বর অন্যমনস্ক চিত্ত টাইপ-রাইটারের ধমকে সচকিত হ'য়ে ওঠে চট্‌পট্‌ চট্‌পটাপট্‌। গভীর বিরক্তিভরে মেসিনটা ঢেকে রেখে সে চেয়ারটা জানালার কাছে টেনে নিয়ে যায়। যন্ত্রের নীরস একঘেয়ে কর্কশ তর্জ্জনের চেয়ে এই টুকরো আকাশের ভাষা সরস অনুরাগে ভরা,—ছিন্ন মেঘপুঞ্জে অনেক কালের হারানো বাণীর সন্ধান মেলে।

সেদিনের কথা অপূর্ব্বর মনে পড়ে। চির-উজ্জ্বল জীবনের ধারা পাষাণের বেষ্টনীতে বাধা পড়ে' এমনি স্রোতহারা পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হয় নি। ওই চৌকো আকাশখানা ছিল অবাধ উন্মুক্ত গাঢ় নীল আলোয় আলোকময়। দিগন্ত তার উদার নীলাঞ্চল ঘিরে রঙের উপর রঙের পোঁচ বুলিয়ে যেতো—সেই রঙের ধারায় স্নান করে' কল্পনা তার দুই ডানা মেলে দিয়ে খুসীর হাওয়ায় ভেসে ভেসে দূরান্তরের উদ্দেশহারা পথে পাড়ি দিতো। কেউ তার সন্ধান জান্‌তো না। সে ছিল যেন স্বতন্ত্র জগতের জীব—এ কর্ম্মকোলাহলময়—সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বভরা জড় জীবনের নাগাল হ'তে দূরে—অনেক দূরে!

তারপর একদিন আকাশের গায়ে রঙের শেষ শিখাটি ধুয়ে-মুছে যখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'লো—সন্ধ্যার চপল-রাঙা কপোলে মরণের কালো ছায়া এলো গাঢ় হয়ে—তখন কোথায় আলো—কোথায় অফুরন্ত নীলিমার উৎস-ধারা! আলোকের পথে পথহারা আঁধারের পান্থী—আবার এলো ফিরে সেই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী দিয়ে ঘেরা নিতান্ত সাধারণ একান্ত পরিচিত আঁধারের নীড়ে।

ধপ্‌!

একগাদা হ্যাণ্ডবিলের বোঝা টেবিলের ওপর সশব্দে নামিয়ে রেখে—কোণাচে বসে' বাণীকান্ত কোঁচার আগাটা ডান হাতে ধরে' ঘন ঘন মুখের আগে দুলিয়ে যায়।

অতিমাত্রায় কালো আর বেঁটে—তেমনি মোটা সে। চোখ দুটো ফুলো ফুলো—সব সময়ে যেন ঝিমিয়েই আছে। নাকটিকে কেন্দ্র করে' নিখুঁত বৃত্ত রচনা হয়েছে—থুত্‌নি ও কপোলের অপূর্ব্ব সম্মিলনে। চোখ-মুখ আঁকা শিশু-সূর্য্যের ছবিটি যেন। গলা বেয়ে ত্রিধারায় ঘাম ঝরছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে' পড়া তিনটি বিশীর্ণা ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত।

অপূর্ব্ব বলে—"এত দেরী যে?"

বাণীকান্ত একটু চড়া সুরে উত্তর দেয়—"আর বলেন কেন? সেই কোন্ সকাল হ'তে

হত্যে দিয়ে পড়ে আছি—এতক্ষণে সব 'কম্‌প্লিট্' হ'ল। দু'ঘণ্টা কাগজ বিলি করবো—তার তোড়জোড় চলেছে সাত ঘণ্টা ধরে'! কেন রে বাপু, সময় থাকতে পিণ্ডিগুলো প্রেসে দিয়ে রাখ্‌লে কী এমন মহাভারত উচ্ছন্নে যেত? এত ল্যাঠাও বাধ্‌ত না, আর এমন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটেও মরতে হ'ত না! পেয়েছে সস্তার গাধা, ভুগ্‌তে হয় ভুগ্‌বে সেই। কার কি?"

অপূর্ণ বলে—"কিন্তু আমাদের চারটের মধ্যে টাউন-হলে গিয়ে উপস্থিত হবার কথা—এদিকে চারটে বেজে পনেরো মিনিট হ'য়ে গেছে।"

কোঁচার কাপড়ে কপালের ঘাম মুছে তেমনি তিরিক্ষি হয়েই বাণীকান্ত জবাব দেয়—"আরে, রেখে দেন মশাই! দশটাকার কেরাণীগিরিতে আর সাহেবী 'টাইম' নিয়ে কারবার করতে হয় না। বোঝার ওপর শাকের আঁটি—হপ্তার মধ্যে একটা দিন রোববার, তাও ঘুমিয়ে বাঁচবার ফুরসুৎ নেই।"

অপূর্ণ কোনও জবাব দেয় না। মনে মনে কৌতুক অনুভব করে। সে জানে এই দশটা টাকার অনুগ্রহ কুড়িয়ে বেড়াবার যে গ্লানি, সেই অসম্মানের বোঝাই ওর কাছে সবার চেয়ে ভারী হ'য়ে উঠেছে! তাই সে ভার—সে অগৌরবের বোঝা—যখনি সে অবকাশ খুঁজে পায়, তাকে নামিয়ে ফেলে নিজেকে হাল্‌কা করে' নেয়। লিফ্‌ট্‌ম্যান্, দারোয়ান হ'তে আশ-পাশের অফিসের চাপরাশীগুলো অবধি কার-ও এই দশটা টাকার ইতিহাস জানতে বাকী নেই। টাকার মানদণ্ডে পাছে তার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে ওদের পর্য্যায়ে স্খলিত হ'য়ে পড়ে, সেই আশঙ্কায় ওদের কাছে আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সে প্রায়ই জাঁক করে' বলে—"ষ্টিম্-লঞ্চ' অফিসে যখন কাজ কোরতুম, এমনি কত দশটাকা এই হাতে করে' চাপরাশী আর দারোয়ানের মাইনে দিয়েছি।"

ওরা কপালে হাত ছুঁয়ে বলে—"নসীব!"

ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে এ ওর মুখ চেয়ে চোরা হাসি হাসে। বাণীকান্ত দেখ্‌তে পায় না। বলে—"দশ বছরের চাকরী একটি কথায় খতম হ'ল। এখনো ছ'মাসের মাইনে বাকী—আদায় হচ্ছে না। এ ছাড়া আর নসীব কা'কে বলে!"

ওরা মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়—"ঠিক্, তাই বটে!"

কৌতুকের মাত্রা একটু চড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে অপূর্ণ বলে—"সহরে নিখরচায় থাকা আর খাওয়ার সুবিধে পেলে আপনার ও দশটা টাকার দাম আমার কুড়িটা টাকার চেয়ে যে অনেক বেশী হ'য়ে দাঁড়ায় বাণীবাবু—সে কথা ভোলেন কেন?"

বাণীকান্ত বলে—"সে কথা ভুলবো কেন ভাই! কিন্তু সে সুবিধের উশুল শুধতে গায়ের রক্ত যে কতখানি জল করতে হয়—সে কথা ত আর জানেন না! তাঁর নাম অনুরূপবাবু।"

অনুরূপবাবু কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বাণীকান্ত আবার বলে—"তাঁর ঘরের অফিস চালাবো না এখানকার দারোয়ানী করে' বেড়াবো! দু'চোখ দিয়ে দেখ্‌চেন ত? সমস্ত দুপুর সারা সহরটা চক্কর দিয়ে বেড়িয়ে বাড়ী গিয়ে যে একটু নিশ্চিন্ত হবো তার যো-টি নেই। ওঁর ছেলেমেয়ের পড়া বলে' দেওয়া—বৌয়ের ওষুধ আনা—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—কিছু আর বাকী থাকে না। সুবিধেটা কেমন! সহ্য হয় সব, কিন্তু এ ভূতের খাটুনির ওপর খিচুনি সহ্য হয় না। ইচ্ছে করে চাকরীর মাথায় ঝাড়ু মেরে ইস্তফা দিয়ে

পালাই। কিন্তু বাচ্চাবাগুলোর কচি মুখ আর সে হতভাগীটার কথা মনে হ'লে পায়ে কে যেন শেকল বেঁধে দেয়! মাস মাস যে এই দশটা করে' টাকা পাঠাতে পাচ্ছি—সেই আমার বহু ভাগ্যি!"

শেষটা ওর গলার স্বর আট্‌কে আসে। মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাতের কালিমা ওর মুখের ওপর ছায়া ফেলে। আর কিছু বলে না।

নীরবতা বড় বিশ্রী হ'য়ে বাজে। চেয়ার ছেড়ে অপূর্ব উঠে দাঁড়ায়। বাণীকান্ত হাণ্ডবিলের বাঁধন খুলে অর্দ্ধেক ভাগ কমিয়ে বাকীটা আলমারীতে তুলে রাখে। একরাশ আবেদন-পত্র বার করে' অপূর্বর হাতে তুলে দিয়ে বলে—"আপনি এই সাদাগুলো নিন্— হাণ্ডবিলগুলো বরং আমার কাছে থাক্।"

দু'জনে ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে দুয়ারে তালা দেয়। তেতলার সিঁড়ি ভেঙে বিরাট অট্টালিকার অন্ধকারময় জঠর ছেড়ে আলোকিত রাজপথে নেমে আসে।

টাউন-হল। 'প্রফুল্ল জয়ন্তী'র সুবিপুল সমারোহ! অভিজাত-সম্প্রদায়ের অর্দ্ধস্ফুট কথার গুঞ্জরণে তোরণ-পথ মুখরিত—আতর আর চুরুটের গন্ধে ভরপুর। নারীদের চারু-অঙ্গ ঘিরে নানাবর্ণের বিচিত্র ভূষা নানা ছন্দে লীলায়িত। মোটরের বিকট 'হর্ণে'র শব্দ গভীর বিদ্রূপে ভরে' ওঠে।

অর্দ্ধছিন্ন অর্দ্ধমলিন বসনে দূরে যারা দাঁড়িয়ে থাকে—ভয়ে ভয়ে দু'-একপা করে' এগিয়ে এসে তারা জিজ্ঞেস করে—"কিসের তামাসা বাবু?"

অপূর্ব জবাব দেয় না। মনে মনে ভাবে—তামাসাই বটে! অনুরূপবাবুর হুকুম ছিল, তিনি না আসা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বিলি যেন বন্ধ থাকে। তিনি এলে পর নিজে থেকে তার বন্দোবস্ত করে' দেবেন।

ভিড় ঠেলে অনুরূপবাবু হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ান। সঙ্গে ক্যাসিয়ারবাবু ও ইঞ্জিনিয়ার বংশীবদনবাবু।

অনুরূপবাবু অপূর্বকে জিজ্ঞেস করেন—"কতক্ষণ এসেছ?"

অপূর্ব বলে—"এই কিছুক্ষণ হলো।"

অনুরূপবাবুর জালার মত চেহারা। গলার আওয়াজ তেমনি গম্ভীর। সবুজ প্রান্তরের কোলে তৃণহীন ভূখণ্ডের মত তালুর ওপর টাক। গৌরবর্ণ—বয়স চল্লিশের কোঠায়। অনেকে ঠাট্টা করে' তাঁকে বলে—"অচল পর্ব্বত!"

গাড়ী-বারান্দার তলে হলের প্রকাণ্ড দুয়ারের সাম্‌নে এসে অনুরূপবাবু দু'জনকে দুই সীমান্তে দাঁড়িয়ে কাগজ বিলি করবার উপদেশ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারবাবু ও ক্যাসিয়ারবাবুর সঙ্গে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন।

বাণীকান্ত বলে—"দেখলেন ত কাণ্ডখানা একবার—দুটো টাকা খরচ করে' দু'খান টিকিট কিন্‌তে গায়ে যেন বিছে কাম্‌ড়ালো! কিপ্পিনের একশেষ!"

সে গাড়ী-বারান্দার দক্ষিণ সীমান্তে চলে' যায়।

পত্রপুষ্প-সুশোভিত দুয়ারের দু'পাশে পাতা-বাহারের টব—সবুজ হাসির অভ্যর্থনা বয়ে' মর্ম্মর সোপানাবলীর ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। রঙ-বেরঙ কাগজের কৃত্রিম শৃঙ্খল স্তম্ভের মাঝে মাঝে পাষাণ-পুরীর কণ্ঠহারের মত বাতাসের নিশ্বাসে দুলে দুলে উঠ্‌ছে।

তলায় লাল কাঁকরের রাস্তা। কোন্ লাঞ্ছিত অনাদৃত বেদনার গভীর রঙে রঙীন্! দামী জুতোর ভারী আওয়াজ আঘাতের চিহ্ন এঁকে

যায়। ধুলায় মলিন নগ্নপদের ধূলিভরা অনুরাগে সে ক্ষতকে ঢেকে দেয় না।

অপূর্ণ ভাবে—সেই উপেক্ষিত অনাহুতের দল, অর্দ্ধছিন্ন অর্দ্ধমলিন বসনে যারা আজকের এই উৎসবে নিতান্ত অনাবশ্যকের মত ভিড় করে' এসে দাঁড়িয়েছে—তারা কী ওই তোরণ-দ্বারের বাইরে থেকেই ফিরে চলে' যাবে?—ওরা যদি আজ দুয়ারের কাছে পুঞ্জীভূত হতাশ্বাস সঞ্চিত রেখে চলে যায়—তবে সে ব্যর্থতা কোন্ মাঙ্গলিকের সূচনা জানাবে?

—"রাস্তা ছেড়ে, রাস্তা ছেড়ে—"

একটা সোরগোল ঠেকে উঠ্তে অপূর্ণ সিঁড়ি ছেড়ে একটু তফাতে সরে' আসে। একটা প্রকাণ্ড মোটর সাম্নে এসে দাঁড়াতেই কার অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি কানে আসে—"রবীন্দ্রনাথ।"

তার সারা দেহে পুলকের শিহরণ বয়ে' যায়। জনতার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিমেষে সে কবিকে দেখে নেয়। ক্ষণিকের দেখা—সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ কর্তে যেটুকু সময় লাগে। কিন্তু এই পলকের দেখাতেই কবির মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেভাবে তার মনের পটে এসে ধরা দেয়—হাজার দেখাতেও তার চেয়ে বেশী কিছু আঁকা যায় না! অপূর্ণ জীবনে বিশ্বকবিকে এই প্রথম দেখ্লে। শুধু ছবি হ'য়ে এতদিন মনের তলে যা' ঢাকা ছিল—আজ এই মুহূর্ত্তে প্রাণ পেয়ে সে যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠ্ল। সে ভাবে—এই সেই 'শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে'র কবি! তার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে' ওঠে। আজকের দিনের যত লজ্জা—যত ব্যর্থতার অপমান—সব কবিকে দেখার আনন্দে বর্ষণ-সিক্ত রৌদ্রের মত মধুর ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

সভা শেষ হ'তে সকলের চলে' যাওয়ার পর চারিদিকের নির্জ্জনতা অপূর্ণকে অবসাদগ্রস্ত করে' তোলে। কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে সে একাই পথ চল্তে থাকে। জনকোলাহল-মুখরিত সভাতল, হাসি-আনন্দ সকল কিছুই অপূর্ণর স্বপ্ন ঠেকে। একা পথচলা,—এইটুকুই তার কাছে চিরন্তন সত্য বলে' মনে হয়।

অনেকখানি পথ হেঁটে এসে পায়ের শিরা যন্ত্রণায় টন্টন্ করে। বুভুক্ষায় জঠরে আগুন জ্বলে। রাস্তার কল হ'তে আকণ্ঠ জলপান করেও সে ক্ষুধা শীতল হয় না। পকেটে একটি মাত্র পয়সা। তিনদিন টিফিন না খেয়ে ক্ষুধার সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে' বাঁচিয়ে রেখেছে! আজ এক মুহূর্ত্তে—না এত দুর্ব্বল, এত অব্যবস্থচিত্ত সে নয়! এখন যে কষ্টকে দুঃসহ বলে' মনে হচ্ছে, কাল কর্ম্মের চাপে এ ক্ষুধার উত্তেজনা আরো দ্বিগুণ হ'য়ে যখন জ্বলে উঠ্বে, তখন তার তুলনায় এ কষ্ট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে' মনে হবে! তখন এই একটি পয়সা ভিন্ন আর গতি নেই! সে জানে এমনি কত 'কালে'র পর 'কাল' কেটে গেছে, তবুও প্রাণ ধরে' পয়সাটা সে খরচ করতে পারে নি!

'চিত্রা'র ফোর্থ-ক্লাস 'বুকিং-অফিসে'র খানিক তফাতে লোহার দরজার পাশে 'কারবাইডে'র আলো জেলে চীনের বাদামওয়ালা শূন্য ম্লানদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার চোখে চোখ মিল্তেই বলে—"ক্যা চাইয়ে বাবু?"

অপূর্ণ নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে ফুটপাথের সীমান্তে এসে দাঁড়ায়। সমস্যা আরো ঘোরালো হ'য়ে ওঠে! প্রতিকারের উপায় থাক্তে অনর্থক এ কষ্ট সয়ে' থাকার কী প্রয়োজন? দেহের পীড়ার

ওপর—মনের এ পীড়া অসহ। অপূর্ব দু'পা এগিয়ে যায়—আবার পিছিয়ে আসে! এই যদি তার সঙ্কল্প ছিল—তবে এতক্ষণ মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে' ফল হলো কি? মনে হয় তার মাথাটা যেন একেবারে খালি হ'য়ে গেছে!—সাধারণ ধারণাটুকু পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। এই একটা পয়সার দাবী নিয়ে যারা তার মনের ভিতর অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব বাধিয়েছে—তাদের মধ্যে কোন্ একজনের দাবীকে সে প্রশ্রয় দেবে। বিবেক—মন—আত্মা—বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়—এদের মধ্যে কোন্ একজনকে পরিতৃপ্ত করতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে? বিবেক—সে কি চায়? আত্মা—তারি বা দাবী কিসের? ইন্দ্রিয়—এই সামান্য উপাদানে কতটুকুই বা তার লালসা মিটবে? না—সে আর ভাবতে পারে না! এই পয়সাটাই যত ভাবনার মূল! পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—সম্মুখে শীতল বারি! কে এমন মূর্খ আছে যে, তাকে উপেক্ষা করে' চলে' যাবে? মিটে যাক্—যার দাবী সে নিজেই বুঝে নিক্! সে কেবল এক ঠোঙা চীনের বাদাম নিয়েই খালাস! সুখ আসে—তৃপ্তি আসে—ভালোই! দুঃখ যদি চরমে ওঠে—তা'তেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই! কিন্তু এ সুখ-দুঃখের দোলায় আর দোলা যায় না! পয়সাটা মুঠোর ভেতর চেপে সে এগিয়ে যায়।

—"কে, অপূর্ব না?"

যন্ত্রচালিতের মত হাতখানা পকেটে ফিরে আসে—যেন কোন্ মহাপরাধে লিপ্ত হ'তে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়েছে। আশঙ্কায় দুরুদুরু বুকে চেয়ে দেখে—মঞ্জুশ্রী—তার সহধ্যায়ী। পাঠ্যাবস্থার দীর্ঘ অসাক্ষাতের পর গোলদীঘির ধারে সেদিন যখন ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়—অপূর্ব নিমেষেই চিনে ফেলেছিল। তেমনি ছিপছিপে ফরসা চেহারা। 'রোল্ড্-গোল্ডে'র চশমা চোখে—চুনট্ করা দিশী ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে। একটুও বদ্লায় নি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল আগের চেয়ে যা' একটু ঢেঙা হ'য়েছে। কিন্তু অপূর্বকে নামের গ্রন্থি দিয়ে পরিচয়ের ছিন্ন-সূত্রকে আবার নূতন করে' বাঁধতে হয়েছিল! এই ক'বছরের পরিবর্ত্তনে ছেলেবেলেকার ছবি তার সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে! মঞ্জুশ্রীর মনে শুধু নামটা নিয়ে সে বেঁচেছিল!

সেইদিনই মঞ্জুশ্রীর মুখে শোনে যে, সে সম্প্রতি বিবাহিত। য়ুনিভার্সিটি কলেজে এম-এ আর ল পড়্ছে। সে আজ এক সপ্তাহের কথা। তারপর আবার এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ!

মঞ্জুশ্রী বলে—"কিহে, দেখ্‌চ না কি?"

চিত্রায় তখনো পুরোদমে 'চণ্ডীদাস' চলেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হ'লেও জনতার বহর কমে নি।

অপূর্ব বলে—"না, এম্নি এধারে একটু এসেছিলুম। তুমি যে—"

চশমাটা একটু নাকের ওপর তুলে দিয়ে মঞ্জুশ্রী বলে—"দেখব মনে করছি। অবশ্য একলা নয়। সঙ্গে এই যে ইনি, অঞ্জনা—আমার 'বেটার হাফ্'।"

অদূরে একটি কিশোরী গ্রীবা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল—অপূর্ব এতক্ষণ তা' লক্ষ্য করে নি। লম্বা ছাড়ালো গড়ন—পরণে মেঘ্‌লা রঙের সিল্কের ছাপানো শাড়ী। পায়ে রোম্যান স্লিপার। গায়ের রঙ্ ধবধবে সাদা। দীপ্তিতে দৃষ্টি ঝল্‌সে যায়। মেঘের কোলে অচঞ্চল বিদ্যুৎ-শিখার মত—তার সৌন্দর্য্য কেবল দূর হ'তে উপভোগের জিনিষ—স্পর্শ করা চলে না।

মঞ্জুশ্রী পরিচয় করিয়ে দেয়—"ইনি অপূর্ণ, একসঙ্গে পড়েচি।"

অঞ্জনা যুক্তকরে ক্ষুদ্র নমস্কার জানায়। অপূর্ণ আচ্ছন্নের মত প্রতি নমস্কার করে' কি বলে' বিদায় নেওয়া যায়, মনে মনে তারি মতলব আঁটে। তার সারা দেহে চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে।

মঞ্জুশ্রী বলে—"মিছে এখানে দাঁড়িয়ে বাক্য-ব্যয়ে ফল নেই। চল, ভেতরে গিয়ে সব কথাবার্ত্তা হবে।"

অপূর্ণ মনে মনে প্রমাদ গণে! মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলে—"না না, তোমরাই যাও ভাই--আমার যাবার উপায় নেই, বড় দরকার।"

মঞ্জুশ্রী চেপে ধরে। বলে—"দরকার ত রোজই আছে। ঘণ্টাকয়েকের বে-দরকারে বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। একটা দিন বই ত নয়। এসো এসো—"

অঞ্জনা মিষ্ট স্বরে বলে—"বেশ ত আসুন না।"

ওদিক দিয়ে আর অনুযোগ করা চলে না। অপূর্ণ অন্যপথ ধরে' বলে—"কিন্তু, বাড়ীর কেউ জানবে না—ফিরতে রাত্তির হ'লে সবাই ভাববে—আর তা' ছাড়া আমার কাছে ত উপস্থিত—"

লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায়!

মঞ্জুশ্রী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে—"আরে, ওর জন্যে ভেবো না। সে হ'য়ে যাবে 'খন্। আর রাত্তির হ'লে ভাববার মত ভাবতে কেই বা আছে তোমার এমন? সে বরং এই আমার! পাছে ভাবতে হয়, তাই দেখ না, পেছন পর্য্যন্ত ধাওয়া করে' এসেচেন! একলাটি কি এক পা বাড়াবার উপায় আছে?"

অঞ্জনা ভ্রূকুটি করে' বলে—"না, তা' কি আর আছে? এলেই পারতে ত একলা—কে বারণ করতে গিয়েছিল! ভাবতে ত আমার আর ঘুম ধরছিল না!"

মঞ্জুশ্রী সশব্যস্ত হ'য়ে বলে—"আরে, চুপ চুপ্! রাস্তার মাঝখানে এ সব কী কাণ্ড-কারখানা! ভাল কথা বল্‌তে গিয়ে এ যে দেখি হিতে-বিপরীত হ'য়ে দাঁড়ালো। নাও, এখন কথা কাটাকাটি তর্ক-বিতর্ক সব মুল্‌তুবী থাক্। চল।"

অপূর্ণর হাত ধরে' সে একরকম টেনেই নিয়ে যায়। তৃতীয়-শ্রেণীর টিকিট একখানিও বাকী ছিল না। দ্বিতীয়-শ্রেণীর টিকিট কাট্‌তে হয়।

অপূর্ণ ভাবে—এই মুহূর্ত্তে বসুন্ধরা যদি দ্বিধা বিভক্ত হয়, তবে সে তার মধ্যে প্রবেশ করে' মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে!

অপূর্ণ আর মঞ্জুশ্রীর মাঝখানের আসনে অঞ্জনা! তার গন্ধ-আঁচল বিজলীপাখার হাওয়ায় দুলে দুলে যতবার গায়ে এসে পড়ে—ততবারই অপূর্ণ কেমন অস্বস্তি অনুভব করে। তার বেশ-বিলাস, আদব-কায়দা—কোনটাই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না। ঘর্ম্মসিক্ত মলিন জামাটার দুর্গন্ধ বাতাসের কণ্ঠ চেপে ধরে! তার নিজেরও দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ছবিগুলোর চলা-বলা সবি তার কাছে অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বলে' মনে হয়! ওরা যেন বারবার জনতা ভেদ করে' তার দিকে অর্দ্ধ-শূর্ণ দৃষ্টি হেনে চলে' যায়। দেবতার মন্দিরে অস্পৃশ্য হয়ে সেই যেন কেবল একা অনধিকার-প্রবেশ করে' বসে' আছে।

যে 'চণ্ডীদাস' ও 'রামী'র প্রেমে গাঁথা পদাবলীর প্রতি ছত্রে দু'টি নিষ্পাপ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি তার কাছে সহানুভূতি কামনা করে' ফিরতো, এদের মধ্যে অপূর্ণ তাদের সন্ধান খুঁজে পায় না। এরা যেন আধুনিক সভ্যতার ছাঁচে

ঢালা, সুখ-লালসা বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত ছদ্মবেশী আভিজাত্যের ছায়া-মূর্ত্তি! আজকের রাতে একজোট হ'য়ে তার দারিদ্র্যকে উপহাস করে' আনন্দ সঞ্চয় করতে চায়! তার চিত্ত বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে ভরে' ওঠে। কোনরকমে দুটো ঘণ্টার মামলা চুকে গেলে নিশ্চিন্ত। দু' ঘণ্টাও সে বসে' থাকতে পারে না —মাথা তার ঘুরে ওঠে।

নীচুগলায় সে বলে—"আমি যাই ভাই···মাথাটা কেমন করছে!

—"এ কি হ'ল তোর হঠাৎ! কষ্ট হচ্ছে না কি? একটু বোস না, আর ত হ'য়ে এল। নেহাত যদি না পারিস, তবে ওঠ।"

অপূর্ণ ব্যস্ত হ'য়ে বলে—"না না, তোমরা উঠবে কেন? আমি একাই যাই।"

মঞ্জুশ্রী বলে—"সেও কি হয়?"

অপূর্ণ বলে—"তবে থাক্। আমি এই চেয়ারে মাথা রেখে শুয়ে থাকি—কোনও কষ্ট হবে না।"

অঞ্জনা বলে—"তাই শুন্, আমি এই রুমাল দিয়ে বাতাস করি।"

অপূর্ণ বাধা দিয়ে বলে—"না না, কি দরকার। এই ত বেশ পাখার হাওয়া আছে।"

মঞ্জুশ্রী তার স্বামীকে বলে—"বাস্তবিকই যদি ওঁর খুব কষ্ট হয়, তবে ওঠ।"

অপূর্ণ বলে—"না, এমনি কেমন একটু মাথার ভেতর—এখুনি সেরে যাবে।"

অঞ্জনা বলে—"যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি? দেব মাথা টিপে?"

অপূর্ণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলে—"না না, কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন! কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি দেখুন না স্বচ্ছন্দে!"

মঞ্জুশ্রী বলে—"দিক্ না—লজ্জা কিসের?"

অঞ্জনার হাতখানা তার ললাট স্পর্শ করে। আর বাধা দেওয়া চলে না। সঙ্কোচে তার শরীর আড়ষ্ট হ'য়ে আসে। সে ভাবে অপূর্ব্ব রহস্যময়ী এই নারী! তার শিরায় শিরায় এ কী উন্মাদনা! রক্তে রক্তে এ কী চঞ্চলতা! অপরিচিতা নারীর স্পর্শ তার চিত্তে কি আনন্দের প্রস্রবণ ঢেলে দিয়েছে? তাই যদি হয়, তবে সে আনন্দের পূর্ণপাত্র এই মুহূর্ত্তে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায়!

শতজনার সাক্ষাতে এই যে লজ্জাকর দৃশ্য আজ তাকে নিঃশব্দে মেনে নিতে হচ্ছে, তার মূলে ছিল এই আনন্দ-লিপ্সাই! মঞ্জুশ্রীর উপরোধ ত অনায়াসে সে এড়িয়ে চলে' যেতে পারত! তবে সে এখানে এলো কিসের প্রলোভনে?

এই প্রথম যেন সে আবিষ্কার করলে—পার্শ্বোপবিষ্টা এই কিশোরীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য—সরল সহজ অভ্যর্থনা—মধুচ্ছন্দা বাণী—মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত তাকে এখানে টেনে এনেছে। স্পর্শ পাবার এই আনন্দটুকু কল্পনা করেই হয় ত সে ওদের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে নি! ঠিক! যে আকাঙ্ক্ষা তার সম্পূর্ণ অগোচরে মনের তলায় এতক্ষণ সুপ্ত ছিল—নারীর স্পর্শে চেতনা পেয়ে এইমাত্র সে যেন জেগে উঠেছে! কিন্তু এ আনন্দের পরিণতি কোথায়!

—"চণ্ডিঠাকুর, এ কি সত্যি?"

রাম্নীর আকুল কান্নার প্রতিধ্বনির মত তার অন্তরও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে' বলে' ওঠে—"এ কি সত্যি—এ কি সত্যি!"

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রার অবকাশ ভুলে—রাত্রির এই স্বল্পালোকিত অন্ধকারে—অপরিচিতা এক নারীর একান্ত সান্নিধ্যে বসে'—শুধু তার স্পর্শটুকু দিয়ে জীবনের যাত্রাকে সে পঙ্কিল আনন্দে ভরে' তুলতে চায়—এ কি সত্যি? আজকের রাতের

মাত্র দু'টি দণ্ডের আলাপ বিনিময়ের অবসরে এই সত্যটাই কি সবার চেয়ে বড় হ'য়ে থাকবে ?

অঞ্জনার স্পর্শটাকে সে যাচাই করতে চেয়েছিল—তাই রক্ত তার অমন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। তাই প্রথম দেখায় রূপ ওর তীব্র হ'য়ে দৃষ্টি তার ঝল্‌সে দিয়েছিল—স্নিগ্ধতায় ভরে' ওঠে নি!

অনাদিকাল ধরে' যে জননী নারীর অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে—এতক্ষণ পরে অপূর্ব যেন তার ছোঁয়া পায়। অঞ্জনার স্পর্শ মাতৃত্বের অমৃতে অভিষিক্ত হ'য়ে মধুর রসে তার ইন্দ্রিয় মন পরিপূর্ণ করে' তোলে। এই স্পর্শটুকু আছে বলেই জীবন এমন মধুরতার আধার! নইলে যে পৃথিবীর সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে দিগন্তব্যাপী বিরাট মরুভূমি বিস্তীর্ণ বালুকারাশি নিয়ে দুর্ভিক্ষের মত শূন্যতার স্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করত!

তার দুই চোখ জলে ভঁরে' আসে! একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতার কাছ হ'তে অযাচিত এত স্নেহ সে আর কোনও দিন পায় নি। তার পঙ্কিল চিত্ত যে আনন্দের সন্ধানে এখানে এসেছিল, সে আনন্দ কোন্ পুণ্যস্পর্শে পবিত্রতায় ভরে' ওঠে। আবেশে তার আঁখি দু'টি মুদ্রিত হ'য়ে আসে।

—"এ কি, ঘুমোলেন না কি ? উঠুন, শেষ হ'য়ে গেছে যে।"

অঞ্জনার মিষ্টি মৃদু গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনতা দ্বারের প্রান্তে ভিড় জমায়।

অপূর্বকে বাড়ীর গলির মুখ অবধি এগিয়ে দিয়ে মঞ্জুশ্রী আর অঞ্জনা বিদায় নেয়।

অপূর্ব মঞ্জুশ্রীর হাত ধরে' বলে—"অনেক কষ্ট পেলে আজ আমার জন্যে!"

মঞ্জুশ্রী বাধা দিয়ে বলে—"সে কি! কষ্ট পেলুম, না তোমায় আরো কষ্ট দিলুম। তোমার শরীর খারাপ জান্‌লে—"

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে অঞ্জনা তাড়াতাড়ি বলে—"কোথায় অন্যায় অত্যাচার করেচি বলে' আমরাই আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবো, তা' না আগে হ'তেই আমাদের মুখবন্ধ করে' দিলেন। মজা মন্দ নয়!"

অপূর্ব বিস্ময়ের স্বরে বলে—"অত্যাচার! সে ত আমিই করলুম। লাভের মধ্যে ভাল করে' দেখাই হলো না আপনাদের।"

অঞ্জনা মৃদু হেসে বলে—"আপনাদের মানে দাঁড়াচ্ছে ত আমি। দেখি নি কি রকম ? দেখেচি কি না শুনতে চান ? গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত অবিকল বলে' যেতে পারি।"

মঞ্জুশ্রী বলে—"থাক্! রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে গল্প ফেঁদে বস্‌লেই হয়েছে আর কি! বিপ্লবীর দল ঠাউরে এখনি লালবাজারে চালান করে' দেবে!" অপূর্বর দিকে চেয়ে বলে—"আচ্ছা, তবে আসি ভাই—অনেক রাত হলো।"

অপূর্ব বলে—"হ্যাঁ, এসো।" অঞ্জনাকে বলে—"যে অত্যাচারটা আজ করলুম আপনার ওপর—আশা করি মনে রাখবেন না!"

চপল হাসি হেসে অঞ্জনা কৌতুক করে' বলে—"আপনি মনে না রাখতে পারেন, আমি ভুলছি না কিছুতেই! এ অত্যাচারের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে!"

ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে অঞ্জনা মঞ্জুশ্রীর পিছনে এসে দাঁড়ায়। মঞ্জুশ্রী আর একবার 'আসি' বলে' বিদায় নেয়। রাস্তার বাঁক ঘুরে যেতেই ওদের আর দেখা যায় না। অপূর্ব কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে গলির রাস্তা ধরে' চলে।

অঞ্জনার শেষ কথাটা তার মনের মধ্যে

তোলপাড় বাধিয়ে দেয়! কথাটা এমনভাবে শেষ করে' সে বিদায় নিলো কেন? এ কি তার বিদ্রূপের ছল অথবা নিছক রহস্য? বিদ্রূপই হোক বা রহস্যই হোক দুটোর কোনটাই অপূর্ব্বর কাছে প্রীতিকর নয়। দুটোরই মূলে রয়েছে তার দুষ্কৃতির অবমাননা। অপমানের ওপর বিদ্রূপের তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অনন্ত রহস্যের মধ্যে ফেলে, রহস্যের মতই ওই নারী চলে গেছে!

কিন্তু এমনও ত হ'তে পারে, শুধু বন্ধুত্বের মর্য্যাদা দেখাতে সে তার স্বাভাবিক সারল্যে আজকের দিনের এ প্রথম পরশটুকু চিরদিন স্মরণে রাখার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চলে' গেল! তবে ওই চপল হাসি? ও হাসির অর্থ কি? ওই হাসিই ত তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নের আন্দোলন তুলেছে! নইলে ত অনায়াসে সে ওই কথা মনে করে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতো! ওর কথাগুলোর মধ্যে তেমন অপরাধ থাক না থাক, হাসিটার অপরাধ অমার্জ্জনীয়!

সে যেন প্রত্যক্ষ দেখছে মঞ্জুশ্রী আর অঞ্জনা পাশাপাশি পথ চল্‌তে চল্‌তে তারি আলোচনায় হাস্য-মুখর হ'য়ে উঠেছে। তাদের সে কাল্পনিক হাসির নিঃশব্দ ঝঙ্কার শেলের মত তার হৃদয়ে এসে বেঁধে।

বাড়ীর পশ্চিম সীমান্তে পাঁচিলের গা ঘেঁসে সরু গলি। গলির দরজা খোলাই ছিল। ডাকাডাকিতে বিধবা বড় বোন্ এসে কপাট খুলে দেয়।

ঘরের কোণে হ্যারিকেনের মিট্‌মিটে আলো। তারি পাশে টীনের বড় গামলার তলে ভাত ঢাকা।

অপূর্ব্ব খাবার অসম্মতি জানিয়ে ভিতরে যাবার সিঁড়ি ভেঙে অন্ধকার চিল্‌কোঠায় গিয়ে প্রবেশ করে।

আগে হতেই কে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে রেখেছে। জামাটা খুল্‌তে গিয়ে 'টঙ্' করে' কি একটা শব্দ হয়! অন্ধকারে জায়গাটা ঠাহর করে' হাত রাখতেই পয়সাটা উঠে আসে। একেবারেই মনে ছিল না—অথচ, এই পয়সাটা নিয়ে তার মনের মধ্যে কী দ্বন্দ্বই না তখন চলেছিল!

বায়স্কোপের ছবির মত মনের পর্দ্দায় একে একে সমস্ত কথা ফুটে ওঠে—সেই চীনের বাদাম-ওয়ালার আহ্বান উপেক্ষা করে' ফুটপথের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। মঞ্জুশ্রী, অঞ্জনা—বিজলী-পাখার হাওয়ায় তার অঞ্চল-সিঞ্চিত অঙ্গ-সৌরভ—ছায়াছবির মায়ালোক—এলেমেলো স্বপ্নের মত তার চোখের ওপর ভাসে!

মনে পড়ে, অঞ্জনার স্নেহ-শীতল স্পর্শ—অযাচিত অমিয়মাখা করুণা! করুণা? যাবার বেলায় তার মনে রাখবার প্রতিশ্রুতিটুকু—সেও কি করুণা? তার ওই হাসিটুকু—সেও করুণা? হ্যাঁ, কেবল করুণা! যেটুকু সময় সে এসেছিল, কেবল করুণাই বিলিয়ে গেছে! হৃদয়ের একটি কণাও ভুলবশে ফেলে রেখে যায় নি। তার এই মলিন দীনবেশ, দারিদ্র্যের জীর্ণ আবরণ, ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর মুখচ্ছবি—সকলকে সে কেবল করুণার পাত্র বলেই মনে করেছিল। তাই সে কৃপা করে' ললাটে করস্পর্শ করেছে! আর সে সেই কৃপার তণ্ডুলকণা কুড়িয়ে নিজের আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়! না, আর কোনও ভুল নেই! যাবার বেলায় ওই হাসির মধ্যে সে তার সমস্ত ফাঁকিকে ধরে' দিয়ে গেছে! এত অপমানিত জীবনে সে আর কোনও দিন হয় নি! কিন্তু এ অপমানের জন্মে দায়ী কে? মঞ্জুশ্রী, অঞ্জনা—না সে নিজে? দায়ী

কেবল এই একটা পয়সা—আর কেউ নয়! এই পয়সাটা নিয়ে রাস্তার মাঝখানে অমন গোল না বাধ্‌লে—মঞ্জুশ্রী বা অঞ্জনা কারো সঙ্গে তার দেখা হবার সম্ভাবনা থাকত না—আর এই দুর্ব্বিসহ অপমানের দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে' রাত্রির অন্ধকারও এমন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ত না! অদৃষ্টের এ কী পরিহাস!

সুপ্তিমগ্ন রাত্রির নিঃস্তব্ধ নীরবতার মাঝে নিদ্রার যে একটুখানি স্বাধীনতা—এ ক্ষুদ্র মলিন তাম্রখণ্ড তার ওপরেও হস্তক্ষেপ করে! ব্যঙ্গের শলাকা বিঁধে হৃদয়ের ক্ষতকে আরো গভীর করে' তোলে! সে যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পায়,—জীবনে তার যত ক্ষতি, যত ব্যর্থতার পরাজয়-টিক, সব ওই তাম্র অক্ষরে লেখা! চারিদিকে কেবল তাম্রের স্তূপ—অবিশ্রান্ত তাম্রবৃষ্টি! তাম্রের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে' নিশ্বাস তার রুদ্ধ হ'য়ে আসে। অগ্নির উত্তাপে যেন করতল দগ্ধ হ'তে থাকে! উন্মত্ততায় যুক্তি-তর্কের আবরণ খসে' পড়ে—জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে পয়সাটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পথের প্রান্তসীমায় গ্যাসের আলোয় সুস্পষ্ট হ'য়ে নিষ্করুণ পরিহাসের মত সে বলে—"কেমন!"

সশব্দে জানালাটা টেনে দিয়ে সে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সমস্ত রাত তার ঘুম হয় না।. শেষ রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে এসে দরজা খুলে, রাস্তা হ'তে সে পয়সাটা কুড়িয়ে আনে!

'আণ্ডার কারেন্ট'

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

আর সব কথাই গোপন থাক্,—কেবল এই-টুকু বুঝে নেওয়া যাক্ যে, এই ছোট কাহিনীটির যেখানে আরম্ভ,—আরম্ভ সেইখানেই—পেছনে কোন প্রাক্-আরম্ভ নেই।

ক্রমক্ষীণায়মান অগভীর নদী—দুই পারে তার ধূ ধূ করছে বালির চর— আশাহীন বাসা-হীন। অনেক দূরে গাছপালা আর গ্রাম—আশ্বস্তির ইঙ্গিত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই গ্রাম থেকে জল নিতে প্রত্যহ বিকালে আসে একটী মেয়ে। দেহে যৌবনের উচ্ছলতা নাই—আভাষ আছে। গৈরিক বালুচরের কত তপস্যার ফলে যেখানে একটি ছোট্ট কাঁটাগাছ জন্মেছিল, অপরাহ্ণের ম্লানাভ আলোকে অতি ছোট একটি পাখী সেখানে বসে' মাঝে মাঝে ঠোঁট দু'টি ফাঁক করে' থেকে থেকে ডাকে—কা'কে জানা নাই—তবে সুরটা তার উদাস।

প্রত্যহ আসে, যায়—সেই একই পথ—সেই একই পাখী।

কিন্তু একদিন সে আর জল নিতে এলো না। অপরাহ্ণের স্বর্ণ-সমারোহ তা'তে কিছুমাত্র কমলো না,—বালুচরের মৌন ইতিহাস মেয়ে-টাকে অস্বীকার কোরল।

মা—যিনি তা'কে নিয়ে এ গাঁয়ে এসেছিলেন, তা' কমলার মনে নাই। তবে তিনি মারা যাবার পর কমলা এটা বুঝলো যে, সে এই বিরাট জগতে সম্পূর্ণ একা। প্রকাণ্ড জমিদার-বাড়ীতে সে থাকে। আর থাকে মৃত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের পত্নী আর ছোট ছেলে। বড় দু'জন কোলকাতায় থাকে—চাকরী করে।

রাত্রে ঘরে শুয়ে নিজের একাকীত্বে তার ভয় ভয় করে। মনে হয়, যেন এই নিশীথ রাত্রি তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দ অপেক্ষায় থম্‌থম্ করছে। বহু প্রাচীন অট্টালিকার ফাটলের ভিতর থেকে পেঁচা ডেকে ওঠে। ঝিঁঝিঁর একটানা ঝিঁঝিঁ আওয়াজ ঘরের পাশের বকুল গাছটার ওপর দিয়ে গভীর রাত্রির বাতাসে কার যেন মৃদু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ...

কমলা চোখ দু'টিকে শক্ত করে' বন্ধ করে।

তার মার সঙ্গে এই প্রাচীন জমিদার-বাড়ীর কি সম্পর্ক ছিল তা' সে জানে না; তবু মনে হয়, কিছু যেন একটা ছিল। বৃদ্ধা জমিদার-পত্নীর আদর-যত্নের অভাব নাই; তিনি কমলাকে সত্যই ভালবাসেন। তাই ত মা মরবার সময় তাঁরই হাতে স'পে দিয়ে গেছেন তা'কে।

আচ্ছা সে কী কোরবে এখন? সে কি কোথাও চলে' যাবে? কিন্তু কোথায় যাবে? সংসারে পরিচিত বলতে এদের ছাড়া সে আর কাউকে জানে না, তবে—

সুবিপুল বিশ্ব-পৃথিবী ব্যঙ্গ কোরবে, সমা-লোচনা কোরবে, কিন্তু আশ্রয় দেবে না। হৃদয়-হীনতার চরমোৎকর্ষ!

সে কি তবে অনাদৃত ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে স্থান ভিক্ষা কোরবে?...মাগো!...

এখানে থাকতে ত অনিচ্ছা নেই—তবে ওই ছোটদাদাবাবুর কথাগুলো যেন কেমন কেমন! তার প্রত্যেকটী কথায় মনে হয়,—যেন পিছনে কোন মতলব আছে। কে জানে!

হঠাৎ নদীর ওপার থেকে কতগুলো শেয়াল

ডেকে ওঠে,—তাপসী রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়—এখানে-ওখানে অকারণ শব্দ হ'তে থাকে—

কমলা পাশ ফিরে শোয়—হয় ত কাঁদে খানিকটা, নয় ত না।

দিন চলে।

বেলা দশটা।

জিতেন গ্রাম বেড়িয়ে ফিরে আসতেই মা বল্‌লেন—ওরে জিত্, কমলার একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখ—মেয়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌লো।

জিতেন বোধ হয় কথাটায় তেমন কান দিল না; উদাসীন-স্বরে বল্‌লো—দেখবো। বলেই ডাক দিল—কমলি! কম্‌লি কইরে?

কমলা কাছেই কোথাও হয় ত ছিল, সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। জিতেন উচ্ছ্বসিত-স্বরে বললো—এই যে শুনেছিস্ বোধ হয়, আমাদের থিয়েটার হচ্ছে? শুনিস নি? হ্যাঁ, হচ্ছে। 'বিল্বমঙ্গল' বইখানাই ধরা গেল—অমন বই আর হয় না! এ্যাকটিং-এর এক-একটা 'পিস্' একেবারে যেন হীরের টুকরো! এই একটুখানি শোন্—

"এই নরদেহ জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায়
কুক্কুর শৃগাল; কিম্বা চিতাভস্ম পবন
উড়ায়—এই নারী, এরও এই পরিণাম—"

আর জানি নে কোলকাতা থেকে দাদা লিখেছে যে, 'বিল্বমঙ্গল' আর 'চিন্তামণি' সাজ্‌তে তার দু'জন বন্ধু আস্‌বে। ব্যস্, এবার মার্ দিয়া! 'হলুদদীঘি'র পার্টি এবার কাৎ......

এই নারী, তার কি পরিণাম তা' আর কমলার শোনা হ'ল না। জিতেনের উচ্ছ্বাসের মুখে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। এই জিতু দা'র সঙ্গে কোনদিনই তার ভাল করে' আলাপ হ'ল না। এমন একটা দৃষ্টি আছে জিতেনের,—যা' কমলাকে মোটেই শান্তি দেয় না।

কম্‌লি তুই চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে—শুনছিস নে বুঝি? আমার কপাল! ও মা, কমলিকে তুই জিজ্ঞেস করতো, ও আমাকে এমন ভয় করে কেন? আমি বাঘ না ভালুক···?

মা রান্নাঘরের ভেতর থেকে গজর গজর করতে লাগলেন, আর কমলার দিকে চেয়ে একটুখানি চোখ টিপে হাসলেন।···

দুপুর বেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর ওপরে কমলা জিতুকে পান দিতে গেল। পানের সঙ্গে কমলার হাত ধরে' টানার যে কি মানে,—তা' কমলা বুঝতে পারলো না। জিতু বললো—আয় না, এখানে বসে' একটু গল্প করি।

কমলা কেঁদে বল্‌লো—"না জিতু দা', তোমার পায়ে পড়ি—আমার কাজ আছে—

জিতু অন্যদিকে চেয়ে শুধু বললে—আচ্ছা, যা'।···

শীতের সুতীক্ষ্ণ রাত্রি। হু হু করে' উত্তুরে হাওয়া বইছে—তার ওপর আকাশে খুব মেঘ করেছে। কমলা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। এই জনমানবহীন প্রাচীন জমিদার-বাড়ীর নিস্তব্ধতা দিন দিন তার প্রাণশক্তি হরণ কোরছে। শেষকালে সে কি পাগল হ'য়ে যাবে? জমিদার-গিন্নীর কয়েকদিন থেকে রীতিমত অসুখ। ভগবান না করুন, যদি তিনি এ যাত্রা নাই টেঁকেন—তবে? বাড়ীতে রইল শুধু জিতু দা' আর সে—তারপর?

আচ্ছা, জিতু দা' কি চায় তার কাছে? প্রত্যেকটী পদক্ষেপে সে কমলাকে নিকটে পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে—তার চাউনির ভাষা আজও কমলার অজানা। আজ যদি তার মা

বেঁচে থাক্‌তেন, তা' হ'লে জীবনে তার এই সঙ্কট ঘটতো না—একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হ'ত।

হঠাৎ তার মনে হ'ল—অন্ধকারে যেন কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঠ হ'য়ে গেল!…

অন্ধকার চোখের ওপর আর এক পর্দা অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।…অসহ্য আতঙ্কে সে বোধ করি বা মূর্চ্ছিতই হ'য়ে পড়লো।

দেহে মনে অপরিসীম ক্লান্তি। জিতু দা'কে এড়িয়ে চলবার আর কোন মানে হয় না। মানুষকে ভয় করবার গোপন রহস্যলোক আজ তার কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত। সে চেষ্টা করলে,—জিতু দা'র সঙ্গে এ বাড়ীতে থাকা নিয়ে আজকে বোধ হয় ঝগড়াও করতে পারে।

ঘাটে জল আনতে আর সে যায় না। সুবিস্তীর্ণ বালুচরের ওপর দিয়ে একা একা হেঁটে যাওয়ার যে মোহ ওর ছিল, আজ আর তা' নেই। কাঁটাগাছের ডালে সেই ছোট পাখিটীর গান আজ ওর কাছে অর্থহীন। শুধু বিশ্ব-সংসারের মধ্যে এইটেই একমাত্র সত্য যে,—আজ রাত্রে যদি জিতু দা' তা'কে ওপরে পান দিয়ে যেতে না ডাকে, তবে সে কি করে' বাঁচবে?…

অসহ্য অসহায়তার মাঝে সে শুধু প্রয়োজন পূরণের প্রতীক। আর কিছু না। এই হাসি-গান-শব্দ-গন্ধ-মুখর সুন্দরী ধরিত্রীর দিন-যাত্রায় তার স্থান নাই। পুরুষের পরুষ অগ্রগতির পিছনে পিছনে নত মস্তকে তা'কে চলতে হবে—আজীবন!

সময় সময় সে ভাবে—আত্মহত্যার কথা। কিন্তু এই সুন্দর সংসারে তার বাঁচবার অধিকার নেই—এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না! সে এখান থেকে যেমন করে' হোক্ পালাবেই! উদ্ধার তা'কে পেতেই হবে—জীবন দিয়ে হয়, সেও স্বীকার!

এর বেশী আর ভাববার অবকাশ মেলে না; ওপর থেকে জিতেনের ডাক আসে—কম্‌লি, পান দিয়ে যা'।

পানের ডিবেটা শক্ত করে' ধরে'—কমলা একবার অসহায়ভাবে অন্ধকার রাত্রির দিকে চায়—তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।…

চোখে জল আসা উচিত ছিল…কিন্তু আসে না।

কোলকাতা থেকে 'বিল্বমঙ্গল' আর 'চিন্তামণি' এসে পৌঁছেচে। তাদের চা আর জল-খাবার যোগাতে যোগাতে কমলার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু যাই হোক্,—'বিল্বমঙ্গল' ছেলেটির চেহারাটা কিন্তু বেশ—কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঘাড়ের কাছ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে—টানা টানা দুটো চোখ—মুখে হাসি লেগেই আছে। উন্মুখ জগতের বার্ত্তা ওদের প্রত্যেক কথায়—ওরা যেন কমলার জীবনে আশার ভাষা এনেছে!

চা দিতে গিয়ে হঠাৎ যোগেনের সঙ্গে কমলার চোখোচোখি হ'য়ে গেল। 'বিল্বমঙ্গলে'র নাম যোগেন—আর 'চিন্তামণি'র নাম গোবিন্দ। যোগেন একটু হেসে জিজ্ঞেস করলে—তোমার নামটি কি ভাই?

কমলা লাল হ'য়ে কোনরকমে বললে—আমার নাম কমলা।

কমলা! বেশ নামটী ত! তা' ভাই, তুমি আমাদের লজ্জা কোরছ কেন? আমাদের

তোমার বড় ভায়ের মতই দেখো। তাই ত আসবার সময় সীতেন দা' বললে যে,—যাও, তোমাদের অসুবিধে কিন্তু হবে না—যদিও সেখানে জিতু আছে, তবে তার ভরসা আমি করি নে—তবে সেখানে কমলা আছে—নিশ্চয় জেনো, সে তোমাদের অসুবিধে ঘটতে দেবে না।

কমলা চুপ করে' শুনে গেল—কোন উত্তর দিল না।

—আচ্ছা যাও এখন। দাঁড় করিয়ে রাখবো না—কাজ-কর্ম্ম হয় ত পড়ে' আছে।

সেদিন বিকেলে যোগেনকে একলা দেখতে পেয়ে কমলা এগিয়ে গিয়ে কেঁদে পড়লো। যোগেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল! জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে কমল?

কমলা কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমায় এখান থেকে যেমন করে' হোক্ নিয়ে চলুন! এখানে থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাব!

—তোমাকে নিয়ে যাব! কোথায় যাবে তুমি?

—কোলকাতায়।

—কোলকাতা ত আর এতটুকু জায়গা নয়—সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবে?

—কেন, সত্যেন্ দা'র কাছে।

—ও! তা', আচ্ছা, বেশ। জীতুকে বলে' দেখি—

—না না, কাউকে বলাটলা হবে না। পায়ে পড়ি আপনার।

এতক্ষণে যোগেন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো; একটু থেমে বললো—বেশ, তাই হবে—তুমি তৈরী থেকো। কাল্‌কেই রাত্রি বারোটার গাড়ীতে—বুঝেছ?

কমলা চলে' যাচ্ছিল,—যোগেন তা'কে ডাক দিলো—শোন কমল।

কমলা ফিরে দাঁড়াল। যোগেন একটু ইতঃস্ততঃ করে' বললো—আচ্ছা, আমি যে এতবড় একটা দায়ীত্ব ঘাড়ে নিচ্ছি,—তার পুরস্কার?

কমলা চম্‌কে যোগেনের দিকে চাইল!···

—পুরুষের চোখের সেই সনাতন দৃষ্টি!··· যার বলে যুগে-যুগে নারীপ্রগতির অমিত বলশালিতা স্তিমিত হ'য়ে গেছে! শুধু ওই দৃষ্টির অদ্ভুত শক্তিতেই পুরুষ অনন্তকাল ধরে' নারীর প্রাণভাণ্ডার থেকে আপনার বংশধারাকে, দীর্ঘজীবি করেছে,—পুষ্ট করেছে,—জয়যুক্ত করেছে!

কমলা অকস্মাৎ মরিয়া হ'য়ে জবাব দিলো—পাবেন।

পরের দিন সন্ধ্যা।······

আর কয়েকঘণ্টা পরেই কমলা মুক্তি পাবে। আর কয়েকঘণ্টা পরেই এই গ্রামের আকাশ ছাড়া অন্য আকাশ এবং জিতু দা' ছাড়া অন্য মানুষ তার চোখে পড়বে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানা ও ফেলার যে পরিপূর্ণ নির্ভয়তা,—তা' সে লাভ কোরবে।

মুক্তি—তা' সে যার বিনিময়েই হোক্···দেহ, আত্মা, প্রাণ, মন,—কিছু যায় আসে না! উন্মাদের মত কমলা কাজ শেষ কোরতে লাগ্‌লো।

জিতেন এসে আদর করে' গেল; আজ কমলা আপত্তিমাত্র করলো না; বরং একটু হেসে তা'কে সম্বর্দ্ধনা করলো। জিতেন বললো—কি গো কমল, মনে আজ এত ফূর্ত্তি কেন?

কমলা আবার একটু হাসলো—কথা কইলো না।

আজ সকলকে সে ক্ষমা করবে—পরম

শত্রুকেও। আগত অনাগত সব অনিষ্টকারীর ওপর তার পরিপূর্ণ ক্ষমা রইলো।

আজ তার জীবন বিস্তারের পুণ্যলগ্ন!…

রাত্রি গভীর হ'ল।……

ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে কমলা কাপড়ের একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে পথে নেমে পড়লো। গ্রাম থেকে ষ্টেশন একমাইলের মধ্যেই—ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেও গিয়ে পৌছনো যায়।

পরিচিত রাস্তার ওপর দিয়ে কমলা চলেছে অপরিচিতের উদ্দেশে। কোলকাতার জনতা-জটিল রাজপথ তার সমস্ত উদ্দামতা নিয়ে অপেক্ষা করছে—বিশ্বের বিশাল কর্ম্ম-তালিকায় তার স্থান দান কোরবার জন্যে।

সীতেন্ দা' জিতেন নয়—এই কমলার একটা সান্ত্বনা। সীতেন্ দা' ঠিক ওর সীতেন্ দা'ই। সে সেখানে থেকে লেখাপড়া শিখবে—তারপর তার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতে আজ্‌কের কলুষ মনেও থাকবে না।

ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকার।

জনমানবহীন ষ্টেশন। যোগেন ত দূরের কথা,—একটা কুলি পর্য্যন্ত নেই। কমলার বুকটা ধড়াস্ করে' উঠলো!…সে চীৎকার করে' ডাকলো—যো—যোগেন দা'!

ওয়েটিং-রুমের পাশ থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। বললো—যোগেনকে খুঁজছো? যোগেন ত রাত এগারটার গাড়ীতে কোলকাতা চলে' গেছে।

লোকটা জিতেন।

কমলার পা দুটো থর্‌থর্ করে' কেঁপে উঠলো। সে বসে' পড়বার চেষ্টা করতেই, জিতেন তা'কে ধরে' ফেললো।

—একেবারে গাড়ীতে গিয়েই বসো—বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে

কমলা শুধু একবার করুণ-দৃষ্টিতে জিতেনের মুখের দিকে চাইলো—তারপরই ঝরঝর করে' কেঁদে ফেল্‌লো।

গাড়ীর ভিতর সেদিন জিতেন কমলাকে অপ্রত্যাশিত রকম আদর করেছিল।

অন্ধকারের ভিতর গরুর গাড়ীর একঘেয়ে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দ ক্রমেই দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লো।…………

প্রকৃতির দাবী

শ্রীদেবীরঞ্জন দে

ম্যানেজার রমেশবাবু সকালবেলা বাংলোর বারান্দায় বসে' আছেন, এমন সময় দেখেন দূরে কুলীদের বস্তির কাছে অনেক লোক জমা হয়েচে। তিনি চাকরকে ডেকে বল্‌লেন, 'বাহাদুর, দেখ্‌ ত কিসের ভিড় ওখানে ?

একটু পরেই ঘুরে এসে বাহাদুর বল্‌লে, "বাপু, একটী কচি মেয়ে নিয়ে একটা বুনো লোক কি সব বলছে—তাই বস্তির কুলীগুলো ভিড় করে' দাঁড়িয়ে আছে।"

রমেশবাবু বল্‌লেন, "ডাক্‌ ত লোকটাকে।"

বাহাদুর গিয়ে লোকটাকে ডেকে নিয়ে এল। রমেশবাবু দেখেন, একটা শীর্ণকায়, হিংস্রভাবাপন্ন লোক। তার কোলে একটী সদ্যঃপ্রসূত সন্তান।

রমেশবাবু মেয়েটীর দিকে আঙুল দিয়ে আসামী ভাষায় লোকটীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটী কার ?"

রমেশবাবুর ভাষা, সে ঠিক বুঝ্‌তে পারলে কি না, বোঝা গেল না; কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পেরে, সে তার না-আসামী, না-পাহাড়ী ভাষায় জবাব দিলে, "আমার।"

তারপর সে রমেশবাবুকে কোনরকমে বোঝালে যে, সে মেয়েটীকে বিলিয়ে দিতে চায়।

রমেশবাবু তা'কে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটার মা কোথায়—সে বিলিয়ে দিতে চায় কেন ?"

জবাবে সে অনেক কথা বল্‌লে; তবে তিনি তার সব কথা থেকে এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, মেয়েটার মা প্রসব করার পরেই মারা গেছে এবং সে এই কন্যার ভার গ্রহণ করতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক।

ইতিমধ্যে রমেশবাবুর স্ত্রী নলিনী দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এই সব কথাবার্ত্তা শুনে বাহাদুরকে দিয়ে রমেশবাবুকে ভিতরে ডাকিয়ে বল্‌লেন, "ওকে নাও না, দিব্যি মেয়েটী!" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "আহা, যদি মণি থাকতো, তা হ'লে এতদিন পাঁচ বছরেরটী হ'ত।

বর্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ বুঝতে পেরে রমেশবাবু তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, "আমিও তাই মনে করছিলুম নলিনী, মেয়েটীকে নেওয়াই ভাল,—তবু তোমার একটা অবলম্বন হবে। ওর কাছে থাকলে, ও ত বাঁচাতে পারবে না।"

বাইরে বেরিয়ে এসে, রমেশবাবু লোকটাকে বল্‌লেন, "রেখে যা' বাপু মেয়েটাকে, এখানেই রেখে যা'। নে রে বাহাদুর, ওর কোল থেকে মেয়েটাকে নে। ময়লা, ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলোকে ফেলে দিয়ে, ওর গায়ে বেশ করে' সাবান দিয়ে তবে ঘরে নিয়ে যাবি।"

তারপরও কিন্তু লোকটা বসে' রইল।

রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, আবার বসে' কেন ? মেয়ে বিলুনো ত হ'য়ে গেছে।"

অবোধ্য ভাষায় কি বলে' লোকটা হাত পাতলে।

রমেশবাবু মনে মনে হেসে তার হাতে একটা টাকা ফেলে দিলেন।

লোকটা বিশেষ কোন কৃতজ্ঞতার ভাব না দেখিয়ে চলে' গেল।

রমেশবাবু অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, পৃথিবীতে কত রকমের লোকই আছে।

দুই

বছর তিনেক কেটে গেছে। তখনকার সদ্যজাত শিশু এমন দামাল মেয়েতে পরিণত হয়েছে। তার দৌরাত্ম্যে ঘরে কোন জিনিষ রাখবার যো নেই। নীচেয় রাখলে ত কথাই নেই ; উঁচুতে রাখলেও তার হাত থেকে নিস্তার নেই—সে জানালায় উঠে হোক্, লাঠি দিয়ে হোক্ যেমন করে' পারে হস্তগত করবে এবং পরক্ষণেই ভেঙে ফেল্‌বে। ভেঙেই তার আনন্দ।

পাহাড় দেশে পাওয়া মেয়ে বলে', সাধ করে' তার নাম রাখা হয়েছে পার্ব্বতী। সে আধ আধ কথা কয়। কথাগুলি তার ভারি মিষ্টি—কাণে যেন মধু ঢেলে দেয়! রংটী তার কাঁচা সোনা। মাথার চুলগুলো কাল, কোঁকড়া কোঁকড়া, দোষের মধ্যে তার নাক বসা, চোখ ছোট। নলিনী বলে, "তা' হোক্। রংয়ের গুণে মানিয়ে যাবে।"

নলিনীর কাজ বেড়ে গেছে। শোওয়া-বসা তাঁর উঠে গেছে—সব সময়েই মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। পার্ব্বতী তাঁকে ছেলের শোক ভুলিয়ে দিয়েছে। সে কোন জিনিস ভেঙে নষ্ট করলে তিনি সেটাকে হেসেই উড়িয়ে দেন। সময়ে সময়ে কৃত্রিম রোষে বলেন "মেয়েটা, ভারি দুষ্টু হয়েছে—এবার এটাকে বেঁধে রাখতে হবে দেখছি।"

আগে রমেশবাবুর অবসর সময়টা যেন কাটতে চাইত না ; এখন সময় কাটাবার আর ভাবনা নেই। সময় পেলেই পার্ব্বতীর সঙ্গে খেলা করা, তাঁর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে হ'য়ে গেছে। খেলার মধ্যে পার্ব্বতীর সব চেয়ে বেশী ভাল লাগে পাহাড়ে ওঠা। রমেশবাবু হবেন কুলি, সে হবে ভারি বোঝা। রমেশবাবু তাকে পিঠে করে' ঘাড় নুইয়ে বাংলোর সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠবেন, আবার ধীরে ধীরে নেমে আস্‌বেন। এই খেলা পার্ব্বতীর বড় প্রিয়। রমেশবাবু যখন ওই রকম করে' উঠেন আর নামেন, সে তখন খিল্‌খিল্ করে' হাসে।

নলিনী আর রমেশবাবুর পার্ব্বতী যেন নয়নের মণি—আঁধার ঘরের আলো!

তিন

পার্ব্বতী এখন আট-ন' বছরের মেয়ে। অনেকের ধারণা ছেলেমেয়ে ছেলেবেলায় দুষ্টু থাকলে, বড় হ'লে ভালমানুষ হ'য়ে যায়। পার্ব্বতীর বেলা কিন্তু তা' হ'ল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্টুমি আরও বেড়েই চল্‌ল। নলিনী আর রমেশবাবুর আদরে আদরে, সে একেবারে অবাধ্য হ'য়ে উঠেছে। সে কারুর কথা শুনতে চায় না, এমন কি রমেশবাবুরও নয়। নলিনী চান্, মেয়ে ঘরের মধ্যে বসে' তাঁর সাম্‌নে খেলা করে ; পার্ব্বতী চায়, সে বাইরে গিয়ে কুলী-মেয়েদের মত চায়ের পাতা তোলে। নলিনী তার জন্যে কোলকাতা থেকে ভাল ভাল খেলনা, দামী দামী পুতুল আনিয়েছেন ; রমেশ-বাবু তা'কে একখানা 'ট্রাইসিকেল' কিনে দিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই পার্ব্বতীর মন আর ওঠে না—যেমন তার আবদার,তেমনি তার অভিমান। একদিন সে বায়না ধরলে—আমি সাইকেলে চড়বো না—ঘোড়ায় চড়বো। নলিনী তা'কে কত বোঝালেন, বল্‌লেন, "ছি মা, মেয়েমানুষে কি ঘোড়ায় চড়ে!

নলিনী গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "হাঁ চড়ে।

আমি দেখেছি, সেদিন একদল লোক পাহাড় থেকে নেমে আস্‌ছিলো—তার মধ্যে ত কত মেয়েমানুষ ছিল।"

নলিনী একটু বিরক্তি-পূর্ণ স্নেহ-মিশ্রিত স্বরে বল্‌লেন,"তুই কি বলিস পার্ব্বতী ? তারা কোনো পাহাড়ে লোক, বুনো ; কার সঙ্গে কার তুলনা !"

পার্ব্বতী কোন কথা কইল না ; গোঁভরে চুপ করে' রইলো। রমেশবাবু একটু স্বগত-ভাবেই বল্‌লেন—"বুড়ো মেয়ের আবদার দেখ ! বলে, ঘোড়ায় চড়বো—দু'দিন পরে বলবে, চাঁদ ধরবো !"

পার্ব্বতী কিন্তু অচল, অটল। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো—এক পাও নড়লো না। নলিনী রমেশবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "মহা মুস্কিল হ'ল দেখ্‌ছি ! এ মেয়ে নিয়ে কি করা যায় ?"

বিরক্ত হ'য়ে রমেশবাবু বল্‌লেন, "তুমিই ওকে অমন করেছ। আবদার দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে !"

একটু হেসে নলিনী বল্‌লেন, "আর তুমি, তুমি বুঝি আবদার দাও না !"

রমেশবাবু চুপ।

উপায়ান্তর না দেখে, রমেশবাবু বাহাদুরকে বল্‌লেন, "যা' ত বাহাদুর, ডাক্তারবাবুর টাট্টুটাকে চেয়ে নিয়ে আয় ত একবার। কি জেদ মেয়ের !"বলে'তিনি অন্য কাজে মনোসংযোগ করলেন। বাহাদুর টাট্টু নিয়ে এসে পার্ব্বতীকে চড়িয়ে খানিকটা ঘোরোনোর পর, তবে তার মুখে হাসি ফুটলো।

কোনদিন হয় ত রমেশবাবু বাগানে কুলিদের কাজ দেখবার জন্যে বেরুচ্ছেন, এমন সময় পার্ব্বতী বলে' বসলো, "বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।"

রমেশবাবু দেখেন,—পার্ব্বতী বায়না ধরলে সহজে ছাড়ে না—কাজেই তা'কে অনেক সময়েই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। সে সময় নলিনী যদি হেসে বলেন, "পার্ব্বতী, তুই আমায় একা রেখে যাবি, আমার ভয় করবে না ?"

পার্ব্বতী গম্ভীরভাবে বলে, "বাহাদুর ত আছে, ভয় কি ? অতবড় মেয়ের আবার ভয়।"

তার এই রকম নর্ত্তন-কুর্দ্দন, হাস্য-কোলাহলে রমেশবাবুর বাংলোটী যেন সব সময় মুখর হ'য়ে থাকে। নলিনীর আনন্দ আর ধরে না ! তিনি রমেশবাবুকে বলেন, "ভাগ্যিস পার্ব্বতীকে পেয়েছিলুম, তা' না হ'লে কি হ'ত বল ত ! আমাদের দিন কাটতো কি করে' ?"

চার

পার্ব্বতী এখন বারো-তের বছরের মেয়ে। চাঞ্চল্য কিন্তু তার একটুও কমে নি। নলিনীর কাছে বাড়ীতে থাকা তার মোটেই পোষায় না। এখনও সে আগেরই মত রমেশবাবুর সঙ্গে বাইরে ঘোরে। নলিনী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন, "তুমি কি বল ত, অতবড় মেয়ে সঙ্গে নিয়ে পথে-ঘাটে, বাগানে ঘুরে বেড়াও !

রমেশবাবু একটু হেসে বলেন, "ছেলেবেলা থেকে তা'কে এই রকম করে' বাইরে ঘোরানই দোষ হয়েছে। হঠাৎ যদি এখন বন্ধ করি, তা' হ'লে ভেবে ভেবে তার অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে। একটু-একটু করে' এই বদ-অভ্যাস ছাড়াতে হবে ; ব্যস্ত হ'লে চলবে না !"

এখন মাঝে মাঝে তিনি পার্ব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে যান না ; কিন্তু ফল তা'তে বড় ভাল হয় না। তাঁর চলে' যাওয়ার একটু পরেই সেও কাউকে কিছু না বলে' বেরিয়ে যায়। নলিনীকে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে মেয়ের খোঁজে প্রায়ই বাহাদুরকে পাঠাতে হয়। বাহাদুর কোনদিন ফিরে এসে জানায়, "পার্ব্বতী শালবনে শালপাতা কুড়ুচ্ছে !"

কোনদিন বলে, "প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটী করছে।"

বাহাদুর ডাকলে সে আসে না। নলিনী-কেই আবার যেতে হয় মেয়েকে নিয়ে আসবার জন্যে। তাই কি সে সহজে আসে, অনেক পেড়াপীড়ি করলে, তখন বলে, "আচ্ছা মা, এইবার চলো।"

অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে নলিনী বলেন, "বল্, পোড়ারমুখী বল্, আমায় না মেরে তুই কি ছাড়বি না!"

পার্ব্বতী কোনদিন বলে, "এ ঝরণার জল কোত্থেকে আসচে মা?" কোনদিন বা বলে, "এ শালবন কতদূর গিয়েছে?" আবার একদিন বলে, "মা, প্রজাপতিগুলো রাত্রিবেলা কোথায় থাকে?"

মিষ্টি করে' এই সব কথার জবাব দিয়ে তবে নলিনীকে মেয়ে আনতে হয়।

যদি তিনি কোনদিন বলেন, "আমি জানি না।"

মেয়েও সঙ্গে-সঙ্গে বলে, "আমি যাব না।"

রমেশবাবু সেদিন বড় চিন্তিত। নলিনী স্বামীর মুখ দেখে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে গা? চাকরী-বাকরীর কিছু গোলমাল—"

কথা শেষ করতে না দিয়েই রমেশবাবু বললেন, "না গো না, চাকরী-বাকরীর নয়। সেই বুনোলোকটা এসেছে!"

নলিনী বুঝতে না পেরে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কোন লোকটা?"

রমেশবাবু বললেন, "সেই যে গো, যার কাছ থেকে আমরা পার্ব্বতীকে নিয়েছিলুম।"

'পার্ব্বতী' পর্য্যন্ত শুনেই নলিনীর মুখ শুকিয়ে গেল। অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বললে সে?"

রমেশবাবু বললেন, "বিশেষ কিছু বলে নি। আমি যখন সকালবেলায় বাগানে যাচ্ছিলুম, সে একটা গাছতলায় বসেছিল। আমায় দেখে উঠে এসে, আকারে-ইঙ্গিতে আমার কাছে টাকা চাইলে। তার ওই জ্বলন্ত চোখ দুটোর মধ্যে কেমন একটা হিংস্রভাব লুকিয়ে আছে! তা'কে দেখলেই আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়! আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁচটা টাকা ফেলে দিলুম; আর সঙ্গে সঙ্গে কঠোরভাবে বলে' দিলুম, 'তাকে যেন এ অঞ্চলে আর দেখতে না পাই!' টাকা নিয়ে লোকটা তবু নড়ে না। হাতমুখ নেড়ে নানারকম করে' সে আমায় বোঝালে—'তার মেয়েটাকে সে একবার দেখতে চায়।' আমি দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললুম, 'না, তা' হবে না।' সে 'গুম্' হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে, হন্‌হন্ করে' বনের দিকে চলে' গেল।"

নলিনী ব্যগ্রতার সহিত বললেন, "তুমি তা'কে পুলিসে দিলে না কেন?"

রমেশবাবু চিন্তার মধ্যেও একটু হেসে বললেন, "তুমি ত তোমার আবেগে বলে' ফেললে পুলিসে দিলে না কেন?' কিন্তু তার অপরাধটা কি? কি দোষে তা'কে পুলিসে দোব?"

নলিনী চুপ করে' রইলেন—উত্তর দিলেন না।

রমেশবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখ নলিনী, পার্ব্বতীকে এখন থেকে আর বাড়ীর বাইরে যেতে দিও না। বাহাদুরকে ভাল করে' বলে' দেবে, সে যেন সব সময় তার ওপর নজর রাখে।"

পাঁচ

পার্ব্বতীর এখন বড় মুস্কিল হয়েছে। তার মন চায় বাইরে ছুটে যেতে; রঙীন প্রজাপতির

সঙ্গে মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে; ঝরণার জলের মত উচ্ছল গতিতে বয়ে' যেতে; শালতরুর মাঝে দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার,নীরবতার মাধুর্য্য মৌন হ'য়ে উপভোগ করতে। বাধা দেয় বাহাদুর, বাধা দেয় নলিনী। সে জানালায় বসে' আকুল হ'য়ে বাইরের মুক্ত আলো-আকাশের দিকে চেয়ে থাকে! তার চোখে-মুখে এসে লাগে শালবনের খোলা হাওয়া। পাগল করে' দেয় মন। উদাস হ'য়ে সে শুধু চেয়েই থাকে! দেহ তার পড়ে থাকে বাংলোর অন্দরে—মন তার ছুটে বেড়ায় বাইরের মুক্ত প্রান্তরে!

দু'দিন যেতে-না-যেতে তার দেহের অমন লাবণ্য ম্লান হ'য়ে এল; সুন্দর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল।

নলিনীর মুখে গম্ভীর চিন্তার ছাপ। রমেশ বাবুও ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবেন, বাইরে যেতে দিলে যদি সেই বুনো লোকটার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। যদি সে পার্ব্বতীকে বলে, 'সেই তার বাপ—আমরা কেউ নই! সে যদি পার্ব্বতীকে ভোলায়। পার্ব্বতী যদি রক্তের টানে ভুলে যায়। তা' হ'লে কি হবে? আমাদের সোনার স্বপ্ন যে ভেঙে যাবে! আমরা কি নিয়ে থাকবো? আবার কখনও ভাবেন, এমন ভাবে চোখের সামনে শুকিয়ে যাবে, তাই বা কি করে' দেখা যায়?

অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁরা ঠিক করলেন, পার্ব্বতীকে পুরাণো বুড়ো চাকর বাহাদুরের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে দেওয়া হবে।

পার্ব্বতী এখন বাইরে বেড়ায়; ইচ্ছামত এখান-সেখানে যায়—কিন্তু বাহাদুর সব সময় তার পাশে পাশে থাকে। বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হ'লে কখনও গাছতলায় কখনও বা ঝরণার পাশে বসে। বসে' বসে' বাহাদুরের সঙ্গে কত গল্পই করে—যেন কথায় আর শেষ নেই!

একদিন বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা বাহাদুর, এই সব বনের মধ্যে লোক থাকে?"

বাহাদুর বললে, "হ্যাঁ, থাকে বৈকি।"

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "পাহাড়ের ওপরে?"

বাহাদুর বললে, "সেখানেও থাকে।"

সে তখন প্রশ্ন করে' বসল, "কেমন করে' থাকে তারা? কি খায়? তারা কি আমাদের মত কাপড়-জামা পরে? আমাদের মত দেখতে?"

বাহাদুর এক এক করে' তার সব কথার জবাব দিলে।

হঠাৎ পার্ব্বতীর একটা কথা মনে পড়ে' গেল। সে বললে, "আচ্ছা বাহাদুর, মাকে আমি বলতে ভুলে গেছি, তাই তোকে এখন জিজ্ঞাসা করছি, সেদিন যখন আমি যাচ্ছিলুম, আমায় দেখিয়ে একটা কুলি-বউ আর একটা কুলি-বউকে বললে, 'বাবুর মেয়েটা লেপচার মেয়ে!' কেন তারা ও কথা বললে?"

ভেতরে একটু অস্বস্তি বোধ করে' বাহাদুর জবাব দিলে, "তা' আমি বলতে পারি না; তুমি মাকে জিজ্ঞাসা করো।"

মনে মনে একটু বিরক্ত হ'য়ে পার্ব্বতী চুপ করে' রইল। আর কোন কথা কইলে না।

তারপর বাড়ীতে ফিরে এসেই, মাকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কুলি-বউটা ও কথা বললে কেন মা?"

নলিনী প্রথমে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন; তারপর হেসে বললেন, "তোর নাক-চোখ দেখে।"

পার্ব্বতীও একটু হাসলে; তারপর বললে,

"আচ্ছা মা, আমার মুখটা এমন হ'ল কেন—তোমাদের ত এমন নয়?"

নলিনীর ভিতরটা শিউরে উঠলো! তারপর ধীরভাবে বললেন, "সকলের কি সমান হয় মা?"

পার্ব্বতী এ উত্তরের পর আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেলে না—কাজেই চুপ করে' রইলো।

একদিন সে বললে, "আমি আজ বেড়াতে যাবো না; রোজ রোজ বেড়াতে ভাল লাগে না।" তারপর নলিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, "আজ আমি তোমার সঙ্গে বসে' গল্প করবো।"

নলিনী জানতেন, পার্ব্বতীর এরকম ডেকে গল্প করার মানে, তাঁ'কে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নে বিব্রত করে' তোলা। তাই তিনি অন্তরে ভীত হ'লেও হাসিমুখে বললেন, "আমিও ত তাই বলি মা, বনে-জঙ্গলে ঘুরে না বেড়িয়ে মায়ে-ঝিয়ে একসঙ্গে বসে' দু'দণ্ড কথা কই এস।"

"আচ্ছা মা, তুমি বলতে পার বন-জঙ্গল আমার এত ভাল লাগে কেন?" বলেই মেয়ে মায়ের পাশটিতে বসে' পড়ল।

নলিনী বল্লেন, "বন-জঙ্গল তোর কি একাই ভাল লাগে মা, সকলেরই ভাল লাগে।"

পার্ব্বতী হেসে বললে, "আমারও তাই ধারণা। আমি যখন ঝরণার ধারে শালবনের মধ্যে পাহাড়ের কোলে কোলে বেড়াই, তখন আমার মনে কি হয় জানো মা? মনে হয়, একবার ছুটে গিয়ে দেখি ঝরণার জল কোথা থেকে আসচে, শালবনটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাহাড়টা কতখানি উঁচু, তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে নিচেটা কেমন দেখায়? তোমার মনে এ রকম হয় মা?"

নলিনী বল্লেন, "নারে পাগলী, না, আমার এ রকম হয় না। তবে যদি আমি এ দেশে জন্মাতুম, আর তোর মত বয়স হ'ত, তা' হ'লে হয় ত আমারও হ'ত।"

পার্ব্বতী বল্লে, "আমার কি ইচ্ছা করে জান মা?"

নলিনী ঈষৎ ভাবিত হ'য়ে ধীরভাবে বল্লেন, "কি?"

পার্ব্বতী মায়ের চিন্তিতভাব মোটেই লক্ষ্য না করে' বল্লে, "আমার ইচ্ছা করে মা, আমি সারাদিন পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরি, খিদে পেলে বনের ফল খাই, তেষ্টা পেলে ঝরণার জল খাই, আর ঘুম পেলে, পাহাড়ের গর্ত্তে ঘুমুই। তোমার এরকম ইচ্ছা হয় মা?"

নলিনী তখন বিশেষ ভাবিত হ'য়ে বল্লেন, "না না, আমার হয় না। তুই মা অমন করে' বকিস নি; তোর মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে। আমি বরং গল্প করি, তুই শোন্।"

শুনতে শুনতে মেয়ে মায়ের কোলের কাছে লুটিয়ে পড়লো।

ছয়

পার্ব্বতী যত বড় হ'তে লাগ্‌ল্, তার বাইরের আকর্ষণ ততই বেশী হ'য়ে উঠ্‌ল। রমেশবাবু বলেন, "ও সব কিছু নয়—ছেলেবেলা থেকে আমার সঙ্গে বাইরে ঘুরে-ঘুরে ওর অমন স্বভাব হ'য়ে গেছে। বিয়ে হ'লে এ সব আর থাকবে না।"

নলিনী ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "না গো না, এ সে ভাব নয়—মেয়েছেলের এ রকম ব্যাপার আমি কখন দেখিও নি, শুনিও নি।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পার্ব্বতীর ষোল বছর বয়স হ'ল। রমেশবাবু অনেককেই পার্ব্বতীর বিয়ের কথা বল্লেন। তবে আসামের চা-বাগানে বসে' মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত—তার উপর আবার পার্ব্বতীর মত মেয়ে। কাজেই রমেশ-

যায় ঠিক করলেন, এই পুজোর পর কোলকাতায় গিয়ে যা' হয় একটা ব্যবস্থা করবেন।

রমেশবাবুর বাগানের কপাল এবার ফিরে গেছে। সেখানকার বাঙালী-বাবুরা মৎলব করেছেন, যখন পুজোর ছুটী পাওয়া যায় না, তখন বাগানেই সবাই মিলে দুর্গাপূজা করবেন।

রমেশবাবুর ভারি উৎসাহ! বললেন, "প্রতিমা গড়ার যা' কিছু খরচ, আমি একাই দোবো। কতকাল মায়ের মূর্ত্তি দেখি নি—এবার এখানেই তাঁর দর্শন পাবো!"

কৃষ্ণনগর থেকে অনেক টাকা খরচ করে' তিনি পটুয়া আনালেন। প্রতিমার গড়ন আরম্ভ হ'য়ে গেল। রমেশবাবুর বাগানের সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী হ'ল।

পার্ব্বতীর বনে-জঙ্গলে ঘোরা আজকাল যেন একটু কমেছে। তবে থেকে থেকে আত্মভোলা ভাব কিন্তু তার যায় নি। নলিনী বোঝান, রমেশবাবু বোঝান, "ছি মা, বড় হয়েছিস, অমন করে' এখানে-সেখানে ঘুরিস নি—লোকে কি বলবে?"

সেও এখন বোঝে, কথাটা খুব মিছে নয়। কিন্তু সে যে থাকতে পারে না—কে যেন ভেতর থেকে তা'কে আকুল করে' তোলে। সব ছেড়ে সে বনের দিকে ছুটে যায়। সে বুঝতে পারে না, কেন এমন হয়! সে ভেবে পায় না, তা'কে পাগল করে' তোলে কেন?

আজকাল সে বাইরে ঘোরা ছেড়ে দিয়ে নিপুণ পটুয়ার মূর্ত্তিগড়া দেখছে। শুধু খাবার সময় খায়, আর নলিনী শোনে না, তাই বাড়ীর ভেতর গিয়ে শোয়। দক্ষ শিল্পী দেখতে দেখতে পার্ব্বতীর চোখের সামনে কাট, খড়, মাটি দিয়ে সুন্দর দেবীমূর্ত্তি গড়ে' তুললে। পার্ব্বতী অবাক্ হ'য়ে প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে, আর ভাবে, দুর্গা যে হিমালয়ের মেয়ে, তাই এত সুন্দরী! অমনি তার মনে পড়ে' যায় পাহাড়ের কথা, জঙ্গলের কথা, ঝরণার কথা—সঙ্গে-সঙ্গে মনটা উদাস হ'য়ে ওঠে।

আজ সপ্তমী। সেখানকার আশপাশের ছোট-খাটো বাগানের যত বাঙালী ছিলেন, সবাই এসে পুজোয় যোগদান করেছেন। বড় জাঁকজমক। লোকের চীৎকারে, সানায়ের আলাপে, শাঁকের আওয়াজে কান পাতবার যো নেই। অন্য সব মেয়েদের মত পার্ব্বতীও সেজেছে; কিন্তু সাজ-সজ্জা তার ভাল লাগচে না। তবু কি করে, নলিনী আর রমেশবাবুর পেড়াপীড়িতে তা'কে ভাল কাপড়-জামা পরতেই হয়েছে। ছাগবলির সময় মেয়েরা সব পালিয়ে গেল—যাও বা দু'-একটি রইল, তারা খাঁড়া তোলা দেখে ভয়ে ভয়ে চোখ বুজলে। পার্ব্বতী পালালো না, চোখও বুজলো না, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছাগরক্ত দেখে তার মনে একটা পশুভাব জেগে উঠল। চোখে-মুখে হিংসারজ্বালা ফুটে উঠলো।

অষ্টমীর দিন বাঙালী-বাবুদের ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। রমেশবাবু সাধ করে' মিষ্টি পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন পার্ব্বতীর ওপর। সে কিন্তু স্পষ্টই বলে' দিলে ও সব সে পারবে না। শুনে রমেশবাবু একটু দুঃখিত ও বিস্মিত হলেন! মনে করলেন, কি অদ্ভুত মেয়ে!

আজ বিজয়া। সকাল থেকেই একটা বিষাদের ছায়া সকলের মুখের ওপর পড়েছে। পার্ব্বতীর মনটা আজ বড়ই কেমন কেমন। মাঝে মাঝে দূর থেকে কার যেন পাগল-করা ডাক হাও য়ায় ভেসে তার কাণে এসে লাগচে। অন্তর তার চঞ্চল হ'য়ে উঠছে! কোন্ এক অলক্ষ্য শক্তি যেন তা'কে আকর্ষণ করচে। ওই জঙ্গলভরা ঝরণা-খোয়া পাহাড়ের দিকে! তার মনের চিন্তা-

শক্তি লোপ পেয়ে গেছে ! বিবেককে সে হারিয়ে ফেলেচে। কি একটা আবিলতায় ছেয়ে গেছে তার মন প্রাণ ! এক-একবার তার ইচ্ছা হচ্চে, সে ডাক ছেড়ে কেঁদে বলে, "আমি যাবো না, ও গো, আমি যাবো না !"

প্রতিমা বিসর্জ্জন হ'ল ঝরণার জলে। বিসর্জ্জনের পর বিজয়ার নমস্কার-আলিঙ্গন আরম্ভ হ'ল। তারপর মিষ্টিমুখ করে' সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল।

নলিনী রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পার্ব্বতী কই ? সে তোমার সঙ্গে যায় নি ?

চিন্তিতভাবে রমেশবাবু বললেন, "না, সে ত আমার সঙ্গে ছিল না।"

সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকর, পরিচিত-অপরিচিত যে যেখানে ছিল, পার্ব্বতীর খোঁজে ছুটল। সবাই জানে, রমেশবাবুর মেয়ে-অন্ত প্রাণ ! নলিনীর নয়নের মণি সে।

বেশ রাত্রি হয়েছে। মেয়ের খোঁজে যারা গেছল, তারা এক এক করে' ধীরে ধীরে বিমর্ষ-চিত্তে ফিরে এল। পার্ব্বতীর দেখা নাই !

রমেশবাবু কাঁদছেন ! নলিনী মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে —অশ্রুজলে তাঁর কপোল ভেসে গেছে। এক-একবার কেঁদে কেঁদে বলছেন, "আজ বিশ্বমায়ের সঙ্গে মা গো তুইও আমাদের ছেড়ে গেলি !"

পরদিন ভোর-হ'তে-না-হ'তেই রমেশবাবু আবার মেয়ের খোঁজে লোক পাঠালেন। কুলিরা চারিদিকে ঘোড়ায় চড়ে' ছুটল। নিজেও তিনি ঘোড়া নিয়ে শালবনের দিকে দৌড়লেন। সারাদিন ধরে' স্নানাহার ভুলে গিয়ে সবাই পাহাড়ে জঙ্গলে ছুটোছুটি করতে লাগল। পার্ব্বতীর চিহ্নমাত্র কেউ দেখতে পেলে না !

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় রমেশবাবু দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একটা গাছের কাটলে সাদা মত কি রয়েছে। ছুটে গিয়ে দেখেন,— পার্ব্বতীর পূজোর সময় পরা জামা-কাপড়গুলো। বুঝতে পারলেন, কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। যাবার সময় এগুলোকে আর নেয় নি। এ সবের দরকার ত তার কোনকালেই ছিল না !

আসামের শালবনের অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আসতে লাগলো। সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে' এল। রমেশবাবুও ফিরলেন পার্ব্বতীর জামা-কাপড়গুলো নিয়ে।

এই রকম দিনের পর দিন নিষ্ফল অনুসন্ধান কিছুকাল ধরে' চললো। তারপর সবাই বল্লে, "রমেশবাবু, আর কেন ? বন্য হরিণীকে আপনারা ধরেছিলেন—ছাড়া পেয়ে আবার সে বনে চলে' গেছে !"
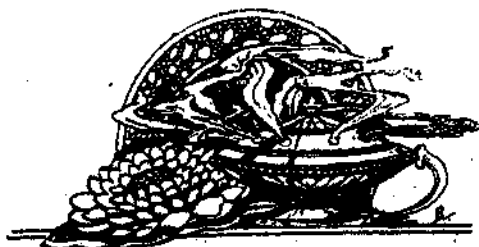
কাঁটার ফুল

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল

সদ্‌যুক্তি বলিয়া দাবী করিলে-ও কি জানি কেন মাতা নিভাননীর সে উপদেশ পালন করিতে পারুল কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারিল না। একটা কথা কেবলি তার বুকে বড় করিয়া বাজিতে লাগিল, যে,—হইলই বা সে পতিতার কন্যা, কিন্তু জানত কোন পাপই ত তাহাকে স্পর্শ করে নাই! জন্ম? তাহাতে মানুষের হাত থাকা অসম্ভব। তবে কেন সে স্বেচ্ছায় এই বিষাক্ত মাল্য সাদরে গলায় ঝুলাইয়া দিবে?

উনিশ বৎসরের যুবতী সে, রূপের-ও তার অভাব নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কামনার নৈবেদ্য সাজাইয়া তাহাকে যে অজ্ঞাত অপরিচিত নির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখেই দাঁড়াইতে হইবে, এই বা কিরূপ কথা! তাই নিভাননী যখন বলিত: এই ত কুড়োবার সময় রে হতভাগী, এই বেলা দু' হাতে তুলে নে—পরকালের দিকে চাইবার বা ঢুকু করবার সময় পরে ঢের পাবি। তখন তার সারা অঙ্গে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিত।

বিদ্রোহ করিয়া কি একটা বলিবার পূর্ব্বেই জননী বাধা দিয়া বলিয়া কহিল: আমাদের তবু রূপ ছিল না, তা'তেই প্রথম বয়সে কিছু কি কম পেয়েছিলুম? গা-ভরা গয়না, নগদ টাকাকড়ি, লোক-লস্করের অভাব কি কোনদিন ছিল? সেই যে-বছর তুই পেটে এলি—

পারুলের যেন অসহ্য বোধ হইল। গৌরবের মনে করিয়া তাহার মাতা তাহাকে যে-কথা শুনাইতে চাহিল, তাহাতে কতখানি বিষ মিশান আছে, সে যেন অনেক পরিমাপ করিয়াও তাহার হদিস্ পাইল না। হাত দিয়া দুই চক্ষু আবরিত করিয়া ক্রন্দন-জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল: থামো মা, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি!

নিভাননীর যেন এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল! কন্যার মুখের দিকে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল: শোন একবার মেয়ের অনাছিষ্টি কথা! এতে কেঁদে ককিয়ে ওঠবার কি আছে, আমি ত ভেবে পাই না। বামুনদের সেই ছেলেটা ত দু'বেলা বাড়ী চষে ফেলছে! সে-কি আর দেখতে মন্দ? অমন চেহারা, ফুট্‌ফুটে রঙ; তা', দু'বছরেও বাপু তোর আর মন গল্‌ল না।

ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাকের উপর হইতে বঁটিখানা তুলিয়া লইয়া পারুল বলিল: তুমি যদি ফের ওই সব কথা বলো মা, তা' হ'লে তোমার চোখের ওপরেই আমি রক্তগঙ্গা হবো!

কন্যার হাবভাব দেখিয়া বিলক্ষণ ভীত হইয়া অগত্যা নিভাননী প্রমাদ গণিল। কতই ঢঙ্‌ জানিস্ বাপু!—বলিয়া রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া পারুলের জায়গা খালি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া নিভাননীর বুকটা 'ছ্যাৎ' করিয়া উঠিল! কন্যার গত রাত্রির আচরণ তখনও তাহার মনে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। একটা দোলায়মান সন্দেহে তাহার চিত্ত দুলিতে লাগিল।

ত্রিতল বাটীখানার প্রত্যেক কামরা অনুসন্ধান করিয়া-ও যখন পারুলের কোন তথ্যই

পাওয়া গেল না, তখন নিভাননী বারান্দার এককোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না সুরু করিয়া দিল: ওরে, আমার এমন সর্ব্বনাশ কে করলে রে!

পূজার আনন্দ শেষ হইয়া কার্ত্তিক মাস পড়িতেই ভোরের দিকে বেশ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হইত। প্রায় সারারাত্রি মাতামাতিতে অতিবাহিত করিয়া গৃহের অধিকারিণীগণ সে সময়ে রীতিমত আমেজেই থাকিতেন; তাই নিতান্ত অসময়ে নিভাননীর আর্ত্তনাদে তাহারা অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

অব্যবহিত পার্শ্বের গৃহের অধিকারিণী তন্দ্রা-জড়িত-স্বরে রুদ্ধ গৃহের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল: কে, নিভা দি' না? ভোর হতে-না-হতেই মড়া-কান্না যুড়ে দিলে কেন গা?

শিরে করাঘাত করিয়া নিভাননী কহিল: আর ভাই মনো, পারুলকে সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না।

পারুলের নামে মনো ওরফে মনোরমার বেশ একটু মোহ ছিল। কারণ, মনোরমার প্রিয় পাত্রটী পারুলকে লাভ করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে বেশ একখানা ভারী গহনা দিবেন তাহার নিকট এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। সেই পারুল, অকস্মাৎ বাঁধন ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেল শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া সে বিস্রস্ত বসন ঠিক করিতে করিতে নিভাননীর উদ্দেশ্যে বলিল: কে এ সর্ব্বনাশ করলে দিদি? এ নিশ্চয়ই সেই বিটলে বামনা ছোঁড়ার কাজ! না যদি হয় ত কি বলেছি!

কিন্তু নিভাননী একটী-ও কথা বলিল না—'গুম্' হইয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল: নারে মনো, না—সে হতভাগী তা'কে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

একটা বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া মনোরমা বলিল: তা'হ'লে তুমি খুব চিনেছ দেখচি! এ লাইনে এতদিন থেকেও মেয়েদের হালচাল কিছুই বুঝলে না?

কি জানি কেন, নিতান্ত জোরের সহিত বলিলে-ও সেকথা বিশ্বাস করিতে কিছুতেই নিভাননীর মন সরিল না। পারুলের গত রাত্রির কথাবার্ত্তা, সেই বিষাক্ত চাহনি, মনে পড়িয়া তাহার অন্তরটাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ব্যাপারটা শাখা-পল্লবে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বহু অভিজ্ঞতার ফলে কেহ বা হলফ্ করিয়া বলিয়া বসিল: অমন রূপ নিয়ে ঘরে থাকা দেবতাদের সয় না, এত মানুষ! এ যে হবেই, তা' অনেকদিন পূর্ব্বেই আমাদের ঠিক করা ছিল!

কেহ বা বলিল: এদানী মেয়েটার একটু বেচাল দেখা যাচ্ছিল—কিন্তু তা' ধরবার চোখ থাকা সোজা কথা নয়, ইত্যাদি।

মনোরমার প্ররোচনায় ভুলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সচেতনকারী মন্তব্য প্রকাশ করিল নিস্তারিণী। নিভাননীর অপর এক পাশের ঘরখানায় সে বাস করিত। সেই দাবী লইয়া জোর-গলায় প্রচার করিয়া দিল: কাল রাত্রে বামুনঠাকুরের সঙ্গে পারুলকে স্বচক্ষে আমি পরামর্শ আঁটতে দেখেছি।

অগত্যা নিভাননীর সকল যুক্তিই ভাসিয়া গেল। মন স্বীকার না করিলে-ও লোকের মুখ সে চাপা দেয় কি করিয়া? নিস্তারিণী পুনরায় কহিল: এই অপকর্ম্ম সেই বিটলে বামুনটার-ই কাজ এবং কারসাজি। কিন্তু সকলে তাহার প্রশংসা করিতেও ছাড়িল না: হ্যাঁ, বেটার নজর আছে বটে!

জনমানবশূন্য পথে পা দিয়াই পারুলের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। একে অপরিচিত, তা'তে একটীও লোক দেখিতে না পাইয়া তাহার গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। মাতার সহিত গঙ্গা-স্নান করিতে আসা ব্যতীত কখনও সে পথে বাহির হইত না। অচেনা রাস্তা না ধরিয়া কি ভাবিয়া সে গঙ্গার পথই ধরিল।

ঘাটে আসিয়া তাহার আরো ভয় করিতে লাগিল। ঘড়ি দেখিয়া সে বাহির হয় নাই; এখন রাত্রি কত তাহা-ই বা কে জানে। ওপারে পাট-কলের বৈদ্যুতিক আলোগুলো মাঝে মাঝে প্রদীপের মতো ম্লান হইয়া মিটমিট্‌ করিতেছে—আর অবিশ্রান্ত কলরোল তুলিয়া সুরধুনী আপন-মনে বহিয়া চলিয়াছেন।

আপন কর্ত্তব্য কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া তাহার মাথা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। একবার ভাবিল,—এ পাপ দেহভার ভাগীরথীর পুণ্য-সলিলে উৎসর্গ করিয়া সকল চিন্তার অবসান করিয়া দেয়! কিন্তু এ-কথা চিন্তামাত্রেই তাহার সুপ্ত বিবেক তাহাকে নিদারুণ আঘাত করিল। কে যেন কাণে কাণে বলিল: এই-ই যদি ভেতরের ভাব, তবে এ দুঃসাহসিকতার কী প্রয়োজন ছিল?

মন স্থির করিয়া সে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিবার পর একযোগে অনেকগুলি রমণীকে গল্প করিতে করিতে ঘাটের দিকে আসিতে দেখিল। কাছে আসিলে তাহাদিগকে মাড়োয়ারী বলিয়া চিনিল। তাহা হইলে সে হাওড়ার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে। মাতার মুখে সে বহুবার শুনিয়াছে, শেষরাত্রে বড়বাজার-ঘাটে দল বাঁধিয়া গঙ্গাস্নানে আসার খেয়াল ওই জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

অদূরে হাওড়ার পুল দেখা যাইতেছে। পূবের আকাশ-ও তখন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। পারুলও মাড়োয়ারীদের সহিত মিশিয়া ঘাটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

অবিশ্রান্ত নানাপ্রকার ভজন-সঙ্গীতের ঝঙ্কারে এবং মোটা মোটা গহনার ঠোকাঠুকি শব্দে অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সেখান হইতে ফিরিতে হইল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক নাই! নিজের উপর অজস্র ধিক্কারে, বেদনায় তাহার মন টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল! আবার সে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিল।

ভোরের আলো তখন সবেমাত্র স্পষ্ট হইয়া হেমন্তের শিশির-সিক্ত প্রভাতকে বন্দনা করিতেছে। এমন সময় একস্থানে একটি যুবককে সে একটা ছোট ঢোলক হস্তে ম্যাজিক দেখাইবার বার্ত্তা ঘোষণা করিতে শুনিল। এক-একটী লোক যুটিতে যুটিতে ক্রমে অনেকগুলি দর্শক সেখানে আসিয়া জমা হইল। পারুলও ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হইয়া আপনার জন্য একটু জায়গা করিয়া লইল। সকলের সজাগ-দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইলে, সে প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তারপর আপন-মনে নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

খেলা শেষ হইয়া গেল। পয়সা দিবার সময় বুঝিয়া অনেক দর্শক-ই একে একে গা ঢাকা দিল। কিন্তু এই কৌতূহলময়ী সুন্দরীটি কেন যায় না জানিবার জন্য ম্যাজিসিয়ান রবীন্দ্রের মনে কেমন একটা আগ্রহ হইল। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্রবংশ-

সম্বৃত। অকারণ গায়ে পড়িয়া আলাপ করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না ভাবিয়া অন্তরে দ্বিধা অনুভব করিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর প্রথম দর্শনীর দশ বারটি পয়সা থলিজাত করিয়া মনের সঙ্কোচ সজোরে দূরে সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে পারুলের দিকে অগ্রসর হইল। বলিল: আপনি কি পথ হারিয়ে ফেলেচেন, কিম্বা রাগ করে'—

নিজের চিন্তায় পারুল এত অন্যমনস্ক ছিল যে, প্রথমে সেকথা শুনিতেই পাইল না। পুনরায় ডাকিতেই বারেকের জন্য রবীন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া সে দৃষ্টি নামাইয়া লইল। ধীরকণ্ঠে কহিল: না, ইচ্ছে করেই চলে' এসেছি।

কথাটা হেঁয়ালীর মতোই রবীনের কানে বাজিল। বলিল: যদি অযোগ্য মনে না করেন, সবটা আমায় বলতে পারেন।

পারুলের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল: আপনি কি এর কোন প্রতিকার করতে পারবেন? বলে' লাভ?

লাভ-লোকসানের কথা জানি নে—তবে সাধ্যাতীত না হ'লে আপনার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারি।

পারুলের দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়া রবীন্দ্র বলিল: আমারও সব থেকে আজ আর কেউ নেই! উপায় করতে পারি না বলে' মা-বাপ গলগ্রহ মনে করেন—তাই আমিও একদিন আপনার মতই এক রাত্রে এক কাপড়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। বিভিন্ন কারণ হলেও আমাদের পরিণতির লক্ষ্য প্রায় এক! তাই বলি, যদি আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে রাজী থাকেন, তা' হ'লে আমি আপনার ভার নিতে প্রস্তুত আছি।

দিগন্তপ্রসারিত অকূলে কূল দেখিতে পাইয়া আশার আনন্দে উচ্ছ্বসিত পারুল গলায় আঁচল জড়াইয়া রবীন্দ্রের পায়ের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর ধীর অকম্পিত-কণ্ঠে কহিল: ওপরে অনন্ত কালের জাগ্রত দেবতা, আর সম্মুখে এই চির-পবিত্রা মা জাহ্নবী সাক্ষী,—আজ থেকে তুমিই আমার স্বামী!

তাহার হাত দুইটী সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া রবীন্দ্র বলিল: বেশ, তবে তাই হোক্!

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করার পরিণাম রবীনকে বিলক্ষণ ভুগিতে হইল। দর্মাহাটার একটা খোলার বাটীতে তাহারই মত আরও জন চারেক অভাগা মিলিয়া একখানা ঘরে বাস করিত। পারুলকে লইয়া সেখানে থাকা কি-রূপে সম্ভব হইবে ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। অথচ, স্বামীত্বের দাবীতে এই অল্প পূর্ব্বে যাহাকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাকে লইয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানই কি শোভন হইবে ভাবিয়া তাহার মন অস্থির হইয়া পড়িল।

পারুলকে সঙ্গে করিয়া সে যখন নিজের আস্তানায় ফিরিল, তখন তাহার বন্ধুরা সকলেই অর্থের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। শূন্যগৃহ দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মুড়ি ও কিছু তেলেভাজা কিনিয়া সে পারুলকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু পারুল আপত্তি তুলিতে প্রথমে নিজে একটু মিছরী ও জল খাইয়া বলিল: তুমি ততক্ষণ খাও, আমি শীগ্‌গিরই আসচি!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কিছু দূরে একটা ছোট খোলার ঘর ঠিক করিয়া ঘরে ফিরিয়া হাসিতে

হাসিতে কহিল: ভাবছিলে, ফেলে বুঝি পালালুম, না?

হঠাৎ পারুলের ওপর দৃষ্টি পড়িতেই সে অবাক হইয়া গেল! ছিন্ন হইলেও একখানি আধময়লা লালপাড় সাড়ি পরিয়া এবং চিরুণীতে চুলগুলি পরিপাটি করিয়া আঁচড়াইয়া চৌকির উপর সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

পরিহাস করিয়া রবীন বলিল: তবে না বলেছিলে, এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি? তা' যাই হোক্, বেশ মানিয়েছে কিন্তু তোমায়!

কৃত্রিম অভিমানের সুরে পারুল কহিল: খুব হয়েছে, থামো! সব বিদ্যে টের পেয়েছি তোমার! এখন সতীনটী কোথায়, তাই বল দিকি শুনি?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া রবীনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল! বলিল: কী সব বল্‌চ তুমি!

—কি আর! আসল কথাটা বলই না না শুনি? এই কাপড় ত ওই বোঁচ্‌কা থেকে বেরুল?

রবীনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে এক গৃহস্থ বাটীতে ম্যাজিক দেখাইবার পুরস্কার-স্বরূপ সে ওই ব্যবহৃত কাপড়খানি এবং অন্যান্য জামা ইত্যাদি উপহার পাইয়াছিল। ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল: এর মধ্যে খুঁটিনাটি সব দেখা হ'য়ে গেছে? ধন্য তোমরা!

পারুল একথা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল। হাসিয়া বলিল: তোমরাই বা ধন্য কম কিসে!

রবীন কহিল: চলো, এখুনি নতুন ঘরে যেতে হবে; সব ঠিক হয়ে গেছে। এ ঘরে আমরা চারজনে থাকি।

পারুল হাসিয়া বলিল: বাক্সগুলোই ত সাক্ষী রয়েছে; ও আর শুনিয়ে লাভ নাই। এখন এক করো, এক পয়সার সিঁদুর এনে দাও। মাথায় সিঁদূর না দিয়ে তোমার সঙ্গে আর এক পাও নড়ছি না আমি। বিশ্বাস কি?

রবীনও হাসিয়া উত্তর দিল: একটু সিঁদূর দিলেই বিশ্বাস আসবে ত?

সগর্ব্বে পারুল কহিল: নিশ্চয়ই—হিন্দুর মেয়ের এই-ই ত সব চেয়ে বড় বিশ্বাস!

কালের কোলে ভাসিতে ভাসিতে আটমাস কাটিয়া গেল। চির-সাধনার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মনোমত স্বামী পাইয়া সুখে দুঃখে পারুলের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু দিন দিন উপার্জ্জনের অঙ্ক কমিয়া আসিতে এবং বাজারের অবস্থা মন্দা দেখিয়া রবীন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। সত্য বটে, মাত্র দুই আনায় সে পত্নীর যেরূপ সহাস্য প্রফুল্ল বদন দেখিয়াছে, দুই বা ততোধিক টাকা দিয়াও তাহা অপেক্ষা বেশী কিছুই তাহার নিকট হইতে পায় নাই। অশেষ গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাইয়া সে মনে মনে শান্তি অনুভব করিত।

কিন্তু ক্রমশঃই তাহার সংসার অচল হইয়া উঠিতে লাগিল। আয় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এদিকে পুত্র-সম্ভাবনার লক্ষণগুলি পারুলের দেহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কি করিবে ভাবিয়া রবীন্দ্র প্রমাদ গণিল। ইদানীং সে বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে নানা অজুহাতে কর্জ্জ করিয়া তাহা দিনান্তে পারুলের হাতে গুঁজিয়া দিত। এ-অবস্থায় অনাহারে থাকিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া!

পারুল স্বামীর এই সব কথা কিছুই জানিত না। কথাটা সেদিন কিন্তু জলের মতই তাহার

নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল, যেদিন নিমাই আসিয়া চড়াগলায় বলিল : আজ নয়, কাল নয় করে' দু'মাস সহ্য করেচি—আজ কিন্তু টাকা না নিয়ে আর নড়্‌চি না।

রবীন্দ্র তাহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু কোন ওজরই টিঁকিল না। অগত্যা, 'আমি আসচি' বলিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই সে বন্ধুর সহিত বাটীর বাহির হইয়া গেল। পারুল একটি কথা বলিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না।

সেদিন, তারপরের দিন পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, রবীন আসিল না দেখিয়া পারুল মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রায় বৎসর ঘুরিতে চলিল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কই,—একদিনও ত তাহার স্বামীকে সে এরূপ অনুপস্থিত থাকিতে দেখে নাই। তবে কি তাহার বন্ধু তাহাকে পুলিশে দিল? মরিয়া ফেলিল? নানারূপ দুর্ভাবনায় তাহার তরুণ মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা। ক্রমে রাত্রিও বাড়িয়া চলিল। পারুল তখনো অন্ধকার গৃহে চৌকির উপর বসিয়া স্বামীর কথাই চিন্তা করিতেছিল। আজ তাহার ঘরে প্রদীপ পর্য্যন্ত জলে নাই।

নিকটবর্ত্তী একটা ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া রাত্রির দীর্ঘতা জ্ঞাপন করিল। পারুল তখন-ও গভীর চিন্তায় আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ঘড়ির শব্দে তাহার চমক ভাঙিল। কি ভাবিয়া হঠাৎ ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া সে শক্ত করিয়া কাপড়খানা পরিয়া লইল।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এক বিভীষিকাময়ী নিশীথে সে যেমন ভরসা করিয়া গৃহের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল, আজও তেমনি সাহসে বুক বাঁধিয়া স্বামীর সন্ধানে বহির্গত হইয়া পড়িল।

ভোরের আলো তখন-ও স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় মুদ্রিত নয়নে স্বামীকে শায়িত দেখিয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!

ক্ষিপ্রহস্তে স্বামীর গায়ে হাত দিতেই সে শিহরিয়া উঠিল! জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে।

অজ্ঞাত স্পর্শে রবীন্দ্র জোর করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দু'টী জবাফুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে মৃদুস্বরে কহিল : এসেছ? আমি জানতুম—তুমি আসবেই! কিন্তু আর বোধ হয় আমায় ফিরে পাবে না পারুল!

উন্মাদিনীর মতো পারুল চীৎকার করিয়া উঠিল : কেন, কী পাতক করেছি আমি,—যার জন্যে ভগবান তোমায় আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে সাহস করবেন!

রবীন মৃদু হাসিল। বলিল : পাগল! তোমার আমার মতো তুচ্ছ নগণ্য দু'-চারটে পুণ্যাত্মার দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় তোমাদের অতবড় ভগবানের নেই!

পারুল ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল : কী, এতবড় নাস্তিক তুমি—আমার স্বামী!

জ্বর-বিকম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া পারুলকে ধরিয়া রবীন স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল : ছিঃ, অমন মাথা গরম করো না!

তারপর একটু থামিয়া বলিল : নিমায়ের টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। শাঁখের শাখার কথা তুমি অনেকদিন বলেছ, তাই না খেয়ে একজনের কাছে টাকা জমা রেখেছিলুম, তাই তুলে তার দেনা শোধ করে' দিয়েছি।

নিমাই চলে' যাবার পর মনটা এক অব্যক্ত যাতনায় ভেঙে পড়ল! খানিক পরেই মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কের ভেতরে গিয়ে বসলুম — খোলা হাওয়া লেগে যদি কিছু উপকার হয়। তার-পর কখন যে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিছুই জানি না। যখন চোখ খুল্‌লুম, দেখি,—দিব্যি রোদ উঠে গেচে। মাঠে জল দিতে অসুবিধা হচ্চে দেখে মালী আমায় চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লেগেচে।

দাঁড়াতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু সমস্ত গা যেন আড়ষ্ট; মাথার যন্ত্রণা ভয়ানক ভাবলুম, যা' হবার তা' হ'য়ে গেছে—এ অবস্থায় বাড়ী গিয়ে তোমায় বিব্রত করে' না তুলে বরাবর হাসপাতালে চলে' যাই। সেখান থেকে তোমায় খবর দেব। কিন্তু তারা নিলে না— ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিলে। তারপর এই পথে হাঁটতে হাঁটতে কি করে' যে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে' গেছি এবং কে-ই বা তুলে আমায় এখানে রেখে গেছেন, কিছুই জানি না!

আদ্যোপান্ত শুনিয়া পারুলের জিহ্বা শুকাইয়া আসিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিল: তা' হ'লে উপায়— আমি একবার যাব হাসপাতালে?

রবীনের বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছিল। 'দম' লইয়া বলিল: তার চাইতে কিছুদূরে ওই লাল বাড়ীখানায় যাও। ওখানা হাসপাতালেরই ডাক্তারের—আর বলিতে পারিল না; তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল।

পারুল কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া অদূরবর্ত্তী কল হইতে আঁচল ভিজান জল আনিয়া তাহার স্বামীর চোখে-মুখে ছিটাইয়া দিল; কাপড় নাড়িয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই রবীন্দ্রের জ্ঞান ফিরিল না। তখন উঠিয়া উন্মাদিনীর মতো সে লালবাটীর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল।

দ্বারোয়ান হাঁকিয়া উঠিল: এই মাগী, একদম দাওয়া-কামরামে চলা আয়া?

পারুলের সেদিকে দৃষ্টি নাই। কেবল বলিতে লাগিল: কই, ডাক্তারবাবু কই!

ডাক্তার সুধাংশুবাবু তখন সবেমাত্র প্রাতরাশ শেষ করিয়া রোগী দেখিবার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। দ্বারোয়ানের কণ্ঠস্বরে তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন।

দ্বারোয়ান পারুলকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিল। বিহ্বল-কণ্ঠে পারুল কহিল: তুমি-ই ডাক্তার? একবার আমার স্বামীকে—

সম্বোধনে গৃহশুদ্ধ সকলেই অল্প-বিস্তর আশ্চর্য হইয়া গেল! সুধাংশু হাসিয়া বলিলেন: চলে' যা' পাগলী। ওরে রঘুয়া, একে বার করে' ফটক বন্ধ করে' দে।

মর্ম্মভেদী কণ্ঠে পারুল কহিল: ও গো, না, না, আমি পাগল নই! আমায় ভুল বুঝো না! আমার স্বামীর বড় অসুখ!

সুধাংশু ভয়ানক চটিয়া উঠিলেন। এই মেয়েটীর জন্য তাঁহার মনে একটু দয়া হইলেও অতগুলি লোকের সাক্ষাতে অপমান-সূচক 'তুমি' সম্বোধনটা এত শীঘ্র তিনি হজম করিতে পারিতে ছিলেন না। বলিলেন: যদি অসুখই হ'য়ে থাকে, হাসপাতালে নিয়ে যা'। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

—না ডাক্তারবাবু, তুমি একবার আমার সঙ্গে চলো।

মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও সুধাংশু হাসিয়া

কহিলেন: ফী না হ'লে ত আমরা কোথাও যাই না।

—ফী? টাকা? আমাদের ত কিছুই নেই!

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন: সকালবেলাই জ্বালাতন সুরু করলি। যা', পালা এখান থেকে।

পারুল কিছুতেই নড়িল না দেখিয়া কি ভাবিয়া সুধাংশু বলিলেন: আচ্ছা বোস্; কাজ সেরে যাব। এদের সব বিদায় করে দি'।

একে একে রোগীরা চলিয়া গেলে সুধাংশু উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। একটা লালসা-পূর্ণ দৃষ্টিতে পারুলের দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি কহিলেন: তোমার এমন রূপ, ফী দেবার টাকা নেই তোমার?

পারুল শিহরিয়া উঠিল! ডাক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল: দাদা, তুমি কী বলচ—আমি যে তোমার ছোট বোন্!

উন্মত্ত সুধাংশু তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেই সে তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল: আমি তোমায় 'দাদা' বল্‌লুম, তুমি তার এই মর্য্যাদা দিলে ভাই! বেশ, কিন্তু তোমার এ পা আর আমি ছাড়চি না!

বিবেকের তীক্ষ্ণ কষাঘাতে সুধাংশুর মোহ ছুটিয়া গেল। মাটীর দিকে দৃষ্টি নামাইয়া সে লজ্জা-জড়িত-কণ্ঠে বলিল: উঠে পড় দিদি—তুমি আমায় খুব শিক্ষা দিলে আজ!

অবসাদে, অনাহারে, পারুল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে গিয়া সুধাংশু চীৎকার করিয়া উঠিলেন: ওরে রঘুয়া, শীগ্‌গীর এক বাল্‌তি জল নিয়ে আয়!

রবীনকে মোটরে তুলিয়া আনিয়া ভিতরের একখানি ঘরে রাখিয়া সুধাংশু আবশ্যকমত ঔষধ ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। রবীনের জ্ঞান ফিরিলে এবং একটু সুস্থ হইলে তিনি কহিলেন: পারুল দিদি, এখন থেকে তোমাদের বরাবর এখানেই থাক্‌তে হবে।

পারুল তখন বেশ ভাল হইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল: কি অপরাধে?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত সুধাংশু কহিলেন: অভিভাবক-হারা হ'য়ে তোমার দাদাটী গোল্লায় যাবে, তা'তে বুঝি কোন কষ্ট হবে না তোমার?

পারুল কোন উত্তর দিল না। কিসের স্মৃতি তাহাকে সচকিত করিয়া তাহার চোখ দু'টী বাষ্পাকুল করিয়া তুলিল।

এই ঘটনার পর আরো দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পারুলের খোকাটী এক্ষণে বড় হইয়া আধআধ ভাষায় সুধাংশুকে বিলক্ষণ জ্বালাতন করিয়া থাকে। সুধাংশুও তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন।

ইদানীং রাত্রিতে আহারের পর খোকাকে একবার আদর করিয়া না গেলে সুধাংশুর ঘুম হইত না। পারুল সেজন্য সেই সময়টীতে তুলিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইত।

সেদিন সুধাংশু খোকাকে কোলে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছেন, এমন সময় 'কলিং বেল' ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন: জ্বালিয়ে গেলে! একটু যদি বিশ্রাম কর্‌বার যো আছে!

সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল: একঠো খুনী কেস্ আয়া।

গৃহশুদ্ধ সকলেই চমকিয়া উঠিল।

রবীন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।

সুধাংশু কহিলেন: মর্দ্দানা?

—নেহি জী, জেনানা।

জেনানা খুনী! বিস্ময় আরো বাড়িয়া উঠিল! সুধাংশু বলিলেন: এই শীতে আর বাইরে যেতে পারি না। এখানেই নিয়ে আয়।

একে খুনী, তাহাতে আবার স্ত্রীলোক শুনিয়া পারুল ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুধাংশুর কোল হইতে খোকাকে লইয়া সে ধীরে ধীরে খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

খুনীকে লইয়া রঘুয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার মুখপানে চাহিয়া পারুল একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। খোকা চীৎকার করিতে লাগিল। আগন্তুকও পারুলকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার বুকের কাপড় রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। নিভাননী নির্জ্জীবের মত মেঝেয় বসিয়া পড়িল।

খোকাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া সুধাংশুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পারুল কহিল: দাদা, আমার মাকে বাঁচাও!

—তোমার মা! বিস্ময়ে সুধাংশু পারুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন: তোমার মা এই রমণী!

ধীরকণ্ঠে পারুল কহিল: সে কথা পরে হবে ভাই—আগে ওঁকে বাঁচাও তুমি!

সুধাংশু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অত্যধিক রক্তপাতের জন্য রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মধ্যরাত্রে নিভাননীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। রবীন ও পারুল সেই হইতে একভাবেই রোগিনীর নিকট বসিয়াছিল।

নিভাননী বলিল: তোর খোকাকে একবার আমার কোলে দে মা,—আর বোধ হয় নেবার সময় হবে না!

পারুল ছেলেকে তাহার কোলে দিতেই সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল: ওরে খোকন্, ওরে যাদু, ওরে মাণিক আমার! তারপর মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল: তোকে সেই বামুন ঠাকুরের হাতে তুলে দেব বলে' কিছু টাকা ও গহনা আগাম নিয়েছিলুম; শোধ করতে পারি নি বলে' সে এই শাস্তি আমায় দিয়েছে! আর তুই দিলি তোর মায়ের চরমকালে এই পরম পুরস্কার!...বলিয়া সে তাহার পাণ্ডুর শীতল ওষ্ঠ একবার খোকার কোমল গণ্ডে স্পর্শ করিল!

পারুলের ভিতর তখন যে কি হইতেছিল, তাহা যিনি সর্ব্বকালে সকল সময় মানুষের অন্তরটা দেখিয়া আসিতেছেন, তিনিই শুধু বুঝিতেছিলেন!

নিভাননী বলিয়া চলিল: আমার জন্যে একটুও দুঃখু নেই। তবে তোদের যে এমনভাবে ফিরে পাব, এ আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি!

সুধাংশুর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল: শুধু তাই নয়, আমার বোন্‌টী যে কী, আমি আজও তা' ঠিক করতে পারি নি! এতদিন ভাবতুম, কবিরাই বুঝি রঙ্ ফলিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন। কিন্তু তা' নয়—কাঁটাগাছেও কখন কখন গোলাপ ফুল ফোটে!

এই কথাগুলি শুনিবার জন্যই যেন নিভাননী এতক্ষণ মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

বিস্ময়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

শৈলেশের স্ত্রীর পিতৃদত্ত নাম বিনোদবালা ; কিন্তু ভাবী শ্বশুরকুলের কেন জানি না ওই নামটি মনে ধরিল না। সকলেই একবাক্যে বলিল—নামটা অত্যন্ত পুরুষালি ঢঙের। বিনোদবালার পিতা এতদিনের পরিচিত নাম পাল্টাইতে হইবে শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি কন্যার পিতা—এই সামান্য মতভেদের জন্য পাছে কিছু গোল-যোগ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে অভিধান খুঁজিয়া-পাতিয়া রাখা এমন পছন্দসই নামও বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সেই বিবাহের রাত্রে রাখা নাম—'কমলা' বলিয়াও তাহাকে কোনদিন ডাকিতে পারিলেন না। 'বিনু,' 'বিনোদ', ইত্যাদি ছাড়াইয়া কোনদিন তাহার মুখ দিয়া আর 'কমলা' বাহির হইল না।

একদিন কথায় কথায় কমলা বলিল—আচ্ছা, বড় পিসীমা বলছিলেন যে, চৈত্র মাসে জন্মালে না কি তার খুব স্বামী-সৌভাগ্য হয়, কথাটা কি সত্যি ?

শৈলেশ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কেন বল ত ?

কমলা মুখে একরাশ কাপড় গুঁজিয়া দিয়া বলিল—আমি যে—আর কিছু না বলিয়াই সে হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই হইতে শৈলেশ তাহাকে 'চৈতী' বলিয়াই ডাকিত। বন্ধু-মহলেও চৈতী নামটাই খুব প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিল।

যাহাকে লইয়া নামের এই ছোট্ট একটু-খানি ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই আজ সন্ধ্যার ষ্টীমারে আসিবার কথা। সন্তোষের সে কথা মনে পড়িতেই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—ও হো, সে কথাটা একেবারে ভুলেই গিছলাম। আজ যে চৈত্রী বৌদি'র আসবার কথা।

—বটে ! বলিয়া শৈলেশ এমন একটু হাসিল যে, মুখের উপরেই তাহার সমস্ত অন্তরটা ভাসিয়া উঠিল।

সন্তোষ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—চৈতী বৌদি' এতক্ষণে হয় ত পৌঁছে দাপাদাপি সুরু করে' দিয়েছে।

—কেন রে ? বলিয়া শৈলেশ ছোট নৌকার মুখ ঘুরাইয়া আবার খালে পড়িল। সন্তোষ গোলুই হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—না, না, আর বেরিয়ে কাজ নেই, বাড়ী ফিরেই চ'।

শৈলেশ মৃদু হাসিয়া বলিল দূর বোকা, এখন বাড়ী ফিরে কি হবে ? চ' বরং ষ্টেশনেই যাওয়া যাক্ ; ওকে চম্‌কে দেওয়া যাবে।

সন্তোষ আসন্ন সায়াহ্নের আকাশের পানে যতদূর দৃষ্টি যায় লক্ষ্য করিয়া বুঝিল, ষ্টীমার আসিয়া না পৌঁছিলেও আর বড় বিলম্ব নাই। সে অন্যমনস্কভাবে নৌকার পাটাতন হইতে অকেজো অনাদৃত 'সুপারি'র বৈঠাটা তুলিয়া লইল। শৈলেশ কি একটা কথা বলিতে গিয়া সন্তোষের ব্যস্ততা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। সায়াহ্নের পাত্‌লা অন্ধকারে সে হাসি খুব মানাইল।

নৌকায় উঠিয়া চৈতী শৈলেশের পায়ের উপর গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—এত ঘটা করে' আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার কি দরকার ছিল বল ত ?

বাড়ীর বৃদ্ধ গোমস্তা ত্রৈলোক্যনাথ চৈতীকে তাহার বাপের বাড়ী হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। ষ্টীমার-ঘাট হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্ম দুঃখীরাম একখানি বড় দেখিয়া নৌকা ইতিমধ্যে ভাড়া করিয়া তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কিন্তু শৈলেশের আগমন কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ত্রৈলোক্যনাথ কাজেই ব্যবস্থাটা একটু পাল্‌টাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিজেই যাচিয়া বুদ্ধি দিলেন,—যখন এসেই পড়েছ, তখন এক কাজ করো বাবা, তুমি আর সন্তোষ বৌমাকে নিয়ে ওই ভাড়াটে নৌকোখানায় যাও। দুঃখী বাড়ীর নৌকোখানা ঘাটে পৌঁছে দিক্। আর আমি হেঁটে গিয়ে খবরটা আগেই জানিয়ে দি'—কেমন, সেই ভাল ত ? ষ্টীমার আসতেও আজ দেরী করে' ফেলেছে ; সবাই এতক্ষণে হয় ত ভাবতে বসে' গেছেন।

শৈলেশ ত্রৈলোক্যনাথের প্রস্তাবে অনেক আপত্তি জানাইল ; কিন্তু কোনটাই টিঁকিল না। আসল কথা, বৃদ্ধকে সে কিছুতেই এই পথ হাঁটার কষ্ট দিতে রাজী হইতেছিল না। শেষ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথের প্রস্তাবই বহাল রহিয়া গেল।

শৈলেশ মনে মনে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—ঘটা আমি কিছুই করি নি। বাড়ীর সবার কাছে এর জন্যে আমাকে লজ্জাও পেতে হবে অনেক জানি ; কিন্তু তোমার এই ঠাকুরপোটি কিছুতেই ছাড়লে না।

চৈতী সন্তোষের পানে প্রশংস-দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া আনত মুখে বলিল—এ ভালই হলো, তোমাকেই সবার আগে প্রণাম করতে পেলাম।

লাজুক চৈতী যে এমন করিয়া কথা কহিতে পারে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সন্তোষের জানা ছিল না। কিন্তু কোথা হইতে এত বিস্ময়, এত শ্রদ্ধা, এত সম্ভ্রম একসঙ্গে আসিয়া তাহাকে মুহূর্ত্তে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

মানুষ কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে যে নিজের সত্য পরিচয় দিয়া আর এক জনের চোখে সম্মান শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা সে যেমন নিজেও বোঝে না, তেমনই বিস্মিত অভিভূত লোকটিও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না যে, কেমন করিয়া, কোথা দিয়া, কোন্ যাদুমন্ত্রে সে এতখানি সম্মান শ্রদ্ধা আদায় করিয়া লইল। একটা অব্যক্ত বিস্ময়ে সে মুহূর্ত্তটি এমন ভাবে ঢাকা পড়িয়া যায় যে, কোনদিনই তাহাকে আর টানিয়া বাহিরে আনা চলে না ; স্মরণের অতীতে সে মুহূর্ত্ত চিরদিনের মত মিলাইয়া যায়—কিন্তু উদ্বুদ্ধ সম্মান শ্রদ্ধা তেমনই অটুট অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অলক্ষিতে বহিতে থাকে। ...এমনই একটি মুহূর্ত্ত হয় ত কাটিয়া গেল।

সন্তোষ নীরব থাকিয়া সে-মুহূর্ত্তটিকে নিজের স্মরণের গ্রন্থির মধ্যে বাঁধিয়া লইতে বৃথাই চেষ্টা করিল হয় ত। কিন্তু সে-মুহূর্ত্ত অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে চিরদিনের মত বিলীন বিলুপ্ত হইয়া গেল।...

এই অর্থশূন্য চঞ্চল নীরবতা প্রথম চৈতীই ভাঙিয়া দিয়া বলিল—ঠাকুরপো !

সন্তোষ চম্‌কাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা চৈতী বৌদি', আর দুটো দিন আগে আসতে কি হয়েছিল শুনি ? আমাদের ছুটির আর ক'দিনই বা বাকী আছে ? এ দু'দিনের জন্যে না এলেও চলতো !

চৈতী এমন একটা অনুযোগ সন্তোষের নিকট হইতে আশা না করিলেও শৈলেশের নিকট হইতে করিয়াছিল; কিন্তু শৈলেশ কেন যে এ কথা এতক্ষণ ভুলিতে পারিল না, তাহাও সে বুঝিল।

এই অতি সঙ্গত অনুযোগের প্রত্যুত্তরে বলিবার মত অনেক কিছুই চৈতী মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কেমন করিয়া ইহারই জন্ম সে স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিবে, কেমন করিয়া নিজের অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাইবে, কেমন করিয়া একটি আপ্রাণ প্রণামে সমস্ত অপরাধের জবাব-দিহি হইতে মুক্তিলাভ করিবে...ইত্যাদি, আরও কত কিছু! কিন্তু অভাবিত সত্য সহজ উত্তরটাই তাহার মুখে আসিয়া পড়িল। আর কিছু যে সে ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, তাহাও তাহার স্মরণ হইল না। বলিল—বাবা কিছুতেই ছাড়লেন না।

সন্তোষ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই শৈলেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—এত আদরের বিনুকে তাঁর বিয়ে দেওয়াটাই ভুল হ'য়ে গেছে।

শৈলেশ চৈতীকে উপহাসছলে আক্রমণ করিতে হইলে 'বিনু' বলিত।

চৈতী ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া আবেগ-হিল্লোলিত-কণ্ঠে বলিল—ইঃ, এসবে বুঝি আবার কারও হাত আছে? এম্‌নি ত জন্ম জন্ম চলবে,—কেউ বাধা দিতে পারবে না।

সত্যি!—বলিয়া শৈলেশ উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ সাম্‌লাইতে পারিল না।

খালের কিনারে কিনারে সে হাসি ধাক্কা খাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিজের কানেই বিশ্রী হইয়া বাজিল।

মুগ্ধ সন্তোষ সহসা প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে দুই হাত বাড়াইয়া বলিল—চৈতী বৌদি', তোমাকে ত আমার প্রণাম করা হয় নি এখনও।

চৈতী তাড়াতাড়ি দুই হাতে নিজের পা দুইটি চাপিয়া ধরিয়া জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিল। পরমুহূর্ত্তেই আবার দুই হাত দিয়া সন্তোষের আগ্রহ-প্রসারিত দুই বাহুর গতিরোধ করিয়া বলিল—ধ্যেৎ, তুমি যে আমার চেয়ে ঢের বড়।

সন্তোষ বলিল—হ'লামই বা বড়!

—না, তা' হয় না।

হইলও না। চৈতী যেন একটা মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিল।

বাড়ীর কাছাকাছি নৌকা আসিয়া পড়িতেই হিম্মৎ সিং হাঁকিয়া কহিল—দাদাবাবু, পিসীমার হুকুম, সন্ধ্যে একেবারে উৎরে না গেলে ঘাটে নৌকো লাগাতে পারবেন না।

শৈলেশের মাতার মৃত্যুর পর হইতে তাহার পিসীমাই তাহাদের সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছিলেন। শৈলেশের তত্ত্বতল্লাস লইয়াই তিনি সদাসর্ব্বদা এতদূর ব্যস্ত থাকেন যে, সংসারের আর কোন কাজে প্রায়ই তিনি দৃষ্টি দিতে পারেন না। শৈলেশ এই অপূর্ব্ব স্নেহময়ী পিসীমার আইন-কানুন বাঁধা বাঁধনে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু না মানিয়া চলাও তাহার কোষ্ঠীতে যেন লেখে নাই।

শৈলেশ বিরক্ত হইয়া বলিল—দরোয়ানজী, তাঁকে জিগ্যেস্ করে' এসো ত যে, সন্ধ্যে রাত উৎরোবে কতক্ষণে।

জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রয়োজন হইল না। হিম্মৎ সিং-এর পিছন হইতে দেখ্ দেখ্ করিয়া পিসীমা স্বয়ং ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ও মাঝি, বাপু, এই ভর-সন্ধ্যেবেলা ঘাটে নৌকো লাগিও না। নায়ে বৌ মানুষ আছে; কাজেই এত

বাছাবাছি বাছা। বলিয়া তিনি হাঁপ লইতে লাগিলেন।

মাঝি লগির সাহায্যে উল্‌টা খোঁচ্‌ মারিয়া খালের মাঝেই নৌকা রাখিল।

সন্তোষ অদূরে চাহিয়া দেখিল, সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকন্যাকে জয় করিয়া রাজপুত্রের দেশে ফেরার কাহিনী শুনিতে-শুনিতেই সন্ধ্যা যেন তাহার রজনী দিদির শীতল ক্রোড়ে তন্দ্রাতুর মাথাটি সবেমাত্র রাখিয়াছে!

এসব কথা না কি গোপন থাকে না। কথাটা বীণার কানেও তাই আসিয়া পৌছিয়াছিল। কিন্তু এসব লইয়া বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রবৃত্তি তাহার একেবারেই ছিল না। গৃহের যা' কিছু সামান্য কাজ শেষ করিয়া সে বারান্দায় উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সুদূর টেহেরানের কথাই ভাবিতেছিল। আজ মধ্যাহ্নেই সে মাসিক-পত্রে স্বামীর টেহেরানের ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। সেই অদেখা অজানা দেশ তাহার সুপরিচিত স্বামীটির কেমন লাগিয়াছে তাহাই মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে গিয়া সে এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। যত সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আজ সে ঘুরিয়া অতৃপ্ত বুভুক্ষু হৃদয়কে ভুলাইতে চেষ্টা করুক না কেন, একদিন আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহারই দুয়ারে আঘাত করিয়া বলিতে হইবে—এ তৃষ্ণা ত আমার মিটিবার নয়! আমি অকারণে শুধু দূরে দূরে ঘুরিয়া মরিয়াছি।······

এমনই করিয়া তাহার এই বিষবৎ পরিত্যক্ত রূপের মধ্যেই একদিন তাহার তৃষ্ণা-কাতর হৃদয় আছাড় খাইয়া মরিবে! তাহার মধ্যেই তাহার তৃষ্ণার সমাধি রচিত হইবে!

বীণার এই আত্মসমাহিত ভাব অদূরে মানুষের পদশব্দে ভাঙিয়া গেল। অন্ধকারেও তাহার দৃষ্টি ভুল করিল না। কারণ চিনুর মায়ের গতিবিধির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইত না।

চিনুর মাই প্রথম কথা কহিল—বৌমা!

এ-ই সামান্য একটি শব্দোচ্চারণের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সমস্ত দৈন্য দুর্ব্বলতা যেন একসঙ্গে বীণার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। বীণা তাহার আড়ষ্ট অস্ফুট কথা শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। এতদিনের সঞ্চিত বিশেষ ঘৃণা একসঙ্গে এমন করিয়া কেহ যে ডুবাইয়া দিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতে পারে, তাহা বীণার জানা ছিল না।

চিনুর মা আবার বলিল—বুঝলে বৌমা, আমি ত কিছুই অস্বীকার করচি না। আমার ভরাডুবি ত অনেককাল আগেই হ'য়ে গেছে। এই ধর না, চিনু যেদিন স্বামী সংসার সব বিসর্জ্জন দিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে—যার নাম করতেও আজ আমার ঘৃণা বোধ হয়—বেরিয়ে গেল; তা' গেল যে সে কিসের লোভে তা' সেই জানে। কিন্তু তার সঙ্গেও ত রইল না। আমরা কিছুই বুঝি না বৌমা; আর যা' আমরা ভাবি তাও হয় ত ভুল। বিনু চলে' গেল, রেখে গেল এই হতভাগিনীর সঙ্গে তার পোড়া অদেষ্ট। জামাই আমার নেহাত ভালমানুষ; সেই ত বিনু থাকতে আমার খাওয়া পরা চালাতো—কিন্তু এর পরও সে কি আর আমাদের মুখ দেখতে পারে কখনও? বাছা আর কখন এ মুখোও হলো না! কিছুদিন অনাহারে অনিদ্রায় মহা দুর্ভাবনা নিয়ে দিন কাটলো। তারপর ওই মুখপোড়া একদিন আবার গাঁয়ে ফিরে এলো। গলায় দড়ি দিয়েই আমার মরা উচিত ছিল বৌমা, কিন্তু তা' ত

আর পারি নি। অনাহারে মরতেও সাহসে কুলোলো না ; কাজেই যে আমাকে এই অপযশের মধ্যে এমন করে' ডুবিয়ে দিল, তারই কাছে গিয়ে খোরপোষের জন্যে দাবী জানাতে হলো। তা' ছাড়া, আর অন্য উপায়ও ত ছিল না আমার। সেও রাজী হলো। যে আধখানা কপাল পুড়তে সেদিনও বাকী ছিল তাও পুড়ে থাক্ হলো। এখনও ত আবার অনাহারেই মরতে হবে ; কিন্তু সেদিন মরতে কেন যে ভয় পেয়েছিলাম, তা' ত ভেবে পাই না। সবই গ্রহের ফের বৌমা, গ্রহের ফের !

বলিয়া সে যেন একটা অন্তিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অন্ধকারে বীণার চোখ বাহিয়াও দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বীণা যখন ব্যথাকাতর হৃদয়ে এই অনুতপ্তা নারীর স্বীকারোক্তির নিগূঢ় কারণ আবিষ্কার করিতে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তখন সন্তোষ নিজের ঘরে আলো হাতে প্রবেশ করিয়াই বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছিল ! স্থানে-অস্থানে প্রক্ষিপ্ত পুস্তকরাশি যে হাঁটিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায় নাই তাহা ঠিক। আর তুলিয়া রাখা শয্যাটী যে আপনি পাতা হইয়া যায় নাই, তাহাও বোঝা এমন কিছু কঠিন নয় !

একবার তাহার মনে হইল, মা যদি ঘরের আগোছাল অবস্থা দেখিয়া সমস্ত ঠিক্-ঠাক্ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া থাকেন। কিন্তু কাত্যায়নী দেবীর কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অবসর তিনি কোনদিনই পান না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এমনি সব নগণ্য কাজের পিছনে ঘুরিয়া ফেরেন যে, দিনান্তে তাহার হিসাব করিতে গিয়া দেখেন, প্রধান ও প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলিই করিতে ভুলিয়া গেছেন। সমস্ত দিনে তিনি যে কতবার স্নান করিতেন, তাহা হিসাব করিয়া বলা কঠিন। অস্নাত কেহ তাঁহার পাশ দিয়া গেলে নিজের শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পুষ্করের ঘাটে যাইতে হইত। শুচিতা সম্বন্ধে এতখানি প্রখর দৃষ্টি আছে বলিয়াই তিনি পুত্রের কক্ষে পারতপক্ষে প্রবেশ করিতেন না এবং প্রবেশ করিলেও বাহিরে আসিয়াই স্নান করিয়া ফেলিতেন। তাই সন্তোষ সহজেই বুঝিল যে, মায়ের দ্বারা তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কয়েকদিন ধরিয়া সে ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে কে একজন একান্ত গোপনে নিঃশব্দে তাহার কাজগুলি করিয়া দিয়া যাইতেছে। প্রথম সে বীণাকেই সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু বীণা প্রকাশ্যে না করিয়া অলক্ষিত থাকিয়া কাজ করিবে কেন, তাহাই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও এই গোপনচারিণী সেবা-নিরতাকে যখন সে আবিষ্কার করিতে পারিল না, তখন অসহায়ভাবে পাতা শয্যার উপরে সে তাহার দেহভার এলাইয়া দিল সহসা পিঠে কি-একটা জিনিষ বিঁধিতেই আবার সে উঠিয়া বসিল। পিঠে যাহা বিঁধিয়াছিল, তাহারই উপর ঘরের আলো পড়ায় তাহা চিক্-চিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেদিকে চাহিয়া সন্তোষ চম্‌কাইয়া উঠিল। বীণার কানের স্বর্ণদুল সে নিমিষেই চিনিয়া লইয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল ! গোপনচারিণীকে মুহূর্ত্তেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া সে আরও বিপদে পড়িয়া গেল !

.. একটা বিষাক্ত রূপ তাহার চোখের সামনে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণ-বিদ্যুতের মত ঝলকিয়া উঠিতেছিল, একটা বিরাট রূপহীন আশঙ্কা ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিতেছিল,—তাহার সারা দেহে একটা বিপুল অশান্ত রক্ত চাঞ্চল্য থাকিয়া থাকিয়া উত্তাল উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল, পাছে এই রক্তের ঝলক্ একটা নিদারুণ চাপ দিয়া সমস্ত বাধা-বন্ধ টুটিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসে। আলোটার দিকে নিতান্ত অসহায় দৃষ্টি

ফেলিতেই মনে হইল, মাথায় তাহার আগুন ধরিয়া গিয়াছে। দুই হাতে সবলে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া সে শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইল, না, না, সে ত এত দুর্ব্বল নয়। কিন্তু ঘরের আলোটা যে তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে একান্ত ব্যঙ্গ করিতেই হাসিতেছে,তাহা না মনে করিয়াও সে থাকিতে পারিল না।

সন্তোষ তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া চোখ বুজিল; কিন্তু নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া সহসা তাহার ধারণা হইল, বুকের মাঝে শ্বাস জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

চিন্ময় মা কপালে হাত ঠেকাইয়া তখন বীণাকে বুঝাইতেছিল, সব অদেষ্ট বৌমা, সব অদেষ্ট! তোমার আমার হাতে কিছুই নেই। এ দুনিয়ার দোষ তাই কিছুতেই দেওয়া চলে না।·· ইত্যাদি, আরও কত কিছু।

ভোরের কচি আলোর স্পর্শে অন্ধকারের আঁৎকাইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ একলাফে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে ক্রুর দেবতা ঘরের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের আঁচে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া মারিবার সংকল্প করিয়াছিল, তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ কিসের স্পর্শ পাইয়া যে সহসা তাহার কাছে এমন বিষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু বীণার সেদিনকার সেই কথাটী —'ঠাকুরপো, তুমিও আমাকে ভালবেসেছ'— সারারাত তাহার বুকের মাঝে এমন ঝড় তুলিয়াছিল যে, সে বিভ্রান্ত হইয়া দুনিরোধ বিপন্নতার কাছে আত্মসমর্পন করিয়া বসিয়াছিল।

বাহিরে আসিয়া সে বুঝিল, রাত্রি যত দীর্ঘই হউক না কেন, তাহাও কাটিয়া যায়। সে যে কী তৃপ্তি! তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন আর কিছুতেই তখন ভয় পায় না।

সহসা বীণা মৃদু হাসিয়া একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! বলিল, ঠাকুরপো, আমার সোণার দুলটা যে কোথায় খসে' পড়ে' গেল তা'ত ভেবে পাচ্ছি না। মাকেও জানাতে সাহসে কুলোচ্ছে না; কেন না, সোনা হারালে না কি স্বামীর অমঙ্গল হয়—শুনতে পাই।

সন্তোষ কোন কিছু না ভাবিয়াই বলিল— ফেলিল—স্বামীর অমঙ্গলের জন্যে আজও কি তোমার ভয় হয় বৌদি'?

বীণার মুখ একটি সলাজ পবিত্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভিতরের অনেকখানি উত্তেজনা সে যেন অতিকষ্টে চাপিয়া লইয়া উত্তর করিল—হিন্দু-স্ত্রীর স্বামী যে কি জিনিষ, তা'ত তোমার অজানা নয় ঠাকুরপো।

যে হিন্দু-স্ত্রী উচ্ছৃঙ্খল, অপরকে ভালবাসে —তা'র পক্ষেও কি ও কথা খাটে না কি?— বলিয়া সন্তোষ বীণার দুর্ব্বল স্থানটিতে আঘাত করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে খুসি হইয়া উঠিল!

বীণা অহৃদ্দীপ্ত শান্তকণ্ঠে বলিল—অপরের কথা বলতে পারি না, কিন্তু সতী-সাবিত্রীর চোখে তা'দের স্বামী ঠিক যেমনটি ছিল, আমার চোখেও আমার স্বামী ঠিক তেমনই ঠাকুরপো!

—তা' হ'লে এমন করে' আর একজনকে ভালোবেসে তাঁর মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে কখনই সাহসী হ'তে না বৌদি'। সতী-সাবিত্রী কী না পারতেন, কী না পেরেছেন?

—হাতের পাঁচটা আঙুল যদি সমান হ'ত, আর দুনিয়ায় একটা বই দুটো পথ যদি না থাকতো ত আর ভাবনা ছিল কি ঠাকুরপো। বলিয়া বীণা বিপুল বেগে হাসিয়া উঠিল।

বীণার বিদ্রূপাত্মক হাসির ধাক্কা সামলাইতে

নীরবে কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিয়া সন্তোষ বলিল—তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না জানি; কিন্তু তুমি যে সতী-সাবিত্রীর নখের যুগ্যিও নও, তার যথেষ্ট প্রমাণ এরই মধ্যে আমি পেয়েছি। তোমার কানের দুলটাও বোধ করি তার সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না।

—সত্যি, পাওয়া গেছে! বলিয়া বীণা আনন্দে সন্তোষের একটা হাত চাপিয়া ধরিল!

যে স্পর্শ হইতে সন্তোষ আপনাকে সভয়ে এতদিন বাঁচাইয়া আসিয়াছে, যে কটাক্ষকে চিরদিন ঘৃণায় সে প্রত্যাহার করিয়াছে, যে হাসিকে নির্লজ্জ অসংযম মনে করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে—সে সবই আবার কেমন করিয়া যে আজ তাহার ভাল লাগিয়া গেল, তাহার স্পষ্ট কারণ কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না; ভাবিয়া পাইতেও ব্যগ্র হইল না। বীণার এতদিনের টানের সামনে এতকাল পরে সে আজ নির্ভয়ে গা ভাসাইয়া দিল।

বীনা হাসিল। পরে সমর্পিত হাতটা তাচ্ছিল্যভরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—কই ঠাকুরপো, আজ ত একবারও জোর খাটালে না?

সন্তোষ মুহূর্ত্তের জন্য একবার অনুভব করিল, আপনার অজ্ঞাতে সেও বীণাকে ভালবাসিয়াছে। কোন্ অতল অনুভূতির অতীত দেশে সে যে ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতেছিল, তাহা তাহার বিস্মিত বিমুগ্ধ হৃদয় সন্ধান রাখে নাই। বীণা কথা কহিয়াই অতলগর্ভ সমাধি হইতে তাহাকে টানিয়া তুলিল।

সন্তোষ বিকৃত অসহায় কণ্ঠে কহিল—না।

বীণা সন্তোষের কণ্ঠস্বরে তাহার হৃদয়ের প্রত্যেকটি কথা যেন নির্ভুল বলিয়া বুঝিয়া লইল। তাহার চোখের সামনে এই নির্দ্দোষ সরল যুবককে পথভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ার গ্লানি আজ দুই বিন্দু অশ্রুতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। চোখের জল গোপন করিতে কোন প্রয়াস না পাইয়া সে সচেষ্ট সংযত-কণ্ঠে বলিল—যাক্, দুলটা তা'হ'লে হারায় নি! কোথায় রেখেছো ঠাকুরপো? হাতের কাজ ফেলে উঠে এসেছি আবার।

সন্তোষ কি যেন দুর্ব্বোধ্য কথার মানে সহসা বুঝিতে পারিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—বৌদি', জেনে-শুনে কিছুই কি আর হারায় কোনদিন? তোমার কান থেকে দুলটা খসে' আর পড়ে নি ত? জানতে বলেই তাই ভোর না হ'তে এখানেই ছুটে এসেছো প্রথম।

বীণা স্বেচ্ছায় সন্তোষের শয্যার উপর দুল ফেলিয়া যায় নাই। চিরদিনের অভ্যস্ত ভার হারাইয়া কানটায় এক অস্বস্তিকর মুক্তির স্বাদ যে মুহূর্ত্তে প্রথম অনুভব করিল, তখনই সে সকল সম্ভব অসম্ভব স্থানের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোথাও যখন পাওয়া গেল না, তখন বুঝিল যে, সন্তোষের ঘরেই হয় ত তাহা পড়িয়া গিয়া থাকিবে। রাত অধিক হইয়া যাওয়ায় কাল সে আর খোঁজ লইতে পারে নাই।

বীণা বলিল—আচ্ছা ধরো, ইচ্ছে করেই আমি ফেলে গেছি। তোমার ফিরিয়ে দিতে কিছু আপত্তি আছে কি?

—না, কিছু না। টেবিলের ওপর আছে; নিয়ে যেতে পার।

বীণা আর কোন কথা না বলিয়া সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর দুলটা দেখিতে পাইল।

সন্তোষ মুহূর্ত্তে মনে মনে কি একটা সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়া দরজার সম্মুখে তৃপ্ত উল্লসিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল।

বীণা বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল রাত্রে বোধ হয় একটুও ঘুমুতে পার নি ঠাকুরপো?

সন্তোষের উল্লসিত হৃদয়কে বীণা যেন দুই

হাতে এই সামান্য কথার অসামান্য মন্ত্রে মুচ্‌ড়াইয়া বিরস বিশুষ্ক করিয়া তুলিল।

সন্তোষ প্রাণহীনের মত উত্তর করিল—না।

বীণা 'ফিক্' করিয়া হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে গিয়া চমকাইয়া থামিল!

সন্তোষের দীপ্তিহীন ক্লান্ত দুই চোখের দৃষ্টি তাহারই দেহের উপর পড়িয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। ক্ষুধা, জাগরণ, ক্লান্তি—সে চোখের নীরব নিদারুণ অভিব্যক্তি

ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়

১। মৃত্যুমুখে

২। হীরার খণি

৩। জালিয়াৎ

প্রত্যেক খানির মূল্য বারো আনা মাত্র।

স্বনামখ্যাত প্রকাশক শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্ 'রহস্য-চক্র সিরিজ' নাম দিয়া সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রকাশ করিবার যে নূতন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, সেই সিরিজের উপরোক্ত তিনখানি গ্রন্থ আমরা পড়িয়াছি এবং পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই সিরিজের উপন্যাসগুলি ইংরাজী উপন্যাসের মস্তিষ্কহীন নীরস অনুবাদ নহে; আমাদের জাতীয় জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই এই বইগুলির বিষয়বস্তু রচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে ও লেখার গুণে প্রত্যেক গ্রন্থখানি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি সরস ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ, ইহাদের ঘটনা-বিন্যাসও তেমনি মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। আলোচ্য পুস্তক তিনখানির মধ্যে আমরা এই সিরিজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর পাকা হাতের পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছি। আজকাল বাজার-চলিত একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ন্যাকামীপূর্ণ পুস্তকরাজি অপেক্ষা এই বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ 'য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী'গুলি পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই তৃপ্ত হইয়াছি। সেজন্য মনোরঞ্জন-বাবু আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা তাঁহার এই নবানুষ্ঠিত সিরিজের বহুল-প্রচার কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই, ছবি এবং বিষয়-বস্তুর তুলনায় পুস্তকগুলির দাম যে বিশেষ সস্তা, তাহাতে বোধ করি কেহ-ই দ্বিমত করিবেন না।

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ　　ফাল্গুন, ১৩৪০　　একাদশ সংখ্যা

স্মৃতি-বার্ষিকী

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভ্রান্ত বংশ এবং সুদর্শন চেহারা দেখিয়া কল্যাণীর পিতা, অপূর্ব্বমোহনের সহিত কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পর, ভবিষ্যতে কন্যা-জামাতাকে যে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে,—এ-কথাটা বোধ হয় বিবাহের পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। বর্ত্তমানের জন্যও তাঁহাকে সে ভাবনা ভাবিতে হইল না,—বিবাহ-বাড়ীর গোলমাল মিটিতে না মিটিতেই হঠাৎ একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গভীর রাত্রে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিল।

অপূর্ব্বমোহন তখন শ্বশুরালয়ে। ব্রাহ্মণদিগের অশৌচান্ত হয় দশম দিবসে, সুতরাং শ্বশুরের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত অপূর্ব্বকে অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু এই অপেক্ষা করা সম্বন্ধে কল্যাণীর অসম্মতি ছিল। সে, আত্মীয়-কুটুম্বদের উপস্থিতিতে স্বামীর অপ্রতিভ অবস্থা দেখিতে চায় না। বর্ত্তমান যুগে, দরিদ্রতার অপরাধ নরহত্যার চেয়েও বেশী,—ইহা ষোড়শী কল্যাণী জানিত। দরিদ্র অপূর্ব্বকে, বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার কথাটা, একদিন রাত্রে কথায় কথায় সে বুঝাইয়া দিল।

কিন্তু অপূর্ব্ব যখন কিছুতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত নহে, তখন বাধ্য হইয়া কল্যাণীকে নিজের গায়ের গহনা বন্ধক রাখিতে হইল;—টাকা লইয়া অপূর্ব্ব শ্বশুরের শ্রাদ্ধে লৌকিকতা বজায় রাখিবে। পিতা দরিদ্রের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেছেন, দারিদ্র্যকে ভয় করিলে ওর চলিবে না—এ-কথাও কল্যাণী জানে. কিন্তু স্বামীর জন্য ওর দুঃখ হয়।

অবস্থা অনুযায়ী শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইলে, কল্যাণী জোর করিয়া শ্বশুরঘর করিতে আসিল। কিন্তু ঘর কোথায়? একখানি ভাঙা মাটীর কুঠরি। রান্নার জন্য জীর্ণ এক চালা, চালার পাশে ঢেঁকিশাল।

কল্যাণী কাঁদিল না, দুঃখ করিল না, স্বর্গীয় পিতাকেও দায়ী করিল না; শুধু দুঃখিত হইল স্বামীর জন্য। ও ভাবে, স্বামীর অদৃষ্ট স্ত্রীর অদৃষ্টের অনুলিপি।

সাত দিনের ছুটি লইয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিল, ফিরিতে হইল একুশ দিন। ইহার মধ্যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিবারও সময় হয় নাই। অপূর্ব্বর চাকরী গেছে, জমিদার মহাশয় নূতন লোক বহাল করিয়াছেন, কাজেই হাঁটা-হাঁটি বা কান্নাকাটিতে কোনো ফল পাওয়া গেল না।...

অপূর্ব্ব সংসার চালায় পিতল-কাঁসার বাসন বেচিয়া। সেদিন জ্বালানীর অভাবে ঢেঁকি-টাকেও পোড়াইতে হইয়াছে। মা-বাপের আদরের কন্যা কল্যাণী, সে-ও বিপাকে পড়িয়া মাটীর কল্‌সী কাঁখে পুকুর-ঘাট হইতে জল আনে; হয়তো কল্যাণী মনে-মনে কত কাঁদে, হয়তো অক্ষম স্বামীকে অভিশাপ দেয়।

অপূর্ব্ব ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মনে-মনে মতলব আঁটে,— জীবিকা অর্জ্জনের নূতন একটা পন্থা বাহির করিতে হইবে। কিন্তু মতলব, মনের মধ্যে যাহা আসে, তাহাই হয় পুরাতন। কেউ-না-কেউ করিয়াছে, হয়তো হইয়াছে উন্নতি কিংবা অবনতিই!

এমন পন্থা অপূর্ব্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে আজো পর্যান্ত কেউ পড়ে নাই; উন্নতিও হয় নাই কাহারো, অবনতিও না।

অপূর্ব্ব তিনদিন ধরিয়া একখানা দরখাস্তের তর্জ্জমা করে, কিন্তু মনের মত হয় না, লিখিয়াই কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

অবশেষে একদিন লেখাটা মনের মত হইল:—

— "ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করুন,—বেকার-জীবন-ভার বহনে ক্লান্ত আমি। যদি অন্নদানে নারাজ থাকেন, বিষ কিনিবার পয়সা দিন!"

ঠিক হইয়াছে, নূতন মতলব্ বটে! অপূর্ব্ব হাঁড়ি-কল্‌সীর জঙ্গল হইতে একটা ভাঙা কাঠের বাক্স বাহির করিয়া, ডালার উপর লম্বা ছিদ্র করিল, তার পর বাক্সটার চারদিকে কাগজ আঁটিয়া দিয়া, গোটা গোটা অক্ষরে লিখিল— "ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করুন"...

এইবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ট্রেনে-ট্রামে-বাসে, রাস্তায়-রাস্তায়, অলিতে-গলিতে বাক্স লইয়া ফিরিবে, মুখ ফুটিয়া, 'দাও' বলিয়া কাহারও কাছে চাহিবে না।...হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াও, কল্যাণীকে সুখে রাখিতে হইবে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত তার মুখে মলিনতার আভাষ ফুটিয়াছে।...

একদিন অধিক রাত্রে ঘুমন্ত কল্যাণীর আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া, অপূর্ব্ব তাহার বাক্স খুলিল। মাত্র একগাছি সোণার চুড়ি বাহির করিয়া লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিতে যাইবে—ঈষৎ শব্দ পাইয়া কল্যাণী চোখ মেলিয়া চাহিল। স্বামীর চৌর্য্যবৃত্তি দেখিয়া ওর রাগ হইল না, দুঃখে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। কল্যাণী পুনরায় চোখ বুজিল।... কী কষ্ট! স্ত্রীর কাছেও চাহিতে লজ্জা হয়!

যাত্রার দিনে, কল্যাণীর কাছে অপূর্ব্ব কোন কথাই গোপন রাখিতে পারিল না। কল্যাণীর

মত পত্নীকে প্রবঞ্চনা করিতে ওর মন সায় দেয় নাই।

কিছু টাকা নিজে লইয়া এবং কিছু কল্যাণীর খরচের জন্য রাখিয়া, একদিন সত্যসত্যই অপূর্ব্ব কলিকাতায় আসিল। আসিবার সময় কল্যাণী একটুও কাঁদে নাই, বরং হাসিমুখেই স্বামীকে বিদায় দিয়াছিল। কিন্তু সে-হাসি দেখিয়া অপূর্ব্ব রোদন সম্বরণ করিতে পারে নাই!...

ঠিক সাতটি দিন মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছে—ইহারই মধ্যে অপূর্ব্ব একদফা কল্যাণীর নামে পাঁচটাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছে, আর তিনদিন পরে হয়তো দশ টাকাই পাঠাইতে পারিবে। বেচারা দু'বেলা হোটেলে খায়,—একপয়সার ভাত, এক পয়সার তরকারী আর এক পয়সার ডা'ল!— রাত্রে শুইয়া থাকে এক বড়লোকের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায়, স্নান করে মা-গঙ্গার জলে; পরণের কাপড় পরণেই শুকাইয়া লইতে হয়।

সেদিন কালীঘাটে দুপুরের সময় আদি গঙ্গার বাঁধানো কিনারায় বসিয়া, অপূর্ব্ব বাক্স খুলিয়া দেখিল—দশটাকা তিনপয়সা হইয়াছে। আর পাঁচটি পয়সা হইলেই এ-টাকা কল্যাণীর নামে মনি-অর্ডার করা চলিবে। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া, পুনরায় ভিক্ষায় বাহির হইল, কিন্তু পড়তা ছিল খারাপ, পাঁচ পয়সার যোগাড় হইল যখন, তখন পাঁচটা বাজিয়া গেছে, টাকা পাঠানো হইল না।

লোভ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে,—অপূর্ব্ব আবার ভিক্ষা সুরু করিয়া দিল। একটা কার্ণিভালের ফটকে দাঁড়াইয়া, সে-রাত্রেই ওর তিন টাকার বেশী যোগাড় হইয়া গেল।

আহারে বসিয়া সেদিন ফরমাইস্ করিল—চার পয়সার মাংস্ দু'টো ডিম...

হোটেলের মালিক জিজ্ঞাসা করে—আজ ব্যাপার কি হে!—মাংস...ডিম...

খাইতে খাইতে অপূর্ব্ব জবাব দেয়—লোভ হ'য়েছিল ভাই!...

পরের দিন দশ টাকার জায়গায় বারো টাকা পাঠানো হইল। নূতন মতলব আঁটিয়া, অপূর্ব্ব ট্রাম-বাসে বেড়ানো ছাড়িয়া দিল। প্রতিদিন হাওড়া-ষ্টেশন আর ব্যাণ্ডেল জংশন—ইহার মধ্যে যতগুলি ষ্টেশন আছে, ট্রেণে চাপিয়া, প্রতি ষ্টেশনে ষ্টেশনে কামরা বদল করিয়া প্যাসেঞ্জার-দের সুমুখে ভিক্ষার জন্য বাক্স বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু কানা-খোঁড়া, অন্ধ-কুষ্ঠে—সকলকারই সেখানে অন্ন-সংস্থান হয়, অপূর্ব্ব একটি পয়সাও পায় না। অপূর্ব্ব দমিয়া পড়ে না, যাহাতে আশাতিরিক্ত ভিক্ষা পাওয়া যায়, এ-রকম মতলবও অপূর্ব্বর মাথায় আসিতে বিলম্ব হইল না। ও একদিন বাক্সটার চারিদিকের কাগজ তুলিয়া ফেলিয়া নূতন কাগজ আঁটিল; সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিল—'মা শীতলার মন্দির-নির্ম্মাণ কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।'

ভিক্ষার কেন্দ্রও পরিবর্ত্তিত হইল। ই-আই-আর ছাড়িয়া অপূর্ব্ব আসিল, ই-বি-আর এ,—শিয়ালদ' হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত। সেবার কলিকাতায় বসন্তের মড়ক লাগিয়াছিল, মা-শীতলার নামে পাওনা হইতে লাগিল প্রচুর! পাঁচদিন অন্তর অন্তর সাতটাকা আটটাকা হিসাবে কল্যাণীকে পাঠাইয়া দিয়া, অপূর্ব্ব রাত্রি-কালে শুইয়া শুইয়া ভাবে – এইবার একদিন বাড়ী যাইতে হইবে; কল্যাণীর মুখখানি যেন চোখের সাম্‌নে ঝাপ্‌সা হইয়া দেখা দেয়—মুখখানা মনে পড়ে না।

বেলেঘাটার এক বস্তিতে, অপূর্ব্ব মাসিক তিনটাকা ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া লইয়াছে! ঘরের একদিকে গেরুয়া রঙের চাদর-কাপড়,

অন্যদিকে ভাতের হাঁড়ি জলের কল্‌সী, এনামেলের একখানি থালা আর ঘটি। হোটেলে আর খাইতে যায় না, এখন রান্না করে ও নিজের হাতে।

এমনি ভাবে আরো তিনমাস কাটিয়া গেছে। এতদিন পরে অপূর্ব্ব সত্যসত্যই বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

দুই

যাহার স্বামী কলিকাতায় থাকিয়া হপ্তায় দু'বার টাকা পাঠায়, পল্লীগ্রামে তাহার প্রতির সম্মানের অবধি থাকে না।

আজকাল কল্যাণীর বাড়ীতে পাড়ার মেয়েদের বৈঠক বসে। হাসি-গল্প হয়, সুখ-দুঃখের আলোচনা চলে; কল্যাণীর সহিত আলাপ করিতে পারিয়া অনেক নারী নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবে। কেহ ছেলে-মেয়ের অসুখের কথা বা নিজের দৈন্য জানাইয়া চার ছ'আনা পয়সা নেয়, কেহ বা টাকায় একআনা সুদে দু'-পাচ টাকাও ধার করে।

দেখিতে দেখিতে মেয়েমহলে কল্যাণীর সুদী কারবার জমিয়া উঠে। দু' পাচ টাকা হইতে দশ পঁচিশ ও কল্যাণী ধার দেয়;—কিন্তু খালি হাতে নয়, দস্তর মত সোণা-রূপার গহনা অথবা পিতল কাঁসার বাসন বন্ধক রাখিয়া।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে অনেকে পালা করিয়া কল্যাণীর কাছে রাত্রে শুইতে আসে, মাঝে মাঝে আহারাদিও করে। সেদিন বিকাল হইতে কাল-বৈশাখীর মাতন সুরু হইয়াছিল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ঝড়-জল থামিতে চায় না

কল্যাণী একা-একা বিছানায় শুইয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল।

দুর্য্যোগের জন্য আজ আর কেহ শুইতে আসিতে পারে নাই। আজ স্বামীর কথাই ওর মনে পড়ে বেশী করিয়া। এমন লোক, নিজের আসল ঠিকানটা পর্য্যন্ত এই ছ'মাসের মধ্যে লিখিয়া জানাইল না!—আজ একরকম,কাল আর একরকম—কোথায় থাকে কে জানে! দীর্ঘ এই ছ'মাসের মধ্যে না দিল একখানা চিঠি, না এতটুকু কুশল সংবাদ! কেমন আছে···হয়তো বা কোনো হোটেলের অন্ধকার ঘরে অসুখে পড়িয়া আছে...কিংবা হয়তো টাকার মোহে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতে করিতে চিঠি লিখিবার সময়ই পায় না! কল্যাণীকে আর কিছুদিন পরে বাপের বাড়ীতে যাইতে হইবে,—সাতমাস উত্তীর্ণ হয়,—প্রসবের সময় এখানে এমন কে আছে, যাহার ভরসায় সে একা-একা এই নির্জ্জন বাড়ীতেই বাস করিতে পারে। অথচ স্বামীকে সংবাদ দিবার উপায় নাই!

এতদিন পরে কল্যাণী খাঁচার পাখীর মত ছটফট করিতে লাগিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর ব্যর্থ ক্রন্দনে বালিশ ভিজাইয়া ফেলিল।

মা চিঠি দিয়াছেন—না হবে পাচ সাতখানি। সব চিঠিগুলি তোষকের নীচে হইতে বাহির করিয়া, কল্যাণী একখানির পর একখানি পড়িতে লাগিল। চোখের জলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে; ইচ্ছা হয় খানিকক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কাঁদে! টাকাই কি নারীর সর্ব্বস্ব! স্বামী হইয়াও কেন তিনি এ-কথাটা বুঝিয়া দেখিলেন না!

এখন আর অপূর্ব্বর একখানি মাত্র ভাঙাঘরই সম্বল নয়, এখন দস্তর মত বাড়ী হইয়াছে; ভাঙা-ঘর মেরামত হইয়াছে, চারিদিকে পাঁচিল উঠিয়াছে, সদর দরজায় কপাট পর্য্যন্ত লাগানো হইয়া গেছে! কল্যাণীর কল্যাণে বাকী কিছুই নাই! কেবল যার জিনিষ, সে আসিয়া দেখিলেই কল্যাণীর শ্রম সার্থক হয়।

ঝড়-জলের মাতন তখনো সমানে চলিতেছে;

বন্ধ ঘরের মধ্যে নানা চিন্তায় ক্লান্ত কল্যাণী এতক্ষণ শুনিতে পায় নাই,—কে-যেন সদর দরজা ঘন-ঘন আঘাত করিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকা-ডাকি করিতেছিল। কল্যাণী শুনিল, শুনিয়া এব ভরসা হইল। নিশ্চয়ই পাড়ার কেহ, এই দুর্য্যোগের রাত্রিতেও তাহাকে আগ্‌লাইতে আসিয়াছে।···

কিন্তু দরজা খুলিয়াই ওকে ভয়ে পিছাইয়া আসিতে হইল। চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে বিস্তর জিনিষপত্র; সর্ব্বাঙ্গ তাদের ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া গেছে। গ্রীষ্মের দিনেও সকলে শীতে ঠক্‌-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

অস্ফুট চীৎকার করিয়া কল্যাণী পুনরায় দরজা বন্ধ করিতে যাইবে—অপূর্ব্ব ওর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ভয় নেই···আমি—

ঘরের মধ্যে আসিয়া অপূর্ব্ব মুটের মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। একরাশ জিনিষ · বাক্‌স, তোরঙ, ফল, মিষ্টান্ন—প্রচুর।

কল্যাণী সলজ্জভাবে স্বামীর পায়ের গোড়ায় মাথা নোয়াইল। আজ ওর দুর্য্যোগের রাত্রি নয়,—আজ ওর অমৃতযোগ—ওর বিড়ম্বিত অদৃষ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লগ্ন!——

সমস্ত রাত্রির মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর চোখে ঘুম আসে না। কল্যাণীর বুদ্ধির তারিফ করিতে করিতে অপূর্ব্ব মনে-মনে বলে—তুমি আমার লক্ষ্মী,—আমার ভাগ্যলক্ষ্মী! তোমার মাথার চুলে মণি-মুক্তার চুম্‌কি, গলায় তোমার মাণিকের মালা, তোমার রাঙাপায়ের তলায় প্রস্ফুটিত স্বর্ণ-শতদল!—তুমি আমার ইহকাল, হয়তো বা পরকালও।

হীন ভিক্ষাবৃত্তির জন্য অপূর্ব্ব আর কলিকাতায় যাইতে চাহিল না। যাহা কিছু পুঁজি ছিল কল্যাণীর মেয়ে-মহল হইতে ক্রমশঃ অপূর্ব্ব তাহা পুরুষ-মহলেও ছড়াইয়া দিল। সুদী-কারবার দিনে-দিনে বিস্তৃত হইয়া চলিল।—পঁচিশ-ত্রিশ কেন, ভালো মক্কেল পাইলে, অপূর্ব্ব জায়গা-মর্টগেজ রাখিয়া একসঙ্গে একশো টাকা পর্য্যন্ত ধার দিতে পারে।

কল্যাণী মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করে—সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করলে, টাকা তোমার ভোগ করবে কে? এরপর দু'দিন বাদে আমি বাপের বাড়ী চলে গেলে, দেখছি টাকা খেয়েই তোমাকে থাক্‌তে হবে।

অপূর্ব্ব হাসিয়া প্রতিবাদ করে—টাকাকে অত অনাদর দেখিও না কল্যাণী, তাহ'লে পর-কালেও আপশোষ করতে হবে। টাকার মত জিনিষ খেয়ে নষ্ট করবার জন্যে নয়, ও-জিনিস বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে মরতে হয়।

কল্যাণী হাসিয়া খুন হয়, আবার রাগও করে।——

এম্‌নি করিয়া আরো কিছুদিন অতীত হইয়া গেল। কল্যাণীর পিত্রালয়ে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, সাহস আসে না। স্বামীর অর্থ-পিপাসা যেরূপ দিনে-দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, হয়তো বা আর কিছুদিন পরে সত্যসত্যই টাকা-টাকা করিয়া পাগল হইয়া যাইবে। হয়তো বা ও বাঁচিবে না।

ললাট-লিপি খণ্ডন করিবার নয়,—এই মহা-জনবাক্য স্মরণ করিয়া, কল্যাণী পিত্রালয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

স্বামীকে দেখিবার জন্য র'হিয়া গেল বটে, স্বামী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবারও সময় পায় না। দিবারাত্রি সুদ-কষা কষিয়া-কষিয়া ইহ-পরকালের সকল চিন্তাই অপূর্ব্ব বিস্মৃত হইতে বসিল। একটি পয়সা এদিক-

ওদিক হইবার জো নাই, ও-যেন সুদ-কষায় শুভঙ্করকেও হার মানাইতে পারে।——

কিন্তু সুদ-কষার ভাবি-বিঘ্ন ভাবিয়া, একদিন অপূর্ব্বই কল্যাণীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিল। কল্যাণীর ভালোবাসার অনাদর করিতে ওর ইচ্ছা হয় না, বরং অনাদর হইতেছে ভাবিয়া মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া উঠে। তবু টাকার নেশা ওর অন্তশ্চক্ষু হইতে লুপ্ত হইয়া যায় না।

গ্রামে একটি মাইনর ইস্কুল খুলিবার কথা হইতেছিল। তরুণের দল আসিয়া অপূর্ব্বকে ধরিল। অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা চাঁদা দিতে হইবে। অপূর্ব্বর মত নগদ টাকার মালিক গ্রামে যে আর একটিও নাই, একথা অনেক বার কাণে শুনিয়াও অপূর্ব্ব তাদের একটা পয়সা পর্য্যন্ত দিতে পারিল না। পয়সা অপূর্ব্বর বুকের রক্ত,—ওর জীবাত্মা।

পনের দিন পরে একখানি চিঠি আসিল।

'কল্যাণীর মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে, শরীর খুব দুর্ব্বল, আহারে রুচি নাই, অথচ তার প্রসব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।'

চিঠিতে অপূর্ব্বকে একটিবার যাওয়ার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছে। চিঠি লিখিয়াছেন কল্যাণীর মা স্বয়ং।

চিঠি পড়িয়া অপূর্ব্বর মাথা ঘুরিয়া গেল। যথা সর্ব্বস্ব ওর কল্যাণীই। কল্যাণীর কষ্টের কথা স্মরণ করিয়াই, একদিন বিদেশে গিয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, কল্যাণীর মলিনমুখে হাসির আভা ফুটাইতেই ওর যত-কিছু কৃচ্ছ্র সাধন। অপূর্ব্ব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু যাত্রার একদিন পূর্ব্বে, খত-তমসুকের বাক্সটা গুছাইয়া লইতে গিয়া ওর চোখে পড়িল—আগামী দুই দিনের মধ্যে রসিক ঘোষালের মর্টগেজ দলিলখানা রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। ষাট টাকার দলিল, —যেমন-তেমন ক্ষতি নয়!

অনিবার্য্য বাধা, উপায় নাই। দুঃখ মর্ম্মান্তিক হইয়া ওঠে, কিন্তু ষাটটাকা সুদের ভবিষ্যতে হাজার টাকায় পরিণত হইবে,—এই উচ্চাশার সুবিশাল সৌধ গড়িয়া অপূর্ব্ব তাহারই শীর্ষে বসিয়া আকাশ-কুসুমের মত সৌরভ অনুভব করে। ওর মনে হয়, খালি জমাইবার জন্যই অর্থের সৃষ্টি, ভোগের জন্য আছে অনর্থ।

তিন

পাঁচদিন ক্রমাগত প্রসববেদনার জ্বালা সহ্য করিয়া, কল্যাণীর একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু প্রসবের পর হইতে প্রসূতির জ্ঞান নাই। চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন —অবস্থা সঙ্কটময়।

সংবাদ পাইয়া অপূর্ব্ব আসিয়াছে। সঙ্গে টাকাকড়িও আনিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার সাহস ওর নাই। যেখানে দশটাকা খরচ করা উচিত, অপূর্ব্ব সেখানে তিন টাকা দিতে চায়, দেওয়ার সময় হাতখানা ওর ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপে। মনে-মনে শাশুড়ীর উপর রাগ করে,—বত্রিশ-নাড়ী ছিন্ন করা ধন—সে পুত্রই হোক্ আর কন্যাই হোক্, মায়ের কাছে একই। জমানো টাকা থাকিতে, অপূর্ব্বর বহু-কষ্টার্জ্জিত সামান্য ক'টা টাকার উপরেই যত লোভ!—সে দিন পাড়ায় কে-একজন বলিয়াছিল 'আহা! মেয়েটা যদি না বাঁচে, এমন সোনার চাঁদ জামাই 'পর' হ'য়ে যাবে। হাতে দু'পয়সা হ'য়েচে আজ বউ গেলে কাল আবার ঘর-আলো-করা বৌ আসবে,—যাবে কেবল মায়ের মেয়ে।"

সেইদিন যদুমোড়লের আট আনা সুদ দেওয়ার কথা ছিল, দিতে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে, পুনরায় কবে পাওয়া যাইবে—কে জানে।..অপূর্ব্বর মেজাজ রুক্ষ হইয়াছিল, প্রতিবেশীর মন্তব্যটুকু শুনিয়াও শুনিতে চাহিল না। মনে মনে বলিল —রাজ্যিশুদ্ধ লোক খালি আমার টাকাই দেখেছে! এখন থাক্‌লে বাঁচি!

কিন্তু টাকাই অপূর্ব্বর থাকিল। যাহা থাকিলে জীবনে সুখ-শান্তির অভাব ঘটিত না, তাহা আর থাকিল না। নবজাত শিশুপুত্রকে মায়ের কোলে সঁপিয়া দিয়া কল্যাণী চলিয়া গেল।

অপূর্ব্ব শ্বশুর বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিল ততক্ষণই কাঁদিল, এবং যতক্ষণ কাঁদিল ততক্ষণই, শোকের সঙ্গেও, মনে মনে অর্থ চিন্তা করিল।···

বাড়ী ফিরিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে, পত্নীর শ্রাদ্ধে অপূর্ব্ব দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল, এবং এই ব্রাহ্মণভোজনের জন্য যাহা কিছু খরচ হইয়াছে তাহা ঘরে তুলিবার জন্য সাতদিন কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে সুদের টাকা আদায় করিয়া ফিরিল।

কল্যাণীর জন্য যে ওর কত কষ্ট, তাহা ও জানে, কিন্তু অর্থলোলুপতার তীব্র আকর্ষণে সে কষ্ট মনে আনিবার সময় পায় না। সকালবেলায় আলুভাতে বা কচুভাতে ভাত খায়, সারাদিন টোটো করিয়া খাতকদের বাড়ী বাড়ী ঘোরে, সন্ধ্যায় ফিরিয়া সুদের হিসাব করে; অধিক রাত্রে, যদি কোনোদিন দিনের বেলার রান্নাভাত না থাকে, একটুখানি গুড় আর একঘটি জল খাইয়া শুইয়া পড়ে। আগামী কাল কোথায় কোথায় যাইতে হইবে এবং কতটাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা বা কতটাকা ধার লইবার মক্কেল আছে—ইহারই হিসাব করিতে করিতে শ্রমক্লান্ত দেহ অবসন্ন হইয়া আসে; চোখের পাতায় ঘুমের পরশ লাগে, স্বর্গগতা কল্যাণীর মৃত্যু-পরশ-কাতর মুখখানি তন্দ্রালস নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে উঠিতেই ওর নয়ন মুদিয়া যায়। অপূর্ব্ব তখন স্বপ্ন দেখে: —'না খেয়ে না ঘুমিয়ে যা' জমিয়ে রাখ্‌ছো, ভোগ করবে কে?' অপূর্ব্ব স্বপ্নের ঘোরেই হাসিয়া জবাব দেয়—'কেন খোকা; তোমার খোকা ভোগ করবে কল্যাণী। সব তার।'

দিন যায় দুঃখে কি সুখে,—অপূর্ব্বর তাহা অনুভব করিবার মত শক্তি নাই। গ্রামের অনেকে বলে—বিয়ে করো হে, আর কতদিন সন্নিসী সেজে বেড়াবে?

অপূর্ব্ব বলে—রাজী আছি; কিন্তু হাজার টাকা নগদ চাই। মেয়ে কালো হোক, খোঁড়া হোক্—আপত্তি নেই।

কিন্তু বিবাহ করিবার মত সময় কোথা? আর হাজার টাকা নগদই বা অপূর্ব্বর মত পাত্রকে পল্লীগ্রামের কোন্ জমিদার দিতে আসিবে? তা' ছাড়া, হাজার টাকা পণ দিতে চাহিয়াও, যদি কেহ বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, অপূর্ব্বর তৎক্ষণাৎ কল্যাণীর মুখ মনে পড়িয়া যায়। যে মুখ কলিকাতায় সামান্য কয়েকমাস থাকা কালীন ভালো করিয়া মনে পড়িত না, আজ দশ বৎসর অতীত হইয়া গেছে, সেই মুখ এখনো ওর দৃষ্টির সাম্‌নে সুপরিস্ফুট হইয়া ওঠে।···

শাশুড়ী চিঠি লিখিয়াছেন:—বাবা অপূর্ব্ব, মানিকের অন্নপ্রাশনের সময় তোমার আসা হয় নাই—এ আমার শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাও। তোমার মানিক শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এগারোয় পা দিয়াছে; বামুনের ছেলে, এইবার ওর উপনয়ন দিতে হইবে। দিন ঠিক হইলেই আয়োজন করিব। এবার যেন তোমার আসা হয়।'

পত্রপাঠ অপূর্ব্ব পুত্রের উপনয়নের আয়োজন করিতে শাশুড়ীর নামে দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিল। আজ ওর আনন্দের আর সীমা নাই।

কল্যাণীর খোকার জন্ম নগদ দশ দশ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। ভাবিয়া রাখিল, উপনয়নের জন্ম আরও পাঁচ টাকা খরচ করিতে হইবে। ব্যাপার বাস্তবিকই সোজা নয়,—মাণিকের উপনয়ন,—কল্যাণীর খোকার।

মাণিক বুদ্ধিমান ছেলে, লেপাপড়ায় ওর অখণ্ড মনোযোগ। কিন্তু অপূর্ব্ব আর অপেক্ষা করিতে পারিল না,—পনের বছরের ছেলে ম্যাট্রিক পাশ না করিতেই তাহাকে জোর করিয়া নিজের কাছে আনিল, এবং পাঠ্য পুস্তকগুলি বাক্স বন্দী করিয়া, স্থদ কষার আর্য্যা শিখাইতে লাগিল।

বুদ্ধিমানের বুদ্ধি যে দিকে লাগানো যায়, অতি সহজে সেইদিকেই লাগে। মাণিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দৌলতে, বাপের ব্যবসা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইল। পুত্র হইল পিতার ডান হাত। পাড়ায় সমবয়সী অনেক আছে, কিন্তু মাণিকের কাহারও সহিত বন্ধুত্ব নাই। কিশোর বয়সে টাকার স্থদ লইয়া মাথা ঘামাইতে ঘামাইতে ওর সবুজ মনে কালির আঁচড় পড়িতে থাকে, মেজাজ ক্রমেই রুক্ষ হইয়া আসে।

সেদিন বাজারে গিয়া, নগদ চারআনা দিয়া অপূর্ব্ব ইলিশ মাছ কিনিয়া আনিল। মাণিক তখন রান্না শেষ করিয়া, পাড়ার বিশু মণ্ডলের সহিত বচসা জুড়িয়া দিয়াছে। সাড়ে দশ আনা স্থদ দিতে আসিয়া, বিশু নাকি দশ আনা এক পয়সা দিয়াছে! মানিক একটি পয়সাও ছড়িতে রাজী নয়, ও বলে,—একটা পয়সা আমার মোহর।'

কথাটা অপূর্ব্বর কাণে গেল। হ্যাঁ, এইবার যদি স্বর্গ হইতে পুষ্পক-রথ আসে, অপূর্ব্ব যাত্রার জন্ম এতটুকু বিলম্ব করিবে না,...কল্যাণী সেখানে একা আছে।...

ইলিশ মাছ দেখিয়াই মাণিক অপূর্ব্বকে এমন ঠিকানায় পৌছিয়া দিল, যেখানে দাঁড়াইয়া অন্ততঃ স্বর্গবাসের বাসনা হয় না।

—চার চার আনা পয়সা!...অতবড় মাছ খাবে কে? কি দরকার ছিল? কে তোমাকে আনতে ব'লেছিল!

অপূর্ব্ব পুত্রকে আজকাল সমীহ করিয়া চলে। চাণক্য পণ্ডিতের 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে'—কথাটার প্রতি ওর প্রচুর সম্মম আছে। কহিল—তুই ইলিশমাছ ভালো-বাসিস—

—ভালোবাসি তা কী? তাই বলে চার গণ্ডা পয়সার মাছ একদিনে খেতে হবে? আমরা রাজা-বাদ্সা?...হাঁড়িতে চারটিখানি সোনা-মুগের ডা'ল ছিল, খিচুড়ী করলাম। আবার চার আনার মাছ! ফিরিয়ে দিয়ে এক পয়সার ঘি কিনে আনো। খিচুড়ীর সঙ্গে ঘি,...ইলিশ মাছের দরকার নেই।

অপূর্ব্ব কহিল—তা হোক মাণিক, আজ ইলিশ মাছ তুই ভাজা কর। ঘি-ও আমি এনে দিচ্ছি।

মাণিক গম্ভীর হইয়া কহিল—ঘি খাও, মাছ ভাজা খাও;—লোহার সিন্দুকটাকেও খেয়ে নাও! ...আমি কাল থেকে আর রাঁধতে পারবো না। বড়লোক তুমি, টাকার যখন অভাব নেই, তখন রাঁধুনি নিয়ে এসো। একটা পয়সা স্থদ ছাড়তে হ'চ্ছিল ব'লে, আমি এতক্ষণ নাকে কেঁদে সারা হ'য়ে গেলাম; আর তুমি নগদ চারগণ্ডা পয়সা হাস্‌তে হাস্‌তে জলে দিয়ে এলে!

পুত্রের কৃতিত্বে পিতার গৌরবই বাড়ে। অপূর্ব্ব এ-কথা বার-বার স্মরণ রাখিতেছিল। কহিল—কাল থেকে আর বাজে খরচ করবো না মাণিক, তুই বরং এখন থেকেই লোহার

সিন্দুকের চাবিটা রেখে দে।···আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচি।

মনে মনে বলিল,—"আমি এইটুকুই চেয়েছিলাম।···কল্যাণীর খোকা, আমার সব—সর্ব্বস্বই তো ওর।

চার

অর্থশালী হইয়াও, কৃপণতার জন্য, ভদ্র-সমাজে ধনীজনোচিত মর্য্যাদা লাভ করিতে অপূর্ব্ব পারিল না। কিন্তু দুনিয়ায় টাকার তুল্য সম্মানের বস্তু আর একটিও নাই,—অপূর্ব্ব সেই সম্মানের দাবী করিল।—বিনা আড়ম্বরে পুত্রের বিবাহ দিয়া, সঞ্চিত টাকার পরিমাণ আরো কিছু বাড়াইয়া তুলিল। পুত্রবধূ সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা; এইজন্য ভদ্রমহলেও অপূর্ব্বর ক্রমে-ক্রমে মাখামাখি ভাব হইতে লাগিল।

আজ-কাল প্রায়ই, ও কাহারও চণ্ডীমণ্ডপে, কাহারও বা বৈঠকখানায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তামাক পোড়ায়। কাহারও হুঁকায় টান দেয় না, একটি মাঝারি নারিকেলের হুঁকা নিয়ত ওর হাতে-হাতে ফেরে।

সংসারের ভাবনা নাই, ব্যবসার জন্যও মাথা ঘামাইতে হয় না, মাম্‌লা মোকর্দ্দমার তদ্বির করা, খত্-তমসুক রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া,—যা-কিছু কাজ মাণিক একাই বেশ চালাইয়া লয়।......

প্রতি বৎসর কল্যাণীর মৃত্যু-তিথিতে, অপূর্ব্ব পাঁচটি করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করায়। যে-মাসে কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছিল, প্রতি বৎসরে সেই মাসের প্রথম হইতে অপূর্ব্ব সর্ব্বদা সতর্ক থাকে; পাছে দিন এড়াইয়া যায়,—পাছে ভুল হয়! সে ভুল যে কত বড় মারাত্মক হইবে, সে-কথা ও নিজে ছাড়া কে-ই-বা বোঝে? সংসারে থাকিয়াও, সংসার-নির্লিপ্ততার জন্য কেবল এই কথাটাই ওর নিয়ত মনে পড়ে। হুঁকা হাতে পাড়ায় বাহির হইবার পূর্ব্বে, একবার করিয়া পঞ্জিকা খুলিয়া দেখে,—'১৭ই শ্রাবণ, বুধবার।—তৃতীয়ায় একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন।'

১৩ই শ্রাবণ। রাত্রে আহারের পর, দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে-টানিতে পুত্রবধূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চা'ল ডা'লগুলো সব তৈরী হ'য়ে এসেচে তো বউমা? হাতে আর মাত্র তিনটি দিন বাকী। এবারে আবার পাঁচটি বামুন খাইয়েই শেষ করতে পারবো না;—রাধু নাপিত, বেনী ময়রা, সহদেব মণ্ডল—ওরা সব যেচে নেমতন্ন নিয়েছে। গোটাকতক টাকা এবার বেশী খরচ হবে দেখ্‌ছি।

পুত্রবধূ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য মেয়ে। বলিল—তা' হোক্ বাবা। আমিও পাড়ার সধবা ক'জনকে ব'লে রেখেছি।···খরচ আর কতই বা হবে! বড় জোর দশ কি পনের।

কিন্তু মাণিক সমস্ত শুনিয়া, চটিয়া লাল হইয়া উঠিল। পিতা তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত, পত্নীকে শাসাইয়া দিল—পাঁচসিকের একটি পয়সা আমি বেশী দিতে পারবো না, তাতে পাড়ার সধবা কেন,—দুনিয়াশুদ্ধ সধবাদের খাওয়াতে চাও খাওয়াও গে। আর বাবাকেও বলে দিয়ো, বামুন ভোজনের সঙ্গে ও-সব ময়রা-মোড়ল আর নাপ্‌তের ভিড় জমিয়ে, মিছি-মিছি পয়সা খরচ। ওতে নাম হয় না। তাছাড়া নাম নিয়েই বা আমাদের কী দরকার?

কিন্তু পুত্রবধূ এ-কথা শ্বশুরকে বলিতে পারে না। শ্বশুর সংসার ভুলিয়াছে, কৃপণের প্রাণ তার নির্জ্জীব এখন! অন্তরে স্মৃতি-বিদ্যুতের চমক লাগে,—কল্যাণীর হাসি... কল্যাণীর কাতরতা···কল্যাণীর সর্ব্ব-অবয়বের

দীপ্তি! লোকান্তরিত পত্নীর সাহচর্য্য কামনায় অপূর্ব্বর বিরহী মন উন্মাদ হইয়া যায়! বৎসরের এই একটি দিনে, ও যেন বুঝিতে পারে, কল্যাণী স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে! সদ্য-প্রত্যাগতার পদধ্বনি ওর কাণে বাজে! কল্যাণীর কণ্ঠে যেন স্বর-সমারোহ,—ওর হাসির সঙ্গে নন্দনের পারিজাত সুষমা! ওর নিশ্বাসে-নিশ্বাসে সমস্ত ঘর-দুয়ার যেন সুরভি-গন্ধে ভরপুর!...এবার কল্যাণী আসিয়া দেখিবে, তার খোকা আর খোকা নাই, অপূর্ব্বর বহু ক্লেশার্জ্জিত অর্থকে সে পরমার্থ বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে! কল্যাণীর অহংকার হইবে!

১৬ই শ্রাবণ।

বিকাল হইতে পাশার আড্ডা জমিয়াছে। কিন্তু খেলার দিকে অপূর্ব্বর মনোযোগ নাই। ওর কেবলই মনে হয়—আগামী কল্যকার তিথি...কল্যাণী ছাড়িয়া গেল যখন, মাণিক কচি শিশু—একদিনের মাত্র। কী যে ও হারাইয়াছিল বোঝে নাই, আজো হয় তো বুঝিতে পারে না, কিন্তু পুত্রের হইয়া পিতা বুঝিতে পারিয়াছে মর্ম্মে-মর্ম্মে।

অপূর্ব্ব পাশার দান ফেলিয়া 'ছ-তিন-নয়' দেখে, কিন্তু মুখে বলে—'কচে বারো।' হাতের হুঁকাটার ঘন-ঘন টান দেয়।

খেলা বেশীক্ষণ চলে না আর। অপূর্ব্ব উঠিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়।...দলশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, অথচ যোগাড়-পত্র কি কতদূর হইল কে জানে! বউমা বাড়ীতে একা।...

পথের মাঝে দেখা হইয়া যায় ইস্কুলের সেক্রেটারী মাখনবাবুর সঙ্গে। ম্যানেজিং কমিটির সভা ছিল, শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন।

—কে?—অপূদা'?

—হ্যাঁ ··মাখনভায়া...এত রাত্রে—

—ইস্কুলের মিটিং ছিল। ··আজ সকাল সকাল ফিরলেন যে? খেলা ভেঙে গেল?

—না, খেলা চল্‌ছে। বাড়ীতে আমার কাজ ..তাই—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে। আমাকেও তো নেমন্তন্ন ক'রেছেন। · মিটিংএর পর এতক্ষণ এই সব হচ্ছিল।

অপূর্ব্বর বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল। দুনিয়াশুদ্ধ লোক আজ তাহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা হচ্ছিল?

—আপনার পত্নী বাৎসল্যের কথা। অন্য কেউ হ'লে, আবার বিয়ে-থা করতো, কত ছেলে মেয়ে হ'ত! তা ছাড়া বছর বছর এই যে শ্রাদ্ধের আয়োজন, লোকজন খাওয়ানো···ক'টা লোকে করে আজকাল?·· স্ত্রীর অভাব শেষ বয়সেই বেশী জানা যায় অপূদা'। আমি জানি—

অপূর্ব্ব আর দাঁড়াইতে চাহে না। চলিতে-চলিতেই মাখনবাবু বলিলেন—কিন্তু এ সব না ক'রে একটা কাজের মত কাজ করুন অপূদা'। মনে শান্তি পাবেন, দেশশুদ্ধ লোক দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

মাখনবাবু বলিতে লাগিলেন—কল্যাণী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্যে আমাদের ইস্কুল ঘরটা পাকা ক'রে দিন। বেশী কিছু লাগবে না; আমার মনে হয়, হাজারখানেক টাকা হ'লেই হ'য়ে যাবে। মার্ব্বেল পাথরের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা থাকবে—'অপূর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তীর পরলোকগতা পত্নী কল্যাণীদেবীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই বিদ্যামন্দির নির্ম্মিত হইল'।...টাকাটা দিয়ে, কাল কল্যাণী দেবীর মৃত্যুতিথিতেই কাজ সুরু হ'য়ে যাক্‌। এই আপনাদের বামুন-ভোজন কুটুম্বভোজন করানো—কী হয় এতে? ভস্মে ঘি ঢালা! এ হবে একটা কাজের মত কাজ।

এমন কি গভর্ণমেণ্টের ঘরে পর্য্যন্ত আপনার নাম,—আপনার স্ত্রীর নাম থাকবে।

অপূর্ব্বর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল। কণ্ঠে ভাষা ফোটে না, একটা চাপা কান্না বুক ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চায়—'পরলোকগতা পত্নী কল্যাণী দেবীর স্মৃতিকল্পে'···'গভর্ণমেণ্টের ঘরেও নাম থাকিবে।'

মনে পড়ে কল্যাণীর মুখ। কল্যাণীর জন্য, ভদ্রসন্তান হইয়াও একদিন সে হীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল! কল্যাণীর সুখের জন্যই··· কিন্তু কল্যাণীর পীড়ার সময় সে কি করিয়াছিল? অর্থের মোহে, ধনবৃদ্ধির নেশায় মরণাপন্ন স্ত্রীকে প্রাণ ভরিয়া শুশ্রূষা করিতেও সময় পায় নাই।

মাখনবাবু কহিলেন—তৈরী ইস্কুল উঠে যাচ্ছে। বর্ষায় ঘরখানার যে কি অবস্থা হ'য়েচে, কাল একটিবার সময় ক'রে দেখে আসবেন।·· পুণ্যময়ী কল্যাণীর কল্যাণে যদি দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌তে পায়···দিনকতক পরে আপনার মাণিকেরও তো ছেলেমেয়ে হবে, তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে।

অপূর্ব্ব মাথা চুলকাইতেছিল।·· হাজার টা—কা! কিন্তু হাজার-হাজার টাকা আজ যে লোহার সিন্দুকে জমা হইয়া আছে,—এই জমানোর অনুপ্রেরণা দিয়াছিল কল্যাণীই, কল্যাণীর প্রেমের মধু-মত্ততাই অপূর্ব্বকে উন্নতির সোপানে বসাইয়া দিয়াছে!

অপূর্ব্ব মাখনবাবুর কথার শেষ জবাব না দিয়াই পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল।

মাখনবাবু স্তব্ধ! বিমূঢ়! ভাবিলেন, লোকটা সত্যই কঞ্জুষ! এতক্ষণ বৃথাই বাক্যব্যয় করিয়াছি।

মাণিক টাকার সুদ কষিতেছিল।

অপূর্ব্ব বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে অস্বাভাবিক কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—মাণিক!

মাণিক মুখ তুলিয়া চাহিল।

—লোহার সিন্দুকের চাবিটা একবার দে তো বাবা।

—কেন?

—হাজার খানেক টাকা চাই আমার।

মাণিক খাতাখানি বন্ধ করিতে করিতে এমন বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল যে, অপূর্ব্ব সে চাহনির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। কহিল, আর আমি জীবনে একটি পয়সাও খরচ করবো না মাণিক,—মাত্র এই একটি হাজার টাকা।···ওরা বল্‌ছিল,—তোর মায়ের নামে স্কুল করে দেবে। তোর মায়ের স্মৃতিরক্ষা—

ঝঙ্কার দিয়া মাণিক বলিয়া উঠিল—ওরা সব তোমাকে পাগল ভেবেচে। নইলে অপূর্ব্ব চক্রোত্তিকে হাজার টাকা খয়রাৎ করতে বলে।··· হাজার টাকা! একটা টাকা উপায় করতে তোমার কতখানি কষ্ট হ'য়েছিল, আজ ভাবো দেখি। টাকা দিয়ে স্মৃতি কিন্‌তে হবে? কেন মন কি আমাদের শুকিয়ে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে?

অপূর্ব্ব কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—কিন্তু আমি যে দিতে চেয়েছি মাণিক। আমার যেন মনে হচ্ছে, তোর মা কাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ব'লেছিল—

মাণিক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। খেয়ে শুয়ে পড়ো গে। আমাদের মত লোক কি টাকা খয়রাৎ করতে পারে? আমাদের আছেই বা কত?

অপূর্ব্ব আজ পুত্রের কাছে ভিক্ষুক সাজিয়াছে! মুখে ওর বাধে না কিছু। বলিল—লক্ষ্মী মাণিক আমার, একটা হাজার টাকা আমাকে দে বাবা।—আমার বড় কষ্ট মাণিক,—সইতে আর পারবো না হয়তো। হয়তো আমি ম'রে যাবো বাবা।—

পিতারই কাছে শিক্ষা পাইয়া মাণিক হইয়াছে সুশিক্ষিত এবং সুযোগ্য পুত্র। পিতার কথাও কাণে শুনিতে চাহিল না, আজ রাত্রের মধ্যেই এগারো খানি খতের সুদ কষিয়া রাখিতে হইবে। দু'দিন পরে মাম্‌লা দায়ের করা চাই-ই। তামাদির সময় হইয়া আসিয়াছে।

আগামী কল্য বাড়ীতে লোকজন খাওয়ানো হইবে; মাণিকের স্ত্রী অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আয়োজন পত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মাণিক তখনো টাকার সুদ কষিতেছে। ওর কাছে টাকা-আনা-পাই ভিন্ন বিশ্বজগতে এখন আর কিছুই যেন বাঁচিয়া নাই।

—ওগো, আর কতক্ষণ দেরী হবে?

—বাবা খেয়েচে?

—বাবা…কোথায়?

—এই তো এখানেই ছিল। ঘরে গিয়ে শুয়ে প'ড়েছে হয়তো। মাণিক কাজে মন দিল।

পুত্রবধূ ঘরে ঢুকিয়াই, শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, অতখানি রাত্রেও ঘরে আলো জলিতেছে, আলোর সুমুখে বসিয়া, প্রকাণ্ড একখানা কাগজে অপূর্ব্ব আপন মনে কি সব লিখিতেছে; লিখিবার ভঙ্গী দ্রুত।

—বাবা!

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানা বিছানার নীচে ভাজ করিয়া রাখিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

—অনেক রাত হ'য়েচে বাবা, খাবেন চলুন।

বাঁশের আল্‌না হইতে চাদরখানা লইয়া, ছাতিটা লইতে লইতে অপূর্ব্ব বলিল—আমি খাবো না বউমা, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গে। মাণিক খেয়েচে?

—না। কিন্তু ছাতা-চাদর নিয়ে, এই রাত্রে কোথায় যাবেন?

—যে দিকে দু'চোখ যায়।…যেখানে নিজের ছেলের ওপর জোর চলে না, সেখানে আর থাকবো না আমি। মাণিক আজ অপমান ক'রেছে।…আমি চ'ল্‌লাম মা—

রূঢ় চীৎকার করিতে করিতে মাণিক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বলি, মাণিক তোমার কী অপমান করেছে? তোমার রক্ত জল করা পয়সা নিয়ে মদ খেয়েছি আমি? জুয়ো খেলেছি, দু'হাতে বিলিয়েছি? কী ক'রেছি?…যা খুসী তোমার করো গে! ভেবেছিলাম ভালো হবে, হ'লো মন্দ!…তোমার ঘর-সংসার ছেড়ে তুমি কেন যাবে! রাত পোহালে আমরাই বিদেয় হ'য়ে যাবো।…এই নাও চাবি, সমস্ত টাকা তুমি বিলিয়ে দাও গে; স্কুল কেন, গাঁয়ে কলেজ হোক্—হাঁসপাতাল হোক—শুঁড়ির দোকান বসুক,—যা খুসী তোমার—

মাণিক আর কথা বলিতে পারিল না। লোহার সিন্দুকের চাবিছড়া পিতার সুমুখে ফেলিয়া দিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। তারপর একখানির পর একখানি করিয়া হিসাবের খাতাপত্রগুলি গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব তখন রাগ অভিমান ভুলিয়া গেছে। উপবাসী ভিক্ষুক আহার্য্য পাইলে যে-ভাবে লুফিয়া নেয়, ঠিক তেম্‌নি ভাবেই চাবিছড়া কুড়াইয়া লইয়া, ও লোহার সিন্দুকটা খুলিল, এবং অনেকগুলি তাড়া হইতে একতাড়া দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া, পুনরায় সযত্নে সিন্দুক বন্ধ করিয়া দিল। তারপর চাবিছড়া পুত্রবধূর পায়ের গোড়ায় ছুঁড়িয়া দিয়া, দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।…মহাকাজের ব্যস্ততায়, ওর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে যেন!…

মাণিক পুনরায় সে-ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ডাকিল—বেরিয়ে এসো না?…কী হচ্ছে?…ও কি! হাতে চিঠি কিসের?

—প'ড়ে দেখ। বাবা লিখ্‌ছিলেন…আমি দেখেছি—

মাণিক পড়িল :—অযোগ্য স্বামীকে ক্ষমা কোরো কল্যাণী; জীবনে যা নিতে পারো-নি, মরণের পরেও তা নিতে তুমি পারলে না—

মাণিক কাগজখানা মুড়িয়া ফেলিয়া কহিল—একদম্ পাগল হ'য়ে গেছে। পাড়ার লোকেই এসব ঘটালে!…উঃ, হাজার টাকা…একশো খানা দশ-দশ টাকার নোট!…

যক্ষরাজ ধনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে। মনের উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া, অপূর্ব্ব নোটের তাড়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া সেইরাত্রেই বরাবর মাখনবাবুর সদর দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নোটগুলি হাতের মুঠায় লইয়া বারকতক অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল—'মাখন ভায়া।—মাখন ভায়া!—

কিন্তু নিজের স্বর ও-যেন আজ নিজেই শুনিতে পায় না। সুপ্তিমগ্ন পল্লীতে, মানুষে সে-ডাক শুনিল না।

অপূর্ব্ব ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ীতে নয়; বরাবর স্কুল-ঘরের দাবায় আসিয়া উঠিল। একখানি একখানি করিয়া একশোখানি নোট, একবার নয়, তিনবার গণিয়া দেখিল।—ঠিক আছে! কল্যাণীর স্মৃতি-তর্পণের উপচার অবিকল ঠিক আছে।

কিন্তু কল্যাণীর কথা মনে পড়িতেই, এই নিশীথ রাত্রে ওর মনে পড়িয়া গেল—বিগত যৌবনের যত কিছু ঘটনা! কল্যাণীর প্রেম, কল্যাণীর অমায়িক সারল্য!.. মনে পড়িলে কলিকাতার ঘটনা। হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারে-দ্বারে ভ্রমণ! একটি পয়সার জন্য কত না লাঞ্ছনা বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছে! মনে পড়িল—একদিন পাঁচটি পয়সার অভাবে, কল্যাণীকে দশটাকা মণি-অর্ডার করা হয় নাই!—একটি পয়সার জন্য কখনো কখনো এক জায়গায় এক ঘণ্টার ও বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। সেই ক্লেশার্জ্জিত অর্থ অদৃষ্টের বিধানে আজ হাজার হাজার!.. এক পয়সা যার কলিজার রক্ত ছিল, আজ সে অনায়াসে হাজার টাকা দান করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে!.. এ কি মানুষে পারে! ভিক্ষার্জ্জিত ধন ভিক্ষায় বিলাইয়া দেওয়া—এ কি ভিক্ষুকের কাজ? অপূর্ব্ব তো ভিক্ষুকই! ভিক্ষুক ধনী হইয়াছে,—দাতা সাজিয়াছে আজ! আজ সে অর্থকে পরমার্থ জানিয়াও, পরমার্থকেই ধূলিমুষ্টির সামিল করিয়া…

অপূর্ব্ব আবার নোটগুলি গণিতে আরম্ভ করিল।…এক-দুই-তিন দশ…কুড়ি চল্লিশ!…ওর চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল সেই বাক্সটা! —'ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করুন.. বেকার জীবন-ভার বহনে ক্লান্ত আমি'—

মনে পড়িল—তখনকার অবস্থা!—ঘৃণিত—অতি-তুচ্ছ এক হোটেলে আহার…এক পয়সার ভাত—এক পয়সার তরকারী!.. গাড়ী-বারান্দায় রাত্রিযাপন!

হাতের নোটগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। অবকাশে শুকতারা নিষ্প্রভ, উদয়াচল রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে!

এখনই সূর্য্য উঠিবে, মাখনবাবু হয়তো অপূর্ব্বে বাড়িতে গিয়াই টাকার জন্য তাগাদা সুরু করিয়া দিবে!…

অপূর্ব্ব বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। ওর চলন-ভঙ্গী দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছিল।…

মাণিক সদর-দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল—শুষ্ক ম্লানমুখে পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া! শ্রান্তিতে পা দুইটা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

কহিল—দিয়ে এলে তো? কলেজ তৈরী হ'ল?…এইবার বাকী যা আছে, দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে দাওগে।

অপূর্ব্ব মিনিটখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সহসা মাণিককে জড়াইয়া ধরিল। তারপর পেটের কাপড় হইতে নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া, পুত্রের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—দিতে পারি নি মাণিক—দিই নি। এই দেখ্, সব ফিরিয়ে এনেছি!…

গুরু-দক্ষিণা

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিষ্য গুরুর পায়ে মাথা নোয়াইয়া সংসার প্রবেশের অনুমতি চাহিল।

গুরু হাস্যোজ্জ্বল-কণ্ঠে বলিলেন—"এতদিন কেবল শাসন আর সংযমের মধ্যে থেকে কষ্টই পেয়েছ বাবা, কিন্তু সংসারের পিচ্ছিল পথে তাই তোমার আশীর্ব্বাদ হবে। মনে রেখো, জীবনে ভোগ আপাত মধুর, কিন্তু সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য।

শিষ্য আর একবার গুরুপদে মাথা রাখিল। সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া গুরু হাসিয়া বলিলেন—"কিছু বলবে বাবা?"

শিষ্য হাত যোড় করিয়া বলিল—"কিন্তু গুরু-দক্ষিণা! আপনিই যে বলেছেন, বিনা দক্ষিণায় কার্য্য সিদ্ধি হয় না!"

গুরু হাসিলেন, বলিলেন,—সংসার প্রলোভনের রাজ্য, এ রাজ্যের অধিকারী স্বয়ং মহামায়া! তাঁকে কখন ভুল করেও ভুলে যেও না। জেনো, তাঁকে ছাড়লেই বিপদ। কলুষতা, মলিনতায় পথ ভরে' যাবে, অন্ধের মত তুমি তখন কলুষিত জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, রক্তের অক্ষরে এই কথাটা তোমার বুকে লেখা থাক, তাই আমার গুরু-দক্ষিণা।

শিষ্য বিভ্রান্ত, এও যে অমূল্য উপদেশ, দক্ষিণা কি করিয়া!

গুরু বলিলেন—"কিছু না দিয়ে মন উঠছে না তবু, না বাবা? বেশ, ওই গাছ থেকে একটা আম পেড়ে এনে দে।"

শিষ্য কাঁদিয়া ফেলিল। পার্শ্বে গুরুপত্নী দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন—"কাঁদ্‌ছিস কেন বাবা?"

শিষ্য হাত জোড় করিয়া বলিল—"গুরুর ধনেই গুরু-দক্ষিণা দেব মা, এত বড় অভাগাই বটে আমি। কিন্তু, এ দিন কি থেকেই যাবে, কোনদিন কি কিছু পাব না।

গুরু কি বলতে গেলেন, কিন্তু গুরুপত্নী বাধা দিয়া বলিলেন—"উনি ব্রাহ্মণ, জীবনে কোন কিছু চান নি, আজও চাইবেন না। আমি তোর গরীব মা, আমায় দিস, উনি নেবেন না।"

শিষ্য উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—"কি দেব মা, আদেশ করুণ?"

মা হাসিলেন, বলিলেন—"হাতি, ঘোড়া, রাজ্য-পাট, আর কি দিবি?"

শিষ্য প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। গুরু গম্ভীর হইলেন।

বাদশার দরবার!

আমীর-ওমরাহ যোগ্য আসনে আসীন। বাদশা প্রীতকণ্ঠে এক সৌম্যকান্তি যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমার নক্ষত্র জগতের আজ পরীক্ষা যুবক, কেমন প্রস্তুত?

যুবক জ্যোতিষী হাসিয়া বলিল—"আমিও প্রস্তুত বই কি সাহান-শা।

বাদশা কৌতুক ভরে বলিলেন—"কিন্তু ও লোক ঠকাবার ফন্দীতে আমার বিশ্বাসই নেই, কেন ঠক্‌বে?"

যুবক কিন্তু অটল, ধীরকণ্ঠে জানাইল—যত

তুচ্ছই হ'ক, এর দাম দেবার ক্ষমতা বাদশার ভাণ্ডারেও নাই। বাদশা বলিলেন—"বল ত এখান থেকে উঠে আমি কোথায় যাব ?"

যুবক হাসিয়া বলিল—' মাছ ধর্‌তে।

বাদশা বিস্মিত হইলেন, কারণ এখন পর্য্যন্ত কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন—"বেশ, তোমার খড়ি এবার পাত, বল সেখানে কি পাব ?"

যুবক ত্বরিতকণ্ঠে বলিল—"একটা পাখী।"

চারিদিকে উচ্চহাস্যের হিল্লোল বহিয়া গেল। একজন ওমরাহ পরিহাস ভরে বলিলেন—"এই বিদ্যে নিয়ে তুমি বাদশার দরবারে এসেছ ? মাছ ধরতে গিয়ে কেউ কখন পাখী পায়, আচ্ছা পাগল ত !"

যুবকের উজ্জ্বল চক্ষু আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"আমি বলছি, এ-যাত্রার ফল উনি চিঁড়িয়া নিয়ে ফিরবেন, যদি না হয় আমি সাজা মাথা পেতে নেব।"

দরবারের চারিপার্শ্বে আর একবার হাস্যের হিল্লোল বহিয়া গেল। সবার কণ্ঠেই বেশ সুস্পষ্ট স্বর বাহির হইয়া আসিল—"পাগল।"

গণনার ফল কিন্তু মিথ্যা হইল না। মৎস্য শীকারে গিয়াও সাহান-শা এক পাখী লইয়াই ফিরিলেন। যত ওমরাহ বিস্ময়ে অবাক হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা এই—ছিপ ফেলিয়া বাদশা অপেক্ষা করিতেছিলেন, ফাৎনা ডুবিতেই সজোরে টান দিয়া ব্যঙ্গভরে বলিলেন—"এই নাও বিহারী জ্যোতিষীর গণনার ফল।"

কথাটায় সকলেই হাসিল। দরবারের বোধ হয় এই রীতি।

কিন্তু আশার ফল ফলিল বিপরীত। মাছ পলাইয়া বাঁচিল। বঁড়সী গিয়া বিঁধিল, গাছের এক সুকণ্ঠ পাখীর দুই ডানার মধ্যস্থলে। যেন বাদশার এ উপহাসকে উপহাস করিতেই সুন্দর সুশ্রী পাখীটি নামিয়া আসিল।

বাদশা চকিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া হাঁকিলেন—"কে আছ, জ্যোতিষীকে আটকাও।

একজন হিন্দু ওমরাহ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"বান্দা অনুমতির অপেক্ষা করে নি, দোস্তকী মাপ কি জিয়ে, আমি আহার ও বসবাসের স্থান দিয়ে তাকে আট্‌কেছি ?"

বাদশা প্রীত হইলেন। ওমরাহের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন, বাদশার হাতের পান মিলিল।

বাদশা হাসিয়া পাখীটার দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"এটা আমাদের উপহাসের দণ্ড, বেহারী জ্যোতিষী—"

কথাটা কিন্তু শেষ না করিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। সেদিন মৎস্য শীকার এই পর্য্যন্ত।

পরদিন দরবারে বসিয়া জ্যোতিষীর অভ্যর্থনাই আগে হইল। তারপর আসন্ন বিদ্রোহ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মন্ত্রনা চলিল তাহারই সঙ্গে, গতদিন যাহাকে সমস্ত সভাস্থল পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল।

বিদ্রোহ প্রশমনের ফল তাম্র অনুশাসন জ্যোতিষীর ভাগ্যে রাজ্যপাটই আনিয়া দিল। বাদশা হাসিয়া বলিলেন—"দান সামান্য, কিন্তু আশা করি তুমি এতে সন্তুষ্টই হবে।"

যুবক গম্ভীরমুখে বলিল—"কিন্তু এ আমি রাখতে পারব না, দেনা আছে।

সকল কথা শুনিয়া বাদশাহ চকিত হইলেন এবং যুবকের প্রার্থনা মত তার মাহজনের নামেই রাজ্যপাট লিখিয়া দিলেন।

গুরুপত্নী তাম্রশাসন হাতে পাইয়া বলিলেন—"এ কি গয়না বাবা, কোথায় পরব ?"

কিন্তু জবাবটা শিষ্য দিল না, দিলেন গুরু নিজে; বলিলেন—"তোমার চাওয়া রাজ্য পাট গিন্নি। আর আমার উপযুক্ত শিষ্যের আদর্শ দক্ষিণা। পরবে সর্ব্বাঙ্গে, কেন না রাজ্য শাসনের দুশ্চিন্তায় তোমায় বেশ একটু চঞ্চল করে তুলবে, তোমার অন্তর যা' চেয়েছিল পেয়েছ, ভোগ কর!"

গুরু-পত্নী ব্যাগ্র কণ্ঠে বলিলেন—"ক বিঘে বাবা, আহা, শিষ্যদের শুখ্‌নো মুখ আর দেখতে হবে না। বেচারীরা দু'বেলা খেয়ে বাঁচ্‌বে, ক'বিঘে বাবা?"

গুরু বলিলেন—"ও বিঘের হিসেব দিতে পারবে না। তবে তোমার বংশই রাজাধিরাজ উপাধী পেয়ে এক নদী থেকে অন্য নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের মালিক হ'য়েছে।

গুরু-পত্নীর মুখ শুকাইল, ত্রস্তে বলিলেন—"না না, এতয় আমার কি কাজ, সামান্য কয় বিঘে আমায়—"

শিষ্য হাসিল—বলিল, "দান প্রতিগ্রহ পাপ; আমি ত নয়ই, আমার বংশেরও কেউ মাথা পেতে নেবে না মা, এসব আপনারই।"

গুরু হাসিলেন। গুরুপত্নী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হাঁ গা, এত কষ্টে পাওনা ও কি কিছুই নেবে না।"

গুরু বলিলেন—"না, তবে তুমি বা তোমার ভবিষ্যৎ বংশ এ পরিবারের কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবে। হাজার বিঘে গুরুদাসপুর ওর বংশের হ'য়ে শাসন তোমার বংশই করবে, কিন্তু প্রতিপালিত হবে ওর বংশ। কেমন বাবা, এটা ত দান প্রতিগ্রহ নয়, গুরুর আশীর্ব্বাদ!

শিষ্য কথা বলিতে পারিল না, গুরুর পায়ের উপর সটান লুটাইয়া পড়িল।

রহস্যের রঙমহল

শ্রীবাসব বর্ম্মা

তরুণ সবেমাত্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে; হাত-মুখ ধুইবার অবকাশও পায় নাই। এক ভদ্রবেশধারিণী বৃদ্ধা দ্বারে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি যা' বলিলেন, তাহা এই—

সহরের সর্ব্বজন পরিচিত ধনী মহম্মদ রুকাইন ইসাক্। বৃদ্ধা তাহারি পালন কর্ত্রী, নাম হামিদা রৌজিয়া। সবাই জানেন ইসাক্-সাহেব আজও অবিবাহিত; কিন্তু তাঁহারই গৃহ হইতে একটী যুবতী নারীর অপহরণ সংবাদ বহন করিয়াই বৃদ্ধা পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছেন।

জিজ্ঞাসার উত্তরে হামিদা বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ, কাল ঠিক্ বারটার সময় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সলিমার ঘর আমার পাশেই; সে এ বাড়ীতে পাচিকার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তার ঘরে পুরুষের কঠোর স্বর শুনে আমি বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। দরজায় কাণ রেখে বুঝ্‌লুম, গলা একজনের নয়, দু'জনের। আমার মনে হয়,—তারাই বেচারীকে খুন করেছে।"

তরুণ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সন্দেহের কারণ?"

হামিদা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "কারণ, তারপর আর তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সে ত এ বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। সলিমা নিজের ইচ্ছে যে যায় নি, এটা আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি। তারাই তা'কে নিয়ে গেছে।"

এত জোর দিয়া তিনি কথাগুলা উচ্চারণ করিলেন যে, তরুণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতটা দৃঢ় সিদ্ধান্তের কারণ, তার সঙ্গে এ বাড়ীর কোন সম্বন্ধ ছিল না কি?"

অধৈর্য্যভাবে হাসিয়া বলিলেন, "না, না, না! কেবল অনাথা জেনেই একথা বলছি। তিনকুলে যার কেউ কোথাও নেই, সে যাবে কোথায়? তা' ছাড়া, বাইরের আবহাওয়া তার মোটেই পছন্দ নয়। আর জানেন ত, আমাদের ঘরে পরদানশীন মহিলার পথ চারিদিক দিয়েই বন্ধ?"

তরুণ হাসিল; কোন কথা কহিল না। সহচর এবং ছাত্র গুণধর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথাগুলা বেশ মনোযোগ দিয়াই শুনিতেছিল। সে বলিল, "এই যে বললেন, সে আপনাদের ওপানে রাঁধুনীগিরি করত—তবে?"

হামিদা অস্থির-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আর কিছুই নয়, তার মত মেয়েকে আমি এত ছোট কাজ দিতে পারি নি। ব্যস, যাক্—এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু কথা তুলবেন না। তাকে খুঁজে বের করে' দিন—আমি কেবল এইটুকুই চাই! অবশ্য স্থায্য ইনাম-বক্‌শিসের অভাব হবে না।"

তরুণ আবার হাসিল। গুণধর বলিল, "ইনাম-বক্‌শিস দেবেন কে? ইসাক্ সাহেব, না আপনি?"

হামিদা আরও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "না না, তিনি নন; আমি, আমি! আমার যথাসর্ব্বস্ব তা'কে ফিরিয়ে পাওয়ার বদলে যদি খরচা হ'য়ে যায়, আমি তা'তেও রাজী।

ইসাক্‌সাহেব তার বাড়ীর কোন আশ্রিতেরই খোঁজ-রাখেন না।

গুণধর বিস্মিত-নেত্রে তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়া দিল; কিন্তু তরুণ কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখাইয়া বলিল, "মেয়েটী যেখানে ছিল, সে স্থানটা অন্ততঃ একবার দেখা দরকার। সে বিষয়ে সুবিধা হবে কি?"

বৃদ্ধ বেশ উত্তেজনার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ঠিক সেই ভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "এটা কি একান্ত দরকার মনে করেন?"

গুণধর হাসিয়া বলিল, "আপনার কোন খবর না নিয়ে যদি আমরা তা'কে বের করে' দিতে পারতুম, তা' হ'লে একটা অলৌকিক জ্যোতিষীর কাজ করা হ'ত হয় ত; কিন্তু না, আমরা তা' প্যারি না।"

হামিদা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন; পরে তরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চলুন।"

তিনজনে ইসাক্‌-সাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিলেন। তারপর পশ্চাতের একটা দ্বার খুলিয়া কয়জনে খুব সতর্কতার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তরুণ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; একস্থানে দাঁড়াইয়া বেশ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। গুণধর কিন্তু অস্থির চরণে সূত্র অনুসন্ধানে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। খানিক পরে অস্থির-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "এ খুন, জানেন? এই দেখুন রক্তের দাগ।"

উদাস-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তরুণ বলিল, "তাই না কি! তা' হ'লে লোকগুলো ত ভারী বাহাদুর; মড়া বয়ে' ওই বাঁশের ভারা বেয়ে নামতে পেরেছে!"

দৃষ্টি কিন্তু তাহার তখনও এদিক-ওদিক ঘুরিতেছে। পরে হঠাৎ বড় দেরাজ-আরসীখানার কাছে আসিয়া টানা খুলিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন পরীক্ষা করিতে লাগিল। গুণধর কিন্তু আপনার ভাবেই উন্মত্ত। বরাবর রক্তের চিহ্ন ধরিয়া সে পাশের একটা বারান্দা এবং সেখান হইতে তরুণের কথিত বাঁশের ভারার কাছে গিয়া মুখ ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল আর কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না। বৃদ্ধা হামিদা খুনের নাম শুনিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা সোফার উপর পড়িয়া গেলেন। তারপর উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া সেই যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তরুণের সন্ধান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর নড়িলেন না।

গুণধর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তরুণবাবু কোথায়?"

বৃদ্ধা চমকিয়া চক্ষু খুলিলেন, চারিদিকে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া হতাশ-কণ্ঠে বলিল, "কই, জানি না ত!"

নীচ হইতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল; পদশব্দ একের নয়, দুই জনের। পরক্ষণেই ইসাক্‌-সাহেবের সহিত তরুণকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা হামিদা ভয়ে একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! তরুণ কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে প্রশ্ন করিল, "এই ঘরে যে মেয়েটী থাকত, কাল থেকে তা'কে পাওয়া যাচ্ছে না—জানেন বোধ হয়?"

বিরক্ত ইসাক্ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "না, কোন মেয়ের খোঁজ রাখবার মত সময় বা মন আমার নেই। আর বাড়ীতে কে থাকে না থাকে, সেটা বুড়ী হামিদাই জানে, আমি নই।"

তরুণ আবার হাসিল; বলিল, "মাপ

করবেন ; এই টানার ভেতর যে পোষাক রয়েছে, তার অধিকারিণীর খোঁজ আপনি কি কখন রাখা উচিত মনে করেন নি ?"

ইসাক্ প্রচণ্ড-কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বলছি ত না, না, না !"

"তা' হলেও আপনার একবার দেখা দরকার।" বলিয়া তরুণ পাশের দেরাজের টানাটা টানিয়া খুলিবার মুখে বুড়ী হামিদা রাক্ষসীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমাদের সমাজের মেয়েদের সম্ভ্রম পুরুষ হ'য়ে আপনারা নষ্ট করবেন না।"

কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার পূর্ব্বেই তরুণ একটা পোষাক বাহির করিয়া ইসাক্-সাহেবের সম্মুখে ধরিল। হঠাৎ ইসাকের রুক্ষদৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল ; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কয়েক পদ হটিয়া গিয়া বলিলেন, "বলেছি ত ফুফু হামিদাকে জিজ্ঞেস করুন ; এ সম্বন্ধে আমার কাছে কোন কথা জান্‌তে চাওয়া বৃথা। যাক্, আপনার প্রশ্ন শেষ হ'য়েছে বোধ হয় ; আমার অনেক কাজ।"

তরুণ হাসিল এবং ভদ্রভাবে ইসাক্-সাহেবকে সেলাম দিল। তারপর হামিদার দিকে চাহিয়া বলিল, ফুফু হামিদা, আমি বাড়ীর দু'-একজন দাসীকে চাই।"

হামিদা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীর দু'-একজন খুব বিশ্বাসী পরিচারিকা ছাড়া তা'কে ত বড় একটা কেউ দেখেই নি।"

তরুণ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "সেই দু'-একজন হ'লেই চলবে।"

হামিদা বোধ হয় মনে বেশ বিপদ অনুভব করিলেন ; খানিক ইতস্ততঃ করিয়া একজনকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "একে জিজ্ঞেস করুন, কিছু কিছু এ বল্‌তে পারবে ; কারণ, তার ঘরের অনেক কাজ এই করত।"

গুণধর ব্যঙ্গপূর্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চাকরাণীর আবার চাকরাণী, আশ্চর্য্য ত !"

পরিচারিকা মতি বেশ সাহসের সহিত বলিল, 'সে এ বাড়ীর চাকরাণী মোটেই ছিল না সাহেব, আশ্রিতা। অমন মেয়ে বেগম হবার উপযুক্ত, দাসী নয়। আমিই তাঁর বাঁদী ছিলুম।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "বল ত মেয়েটীর চেহারা কেমন, লম্বা না বেঁটে, অন্ধ না ট্যারা ; আর বিশেষ করে' বল তার চুলের রং ?"

মতি একটু ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টিতে এ দু'টি আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার বিবি বেরাণী যেমন সুন্দরী, এমন সুন্দরী জগতে দুর্লভ ! আপনি কি বল্‌ছেন, 'গুলেস্তাঁতে'ও অমন মেয়ের তুলনা মেলে না ! হাঁ লম্বা, কিন্তু তালগাছ নয় ; চেহারা অনুপাতে অতটুকু না হ'লে—"

তরুণ সহসা জানালার সাসির একস্থানে হাত দিয়া বলিল, "মাথায় এতটা ছিল, না ?"

মতি বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি দেখেছেন ?"

তরুণ উত্তর না দিয়া বলিল, "হাঁ, গায়ের রং দুধে আলতায় ; সবার ওপর মুখশ্রী দেখলেই মনে হয়, বুঝি বড় ছেলেমানুষ ; কিন্তু একটু বিষণ্ণ—কিসের একটা চিন্তার ঘোর সকল সময়েই যেন লেগে আছে ?"

পরিচারিকা বলিল, "ব্যস, ব্যস, নিশ্চয় আপনি তা'কে দেখেছেন !"

তরুণ বলিল, "চোখ দু'টি বড় চমৎকার, যেন তুলি দিয়ে আঁকা ; চাঞ্চল্য কিন্তু একটুও নেই। মাথার চুল সোনালী বা বাদামী ?"

হাঁফ ছাড়িয়া বৃদ্ধা হামিদা ফুফু বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল ! আপনি তা' হ'লে তা'কে দেখেন নি।"

মতিও বলিল, "না, আমার বেরাণী বিবির চুল ঘোর কাল ; এত কাল আর এমনি ঘন ও

বড় যে, পায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম দেখে ভাবতুম, এত চুলও মানুষের হয়!"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "থাক্, আমাদের এখনকার মত কাজ শেষ হয়েছে।"

দুই

তরুণের আজ্ঞায় গুণধরের উপর ইসাক্-সাহেবের বাড়ী চৌকী দিবার ভার পড়িল। বেচারী কিছুই বুঝিল না; কিন্তু উপরওয়ালার আদেশ অবহেলাও করিতে পারিল না। চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া একখানি ছোট ছুরি সে খোলা ময়দানে কুড়াইয়া পাইল। আর বিটের পাহারাদারের কাছে শুনিয়া আসিল, গত রাত্রে, আন্দাজ তখন দুইটা, দুইজন পুরুষের সহিত একটী স্ত্রীলোককে সে মাঠে বেড়াইতে দেখিয়াছে। তাহার সাড়া পাইয়া পুরুষ দুইজন দুই দিকে ছুটিয়া পলাইল; আর স্ত্রীলোকটি যেন আশ্বাসিত হইয়া ইসাক্-সাহেবের বাড়ীর ফটকের নিকট গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর হয় ত বা ভীত হইয়া আবার ছুটিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল। কারণ জানিবার জন্য স্বকুল মিঞা নিকটে আসিয়া দেখিল, জানালা ধরিয়া স্বয়ং ইসাক্-সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। চাঁদের আলোয় যতটা বোঝা যায় তাঁহার মুখখানা যেন একেবারে রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

গুণধরের মুখে আগন্ত শুনিয়া তরুণ প্রফুল্লভাবেই মাথা নাড়া দিল। গুণধর অবাক্-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিছু বুঝলেন কি?"

তরুণ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "এইবার কাজে নামতে হবে। দেখে এস গুণধর, ইসাক্-সাহেবের বাড়ীর কাছাকাছি কোন ঘর বা সমস্ত বাড়ীটাই ভাড়া পাওয়া যায় কি না।"

গুণধর পুনরায় বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার মানে; খুনে কি এখনও ওই বাড়ীতে আছে মনে করেন?"

তরুণ হাসিল; বলিল, "একখানা পকেট ছুরি দিয়ে একটা মানুষ খুন হয় না গুণধর! তুমি যা' ভাবছ, এ তা' নয়।"

গুণধর চঞ্চল-চক্ষু তুলিয়া বলিল, "কিন্তু রক্ত, আপনিও তা' স্বচক্ষে দেখেছেন?"

তরুণ উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, "তোমার আমার মনে ধোঁকা দেবার জন্যে ওটা মিথ্যে বলেই মনে হয়। যাই হোক্, এখন আমাদের কাজ করা দরকার।"

দুইজনে তখন ছদ্মবেশে বাহির হইয়া একটা বাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীটার বাহিরের দিকের একটা ঘরে তালা লাগান। গুণধর আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তরুণ নিজের পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল; পরে বেশ সহজ-কণ্ঠেই বলিল, "এইখান থেকেই তুমি অকুস্থানের ওপর দৃষ্টি রাখ্‌তে পারবে, কি বল?"

গুণধর আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এর মধ্যে এ ঘর ভাড়া নিলেন কখন?"

তরুণ শুধু একটু হাসিল। কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গুণধর বিরক্ত-চিত্তে আপন-মনে বকিতে লাগিল, "নিজের লোকের কাছেও কিছু ভাঙবেন না! কি জন্যে যে রেখে গেলেন, বুঝ্‌লুম না; শাস্ত্রী হ'য়ে কার বা কোন জিনিষের ওপর পাহারা দেব তাও জানি না। না, কোনদিন যদি মনের ভাব ধরতে পারি!"

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহণে ইসাক্-সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুণধর চঞ্চল-চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আপন-মনে বলিল, "যদি এঁর পেছু নেবার জন্যে রেখে গিয়ে থাকেন ত

অসম্ভব ; মানুষ কখন ঘোড়ার সঙ্গে সমানে তাল রেখে চল্‌তে পারে !"

ঘণ্টা কতক বাদে ইসাক্ ফিরিয়া আসিলেন—বিষণ্ণ, চিন্তামগ্ন ! খানিক পরে তরুণ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুণধর জিজ্ঞাসা করিল, "মানে ?"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "চোখ থাকলে অনেক কিছুই দেখতে পেতে গুণধর ! সে দৃষ্টি তোমার নেই ; কাজেই মানে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তোমায় বোঝাবার সময়টা আমার অনুসন্ধানের পেছনে লাগালে বেশী কাজ হবে।"

গুণধর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার এখানে থাকার কর্ত্তব্যটা অন্ততঃ আমায় বুঝিয়েও ত দেওয়া দরকার ?"

তরুণ বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কেন এতদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছ বলতে পারি না। কপালের ওপর অত বড় বড় চোখ ছুটো থেকেও নেই। প্রত্যেক কথার মানেই যদি বোঝাতে হয়, তা' হ'লে একটা গাধাকেও রাখলে চলে। যাক্, শোন, ক'জন বাড়ীর কাছে আসে, ক'জন বেরোয়, এ খোঁজ রাখবে। নিত্য আমায় তার হিসেব দেবে। আর দেখবে, তোমাদেরই মত আর কেউ এ বাড়ীটা চৌকী দিচ্ছে কিনা।"

গুণধরের বড় ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, চৌকী দিবার লোক তাহারা ছাড়া আর কেউ আছে না কি ? কিন্তু ভর্ৎসিত হইবার ভয়ে সে কথা বলিতে সাহস করিল না। তরুণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল ; বলিল, "তোমার মনের কথা যা', তা' বুঝেছি। হ্যাঁ আছে ; আর তারই ঠিকানা আমাদের জান্‌তে হবে।"

গুণধর চুপ করিয়া রহিল। তরুণ আপনমনে বলিয়া চলিল, "জাল আমারই অনুকূলে গুড়িয়ে চলছে ; বেশ বুঝ্‌ছি, যা' ভেবেছি, তাই। আচ্ছা, দেখা যাক্।"

তারপর গুণধরকে কহিল, "খাবার ঢাকা আছে খেয়ে শুয়ে পড়। আমি নিজেই পাহারায় রইলুম।

ঘণ্টা তিনেক বাদে কি একটা শব্দে হঠাৎ জাগরিত হইয়া গুণধর দেখিল, তরুণ তাহার নির্দ্ধারিত স্থানে নাই। তাহার আর বিশ্রাম করা চলিল না ; লাফাইয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দূরে কে ছুইজন চলিয়া যাইতেছে—উভয়েরই ছদ্মবেশ। পিছনের লোকটী বোধ হয় খঞ্জ ; কিন্তু পথ চলিতে বড় ওস্তাদ।

ভোরের আলো পূর্ব্ব গগনে ফুটিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিল, আগে ইসাক্, পশ্চাতে অনেকখানি দূরে সেই খঞ্জ বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। উভয়েই শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। ইসাক্ নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ; খঞ্জ তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

প্রশান্ত-মুখে তরুণ গৃহে আসিয়া বলিল, "আমায় ওরা চিঠি পাঠিয়েছে গুণধর, এই দেখ।"

সাগ্রহে পত্রখানি হাতে লইয়া গুণধর উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া দেখিল; তারপর পড়িতে লাগিল। তরুণ গোয়েন্দা, লোকে নাম কিংবা টাকার জন্যে এ রকম মানুষের পিছনে কুক্কুরবৃত্তি করিতে ছুটে। তোমার চাই কি ? নাম, তোমার যথেষ্ট আছে ; সুনাম, ইহা অপেক্ষা পাইবে না, এটা নিশ্চয় ; অর্থ, কত চাও ? আমরাই দিব। নিবৃত্ত হও।"

তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া গুণধর বলিল, "এ চিঠি কোথায় পেলেন ?"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "সেটা না শুনলেও আপাততঃ চলবে। শুধু এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, জাল দুর্ভেদ্য নয়। সতর্ক চক্ষু রাখ ; আসামী খুব বেশী দূরে নেই।"

গুণধর দেখিল, তরুণের মুখে-চোখে কেমন

একটা অদ্ভুত জ্যোতি! সে দৃষ্টির নিকট যেন কোন কিছুই লুকাইয়া ছাপাইয়া থাকিতে পারে না। সে ধীরকণ্ঠে বলিল "একটু বিশ্রাম করলে হ'ত না; আবার চল্‌লেন যে?"

তরুণ বেশ হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠেই বলিল, "কাজ আগে, বিশ্রাম পরে। যেটা কর্‌তে হবে, সেটা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আরাম করা মরদের কাজ নয়।"

তাহার গতিশীল চরণ বাহিরের পথে মিলাইয়া গেল। গুণধর গবাক্ষ-পথে চাহিয়া দেখিল, ইসাক্-সাহেব প্রায় ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন; পশ্চাতে একজন মুসলমান ফকির। সে পথে গাড়ীর চলাচল খুবই কম; কাজেই বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রতিহত হইল না। গুণধর আরও দেখিল, পশ্চাতের ফকির খুব সতর্ক; কারণ, ইসাক্-সাহেব হঠাৎ একবার কি ভাবিয়া পশ্চাতে চাহিলে ফকির একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিল। তারপর এমন ভাবে পশ্চাৎ অনুসরণ করিল যে, ইসাক্ নিজের সন্দেহটার উপরেই সন্দেহ করিয়া মাথা নাড়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিন

বর্দ্ধমানে আসিয়া ইসাক্-সাহেব নামিয়া পড়িলেন। তরুণ প্রস্তুতই ছিল; সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিল না। কিছুদূরে একটা দোকানে আসিয়া ইসাক্-সাহেব পান-আহার করিয়া লইলেন। তরুণও সম্মুখের এক দোকান হইতে কিছু সীতাভোগ কিনিয়া জলযোগের পালাটা সারিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিল; যদিও হিন্দু-হোটেলের সাইনবোর্ড সম্মুখেই ছিল, কিন্তু ইসাক্‌কে চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে হইবে ভাবিয়া সেখানে যাইতে ভরসা করিল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ইসাক্-সাহেব গিয়া একটা বাসে উঠিলেন। তরুণ প্রস্তুতই ছিল; সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই গাড়ীতে 'সফারে'র পার্শ্বে গিয়া বসিল। ভাগ্যে বাসে আরও অন্যান্য যাত্রী ছিল, তাই ত তাহার সে কার্য্যটা লোকের উপেক্ষার মধ্যেই রহিয়া গেল; কাহারও মনে সন্দেহ জাগিল না।

ক্রমে ক্রমে সকল যাত্রীই নামিয়া গেল। সফার পিছনের দিকে চাহিয়া ইসাক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদূর যাবেন?"

ইসাক্ যাহা বলিলেন, তাহা বেশ মনোযোগ দিয়া তরুণ শুনিয়া লইল। তাঁহার কথার উত্তরে সফার যখন বলিল, "আমার বিট্ অতদূর নয়; তা' ছাড়া, অতটা যেতে হ'লে দু'-তিন স্থানে থানা পড়বে। এখনকার ফাঁড়ী বড়ই শক্ত বাবুজী! লাইসেন্স নিয়ে ভারী টানাটানি করে; কাজেই আমি যেতে পারব না।"

ইসাক্ হতাশ-কণ্ঠে বলিলেন, "তবে উপায়? আমার যে যাওয়াই চাই!"

সফার বলিল, "এক কাজ করলে পারেন; আমি এক জায়গায় আপনাকে তুলে দেব,যেখানে ঘোড়া ও সাইকেল ভাড়া পেতে পারবেন। সেখান থেকে গেলে আপনার সুবিধেই হবে; তাই ভাল—কি বলেন?"

ইসাক্ স্বীকার করিলেন। তরুণের দিকে চাহিয়া সফার তখন বলিল, "আপনি?"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমাকেও সেই ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। আমি আরও দু'গ্রাম দূরে যাব, অনন্তপুর।"

অনন্তপুর বলিয়া সত্যই কোন গ্রাম আছে কি না তরুণের তাহা জানা ছিল না; কিন্তু কথাটা বেশ গম্ভীরভাবেই শুনাইয়া দিয়া সে আঁটিয়া-সাঁটিয়া বসিল। আরও ক্রোশ দুই যাইবার পর সফার বলিল, "এইবার আপনাদের নাবতে হবে। এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলে বেঁটে বসরু বলে' একজন লোক ভাড়া দেয়। বেশী দূর নয়; রসি

দুই পথ। দেখছেন ত রাস্তাটা কত সরু; গাড়ী চলবে না।"

তরুণ ও ইসাক্ নামিয়া পড়িয়া ভাড়া চুকাইয়া দিল। সফার গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অল্প কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তরুণ স্পষ্ট অনুভব করিল, একটা গুলি তাহার মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। সে ফিরিয়া দেখিল, বিকট হাস্যের সহিত সফার গাড়ীর পাশ হইতে নিজের দেহটা টানিয়া লইতেছে।

আরও খানিকটা যাইবার পর আবার একটা গুলি আসিয়া তরুণের বাহু বিদ্ধ করিল। সে সতর্ক থাকিয়াও সে আঘাত এড়াইতে পারিল না। ইসাক্ কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া গম্ভীর ভাবেই পথ চলিয়াছেন; দুই-দুইবার যে বন্দুকের শব্দ হইল, তাঁহার সেদিকে খেয়ালই নাই। তরুণ বেশ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল,সে ভাব তাঁহার ছলনা নয়। সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া একবার দাঁড়াইয়া হাতটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইল; তারপর আবার অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিল।

বেঁটে খসরুর নিকট হইতে ঘোড়া লইয়া ইসাক্-সাহেব বাহির হইতেছিলেন। তরুণও একখানা সাইকেল লইল। খসরু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজীর নাম?"

যাহা হউক একটা নাম ও ঠিকানা দিয়া তরুণ অগ্রসর হইল। ইসাক্-সাহেব ততক্ষণ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

মধ্যপথে খসরু কিন্তু গণ্ডগোল বাধাইল। অন্য একখানা সাইকেলে চড়িয়া সে পিছনে আসিয়া বলিল, "না বাবুজী, আমি আপনাকে ভাড়া দেব না; আমার সাইকেল দিন।"

তরুণ কুপিত-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মানে?"

লোকটা থতমত খাইয়া বলিল, "আপনি ত লোক ভাল নন; আমার সন্দেহ হয়, আগের লোকটীকে ধাওয়া করে' চলেছেন—উদ্দেশ্য কি তা' আপনিই জানেন। আপনাকে আমি প্রশ্রয় দিতে নারাজ।"

তরুণ হাসিল; বলিল, "তোমার মতলব খাঁটি সাধু; কিন্তু ধারণা ভুল। আমি যাব অন্যদিকে। যাও, আর ত্যক্ত করো না।"

খসরু কিন্তু এমনভাবে চাহিল যে, সে ঝগড়া বাধাইতে প্রস্তুত। কাজেই তরুণকে একটু বিপদে পড়িতে হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, গেঁও লোকের স্বভাব ত এরকম নয়, তবে!

ভাবিবার কিন্তু সময় তখন নয়—ইসাক্-সাহেব দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যান; কাজেই খসরুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ফেলিয়া দিয়া সে সাইকেল ছুটাইয়া দিল। তাহার সে হাওয়ার গতিতে ইসাকের অশ্ব বেশীক্ষণ চক্ষু অন্তরালে রহিল না।

ইসাক্ সোজা পথে চলিয়াছেন, তরুণ তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষেতে নামিয়া পড়িল—কেন না, স্থানটা এত সঙ্কীর্ণ যে, সেখানে নিজের আত্মগোপন একেবারেই অসম্ভব। খানিকটা তফাতে একখানা ভাঙাবাড়ী দেখা যাইতেছিল; গ্রাম কিন্তু সেখান হইতেও মাইলখানেক দূরে। সেই পোড়ো-বাড়ীটার কাছে আসিয়া ইসাক্-সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া নামিলেন। কি যেন পরীক্ষা করিলেন; তারপর হতাশ-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া মাথা নাড়া দিলেন। তারপর বিমর্ষ-মুখে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিলেন।

তরুণ কিন্তু এবার আর অনুসরণ করিল না; নিজের সাইকেলটা ঘুরাইয়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল, কপাটে তালা বন্ধ। সাইকেল রাখিয়া সে তখন বাড়ীটার চারিদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিল, ভাঙা হইলেও

প্রবেশ করা কঠিন; উচ্চ প্রাচীর বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে একস্থানে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ হেলিয়া ভিতরের দিকে গিয়াছে। তরুণ সেই পথ অবলম্বন করিয়া বাড়ীর উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

বাহিরের মত ভিতরও শব্দহীন; তবুও তরুণ সতর্ক হইতে ভুলিল না। উপর নীচে খুরিয়া সে কয়টা দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িল! একটার অনুসন্ধানে অন্য একটা বড় জাল নোটের কেস বাহির হইয়া পড়ায় সে বেশ উৎফুল্ল হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল।

বাহিরে একটা ছাইগাদার পাশে কে যেন অল্প দিন হইল কি সব পুড়াইয়া গিয়াছে দেখিয়া তরুণ বেশ করিয়া স্থানটা পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল! একটা অঙ্গুরীয় ছাইয়ের ভিতর হইতে আপনার মুখ বাহির করিয়া তাহাকে যেন কোন ইতিহাস শুনাইতে চায়। সে যত্ন করিয়া আংটীটি তুলিয়া লইল এবং বাড়ীটা আর একবার ভাল করিয়া সন্ধান করিতে চলিল।

একটা সুড়ঙ্গের মত পথে মানুষের গলিত শব দেহ বাহির হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে তরুণ সেটাকে পরীক্ষা করিল; তারপর কি একটা জিনিষ শবের দেহ-বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া সে নরককুণ্ড পরিত্যাগ করিল।

মনে হইল, পশ্চাতে কে যেন তাহার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছে। দ্রুত ফিরিয়া দেখিল, লোকটা আর কেহ নয়—বেঁটে খনক। তাহার গোয়েন্দাগিরির উপরও সে গোয়েন্দাগিরি চালাইয়াছে। তরুণের মনে হইল, লোকটাকে ধরিয়া রীতিমত শিক্ষা দেয়; কিন্তু কি ভাবিয়া কেবল কঠোর-দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে অগ্রসর হইয়া চলিল। খনক কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িয়া এমনভাবে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল যে, বাধ্য হইয়া তরুণকে ফিরিয়া তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইল।

চার

হাসিতে হাসিতে তরুণ গুণধরের নিকটে আসিয়া বলিল, "আর অল্পই বাকী; চল, সেটুকু সেরে আসা যাক্।"

কথাটায় বিস্মিত গুণধর 'হাঁ' করিয়া তরুণের মুখের দিকে চাহিল। তারপর হঠাৎ তাহার দেহের তিন স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখিয়া বলিল, "এ কি, রীতিমত একটা লড়াই করে' এসেছেন দেখছি যে! বলি, একা যাবেন না; কিন্তু তা' ত শুনবেন না—এমন কাজ-পাগল লোক আমি যদি দু'টি দেখেছি!"

সে কথার উত্তর মৃদু হাসিতেই পরিসমাপ্তি করিয়া তরুণ বলিল, "এইবার চল, ইসাক্ সাহেবের বাড়ী যাওয়া যাক্।"

গুণধর আশ্বাসপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "মেয়েটার খোঁজ তা' হ'লে পেয়েছেন! যাক্, হামিদা ফুফু এবার ধড়ে প্রাণ পাবেন!"

ইসাক্-সাহেবের বসিবার ঘরে ঢুকিয়া তরুণ বলিল, "এবার বলুন, সে মেয়েটার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?"

ইসাক্ মাথা তুলিয়া বিস্মিত-কণ্ঠে বলিল, "মানে?"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "সেই মানেই আমি আজ আপনার কাছে বুঝতে চাই। যদি অস্বীকার করে' বলেন, না, সে আপনার কেউ নয়; তার উত্তরে আমি বল্ব, নিজের খুড়তুত বোনের পিছনে তবে দূতী রেখেছিলেন কেন? আর কেনই বা পাগলের মত যত চোর, জুয়াখোর, বদমায়েসের আড্ডায় আড্ডায় তার এতদিন খোঁজ নিয়ে বেড়িয়েছেন?"

মিঃ ইসাক্ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আপনি যাকে আমার খুড়তুতো বোন্ বলে' মনে করেছেন, সে আমার ভগ্নী নয়, স্ত্রী। আমার চিরদিনের বড় সাধ ছিল, লয়লাকে বিয়ে করি। সেই আমার খুড়তুতো বোন্। বাবা কিন্তু প্রতিবন্ধক হ'লেন; একদিন আমায় ডেকে স্পষ্টই বললেন, 'নিজের রক্তের সঙ্গে যার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তা'কে বিবাহ করা আমি একেবারেই পছন্দ করি না; কাজেই ইচ্ছে থাকলেও লয়লাকে তোমার বিবাহ করা চলবে না। আমার অমতে যদি বিয়ে কর, জেনো, সে বিদ্রোহের দণ্ড দিতে আমি একটুও পশ্চাৎপদ হব না।' বাবাকে খুব ভাল করেই জানতুম; কিন্তু তবুও নিজের কামনাপূর্ণ চিত্তটাকে দমন করতে পারছিলুম না দেখে তিনি আমায় দেশ-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেন। বলে' দিলেন, 'স্ত্রী নিয়ে ঘরে এসো; তা' সে যে বংশেরই হোক্'।"

অল্প কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইসাক্-সাহেব আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "নানা দেশ ঘুরেছি, সাইকেলে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চোড়ে, নানা প্রকারে। দেশ-বিদেশের অনেক কিছু দর্শনীয় দেখেছি; কিন্তু না—তৃপ্ত হ'তে পারি নি! বুকের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মোটেই নিবৃত্তি হয় নি, বরং বেড়েই গেছে!"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা' হ'লে এ বিয়েটা আপনি স্বীকার করতে চান না?"

ইসাক্ মাথা নাড়া দিয়া বলিলেন, "প্রথমে তাই মনে হয়েছিল বটে—কিন্তু যেদিন সে ত্যাগের মধ্য দিয়ে তার কদর বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, সেদিন থেকে আমি কিন্তু আর সেভাব পোষণ করি না। আমি কোনদিন কোন কথা লুকুতে চাই নি; আজও লুকোব না। শুনুন—

"হ্যাঁ, দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে সেদিন বিরক্ত, পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্থ হয়েই পথ হারিয়ে-ছিলুম। মেঘের কোলে বিজলীর খেলা যতই মনোরম হোক্, প্রাণে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না একথা অন্যে বলে বলুক, আমি কিন্তু স্বীকার করি না। সেদিন প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে পড়ে' আমি এটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

দূরের একখানা ভাঙাবাড়ীর গবাক্ষ-পথের আলোকরশ্মি আমায় সাদর আহ্বান জানালে, জীবন-রক্ষার চেষ্টায় আমি সেইদিকে পাগল হ'য়ে ছুটে চললুম। দরজা বন্ধ ছিল; ডাকাডাকিতে একটা লোক বিরক্ত-কণ্ঠে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলে, আমি কে, কি চাই; এমন অসময়ে বিরক্ত করবার উদ্দেশ্যই বা কি?"

আমি বললুম, 'অসময় বলেই আপনাদের এখানে এসেছি মশায়; নইলে আসতুম না।'

"লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে, 'ধন্য হলুম! এটা সরাইখানা নয়; তুমি অপর কোথাও আশ্রয় খুঁজে দেখ।'

বললুম, 'না হলেও মানুষের ধর্ম্ম বলে ত একটা জিনিষ আছে; সেদিক থেকে আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করছি!'

লোকটা বিকট শব্দে হোহো করে' হেসে উঠে বল্লে, 'বড়ই বাধিত হলুম! কিন্তু এতবড় দাতা আমরা নই; তুমি পথ দেখ। এখানে টাকার কারবার; টাকা ফেলতে পার, দেখা যাবে।'

"বললুম, 'রাজী—কেবল আজ রাতটুকুর জন্যে আমি দশটাকা দেব।'

"রুদ্ধ কপাট মুক্ত হ'ল। শুনলুম তারা পিতা-পুত্র। একজন আমার ঘোড়া নিয়ে প্রস্থান করলে; অন্যজন জানি না কি উদ্দেশ্যে চলে' গেল; তবে যাবার আগে আমায় তারা ভিতরের পথ দেখিয়ে দিলে। সেখানে এসে তৃপ্তি অপেক্ষা বিস্মিত হলুম ঢের বেশী—অত সুন্দরী আমার

জীবনে কোনদিন দেখি নি! মেয়েটী বিরক্তিভরা-কণ্ঠে বল্‌লে, 'এখানে তুমি এলে কেন—বেরিয়ে যাও!'

আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালুম। মেয়েটী কি যেন বল্‌তে চাইলে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন ফিরে আসায় ইসারায় আমায় আর একবার বেরিয়ে যেতে বলে' উঠে দাঁড়াল। তার বাপ বল্‌লে, 'সেলিমা, পুবের ঘরে এঁর জন্তে বিছানা কর গে। আর হ্যাঁ, কি খাবেন আপনি? আমাদের কেবল রুটি-বেগুনের সম্বল—খেতে পারবেন?'

দুঃখের সঙ্গেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। কেন না, স্বীকার করা ছাড়া তখন অন্য উপায়ই যে ছিল না। লোকটা বল্‌লে, 'এর জন্তে আপনাকে বেশী আট আনা দিতে হবে। মাংস আনতে পাঠিয়েছি; দেখি যদি পায়, তার জন্তে আজ আর আমরা কিছুই চাই না। মোট সাড়ে দশ টাকা।'

"তৎক্ষণাৎ মণিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট ও একটা টাকা বার করে' দিলুম। দেখ্‌লুম, লোকটার চোখ দুটো যেন একবার জ্বলে উঠ্‌ল। আর দাঁড়ালুম না; দাঁড়াবার মত দেহ-মনের অবস্থাও ছিল না। বল্‌লুম, 'আমার শোবার স্থান দেখিয়ে দাও; আমি বড় শ্রান্ত!'

"রাত কত জানি না, মেয়েটী এসে আমার ঘুম ভাঙালে। বাইরে তখন প্রলয় সুরু হ'য়ে গেছে! হাওয়ায় বৃষ্টির আঘাতে পুরণো বাড়ীটা যেন কাঁপ্‌ছিল। বল্‌লুম, 'উঃ, কি ভীষণ! আপনি কে? ও আমায় খাবার এনেছেন বুঝি? না খেলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।'

"মেয়েটী ঠোঁটে আঙুল চেপে আমার হাত ধরে' টান্‌লে। বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে বল্‌লুম, 'কি কর?'

"আমার কাণের কাছে মুখ এনে সে চুপি চুপি বল্‌লে, 'কথা কইবেন না। বাইরের বিপদের চেয়ে এখানে বিপদ ঢের বেশী। সেখানে বকলেও বকতে পারেন; এখানে কথা কইলে মরণ নিশ্চয়! আপনার মণিব্যাগের নোট এরা দেখেছে; কাজেই আপনাকে প্রাণ দিতে হবে। আমার সঙ্গে আসুন। খাওয়ার লোভ করবেন না—ওতে সব মরফিয়া মেশান।'

'আমরা বাইরে এলুম। একটা ঘর পার হয়েই আমাদের সদর দরজায় যেতে হবে। দেখলুম, ক্ষুধিত বাঘেরই মত তারা পিতাপুত্র সেখানে বসে আছে। আমাকে দেখেই আক্রমনের অভিপ্রায়েই বোধ হয় তারা উঠে দাঁড়াল।

"সেলিমা হস্ত ইঙ্গিতে বললে, 'খবরদার! শোন, তোমরা চাও টাকা, তা' আমি ভালরকম জানি, আর জানি বলেই ওঁর সব টাকাকড়ি আমি নিজে সরিয়ে নিয়েছি, এই দেখ!'

"বলে সে আমারি মণিব্যাগ তুলে ধরল, বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলুম্, এর তবে অভিপ্রায় কি? তারা পিতা পুত্রে হাত বাড়াইলে, কিন্তু সেলিমা বল্‌লে, 'না, এখন তোমরা এটা পাবে না, পাবে একে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে আসবার্ পর। ভয় নেই, এ-টাকা আমি তোমাদের ফিরে এসে দেব। আর যদি তাতে স্বীকার না কর, আমি সত্য বল্‌ছি আগুণে পুড়িয়ে এ গুলোর শেষ করব।'

"কথার সঙ্গে সঙ্গে সে একখানা নোট আগুনে ফেলে দিলে। পিতাপুত্রে একটা বিকট শব্দ করে অগ্রসর হল। সলিমা বললে, 'ফের বল্‌ছি, খবরদার! আমি আগের পেছনে এ গুলোকে পাঠাতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করব না, এখন বুঝে বল কোনটা চাও?'

"সে আর একখানা নোট তুলে আগুণের

দিকে হাত বাড়ালে। পিতা-পুত্রে এক সঙ্গে পথ ছাড়ে দিয়ে বলল, "আমরা রাজী!

আমরা নিরাপদেই বাইরে চলে এলুম।

"পথে এসেও সে কিন্তু আমার হাত ছাড়লে না; হরিণীর গতিতে ছুটে চলল। একস্থানে এসে সহসা বললে, 'সাবধান!'

"আমি দেখলুম, বিরাট একটা গহ্বর যেন আমাদের গ্রাসের জন্যেই মুখ বাড়িয়ে আছে। মেয়েটী বললে, 'এ পথটাই এই রকমের; দাঁড়ান।'

"দেখলুম, একটা গাছের সঙ্গে আমার ঘোড়া বাঁধা। আশ্চর্য্য হলুম! ধন্যবাদ দিয়ে ঘোড়ার দিকে পা বাড়িয়েছি, সে আমার হাত ধরে' বাধা দিলে; বললে, 'না, ওটা ছেড়ে দিতে হবে।'

"কথার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের লণ্ঠনটা ঘোড়ার গলায় বেঁধে দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলে। ঘোড়া তীরবেগে ছুটে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম, পিতা-পুত্র উন্মত্তের মত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

"বললুম, 'এমন করে' একজন অপরিচিতকে তুমি যে দু'জন বুভুক্ষু রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করলে, এর জন্যে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতে তোমার লাভ?'

"মেয়েটী হাসলে। সে হাসি নয়, অশ্রুরই বন্যা! বললে, 'কেন করলুম! তুমি পুরুষ, কাজেই তা' বুঝবে না।'

"দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করে' সে আমাকে পশ্চাতে আসবার ইঙ্গিত করে' অগ্রসর হ'ল। একটা মসজিদে এসে আমাদের সে অগ্রগমন শেষ হ'ল। এত দুর্য্যোগ মাথার উপর দিয়ে জীবনে কখন যায় নি; খোদাতালাকে এ আশ্রয়ের জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না। কিন্তু সেই মসজিদের মোল্লা গোল বাধালেন; বললেন, 'না, এভাবে কুমারী মেয়ের পরপুরুষের সঙ্গে আগমন আমি ভাল চোখে দেখতে পারি না; কাজেই আশ্রয় এখানে তোমরা পাবে না।'

"দেখলুম, মেয়েটীর মুখ বিষাদে উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে। বাপের কলঙ্কের কথা মুখ ফুটে বলতে পারলে না; কিন্তু এদিকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মোল্লাকে অটল দেখে সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সেই বিপদে সেদিন আমি অন্য উপায় না দেখে খেয়ালের বশে বলে' উঠলুম, 'আজ সে কুমারী বটে, কিন্তু কাল থেকে বিবাহিত পত্নীরূপেই অভিহিত হবে। আমি সেই জন্যে প্রস্তুত হয়েই ওঁকে নিয়ে এসেছি!'

"মোল্লা বিস্মিত হ'য়ে সেলিমার দিকে চাইলেন! বললেন, 'তোমারও কি এই মত?'

"সেলিমার কথা বলবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়ে বললুম, 'আমরা সেই পরামর্শ করেই এই দুর্য্যোগের মধ্যেও চলে' এসেছি। ওর বাপের আপাততঃ মত নেই; পরে তা' হ'তে দেরী হবে না—বিবাহ কিন্তু আজ রাত্রেই করতে চাই!'

"সন্তুষ্ট হ'য়ে মোল্লা আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন; পরে যথারীতি আমাদের উভয়ের যোগসূত্রে বেঁধে দিলেন। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলুম বটে, কিন্তু সুখী হ'তে পারলুম না। কেন—বলছি। রুগ্ন, শয্যাশায়ী পিতা যদি সেলিমাকে দেখে অত তৃপ্ত না হতেন, 'মা আমার বলে' আনন্দের হাসি না হাসতেন, তবে বোধ হয় বুকের জ্বালা অতটা নাও বাড়তে পারত। তখন যেন কেবলই মনে হচ্ছিল, এ বিবাহ নয়—জোর করে' গলায় ফাঁসি পরেছি!

"মেয়েটীর যথার্থ পরিচয় বাবাকে নিভৃতে দিলাম। তা'তে তিনি হাসলেন; বললেন, 'আমি মুসলমান, খোদাতালা আমায় যা' দিয়েছেন,

তা'তে আমার প্রতিবাদের কিছুই নেই—তা' সে যেখান থেকেই এসে থাকুক।'

"আমি রাগ করে' বল্লুম, "আমি কিন্তু ওকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারব না!'

"ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজা খুলে সেলিমা এসে বল্লে, 'মাপ কর, আমি এ বাড়ী থেকে চলে' যাচ্ছি!'

"বৃদ্ধ পিতা একটা অস্ফুট শব্দ করে' মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। না হ'লে তার গমনে নিশ্চয়ই বাধা দিতুম।

"সেদিন থেকে তা'কে কত খুঁজেছি, কিন্তু পাই নি! পাব কোথা থেকে—আমারই ফুফু আমার সঙ্গে বেইমানি করে' তা'কে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল; তা' আমার মোটেই জানা ছিল না যে! জানলুম, সে হারিয়ে যাবার পর; আর সেই অবধি তা'কে খুঁজে বেড়াচ্ছি! সত্য বলছি, এখন আমি তা'কে তার ন্যায্যপদ দিতে প্রস্তুত!"

পাঁচ

তরুণ হাসিয়া বলিল, "কাল আপনি তা'কে পাবেন।"

গুণধর ইসাক-সাহেবের সহিত একযোগে চঞ্চল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কাল, এত শীগ্‌গীর! জানেন না কি, তিনি কোথায় আছেন?"

তরুণ হাসিয়া গুণধরকে বলিল, "হ্যাঁ, কালই! তিনি তোমার সঙ্গে একবাড়ীতেই বাপ-ভায়ের হেফাজতে আটক রয়েছেন গুণধর! তোমার চোখ নেই, কাজেই দেখতে পাও না।"

গুণধর বিস্ময়ে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তাই না কি, আশ্চর্য্য ত! আমি ত জানি এক হাঁপ-কেশো বুড়ো ইহুদি খেলনাওয়ালা ছাড়া সে বাড়ীতে অন্য কেউ থাকেই না। এরা তা' হ'লে অদ্ভুত প্রাণী! একবারও বাইরে যাবার দরকারও কি তাদের হয় না?"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "তারা হামেসাই বার হয়। বললুম ত, তোমার চোখ নেই; থাকলে দেখতে—দু'জন কাবুলী ফেরিওয়ালা প্রায়ই বাড়ীর দিকে সওদা বেচে ফেরে। মোটের ওপর সে দু'জন আর কেউ নয়, ওরাই বাপ-বেটা! আর হাঁপ-কেশো বুড়ো আমি নিজে!"

গুণধর বিস্ময় ভরে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য, আপনি কি যাদুকর?"

গুণধরের সমান তালে তাল মিশাইয়া ইসাক্ সাহেব বলিলেন, "সত্যই অদ্ভুত! আপনাকে অনেকবার আমার সামনেই খেলনা বিক্রী করতে দেখেছি যে! আপনি তা' হ'লে একজন বহুরূপী?"

তরুণ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিল, "এতটা তারিফের জন্য ধন্যবাদ ইসাক্-সাহেব, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্যের বেশী কিছুই করি নি! যাক্, এখন কাজের কথা—কাল ভোরে ওদের গ্রেফ্‌তার করতে হবে। ইসাক্-সাহেব ও তুমি প্রস্তুত থেকো গুণধর। না। আমার পরামর্শ মত কাজ কর, আজ গ্রেফ্‌তারে বাধা আছে।"

গুণধর উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাধা?"

তরুণ গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "ওই টুকুই মন্ত্রগুপ্তি। তবে তোমাদের ঔৎসুক্যের জন্য বলছি, কাল ভোরে নিশ্চিত ওদের হাতের মধ্যে পাব।"

গুণধর চঞ্চল হইয়া বলিল, "আমরা যে দু'জনেই এখানে—এর মধ্যে পাখী যদি ওড়ে?'

তরুণ হাসিয়া মাথা নাড়া দিল। ইসাক্ বলিলেন, "সত্যই আমি তাকে হারাতে পারব না! সে চলে' যাওয়ায় বুঝছি,—আমি কতবড় মূল্যবান জিনিষ হারিয়েছি!"

তরুণ বলিল, "ভয় নেই। এখানে থাকার তাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। আর তা' ছাড়া, নজরে রাখবার লোক না রেখে আমি আসি নি!

কিন্তু ইসাক্-সাহেব যদি দরকার হয়, আপনাকে হয় ত কিছু খরচা করতে হবে?"

ইসাক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অকৃতজ্ঞ নই, দেখে নেবেন—"

তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া তরুণ বলিল, "আমার জন্যে আমি বলি নি, বল্‌ছি, আপনার শ্বশুর ও শালার বদমাইসি চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে', তাদের সদ্ভাবে চলবার পথ প্রশস্ত করে' দিতে।"

ইসাক্ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এ আপনি ভুল কচ্ছেন তরুণবাবু। খুনে কখনও মানুষ হয়?"

ধীর, শান্তমূর্ত্তি তরুণ শুধু একটু হাসিল, কোন কথা বলিল না। বলিল গুণধর, "আমার গুরুর ভবিষ্যত বাণী আজ পর্য্যন্ত কখনও বিফল হ'তে দেখি নি ইসাক্-সাহেব, কাজেই এবার হবে, এটা আমার বিশ্বাসই হয় না!"

তরুণ আর কথা বাড়াইতে না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা' হ'লে এই কথাই রইল ইসাক্-সাহেব, তবে ফুফুকে সঙ্গে নিতে পারলে মন্দ হয় না। আপনারা গুণধরের ঘরে থাকবেন, আমি সেলিমা বিবিকে আপনাদের কাছে নিরাপদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে তাঁর বাপ-ভাইকে গ্রেপ্তার করব।"

ইসাক্ কিন্তু পরদিনের জন্যে অপেক্ষা করিতে নারাজ, বলিলেন, "তার সঙ্গে এক বাড়ীতে আছি জানলেও আমার তৃপ্তি! ফুফুকে বলে' দিচ্ছি, তিনি এখনই ওখানে যাবেন'খন আমিও যাবো।"

তরুণ হাসিল, বলিল, "তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু কেন বিপদ ডেকে আনবেন! আমাদের মত তাদেরও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আপনার ওপর আছে।"

ইসাক্ হাসিয়া বলিলেন, "থাক্। আমি রাজা যাদুকরের আশ্রয় পেয়েছি—এক মিনিটে ভোল বদলে দিতে তিনি বোধ হয় পেছুবেন না!"

তরুণ অল্প কতকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "বেশ, তাই হোক্! বুড়ো ইহুদী খেলনাওয়ালা এবার বদলে যাচ্ছে। আচ্ছা শুনুন, আপনাকে কি করতে হবে? খুব জোরে জোরে কাশবেন, যেন সে কাশিটা তাদের অসহ্য হ'য়ে পড়ে। পাশের লাল ডোরা কাটা দরজাটা খুলে সেলিমা বেরিয়ে আসবে, চাই কি ওর বাপ ভাইও তেড়ে মারতে আস্‌তে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, সে এলে এই চিঠিখানা তাকে দেবেন। খানিক পরে সে তার একটা পরিচ্ছদ ওখানে রেখে নীচে চলে আসবে, আপনি তার বেশ পরে এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘরে ঢুকবেন?"

ইসাক হাসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয়—একেবারে বাঘের ঘরে আত্মসমর্পন!"

তরুণ বলিল, "হাঁ! তা'ছাড়া অন্য পথ নেই। তবে আমি পেছনেই থাকব, আপনার ভয় পাবার কোন কারণই থাকবে না।"

তিনজনে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়াছাড়ি হইল। তরুণ পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মিনিট কতকের মধ্যেই ইসাক-সাহেবকে এমন অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত করিয়া আনিল যে, গুণধর চকিত হইয়া বলিল, "এ কি এই ত সেই ইহুদী! তবে যে বল্‌লেন, আপনি নিজে।"

তরুণ হাসিল, বলিল, "একে সঙ্গে নিয়ে যাও গুণধর। বুঝলেন, ডান দিকের সিঁড়িতে উঠে বাঁ দিকের চওড়া দালান, তার উত্তরদিকের ঘর আপনার। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুণ! আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার জাল নোটের গুণ্ডাদের—"

গুণধর একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "সে হবে না, আপনার যাওয়া চলবে না। উনি ত আনাড়ি, আমিও তথৈবচ!"

মুখ গম্ভীর করিয়া তরুণ বলিল, "কিন্তু সেটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ লাইনে যখন এসেছ, কি থাকবে, কি যাবে সে ভয় করলে চলবে না; কর্ত্তব্যের দাস হ'তে হবে।"

পথে বাহির হইয়া বুড়া ইহুদীকে তরুণ আবার বলিল, "যদি ওর বাপ বা ভাই তেড়ে আসে, ভয় পাবেন না। কাশিটা আরও এক পর্দ্দা চড়িয়ে দেবেন। ব্যাস, এই পর্য্যন্ত। জানবেন, আপনার ছলনার ওপর আপনার স্ত্রীর উদ্ধার নির্ভর করে!"

বুড়া ইহুদী মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কাশির অভিনয়ও হইয়া গেল। তরুণ হাসিয়া বলিল, বেশ, এই রকম হলেই যথেষ্ট হবে। না তিনজনে একত্র নয়। আপনি তা হ'লে যান ইসাক্‌-সাহেব। গুণধর মিনিট কতক পরে বেরিও, আমি পেছনের দরজা দিয়ে সরে' পড়ছি?"

ছয়

ধোঁয়া ও বুলেট বৃষ্টির মধ্য হইতে ইসাক্‌-সাহেবকে টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া তরুণ দৃঢ়-পদে অগ্রসর হইল। দায়ে পড়িয়া পিতা-পুত্র তখন আত্মরক্ষার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই মরিয়া হইয়া তাহারা অনবরত বিনা লক্ষ্যেই গুলি চালাইয়া চলিল।

সেই অসংখ্য বাদলধারার মত অগ্নিবর্ষণের মধ্যেও নিজের হাত হইতে পিস্তল বিচ্যুতি এবং আঘাত-প্রাপ্তি জনিত বেদনার অপেক্ষাও বেশী লাগিল ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়, ফজলুল হক্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল, "এটা মানুষ নয় ওসমান, স্বয়ং শয়তান! আমাদের নিয়তিতে টেনেছে, ধরাই দে।"

ওসমান কিন্তু সে কথায় কাণ দিল না, শীকারী জন্তুর মত লাফ দিয়া তরুণের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তরুণও প্রস্তুত ছিল, উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া জমিতে পড়িয়া গেল। দু'-চারজন সিপাই ছুটিয়া আসিল, তরুণ ততক্ষণে ওসমানকে কায়দায় ফেলিয়া বুকে চাপিয়া বসিয়াছে।

গ্রেফ্‌তারের পর ফজলুল বলিল, "এর প্রতিশোধ কিন্তু তোলা থাকল তরুণবাবু।

তরুণ হাসিয়া বলিল, "বেশ ত আমি প্রস্তুতই থাকব। এখন শোন, এঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা এরপর থেকে মুখ দিয়ে বার করতে পাবে না। সে যে তোমার মেয়ে এ কথা কোন-দিন যেন মুখ দিয়ে না বেরোয়! তার বদলে পাবে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। যদি ভালভাবে জীবন অতিবাহিত করতে চাও, তার দরুণ মূলধন দু'হাজার—কেমন রাজী?"

ফজলুল চীৎকার করিয়া উঠিল। তার চোখ দুইটা হিংস্র জন্তুর মত জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "না, কখনই নয়! জগত জান্‌বে মহম্মদ ইসাকের স্ত্রী এক দস্যুকন্যা!"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "তুমি তা' পার্‌বে না আমি বাধা দেব!"

দস্যু আশ্চর্য্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মানে—তুমি আমার মুখ বন্ধ করবে কিসে?

তরুণ পকেট হইতে একটা অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল, "এর জোরে! চিন্‌তে পার, বুড়ো জয়মল শেঠকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়াবার এই নিদর্শন! এখন বেছে নাও, হয় ফাঁসী-কাঠ, নয় নিজের মেয়ের নাম চিরদিনের জন্ত ভুলে যাওয়া।"

ফজলুল ওসমানের দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিল। ওসমান বলিল, "সত্য কথাই বলে' ফেল বাবা। ও শয়তান। একদিন যা' জান্‌বেই তা' লুকিয়ে কোন ফল নেই।"

ফজলুল নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "কিন্তু তবু ত মেয়ের মত' করে মানুষ করেছি।"

ওসমান বলিল, "তা'তে ত নিজের মেয়ে বলে' পরিচয় হয় না।"

তরুণ সমর্থনের স্বরে বলিল, ঠিক তাই—এমন সাফ সাফ রোগ বাতলে ফেলুন হুজুর, নইলে বুঝছেন ত, আমার বুকের আরসীর ছাওয়ায় আবার মারা প'ড়বেন—

ফজলুল মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

ইসাক অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি স্বীকার কচ্ছি, সেলিমার জন্মঘটিত তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব, সাজা হ'তে দেব না।"

ফজলুল বলিল, "শুনুন ইসাক্-সাহেব, এক ঝড়ের রাত্রে আপনারই মত একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এসে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সঙ্গে ছিল তার স্বামী আর ছোট্ট একটী মেয়ে। মেয়েটীকে ফেলে রেখে সেই রাত্রেই তারা স্বামী-স্ত্রীতে মারা যায়। তাদের মৃত্যুর কারণ—

তরুণ হাসিয়া বলিল, "মহিলাটীর গাত্র অলঙ্কার, বলে' যাও?"

দম্ লইয়া ফজলুল বলিল, "হ্যাঁ, অস্বীকার করব না, তার মৃত্যুর কারণ তার অলঙ্কার। সে বিপদের মুহূর্ত্তেও আর্ত্তকণ্ঠে মেয়েটী বলেছিল, 'আমার মেয়েকে সঙ্গে দাও, নইলে ওই হ'তে তুমি মরবে।' আজ তাই হ'ল!"

সেলিমা সকল কথা শুনিল কিন্তু তথাপি কাঁদিয়া বসিল, বলিল, "তোমার বাড়ীতে যদি না থাকতুম, তোমার মান-মর্য্যাদার কথা যদি না জানতুম ত আলাদা কথা, জেনে-শুনে এত বড় বংশকে কলঙ্কিত করতে আমি পারব না।"

"ইসাক বলিলেন, "তবুও আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার স্ত্রী!"

সেলিমা জোরে জোরে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না, না,না, তা' হ'তে পারে না। আমার জন্যে তোমার গৃহ কলঙ্কিত হবে, সেটা আমার—"

ফুফু হামিদা অগ্রসর হইয়া একখানা কাগজ তাহার হাতে দিল। সবিস্ময়ে সে বলিল, "এ কি! কিসের রেজেষ্ট্রারী দলিল?"

হামিদা বলিলেন, "ভাই সাহেবের শেষ উইল, একদিন দরকার হ'তে পারে জেনে মরবার আগেই তিনি এটা রেজেষ্ট্রারী করিয়ে দিয়ে গেছেন?"

ইসাক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি অন্তিম সময়ে আমায় বিষয় থেকে বঞ্চিত করে' তাঁর পুত্রবধূরই নামে সব দিয়ে গেছেন ফুফু?"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন না, কেবল মাথা নাড়া দিয়া সম্মতি জানাইলেন।

সেলিমা তাড়াতাড়ি কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু এবার?"

ইসাক হাসিলেন, বলিলেন, "রেজিষ্ট্রারের ঘরে ওর নকল আছে সেলিমা। তা'ছাড়া, এতগুলো ভদ্রলোক সাক্ষী আছেন। তুমি ছিঁড়লেও আসলে ছেঁড়া যাবে না—ও তোমারি!"

সেলিমা কাতর কণ্ঠে বলিল, "তবে আমি তোমার।"

গোল মিটিয়া গেল।

বিস্ময়

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

চৈতী বাঁ হাত দিয়া তাহার প্রশস্ত কপাল চাপিয়া ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

শৈলেশ যেন তাহারই জন্য এতক্ষণ ব্যগ্র প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে এমন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—বহু ভাগ্য মানি আজি—

এরূপ অভিনয়ী ভাষায় তাহার আরও অনেক কিছু বলিবার সাধ ছিল, কিন্তু গলাটা হঠাৎ ধরিয়া যাওয়ায় ভাব ও ভাষা উভয়ই উধাও হইয়া গেল। আর চৈতীও দুই হাত বাড়াইয়া ত্রস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

শৈলেশের চোখে অমনি চৈতীর কপালের ডাগর কাঁচপোকার সযত্ন পরিহিত টিপটি ধরা পড়িয়া গেল। চৈতী সাবধানে ওই স্থান চাপিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, শৈলেশকে বাধা দিতে গিয়াই সে এমন ঠকিয়া গেল। বোধ হয়... ঠকে নাই। প্রিয়জন মুখের ভাষা—ঠাট্টা বিদ্রূপেরই হউক, আর প্রশংসারই হউক, আদায় করিয়া লইতে পারিলেই মানুষ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। দেখাইতে ইচ্ছা নাই,—আবার আছেও ; কিছু শুনিতে চাই না,—আবার চাইও ;—এই যে দুই বিপরীত ভাবের মাঝের জিনিষটিতে কি যাদু আছে তাহা ভাল করিয়া কেহ তলাইয়া দেখে না সত্য, কিন্তু তাহার রসটুকু পান করিবার জন্য নব-দম্পতীর অন্তরে দারুণ ক্ষুধা প্রতিনিয়তই জাগিয়া থাকে।

চৈতীর সে ক্ষুধা আবার কিছু অসাধারণ।—শৈলেশ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমিত্রাক্ষরে মনোভাব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেই চৈতী বলিল, আমি ওই লজ্জায় কিছু পরতে পারি না।

চৈতী প্রাণপণ বলে শৈলেশের মুখ দুই হাতে চাপিয়া রাখিলেও তাহাকে নীরব করিতে পারিত কি না খুবই সন্দেহজনক, কিন্তু ওই সামান্য কথার একটি ঘায়ে তাহাকে অতি সহজেই মূক করিয়া ছাড়িল। এতটা নীরবতাও চৈতীর আবার ভাল লাগিতেছিল না। বলিল, সত্যি করে' বলতে হবে। হুঁ, খারাপ দেখাচ্ছে কি ?

শৈলেশের মুখ চোখ একপ্রকার কুণ্ঠিত হাসিতে ভরিয়া উঠিল। বলিল, সত্যি বলছি, খুব চমৎকার মানিয়েচে !

এখন সহজ প্রশংসায় চৈতী খুসী হইতে পারে না—এ ক্ষেত্রে পারিলও না। না হইল ইহা লইয়া মতদ্বৈধ, না হইল একটু বচসা, না একটু কথা কাটাকাটি, না হইল শেষের পালা মান-অভিমান ;—তবে আর হইল কি ! প্রাণ যাহার সমগ্র অমৃত গরল আকণ্ঠ পান করিবার জন্য উন্মাদ, সে কি এত সহজেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে ? স্বামীর এই সরল সত্য প্রশংসা তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্যম-উল্লাস নির্ম্মমভাবে পিষিয়া মারিল।

একটু নিন্দা, একটু প্রশংসা,...একটু দু'য়েরই মাঝামাঝি। ইহা না হইলে আর কাহারও চলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু চৈতীর আর চলে না। যাহার কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে

দিয়াছে, সে যদি ব্যথায় পীড়িয়া, দহনে দহিয়া, কাঁদাইয়া হাসাইয়া,স্বহস্তে নিংড়াইয়া নিঃশেষে সব রসটুকু পান না করিল, তবে আত্মোৎসর্গের সার্থকতা রহিল কোথায় ?

চৈতী তাই ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, শুধুই চমৎকার ? আর কিছুই না ?

শৈলেশ নিষ্ঠুরতার মুখোসে আর নিজেকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। চৈতীর নিপীড়িত কণ্ঠের আর্তনাদে তাহার সচেষ্ট গাম্ভীর্য্য নিমিষে টুটিয়া গেল। চোখের কোণে যে হাসিটুকু এতক্ষণ বন্দীর মত সুনিবিড় ব্যথায় এ-পাশ ও-পাশ ফিরিতেছিল, তাহা মুক্তির সহজ উল্লাসে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। পথ-বিচ্যুত পথিকের মত ক্ষণিক থমকিয়া থাকিয়া চাহিয়া রহিল, তারপরে নিরুদ্দেশের সঙ্গ লইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

শৈলেশ দুই বাহুর পরিচিত বেষ্টনে চৈতীকে আবদ্ধ করিয়া তাহার কপালের উপর লুব্ধ পুলক পীড়িত দুইটি কম্পন কাতর ঠোঁট চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।...ভাষার সমাধি হইলেই তবে ভাব সেখানে পরিপূর্ণতা পায়। চৈতী অমনি সভয়ে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল। পাছে এই নিঠুর মায়াবী তাহার মায়া দণ্ডের পরশ বুলাইয়া তাহার সযত্ন সঞ্চিত সকল সুধা নিমিষে হরণ করিয়া লয়। অফুরন্ত সঞ্চয়...তবু অকৃপণ দানে ভরিয়া দিতে সাহস হয় না।

পিসিমা আসিয়া খবর দিলেন, বাবা শৈলেশ, যা' ব'লে দিতে হয় তুই নিজেই ব'লে দিয়ে আয় বাপু, আমি ওসব কিছুর মধ্যেই নেই। যা' বাবা, লোকটা সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে যে।

চৈতী মুহূর্ত্তে দরজার আড়ালে গিয়া সলজ্জ-ভাবে আত্মগোপন করিয়া ছিল, কিন্তু দীপ্তিময়ীর চোখে ধুলা দেওয়া এত সহজ নয়। দীপ্তিময়ী তাহার জড়োসড়ো ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন।

মাননীয় মাননীয়াদের মান-সম্ভ্রম বাঁচাইতে তাহাদের একটা পাত্‌লা আব্রুর আড়ালে রাখিয়া হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাল-বাসাবাসির যে সব চিরাচরিত রীতি-নীতি প্রথা —পালাগান আছে তাহা দীপ্তিময়ীর চোখে অত্যন্ত সমাদরের বস্তু। মাঝে মাঝে পাত্‌লা আব্রুটা একটু স্থানচ্যুত হইলেও ক্ষতি নাই, তবে পরমুহূর্ত্তেই তাহা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা থাকা চাই। চৈতীর এই সব সলাজ চেষ্টাগুলি দীপ্তিময়ীকে কোন্ অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি মুগ্ধ হৃদয়ে মনে মনে খুশীর হাসি হাসিয়া চৈতীকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিতেন।

শৈলেশ বিস্মিতের মত কহিল, কি ব'লে দেব' পিসিমা, কা'কে ?

দীপ্তিময়ী বলিলেন, কি ব'লে দিবি তা' আমি কি জানি ? ব্রজেশদের বাড়ী থেকে লোক এসেচে যে।

শৈলেশ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যেঠাইমা লোক পাঠিয়েচেন তা বোধ হয় তুমি জান', কেমন পিসিমা ?

—তা জানি। কেন এসেচে তাও আমার অজানা নেই, কিন্তু তুই কি ব'লে দিয়ে এলি শুনি ?

বল্‌লুম, হ্যাঁ যাব, আমরা দু'জনেই যাব।— বলিয়া শৈলেশ দীপ্তিময়ীর মুখের ভাব ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

দীপ্তিময়ী চকিত-বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাই ব'লে এলি ? আমার নেমন্তন্ন যে রে গাধা !

শৈলেশ দীপ্তিময়ীর কথার তাৎপর্য্য ভাল

করিয়া বুঝিয়াই উত্তরে বলিল, তা' হোক্, তবুও আমাদের যেতে হবে।

এক একটা লোককে নানাপ্রকার ব্যাধি যেমন করিয়া ঘিরিয়া ধরে জগত্তারিণী দেবীকেও পূজা পার্ব্বণ তিথি-তাড়ণ ঠিক তেমন করিয়াই ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। এমন কোন' সুদিন সুক্ষণ তাহাকে ফাঁকি দিতে পারিত না যেদিন লোক খাওয়ানোর সহজ পুণ্যটুকু সঞ্চয় করিয়া লইতে তিনি ভুলিয়া যাইতেন। সন্তোষ ছিল তাহার এসব ব্যাপারের বাঁধা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। ছোটখাট ব্যাপারে একা তাহারই ডাক পড়িত, বড় বড় গুলিতেও আর সকলের সঙ্গে সেও বাদ যাইত না।

কি সামান্ত একটা সু-দিনের উপলক্ষ করিয়া তিনি শৈলেশকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

শৈলেশ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখিল, বীণা রন্ধনকার্য্যে বিশেষরূপে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। বীণা শৈলেশ চৈতীকে দেখিয়া ত্রস্তে মাথার কাপড়টা আর একটু তুলিয়া দিয়া সশব্দে হাতাটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, এত দেরী ক'রে এলে যে? আমি মনে করি, বুঝি বা ভুলেই গেলে।

শৈলেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে লোকের ধারণা এই রকমই বটে। কিন্তু বৌদি, সে অপবাদ তো আমার পড়াশুনোর বেলায়, এসব ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ মেধাকে আমার অতিবড় শত্রুও যে প্রশংসা না ক'রে পারে না।

আমিও করি ঠাকুরপো।—বলিয়া চৈতীর সলজ্জ অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া বীণা বলিল, আর আমি জানতাম যে, বোন্‌টি আমার আছে যখন তখন তুমি ইচ্ছে করলেও সহজে এড়াতে পারবে না।

চৈতী অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

শৈলেশ বলিল, সে কথা ব'লো না বৌদি। আমারই বরং অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে তোমার বোন্‌টিকে রাজী করাতে হ'য়েচে। প্রশংসার দাবী করতে হ'লে তা' আমিই করতে পারি।

চৈতীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা অস্বস্তিকর প্রবাহ খেলিয়া গেল।

বীণা ইহা ঠিক আশা করে নাই। মুহূর্ত্তেই আবার সে নিজেকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া কহিল, এখন চল', ওঘরে গিয়ে বসবে!—বলিয়া চৈতীর একটী হাত ধরিয়া সেদিকে অগ্রসর হইল।

দুঃখীরাম এমন সময় বলিল, দাদাবাবু, আমি যে আবার হাতের কাজ ফেলে এসেচি। আমি এখন যাই, আবার এসে নিয়ে যাব'খন।

শৈলেশ দুঃখীরামের প্রস্তাবে সম্মত হইলে বীণা বলিল, দুঃখীরাম, যাবার পথে তোর সন্তোষ দাদাবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাস্ তো।

আচ্ছা!—বলিয়া দুঃখীরাম চলিয়া গেল।

শৈলেশ বলিল, সন্তোষেরও নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বীণা বলিল, লোকজন নেই, ঠাকুরপোই তো জিনিষ-পত্তর যোগাড়-যন্ত্র ক'রে দিলে।

জগত্তারিণী দেবী দূর হইতে শৈলেশ চৈতীকে লক্ষ্য করিয়া উল্লসিত হইয়া কহিলেন, শৈল এলি? বৌমা এলো?—তারপরে অকৃপণ আশীর্ব্বাদে এই দুইটি তরুণ তরুণীর লজ্জা-বিনম্র শির ছাইয়া দিলেন।

বীণা তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার শাশুড়ীর উপর দিয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করিতেই আবার চলিয়া গেল।

সন্তোষ আর শৈলেশের আহারাদির পর জগত্তারিণী দেবী পাখা হাতে তাহাদের বাতাস করিতে করিতে বারবার কারণে অকারণে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খামখেয়ালী পুত্র ধ্রুবেশের কথাই পাড়িতেছিলেন। এমন দিনে জগত্তারিণী দেবী ধ্রুবেশের অভাবটা একান্ত নিবিড়ভাবেই অনুভব করিতেছিলেন।

বীণা চৈতীকে আহার করাইতে রান্না ঘরে লইয়া গেল। সম্মুখে ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া বলিল, চৈতী, তুই ততক্ষণ স্বরু কর্ ভাই, আমি এখুনি আসচি।

চৈতী ভাতের পরিমাণ দেখিয়া সভয়ে কহিল, এত ভাত কি হবে দিদি?

বীণা হাসিয়া কহিল, দু'জনে ওক'টি ভাত আর খেতে পারবো না?

চৈতীর চোখে মুখে সহসা বিষাদ ম্লানিমা ঘনাইয়া উঠিল। এ প্রস্তাবে তাহার কোথায় যেন একটু আপত্তি ছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহসও সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বীণা তাহার চকিত স্তব্ধতার অর্থ না বুঝিলেও তাহার মুখের দৈন্যের ছবিটি সুস্পষ্ট পড়িয়া লইয়াছিল। সে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে তাই বলিল, চুপ ক'রে আছিস্ যে চৈতী?

চৈতী আর নিজেকে সংযম শাসনে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ তাহাকে করিতেই হইল। বলিল, একদিন তোমাকে কি ভালই বাসতাম, কি ভক্তিই না করতাম দিদি .

চৈতী আর বলিতে পারিল না। গর্জ্জন চকিতে থামিয়া গিয়া বিপুল বর্ষণ স্বুরু হইয়া গেল। চৈতী তাড়াতাড়ি উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া চোখ ঢাকিল।

বীণার হৃদয় মধ্যে যে কোন অবস্থায় যত বড় উত্তাল উদ্দাম ভাবপ্রবাহই আসুক না কেন ইচ্ছামাত্র গলা টিপিয়া মারার অদ্ভুত কৌশল তাহার আয়ত্ত করা ছিল। বীণা অবিচলিত সংযমের সহিত চৈতীর পীড়িত কুণ্ঠিত দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আমার ভুল হ'য়ে গেচে বোন, আচ্ছা, আলাদা ক'রেই নিচ্ছি।

শৈলেশ চৈতী যখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল তখন আসন্ন সন্ধ্যা কাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতের অপেক্ষা করিয়া প্রকাশের ব্যথায় গুমরিয়া মরিতেছিল।

সমস্তক্ষণে চৈতী আর বীণার মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। ইচ্ছা ছিল,—বিদায় বেলায় একটা প্রণাম করিয়া সমস্ত ত্রুটি সারিয়া লইবে; কিন্তু অকারণ লজ্জা কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে কেন যে বাধা দিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। নিজের কাছে নিজেকে আজ চৈতীর ভারী লজ্জিত বোধ হইল।

ট্রেণের কাম্‌রার ভিতর বসিয়া অলস মস্তিষ্কে সন্তোষ জীবনে বহুবারই ভাবিয়াছে, এখন যদি ট্রেণখানি অকস্মাৎ কোনরকমে উল্টাইয়া যায় তবে ইহার ভিতরের যাত্রীগুলি মৃত্যুর দুয়ারে কি প্রকার স্তব্ধ বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়।···

সন্তোষ শৈলেশ-চৈতীকে পথে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়া দেখিল, ধরা-বাঁধা পথ হইতে অকস্মাৎ একটা ঝাপ্‌টা খাইয়া সে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার হৃদয়ের সকলপ্রকার বৃত্তি একই কালে ভীষণ স্তব্ধ হইয়া গেছে। এ নিদারুণ অসহ-স্তব্ধতা আর কোনদিন যে চমক খাইয়া ভাঙ্গিবে তাহা সে ধারণাও করিতে পারিল না। অস্তিত্ব যেখানে আছে, অথচ বিকাশ নাই, সেখানে আত্মা ক্লান্ত না হইয়া

পারে না।—চিন্তা-বিধ্বস্ত দেহভার চেয়ারে ন্যস্ত করিয়া সন্তোষ দুই কনুইয়ের ভর টেবিলের উপর রাখিয়া মাথাটা দুই করতলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বীণা পিছু পিছু কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমে এই অনভিজ্ঞ যুবকের ক্লান্তি অবসাদ দেখিয়া তাহাকে অহেতুক পথ-বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়ার যে কঠিন জ্বালা তাহা তাহার—হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। নিজের উপরেই তাহার কেমন একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ ঘৃণা জাগিয়া উঠিল।

জলে ডুব মারিয়া মাটি স্পর্শ করিতে হইলে দম বন্ধ হইয়া আসিলেও মানুষ যেমন করিয়া শেষ ধাক্কায় নিজেকে তল করিয়া ফেলে বীণাও তেমন ভাবেই সমস্ত মায়া মমতা, ব্যথা-বেদনা উদ্বেলিত স্নেহ-সহানুভূতি দুইহাতে আড়ালে ঠেলিয়া দিয়া ডাকিল, ঠাকুরপো!

সন্তোষ নিরুত্তরে বিহ্বলের মত বীণার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। সন্তোষ এমন একপ্রকার দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া রহিল যে, মনে হয় তাহার স্মৃতিপথে এই আগতার কোন চিহ্নই কোন দিন আঁকা হইয়া যায় নাই। সুখ-শান্তি, বিপুল বিরতি আর ঐকান্তিক বিশ্বাস-নির্ভরতা সে চোখে একসঙ্গে প্রাণ পাইল। মুহূর্ত্তের চিন্তা জড়তা সন্তোষের মধ্যে অসম্ভব এক পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল।

বীণা বলিল, ঠাকুরপো, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কলঙ্ক আমার সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ আর তা' অবিশ্বাস করতে পারচে না, কি বল'?'

সন্তোষ উগ্র কঠিন হইয়া উঠিল।

বীণা বলিয়া যাইতে লাগিল, চৈতীর ওপর অচল আস্থা ছিল, সেও আজ মুখের ওপর জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আমাকে সে এখন একান্ত ঘৃণা করে। সমাজে আমার আর স্থান নেই না?...

সন্তোষ কথা কহিতে পারিল না, স্নেহময় এক সুতীব্র অনস্তভূতপূর্ব্ব আলোড়ন অনুভব করিল। সেও ক্ষণেকের জন্য।

বীণা আবার বলিল, না থাকে ভালই।.. ঠাকুরপো, আমি দাবার ছক পেতে খেলতে ব'সেচি। দাবার একদল খেলোয়াড় আছে তারা অপরকে মাত করতে এতদূর ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে যে একটা পথ ঠিক ক'রে নিয়ে কেবল চালের পর চাল দিয়ে যায়। কিন্তু নিজে যে কোথা দিয়ে মাত হ'য়ে যাচ্ছে তা' মোটে নজরই করে না! তারা সব সময়েই যে মাত হ'য়ে যায় তাও নয়, মাত করেও দেয়। আমি সেই দলেরই একজন। আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েচি,—যদি লাগে তো আমারই জিত, আর যদি ফস্কে যায় তো, আমি এমন হারাই হারবো ঠাকুরপো—

বীণার কণ্ঠও কাঁপিয়া উঠিল। নিমেষের মৌনতা কণ্ঠের বিকৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া আবার বলিল, নারীর গর্ব্ব করবার একমাত্র জিনিষ, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—যেদিন আপনি আমার অঙ্গ থেকে খ'সে প'ড়ে যাবে। তারপরে যে কি হবে সে কথা আজ না হয় নাই শুনলে ঠাকুরপো।

সন্তোষ বীণাকে নীরব হইতে দেখিয়া এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, বৌদি, এসব তুমি কি বলচো? এর একবর্ণও যে আমি বুঝতে পারচি না।

আজ যদি বীণা সেই গত দিনের মত বলিতে পারিত, আমি তোমাকে ভালবেসেচি ঠাকুরপো—তবে সন্তোষের কাছে তাহা অত্যন্ত সহজবোধ্য হইত, কিন্তু সেদিনের কথার সঙ্গে

আজিকার কথার কি অদ্ভুত অসামঞ্জস্য! সন্তোষ তাই বুঝিল না।

বীণা মৃদু হাস্যে তাহার কথার গুরুত্ব কিছু হ্রাস করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একটু ধৈর্য্য ধ'রে আমার সব কথা যদি শোন তা'হলে সবই বুঝবে। আমি দুর্ব্বোধ্য কিছুই বল্‌চি না। ভালবাসার যথার্থ অর্থ যে কি তা' আজও আমি বুঝি না। ভালবাসতেও তাই বোধ হয় জানি না। কথাটা দশজনের মুখে শুনে,বইয়ে প'ড়েই শিখেচি কিন্তু এর বিকাশ বা যথার্থ রূপ কোনদিনই আমার চোখে পড়েনি, বুঝিওনি। তুমি হয়তো অবাক হ'য়ে যাবে; সে দিন তবে আমি তোমাকে কি ক'রে বল্লাম, ভালবাসি। আজ আমার এসব কথা হয়তো তুমি বিশ্বাসও করতে চাইবে না। তবু শুনে রাখ। একদিন—সে যে কবে তা আমিও ঠিক ক'রে বলতে পারবো না—তোমার গুরুদেবটীকে মনে হলো, তাকেই তো পেয়েচি যার মধ্যে আমাকে পূর্ণতা দেবার, ফুটিয়ে তোলবার, সার্থক সফল করে নেওয়ার ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া আছে। আর কারোর মধ্যে বোধ হয় তা' নেই। অন্ততঃ, আজও আমার চোখে পড়েনি। যেদিন একথা বুঝিচি সেদিন থেকেই নিজেকে তার কাছে একান্তভাবে সঁপে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে কি বুঝেছিল জানি না,—হয়তো সাহস করে গ্রহণ করতে পারিনি, পিছিয়ে দাঁড়ালো। তারপরেও অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দু'চোখ ঐ দুটী পা থেকে আর কোন দিনই দৃষ্টি তুলতে পারেনি। একজনের জন্যে একজনেরই বোধ হয় সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর তাকেই জীবন দিয়ে পাওয়া চাই। তাকে পাওয়া তো আমার চাইই, সে জন্যে যা' বিশ্বাস করি না, বুঝি না তা' তোমাকে বলতেও তাই কুণ্ঠিত হইনি। আর এই এমন পাওয়ার জন্যে ব্যগ্রতাকে যদি তোমরা ভালবাসা বা প্রেম বলে আখ্যা দিয়ে খুসী হও, বা মোহ বলে উড়িয়ে দিতে চাও তো দিতে পার। স্ত্রী স্বামীকে একরকম ক'রে পেতে চায়, বোন ভাইকে আর একরকমে পেতে চায়; আর কন্যা পিতাকে, মাতা পুত্রকে—তাদের প্রত্যেকের চাওয়ার মধ্যেই সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সোজাসুজি তারই একটা নাম আমাদের জানা আছে—ভালবাসা। তুমি কি ঠাকুরপো এর একটার মধ্যেও পড় না।

সন্তোষ ধৈর্য্য ধরিয়া বীণার প্রশ্ন শুনিল। কিন্তু বীণার কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদযন্ত্রের কাজ সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা হইল। বীণা কোথা হইতে কোথায় কোন্ অকূল সাগরে মাঝে যে তাহাকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। শুধু সে বুঝিল, মুক্তির আর কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই।

বীণা সন্তোষকে মূক হইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, কই ঠাকুরপো, কথা কইচো না যে?

সন্তোষ কি যেন ভাবিতেছিল, সহসা চকিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ধরলাম——আমার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু তুমি যা' কারণ দেখালে তার জন্যে কোন স্ত্রীই কোনদিন এতবড় কলঙ্ক বরণ করে' নিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—এ অবস্থায় এসে না দাঁড়ালে আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না ঠাকুরপো। আর... কলঙ্ক কি ঠাকুরপো? এই তো আমার শেষ তূণ। যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তো, আমার নিজ তূণের আঘাত নিজেকেই বিঁধবে, পরাজয় তখন অনিবার্য্য। জয় না ক'রে আমি বাঁচতে পারি না, পরাজয়ের পরেও বাঁচবো না—এইতো একটুখানি তফাৎ।

সন্তোষ এতক্ষণে সহজ অবস্থায় অনেকটা

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ধর' জয়ীই তুমি হ'লে, তখন কলঙ্ক কি তোমার মুছে যাবে ?

বীণা সহাস্যে বলিল, জয়ী হওয়া মানেই তো কলঙ্ক আমার মিথ্যা !

সন্তোষ বলিল, ধর, ধ্রুবেশদা'র চোখে তাই হ'লো, কিন্তু আর সকলে তো তা'তেও বিশ্বাস করবে না

বীণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সত্যি ঠাকুরপো, আমি এতদূর স্বার্থপর যে ছুনিয়ায় আর কেউ যে আছে সেকথা মোটেই ভাবিনি। তাই ভয় হয় ঠাকুরপো, বুঝিবা চাল ভুল ক'রে আমিই মাত হ'য়ে গেলাম।

বীণা থামিল। সন্তোষ নিজের মধ্যে এমন একটা উগ্র জালা অনুভব করিতেছিল যে, তাহারই উত্তেজনায় আর কোন কথা সে ভাবিতে পারিতেছিল না।

বীণা তাহার নীরবতায় ব্যথা অনুভব করিল। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সন্তোষের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, ঠাকুরপো, কাল তোমাদের কল্‌কাতা যাওয়া ঠিক হ'য়েচে শুনেই তোমাকে এতদিন বলি বলি ক'রেও যা' বলতে পারিনি তা' আজ বলতে বাধ্য হ'লাম। নইলে, আজীবন এর জন্যে আমাকে অনুতাপ করতে হ'তো। আজ আসি, কাল সকালে এসে তোমার জিনিষ-পত্তর সব না হয় গুছিয়ে দিয়ে যাব'খন।

বীণা উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বীণা চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষের অন্তরে একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তু ভীষণ দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল। কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝাপ্‌টা লাগিয়াও হয় তো তরু-শাখা এমন দাপাদাপি সুরু করে না।

একটা উন্মত্ত তাড়ণায় সে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা হইল, বীণার সহজ-গতিতে বাধা দিয়া সবলে তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া প্রশ্ন করে ; তোমার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমাকে তা' বলে কলঙ্কিত করলে কেন ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে কেন ? ···· মিথ্যে কথা, তুমি আমাকে ভালবাসো', নিশ্চয়।

অন্ধকারের অন্তরাল হইতে একটা মূর্ত্ত সুনিবিড় ব্যথা, গ্লানি, নৈরাশ্য তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। অনেক চেষ্টা প্রয়াসের পর সে চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি !······

নিজ কণ্ঠস্বরে নিজেই আবার ভয় পাইয়া গেল।

বীণা তখন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সে আর্ত্তনাদ তাহাকে স্পর্শও করিল না।

(ক্রমশঃ)

'উৎসবে ব্যসনে চৈব'

শ্রীরবি ঘোষ

চায়ে এক চুমুক দিয়ে নরেন্দ্র বল্লে—"তোমরা ভাব বন্ধুত্ব বুঝি খুব সহজ। বন্ধু বলে অনেকের সঙ্গে পরিচয় বজায় রাখা যায় মনে করে তোমাদের তাই বিশ্বাস। কিন্তু আসলে বন্ধুত্ব যত দুর্লভ তত দুর্লভ প্রেম। কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে এই প্রমাণ হয়, যদিই বা প্রেম পৃথিবীতে খুঁজে পাও, বন্ধুত্ব কিন্তু মোটেই চ'খে পড়বে না।"

স্বরেন তার সামনে বসে সিগারেট টানছিল, মুখ থেকে সেটা নামিয়ে সে প্রশ্ন করল—আচ্ছা নরেন দা, তোমার জীবনেও কি বন্ধুত্ব বাস্তব হয়ে ওঠে নি।

কথাটা শুনে নরেন্দ্র এমনই এক উচ্চহাস্য করল যে, স্বরেন অপ্রতিভ হয়ে ভাবল, সে বুঝি হঠাৎ Stan Laurel এর জুড়িদার হয়ে পড়েছে। উচ্চহাসি থামিয়ে নরেন্দ্র আর একবার চায়ে চুমুক দিলে, "তবে শোন। তোমরা বোধ হয় ভাব, অমরের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব, তা' আদর্শ স্থানীয়। কেন না স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে এম এ পাশ করার পর বছর চারেক ধরে' গবেষণা করে বিজ্ঞ হওয়া তক। হিসেব করলে দেখা যাবে এই পনের বছরের মধ্যে পনের বারও আমাদের ঝগড়া হয় নি। অমর যখন স্কুলে পড়ে তখন ওর নেশা ছিল প্রথম হবার। প্রতিবারই পরীক্ষায় ও প্রথম হয়ে এসেছে, আমার অভিলাষ অত উচ্চ ছিল না, আমি পাশ করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করতাম। অল্প সময়েও কাজটা হয়ে যেত, বাকী সময়ে করতাম দুরন্তপনা আর এমন এক সাধনা, যাতে আমি সবার কাছে নিন্দার পাত্র হতে পারি। প্রাইজের দিন অমর পেত পুরস্কার, বই, মেডেল, আমি তার সেগুলো গর্বের সঙ্গে ওর বাড়ী পৌছে দিতাম। যদিও আমার স্পোর্ট খুব ভাল লাগত তবু স্পোর্টে নামতুম না, প্রতিযোগিতার ভয়ে নয়, বরং প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ি এই আশঙ্কায়। আদর্শ বন্ধুত্ব, নয়? তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও হ'ল প্রথম, আমি প্রথম বিভাগেই পাশ করলাম। একই কলেজে ঢুকলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা পরীক্ষায় অমর রইল প্রশংসনীয় স্থানে, আর আমি ওর বন্ধুত্বে আবদ্ধ। এম এ পাশ করে ও ঢুকল কলকাতার ভাল এক কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হয়ে। আর আমি ঢুকলাম অন্ধকার পুস্তকাগারের ময়লা বইয়ের মধ্যে। বইয়ের পাহাড় নজির দেখিয়ে সম্ভবকে অসম্ভবে পরিণত করতে গবেষণা যত করেছি তার অনেক কম ছাপিয়েছি,—তাই আমার যশ অধ্যাপক অমর মিত্রের পপুল্যারিটিকে ছাড়িয়ে যাই নি। এখনও আমরা আগের মত সময় পেলেই একসঙ্গে বেড়াই', দু'জনে না হ'লে বায়স্কোপে যাই না। অবশ্য অমরই পয়সা খরচ করে' আমি যোগাই বন্ধুত্বের রসদ। কথাটা হচ্ছে, এখনও এমন জায়গায় আমাদের বন্ধুত্বে এসে পৌছয় নি যেখানে আমাদের স্বার্থ প্রকট হয়ে উঠতে পারে—তাই এখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। তাই আমরা এখনও বন্ধু আছি। কিন্তু

আমি মনে জানি, আমাদের বন্ধুত্বের কোন মূল্য নেই।"

সুরেন ফস করে বলে উঠল—"এটা তোমার দুর্ব্বলতা নরেন-দা। কোন প্রমাণ না পেয়ে তুমি একটা অবাস্তব কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ে আসছ।"

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। আর জানলার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবল। হঠাৎ ক্রুর হাসি হেসে নরেন বললে— "বেশ, আজই তোমায় সে প্রমাণ দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর, অমর এখনই আসবে।"

দু'জনেই অপেক্ষায় রইল। অমর এসে ঘরে ঢুকল, মুখে তার দীপ্ত হাসি, সৌখীন ধরণে পোষাক পরা। সুন্দর লাঠিটা জানলার পাশে রেখে অমর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসল—"কি হে চুপ চাপ যে, এই যে সুরেন্দ্রও এখানে, কতক্ষণ। শুনেছ নরেন, আজ প্যাভলোভার নাচের দিন ছিল।"

"বেশ ত' যাওয়া যাবে।"

অমর আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—'তুমি সত্যি স্বপ্ন দেখছ, আজ কাল, রঙ্গ জগতের কিছুই খবর রাখ না। আমি ত আসবার সময় কলেজ থেকে ফোন করে খবর নিলুম, তাদের সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। কলেজের সব যাচ্ছে, এক টাকার আর দশটাকার খানকয়েক টিকিট পড়ে আছে। কেমন করে যাবে।"

"সে হবে'খন! আমি তার ব্যবস্থা করব'খন। তার আগে কথা আছে।"

সুরেন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠল।

অমর গায়ের চাদরটা চেয়ারের পিঠে জড়িয়ে বল্‌লে—"বল, কিন্তু তোমার গবেষণার কোন কথা পেড় না, দোহাই তোমার।"

নরেন্দ্র পকেট থেকে একখানা টিকিট বার করে অমরের হাতে দিয়ে বলে—"নাও, পাঁচ টাকার, আমি আগে থেকেই বুক করে এসেছি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ পড়ল যে আমার আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। তুমি অন্য এক বন্ধুকে নিয়ে যেও।"

তোমার কি এমন কাজ পড়ল।"

"সে খুব প্রয়োজনীয়, এড়াবার যো নেই। নাচ নয় আর একদিন দেখব। কিন্তু এদিকে অন্য বিপদ! আজ বেলার জন্মদিন। ওর সব বন্ধুরা আসবে, তার মধ্যে কলকাতার নামজাদা লোকেদের মেয়েরা আসবেন, আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলর, হাইকোর্টের জজ এদের বাড়ীর সব মেয়েরা নিমন্ত্রিতা, কিন্তু তাদের সভায় যাবার যোগ্য কাপড়-জামা আমার নেই, অথচ না গেলে নয়, আমি তাদের একরকম 'চিফ্ গেষ্ট্' গোছের। বেলার একান্ত অনুরোধ, তার ওপর ঠিক হয়েছে আমার গবেষণা সম্বন্ধে আমাকে এক লম্বা বক্তৃতা দিতে হবে। অবশ্য, বেলার এটা চালাকী! এই সুযোগে আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে চায়। এদের মধ্যে বুঝেচ অমর, তোমাদের নারী-কবি এবং সাহিত্যিক ক'জনই থাকবেন, ডাঃ সেন ডাঃ মিত্র এরা ত আছেনই। এক কথায় বলতে গেলে এ খুব লোভনীয় সভা বটে। একে ত বেলা 'চার্মিং', তাতে আজ তার জন্মদিন, নিখুঁৎ ভাবেই সাজবে এবং তার গান যা হবে তাও খুব উঁচু দরের। আবার বেলা এত দুষ্ট, আসবার সময় বলে দিলে—আমাদের বিয়ের কথা আজ পাকাপাকি করবে সবার সামনেই।"

নরেন্দ্র কথা শেষ করে দেখে অমরের মুখ

কাল হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে মনের ভাব বেশ বোঝা যায়।

নরেন্দ্র তার কথা শেষ করল—"তুমিই আমায় বাঁচাতে পার অমর। তোমার জামা নিশ্চয়ই আমার গায়ে হবে। তোমার পোষাকটা ছড়ি সমেত আমায় দাও, তুমি ত গাড়ী করেই এসেছ? তোমার 'মাষ্টার বুইক'খানা যদি আমায় ছেড়ে দাও তবে বেঁচে যাই! আর বাঁচে আমার মান।

"আর আমি হেঁটে যাব কি বল?"

"তা যাবে কেন, একখানা ট্যাক্সিতেই তোমর চলে যাবে। আমার জামা-কাপড় ফরসাই আছে, তবে সাদা বলে নেহাৎ পেলো হয়ে যায়, ট্যাক্সি ভাড়া তোমার কাছে না থাকে আমি দিচ্ছি। যদি—।"

নরেন্দ্রের কথা শেষ হবার আগেই অমর বল্লে—"না, তা হবে না, এই পাঁচটাকা টিকিটের দাম। আমার কথা বোঝবার মত তোমার মনের অবস্থা নয়, আমি চল্লুম।"

অমর চলে গেলে নরেন্দ্র সুরেনের দিকে চেয়ে খুব হাসতে লাগল।"

"বুঝেছি নরেন-দা, যাক, ওসব কথা, তোমার বেলার সঙ্গে খুব আলাপ আছে, না?"

নরেন্দ্র তার পিঠ চাপড়ে বল্‌লে—"না রে, সব বানান, শুধু বন্ধুত্বের পরীক্ষা করা।"

"আমি চল্লুম নরেন-দা, তুমি নাচ দেখতে যাচ্ছ ত।"

"নিশ্চয়, ওই অমরের পাশে বসতে হবে; তা' না হ'লে বন্ধুত্ব টি'কবে মনে করেছ।"

দিক্‌ভুল

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

"চলেছি, রেলের সাঁকো পার হ'য়ে, বিশাল প্রান্তর পার হয়ে—সম্পূর্ণ একেলা।...মৌন নিশা, ধ্যানরতা পূজারিণীর মত স্তব্ধ হ'য়ে আছে, আর মাঝে মাঝে ক্ষেপা হাওয়ার শব্দ হচ্ছে—সোঁ সোঁ। ষ্টেসন থেকে দু'মাইল চলে এসেছি—নিঃশব্দে, পথে দোসর পাই নি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তিথি বোধ হয় প্রতিপদ। গাছের ফাঁকে তার আলো এসে প'ড়ছে—শ্যামল অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে আঁধার জমাট বেঁধেছে। দু'পাশে বুনো গাছগুলো লতার আলিঙ্গনে প্রেমের সুখ অনুভব করছে। কি বিচিত্রএর সৌন্দর্য্য!

"...ঘেঁটোফুলের গন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা হ'চ্ছে—আঁকা-বাঁকা রাস্তা, কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত। একটু এগিয়ে এসেছি, সম্মুখে দুরন্ত নদীর উচ্ছ্বাস উঠে কিনারায় আছড়ে পড়ছে, ছলাৎছল—ছলাৎছল, থম্‌কে দাঁড়ালুম। কাছেই বাঁশগাছের পাতা ঝরে পড়ছে, আর নুয়ে পড়ছে তার ডাল পালা। ও কি! ওপারে নদীর ধারে শরবন যেখানে মাথা দুলাচ্ছে, সেখানে চিতা জলছে না! কি দারুণ অগ্নিশিখা! মনটা মুহূর্ত্তে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল।...

রাত হয়েছে। পথের খবর কে দেবে—কতদূরই বা যাবো। গ্রামটা যে এতদূরে তা' যদি জানতুম,তা' হ'লে কি আসি! কিন্তু না এসেই বা কি করি—কন্যাদায়। একটা বুনো শূয়োর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেল। গাছের আড়ালে দাঁড়ালুম। পরক্ষণেই কি যেন তীরবেগে উধাও হোলো কাঁঝাড় বনের মধ্যে। আতঙ্কে বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। বাঘ নয় তো? ভূত! বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিশ্বাসের বাইরে কত কি আছে তাই বা কে জানে!

"খস্ খস্—কার পথ চলার শব্দ বলেই মনে হচ্ছে। দু'চোখ চেয়ে দেখলুম, কেউ তো নেই—তবে! হন্ হন্ ক'রে খানিকটা হেঁটে চললুম, নদীর মোড়টা ঘুরে গেল। জ্যোৎস্না ধারায় পথটা শুধু স্নান করছে—নদীর ধারে যেন এক-খানা সাদা ধব্‌ধবে চাদর বিছানো। হাতে রিষ্টওয়াচটী বাঁধা আছে—দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখলুম, রাত্রি এগারটা বিশ মিনিট। এতরাত্রে মানুষের বাড়ী গেলে বিরক্ত হ'তে পারে—অনুপায়!

...আবার সেই খস্ খস্ শব্দ। বুড়ো বট গাছটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে, না?

"—থম্‌কে আবার দাঁড়ালুম।—কে ও! নিরুত্তর। বুকে হাত দিয়ে দেখলুম এক ঝলক রক্ত নেচে উঠলো। কি করি! চেঁচিয়ে লাভ নেই—এখনও আধ-মাইল রাস্তা পার হ'লে গ্রাম পড়বে। কোন খুনে বদমায়েস নয় ত? শুনেছি এই রকম জায়গায় বেশীর ভাগ খুন হয়। হাতে সুটকেস্—ব্যাগে গোটা কয়েক টাকা মাত্র সম্বল। আশ্চর্য্য! লোকটা কিন্তু মনে হোলো যেন ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আগের ট্রেণটা "ফেল" করে কি মুস্কিলেই পড়েছি! আফসে যদি একটু আগে ছুটী পেতুম—নতুন সাহেব দয়া-মায়ার লেশ

নেই, উঠ্‌বো চেয়ার ছেড়ে এমন সময় শেষ বেলায় যত কাজ!..ও কি! কঙ্কালের মত কি যেন দাঁড়িয়ে ··কি রকম হোলো। একটা বুড়ো লাঠি ধরে যাচ্ছে না?—'ও কর্ত্তা শোনো না?' উত্তর দেয় না। ওকে ধর্‌তে হ'বে—খুব হাঁট্‌লুম। কিন্তু কিছুতেই ধর্‌তে পাচ্ছি না। যতই ডাকি সে গ্রাহ্য করে না—প্রায় কাছে এসেছি, ব্যস্ বুড়োটা অদৃশ্য। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। তারপর কাউকে আর দেখতে পাই না। গাটা ছম্ ছম্ কর্‌ছে। এ কি! স্বপ্ন দেখ্‌ছি না তো!

"..... জেগে স্বপ্ন দেখা কি একে বলে...... কিছুদূর যাওয়ার পর দেখ্‌লুম, একটা দীঘির শান্-বাঁধানো ঘাট থেকে মাথা উঁচু করে কাফ্রি-দের মত কালো একটা জোয়ান মরদ এগিয়ে আস্‌ছে, ময়লা একখানা কাপড় কোনরকমে কোমরে জড়িয়েছে—আর দেহের বাকী অংশ অনাবৃত। বাপ্ রে! কি ভীষণ চেহারা!

"এতরাত্রে এই লোকটা এখানে! মেরে-ধরে বা খুন ক'রে আমার যা' কিছু কেড়ে নেবে না তো? এক নিমিষে তার দিকে চেয়ে খুব দ্রুত হাঁট্‌তে সুরু কর্‌লুম। ভাব্‌ছি—পথিকও তো হ'তে পারে?—'অ মশায়'—কথায় কাণ না দিয়ে চলেছি, আবার যে ডাকে! —মহাবিপদ। তবু চলেছি। প্রকৃতির নিস্তব্ধ রাজ্যের মধ্যে এই দুর্‌মনের আবির্ভাব কি উদ্দেশ্যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যেমন চেহারা তেমনই কর্কশ কণ্ঠ।

'—অ মশায়—অ মশায়—শুনছেন' ডাকের ওপর ডাক। সাড়া না দিয়ে আর তো পারা যায় না। বুকটা ছ্যাং করে উঠ্‌ল। বাধা হ'য়ে বল্‌তে হোলো—'কি?' গলার স্বর উঠ্‌তে চায় না! সে প্রশ্ন করে বল্‌লো—'কতদূর যাবেন?' শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি সে আমার অতি নিকটে। ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম—'রামনগর' 'ওঃ—তা এত দৌড়োচ্ছেন কেন?' ভাব্‌লুম, ব্যাটা ঠিক লক্ষ্য করেছে—প্রকাশ্যে বল্‌লুম—'শ্রান্ত হয়ে গেছে কি-না?'

'—আপনি তো বেশ চল্‌তে পারেন দেখ্‌ছি—!'

"লোকটার কথায় আর মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে না—অথচ চেহারাটা কি বিশ্রী! —দেখ্‌লেই ভয় হয়। তার ভ্যাব্‌ভেবে চোখ দুটোর দিকে চাইতে পার্‌লুম না! পরক্ষণে ভাব্‌ছি ভয়ই দুর্ব্বলতা—ভয়ই মৃত্যু! যা' হয় হবে। পুরুষ মানুষ তো আমি।

"আগ্রহ সহকারে সে বল্‌লে—'রামনগর কার বাড়ী?' উত্তর দিলুম '—ভোলানাথ ঘোষের বাড়ী—' 'হু' বল্‌লে এমন ভাবে, যেন তানপুরায় উদারার ষড়জ গ্রামে ঘা' পড়্‌লো। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—'তুমি কোথায় যাবে?' '—ওই রামনগরেই—ওখানেই আমার বাড়ী কি না!' সরল উত্তর। আমি বল্‌লুম—'বেশ হোলো—সঙ্গী পাওয়া গেল—এতখানি পথ একলাটী যাচ্ছি।'

"নামটা জিজ্ঞাসা কর্‌বো ভাবলুম কিন্তু শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলে সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লুম। তবুও তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না। এদিকে আমি নারীর মত অসহায়; বৃদ্ধের মত দুর্ব্বল।...আমার পিছু পিছু সে আস্‌ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্‌লে—'আপনি কল্‌কাতায় থাকেন—না?' সহরে লোক দেখ্‌লেই বুঝা যায়। 'হাঁ' বলে নিঃশব্দে চলেছি! জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে ভোলানাথ ঘোষের ছেলেটী কেমন; ওদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে কি-না? সত্যি কথা কি বল্‌বে! পাড়াগাঁর লোক বড় খল হয় শুনেছি—সবাই নাও হ'তে পারে!

"সে বলে উঠ্‌ল—'আচ্ছা দাদা—কলকাতায় নাকি ছবিতে কথা বলে, সত্যি?' আমি বল্লুম—'হাঁ' তৎক্ষণাৎ আবার বল্লো—'দেখে আস্‌তে হবে—দেখুন, ইংরেজ কি কলই বানিয়েছে—মরামানুষ যদি জ্যান্তো করতে পারে, তবেই না বুঝি ক্ষমতা!' একেবারে দাদা সম্পর্ক—লোকটা বেশ তো! তারপর বলতে লাগ্‌ল—'কল্‌কাতায় কি করেন?' আমি বল্লুম—'আফিসে চাকরী করি।' '—আপনারা বেশ আছেন। মাস গেলে মাইনে পান! আমাদের ফসল না হ'লেই কষ্ট! এবার ফসল হয় নি—কার্ত্তিকে শালি ধানের অবস্থা ভালো না—যে বৃষ্টি মশায়—সব ভেসে গেল। বন্যে – দুর্ভিক্ষ—তার ওপর জমীদারের অত্যাচার—বাকী খাজনার দায়ে যা' আরম্ভ করেছে, সে আর বল্‌বার নয়। ঐ যে রামনগরের জমীদারবাবুরা—এদের একটুও দয়া-মায়া নেই—পিশাচ মশায়, পিশাচ ওরা—আমার যে শালি জমি ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে—আমরা মাস খানেক আধপেটা খেয়ে আছি—দেউড়ীতে ফেলে সেদিন কি মারটাই না আমাকে দিয়েছে। এর কি বিচার ভগবান কর্‌বেন না? দুর্ব্বল চাষার ওপর সবল জমীদারের অত্যাচার কতদিন আর চল্‌বে।' একদমে অনেকখানি বলে গেল। সব শুনলুম। লোকটা ভারি মিশুক এবং প্রাণ বেশ খোলা তো! দুঃখ হোলো—ভাবলুম, আহা চাষাদের কতই না কষ্ট।

"কিই বা পায়। রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে সারাদিন মাঠে থেকে কি পরিশ্রমটাই না করে। তবু ওদের তাতে দুঃখ বোধ হয় না। ওরা যা' ভয় করে, শুধু জমীদারের অত্যাচার আর সুদখোর মহাজনের পীড়ন। খানিকটা চলে এসে তার ওপর আমার যে সন্দেহ ছিল, তা' কেটে গেছে।

...একটা পথের বাঁকের কাছে এসে সে বল্‌লে, 'আসুন, আপনাকে খুব সোজা পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—এই যে আমবাগানটা দেখছেন, এর বুক চিরে একটা সরু ফালি মত পথ চলে গেছে, ওটা পেরিয়ে গেলে তবে একেবারে ভোলানাথ ঘোষের সদর দরজায় এসে পড়বেন।'

"...বল্লুম—"ওহে এখানে সাপ-খোপ নেই তো।' সে বললে 'ওসব এখানে নেই, আমার সঙ্গে আসুন—না—কিছু মাত্র ভয় করবেন না।' সে আমার পাশাপাশি চলতে চল্‌তে আবার বলতে লাগ্‌লো—'এই গ্রামটায় কত লোকই ছিল। সব মরে গেছে। আমরা মাত্র কয়েক ঘর রয়েছি। ভাবছি, এখান থেকে উঠে অন্য জায়গায় যাবো। অমন শয়তানের জমিদারীর মধ্যে আর থাকবো না। এত অত্যাচার মানুষে সহ্য করতে পারে!' আমি বল্লুম—'তুমি এত রাত্রে গেছ্‌লে কোথায়?—'ডাক্তার ডাকতে, আর বলেন কেন, মেয়েটির কুড়ি দিন একাজ্বরি, এ গ্রামে এত ম্যালেরিয়া যে বলবার নয়, ঘরে ঘরে ভুগছে। মেয়েটার যে কি হবে বুঝতে পারছি না। টাকায় চার পয়সা সুদে কতকগুলো টাকা ধার করেছি, তাও মহাজনের তাগাদা আর জুলুম রোজ লেগেই আছে। মেয়েটার হাড় ক'খানা সার—পাচন খাওয়ালুম, কিছুই হলো না।' বল্লুম 'এ গ্রামে ডাক্তার নেই।'

'—এ গ্রামে শুধু রুগী আছে—ডাক্তার আনতে হয় সেই ষ্টেশনের কাছ থেকে—'এই কথা বলে লোকটা তার ট্যাঁক থেকে বিড়ি আর দেশলাই বা'র করে বিড়ি ধরালো—খুব বিড়ি টানছে।

"আমি বল্লুম—'তোমার চেহারা তো বেশ আছে।' সে হেসে বললে—'তবুও তো ভাল করে আমার পেটে দানা পড়ে না—কি জানেন, তা' হ'লেও মাঠে রোজ কাজ করি লাঙল নিয়ে—

মাটির শরীর মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলে কি আর চট্ করে গতর মাটী হয়ে যায় মশাই।' তা' তো বটে।···চলেছি ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে নিঃশঙ্কচিত্তে—গাঁয়ের কথা সে বলছে। সহুরে আমরা—আমাদের কাছে বড় মিঠে লাগে ওদের গেঁয়ো প্রাণের দু'টো খোস-গল্প, তবে বিষিয়ে ওঠে হৃদয় ওদের অত্যাচার শুনলে—সভ্যতার চাকার তলায় আমরা যেমন পিষে মরছি, ওরা এখনও তেমন করে পিষ্ট হচ্ছে না, তাই রক্ষে! ভাবলুম—কি সরল চাষারা!

"সে একটু চুপ করে বললে—'হাঁ—ওই যে দেখছেন, তেঁতুল গাছটার পাশে একখানা পুরানো খড়ো ঘর – ওই যে মটকা দেখা যাচ্ছে, ওইটি হ'লো আমার আস্তানা।'

"তার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌছুতেই কতকগুলো কুকুর ডেকে উঠলো। ভয় পেলুম। সে বললে—'কিছু বলবে না—আসুন।' উঠানে সামনে একটা পেয়ারা গাছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটা মনে হলো দুলছে, দু'একটা পেয়ারা যেন পড়লো। সে বললে, 'গাছে বাদুড়ের ভারি উৎপাৎ—'

"কুকুরগুলো আমাদের সামনে এসে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠ্ল। রাত্রি তখন বারোটা বেজে গেছে। সে বললে—'ভেলি, চুপ।' কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে তার কাছে এগিয়ে এলো, সে তার মাথায় হাত বুলুতে লাগ্ল। তাকে ঘিরে দাঁড়ালো অন্য কুকুরগুলো। একটু পরে আমার দিকে ফিরে সে বললে—'আপনি দয়া করে দাওয়ায় বসুন, স্ত্রীকে ডেকে খবরটা দিয়ে যাই—ডাক্তারবাবু আসবেন'খন, ওর ঘুম বুঝলেন, বড় বিশ্রী। ডাক্‌লে সাড়া দেয় না! ডাক্তারের খবরটা পেলে তবু না ঘুমুতেও পারে।' সে কড়া নাড়া দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলে—দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক কঙ্কালসার রমণী তার শীর্ণ হাতে লণ্ঠন ধরে'। কঞ্চির মত হাত-পা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

"এরূপ অদ্ভুত চেহারা তো মানুষের দেখি নি—ম্যালেরিয়ায় হয় তো সবই করতে পারে! পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছবিতে অনেকটা এরকম ধরণের চেহারা শিশি হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই বটে।—আমাকে একটা মাদুর পেতে বসতে দিয়ে সে স্ত্রীকে বললে, 'মেয়েটিকে একবার দাও তো!' তৎক্ষণাৎ কাতর শব্দ করতে করতে একটী পাঁচ ছয় বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী এনে তার হাতে দিলে। কঙ্কাল – এ্যা—এ কি।

"আমাকে বললে—'দেখছেন, এর শরীরে কিছুই নেই—ম্যালেরিয়া ডাইনি এর রক্ত-মাংস কি রকম খেয়েছে।'

"···হারিকেনটা তার স্ত্রী আমার কোলের কাছে রেখে গেল। ভেতর থেকে একটা কাতর স্বর বেরিয়ে এলো। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম —'কে কাতরাচ্ছে ভেতরে।'

—'আমার ছোট ভাই অমন করছে—ওকে নায়েব মশাই পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে খুব জুতা পেটা করেছে—অপরাধ কি জানেন, এখন চৈত্র ও ভাদ্র কিস্তির টাকা বাকি। সে নায়েব মহাশয়ের পায়ে ধরে বললে—'হুজুর, একটু সবুর করুণ, পৌষ কিস্তিতে সব শোধ করে দেব'—কিন্তু নায়েব শোনে নি। বেচারী বেদম প্রহার খেয়ে ঘরের ভেতর যন্ত্রণায় ছটফট করছে—অ কুড়োন!' অত্যন্ত কাতর স্বরে ঘরের ভেতর হতে উত্তর এলো—'কি বলছো।' 'কেমন আছিস—' 'সে বলল 'আবার জর এলো—তুমি একটু আমার কাছে এস—আমার অবস্থা ভাল না—বুকের ভেতর কি রকম করছে!' '—দাদা বসুন—আস্‌ছি' বলে—কুঁড়ের ভেতর সে চলে গেল। থম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লুম, কখন দু'জন লোক

উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেন এক একটা অসুর, দেখলে ভয় লাগে। তারা লাঠি বাগিয়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রল—'পরাণ কাঁহা বাবু?' বুঝলুম, জমীদার বাড়ীর দুই যমদূতের মত বরকন্দাজ। ওরই নাম বোধ হয় পরাণ—আন্দাজে ঠিক করে নিয়ে বল্লুম—'ভিতরে—' তারা ডাকলো—'এই পরাণ—পরাণ হো—' ভেতর থেকে কোন শব্দ এল না। আমি বল্লুম—'তোমরা দাঁড়াও—ও এখনই আসছে—' '—ব্যাটার বুকে আজ বাঁশ ডলতে হ'বে—বাবুর হুকুম—' বলে ওদের মধ্যে একজন গোঁফ পাকাতে সুরু করলে।

"আমি বল্লুম—'তোমরা এত রাত্রে এসেছ কেন?' '—জমিদার বাবুর হুকুম এখনই ওকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে—' আমি স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবলুম, এই নিরীহ অসহায় পরিবারের উপর এতবড় অমানুষিক নির্য্যাতনে ভগবানের আসন কি টলবে না?

"...বরকন্দাজ দু'টো উত্তর না পেয়ে কুঁড়ের ভেতর ঢুকে গেল। মনে হোলো আশে পাশে যেন কত লোকই ওঁৎ পেতে বসে আছে—জঙ্গলের মধ্য হ'তে খিল্ খিল্ করে কারা যেন হেসে উঠ্‌লো—এরা কি এদের অনুচর!—ঘরের ভেতর অন্ধকার, বাইরে আমার কোলের কাছের লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ করে জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে গেল।

'—ও গো! আমাদের মেরে ফেল্লে—ওগো আমাদের মেরে ফেল্লে'—ক্ষীণ নারীকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো ভেতরে পরাণের স্ত্রী। প্রহারের শব্দ কাণে এসে বাজ্‌ল। পরাণ ও বুড়োন বোধ হয় একত্র চীৎকার করে বল্লে—'জান্ গেল—জান্ গেল—বাবুর ভিটেয় ঘুঘু চরুক—'আবার প্রহার! আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পার্‌লুম না, দু'টি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কুঁড়ের ভেতর গিয়ে দেখি—সব ফাঁকা—এ্যাঁ—এতগুলো মানুষ কোথায় গেল! তাদের চীৎকার—তাদের আর্ত্তনাদ—তাদের কাতরধ্বনি সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। সারাটা কুঁড়ে প্রদক্ষিণ করলুম্ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে জ্বালতে—দেখি, কোথায় কে!—শুধু বহুদিনের পুরানো কুঁড়ে পড় পড় অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ দিন ধরে কেউ এর মধ্যে বাস ক'রেছিল সে চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কি আশ্চর্য্য! বাহিরে মাদুরও নেই—লণ্ঠনটা অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

..."একটা দেশলাইয়ের বাক্সো ফুরিয়ে গেল—কাছে আর দেশলাইও নেই। চিন্তায় মাথাটা একবার বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। এখন উপায়! তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে বার হ'য়ে পড়লুম সত্য—পথ আর খুঁজে পাই না। বাগানটার ভেতর লক্ষ্য হারিয়ে চলেছি, এদিকে ওদিকে কে যেন ফিস ফিস করে কার কাণে কি বল্‌ছে—কে যেন আমাকে দেখে উপহাস করছে!

"... যা বল্‌ছি, এর একবিন্দু মিথ্যা নয়—বিশ্বাস করো আর নাই করো—প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হচ্ছে, একটা বিরাট ঐন্দ্রজালিকলীলা! .. জগতে অবাস্তব বলে যে সব পদার্থ উপেক্ষিত হ'য়ে আছে, তাও যে বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে—তার চাক্ষুষপ্রমাণ আমি পেয়েছি—শুধুই কি চাক্ষুষ প্রমাণ?—জীবন মরণ-সমস্যা—জনশূন্য স্থানে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিভীষিকা!

...বুঝলুম আমার অবস্থা শোচনীয়। যেখানে এসেছি, বড় সাংঘাতিক জায়গা। সারারাত্রি ধরে সেই বীথির মধ্যে ঘুরেছি—ওরই ভেতর মস্ত একটা ভাঙা পোড়োবাড়ী;—সাহস হোলো না তার দিকে চেয়ে থাকি—একদল শিয়াল ডেকে উঠলো—কুকুরগুলো গেল কোথায়? ওদের ডাক শুনতে পাই না! ক্রমেই নির্জ্জীব হ'য়ে আস্‌ছি—একটু পরে হয়তো সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে যাবে'—মানসিক দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে

অতিন্দ্রিয় লোক নিস্তেজ—অনিবার দুর্ব্বার বিপদের সম্মুখীন হয়ে কতক্ষণ সংগ্রাম করবো!

"...সর্ব্বদাই প্রশ্ন উঠছে, কি আশ্চর্য্য! ভৌতিক ব্যাপার ব্যতীত কি বলতে পারি একে ?

"...বঁইচির কাঁটার ভেতর এসে প'ড়ে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কি অশুভক্ষণেই না যাত্রা করেছিলুম! ভূত আছে কি না ও সম্বন্ধে কোন গবেষণা করি নি এবং আছে এ কথা বিশ্বাসও করি নি সত্য—ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কোলে বসে' ভূতের আজগুবি গল্প শুনতুম—ভয় হোতো। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ওটা কৌতুকের সামিল হয়েছে মাত্র।...যা দেখলুম, মনে হোলো ব্যাপারটা প্রহেলিকাময় বটে। ন্যায়শাস্ত্রে বলে, যা' প্রত্যক্ষীভূত তাকে অস্বীকার করা চলে না। নিশুতি রাত্রে এরূপ সঙ্কটে বোধ হয় আমার মত খুব কম লোকই পড়েছে।...বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে বহুক্ষণ পরে এমন জায়গায় এসে উপনীত হ'লুম, যার পায়ের কাছে নদীর জোয়ারের জল ফুলে ফুলে উঠছে। নদীতে মাঝিরা মাছ ধরছে—অনেকটা সাহস হলো। তাদের নৌকা থেকে খটাস্ খটাস্ শব্দ হচ্ছে, আলো জ্বলছে। প্রাণপণে ডাক দিলুম—'মাঝি ভাই! বাঁচাও—' প্রতিধ্বনি হোলো—'বাচাও' —ছ'চারবারের ডাক তারা উপেক্ষাই করলো—ভারি দুঃখ হোলো অথচ তারা শুনেছে আমার আকুল ডাক, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

"...ওরা এদিকে চায়—আবার মুখ ফিরায়। কেন অমন করছে ? তবু ডাকছি। শেষে তারা যখন মানুষ বলে আমাকে ধারণা করতে পারলো তখন নৌকা সেখানে ভিড়িয়ে তুলে নিয়ে বল্লে—'এমন জায়গাও বাবু এসেছেন—এ যে ভূতের রাজ্যি—উপদেবতার জ্বালায় কত মাঝি যে বিপদে পড়েছে, কত লোক যে মারা গেছে, তার হিসেব করে ওঠা যায় না—প্রাণে যে বেঁচে আছেন, এই ঢের!" তখনও আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত—বুকের স্পন্দন দ্রুত তালেই হচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন বল্লে—'প্রায়ই ঠিক্ ঐ বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে নিশুতি রাতে আমাদের ওরা ডাকে, আর বলে—'মাছ দিয়ে যাও।' তারপর অপর একজন জিজ্ঞাসা করলে—'কোথায় যাবেন ?' বল্লুম '—রামনগর—' '—ওঃ, আপনি তো পথ ভুলে অন্য জায়গায় এসে পড়েছেন—এ তো কামারডাঙা—'ভাতার খাগি' মাঠের কাছ দিয়ে পুবের দিকে যে রাস্তাটা শানিকদহের বিল ডান হাতে আর বাঁ হাতে চুড়ুইগাছি গাঁ রেখে এঁকে বেঁকে চলে গেছে, ওটাকে ধরে ক্রোশখানেক গেলেই রামনগর—মাঝখানে পড়বে একটা সাঁকো, নীচে দিয়ে চলে গেছে ছোট্ট একটা খাল—আপনি তো পশ্চিম দিকে এসেছেন—দিক্‌ভুল হয়ে গেছে।' আমি তাদের মুখের পানে বোকার মত চেয়ে রইলুম।

··সেই ব্যাপারের পর প্রতিজ্ঞা করেছি, মেয়েকে আর দূরে পাড়া-গাঁয়ে বিয়ে দেবো না—যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে।...হ্যাঁ...কি বললে...ঐ যে অত্যাচারের ছবিটা আমার সম্মুখে ওরা দেখিয়েছিল ওটা কি ? মনে হয় অতীতের কোন একদিনে হয়ত এম্নি অত্যাচারই পেয়ে পেয়ে শেষে এরা সপরিবারে মারা গেছে। নগন্য চাষাদের কাহিনী সভ্যতাগর্ব্বী মনুষ্য সমাজ উপেক্ষা করে, ইতিহাসের বুকে আখর টানতে চায় না। তাই বোধ হয় এরা মানুষ দেখ্‌লেই রাতে-ভিতে টেনে এনে দেখায় এদের ব্যথার শিখা—এদের বেদনার জ্বালা!

নীলাঞ্জন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ষোলো

মনীষাদেবী এবং চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। ঘরের মধ্যে সেই কয়েক মুহূর্ত্ত ধরে' এক-প্রকারের অভূতপূর্ব্ব অসহ্য স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। আমার মতো আর সকলেরই নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে গেছে!

ক্ষণকাল পরে মনীষাদেবী শান্ত অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—যে লোকটির ছবি ওই দেরাজের মধ্যে র'য়েছে, সে আজ বিশ বছর আগে মারা গেছে। তার নাম ফণি মজুমদার নয়।

চন্দ্রা ঝাঁজালো-কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—বিশ্বাস করি না, আপনার কথা। ওর নাম ফণি মজুমদার!

সন্দেহকে নিঃসংশয় করবার জন্তে আমি মুখ বাড়িয়ে ছবিখানি দেখবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু বোধ হ'ল, আমার উদ্দেশ্য বুঝেই মনীষা দেবী ক্ষিপ্রহস্তে ছবিশুদ্ধ দেরাজটি বন্ধ করে' চাবি লাগিয়ে দিলেন। তারপর স্থির শান্তকণ্ঠে বললেন—যে ছবিটি এই দেরাজ-এর মধ্যে রয়েছে, সেটি আমার এক পুরণো বন্ধুর ছবি। তাঁর নাম কি, তা' বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ফণি মজুমদার নয়।

চন্দ্রা নির্ণিমেষ-নেত্রে মনীষা দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হচ্ছে, আপনারা সকলে এক জোট হ'য়ে, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। আপনার বাড়ীতে না আসাই আমার উচিত ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফণি মজুমদার বেঁচে আছে এবং সম্ভবতঃ সে এই শহরেই আছে। দেখা যাক্, তা'কে পাই কি না!

চন্দ্রা দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল। নিশীথ-বাবু সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে চন্দ্রা তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বলে' উঠ্‌লো—অন্ততঃ আপনিও আমার বিরুদ্ধে হবেন না। বলুন আমায়, আপনার বন্ধুত্ব এবং সাহায্য আমি পাবো।

নিশীথবাবু নীচু হ'য়ে মৃদুকণ্ঠে কী যেন বললেন, আমরা শুনতে পেলাম না; তারপর চন্দ্রা ঘর থেকে বার হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অনুসরণ করলেন। জানলা দিয়ে দেখ্‌লাম, কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে তারা দু'জনে পাশা-পাশি চলেছে। দেখ্‌লাম, চন্দ্রা ক্ষিপ্র আগ্রহ-ব্যাকুল-কণ্ঠে অনর্গল কথা বলে' চলেছে এবং নিশীথবাবু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ছেন।

কিছুক্ষণ পরে মনীষা দেবী বললেন—কী আর দেখছো! এখানে এসে বসো! মেয়েটা নিশীথকে অস্থির করে' তুলবে!

অকারণে উত্যক্ত হ'য়ে তিক্তকণ্ঠে বললাম—তা' বলা যায় না। পুরুষেরা হয় ত ওই রকম প্রগল্‌ভতা পছন্দ করে।

—না, নিশীথ তা' করে না।

আমার মনের উত্তাপ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। বল্‌লাম—ওদের কথা যাক্‌। আমি একটা জিনিষ আপনার কাছে চাই, মনীষাদেবী।

—কি বল ?

—আমি ওই ফোটোখানা আর একবার দেখতে চাই।

মনীষাদেবী ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন; বোধ হ'ল যেন, তাঁর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ ক'রলে; মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন—তোমার ও অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না। অন্য কোন কথা থাকে ত বল।

উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লাম—আর কোন কথা নয়, ওই ছবি আমি দেখতে চাই; জানতে চাই ও ছবি কার! দিন দিন রহস্যের চাপে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। আমি আর সইতে পারছি নে। আমি ওই ফোটোগ্রাফ দেখব-ই।

মনীষা দেবী আমার পিঠের ওপর হাত রেখে স্নিগ্ধ-করুণ-কণ্ঠে বল্‌লেন—স্থির হও, কেতকী! ও ছবি তোমার না দেখাই ভাল। ও ছবি কার, সে কথা জানতে চেও না—আমার অনুরোধ।

তাঁর স্পর্শে যেন স্নেহের যাদু ছিল; শান্ত-স্বরে বল্‌লাম—বেশ, আপনার অনুরোধ আমি অবহেলা করব না। কিন্তু ছবিখানা আমি দেখেছি! তারপর থেকে আমার সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে।

আমার এই কথা শুনে তিনি উঠে গিয়ে দেরাজটি খুল্‌লেন; তারপর তার ভিতর থেকে ছবিখানিকে বার করে' নিয়ে আবার আমার পাশে এসে ব'সলেন। ভালো করে' সেখানি দেখ্‌লাম। একটি সুদর্শন সৌম্যকান্তি যুবা-পুরুষ—দুই চোখে তাঁর প্রাণ-চাঞ্চল্যের দীপ্তি, মাথার ঘন কেশরাজি দু'পাশে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য অনেকেই হয় ত চিন্‌তে পারতো না, কিন্তু আমার মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী হয় নি! ফোটোগ্রাফ্‌ আমার বাবার!

রুদ্ধ আচ্ছন্ন-স্বরে বল্‌লাম—একদিন তা'হ'লে তাঁর নাম ছিল, ফণি মজুমদার?

মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে মনীষা দেবী বল্‌লেন—হাঁ। অনেকদিন আগে।

বল্‌লাম—চন্দ্রা এই লোককেই অন্বেষণ করছে। ইনিই ছিলেন তার দাদার পরম শত্রু! ইনিই তা' হলে ··

মনীষা দেবী ত্রস্ত হ'য়ে আমায় থামিয়ে দিলেন—ও-সব কথা আমাদের আলোচনা করতে নেই কেতকী! তুমি অন্য কথা বল।

কিন্তু অন্য কথা কী বলব? আমার সারা মন যে ভেঙ্গে পড়ছে! মনে হচ্ছে যেন, মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত আগুনের প্রবাহ ছুটে চলেছে! আমার চোখের সুমুখে সেদিনকার মন্দিরের দৃশ্য ভেসে উঠ্‌লো! নিশীথবাবু এসে খবর দিলেন—বিজয়বাবু খুন হয়েছেন।

হত্যা! নরহত্যা! সকলের মুখে প্রশ্ন জেগে উঠ্‌ল—কে এই নিষ্ঠুর নরঘাতক?

আজ সেই নিদারুণ প্রশ্নের মর্ম্মঘাতী উত্তর পেলাম।

সতের

মনীষাদেবীর বাড়ী থেকে বার হয়ে পথে নেমে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরেই দেখলাম, পথের পাশে প্রসন্নমুখে নিশীথবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁকে দেখে অকারণে আমার মন উগ্র হয়ে উঠলো;—পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে গেলাম, কিন্তু তিনি এমন ভাবে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন যে আমার যাবার রাস্তা র'ল না। বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

তিনি বল্লেন—বাড়ী যাচ্ছেন?

অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে সংক্ষেপে বল্লাম—হাঁ।

আমার কণ্ঠস্বর যে এত নীরস এত নিষ্প্রাণ হতে পারে, আগে তা' কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

আমার উত্তর শুনে নিশীথবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন; তারপর পথের পাশে সরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আমি চন্দ্রার সঙ্গ নিয়েছিলাম বলে আপনি সম্ভবতঃ রাগ করেছেন; কিন্তু আমি কেন তার সঙ্গ নিয়েছিলাম জানেন?—আপনার জন্ত! সে এখানে কত দিন থাকবে এবং কি তার সঙ্কল্প—এই কথা জানবার জন্তই তার সঙ্গ নিয়েছিলাম।

বললাম—কিন্তু আমি ত আপনার কাজের কৈফিয়ৎ চাই নি।

ক্ষণকাল আমার মুখের পানে তাকিয়ে নিশীথ বাবু বল্লেন—আপনার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন ছিল, আমি ফিরবার পথে আপনাদের বাড়ী গিছিলাম, জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে কিন্তু আপনার ভগ্নী বল্লেন, তিনি অসুস্থ, এখন কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না।

—ঠিকই বলেছে সে। বাবা অত্যন্ত অসুস্থ।

তিনি প্রশ্ন করলেন—ডাক্তার আসে নি দেখতে।

—না। তিনি ডাক্তার ডাকতে মানা করছেন। একজন ভাল ডাক্তারকে আনা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হন না।

চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে নিশীথবাবু বল্লেন—আমার উপদেশ যদি শোনেন, তাহলে আপনার বাবা যেমন বলেন, ঠিক সেই রকম কাজ করবেন' অন্তথা করবেন না। তার কিসে ভাল হবে, তা' তিনিই সব চেয়ে ভাল বোঝেন। আমার হয়ে, তাঁকে বলবেন যে এখন তাঁর পক্ষে সব চেয়ে বড় ওষুধ হ'চ্ছে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্ত কোথাও গিয়ে অবস্থান করা। শুনলাম রূপনারায়ণপুরে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার যাবতীয় কাজ তাঁকেই দেখা-শোনা করতে হবে এবং তার জন্ত মাস দুই তাঁকে রূপনারায়ণপুর গিয়ে থাকতে হবে। তা' যদি হয়, তার চেয়ে ভাল কথা আর কিছুই নেই। যত শীঘ্র পারেন, আপনারা সেখানে চলে যান।

নিশীথবাবু চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে যেতে দিলাম না। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেমন করে তিনি আমার পথরোধ করেছিলেন, তেমনি ক'রে তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে বল্লাম—বাবার সম্বন্ধে যে কথাগুলি আপনি বল্লেন, সে গুলির সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক যে বিশেষ নেই, তা' আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমি অনেক কথাই জেনেছি, সুতরাং আমাকে আপনার ভুল বোঝাবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন নাই। আমি জানি চন্দ্রার কথা স্মরণ করেই আপনি বাবাকে সাবধান হবার উপদেশ দিচ্ছেন।

নিশীথবাবুর কণ্ঠ দিয়ে কোন প্রতিবাদের সুর বার হ'ল না, তিনি নীরবে নতনেত্রে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখের ওপর চিন্তার গভীর রেখা ফুটে উঠেছে।

ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—চন্দ্রা কি বলেছে? সে কি কারুর প্রতি তার সন্দেহ প্রকাশ করেছে?

—কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের প্রতি সে কোন সন্দেহ প্রকাশ করে নি বটে, কিন্তু সে সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে এখন কিছুদিন এই সহরে থাকবার সঙ্কল্প করেছে। সে আপনাকে সন্দেহ করেছে।

—আমাকে!

—হাঁ; আপনাকে এবং মনীষা দেবীকে। তার বিশ্বাস, আপনারা দু'জনে তার দাদার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন, কিন্তু তাকে

বলেছেন না। তার বিশ্বাস, জগদীশবাবুর কাছ থেকে সে অনেক খবর পেতে পারে, কিন্তু আপনি তাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছেন না।

নিশীথবাবুর মুখের পানে দুচোখ তুলে বল্লাম—তাকে কি কোন মতে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না? তাকে যত দেখচি,ততই আমার ভয় বাড়ছে।

স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে পরমাত্মীয়ের কণ্ঠে নিশীথবাবু চাপা স্বরে বল্লেন—সে যাতে এ শহর ছেড়ে কলকাতা বা শিলং চলে যায়, আমি তো সেই চেষ্টাই করছি। সে যাতে কোন রকম গুরুতর কাজ কিছু না করে, আমি সর্ব্বদা সেদিকে দৃষ্টি রাখবো, ভাগ্যচক্রে সে আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ; সে জন্যে আমার কথা অবহেলা করবে না।

ক্লিষ্টকণ্ঠে বল্লাম—আমি জানি, আপনিই এক দিন তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন ..

—সে জন্যে আমি বিশেষ অনুতপ্ত। আচ্ছা আসি এখন। নমস্কার।

বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম, অতসী বাবার কাজে-কুমুদবাবুর কাছে গিয়েছে; বুধুয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম সেরে কুয়ো থেকে জল তুলছে। সারা বাড়ী যেন কি এক দুর্য্যোগের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

নম্রপদে বাবার ঘরের কাছে এগিয়ে গেলাম, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দরজার দিকে পিছন ফিরে বাবা টেবিলের সুমুখ বসে আছেন। ধীরে ধীরে ঘরের মাঝে প্রবেশ করলাম।

বাবা আমার আগমন জানতে পারলেন না। শ্রান্তি এবং অবসাদে তাঁর সর্ব্বশরীর যেন মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়েছে; দুই চোখ মুদ্রিত, বোধ করি তন্দ্রার আবেশে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তাঁর পাংশু বিবর্ণ চিন্তাশীল মুখের পানে তাকিয়ে কান্নায় আমার বুক জলে উঠলো। দিন দিন আতঙ্কে উত্তেজনায় তিনি যেন শুষ্ক, শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর কাঁধের উপর হাত রাখতেই জ্ঞান হ'ল। চমকে উঠে, চোখ মেলে আমায় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন,—কেতকী! কতক্ষণ এসেছো মা।

—এই মাত্র। এখন কেমন আছো বাবা।

—ভালই আছি।

বললাম—কিন্তু আমার তো মনে হয় না বাবা। দিন দিন তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছো। সকালে খাওয়া তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছো। এ রকম করলে তো শরীর সারবে না বাবা। তুমি অনুমতি কর, আমি কলকাতা থেকে ভাল ডাক্তার আনাই।

বাবা মাথা নাড়লেন। তাঁর সেই দৃঢ়-সঙ্কল্প-ব্যঞ্জক মাথা নাড়ার অর্থ ভালো করেই জানি। কিছুতেই তার নড় চড় হবার উপায় নেই!

ক্ষণকাল নীরব থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন—বিজয়ের ভগ্নী চন্দ্রা এখন কোথায়? সে কি এ শহর পরিত্যাগ করেছে?

ঠিক এই প্রস্তাব অবতারণা করবার জন্যেই এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলাম আজ বাবার মুখ থেকে আসল কথাটা আমায় জানতেই হবে; না জানার অবরুদ্ধতায় আমার নিঃশ্বাস দিন দিন যেন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করেছে।

মাথা নেড়ে বললাম—না; সে যায় নি। সম্ভবত এখন কিছুদিন যাবেও না। এখানে সে একটি বন্ধুর দেখা পেয়ে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

—বন্ধু? কে সে।

নিশীথবাবু। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রার অনেক

দিনের জানা-শোনা। শিলংয়ে তিনি একবার তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

—কোথায় শুনলে ?

বলতে সাহস হ'চ্ছে না। বাবার নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় মনীষা দেবীর বাড়ী গিছলাম, এ কথা শুনে না জানি তিনি হয়ত ভীষণ রেগে উঠবেন। উত্তর দিতে আমার বিলম্ব হচ্ছে দেখে বাবা বললেন—কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কেতকী ?

নিম্নকণ্ঠে বল্লাম—মনীষা দেবীর বাড়ী!

আমার কথা শুনে বাবার মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল। ভাবলাম, এইবার আমার ওপর তাঁর ক্রোধ ফেটে প'ড়বে। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ সে-কথা ভুলেই গেলেন। ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—সেখানে সে কি করতে গিয়েছে!

—তা' বলতে পারি না। বোধ হয়, সে এখানকার প্রত্যেক বাঙালীর বাড়ী গিয়ে ফণি মজুমদারের খোঁজ করছে। তার বিশ্বাস, সেই লোকই তার দাদাকে হত্যা করেছে। সে বলে ··

—কি বলে ?

—সে বলে ফণি মজুমদার এই শহরের কোথাও লুকিয়ে আছে। তাঁকে খুঁজে বার ক'রে তবে সে নিরস্ত হবে।

বাবা মাথা নেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—মিথ্যে কথা! তাকে কোনদিন দেখতে পাবে না। ফণি মজুমদার বহুদিন মারা গেছে।

শান্ত কণ্ঠে বল্লাম—সে কথা সে বিশ্বাস করে না! আর কেন-ই বা তা করবে ?

—তার মানে ?

—তার মানে সে-কথা সত্যি নয় ? ফণি মজুমদার মারা যায় নি। সে তা জানে।

কঠিন বিবর্ণ মুখে বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,—তাঁর সারা দেহ উত্তেজনায় কাঁপছে। বিকৃত-কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—কে বললে; কে বললে, সে মরে নি। কার স্পর্দ্ধা বলে যে ফণি মজুমদার আজো বেঁচে আছে ?

এক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে অবিচলিত স্বরে বল্লাম—বাবা রাগ কোরো না। আমিই বলতে পারি সে কথা। আমি জানি, বহুদিন, বহু বছর আগে, তুমি নিজেকে ফণি মজুমদার নামে পরিচয় দিতে। চন্দ্রা তোমাকেই খুঁজছে!

যার মুখ থেকেই ধ্বনিত হোক, সত্য যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখন তার সেই অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত দীপ্তির কাছে মানুষের মাথা আপনা-থেকে নুয়ে আসে।

বাবা আমার কথায় প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পেলেন না। তিনি পুনরায় টেবিলে ভর দিয়ে ব'সে পড়লেন—তাঁর দুই চোখ যেন অবসন্নতার ভারে নিমীলিত হ'য়ে এলো। কয়েক মুহূর্ত্ত বিবশ নিস্পন্দভাবে নীরব থাকবার পর মৃদু ত্রস্তকণ্ঠে বললেন—সে কি তা সন্দেহে করে ? সেই জন্যেই কি সে এখানে এসেছিল ?

বল্লাম না; সে তোমার কাছে তার দাদার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। তার বিশ্বাস ফণি মজুমদার এই শহরেই আছে।

—কেমন ক'রে তার মনে এ-ধারণা জন্মালো ?

—সে মনীষা দেবীর বাড়ীতে তাঁর ড্রয়ারের মধ্যে ছবি দেখেছে।

আমার কথায় তাঁর সারা দেহ যেন বজ্রাহত হয়ে গেল! ধীরে ধীরে তিনি বিছানার ধারে এসে শয্যার উপর গা' মেলে দিলেন। তাঁর বাক-শক্তি কে যেন হরণ করে নিয়েছে।

তাঁর পায়ের কাছে ব'সে পায়ে হাত বুলতে বুলতে বল্লাম—বাবা! অনেক দিন সয়েছি, কিন্তু পারছি নি,—এ-গুপ্ত-রহস্যের গুরুভার তিলে তিলে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছে।

আজ তুমি আমায় বল, মনীষা দেবী, বিজয় দত্ত, চন্দ্রা, নিশীথবাবু—এদের সঙ্গে তোমার কি গোপন সম্পর্ক আছে? যে-রহস্য চারিদিকে ঘণিয়ে উঠে তোমাকে এমন-জোরে দুঃস্থ আর্ত্ত করে তুলেছে, সে রহস্যের যবনিকা তুমি আজ আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দাও!

বাবা করুণ কোমলকণ্ঠে বল্লেন—কেতকী, আজকের দিনটা আমায় রেহাই দে মা; কাল তোর সকল প্রশ্নের উত্তর আমি দেব!

আঠারো

অকস্মাৎ কথাটা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আমার চারিধারে তার শিখা বিস্তার করলে যেন!—

পাগল! আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি—ছিঃ, ছিঃ, কেমন ক'রে ও-কথা আমার মনে উদয় হ'তে পারলো—

আমি হয়েছি ঈর্ষান্বিতা? চন্দ্রার প্রতি আমার মনে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা জেগেছে; এবং সে ঈর্ষার কেন্দ্রস্থল, নিশীথবাবু?

শয্যা ছেড়ে উঠে বসলাম। লজ্জায় এবং উত্তেজনায় আমার দুই কান গরম হয়ে উঠেছে! কথাটা ভেবে আমার হাসি পাওয়াই উচিৎ ছিল মনে ক'রে সহসা সশব্দে হেসে উঠলাম। কিন্তু সে-হাসির প্রতিধ্বনি শুনে ভয় হ'ল—অস্বাভাবিক হাসি, কৃত্রিম হাসি!

কিন্তু না। এ দুর্ব্বলতাকে রসসিক্ত ক'রে প্রশ্রয় দেবার সময় আমার নেই। যে-কথা আমার স্বপ্নের মধ্যে জেগেছে, স্বপ্নের মধ্যেই তার অবসান ঘটুক।

সারারাত ভালো ঘুম হয় নি। ভোর বেলা খানিকটা বেড়িয়ে অবসন্ন দেহকে ঠিক করে নেব ভেবে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমেই যার দেখা পেলাম, তিনি হচ্ছেন নিশীথবাবু!

তখন খুব ভোর। গাছের মাথায় পাখীর ছানারা সবে ঘুম থেকে উঠে কাকলী সুরু করেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সদ্য-জাগা সূর্য্যের আলো যেন তীরের ফলার মতো ছুটে আসছে। তারই একটা রশ্মিরেখা একেবারে আমারি দু'চোখের ওপর এসে প'ড়ল।

নিশীথবাবুকে যেন নতুন করে দেখলাম। সুন্দর একটি রেশমের পিরাণ ভেদ করে তাঁর সুগঠিত দেহের সৌষ্ঠব দীপ্তি পাচ্ছে। কোঁচানো ধুতির অগ্রভাগ মাটীতে এসে ঠেকেছে। মুখে তার কোমল স্নিগ্ধ হাসি...

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এমনি দিনের এমন মধুর সকালটিকে নষ্ট ক'রে তাঁকে আঘাত করবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে আমি সংযত করতে পারলাম না! বক্রভাবে হেসে বল্লাম—নমস্কার! বন্ধু-সন্দর্শনে চলেছেন বুঝি?

কথাটা তিনি বুঝতে পারলেন না? নিশীথবাবুর বোধ শক্তি সবদিকে কম। অনেক সহজ কথাই তিনি বুঝতে পারেন না!

বল্লাম—আপনার বন্ধু অর্থাৎ বান্ধবী, মানে শ্রীমতী চন্দ্রা; বুঝেছেন এইবার! তিনি তো এইখানেই আছেন?

নিমিষে তাঁর মুখের প্রসন্ন দীপ্তি মরে গেল—সকালবেলাকার সূর্য্য যেন এরই মধ্যে অস্ত গেছে! শুষ্ককণ্ঠে বল্লেন—হাঁ, সে এইখানে আছে, বাজারের কাছে তার এক পরিচিত লোকের বাড়ীতে উঠেছে।

—এখন কিছুদিন এইখানেই থাকবে বোধ করি?

—সম্ভব।

—সে জন্যে আপনি নিশ্চয়ই খুব উল্লসিত বোধ করছেন?

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে নিশীথবাবু ব'লে উঠ্‌লেন—'হোয়াট্ ননসেন্স্'!

পরক্ষণেই গলার স্বর নীচু করে বল্লেন —আমায় মাপ করবেন! কথাটা বলা বোধ করি আমার উচিৎ হয় নি। কিন্তু, কিন্তু,আপনার শেষ কথাটাও খুব সঙ্গত হয় নি—তা' বলতে আমি বাধ্য!

খুসী মুখে বল্লাম—বেশ, আমিও আমার কথা প্রত্যাহার করলাম। এখন বলুন, চন্দ্রা কি নিশ্চয় ক'রে কারুকে সন্দেহ করেছে।

আমার খুসী মুখ দেখে নিশীথবাবু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—মেঘের আড়াল থেকে আবার সূর্য্যোদয় হ'ল! নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো গভীর ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন—না, তা' এখনো করেনি বটে, কিন্তু তার বিশ্বাস, আপনি ফণি মজুমদারকে জানেন এবং তাকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখছেন! সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনার ওপর চন্দ্রার অত্যন্ত রাগ,—আপনাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না!

বল্লাম—আমাকে যে সে পছন্দ করে না, তা' আমি জানি, কিন্তু তা' আশ্চর্য্যের বিষয় কেন?

নিশীথবাবু আমার মুখের পানে তাকিয়ে বল্লেন—আশ্চর্য্যের বিষয় বৈকি, আপনার ওপর যে কারুর মনে বিরাগ জন্মাতে পারে, আমি তা' ধারণাই করতে পারি না।

একান্ত সহজ এবং সরল ভাবে কথাগুলি তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হ'ল, সেগুলি যে আর একজনের মনে কতখানি তরঙ্গ তুললো তা' তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না। মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে তার দুই চোখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বল্লাম—চন্দ্রা যে কেন আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে, তার কারণ আমি জানি!

—জানেন! কি আশ্চর্য্য! কই, আমি তো' জানি না। কি কারণ?

—সে আপনি বুঝতে পারবেন না।

আমার কথা শুনে এবং আমার মুখের পানে তাকিয়ে নিশীথবাবু বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট দু'জনেই মৌন হয়ে রৈলাম। দু'জনেই যেন কথা বলবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমার দুই কান উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন, মুখের পরেও তার ছায়া এসে পড়েছে।

কিয়ৎকাল পরে নম্রকণ্ঠে বল্লাম—বাবার ওষুধ খাবার সময় হ'ল। আমি যাই।

নিশীথবাবু তবুও কোন কথা বল্লেন না। তেমনি স্থির-অপলক-নেত্রে আমার পানে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ক'রে ধীরে ধীরে আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম।

উনিশ

দুপুর বেলা মনীষা দেবীর কাছ থেকে এক-খানি ছোট্ট লিপি এলো।

বৈকালে আমার কাছে এসো। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

কিসের প্রয়োজন?

অপরাহ্ন পার না হ'তেই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মনীষা দেবীর বাড়ীর দরজায় পা দিলেই মনে হয়, যেন একটী পরম আশ্রয়-তীর্থের মধ্যে প্রবেশ করছি, এইবার আমার মনের সকল শঙ্কা দূর হবে এবং সকল আকাঙ্ক্ষা হবে চরিতার্থ! আমার এ অনুভূতি যেমন অভিনব, তেমনি অনির্ব্বচনীয়!

আমাকে দেখে হাত ধরে আমায় ভিতরে নিয়ে গিয়ে মনীষা দেবী আমায় একখানি সোফায় বসালেন, তারপর নিজেও আমার পাশে ব'সে বল্লেন—ব'সো; তোমার কথা কাল থেকে আমার কেবলি মনে পড়ছে। কি দুর্ভাগ্য-ক্রমেই ওই চন্দ্রা মেয়েটা এখানে এসেছিল। ও আসা অবধি রাত্রে আমার ঘুম নেই। সমস্ত

দিনের আস্বাদ আমার মুখে ওষুধের মতো তিতো হয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—চন্দ্রা কি এখন এসেছিল এখানে ?

——হাঁ। এখান থেকে নিশীথকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়েছে। নিশীথকে সে যেন ছায়ার মতো অনুসরণ করে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না।

কিয়ৎকাল নীরব থেকে বল্লাম হয়ত, হয়ত তা' ভালই। তাতে চন্দ্রার মন আর অন্য বিষয়ে উগ্র হয়ে উঠবে না।

—সে আশা আমিও করি এবং নিশীথ-ও যে তাকে সহ্য করে, তার কারণ-ও তাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাতে বিশেষ ফল হবে না,—পুলিশে খবর দিয়ে তার দাদার হত্যার তদন্ত করতে চন্দ্রা নিরস্ত হবে না।

মনীষা দেবীর কথা শুনে আমার মন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। শঙ্কিত মুখে বল্লাম—তা'হ'লে কি হবে ?

তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। তার দুই চোখে কাতর করুণার ছায়া ভেসে উঠ্‌লো। সহানুভূতির সজলকণ্ঠে বল্লেন—এ-বয়সে তোমাকে অনেক দুঃখের ভার বহন করতে হয়েছে কেতকী,—তোমার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝতে পারছি। তোমার কথা যতই আমার মনে পড়ে ততই তোমাকে আমার আরো ভাল লাগে ··

তাঁর কথা শেষ করতে দিলাম না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লাম—দুঃখের ভার বহন করতে আমি ভয় পাইনে ; কিন্তু যে-রহস্য আমাদের জীবনে ঘণিয়ে উঠেছে তার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার দুঃখ তাতেই বেশী। আপনি তো সবই জানেন ; আপনি বলুন, আমায় সব কথা।

তাঁর কাছে স'রে গিয়ে তাঁর একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। বলতেই হবে আজ! আমি শুনবোই।

মনীষা দেবী স্খলিত কম্পিত স্বরে বল্লেন—তা' আমি পারবো না, কেতকী। তুমি আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

—না ; আমি কিছুতেই আজ নিরস্ত হব না। আমায় বলতেই হবে। আমার বাবা এবং আপনার মধ্যে কী এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অস্তিত্ব অনুক্ষণ আমার উৎপীড়িত করে তুলছে। আর আমি সইতে পারছি না। আমায় বলুন, আমি বাঁচি।

আমার দৃঢ় কণ্ঠের দৃপ্ত উক্তি কিছুক্ষণের জন্যে তাঁকে স্তব্ধ নির্ব্বাক ক'রে দিলে। তিনি স্থির-নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত শূন্যের পানে তাকিয়ে রৈলেন। উত্তেজনায় আমার অন্তর দ্রুততর তালে স্পন্দিত হ'তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে তিনি শুধোলেন—তাহ'লে তুমি শুনবেই ?

—হ্যাঁ। শুনবোই।

তখন একান্ত করুণ কোমলকণ্ঠে তিনি বল্লেন—তাহ'লে শোন। তোমায় একটি গল্প বলি।

তার কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে—একান্ত অপূর্ব্ব অপরিচিত সে স্বর। নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। কী এক অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে আমার বুকের রক্ত হীম হয়ে গেল।

মনীষা দেবী বলতে লাগলেন :

এক ছিল তরুণী মেয়ে। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমতী। ছেলেবেলাতেই সে তার বাপ-মাকে হারিয়েছিল। যখন বড় হ'ল তখন সে দেখলে, তার আশে পাশে আছে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী দূর-আত্মীয়ের দল এবং পিতৃ-সঞ্চিত

বিপুল অর্থের আড়ম্বর। মেয়েটীর জীবনে কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। লেখাপড়ার আসক্তি তার ছিল অনির্ব্বান; সেই আসক্তির বশীভূত হ'য়ে সে ক্রমে একদিন বাঙলা দেশের লেখিকাদের পর্য্যায়ভুক্ত হল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে তিনি পুনরায় সুরু করলেন:

মেয়েটির মাথায় ছিল নতুন ভাবের বন্যা। সমাজ এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট দল নিয়ে সে যুদ্ধঘোষণা করলে। যা-কিছু পুরাতন, যা কিছু যুক্তিহীন, তার বিরুদ্ধে চল্ল তার দুর্ণিবার সংগ্রাম। সামাজিক বিধিনিয়মের শৃঙ্খলা এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তার কলমের মুখে বিলীন হ'ল। তারপর সে রুখে দাঁড়ালো—প্রচলিত বিবাহের বিরুদ্ধে। যে বিবাহ এতদিন চলে এসেছে, তাকে সে স্বীকার করলে না। বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে দাস মনোবৃত্তির পরিচায়করূপে গণ্য ক'রে তার বিরুদ্ধে সহস্র ধারায় তার লেখনীকে চালিত করলে। তার সাহস ছিল দুর্জ্জয়। আত্ম-বিশ্বাস ছিল অফুরন্ত!

আবার ক্ষণকালের জন্যে তিনি নীরব হ'লেন। স্তব্ধ নেত্রে আমি তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আবার তিনি আরম্ভ করলেন:

কিছুদিন পরে মেয়েটির জীবনে একটি পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। সে ছিল বয়সে তরুণ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল এবং নব নব চিন্তার প্রেরণায় অনুক্ষণ দীপ্তিমান। দু'জনে সম্মিলীত হ'ল। মেয়েটির না ছিল কোন অভিভাবক, না ছিল কোন বাধা ছেলেটি তাকে বিবাহ করতে চাইলে। মেয়েটি ক্ষণকালের জন্যে দ্বিধান্বিত হ'ল—পুরাণো সংস্কার গুলোকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা তাকে জয় করতেই হবে; তা' না হ'লে কেমন করে সে ভবিষ্যত নারী সমাজের কাছে তাঁর ভাবধারার আদর্শকে সংস্থাপিত করবে? তার ভক্তের দল তার মুখের পানে আশান্বিত অন্তরে চেয়ে আছে। সে ছেলেটির বিবাহ প্রস্তাবকে হেসে উড়িয়ে দিলে—বিবাহ একটা আজন্মাজ্জিত কুসংস্কার, তাকে সে স্বীকার করে না। ছেলেটি অনেক বোঝাতে চাইলে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। মেয়েটিই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল।

মুহূর্ত্তকালের জন্য মনীষা দেবী আত্মবিস্মৃত হ'য়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন; তার পরক্ষণেই আবার বলতে লাগলেন:

তাদের দু'জনকার জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস খুব সুখের নয়। অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, দু'জনের চরিত্রে বহুবিধ বড় বড় অমিলের পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—সে বাধা অতিক্রম করা সহজ সাধ্য নয়। ছেলেটি ছিল স্বপ্নদর্শী, ধর্ম্মপ্রাণ। মেয়েটির কাছে ধর্ম্ম ছিল বিদ্রূপের বস্তু। ছেলেটি সহসা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে মহা উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলে। এ-ব্যবস্থা মেয়েটির পক্ষে অসহ্য হ'ল। সে তাকে পরিত্যাগ করলে।

মনীষা দেবীর কাহিনী শুনে আমার সকল অনুভূতি যেন অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। দু'চোখের দৃষ্টি আমার যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে তাঁর কোলের ওপর মাথা রাখলাম। তিনি সরস স্নেহে আমার চুলগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ক্ষণকাল পরে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—আপনি, আপনিই সেই মেয়ে...?

স্নিগ্ধস্বরে তিনি বল্লেন—হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে; সে ছেলেটি হচ্ছেন, তোমার বাবা; এবং তুমি...

আমি। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো বলে উঠলাম—কি আমি!

দু'হাতে আমার হাত চেপে ধ'রে তিনি বল্লেন—এবং তুমিই হ'লে আমাদের সেই অশুভ মিলনের দুর্ভাগা সন্তান!

চল্‌বে·

বন্দিনী সীতা!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যে একজন ছিল—তাহার নাম যাই থাক, আমরা ক্যাপা বলিয়াই তাহাকে ডাকিতাম। ক্যাপার ধারণা ছিল, পৃথিবীর সবাই তাহাকে ভালবাসে। বিশেষ করিয়া মেয়েদের প্রীতি নাকি সে চোখের একটা ইঙ্গিতেই দখল করিয়া লয়। কতদিন তাহার মুখে কত অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছি। ট্রামে উঠিতেই দেখা এক ষোড়শীর সঙ্গে—আর যায় কোথা! শ্রীকৃষ্ণের মত বাঁকা একটুকরা দৃষ্টির বাণ হানিতেই বেচারী একেবারে ভিজা বিড়াল! ইত্যাদি···

কথাগুলার মধ্যে কতটা সত্য ছিল, সে গবেষণা করার প্রয়োজন আমরা বোধ করি নাই—নির্ব্বিবাদেই তাহার নাম দিয়াছিলাম—ক্যাপা।

বহুদিন ক্যাপাকে ক্যাপাইয়াই চলিতেছিল; কিন্তু একদিন তাহাকে দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইলাম। দারুণ শীতে আমরা যখন ঘরের মধ্যে মুড়ি-সুড়ি দিয়া অলস গল্প-গুজবে সময় কর্ত্তন করিতেছি, তখন সে রীতিমত সাবান মাখিয়া বুটীদার পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। মুখে শুধু শ্রী ফুটিয়া উঠে নাই, পুরুষ্টু গালে আঙুর রস ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

আড়ালে ডাকিয়া বলিলাম—ব্যাপার কি হে?

দেখিলাম লজ্জায় তাহার মাথা নীচু হইয়া পড়িয়াছে। বলি বলি করিয়াও কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। বলিলাম—এ ত সুবিধার নয়, একেবারে নবোঢ়া বধূর মত যে লাল হয়ে উঠ্‌লি! কি হয়েছে ভেঙে বল ত?

কেন জানি না, কোনদিন আমাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, আজও পারিল না। অতি কষ্টে অস্ফুট ঠোঁট দিয়া যাহা উচ্চারণ করিল, তাহা যেমনই মধুর, তেমনই কৌতুকপ্রদ।

সেদিন 'চিত্রা'য় মীরাবাই দেখিতে গিয়া সে দুইটী তরুণীর হৃদয় জয় করিয়া ফিরিয়াছে। এবং তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যার এ অভিযান তাহাদেরই গৃহাভিমুখে। ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ততটা লোমহর্ষণ না হইলেও চমকপ্রদ বটে!

তাহারই পিছনের 'সীটে' বসিয়াছিল দুইটি তরুণী। এবং বিধাতার দেওয়া তাহার হিমালয়ের মত ঢ্যাঙা মাথাটাই নাকি হইয়াছিল তাহাদের চক্ষুশূল! একজন অপর জনকে বলিতেছিল, বল না ভাই, মাথাটা পকেটে পুরতে পয়সা দিয়ে ভাল বিপদে পড়্‌লুম ত! মাথাই দেখ্‌ব না কি?

অন্যজন নিম্নকণ্ঠে বলিল—চুপ, শুনতে পেলে কি ভাবে বল ত?

ভাব্‌বে ছাই!

তাহাদের ছাই-পাশ ভাবিতে কিন্তু ক্যাপা অধিক সময় দেয় নাই। পাশের দু'টি ভদ্রলোককে বলিয়া-কহিয়া পিছনে বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের নিজেদের সিটগুলি উঁহাদের ছাড়িয়া দিয়া প্রথম নম্বর ফুল মার্ক পাইয়াছিল। দ্বিতীয় নম্বর পাইল—মুখরা মেয়েটি বায়স্কোপের মধ্যপথে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায়।

ভিতরে কি ছিল কে জানে! স্বামী সন্দেহ

করিয়া স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করিতেছিল সে দৃশ্যটা তাহার সহ্য হইল না।

মহিলা দুইটি সম্ভবত প্রগতির উপাসিকা, তাই সঙ্গে পুরুষ না লইয়াই গতি করিয়াছিলেন। আসন্ন বিপদে হতভম্ব হইয়া বাড়িতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। ক্ষ্যাপা শুধু সাহায্য করা নয়, বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছে।

বলিলাম—চমৎকার! তোর জন্মটাই দেখ্‌ছি এ্যাডভেঞ্চার নক্ষত্রে! এখন কবে নিয়ে যাচ্ছিস্ বল ত শুনি?

যাবে? কিন্তু তাঁরা যদি কিছু মনে করেন?

ভাঁওতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে দেখিতেছি। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলাম—আ রে না না, ও সব মেয়েরা পুরুষ দেখলে রাগ করে না, আর যদি করেই তাতে তোরই ত অপমান! চল, আজই যাওয়া যাক।—

আজই!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, চল দেখি।—

কিন্তু ···

তাহার এই 'কিন্তু'র মধ্যে যে কত কি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলাম।

সে বলিল—তবে চল।

যাইতে হইবে বই কি!

একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমরা যখন দাঁড়াইলাম, আকাশের বুকে তখন সন্ধ্যা তারার ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি মিট্‌ মিট করিয়া জলিতেছে। ···

বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল—একটা ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়িয়া শেষটা মার খাইব না কি! কিন্তু ভাবিবার অবসর মিলিল না। সদর দ্বার পার হইতেই সিঁড়ি, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে-না-দিতেই উপর হইতে হুড়মুড় করিয়া যেন কাহারা নামিয়া আসিল: আসুন সর্ব্ববিজয়-দা'।

ডাক শুনিয়াই গা-টা কেমন রি-রি করিয়া উঠিল। ক্ষ্যাপাটা হইল কি, সর্ব্ব তাহার উপর আবার বিজয়—শেষে দা'—কিন্তু বেশী ভাবিবার অবসর কোথায়! সামনে চাহিয়া দেখিলাম—আকাশের বুক হইতে এক-ঝলক বিদ্যুৎ যেন কোন ফাঁকে বাহির হইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

সঙ্গে নূতন লোক দেখিয়াই সম্ভবত মেয়েটি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া গেল। ক্ষ্যাপা বলিল—ইনি আমার বন্ধু, ধরলেন তোমা-দের দেখব বলে তাই নিয়ে এলুম।

ঢিপ্‌ করিয়া পায়ের উপর একটা মাথা আসিয়া পড়িল।

থাক থাক, করেন কি, করেন কি বলিয়া পিছাইয়া গেলাম।—আশীর্ব্বাদের কথা মনে আসিল না।

উপরের ঘরে গিয়া বসিলাম। সত্যই মনের মত সাজান ঘর বটে! মেঝের ঢালা ফরাসের উপর বসিয়া পড়িলাম। অদূরেই একটী তরুণ বসিয়াছিল, দেখিলাম—উঠিয়া ক্ষ্যাপার পায়ের ধুলা টানিয়া মাথায় বোঝাই করিতেছে।

ভাল বিপদ যা হক!

ক্ষ্যাপা বলিল—এঁর নাম নৃত্যকালী দত্ত, ইনিই এঁর স্বামী!

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলাম, আর বলা হইল না; সম্মুখে দেখিলাম—চায়ের 'কাপ' লইয়া মেয়েটী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সরলতার যেন একখানি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! বলিল, ভারী ঠাণ্ডা পড়েছে। আগে চা-খেয়ে তারপর গল্প করুণ। তা' ছাড়া, যে গল্পে লোক উনি, পরে হয় ত সে ফুরসৎ-ই পাবেন না।

উনিটী লাফাইয়া উঠিলেন ঃ কি, কি বল্‌লে ! গল্পে আমি ? ও কথা আর বল্‌তে হয় না। সর্ব্ববিজয়দার সঙ্গে গল্প করবে বলে' দু'বেলার রান্না ত একবেলাতেই সারতে সুরু করেছ, আবার আমায় বলা হচ্ছে ··

শুধু আমিই যেন শুন্‌তে চাই, নিজে যে আজ একমাস ধরে' তাসের আড্ডার পাট তুলে দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছ, সে বুঝি বাড়ীর পাখীটার লোভে, না ?

সর্ব্ববিজয় বলিয়া উঠিল—ব্যাপার ক্রমে জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে ! নৃত্যকালীর হয়ে আমিই বলছি—পাখীর লোভে নয়, তার মালিকের—

যান, আপনাকে আর ঠাট্টা কর্‌তে হবে না ! বলিয়া অনীতা সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

কেমন একটা শান্ত-শ্রী যেন সর্ব্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। মনে মনে খুসী না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তথাপি বুকের ভিতর কোথায় যেন কি একটা খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিয়া পীড়া দিতে লাগিল—বিকৃত মস্তিষ্ক এই লোকটার মধ্যে এমন কি উহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে, যাহার জন্য তাহার এত প্রতিপত্তি !

অনীতা আবার ঘরে ঢুকিল; মুখখানিতে যেন হাসি মাখান ! বলিল, বিজয়-দা আর কাউকে খুঁজছ নিশ্চয়, না ? সে-ও যেতে চায় নি, বলে', বায়স্কোপ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তার দিদি আর ভগ্নিপতি জোর করে' ধরে' নিয়ে গেল। বলে গেছে, যেন চলে' না যান তার জন্যে খবরদারী করতে। তার মহাজনটী ও এসে পড়্‌লেন বলে !

অন্যজনের আগমনের প্রতীক্ষায় ক্ষ্যাপা কতটা উৎসুক হইয়াছিল জানি না, আমি কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তবু ভালো !

গল্প-গুজবের মধ্য দিয়া সময়টা কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, হুঁস ছিল না। হঠাৎ হুঁস হইল দ্বার-প্রান্তে এক নারীমূর্ত্তি দেখিয়া। আমাকে লক্ষ্যের মধ্যে আনা প্রয়োজন, ইহা তাহার হাব-ভাবে প্রকাশ পাইল না। বেশ প্রশান্ত ভাবেই সে অগ্রসর হইয়া ক্ষ্যাপার পায়ে মাথা লুটাইয়া দিল।

একটা হাসির বেগ সংবরণ করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিত, যদি না অনীতা হঠাৎ আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিত—এদিকেও মাথাটা ঠেকা আপত্তি, আমার কুটুম্ব নয়, ইনি ওঁরই—

আচ্ছা লজ্জায় ফেল্‌তে পারেন যা'হ'ক। না না, ওসব বাইরের লৌকিকতা আমি পছন্দ করি না। মাপ করবেন—

বাধা দিয়া মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া বলিল—মাপ করতে আমি জানি না, তবে এই জানি, পছন্দ করার বিচার বোনের নয়, সে শুধু নমস্কার করেই খালাস।

বেশ ঘুরাইয়া কথা কহিতে ওস্তাদ দেখিতেছি।

আনন্দ কলরবের মধ্যে দিয়া রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল।

কোনমতে ছুটি লইয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ক্ষ্যাপা প্রশ্ন করিল—কেমন দেখলে ?

প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারিলাম না ভাল ! মন্দ কি বলিয়া নীরবেই পথ চলিতে সুরু করিলাম।

মাস খানেক পরের কথা। আর তাহাদের বাড়ী যাই নাই।—কতকটা ইচ্ছা করিয়াও বটে, কতকটা কাজের চাপে পড়িয়াও বটে ! সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া দেখি—মেয়েলি হরফে লেখা চিঠি। বিস্ময় লাগিল ! তিনকুলে এমন কেহ আছে বলিয়া ত কই মনে পড়ে না যে আমাকে পত্র লিখিতে পারে।

তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া শেষ লাইনটা

পড়িয়া আরও অবাক হইয়া গেলাম।—হঠাৎ অনীতা আমার উপর এত দয়া দেখাইয়া ফেলিল কেন ?

পড়িলাম—ক্ষ্যাপার জন্ম দিনোৎসব আগামী কল্য সগৌরবে অনুষ্ঠিত হইবে। আমার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, যেহেতু, আমি তাহার বন্ধু। ইত্যাদি।

খুব খানিকটা বাধা-বন্ধ-হীন হাসি হাসিয়া লইলাম। হতভাগাটার আঙুল দেখিতেছি ফুলিয়া কলা গাছ না হইয়া আর যায় না। একবার পাগলামীর চূড়ান্তটা না দেখিয়াও মন মানিল না। পরদিন সেখানে গিয়া হাজির হইলাম।

অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই। আমপাতার ঝালর ঝুলিতেছে ঘরের দরজায়। অনীতা ও আরতি সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া রঙীন প্রজাপতির মত এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমাকে দেখিয়া যেন আর তাহাদের আনন্দ ধরে' না !

নির্দ্ধারিত সময়ে অনীতা একটী কবিতা আবৃত্তি করিল। তাহারই রচিত বিজয়-প্রশস্তি। আরতি গাহিল স-রচিত একখানি গান, তাহাদের কণ্ঠের মূর্চ্ছনা আমাদের সকলের কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল।

ভুরি-ভোজন করিয়া বাড়ী ফিরিতে সেদিনও রাত্রি দীর্ঘতর হইয়া উঠিল।

ক্ষ্যাপা বলিল, পাগল এরা দেখ, সেদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, মা বেঁচে থাকতে এই দিনটাকে বড় আদরের চোখে দেখ্‌তেন। বন্ধু-বান্ধবেরা এসে বাড়ীতে আমোদ করে যেতো। আর যায় কোথা, এরা একেবারে বিরাট ব্যাপার করে তুলেছে। কত বারণ করলুম, কিছুতেই ছাড়লে না। না হ'ক্ কতকগুলো খরচ-পত্র করে ফেল্‌লে।

বলিলাম, ভালই হ'ল—তবু কিছু জলযোগ করা গেল।

সে হাসিয়া সে কথায় সায় দিল।

দিন দুই পরের কথা।

মুনি-ঋষিদের বাক্য উপেক্ষনীয় নয়, ইহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। যে বাড়ীটার উপর কোন মোহ ছিল না, সংসর্গ দোষে সেই বাড়ীর চিন্তাটাই আমাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল অত্যধিক। সেদিন ক্ষ্যাপার আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়াই একেবারে অনীতাদের ওখানে গিয়া হাজির হইলাম।

উপর ঘরে আমাকে লইয়া গিয়া বসান হইল।

অনীতা বোধ হয় বাহিরে কোন কাজে ব্যস্ত ছিল, ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—বিজয় দা'। কিন্তু বিজয়দার পরিবর্ত্তে আমাকে দেখিয়া সে যে সন্তুষ্ট হইল না, ইহা তাহার মুখ দেখিয়া ধরিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না।

শুনিলাম ক্ষ্যাপা দুইদিন আসে নাই। সম্ভবতঃ শরীর অসুস্থ হইয়াছে, না হইলে কখন ত সে এমন করিয়া অনুপস্থিত থাকে না।

অনীতা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—সর্ব্বি বিজয়-দা' কেমন আছেন ? না না, আপনি লুকুবেন। সত্যিই কি অসুখ বড় বেশী। দু'দিন ধরে' খোসামোদ করছি, একার সেখানে যাবার জন্যে। বাবুর আর ফুরসৎ হয় না। বলুন না, তিনি কেমন আছেন ?—

তাহার এই সরল আন্তরিকতার কাছে আমি যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম—তার খবর ত কই আনা হয় নি। সে এখানে আছে জেনেই আমি এসেছিলাম, কালই খোঁজ নেব'খন।

বাধা দিয়া অনীতার উনিটী বলিলেন,—তার আর দরকার হবে না। তাঁর দরকার থাকলে

তিনি নিজেই আস্‌বেন'খন। জোর করে টেনে আন্‌তে চাই না আমি।

কথাগুলো কেমন কেমন লাগিল।

অনীতার দিকে চাহিতেই সে বলিল—ওর কথা ধরবেন না। কাল খবর নিয়ে আস্‌বেন, কেমন? বলুন, কথা দিলেন?

আচ্ছা!

খানিক বসিয়া রহিলাম। মজলিস্ আর তত টা জমিয়া উঠিল না। শুনিলাম, আরতি দুইদিন এ ঘরে আসিতে পারে নাই। কাজ আর কাজ! বেচারী কাজের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

অনীতা বালিশে মাথা দিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। দেখিলে মনে হয়, যেন সর্ব্ব-বিজয়ের ধ্যানে সে আর ইহলোকে নাই!

বেগতিক বুঝিয়া গুটি-গুটি পা-পা' করিয়া সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

মোহ আর কাহাকে বলে'! পরদিন সব কাজ ফেলিয়া ক্ষ্যাপার বাড়ী গিয়া হাজির। দেখিলাম—অনীতার কল্পনা অমূলক নহে। ক্ষ্যাপা দারুণ জ্বরে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া উল্লাসে তাহার চোখ দু'টী জ্বলিয়া উঠিল।

বলিলাম—অনীতার অনুমানই ঠিক, বাচারী তোর জন্তে অস্থির হ'য়ে উঠেছে অসুখ হয়েছে বলে'।

রোগ যন্ত্রণা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষ্যাপার মুখে সার্থকতার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, সত্যি—সত্যি অনুষ্টুপ-দা', ক'রাত্রি চোখ বুজে যেন আমি দেখ্‌তে পাই—অনীতা আর আরতি আমার পাশটীতে এসে বসে আছি। মুখে তাদের কি দারুণ উৎকণ্ঠা! বুকে তাদের কি অপূর্ব্ব আলোড়ন! মনে হয়, আমার সারা জীবন ধরে' চলুক এ রোগের অত্যাচার, আমি তাদের সেবা উজাড় করে নিয়ে নিজেকে সফল করে নি, সার্থক করে তুলি।

সাত-চড়ে যাহার মুখে একটা কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, সে আজ সেই কথার বহাইতে চায় দেখিতেছি।...

এমন করিয়া না পাইলে কি আর জীবন!

সে বলিয়া চলিল তোমরা আমায় নিয়ে হাস্‌তে, পাগল বলে উপহাস করতে, তা' কি আমি বুঝি নি মনে কর। বুঝতুম সব, কিন্তু মুখ ফুটে বলি নি একটী কথাও শুধু এই ভেবে, বিরাট একটা মিথ্যা নিয়ে যদি সকলে আনন্দ পায়—পাক না, আমার কি এসে যায়। কিন্তু কে জানত মিথ্যা, যা' তা' একদিন সত্যের রূপ ধরতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, পাওয়ার গর্ব্ব আজ আমাকে উন্মাদ করে' তুলেছে, অনুষ্টুপ-দা'।

বলিলাম—এ গর্ব্ব তোমায় সাজে, সত্যই তুমি ভাগ্যবান!

সন্ধ্যার দিকে তাহার সংবাদটা দিবার জন্য অনীতাদের ওখানে গিয়ে হাজির হইলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, ডাকা-ডাকিতেও কিন্তু কাহার সাড়া পাইলাম না। অনেকক্ষণ বাদে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু বাড়ী নাই, কোথায় কি বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন।

মনটায় ধ্বক করিয়া আঘাত লাগিল। কাল বলিয়া গেলাম, আসিয়া খবর দিব। অনীতা দিব্য পর্য্যন্ত করাইয়া লইল, তবু এ কী ব্যবহার! কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ত কাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। হয় ত বিশেষ কারণেই তাহাদের যাইতে হইয়াছে। একখানি চিঠিতে ক্ষ্যাপার কথা লিখিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

মানুষের তাগিদের অপেক্ষা কর্ম্মস্থানের তাগিদ আমায় চিরদিনই প্রিয়তর। পরদিন অফিসের একটা কাজে শিলঙ চলিয়া যাইতে হইল। ইচ্ছা থাকিলেও কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠিল না।

মাস তিনেক পর সবে বাড়ী ফিরিয়াছি।

ক্ষ্যাপাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।—

এ কী সেই মানুষ! অকালে বার্দ্ধক্য যেন সোল্লাসে তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহার গালের আঙুর-ফাটা রঙ, ডোরা কাটা পাঞ্জাবী, বাবড়ী করা চুল। দীর্ঘদিন মন্বন্তরের দেশে থাকিয়া সবে যেন সে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছে!

বলিলাম, অনীতা, আরতি ··

ক্ষ্যাপা হাসিল; বলিল—তারা ভালই আছে অনুষ্টুপ-দা' বন্দিনী সীতার জাত ওরা, ওদের দুঃখ-কষ্টকে জয় করতেই হবে যে!

হেঁয়ালী!

বলিলাম—দুঃখ-কষ্ট জয় পরে শুনব, এখন ব্যাপার কি বল ত?

সেই ত্রেতা যুগ থেকে যে দুর্ম্মুখের অনুগ্রহ চলে' এসেছে, আজও তার শেষ নেই অনুষ্টুপ-দা', রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন করতে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে যে কলঙ্ক কিনেছিলেন, আজও এ দেশ তাকে আদর্শ বলে' ভাবে কি করে' বলতে পার? সেদিন আমার বড় বেশী দেরী নেই, যেদিন লোকে এ ক্লীবত্বকে ব্যঙ্গ করবে, নূতন রামায়ণ রচনা করে। তাতে সর্ব্বপ্রথম হবে দুর্ম্মুখের বংশ নিধন।··· তার পর...

কোন প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম না। সে আপন আবেগে বলিয়া চলিল:

লোকে রটিয়েছে, আমি···হাঁ, হাঁ, আমি নাকি তাদের ওখানে যাই সেই লোভে, যে লোভকে দমন করা চলে কতকগুলা টাকার বিনিময়ে—ছি ছি! এরা কি মানুষ! কে না কি শ্যেন দৃষ্টি পেতে দেখেছে—আমি এমন কিছু গুরুতর অন্যায় করেছি, যার জন্যে তাদের ওখানে আর আমায় যাওয়া চলতে পারে না। তাদের অভিভাবক ধনুর্ধ্বজ বাবু কড়া হুকুম করেছেন, আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেবার!

কথাগুলা শুনে' চমকে উঠেছিলুম—নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি নি—কিন্তু কোন কথাই ত মিথ্যা নয়, পাড়ার ছেলেরা আমায় নিয়ে ছড়া বাঁধছে? ঝি মহলে হয়েছি আমি আলোচনার বস্তু।—গৃহিণীরা বক্তৃতা দিচ্ছেন, —অবাধ মেলামেশার কি ভয়ানক পরিণতি!

তুমি বললে হয়ত বিশ্বাস-ই করবে না, অনীতা, শুধু অনীতা কেন, আরতি পর্য্যন্ত আমার সামনে আসতে লজ্জা করে'। কেউ আমি গেলে ঘুমোয়, কেই জানালা বন্ধ করে' দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে!

যেন স্বপ্ন দেখিয়া উঠিতেছি যেন! নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হয়, অতটা বাড়াবাড়ি সকলের ভাল লাগতে না পারে। তবে কুৎসা রটানও তাদের উচিত হয় নি! কিন্তু তোমার দুঃখের কি আছে এতে! ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে অনীতা··

বাধা দিয়া ক্ষ্যাপা বলিল—না, না, ও চিন্তা আমি মনেও আনি নি অনুষ্টুপ-দা'। আমি জানি, আমি ভাল মত জানি, আজও তাদের মন আমার জন্যে ছাদের আনাচে-কানাচে ঘোরে। আমার যাওয়ার সময়টী তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। চোখ দু'টী বাষ্পাকুল হয়ে যায়। বন্দিনী সীতার চোখের জলে রাত্রির অভিসার চলে···তা' না হ'লে আমি পাগল

হয়ে যেতুম যে! রোজ রাত্রে আমি আমার শিয়রে তাদের জাগ্রত ক'টি চোখ দেখতে পাই! কেউ সেবায়, কেউ যত্নে, কেউ আবদারে, কেউ দাবীতে আমাকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে! যেমনই দু'টী মেয়ে, তেমনি ছেলে দু'টী! কার' কাছে আমার পারবার যো নেই। যেন জয় করার জন্যেই ওরা আমাকে পৃথিবীর আবর্জ্জনা থেকে টেনে এনেছে!

—সেদিনের কথা এখন মনে পড়ে অনুষ্টুপ-দা', রোজ রাত্রে বাড়ী ফিরতুম, রাত দশটায়, বাধা-ধরা নিয়ম। কোন ফাঁকে আরতি আর সত্যজিতে বাজি ফেলা হয়ে গ্যাছে—আরতি আমাকে রাখ্‌বে রাত একটা অবধি—সত্যজিত বলেছে—পারবে না!—ওরা ত বাজী রেখেই খালাস। মাঘ মাসের শীতে যত উঠ্‌তে চাই, আরতি বলে' আর একটু। সত্য বলে' গেলেন না যে? রাত হ'ল, ঘুমুবো না! ও বলে'—হ'ক রাত। ব'স, আজ বড় গল্প ভাল লাগ্‌ছে। বল, তোমার মার কথা, তোমার বৌদির কথা ··

গল্প করেই চলেছি, হুঁস নেই অন্য কিছু। ঘড়ীতে যেই বাজল একটা, অমনই গল্প গেলো থেমে, উঠলো হাসির ঢেউ—কেমন, দুয়ো...

চমকে উঠলুম, গল্প ত এমন জায়গায় আসে নি যে দুয়ো দেবে—

আরতি বললে—তোমায় নয়, তোমায় নয়, ওই-ওই বোকা রামকে! আজ বাজী হয়েছিল তোমায় একটা অবধি ধরে' রাখব, কেমন হয়েছে?

বললুম—পাগল কোথাকার। শত্রু জয় করতে হয় ছলে, বলে, কৌশলে। আগে বলে' দিতে হয়, তবে ত...

থাক, থাক, আর শত্রু জয় করতে হবে না। বাবা কি লোক! বোনকে একেবারে শত্রু করে' দিলে।

বুঝিলাম বর্ত্তমানের অন্ধকার সরাইতে আজ ক্ষ্যাপা অতীতের কোলে ডুব দিতে চায়। দুঃখ হইল, কিন্তু অন্য কাজ থাকায় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে স্কুল, কলেজ এমন কি আফিস পর্য্যন্ত বন্ধ। বন্ধু কলহানন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আসিয়া ঘোষণা করিল—এতবড় প্রেমাভিনয় নাকি কখন সম্ভব নয়, জেনেট্ গেনার 'ক্রিষ্টিয়ানা'র অংশে যাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উত্তেজনা এমনই প্রবল যে সে আমার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একখানি টিকিট পর্য্যন্ত কিনিয়া আনিয়াছে দেখিলাম।

হাতে কোন কাজও ছিল না, ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

তখনও অভিনয় সুরু হইতে কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। চুপ করিয়া বসিয়া আছি—হঠাৎ একটা কথা কাণে আসায় উৎকর্ণীত হইয়া উঠিলাম।—ঠিক সম্মুখের সিটে বসিয়া অনীতা আর আরতি!

অনীতা বলিল—আবার সামনে এক ঢ্যাঙা পাহাড়—হাঁ ভাই আরতি, পাহাড়গুলো কি শুধু আমাদের উপরই অত্যাচার করতে আছে না কি!—

আরতি হাসিয়া উঠিল—গুলো আবার কবে? ওঃ, মনে পড়েছে, সেই সর্ব্ববিক্রয়দার কথা, না?

"হুঁ! কি পাগলামীটাই হ'ল তাকে নিয়ে। মিছিমিছি ভোগান্তি। শুনলুম, লোকের কাছে বলে'—আরতির বাড়ী গেলুম, সে একবার ডাকলে না পর্য্যন্ত!

গ্রীবা হেলাইয়া আরতি বলিল—ওসব ভাবা-ভাবির ধার ধারি না ভাই, যে যা' বলে' বলুক। আসত, খুসী হয়, যত্ন-আত্তি করেছি। প্যাঁচাপেঁচি বুঝি না।

তা বটে, কি রকম হাঁ করে' মুখের দিকে

চেয়ে থাকত দেখেছিস্, যেন গিলবে। আমার ঘরে যা' হ'ক ছিল ; কিন্তু তোর ঘরে হ'ল রবীন্দ্র নাথের গল্পের দশা।—স্বামী যখন বললে—বাঁশী বাজায় ভাল ; স্ত্রী রেগে লাল। কিন্তু স্ত্রী ভাল বল্‌তেই হ'ল বাদকের গ্রাম থেকে বহিস্কার।

ওলো, তোর উনিটিও কম নন, ওর কাছে দুঃখ করেছে, বল কি ভাই, আমার দিকে নজর নেই এতটুকু, ওঁর জন্তে বিছানায় পড়ে দীর্ঘশ্বাস...

যা', বাজে বকিস্ নি। ও সব একটু কায়দা করতুম বই ত নয় ..

কথা বন্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম—তাহাদের 'উনি' দুইটি ও আর দুই-চারিটী ছোকরা বাবু। বাবু কয়টির হাতে সিগারেট, চোখে চশমা। দেখিলে বাঙলার ভবিষ্যত ভরসাস্থল বলিতে অতটুকু সঙ্কোচ হয় না।

অনীতা একগাল হাসিয়া বলিল—বেশ লোক যা' হ'ক। আমরা ঠায় পথ চেয়ে বসে আছি, এতক্ষণে আস্‌তে পারলেন ! তবু ভাল !

কণ্ঠে পূর্ব্বদিনের মাদকতার এতটুকু অভাব নাই ! দৃষ্টি গতদিনেরই মত স্বচ্ছ, সরল !

একটি যুবক নাটুকে ভঙ্গীতে কি বলিল। দুইটি মেয়েই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্লে সুরু হইয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

বইখানা যেন বিশ্রী, অর্থহীন। জেনেট্ গেনারের অভিনয় দেখিয়া উল্লাস করিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না। এর চেয়ে ঢের, ঢের বেশী সুন্দর অভিনয় আমি দেখিয়াছি সেই দেশে, যেখানে অভিনয়কে 'পাপ' বলিয়াই অভিহিত করে।

হতভাগ্য ক্ষ্যাপার জন্ম কোথা হইতে এক বিন্দু অশ্রু আমার শুষ্ক মরুভূ-হৃদয় নিঙাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, জানি না। মনে মনে বলিলাম—যে সুখ-স্বপ্ন লইয়া তুমি অপার-আনন্দ, বিপুল-তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, তাহা যেন অক্ষয় হয়। হ'ক মিথ্যা, হ'ক স্বপ্ন, তথাপি আজ যে আনন্দ তোমার জীবনকে পরিপূর্ণতার পথে সহায়তা করিল, তাহা যেন না কখন কোন প্রতিকূল আঘাতেই ভাঙিয়া পড়ে।

বায়স্কোপ ভাঙিবার জন্ম আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না ; বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে তখন যাত্রীর বিরাম নাই। চোখে পড়িল— সিনেমার দরজায় প্রকাণ্ড এক ছবি টাঙান রহিয়াছে প্রেমোন্মত্তা গেনার সাদা ঘোড়-সোয়ারের স্বপ্ন দেখিতেছে। এ বিহ্বল দৃষ্টি, এ সরল মুখচ্ছায়া যে আমার একান্ত পরিচিত ! ··

তাড়াতাড়ি খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিলাম।···

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ লক্ষ-লহরীর এই সংখ্যার পৃষ্ঠা ৬৫৮ পর ৬৮৯ ছাপা হইয়াছে। ৬৮৯ স্থলে ৬৫৯ হইবে ও পরের পৃষ্ঠা কয়েকটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি পঃ লঃ সঃ।

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম বর্ষ চৈত্র, ১৩৪০ দ্বাদশ সংখ্যা

বাঁধন-ছেঁড়া

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

আসছিলুম, বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর কর্ম্ম-স্থানে। খোকাকে নিয়ে আমি আছি কেবিনের মধ্যে একা, উনি আছেন বাইরে খোলা ডেকের ওপর।

…মায়ের সজল চোখ ছু'টী, ভাইবোনেদের কচি মলিন মুখগুলি মনে পড়্‌চে।

আবার কতদিন—কতকাল পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? হায়রে, মেয়েমানুষের জীবন! কতবড় বিচ্ছেদের ভগ্নস্তূপে তোরা তোদের মিলনের সৌধখানি গড়ে' তুলিস্‌, …

…শরতের আকাশ জুড়ে নীলিমার আর অন্ত নেই! একটু আগেই খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। তা'তেই যেন সব বিষাদের ভার কাটিয়ে দিয়ে আকাশ স্মিত হাসিতে ভরে' উঠেচে!… এম্‌নি বুঝি আমাদেরও! পিছনে যে-বেদনাকে ফেলে এসেচি, তারই আভায় সাম্‌নের আনন্দ যেন আর থই পাচ্চে না!…

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম, আকাশ, নদী, আর নদীর তীরে-তীরে গ্রামের আবছায়াগুলি! কী মিষ্টিই দেখাচ্চে ওই ভিজে সবুজের ওপর ঝক্‌ঝকে রোদের ওই জৌলুস-টুকু!…

ষ্টীমারের গতি ক্রমশঃ কমে' আস্‌চে, বোধ হয় এইখানেই কোথাও থাম্‌বে। ওই যে! ওই একখানা নৌকো রয়েচে তীরের কাছে, আর ওই কি একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ক'টি পুরুষ আর মেয়ে!…ষ্টীমার সিটি দিতে দিতে ঘাটের কাছে এগিয়ে যাচ্চে।…ওদের

বিদায়ের পালা বুঝি এখনো ফুরোতে চাচ্ছে না। আহা, মনে করতেও চোখে জল আসে!

নৌকো করে' একটী ছেলে আর মেয়ে ষ্টীমারে এসে উঠ্‌লো।

তারা ওপরের ডেকে উঠে এল। লোকটি কেবিনের বাইরে দাঁড়াল, মেয়েটি ভেতরে এল।

...যেতে হবে এখনো অনেকখানি পথ, পথের খোরাক পেয়ে তাই একটু আনন্দ হোল। মেয়েটী সামনের বেঞ্চিতে বসে' আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। সে চাওয়ার মধ্যে কী যেন একটা ছিল। দু'জনের বুঝি একই সঙ্গে মনে হোল, কোথায় কোন্‌দিনে যেন আমাদের চেনা হ'য়েছিল!

সে হঠাৎ হেসে ফেলে বল্‌লে, এই যে, আপনি? নমস্কার!...এই বুঝি আপনার ছেলে?

আমি তখনো অবাক্ হ'য়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে।

আমার ঘুমন্ত খোকার চিবুকটি ধরে' একটু আদর করে' সে বললে, ছেলে তো নয়, যেন পদ্মফুলের কুঁড়ি!

তারপর আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বল্‌লে, ও, আপনি বুঝি চিন্‌তেই পারেন নি এখনো?...আমি কিন্তু পেরেচি ত! মোটে তো এই এক বছরের কথা! সেদিন আপনি যাচ্ছিলেন বাপের বাড়ী, আমি যাচ্ছিলুম আমার স্বামীর ঘরে। আর আজ এক বছর পরে আপনি ফিরচেন স্বামীর ঘরে, আমি ফিরচি আমার বাপের কাছে! কেমন, পড়চে না মনে?... বলে' মেয়েটি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

সত্যিই এবার মনে পড়ে' গেল।

সেদিন ট্রেণে মেয়েদের গাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ের ভিড় জমেছিল। কি একটি ছোট ষ্টেশনে এরা উঠ্‌লো। এরা মানে মেয়েটী একাই, আর তা'কে মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন, একটী ভদ্রলোক। বয়স তার পঞ্চান্ন কি ষাটই হবে! ধব্‌ধবে সাদা রং, মাথায় একতাড়া কাশফুলের মত চক্‌চকে চুলগুলি ছোটবড় করে' ছাঁটা। পরণে আগাগোড়া ধোপদস্ত সাদা কাপড় আর জামা; গলায় এক-খানি সাদা কোঁচানো পাক-দেওয়া চাদর। দেখ্‌লে মনে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যেন আপনা হ'তেই জেগে ওঠে।...আমি ছেলেবেলাতেই আমার বাবাকে হারিয়েচি। বেশ মনে পড়ে, সেদিন ওই লোকটিকে দেখে আমার মনে বাপের অভাবের ব্যথাটা নূতন করে' সজাগ হ'য়েছিল।

মেয়েটী উঠে আমাদের কাছে বস্‌লো। মনে পড়ে, সেই ভীড়ের মধ্যে তা'কে ঠিক আমার পাশে একটু বস্‌বার জায়গা করে' দিয়েছিলুম। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে, কচিপাতা রংয়ের একখানি বেনারসী শাড়ী তার গোলাপফুলের মতো অঙ্গখানিকে জড়িয়ে রেখেছিল; তার ওপর আবার দেহের এমন কোনো জায়গা ছিল না,যেখানে গহনার বাহুল্য চোখে পড়ে না। ঠিক যেন একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা! গাড়ীর মেয়েদের রীতিমত চমক্ লেগে গিয়েছিল। তাদের চোখের কোণের ঈর্ষার রশ্মিটুকু ধরা পড়তে আর বাকী ছিল না। মিথ্যে বল্‌বো না, সে হিংসার হাত থেকে আমি নিজেকেও রক্ষা করতে পারি নি।

ট্রেণ যেম্‌নি একটা ষ্টেশনে থামে, অম্‌নি সেই লোকটি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে মেয়েটীর খোঁজ নিয়ে যান। সে যে কতখানি স্নেহ, কতখানি একাগ্রতা, তা কারও বুঝতে বাকী ছিল না। আর, সেটুকু অনুভব করেই মেয়েটীও যেন সঙ্কোচে কু'ক্‌ড়ে উঠ্‌ছিল।

একটি প্রৌঢ়া কিন্তু আর নিজের কৌতূহল

চেপে রাখ্‌তে পারলে না, মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি কে তোমার গা ?

সকলের মনের ওই প্রশ্নটুকু এমনভাবে প্রৌঢ়ার মুখ দিয়ে ব্যক্ত হ'য়ে যেতে গাড়ীর সবাই —এবং আমি নিজেও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

মেয়েটী কোনো জবাব দিলে না, চুপ ক'রেই রইলো। আর একজন বুড়ী বললেন, শ্বশুর-বাড়ী থেকে বাপের ঘরে যাচ্ছো বুঝি ? উনি তোমার বাবা তো ?

সে শুধু একটু ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে' বল্‌লে, না।

—না ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

সে বল্‌লে, শ্বশুরবাড়ী।

সেই বুড়ীটি বল্‌লেন, ওঃ! শ্বশুর নিতে এসেচেন ?

কথাটা এমনভাবে বলা হ'ল যাতে সেটা ঠিক প্রশ্ন কি না বুঝে ওঠা শক্ত। স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ভাব কথাটার মধ্যে এত বেশী যে, মনে হ'ল, মেয়েটী বুঝি নিজেই এ কথা কখন তাঁর কাছে স্বীকার করেচে।

মেয়েটী যেন একটু জোরে মাথা নেড়ে ছোট্ট করে' বল্‌লে, না, উনি আমার স্বামী।

...ট্রেণখানা যদি সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ তার লাইন ছেড়ে কাৎ হ'য়ে পড়তো, তা' হ'লেও বোধ হয় বুকের ভেতরটা এমন ক'রে উঠতো না!... তারপর সুরু হ'ল, মেয়েটীকে বাদ দিয়ে কামরার অপর সব মেয়েদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ির ধুম! সধবা-বিধবা যুবতী-বৃদ্ধা সকলেরই মনের মধ্যে ভাবের সেই ঐক্য! প্রথম বিস্ময়ের ভাব-টুকু সাম্‌লে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ টিপে টিপে হাসাহাসি! আমার কিন্তু হাসবার শক্তি ছিল না, অন্তরের বিপর্য্যয়টুকু কেটে উঠতে বড্ড বেশী সময় লাগছিল। সব মেয়েদের ভেতর সে যে আমারই সমবয়সী! সহযাত্রিনীদের সেই টেপা হাসির জলুনিটুকু মেয়েটীর মুখের ওপর কতখানি বিকৃতি এনে দিয়েচে, তাই দেখ্‌তে তার মুখের পানে চোখ তুলে দেখি, প্রতিমার মত মেয়েটী ব'সে আছে, ঠিক একটী পাথরে-কাটা প্রতিমার মতই!

সে আজ এক বছর আগেকার কথা! সাত মাসের খোকাটি আমার তখনো আমাকে পুরোপুরি মায়ের গৌরবে অভিষিক্ত করে নি।... আজ আবার ফিরে যাবার পথে সেই মেয়েটীরই সঙ্গে দেখা। অসাধারণ তো কিছুই নয়; তবু তবু—এ যে অসম্ভবেরও অতিরিক্ত কিছু!......

বুকের নীচের যে বিস্ময় নিজেকে ব্যক্ত করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, মেয়েটী আপনা থেকেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে' দিলে। বল্‌লে, সেদিনও আমাকে দেখে আপনাদের যেমন আশ্চর্য্য লেগেছিল, আজও আবার তেম্‌নি লাগ্‌বে, না ?...কিন্তু ভাই, বাইরের পোষাকটাই তো আর আমার আসল পরিচয় নয়! আমার জীবনের কুড়িটা বৎসর যা' আমি ছিলুম, আজও যে আমি তাই! মাঝের এই একটা বছরকে মুছে ফেল্‌তে ক'দিনই বা লাগ্‌বে বলতো ?

তার কথার মধ্যে না আছে ব্যথা, না আছে কোনো অনুযোগ; এমনি শান্ত সহজ সুরে সে ওই কথাগুলো বলে' গেল। ঠোঁটের কোণে তার পূর্ব্বাপর সেই এক টুক্‌রা অর্থহীন হাসি!

আমি কোনো কথা বলতে পারার আগেই সে আবার বল্‌লে, সেদিনে আর আজকে আমাদের দু'জনেই অনেকখানি বদলে গেছি, নয় কি, বল ?...তোমার চাকরীর মান-মর্য্যাদা

বেড়ে গিয়ে উন্নতি হ'য়ে গেল, আর আমি পেয়ে গেলুম, চিরদিনের মতই ছুটী! কথায় বলে না, যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত! তা' ছাই আমার কপালে ঘি ভাত ছেড়ে দু'টী শাক-ভাতও জুটলো না।...বল্‌তে বল্‌তে সে আবার মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমি শুধু অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম।

সে আবার বল্‌তে লাগলো, ছুটী বলে' ছুটি! একেবারে যাকে বলে সব দিক্ দিয়ে বাঁধন-ছেঁড়া হ'য়ে আমি বেরিয়ে এসেচি!...আমাদের বাড়ীতে দাদা একবার একটা কোকিল পুষেছিল, আমার ওপর ছিল তা'কে খাবার দেওয়ার ভার। একদিন খাবার দিতে দিতে দরজাটা আল্‌গা রেখে যেমন একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি কোকিলটাকে আর দেখে কে! একেবারে উধাও হয়ে উড়্‌লো।· আমার আজকের ছুটীতে সেই কোকিলটার কথাই বারবার মনে পড়্‌চে।

আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বললুম, ছি ভাই! বল্‌তে নেই অমন করে'!...স্বামীতো!

সে একটু যেন শূন্যদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে থেকে পরে বল্‌লে, হ্যাঁ, স্বামী!...সত্যি বলেচ ভাই, বল্‌তে হয়তো সত্যি করেই নেই। অন্ততঃ আজকে তো নয়ই! তিনি আমার যা' করেচেন তা' আর কার সাধ্যি ছিল না যে! ...আমার বাবার যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা পড়েছিল তাঁর কাছে। আমার দু'টি ভাই, এই ঋণের বোঝা কেমন করে' তাদের মাথায় তুলে দিয়ে যাবেন, তাই ভেবেই বাবার আমার না ছিল নিদ্রা, না ছিল আহার! আমার সম্বন্ধে ভাবনার যদিও কূল-কিনারা ছিল না, তবু কূল-কিনারা পাবার চেষ্টা করাও তাঁরা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন।...এমন সময় পড়লুম তাঁর সুনজরে। তিনি আমার বাবাকে কন্যা আর ঋণ—দু'রকমের দায় থেকেই মুক্তি দিলেন।...তাইতো অবাক্ হয়ে ভাবি তাঁর কথা, আর মাথাটা আপনা থেকেই নুইয়ে পড়ে তাঁর পা দু'খানির উদ্দেশে!... ... ...

বল্‌তে বল্‌তে তার দু'টী চোখ ছল্‌ছল্ করে' উঠ্‌লো। রূপনারায়ণের শান্ত বুকের ওপর বেদনার তরঙ্গ তুলে দিয়ে ষ্টীমারখানা স্বেচ্ছাচারে এগিয়ে চলেচে, চারিদিকে আবার মেঘ করে' উঠেছে, খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি এল' বলে'। আমি সেই মেঘের পানে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলুম।

বল্‌বার মত একটা কথাও মুখে আসা দূরে থাক্, মনের ভেতরও উঁকি মার্‌লে না। দান যে সংসারে কত বেশী নিষ্ঠুর, আর ভক্তি কত করুণ হ'তে পারে, তারই একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আমার সারা মনখানা কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌লে।

মেয়েটী বল্‌লে, কি দেখচো? মেঘ? বুঝিচি, পাগলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শেষে মেঘের পরে ভর্ কর্‌তে হ'লো!

ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লুম, ছি! তাই কি ভাব্‌তে পারি?

সে বল্‌লে,—ভাবো নি ত? যাক্ বাঁচলুম! সত্যিই কিন্তু আবোলতাবোল বকি নি আমি। ...আমি শুধু বল্‌ছিলুম তোমাকে যে, আমার জীবন দিয়ে এতবড় যে একটা কাজ হ'তে পারে, তা' কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। সেই কোন গল্পে আছে না, একটা নেংটী ইঁদুর একদিন এক সিংহকে মুক্তি দিয়েছিল, এ যেন ঠিক তাই। ছেলেরা যা' পার্‌লে না, আমি মেয়ে হ'য়ে আমার বাবাকে দিলুম মুক্তি! আমার এই জীবনটার এত বড় যে একটা প্রয়োজন ছিল, তা' স্বপ্নেও ভাবি নি যে! প্রয়োজন আমার শেষ হ'য়ে

গেছে। তাই, ছুটি যখন এল, তখন দু' হাত বাড়িয়ে তা'কে কাছে টেনে নিতেও এতটুকু কিন্তু করলুম না।

আমি তার মুখের ওপর আমার ব্যথা-সজল চোখ দু'টো তুলে চেয়ে রইলুম। সে নিবৃত্ত না হ'য়ে বল্‌লে, ছুটী কি শুধু স্বামীই দিলেন ভাই, আমার মেয়েরাও তার ব্যবস্থা করে' দিলেন যে!

আমি বললুম, সে আবার কি ভাই?

সে বল্‌লে, আমার স্বামীর টাকাকড়ি বিষয়-আসয় অনেক ছিল। জামায়েরা তাঁর দেহের সৎকার করে' এসে তাঁর আত্মার সদ্গতি করতে বসলেন। একখানা কাগজে কি-সব লেখাপড়া হ'ল, যাতে করে' স্বামীর সম্পত্তির মালিক হলেন তাঁর মেয়েরা, আর আমি যদি সচ্চরিত্র হ'য়ে তাঁদের বাড়ীতেই থাকি, তা' হ'লে আমার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হবে, এই ঠিক হলো!

—বল কি? তোমার স্বামী মরার পর হ'লো উইল?

সে বল্‌লে, কেন হবে না, বা-রে! তাঁর মনের ইচ্ছেটা কি এই ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে? বড় জামাই আমাকে সই করতে বল্‌লে, আমি সই করে' দিলুম।

—সই দিলে? বল কি? নিজের পায়ে এম্‌নি করে'—

—কুড়ুল মার্‌লুম বলচো? নইলে যে আমার চাকরীর জের মেটে না ভাই! নইলে ছুটীকে ছুটী বলেই আমি নিতে পার্‌তুম না যে!

আমি হতাশকণ্ঠে শুধু বললুম,—এ কিন্তু অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়!

সে শুধু মুচকি হেসে বল্‌লে, তা' হবে। দাদা বল্‌ছিলেন, ওই নিয়ে নালিশও না কি চল্‌বে। কিন্তু আমি ভাবি, ওই নালিশ দিয়েই সব নালিশের বিচার হ'য়ে যাবে না কি?

একটা খুব ক্ষীণ হাসির শিখা তার পাতলা গোলাপী ঠোঁট দু'খানাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

নীলাঞ্জন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি

সেদিন মনীষা দেবীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে সারারাত চোখের পাতা এক হ'ল না—মনে হ'ল যেন, এ জীবনে আমার দু'চোখে তন্দ্রা বুঝি আর কোনদিন নামবে না। কত যে কথা, কত যে ছবি, কত যে স্মৃতি মনের কোণে আনাগোনা করতে লাগ্‌লো, তার হিসেব দেওয়া যায় না......

এমনি ক'রে চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে সারারাত এবং সারাদিন গেল কেটে। বৈকালে আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারলাম না; মনীষা দেবীর কাছে হাজির হলাম।

আমাকে দেখে তিনি ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—হঠাৎ কি মনে ক'রে? এসো এসো।

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে দেখ্‌লাম, তাঁর ওপর দিয়েও ঝড় বয়েছে! এক রাত্রে তিনি যেন ভেঙে পড়েছেন।

তাঁর পাশে ব'সে বল্লাম—দুটো প্রশ্ন মনের মধ্যে অহর্নিশি আঘাত করছে। তাদের উত্তর চাই।

—কি প্রশ্ন, বল।

মুহূর্ত্ত কয়েক অপেক্ষা ক'রে মনের সব দ্বিধা দু'হাতে ঠেলে দিয়ে বল্লাম—বিজয়বাবুর সঙ্গে আপনার যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, তা' আমি টের পেয়েছি। কিন্তু কী সে সম্পর্ক? তাঁর সম্বন্ধে সব কথা আমায় বলুন।

ধীর গম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন—তুমি আশ্বস্ত হও, কেতকী; তার সঙ্গে আমার কোন অন্যায় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। সে আমাকে কামনা করেছিল, আমার জন্যে সে হয়েছিল উন্মাদ। তোমার বাবার সঙ্গে তার ছিল চিরদিনের শত্রুতা। তোমার বাবা আমাকে পরিত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু আমাকে তার সঙ্গে একত্রে দেখা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি কোনদিন···

প্রশ্ন করলাম—তার প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম ছিল?

—আমার মনোভাব? না, তুমি যা' সন্দেহ করেছ, তা' নয়। তা'কে আমি কোনদিনই শ্রদ্ধা বা প্রীতির চোখে দেখি নি।

নিশ্বাস ফেলে বল্লাম—আর একটা কথা? নিশীথবাবু কে? তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

আমার প্রশ্ন শুনে মনীষাদেবীর মুখের ওপর স্মিত একটি হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল! সে হাসি দেখে আমি মনে মনে অপ্রস্তুত বোধ করলাম। প্রশ্নটা না করলেই যেন ছিল ভাল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থেকে তিনি বল্লেন—আমার বাবা আর নিশীথের বাবা, দু'জনে ছিলেন পরমতম বন্ধু। নিশীথ আর আমি ছেলেবেলায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। বয়সে নিশীথ আমার চেয়ে ছোট হলেও সে আমার বিশেষ বন্ধু।

তার কথা শুনে মনের অন্তস্থলে সূক্ষ্ম একটি আনন্দের আভাস জেগে উঠল। মনে মনে

নিশ্চিন্ত হলাম; খুশী হলাম; মনে হ'ল যেন, অনেকদিনের অনেক দুর্ভাবনা আজ ঘুচ্‌লো।

কথার স্রোত ফিরিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমার বাবা কেমন আছেন, কেতকী?

মাথা নেড়ে বল্লাম—ভাল আছেন। তিনি আজ সকালে কোলকাতা গেছেন।

—তাই না কি!!

—হ্যাঁ। সেখান থেকে দিনকয়েকের জন্য তিনি বোধ হয় পুরী যাবেন। ভুবনেশ্বরে ওঁদের অনেক সহকর্ম্মীরা আছেন, বোধ হয় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সেখান থেকে ফিরে বাবা বোধ হয় একেবারে রূপনারায়ণপুরের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বেন—এখানে আর আসবেন না।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—সে তো ভালই হবে।

অন্যান্য দু'চার কথার পর বাড়ী ফিরবার জন্য উঠ্‌লাম। তিনি বারান্দা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এগিয়ে এলেন। তারপর আমার দু'হাত ধ'রে আমায় নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—কেতকী! আজ আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও!

তাঁর গভীর আয়ত দুই চোখের পানে তাকিয়ে বল্‌লাম—কি কথা!

আমার পরে তোমার মনের ঘৃণা এখনো কি সমানই আছে?

তাঁর অর্দ্ধভাঙা কথা শুনে দেহ কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌লো; তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বল্‌লাম—ও-কি কথা বলছেন! ও-কথা বল্‌লে যে আমায় অপরাধী করা হয়।

তিনি আমাকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লেন—তা' হ'লে, একবার আমায় 'মা' ব'লে ডাক, মা!

তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লাম—মা!!

পথে নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল; তাঁর হাতে একগোছা টাট্‌কা গোলাপ ফুল।

আমাকে দেখে সস্মিত মুখে এগিয়ে এসে তিনি বল্‌লেন—মিস মিত্র! এগুলি আপনার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মালী বল্‌লে, বাগানে এইগুলিই সবচেয়ে ভাল ফুল। আমি নিজে এদের আদর বিশেষ জানি নে, তাই এগুলি আপনার জন্যেই...

ফুলগুলি তাঁর হাত থেকে নিয়ে বল্‌লাম—অনেক, অনেক ধন্যবাদ! চমৎকার ফুলগুলি, সত্যিই চমৎকার!

নিশীথবাবু হাঁপ ছেড়ে বল্‌লেন—ধন্যবাদ।

ফুলগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করবার পর তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লাম—কিন্তু চন্দ্রা কোথায়? সে কি গোলাপ ফুল ভালবাসে না?

আমার কথা শুনে নিশীথবাবু চকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন; তাঁর মুখ কঠিন আকার ধারণ করল; এখনই কোন গুরুতর রূঢ় কথা তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হবে! তাড়াতাড়ি বল্‌লাম—কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে কোন রূঢ় মন্তব্য শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, সে এখন কোথায়?

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন—জানি না। বোধ হয় কাছেই কোথাও আছে।

তরল কণ্ঠে বল্‌লাম—মেয়েদের বিপদ থেকে রক্ষা করবার বিপদ দেখছেন তো। আশা করি এরপর আর কোন মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে অগ্রসর হবেন না!

নিশীথবাবু শুষ্কভাবে বল্‌লেন—দেখছি, আপনি আজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন!

বললাম—মোটেই না। আচ্ছা, চন্দ্রা যে-সব হীরে-মুক্তোর গহনা পরে, সে গুলো আসল পাথর তো? আপনি নিশ্চয়ই জানেন!

নিশীথবাবু এইবার আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—নমস্কার। আমি চললাম। বোধ হয়, আমার সঙ্গ আপনার ভাল লাগছে না—তাই এ-ভাবে অযথা আমায় কটু কথা শোনাচ্ছেন।

তাঁর মুখের স্পষ্ট কথা ভারী ভালো লাগলো; বললাম—আচ্ছা, আর বলব না; দুঃখ যদি দিয়ে থাকি, তার জন্যে মাপ চাইছি। শুনুন একটা দরকারী কথা আপনাকে বলবার আছে। আপনি রাগ না ক'রে দয়া ক'রে এদিকে ফিরুন।

—কি কথা, বলুন।

—বাবা এখানে নেই। তিনি চ'লে গেছেন।

ক্ষিপ্রকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—চ'লে গেছেন? কতদিন গেছেন? কোথায় গেছেন?

শান্তকণ্ঠে বললাম—প্রথমে তিনি কোলকাতায় যাবেন, সেখান থেকে বোধ হয় পুরী বা অন্য কোথাও যাবেন।

নিশীথবাবু বল্লেন—শুনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি যে এখান থেকে অন্যত্র গেছেন, সে ভালই হয়েছে।

ধীরে ধীরে বললাম—চন্দ্রা যখন এ-কথা শুনবে তখন সে কি ভাববে, কে জানে!

নিশীথবাবু আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন—কোন চিন্তা নেই। চন্দ্রা বোধ হয় আর বেশী দিন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে না।

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছিলেন এখন?

হঠাৎ আমার এই প্রশ্ন শুনে নিশীথবাবু ক্ষণেকের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলেন; তারপর বললেন—ফুলগুলো আপনাকে দেবার জন্যে আপনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতাম, তারপর খানিকটা ষ্টেশনের ধারে বেড়িয়ে আসতাম। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে শরীরটা ভারী জড় বোধ হচ্ছে।

—তা' হ'লে চলুন; দু'জনে কিছুদূর বেড়িয়ে আসা যাক্। কিন্তু ষ্টেশনের দিকে নয়। এই দিকে।

পাশাপাশি দু'জনে আমরা মাঠের ওপর দিয়ে অগ্রসর হলাম। তখন সূর্য্য অস্ত গেছে বটে, কিন্তু আকাশের গায়ে এবং পৃথিবীর বুকে তার রঙের খেলা তখনো শেষ হয় নি।

দূরে বৃক্ষান্তরালের কুটীরাভ্যন্তর থেকে মেঠো বাঁশীর সুর ভেসে আসছে! কলসী কাঁখে নিয়ে পল্লীর মেয়েরা নিকটবর্ত্তী পুকুর থেকে জল আনতে চলেছে। বহু দূরে কোন কারখানা থেকে তীব্র সঙ্কেত ধ্বনি মাঠের ওপর তার প্রতিধ্বনি তুলছে!

সেই পরিণাম রমণীয় সন্ধ্যাটির স্মৃতি আমার কাছে চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করবে! কত যে জানা অজানা বিষয় নিয়ে নিশীথবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলাম, তার সংখ্যা হয় না। দেখলাম, পড়াশুনায় নিশীথবাবু কারুর চেয়ে কম নন। কত দেশের কত বই, কত মানুষ, কত ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আমায় কত যে নতুন কথা শোনালেন, তা' লিখতে গেলে এ-গল্পের আকার হ'য়ে উঠ্‌বে দ্বিগুণ।

তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে একথা বুঝতে দেরী হ'ল না যে, তিনি নিয়মিতভাবে এ-সকল বিষয়ের রীতিমতো চর্চ্চা করেন। নিশীথবাবুর সঙ্গে আজ যেন নতুন ক'রে পরিচয় হ'ল।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্তরে পরিপূর্ণ তৃপ্তি বহন ক'রে বাড়ী ফিরলাম। নিশীথবাবু আমাকে

বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে সারাপথ আমার সঙ্গে এলেন

বাড়ীর নিকটে এসে সহসা সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখ্‌লাম, গেটের কাছে বিবর্ণ মুখে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে আছে—তার সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে যেন একটা তীব্র হিংস্রতা ফুটে উঠ্‌ছে! আমাদের দেখে সে যেন ভূমিকম্পের মতো ফেটে পড়ল; নিশীথ-বাবুকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে—বৈকালবেলা আমার বাড়ীতে যাবার আপনার কথা ছিল; আপনার জন্যে আমি সারাক্ষণ বাড়ীতে ব'সে রইলাম। গেলেন না কেন?

মাথা নেড়ে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে নিশীথবাবু বল্‌লেন—আজ বিকালে আপনার বাড়ী যাবার কোন কথা যে ছিল, তা' আমার জানা ছিল না। আপনি আমায় যেতে বলেছিলেন; আমি বলেছিলাম চেষ্টা করব—এই পর্য্যন্ত! অন্য কাজ থাকায় যেতে পারি নি।

বিষাক্ত হাসি হেসে চন্দ্রা বল্‌লে—অন্য কাজ! হ্যাঁ; তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন জানেন? আমি আজ জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করবই। কোন বারণ আমি শুনবো না। তাঁর সঙ্গে আমি যেমন ক'রে হোক্, দেখা করব। তাঁর মেয়ে এসেছেন, ভালই হ'য়েছে। জগদীশ-বাবুকে খবর দেওয়া হোক্ যে, আমি এসেছি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে ফিরবো না।

তাঁর হিংসা-কুটিল মুখের পানে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বল্‌লাম—আপনার আসা একেবারেই ব্যর্থ হ'ল। বাবা এখানে নেই।

—নেই!!

—না। তিনি এখান থেকে চ'লে গেছেন।

চন্দ্রা যেন ক্ষেপে উঠ্‌ল—চ'লে গেছেন! বটে! বুঝেছি খুব চালাকি ক'রে তুমি তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছো! কিন্তু আমিও ছাড়ব না। পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে আমি অনুসরণ করব।

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লাম - আপনার যা'-খুসী তাই করবেন, সে শোনবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি চল্‌লাম। নমস্কার নিশীথবাবু।

নিশীথবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, এবং আমার সঙ্গে গেট পার হ'য়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করতে উদ্যত হ'লেন।

চন্দ্রা আর সহ্য করতে পারলে না; ক্ষিপ্রপদে তাঁর সুমুখে গিয়ে পথরোধ ক'রে অশ্রু-বিকৃত-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—না, আপনাকে আমি কখনই ওই মেয়েটার সঙ্গে যেতে দেব না। কিসের জন্যে আপনি আমায় এ-ভাবে অপমান করছেন? কেন আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন? যে আমার দাদাকে হত্যা করেছে, আমি তা'কে শাস্তি দিতে চাই। সে কি আমার অন্যায়? আপনি সে-কাজে সাহায্য করবার কথা দিয়ে এখন কেন এমন ক'রে অবহেলা করছেন?

নিশীথবাবু অধীর কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—কী পাগলের মতো বকছেন আপনি! আপনার দাদার জন্যে আপনি মিস মিত্রকে এ-ভাবে উদ্ব্যস্ত করছেন কেন। ওঁর কি অপরাধ? আমি আপনাকে হলফ্‌ ক'রে বলছি—ফণি মজুমদার নামে কোন লোক এখানে কোনদিন ছিল না।

চন্দ্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে—কিন্তু সেই ফটো-গ্রাফ! - সে ছবি মনীষা দেবীর বাড়ী কেমন ক'রে এলো। নিশ্চয়ই ফণি মজুমদার এই গ্রামের মধ্যে কিম্বা কাছাকাছি কোথাও আছে। এবং আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, জগদীশবাবু তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। সেই জন্যেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন না—এমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব; তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনবো—এই আমার পণ।

(চল্‌বে)

আলেয়া

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

অফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগের পর বিশ্রাম লইতেছিলাম।

সহরের সীমাবদ্ধ আকাশে দু'-একটি তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পানে চাহিয়া অতীতের পাতা হইতে পুরাতন স্মৃতি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলাম। বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে কত প্রিয়জন মিশিয়া গিয়াছে! যাহারা আমার জীবনে একদিন হাসি-আনন্দের হিল্লোল তুলিয়াছিল, সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছিল, আজিকার আধ আলো আধ ছায়ায় তাহাদের সকলেরই মুখ স্তিমিত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে!

তন্দ্রা ভাঙ্গিল স্ত্রীর ডাকে।

কোলে তাহার পাঁচ বছরের ছোট একটি ফুটফুটে ছেলে।

হাসিয়া বলিল—একে চেন?

যাহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই, তাহাকে কিরূপে চিনিব। স্ত্রী বিমলাকে সে কথা জানাইতে খোকাকে আদর করিয়া সে বলিয়া চলিল—পাশের বাড়ীতে কাল যে নূতন ভাড়াটে এল, এ তাদের বাড়ীর ছেলে। এর মার সঙ্গে আজ আমার আলাপ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নাম কি ওর?

বিমলা খোকার পানে চাহিয়া বলিল—বল তোমার নাম। মেশোমশায় হন। লজ্জা কিসের!

খোকা শত সাধ্যসাধনায়ও তাহার নাম বলিল না।

শেষে বিমলাই বলিল—নাম এর মোহনলাল। সবাই 'মন্টু' ব'লে ডাকে।

মন্টুকে কোলে তুলিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ আদর করিবার পর সে নামিয়া পড়িল।

বিমলা বলিল—এ কেমন গান গাইতে পারে, গানের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নাচেও আবার।

আমি বলিলাম—তাই না কি।

গৃহিণী খোকার পানে চাহিয়া বলিল—একটা গান গাও তো মন্টু; গাও, লক্ষ্মী মাণিক আমার!

মন্টু শুধু সলজ্জ-দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তাহার বেগতিক অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—থাক্ থাক্, আর একদিন গান গাইবে।

তাহারা চলিয়া যাইতে অন্য চিন্তা আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল।

রাত্রে শুইয়া বিমলাকে বলিলাম—তা' হ'লে দুপুরবেলাটা আর তোমায় নেহাৎ একলা কাটাতে হবে না। মন্টুকে নিয়ে বেশ থাকবে।

বিমলা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা' ঠিক। এই তো আজ সারা দুপুরটা খোকার সঙ্গে গল্প বলে' তার গান শুনে কাটলো। আমার হলো ভালই।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার সে বলিয়া

চলিল—কিন্তু কি দুরন্ত ওই মন্টু! চুল বাঁধতে বসেছি, বায়না ধরলো আয়না দাও। কি করবো দিলুম। ও মাগো, আয়নাটা পেয়েই আছড়ে ভেঙে ফেল্‌লে! কাঁচ কুড়োতে গিয়ে আঙুলটা গেল কেটে। ভয় নেই গো, ভয় নেই; তখনই আমি কাঁচ বের ক'রে আইডিন দিয়ে আঙুল বেঁধে তবে অন্য কাজ করেছি। এই দেখ।

দেখিলাম সত্যই আঙুল তাহার ব্যাণ্ডেজে বাঁধা।

সমস্ত দিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু ঘুমাইব, বিমলার জ্বালায় তাহা আর হইয়া উঠিল না। খোকা কেমন বুদ্ধিমান, তাহারও এক গল্প ফাঁদিয়া সে বসিল।

তন্দ্রার ঝোঁকে ঘুমাইয়া পড়িলে বিমলা ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল—ঘুমুলে না কি?

মোট কথা, একরকম সমস্ত রাত্রি জাগিয়াই খোকার গল্প শুনিয়া যাইতে হইল।

অফিসে বাহির হইবার পথে বিমলা বলিল—দেখ, ফেরবার পথে মন্টুর জন্যে দম দেওয়া একটা ছেলেদের মোটর কিনে এনো; আর হ্যাঁ, অমনি একটা ছোট কাপ ডিস নিয়ে আসবে।

হাসিয়া বলিলাম—কেন, মন্টুর চা খাবার জন্যে বুঝি।

আমার পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া সে বলিল—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ; মন্টু বড় কাপ ডিসে চা খেতে পারে না, বুঝলে।

সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে এবং অফিসের কাজের ভীড়েও স্ত্রীর এই মাতৃত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া বেদনা অনুভব করিলাম। শুধু তো মন্টুকে লইয়া নয়। এ রকম এর আগে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের আদর-যত্ন করা, খাবার খাওয়ানো, পুতুল কিনিয়া দেওয়া প্রায়ই দেখিয়াছি। কোনও কিছু সুখের বাকী ভগবান আমাদের রাখেন নাই; শুধু তিনি একটী ছেলে কিংবা মেয়ে দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন!

অফিস হইতে ফিরিবার পথে বিমলার কথা মত ছেলেখেলার মোটর ও ছোট কাপ ডিস কিনিয়া বাড়ী আসিলাম।

মোটর গাড়ী পাইয়া মন্টুর কি আনন্দ! দম দিয়া চালাইবার কায়দা দেখিয়া লইয়া মোটর চালাইতে লাগিল।

বিমলা জলখাবার ও চা লইয়া হাজির হইল। ছোট সুদৃশ্য কাপ ডিসে চা পাইয়াও খোকার মন পড়িয়া রহিল তাহার মোটর গাড়ীর দিকে।

বিমলা মন্টুকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে তোমায় এ গাড়ী দিলে?

মন্টু বলিল—তুমি।

আমি বলিলাম—সে কি! আমি গাড়ী কিনে এনে দিলুম না?

মন্টু তবু হাসিয়া বলিল—না, মাথি দিয়েছে এ গাড়ি।

বলিলাম—বেশ যা' হোক; আমি এনে দিলুম গাড়ী আর নাম হ'ল কি না শেষে মাসীর।

বিমলা মৃদু হাসিয়া খোকার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল—তা' তো হবেই মাসীর নাম, কি বল মন্টু।

মন্টু কোনও রকম প্রত্যুত্তর না করিয়া চা পানের পর মোটর চালাইতে লাগিল।

খোকাকে কোলে বসাইয়া বিমলা একমনে গান গাহিয়া যাইতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিতে তাড়াতাড়ি সে গান থামাইয়া ফেলিল।

বলিলাম—থামলে কেন, গাও না; বেশ তো গাইছিলে।

বিমলা সলজ্জ-দৃষ্টিতে খোকার পানে চাহিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

খাটের উপর ক্লান্ত শরীরটাকে এলাইয়া দিয়া বলিলাম—আমি দেখছি মন্টুকে নিয়ে তুমি বেশ মজায় আছ।

বিমলা হাসিয়া বলিল—মশায়ের কি তা'তে হিংসে হচ্ছে?

আমি বলিলাম—না না, হিংসে করবো কেন। বেশ আছ, তাই দেখছি। আমি অফিসে গেলে দুপুরটা তোমায় নেহাৎ একলাই কাটাতে হয়; তবু তোমার একজন সঙ্গী হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে মন্টুকে খাটের উপর তুলিয়া দিয়া বিমলা বলিল—এর সঙ্গে তুমি একটু গল্প করো, আমি চা-টা তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।

বিমলা চলিয়া গেলে একথা-সেকথার পর খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কা'কে সব সব চাইতে ভালবাস খোকা, মাকে, বাবাকে না এই মাসীকে?

দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই সে বলিয়া ফেলিল—মাথিকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত দিন এখানে থাকো, মায়ের কাছে তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

অবিচলিত কণ্ঠে সে বলিল—না।

তোমাদের দেশ কোথায়—জিজ্ঞাসা করাতে মন্টু বলিল—অনেট দূলে, এল গাল্লি কোলে যায়। গয়ু আথে, পাখী আথে। মাথি দাবে বলেথে।

এই ভাবে খোকার সহিত খোকা সাজিয়া কিছুক্ষণ আবোলতাবোল বকিবার পর বিমলা চা ও খাবার লইয়া উপস্থিত হইল।

চা পান করিতে করিতে বিমলাকে বলিলাম—ছেলেটী খুব বুদ্ধিমান।

বিমলা হাসিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি না কি এদের দেশে যাবে বলেছ?

বিমলা বলিল—হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে। ভয় নেই, ভয় নেই, যাই যদি, বাদ পড়বে না, তুমিও সঙ্গে যাবে।

তাহার ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে থাকি।

প্রতিদিনের মত বিমলা চা তৈয়ারী করিতে গিয়াছে।

মন্টুকে একলা পাইয়া বলিলাম—একটা গান শোনাও তো।

সেদিন সে কি মেজাজে ছিল তা' জানি না; আমার কথায় সে বলিয়া উঠিল—'আল কত দিন ডাক্‌বো বত্তে'-টা গাইথি।

সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—

"আল কত দিন ডাকবো বত্তে
এবাল তুমি দাও গো দেখা
কেঁতে কেঁতে আকুল ওলাম
তোমাল তলে বথিয়া একা।"

আধ আধ গলায় বেশ গাহিতেছিল; হঠাৎ বিমলার আগমনে কি ভাবিয়া সে থামিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না।

বিমলা চা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া বলিল—কি গো বাবু, আমাকে দেখে হঠাৎ থামলে কেন?

খোকা সলজ্জ-দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ও কি কথা, তোমার সামনে গাইবে কেন। আমাকে একটু বেশী ভালবাসে, তাই আমায় গান শোনাচ্ছে।

বিমলা মন্টুকে তাড়াতাড়ি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—আহা, তাই বই কি!

পরে খোকার গাল টিপিয়া আদর করিয়া

জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মন্টু, তুমি সব চাইতে কা'কে ভালবাস—আমাকে, না তোমার মেসো-মশায়কে ?

মন্টু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর বিমলার কাণে চুপিচুপি কি বলাতে বিমলা উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল—এই দেখ মন্টু আমাকে সব চাইতে ভালবাসে বল্‌লে।

হার না মানিয়া বলিলাম—নিজে না শুন্‌লে কিছুতেই বিশ্বাস করছি না।

বিমলা রাগতভাবে বলিল—জানি, অবিশ্বাসীদের স্বভাবই এই রকম।

আমি বলিলাম—তা' যাক্, চা-টা যে তৈরী করেছ, দেবার কথা ভুলে গেছ বোধ হয় ?

বিমলার চমক ভাঙিল। খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া চা ঢালিতে বসিল।

হাসিতে হাসিতে বলিল—সত্যি, আমার কি ভোলা মন। চা এনে রেখেছি, একথা একেবারেই মনে ছিল না।

নীরবে চা পান করিতে থাকি। বিমলার কথার উত্তর দিতে পারি না।

তাহার ওই তন্ময়তা তৃপ্তি দিলেও বেদনাও জাগাইল বেশ ভালভাবেই।

বেশী নয়, শুধু ওই মন্টুর মত মাত্র একটী টুকটুকে ছেলে ভগবান যদি আমাদের দিতেন, তাহা হইলে আমাদের চল্‌তি-পথে চাহিবার আর বিশেষ কিছুই থাকিত না।

একথা বিমলারও মনে উদয় হয় কি না, এর আগে আমি ভালভাবে বুঝিতে পারি নাই। এখন বাহিরের একটী অচেনা ছেলে আসিয়া বিমলার মা হইবার সাধ আমাকে বেশ ভালভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছে।

বিমলা ইজিচেয়ারে বসিয়া মন্টুর জামায় একমনে ফুল তুলিয়া যাইতেছে। মন্টু মেজের উপর বসিয়া নানাবিধ খেলনা ছড়াইয়া আপাততঃ ছেলেখেলা মোটরের পার্টগুলি খুলিয়া ফেলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

আমি তখন খাটের উপর বসিয়া 'গল্‌স্‌ওয়ার্দি'র 'মেমরিস্' পড়িয়া মহা আরামে ছুটীর দুপুরটা কাটাইতেছিলাম।

লেখক মহাশয় একটি কুকুর কিনিয়াছেন। সেই কুকুরটা লোক এলে কি করে, কেমন করে' খায়, কেমন করে' শোয়, কেমন আদর বোঝে, তাহা লইয়া গল্‌স্‌ওয়ার্দি দিব্য একখানা বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন-তেমন বই নয়—ইহা পণ্ডিত-মহলে আদৃত হইয়াছে।

মাঝে বই পড়া রাখিয়া বিমলাকে ডাকিয়া বলিলাম—দেখ, তুমি মন্টুকে নিয়ে একখানা বই লিখ্‌তে পারো।

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—সে কি ! মন্টুকে নিয়ে বই লিখ্‌বো কি বল্‌ছো ?

বলিলাম—কেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি একটা কুকুর নিয়ে এমন সুন্দর একখানা বই লিখ্‌তে পারেন, আর তুমি মন্টুকে নিয়ে তা' পারবে না, সে কি !

বিমলা সেলাই ফেলিয়া অবাক্ হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

মন্টু এতক্ষণ বেশ খেলিতেছিল। বইয়ের কথায় তাহার হয় তো চমক ভাঙ্গিল। আমার হাতে বই দেখিয়া তাহা লইবার জন্ত সে বায়না ধরিল। বলিল—আমায় বই দাও মেসোমশায়, আমায় বই দাও।

আমার নিকট হইতে না পাইয়া শেষে সে বিমলার নিকট অভিযোগ করিল—দেখ মাসিমা, মেসো বই দিচ্ছে না।

বিমলা বলিল,—দাও না বইটা একবার ; খেয়ে তো ফেলবে না ও।

আমি বলিলাম—পাগল হয়েছ না কি! এ বই কি ওকে দেওয়া যায়।

বিমলা স্বাগতভাবে বলিল—ভারী বই তোমার! কুকুর-বেড়াল নিয়ে কি সব মাথা-মুণ্ডু লেখা।

কিছুক্ষণ পরে খোকাকে কোলে করিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই মন্টু যেন আমাদের একান্ত আপনার হইয়া পড়িয়াছে। একটু সে চোখের অন্তরাল হইলে আমার কষ্ট হয়, আর বিমলা তো সহিতেই পারে না। 'মন্টু' 'মন্টু' করিয়া ডাকিয়া অস্থির হয়।

বিমলা কাপড় শুকাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম—দেখো, মন্টুর মায়ায় আমরা যেমন জড়িয়ে পড়েছি, তা'তে আমাদের বিশেষ রকম কষ্ট একদিন পেতে হবে।

বিমলা চম্‌কাইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—তা' সত্যি। হ্যাঁ, শুনেছ, মন্টুরা আজ তাদের দেশে চলে' যাচ্ছে বেলা দুটোর ট্রেণে। তার মায়ের অসুখ সারাতে কোল্‌কাতায় এসেছিল; অসুখ সেরে গেছে, তাই আজ ওরা যাবে।

তাহার চোখের জল আমার নজর এড়াইল না।

অফিস হইতে ফিরিয়া সোজাসুজি শোবার ঘরে চলিয়া আসিলাম।

খোকা নাই, চারিদিকে একটা বিষণ্ণতা যেন থম্‌থম্ করিতেছে। বিমলাকে দু'-তিনবার ডাকিলাম, সাড়া পাইলাম না।

সে এলোচুলে খোকার ছেলেখেলা মোটর, পুতুল, খেলনাগুলি ছড়াইয়া তাহার মাঝে প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে! খোকার ধ্যানে সে যেন মগ্ন, তন্ময়!

নীরবে খাটের উপর বসিলাম।

জীবনে ওই মন্টুর মত কতজনই আসিয়া হাসি-ক্রন্দনের ঢেউ তুলিয়া আলেয়ার মতই মিলাইয়া গিয়াছে!

ভাবিতে লাগিলাম কেবল মন্টুর কথা। সে থাকিলে এখন কি করিত।

আলেয়ার মায়া মানুষকে এত উন্মাদ করিয়া দেয় কেন? এই প্রশ্নটাই মনকে অস্থির করিয়া তুলিল।
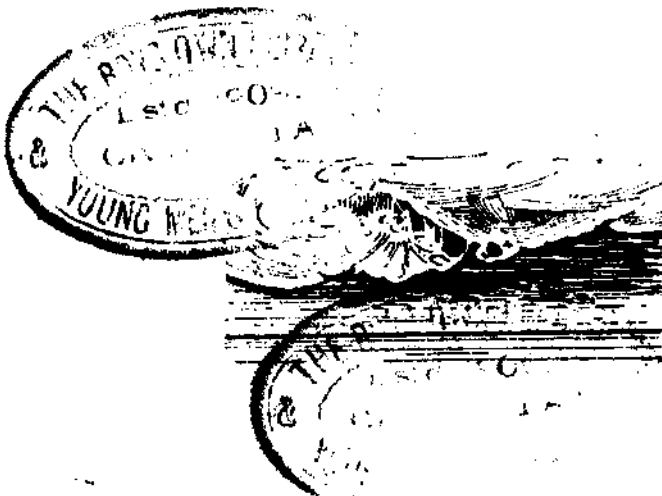
চিতাভস্ম

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

গ্রামে একেবারে ছি ছি পড়িয়া গেল। সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না;—এমন ভাল ঘর এবং কার্ত্তিকের মত বর পাইয়াও সুমিত্রা কি করিয়া কুল-ত্যাগ করিল? বহুদিন পর্য্যন্ত সকলের মুখে মুখে এই কলঙ্কিনী নারীর আলোচনা চলিতে লাগিল। যখন কাঁধে ভূত চাপে, তখন এমনই মতিভ্রম হয়; ক্ষণিকের ভুলে, মুহূর্ত্তের লালসায় নিজেকে দেউলিয়া করিয়া অসুন্দরকে বরণ করিয়া লয়। শত চেষ্টাতেও সে আর মোড় ফিরাইতে পারে না, অতলে কোথায় তলাইয়া যায়।

সনৎ লজ্জায় একেবারে মরমে মরিয়া গেল। কাহাকেও মুখ দেখাইতে তাহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। স্ত্রীর হঠাৎ চলিয়া যাইবার সে কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইল না। সমস্ত ঘটনাটাই তাহার নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখানে তাহার কিসের অভাব ছিল? তাহাকে ত্যাগ করিয়া তবে কেন গেল সে? সে ত তাহাকে অন্তর দিয়াই ভাল বাসিয়াছে, কখনো অসুখী করে নাই, তবু কি অসুবিধা ছিল তাহার এখানে? তবে এমন করিয়া কুলে কালি দিয়া কেন গেল সে? অসহ্য যন্ত্রণায়, দারুণ দুশ্চিন্তায় সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

মাতা সুনয়না পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িলে তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—তুই দুঃখু করিস নি বাবা! অভাগীর অদৃষ্টে অনেক কষ্টই আছে, নইলে, এমন দুর্ম্মতি হবে কেন তার? তোর ঐ শুক্‌নো মুখ আমি যে আর দেখ্‌তে পারি না, আবার যে দিয়ে চাঁদপানা বউ এনে আঁধার ঘর আলো করি। অমত করিস্ নি!

অত দুঃখেও সনতের হাসি পাইল। সে বলিল—না মা, আর বে-থা করব না; বেশ ত আছি দু'জনে। ওকথা আর আমাকে বলো না!

পুত্রের কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া মাতা চুপ করিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন—যাক্ না আরো দু'দিন, সব ঠিক্ হয়ে যাবে।......

রাত্রে শয্যায় শুইয়া সনতের ঘুম আসিল না। বিবাহের রাত্রি হইতে একে একে কত কথাই তাহার মনে পড়িল। কখনো ত সে সুমিত্রার ভালবাসার অভাব বা অবহেলা বুঝিতে পারে নাই! সে ত নিজেকে নিঃস্ব করিয়াই তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। তবে হঠাৎ তাহার এ দুর্ম্মতি হইল কেন? সে কি তবে তাহার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছে? বারবার ভবিয়াও সে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না; নীরব অশ্রু-ধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল।

বি-এ পাশ করিয়া এতদিন সনৎ বাড়ীতেই ছিল, কোন চাকুরীর কথা তাহার মনে হয় নাই। এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে হইল কাজের কথা। যাহা হউক, একটা কিছু তাহাকে করিতেই হইবে। চিন্তাটা মনে আসিতেই সে—বুকের জায়গায় বরখাস্ত করিয়া দিল।......

পুত্রের বাউণ্ডুলে-ছন্নছাড়া ভাব দেখিয়া মাতৃ-হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে আবার ভাল করিয়া বুঝাইতে বসিলেন—অমত করিস্ নি বাবা! রাজী হ, আমার হাতে অনেকগুলি সুন্দরী মেয়ে আছে, পছন্দ মত একটাকে ঠিক্ করে দি'।

সনৎ অচল অটল। বলিল—না মা, বিয়ে আর করব না। ও কথা একেবারে ভুলে যাও তুমি।

সুনয়না একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার বুকের ভিতর আশার ক্ষীণ আলো কিন্তু ধিকিধিকি জ্বলিতে লাগিল। ভাবিলেন, যাক্ আরো কিছুদিন, মন টল্‌বেই! সেই অনাগত শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই তিনি দিন গণিতে লাগিলেন।.....

দুই

সনতের বরাৎ ভাল; তাহার একখানি দরখাস্ত লাগিয়া গেল। চিত্রগুপ্তের আফিসে অর্থাৎ 'ডেথ্ সাব-রেজিষ্ট্রার' পদে তাহাকে মনোনীত করা হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে কোথায় পোষ্ট করা হইল জানান হইবে। চিঠিখানি পাইয়া সনতের মন খুব খুসিতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল কর্ম্ম-কোলাহলে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া এবার সে সুমিত্রার স্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু পারিবে কি? সে যে তাহার প্রতি শিরায় শিরায় জড়াইয়া আছে।......

কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনিবার জন্য সনৎ কলিকাতায় এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। পথ চলিবার সময় সে চারিদিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ফেলিয়া চলিতে লাগিল। মনে মনে ক্ষীণ আশা—যদি দৈবাৎ সুমিত্রার দেখা পাওয়া যায়। সে একে একে সমস্ত স্নানের ঘাটগুলি খুঁজিয়া দেখিল—যদি সেখানে তাহার সন্ধান মিলে। কিন্তু সব বৃথা; তাহাকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতাশ হইয়াই ফিরিতে হইল।

সেদিন সনতের বন্ধু বিকাশ তাহাকে ধরিয়া বসিল—বায়স্কোপে যাইতে হইবে। কি একখানি ভাল বাংলা বই আছে। বন্ধুর অনুরোধ সে উপেক্ষা করিতে পারিল না; যাইতেই হইল তাহাকে তাহার সঙ্গে।

অভিনয়ের তখনও অনেক দেরী। সমস্ত ঘরটা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কত স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; তাহার চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। যদি আজ সুমিত্রা আসত!.....

যথাসময়ে সমস্ত আলোগুলি নিবিয়া গিয়া পর্দ্দার বুকে ছবি ফুটিয়া উঠিল। সনতের মন সুমিত্রার চিন্তায় বিভোর হইয়া গিয়াছিল—ভাল করিয়া ছবির উপরে দৃষ্টি দিতে পারিল না; মধ্যে মধ্যে এক-একবার সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল মাত্র।.....

হঠাৎ একবার সে চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ছবিতে ওই যে মেয়েটী একটি জীর্ণ সান-বাঁধান ঘাটে স্নান করিতেছে; এবং অপর একটি ঘাটে এক যুবক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে, সেইদিকে চাহিয়া সনৎ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না; আকুল আগ্রহে অপলক দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল। মনে হইল—ওই মেয়েটী যেন তাহারই প্রিয়তমা পত্নী সুমিত্রা! ঠিক্ সেই রকম দু'টি ডাগর-ডাগর কালো চোখ, ওই ত বাঁ দিগের গালের উপর সেই ছোট তিলটি!

ওই ত ঠিক্ তারি মত মনভুলান চপল হাসি; হাসিতে গেলে—ঠিক্ তারি মত গালে টোল খাইয়া যায়। সনৎ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল।

তাহার ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলে—'সুমু, লক্ষীটি, ফিরে এসো।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—না, না, আমার সুমিত্রা অভিনয় করিতে যাইবে কেন? আর সে এমন সুন্দর অভিনয় করিবেই বা কি করিয়া? এ হয় ত আর কেহ; একরকম চেহারার লোক কি থাকিতে নাই? এ চিন্তাতেও কিন্তু সে শান্তি পাইল না; মুহূর্ত্তে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। একাগ্র দৃষ্টি দিয়া সে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—ও সুমিত্রা না হইয়া যায় না। এতদিন সে ইহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অন্তরের তুমুল আন্দোলনে সে যেন একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল।

ইণ্টারভেলের সময় সে বন্ধু বিকাশের কাছে মেয়েটার প্রশংসা করিয়া তাহার পরিচয় জানিতে চাহিল।

বিকাশ হাসিয়া বলিল, পছন্দ হলো না কি? মাইরী, বেশ 'প্লে' করেছে। 'স্ক্রীনে' ও এই প্রথম নেমেছে বটে, কিন্তু ভারী চমৎকার উতরে গেছে। ওর নাম পূর্ণশশী। কেউ ওকে চিন্‌তই না। মেয়েটার চেহারা এবং গলার সুর অতি সুন্দর—ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল দেখে নিও তুমি।

বিকাশ সনতের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; কাজেই সে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিল না।

আবার ছবি আরম্ভ হইল।

তন্ময়ভাবে সনৎ ছবি দেখিতে লাগিল। যে যুবকটী মাছ ধরিতেছিল, সে জমিদারের ছেলে; স্নানরতা তরুণীকে দেখিয়া তাহার রূপে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। বারমাসই সে শহরে থাকে। চরিত্রহীন বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া সেও পাপের শেষ ধাপে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কোনপ্রকার অন্যায় করিতেই তাহার আর বাধে না। সে তাহার লোলুপ লুব্ধদৃষ্টি তরুণীকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। তারপর তাহাকে পাইবার জন্য কত পরামর্শ, কত ষড়যন্ত্র! অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে কতগুলি পাষণ্ড বলপূর্ব্বক সেই তরুণীকে অপহরণ করিয়া লম্পট জমিদার-নন্দনের উদ্যান বাটীতে লইয়া গিয়া হাজির করিল। সেখানে তাহার প্রতি কি কুৎসিত ব্যবহার না চলিতে লাগিল! তরুণী কাতরকণ্ঠে কত মিনতি, আকুল হইয়া কত ক্রন্দনই না করিল! কিন্তু সব বৃথা, কেহ সে সবে কর্ণপাতও করিল না। নিস্তব্ধ নির্জ্জন নিশীথে একটি অসহায়া অবলা নারীর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল!

সেই ভয়ানক স্থানটি দেখিতে দেখিতে সনৎ নিজেকে হারাইয়া ফেলিল; ভুলিয়া গেল যে, সেটা বায়স্কোপ-গৃহ। দারুণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—সুমিত্রা, সুমিত্রা! তারপর হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

চারিদিকে একটা সোরগোল উঠিল। কেহ বলিতে লাগিল—এমন নার্ভাস লোকের কোথাও যাওয়া উচিত নয়। কেহ বলিল—মৃগী রোগ আছে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু কেহই বুঝিল না।

বিকাশ বেচারা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সেই যেন অপরাধ করিয়াছে।

একটু পরেই সনতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে কি করিয়া বসিল ভাবিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল।

মেসে ফিরিয়া বিকাশ সনতকে কোন প্রশ্নই করিল না; মিছামিছি তাহাকে লজ্জার উপর লজ্জা দিয়া লাভই বা কি?

কলিকাতা যেন সনতের অসহ্য বোধ হইতেছিল। পরদিনই সে তাহার দেশে রওনা হইয়া গেল।

বাড়ী আসিয়াই সে দেখিল, সদর হইতে তাহার নিয়োগ-পত্র আসিয়াছে। '————' সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হইতে তাহাকে চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

সামনে একটা কাজ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। নিজেকে ভুলিতে হইলে এইটাই যে অমোঘ মহৌষধ। সে কর্ম্মস্থলের দিকে রওনা হইয়া পড়িল।

নূতন চাকুরী সম্বন্ধে সনৎ মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনাই না করিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মস্থলে আসিয়া চাকুরীর নমুনা দেখিয়াই তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

নদীতীরেই শ্মশান। আশেপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে নির্জ্জন তটভূমি।

শ্মশানের অনতিদূরেই একটা টিনের সেডের একচালা। রৌদ্র এবং ঝড়-বৃষ্টিতে শবদাহকারীরা সেখানে কোনপ্রকারে মাথা রক্ষা করে। কোনদিন হয় ত ইহার চারিদিক ঘেরা ছিল; কিন্তু কালের কঠিন আঘাতে সেই বেড়াগুলা এখন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সেখান হইতে একটু দূরে ওই বড় অশথ গাছটার কাছে ছোট একখানা একচালা; তাহাতে পালা করিয়া কয়েকজন ডোম থাকে।

তাহার পাশেই রেজেষ্ট্রি অফিস। ছোট একখানা টিনের ঘর। চব্বিশ ঘণ্টা সনতকে সেখানেই থাকিতে হয়। শবের নাম-ধাম, বয়স, রোগ ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া শ্মশানে গিয়া মৃতব্যক্তিকে দেখিয়া আসা তাহার নিত্য-নিয়মিত কর্ম্ম। হ্যাঙ্গামা কম নয়; সন্দেহ হইলে থানায় খবরও পাঠাইতে হয়।

কয়দিন তাহার কি ভয়ে ভয়েই না কাটিল! রাত্রে এক মুহূর্ত্তেরই জন্যও দুই চোখ এক করিতে পারিল না। বেগতিক দেখিয়া তাহাকে কালু ডোমের সাহায্য লইতে হইল—রাত্রে সে সনতের ঘরে শুইবে।

কালু হাসিয়া বলিল—দু'দিনেই সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে বাবু! ভয়-ডর কিছু আর থাকবে না। এ বড় মজার কাজ আছে; দৈত্যদানা আমাদের কাছে ঘ্যসতে পারে না। যমরাজার চাকরী করি আমরা, হাঃ হাঃ!

হইলও ঠিক্ তাহাই। কয়দিন পরেই তাহার আর কোন ভয়-ভাবনা রহিল না। কালুকে এখন তাহার ঘরে রাত্রিযাপন করিতে হয় না: খাইতে বসিয়াও তাহার আর ঘিনঘিন লাগে না; সবই তাহার গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

বর্ষাকাল। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কয়দিন ধরিয়া বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না।

এ কয়দিন কোন শবই আসে নাই। সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইয়া সনৎ একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে; তাহার সময় যেন আর কাটিতে চাহে না। অবসর পাইয়া আজ সুমিত্রার চিন্তা তাহাকে নূতন করিয়া পাইয়া বসিল। স্ত্রীর কথা মনে হইতেই সে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল।

রাত্রি গভীর। তখন মেঘ কাটিয়া প্রথম চন্দ্রোদয় হইয়াছে। তাহার স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা কতকগুলি সমবেত নারীকণ্ঠের 'হরি ধ্বনি'তে সনতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রমণীদের চীৎকার শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, কোন পতিতালয় হইতে শব আসিয়াছে। সে উঠিয়া

আলোটা চড়াইয়া দিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে গিয়া বসিল।

একটু পরেই কয়েকজন রমণী আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। সনৎ কপাট খুলিয়া দিয়া মৃতার নাম ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ণশশী নাম শুনিয়াই তাহার অন্তরটা 'ছ্যাং' করিয়া উঠিল। এ যদি বায়স্কোপের সেই পূর্ণশশী হয়! তাড়াতাড়ি সে লেখা শেষ এবং টাকা জমা লইয়া মৃতাকে দেখিতে গেল।

একখানা চাদর দিয়া মৃতদেহটা আচ্ছাদিত। আবরণ উন্মোচন করিতেই মেঘাবৃত চন্দ্রমার মত একখানি ফুটফুটে সুন্দর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। এ যে সনতের চির-পরিচিত মুখ! ইহাকেই ত সে এতদিন শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যান করিয়া আসিয়াছে! এমন করিয়াই বিধি তাহাকে শেষ দেখা দেখাইল! তাহার অন্তরটা হাহাকার করিয়া উঠিল। চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া রমণীগণ অবাক্ হইয়া গেল—মানুষ এমন দুর্ব্বল চিত্তও হয়। পরের জন্য কখনও কাহারো চোখে জল আসে না কি? আসল ব্যাপারটা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

সনৎ সারাক্ষণ শ্মশানে থাকিয়া সুমিত্রার দাহকার্য্য দেখিল।...

শেষরাত্রির দিকে সব শেষ হইয়া গেল। এই জীবন! সৎকার শেষ করিয়া কোলাহল করিতে করিতে রমণীর দল স্নানের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

সনৎ সুমিত্রার চিতায় এক কলসী জল ঢালিয়া দিয়া বলিল—যেখানেই থাক না কেন, শান্তি পাও তুমি! ভগবান তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন!...

পরদিন সনৎ কিছুতেই কাজে মন দিতে পারিতেছিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সুমিত্রার স্মৃতিই তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছিল। একটু অবসর পাইলেই সে শ্মশানে গিয়া বসিতেছিল। কিছুতেই সে প্রিয়তমার স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছিল না।...

হঠাৎ কানুর ডাকে সনতের চমক ভাঙ্গিল। সে জানাইয়া গেল যে, একখানি রেজিষ্টারী চিঠি লইয়া ডাকপিওন অপেক্ষা করিতেছে।

সনৎ ভাবিয়া পাইল না, কোথা হইতে তাহার নামে রেজিষ্টারী পত্র আসিল। তাড়াতাড়ি গিয়া সহি দিয়া চিঠিখানি হাত লইয়া পিওনকে বিদায় করিল; তারপর খামটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে ভিতরের পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে জড়ান জড়ান অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

প্রিয়তম,

জানি, এ সম্বোধনের অধিকার আজ আর আমার নাই। স্বেচ্ছায় নিজের হাতে আমি যে সে অধিকার-গ্রন্থি ছিন্ন করে' চলে' এসেছি।

কতবড় অপরাধ আমি করেছি—কতটুকু প্রায়শ্চিত্তই বা তার হ'ল এসব হিসাব-নিকাশ করে' দেখবার প্রবৃত্তি নেই, সময়েরও অভাব। ওপারের বাঁশী এসে কেবলই আমার কাণে বাজছে—যেতে হবার কল্পনায় আমি উন্মাদ হ'য়ে উঠেছি।

কিন্তু কি দুর্গ্রহ! দিন যত নিকট হ'য়ে আসছে, মন তত পিছিয়ে পড়ছে কেন?

সে কেবলই তার হারান দিনের স্বপ্ন নিয়েই মেতে উঠেছে। বুঝি সে তার সামনের নিষ্ঠুর ব্যর্থতাকে পূরণ করে' নিতে চায় গতদিনের চরম সার্থকতার ক্ষণগুলি দিয়ে! কে জানে!...

যখন ভাবি, তখনই হাসি পায়। তোমার

মত স্বামী পেয়েও যে পোড়াকপালীর কপাল পোড়ে, তার জন্যে দুঃখ করে' লাভ !

শিক্ষিতা সুন্দরী বধূ, শহর থেকে গ্রাম আলো করতে এসেছে—তার আদর না হ'য়ে কি পারে ! শাশুড়ীর স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা, এমন কি, প্রতিবেশীদের পর্য্যন্ত আদর-যত্ন পেয়েছিলুম অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু মন উঠল কোথায়—উপন্যাসের নায়িকার মত স্বাধীন সত্তা মনের মধ্যে তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যে !

বাবার অর্থহীনতা অপরাধের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব কেন ? যাকে আমি কোন-মতেই আমার উপযুক্ত মনে করতে পারছি না, সেই হবে আমার জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তা !

হয় ত কালের যাদুমন্ত্রে এ সবই ওলট-পালট হ'য়ে গিয়ে স্বামী-তীর্থেই আমি আমার জীবনের শেষ নিশ্বাসটুকু মিলিয়ে দিতে পারতুম; কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতার ক্রুর ইঙ্গিতে তা' হওয়া সম্ভব হ'ল না। শহর থেকে পেলুম এক চিঠি। তা'তে অখণ্ড যুক্তি দিয়ে বোঝান হয়েছে,—দেহের অবসানই জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ নয় ; মনের মৃত্যুর মত শোচনীয় ট্রাজেডি আর নেই ।

পৃথিবীতে আজও এমন মানুষের অভাব হয় নি, যারা এই ট্রাজেডির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দেহটাকে হেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারে ! তুমি যদি বল, পৃথিবীতে যা' অসম্ভব তোমার জন্যে তাও আমি সম্ভব করতে পারি, ইত্যাদি।

সমস্ত কথাগুলা চুম্বকের মত যেন আমাকে আকর্ষণ করে' নিলে। চিঠির উত্তর গেল, আবার এল। তারপর একদিন তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়-লুম—সত্যের সন্ধানে !

সত্য মিলল ; কিন্তু সত্তা সাব্যস্ত হ'ল না।—কুসংস্কারের জলন্ত নিদর্শন বিবাহ ত হয় নি, কাজেই ইতস্ততঃ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। একদিন দেখলুম জগতের আর মহত্ত্বের কাজে তার ডাক পড়েছে। বিনা দ্বিধায় সে সেই কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করতে ছুটেছে। প্রতি-রোধ করবার প্রবৃত্তি হ'ল না, নিঃশব্দে বসে' রইলুম। মনে পড়ল তোমার মুখ—কিন্তু অলঙ্ঘ্য ব্যবধান উত্তীর্ণ হ'য়ে তোমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বার শক্তি কোথায় !

বায়স্কোপে নামলুম ! সব সত্যের উপর সত্য যে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ !

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে' গেল। এমন স্বাভাবিক অভিনয় না কি বাঙলা দেশে হওয়া সম্ভব ছিল না এর আগে ! মনে মনে হাসলুম, অভিনয় কোথা—এ যে আমার জীবনেরই একটা অধ্যায় !

সেদিন নিজের সুখ্যাতি নিজের কাণে শোনবার জন্যে বায়স্কোপে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল তোমার ওপর। চোর যেমন চুরী করে' পালায়, তেমনি করে' নিজেকে গোপন করে' বসে রইলুম ; একবার ছবিটা দেখবারও প্রবৃত্তি হ'ল না। ভাবলুম, বাড়ী চলে' যাব ; কিন্তু সেখানে লোভী মন বাধা তুললে—ইণ্টারভালের সময় আর একটীবার তোমাকে দেখতেই হবে যে !

ইণ্টারভাল হ'ল। প্লে আবার সুরু হ'লে ভাবলুম,—হোক্ না সম্বন্ধের শেষ, তবু ত এক বাড়ীতে রয়েছি দু'জনে ! কতক্ষণ পরেই কিন্তু হট্টগোল উঠ্‌ল— কে একজন অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। বুকটা 'ছ্যাৎ' করে' উঠ্‌ল—যা' ভেবেছি তাই ! সব ভুলে তড়তড় করে' নীচে নেমে এলুম, কিন্তু এগুতে পারলুম না। সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন আমার ওপর পড়েছে ; কেউ কেউ মন্তব্য করছে—

একেই বলে অভিনয়—লোকটা সহ্য করতে পারলে না।

অভিনয়ই বটে।...

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।

তারপর বায়স্কোপের অভিনয় করা হ'ল আমার কাছে অসম্ভব। তোমার সন্ধান নিয়ে পেছনে পেছনে এখানে এসেছিলুম; কিন্তু কাল ব্যাধি আমাকে তোমার দর্শন সুখ থেকেও বঞ্চিত করলে। জানি এ শাস্তি আমার ন্যায্য প্রাপ্য; কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবার অধিকার আমার নেই। তোমার হাতের আগুণ পাব না সত্য, তবু সান্ত্বনা এই যে,—তোমার ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি একবারও যদি এ অপরাধিনীর ওপর পড়ে, তা' হলে আমার চাওয়ার বেশী যে পাওয়া হবে।

বিদায় ক্ষণে তোমার কাছে আজ সকাতরে একটী প্রার্থনা করে' যাবো। ক্ষমা চাইবার কোন স্পর্দ্ধাই আমার নেই, সে চেষ্টাও আমি করব না। তবু আমার শেষ মিনতি রেখো—আবার বিয়ে করে' তুমি সুখী হয়ো। এ জীবনে তোমায় সুখী করতে পারলুম না সত্য, কিন্তু পরজন্ম যদি থাকে, তোমাকে আবার যেন আমি স্বামী-রূপেই পাই এবং তোমাকে সুখী করবার যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করতে পারি। ইতি,

তোমার
চরণতলাশ্রয়চ্যুত—
সুমিত্রা

পত্রখানি পাঠান্তে সনতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে সম্ভবতঃ ব্যথিতার জন্য ভগবানের নিকট তাহার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিল।

বিস্ময়
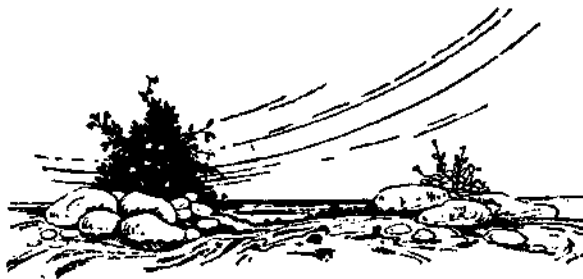
[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

টেহেরান্ ভ্রমণ-কাহিণী বহুবার পড়িয়াও বীণার তৃপ্তি হয় নাই। অবসর পাইলেই সে মাসিক-পত্রগুলি খুলিয়া বসিত।

সেদিনও গৃহের যা' কিছু সামান্য কাজ সমাপনান্তে অপরাহ্নে বীণা মাসিক-পত্র খুলিয়া পড়িতেছিল—

"......ভ্রমণ-ক্লিষ্ট অবশ দেহ নিয়ে সমাগত ব্যথাকাতর সুন্দর সন্ধ্যায় ঘাটের পাশে গিয়ে বসতেই মনে হলো, এ ঘাটে কতবারই না যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু কেন যে করেছি তা' কোনদিনই তো ভেবে পাই নি। আজও হয় তো পেতাম না।...পশ্চিমাকাশে দিক্‌বধূ বিদায়ের চুম্বন এঁকে দিয়ে প্রিয়তমার সুনীল অধর রাঙিয়ে তুলছিল। মুখ তুলে চাইতে পারছিলাম না। পাছে সে লজ্জায় অসমাপ্ত লীলা-কৌতুক ফেলে পালিয়ে যায়।...চেয়ে দেখি, ছোট সুন্দর রঙীন্ কলসী সোহাগে জড়িয়ে বিদেশিনী এক অপরিচিতা তরুণী ঘাটে নাম্‌বার সিঁড়ির ওপর সরম-রাঙা আনত মুখে দাঁড়িয়ে আছে! মনে হলো, এ ঘাটে কবে যেন কি ফেলে গেচি—ফিরে ফিরে তাই তারই সন্ধানে আমাকে আসতে হয়। কিন্তু কি যে ফেলে গেচি..."

বীণা অদূরে পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিল। নিমিষ মধ্যে মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিলেশ ক্লান্ত অথচ সংযত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

নিখিলেশের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বীণা বিশেষ রকম বিচলিত ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। কোনরকমে ভাবচাঞ্চল্য কাটাইয়া উঠিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে জগত্তারিণী দেবীর ঘরটা দেখাইয়া দিল।

নিখিলেশ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ক্লান্ত চরণে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া বীণাকে ডাকিয়া তাহার আহারের যোগাড় করিতে বলিলেন।

মায়ের আজ্ঞার অপেক্ষা না রাখিয়াই বীণা ভাসুরের আহারের যোগাড় করিতে গিয়াছিল।

নিখিলেশ উচ্চকণ্ঠে কহিল, না, না, কোন দরকার নেই। আমি খেয়ে এসেচি। তুমি বৌমাকে কিছু করতে বারণ ক'রে দাও মা।

বীণার কাণে নিখিলেশের প্রত্যেকটি বর্ণ পৌঁছিল। তাহার শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ভাসুর কেন যে আহারের আয়োজন করিতে নিষেধ করিতেছেন, তাহা সে কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিল না। একটা অজানা শঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জগত্তারিণী দেবীও বিশেষ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, সে কি বাবা, এই এতখানি বেলা না খেয়ে আছিস্, মুখ-চোখ শুকিয়ে গেচে, এখন কিছু না খেলে কি চলে?

নিখিলেশ বলিল, কোন দরকার নেই। আমার এখন ক্ষিদে নেই।

জগত্তারিণী দেবী বিচলিতভাবে নিখিলেশকে

নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নিখিলেশ অগত্যা একটা মিথ্যা জবাবদিহি করিল, শৈলেনের পিসীমা পথে ধ'রে ডেকে নিয়ে সেখান থেকে খাইয়ে দিলেন।

জগত্তারিণী দেবী তাহা বিশ্বাস করিলেন; বীণা কিন্তু করিল না, তবু আহারের যোগাড় করিতেও সে আর ব্যস্ত হইল না।

জগত্তারিণী দেবী বলিলেন, তবে থাক্ বৌমা!

বীণা সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া নিজের কক্ষে বসিল। তাহার মুখ দেখিলে মানবচরিত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্পষ্টই বুঝিতে পারিত যে, তাহার হৃদয় মন একটা দুঃসংবাদে কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

দুঃসংবাদ……কিন্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার হৃদয় তখনও কিছুই জানে নাই।

জগত্তারিণী দেবী যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন যে, নিখিলেশ তাহাকে তাহার কলিকাতার বাসায় লইয়া যাইতে আসিয়াছে, তখন তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

করুণ ব্যথিত-কণ্ঠে বলিলেন, বাবা নিখিল, আমি যদি স্বামীর ভিটে ছেড়ে যেতেই পারতাম তো অনেকদিন আগেই তোর ওখানে গিয়ে থাকতাম। এসব জেনে-শুনেও তুই এত কষ্ট ক'রে কেন যে নিতে এলি, তা' তো আমি ভেবে পাই না।

মা, এখনও তোমার সে সাধ মেটে নি? কলঙ্ক অপযশে গাঁ যে ছেয়ে গেল, তবু তোমার মত একটুও টললো না? মা, অতিদুঃখেই আজ তোমাকে আমায় বলতে হচ্ছে যে, তোমার ভিটের পবিত্রতা নষ্ট হ'য়ে গেছে; সেখাকার স্বামীর ধুলো আঁকড়ে পড়ে' থাকায় আর কোন লাভ নেই। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি আমাদের মুখ চেয়েই না হয় এ বাড়ী ছেড়ে চলো।

'আমাদের' বলিবার ইচ্ছা নিখিলেশের ছিল না—কিন্তু 'আমার' বলিতে গিয়া চিরাভ্যস্ত 'আমাদের'ই বাহির হইয়া আসিল। এ জন্য অনুতাপও তাহার বড় কম হয় নাই।

জগত্তারিণী দেবীর কণ্ঠ অধিকতর বিষাদ-ক্লিষ্ট হইয়া আসিল। শূন্যের পানে বিমনা ব্যথিত দৃষ্টি যতদূর সম্ভব নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, নিখিল, শত কলঙ্ক কলুষতাও তাঁর স্মৃতি-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না—এই যে আমার বিশ্বাস।

নিখিলেশ ক্ষীণ উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া বলিল, মা, তোমার বিশ্বাস তোমারই থাক্; কিন্তু আমার আত্মমর্য্যাদা যে তা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে না।

'আমার' বলিতে পারিয়া নিখিলেশ স্বস্তি অনুভব করিল। তাহার হৃদয় মধ্যে 'আমাদের' ও 'আমার' দ্বন্দ্ব এতক্ষণ একটা অদৃশ্য সূচের মতই বিঁধিতেছিল।

জগত্তারিণী দেবীর এই ধরণের কথা কাটা-কাটি একেবারেই পছন্দ হইতেছিল না। তিনি একান্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন—পাছে তাহার স্বামীর পবিত্র স্মৃতি আপনার অজ্ঞাতে লাঞ্ছিত হয়। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি কহিলেন, যাই বলিস্ না কেন নিখিল, কিন্তু আর ক'দিনই বা বাঁচবো! স্বামীর ভিটেয় দেহ রাখতে পারার সুখ থেকে নিজেকে আমি কিছু-তেই বঞ্চিত করতে পারবো না। এ জীবনে আর তো আমার কোন সাধই নেই—শুধু তাঁর পাশেই দেহটা রাখতে চাই। নিখিল, এতবড় গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করিস্ নি বাবা

নিখিলেশ ভাল করিয়াই বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিল। এমন সব কথা যে উঠিয়া পড়িবে, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত; মনে মনে

যথাযথ উত্তরও সে গড়িয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু জগত্তারিণী দেবীর শেষের কথাগুলি তাহার সকল দৃঢ়তার মূলে গিয়া সবেগে নাড়া দিল। প্রতিবাদ করিবার কি তাহাকে বুঝাইবার মত কোন কথাই তাহার মুখে জোগাইল না।

ধীরে ধীরে নিজেকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া কহিল, তুমি এ বাড়ী যদি না ছাড়তে পার তো বৌমাকে আর কোথাও অন্ততঃ পাঠিয়ে দাও। তার নিশ্বাসে এ বাড়ীর বাতাস পর্য্যন্ত বিষিয়ে উঠেচে।

জগত্তারিণী দেবী অধিকতর চিন্তিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বৌমার আপনার বলতে আর কে আছে নিখিল? তার মামার কাছে কিছুদিনের জন্যে পাঠানো যেতো, কিন্তু সেও তো, আজ বছরখানেক হ'লো মারা গেচে। আপনার বলতে যে এখন তার আমরাই নিখিল।

নিখিলেশ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিল, এ ভিন্ন আর কোন পথ তো আমার চোখে পড়ে না। এখন যা' ভাল বোঝ তাই কর।

জগত্তারিণী দেবী ইহার ভাল-মন্দের জন্য কিছুমাত্র ভাবিলেন না। কারণ, তিনি জানিতেন, এ দুইটির একটিও সম্ভব নয়।

— অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা নিখিল, বৌমা যে নির্দ্দোষ নয়, তাই বা তুই কেমন ক'রে জান্‌লি?

নিখিলেশ বিকৃতভাবে হাসিয়া বলিল, মা, ছাইপাঁশ দিয়ে এ সব চাপা দেওয়া তো চলে না। যাকে সন্তোষ ভয় দেখিয়ে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিলে, সেই সঙ্গে তার মুখটা তো আর চিরদিনের মত বন্ধ হ'য়ে গেল না।

লোক পরম্পরায় অতুল চক্রবর্ত্তির কীর্ত্তিটা জগত্তারিণী দেবীর কাণেও আসিয়াছিল, কিন্তু শৈলেশের স্থানে সন্তোষের নামটা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে ডুবিয়া গেলেন। বলিলেন, কে— সন্তোষ না শৈলেশ?

নিখিলেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, থাক্ ; পচা ঘা ঘাঁট্‌তে গেলেই দুর্গন্ধ বেরুবে—ওসব কথা এখন থাক্ বরং। আজই একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেল। কাল সকালের ষ্টীমারে তোমাকে যেতেই হবে।

বীণার কলঙ্ক জগত্তারিণী দেবী বিশ্বাস করেন, কি করেন না—তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার মুখে, এমন কি বীণার প্রতি আচরণেও বুঝিতে পারে নাই।

এসব বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্যরকম নির্লিপ্ত ছিলেন। তাহার নির্লিপ্ততার কারণও কেহ কোনদিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

নিখিলেশও নির্দ্দিষ্টভাবে কিছুই বুঝিল না।

জগত্তারিণী দেবী অবশেষে জানাইলেন, ইহার কোনটাই তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরদিন প্রাতেই আবার নিখিলেশ ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্তে ক্ষুধা মানতে জর্জ্জরিত দেহ লইয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া গেল। রান্না ভাত হাঁড়িতেই পড়িয়া রহিল। নিখিলেশ এ বাড়ীর জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল না। মায়ের পায়ে ঘটা করিয়া মাথা ঠেকাইয়া বিদায়ও সে লইল না। চিরাচরিত প্রথায় এই তাহার প্রথম ভুল হইল।

জগত্তারিণী দেবী ঠাকুর-ঘরে কাঁদিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান ফিরিলে চোখ চাহিয়া দেখিলেন, বীণার কোলে তাহার মাথা রহিয়াছে। দুর্ব্বল কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, কে, বৌমা নিখিল চ'লে গেচে তো?

বীণা কোন উত্তর করিতে কি জানি কেন পারিল না।

দাবার ছক এই প্রথম তাহার চোখের সম্মুখে কেমন লেপিয়া পুঁছিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলগুলি একে একে খোয়া যাইতেছে…হয় তো মাত হইয়া যাইতেই সে বসিয়াছে।…

(ক্রমশঃ)

মামুলী

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

এক

পৌরুষ যেদিন পুরুষের গুণ ছিল, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তে যে আসিয়াছে সে এ দেশের পুরুষের পক্ষে মহাগুণ। ফলে ভদ্রতা ও ভীরুতায় যেমন প্রভেদ রাখি না, তেমনি শৌর্য্যের লক্ষণ দেখিলে তাহাকে অনায়াসে গুণ্ডামী বলিতেও আমাদের বাধে না। এই ধরণের গুণ্ডামীর লক্ষ্য হইয়া হতমান হইলে ব্যথা পাই, কিন্তু গুণ্ডাকে স্বহস্তে দণ্ড দিবার সাহস না থাকায় প্রতিশোধ লওয়া হয় না, ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়।

বিনয় নামে বিনয় হইলেও আমাদের দলে নয়। বিধাতার অনুগ্রহে দেহটা সে পাইয়াছে নিখুঁত। অমন দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ সহজে চোখে পড়ে না। হাতের কব্জীর তুলনা পাঞ্জাবেও বেশী মিলে না। চোখ-মুখ নাক-কাণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তাহার দেহে এমন সুসমঞ্জস যে, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় কি না জানি না; তবে কাছে থাকিলে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে পৃথিবীর অপরপ্রান্ত অবধি অনায়াসে ঘুরিয়া আসা চলে। পথে বাহির হইয়া দুই-একবার এই বিশাল দেহের ও ইহার অভ্যন্তরে যে বিপুল শক্তি রহিয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় মাঝে মাঝে পাইয়াছি, কিন্তু সে কথা থাক—

সেদিন 'পিক্‌চার প্যালেসে' ছবি দেখিতে যাইয়া যে কাণ্ড দেখিয়াছি তাহা আমরণ মনে থাকিবে। বড়দিনের উৎসবে কলিকাতায় সমারোহের অন্ত নাই। সাহেব পাড়ার বাজারের কথা না হয় নাই তুলিলাম—অছেল মোল্লার দোকানের সম্মুখে বিস্ময়ে হতবাক্ নরনারীর যে সম্মিলন হয় তাহাতে ট্রাম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়া পড়ে। 'মরিশ সিভেলিয়ারের' ছবি, তাহাতে আবার বড়দিনের আসর; তরুণ বাঙ্গালায় সম্মুখের আসন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। টিকিট না পাইয়া বিনয় ফিরিতেছিল; মবলক্ নয় সিকা খরচা করিয়া তাহাকে ফিরাইতে হইল।

অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দৌবারিকের টর্চ্চের সাহায্যে আসন দেখিয়া বসিয়া আসে-পাশে চাহিয়া প্রতিবেশিদিগের মুখশ্রী দেখিবার অবসর না পাইয়া মনটা দমিয়া গেল—কিন্তু উপায় নাই, ছবি তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছি—হঠাৎ একজোড়া তরুণ বাঙ্গালাকে পথ করিয়া দিতেই তন্ময়তা দূর হইল। আমাদের ছাড়াইয়া এবং জনপাচেক গোরাসৈন্যের আসন অতিক্রম করিয়া তরুণ বাঙ্গালী আসন গ্রহণ করিতে-না-করিতেই তরুণীর কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদে প্রেক্ষাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অভিনয় বন্ধ হইয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি পাশের আসন শূন্য, কিছুদূরে বিনয়কে ঘিরিয়া গোরার দল। এবং নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া আর সকলে। নবাগতা তরুণীর অবস্থা লিখিয়া জানাইবার মত নয়, আর তাহার সহচর বহুদূর হইতে ক্ষুব্ধ বিষন্ন দৃষ্টিতে এইদিকে তাকাইয়া বোধ করি নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া লইতেছে। তখন ব্যাপার কি জানিয়া লইবার সময় নাই, বিনয়ের

কাছাকাছি হইবার পূর্ব্বেই মণ দুই ওজনের একটী গুরুভার আসিয়া গায়ে পড়িল। আত্মরক্ষা সম্ভব হইল না ইউনিফর্ম্ম সমেত গোরা পুঙ্গবকে লইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পরে কি হইয়াছিল বলিতে পারিব না—কারণ দেখি নাই। চেয়ারের কোন স্থানে লাগিয়া কপালের বাঁ-দিকটা বেশ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। উপর হইতে জোড়া দুই শ্রীচরণ এবং গোটা চার দেহ স্থানচ্যুত হইলে চেয়ারের তলা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—কিন্তু গোরা বাবাজীকে ধরিয়া তুলিতে হইল।

একজনকে হইলে অবশ্য তত শঙ্কিত না হইলেও চলিত। কিন্তু একে একে জন পাঁচ-ছয়কে টানিয়া তুলিয়া খাড়া করিতেই দেখা গেল ইহাদের মধ্যে অক্ষত কেহই নাই; প্রায় সকলেরই বামগণ্ডে চারিটি আঙ্গুলের দাগ বেশ পুরু হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং দক্ষিণ গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বিনয়ের মুখের পানে একবার চহিলাম। সে আসিয়া রুমাল দিয়া কপালটা বাঁধিয়া দিল। রক্তপাত তাহা আবার শ্বেত অঙ্গের—সুতরাং শান্তিরক্ষার অধিকারিগণের আগমন এতক্ষণ কেন হয় নাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতে যাইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন দেখিয়া সংযত হইলাম।

কিন্তু গোরাদের কাণ্ড দেখিয়া সংযম টুটিয়া বিস্ময় মাথা তুলিল। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পুলিশ ছাড়িল না, আমার কপালে রুধিরাক্ত রুমাল বাঁধা দেখিয়া আমাকে এবং বিনয় কি বলিতে যাইতেছিল দেখিয়া তাহাকেও সহযাত্রী করিয়া লইল। প্রেক্ষাগার তখন প্রায় জনশূন্য, পুলিশের স্থনজর অতিক্রম করিতে অনেকেই প্রায় আত্মরক্ষা করিয়াছে। ঘণ্টা দেড়েক পরে থানা হইতে বাহির হইয়া দেখি —পথের অপর পারে সেই তরুণ ও তরুণী মোটর হইতে নামিয়া এদিকে আসিল এবং নিতান্ত কাতর অনুনয়ে দুইজনকে তাহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর প্রদান করিতে বলিয়া সোফেয়ারকে এইদিকে গাড়ী আনিতে ইঙ্গিত করিল।

কর্ত্তিত সুতরাং রক্তাক্ত ললাটের যন্ত্রণায় মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল; সেই সঙ্গে পুলিশের সহিত বচসা করিয়া দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোথাও কোমলতার কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না; ফলে নিমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রক যত লোভের বস্তুই হোক্, মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল; বোধ হয় একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মুখ খুলিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম—

"কোন ওজর-আপত্তি শুনব না—এই পথের মাঝখানে আমরা দু'জন আর আপনারা দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করে' লোক জমিয়ে কোন লাভ নেই, চলুন।"

বিনয় কথা বলিতে মাত্রা জ্ঞান হারাইয়া ফেলে—এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বলিল—"রাস্তায় লোকের ভিড় জমানতে লাভ আর কারোর না হলেও আপনাদের যথেষ্ট হবে—নইলে খানিক আগে এই হাঙ্গামা বাধত না।"

মেয়েটী হাসিয়া বলিল—"হাঙ্গামা বাধে ত আপনি সঙ্গে থাকলে তা'তে ভয় করি না। চলুন।"

বিনয় বেঁকিয়া বসিল, বলিল—"একে নিয়ে যান; হাসপাতালে যাওয়ার চাইতে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ ও'র পক্ষে অনেক উপকারে আসবে।"

—"আর আপনি? আপনার গায়ের জোর আছে বলে'—নিমন্ত্রণ যদিও নয়—অনুরোধ বড় সামান্য, না? তা' হবে না। এই আমি রাস্তার ওপর আপনার

অপেক্ষায় বসে' রইলাম, দেখি গায়ের জোরে আপনি তা' উপেক্ষা করেন কি করে।"

মেয়েটী বিনয়ের একখানি হাত ধরিয়া পথের উপর বসিয়া পড়িল। আমি বিনয়ের দিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম—চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে, হয়ত এখনি একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে!

বলিলাম—"চল বিনয়, নিস্তার নেই।"

বিনয় চলিল—কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া ভবিষ্যতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইলাম।

তরুণীর সহযাত্রী যুবকটী নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া সাদরে আকর্ষণ করিল।

বিনয় বার দুই তরুণীর কোমল মুষ্টির বন্ধন হইতে তাহার কঠিন আঙ্গুলগুলি ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বোধ হয় নিজের অগোচরেই নিরস্ত হইল।

দুই

গাড়ীতে বিনয় একটু নরম হইল। মেয়েটী তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতে লইয়া বিনয়ের হাতের অসাধারণ দীর্ঘ ও স্থূল অঙ্গুলিগুলি লইয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষার পর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আস্তে কারোর হাত ধরলে বোধ হয় সে হাত ভেঙ্গে যায়, না?"

বিনয় বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল, কোন সাড়া দিল না। আমার মনের কথা নাই বলিলাম, কপালে যে জয়-টিকা পারিয়াছি তাহার যন্ত্রণায় মাথা ধরিয়া গিয়াছে; তথাপি বিনয়ের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলাম, বলিলাম—"দেখবেন—ভুলে যদি হাত মুঠো করে আপনার হাতে হয় ত লাগতে পারে; ওর হাত নিয়ে খেলা করা মোটে নিরাপদ নয়।"

বিনয় একবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল, কোন কথা বলিল না। গাড়ীখানি একটা উৎকট শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড এক বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গাড়ীর শব্দে বাড়ীর টিকটিকিটীও বোধ করি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা সকলে এতক্ষণ বিষম উৎকণ্ঠায় মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছিল। এইবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া মেয়েটীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কিছুকাল বোধ করি সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম—চৈতন্য ফিরিতেই দেখি, সকলেই আছে, বিনয় নাই। গোলমালে সে যে কখন নীরবে স্থান ত্যাগ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার মত মনের বা মস্তিষ্কের স্থিরতা তখন ছিল না। তবে কেন যে প্রস্থান করিয়াছে তাহা মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিলাম। গোরার হাতে বিপর্য্যস্ত কন্যার নিরাপদ প্রত্যাগমনে গৃহের সকলেই আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়ায় যাহার সাহায্যে কন্যার নিরাপদে প্রত্যাগমন সম্ভব হইয়াছে, তাহার সংবাদ লইতে গৃহস্থের কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। দোষ খুব বেশী নয়, কিন্তু দোষ যে গ্রহণ করিয়াছে তাহার কাছে দোষের তারতম্য নাই। দোষ মাত্রই দোষ আর তাহা কোন দিনই ক্ষমার যোগ্য নয়। আমার কপালও কিন্তু ফুইয়া পড়িয়াছে।

কন্যার সংবর্দ্ধনা শেষ হইলে যখন উদ্ধারকর্ত্তার খোঁজ হইল, সে তখন কলিকাতার পথের জনারণ্যে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে তাহা গোয়েন্দা-বিভাগও স্থির করিতে পারিবে না। যন্ত্রণা-কাতর-কণ্ঠে ভগ্নদূতের কাজ করিয়া আমিও প্রস্থানের উদ্যোগে করিতেছি, কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না। বাম হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া গাড়ীর উপর বোধ হয় পড়িয়া যাইতেছিলাম, দুই-তিনজনে ধরিয়া ফেলিল এবং একপ্রকার পাঁজা-কোলা করিয়া যেখানে লইয়া আসিল

তেমন সজ্জিত গৃহে পূর্ব্বে কোনদিন প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

পরের কিছুকাল। সেবা-শুশ্রূষার মামুলী বর্ণনা করিবার ইচ্ছা নাই; তবে তাহার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম বলিয়া মনে হইল। এবং অনর্থক কপাল কাটিয়া আমি যে বিনয় অপেক্ষা সৌভাগ্যে কোন অংশে খাট এমন কথা মনে আসিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া যে বন্ধুমহলে কিরূপ বিপরীত আলোচনা উপস্থিত হইবে মনে মনে তাহাই বোধ হয় ভাবিতেছিলাম। কাণে আসিল—

—"আচ্ছা লোক যা' হোক, একটু দেরী হয়েছে আর রাগ করে' চলে' গেলেন?"

মুখ তুলিয়া বক্তার অনুসন্ধান করিতেছি, চোখ ফিরান রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িল। মায়া—অর্থাৎ বিনয়ের বীরত্ব প্রকাশের উপলক্ষ তরুণী এবং গৃহস্বামীর সুন্দরী কন্যা—কিন্তু ঐ একটী মাত্র বিশেষণে তাহার রূপের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় সম্ভব কি না তাহা ভাষাবিদের বিচার্য্য। বিনয় চলিয়া যাওয়াতে তাহার যে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে, আমি মূঢ় হইয়াও সে কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম—"তার স্বভাবটা তার গায়ের জোরের মতই অসাধারণ। আপনারা ক্ষুণ্ণ হবেন না।"

মায়ার জননী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না বাছাকে!"

—"হ্যাঁ বাছাই বটে! একেবারে দুধের বাছা! এক-একটা আঙ্গুল যেন লোহার বল্টু। যেখানে হাত দেবে ভেঙ্গে যাবে।"

—"লোহার বল্টু কাছে না থাকলে আজ তোমারই লাঞ্ছনার সীমা থাকত না—বসন্ত দা'। মুখ নেড়ে আর ও কথা বলো না।"

বসন্তকে চুপ করিতে হইল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বেচারার জন্য কেমন দুঃখ হইল। বলিলাম—"আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না বসন্তবাবু, আমি বিনয়ের আবাল্য-বন্ধু হয়েও দেহের শক্তিতে তার কাছেও ঘেঁসতে পারি না, কারণ বিধাতা বিমুখ। দেখুন না, সে করল মারামারি, কপাল কাটল আমার।"

কে একজন প্রশ্ন করিলেন—"সেই গোলমালের মধ্যে ছিলেন নিশ্চয়?"

—"মোটেই না।"

—"তা হ'লে আহত হলেন কি করে'?"

—"কপালের ভোগ, বসে ছবি দেখছিলাম, উঠে দাঁড়িয়েছি, বিনয়কে পাশে না দেখে' তারপরেই একটা গুরুভার এসে গায়ে পড়ল, দেখি—চেয়ারের তলায় পড়ে এক গোরা বাবাজীর সঙ্গে কোলাকুলি কচ্ছি।"

দেখিলাম মায়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পরম উৎসাহে সে বলিল—"বলব কি মা, লোকটাকে দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।"

—"তা' সে অভ্যাস তার আছে। একবার ছ' ফিটলম্বা এক কাবুলীকে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল; মিনিটখানেক পরে আবার তা'কে সাঁতরে তুলে আনে।"

—"কি রকম" বলিয়া সকলেই উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। বলিতে হইল—"তেমন কিছু নয়। বছর পাঁচেক আগে ছুটিতে দেশে গেছে; পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। কাবুলী বোধ হয় হেসে উঠেছিল; বিনয়ের বিশ্বাস সেই শব্দে চারের মাছ পালিয়ে গেল। আর দেখে কে, উঠে এসেই কাবুলীটাকে দু'হাতে তুলে জলে ফেলে দিলে। তারপর কি ভেবে তা'কে তুলে আনে। সে বেটা এখনও দেখলে সেলাম করে।"

মায়ার বাবা এতকাল চুপ করিয়াছিলেন। এইবার বলিলেন—"না, ছেলেটিকে দেখতে হলো। কালই আমি গিয়ে ধরে' নিয়ে আসছি। তারপর হাসিয়া বলিলেন—"ছুঁড়ে

ফেলে দেবে না ত নির্ম্মলবাবু? বুড়োমানুষ তা' হ'লে মারা পড়ব কিন্তু।"

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"না, সে ভয় নেই। আজ অবধি কোন বাঙ্গালীর গায়ে সে হাত তোলে নি।"

—"তাঁর বিবেচনা আছে। অত ঝক্কি বাঙ্গালীর পোষাবে না—তা' হ'লে কালই, কেমন মায়া?"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এখনই যদি সম্ভব হয় ত সে বিলম্ব করিতে প্রস্তুত নয়।

কাটা কপালে আবার যন্ত্রণা হইতেছিল; উঠিয়া বলিলাম—"এবার অনুমতি করেন ত আমি চলি?"

শশধরবাবু পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা এঁকে পৌঁছে দিয়ে এস—।"

তারপর হাতযোড় করিয়া বলিলেন—আপনাকেও কাল আমাদের চাই কিন্তু নির্ম্মল-বাবু।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"নিশ্চয়! তবে আসল আসামীকে পাওয়াই এক সমস্যা।"

শশধর—"তার সমাধান আমার কাছে।" বলিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিলেন।

তিন

পরের দিন যে সময় শশধরবাবু স-কন্যা মেসে আসিয়া দেখা দিলেন, সে সময়ে বিনয়কে মেসে পাওয়া গেল না, কোন দিনই যায় না। তবে আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাকে যেমন করিয়া পারি লইয়া যাইবার ভার দিয়া বোধ করি ক্ষুণ্ণ মনেই তিনি প্রস্থান করিলেন।

ভার লইয়াছিলাম; কিন্তু বিনয়কে সেখানে লইয়া যাওয়া যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া আশঙ্কার পরিমাণও কম রহিল না।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগ্নদূতের মত একাকী শশধরবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বিনয়ের সংবর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে যে আয়োজন সেই গৃহে সেদিন হইয়াছিল, তাহা সাধারণতঃ কোন স্থানে বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষেও ঘটে না।

আমার ব্যর্থতায় যেন ম্লান হইয়া গেল। শশধরবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—"ছেলেটী বড় বেরসিক ত? কিন্তু কি বল্লেন তিনি?"

—"বেশী কথা সে বলে না- হাঁ আর নায়ে যদি কাজ হয় ত মুখ থেকে তৃতীয় শব্দ বড় শোনা যায় না। এ ক্ষেত্রে সে যে কি বলেছে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।"

—"তিনি মেসে আছেন এখন?"

—"আমি তা'কে তার ঘরে দেখেই এসেছি। এখন আছে কি না জানি না—তবে এসময় বড় সে কোথাও যায় না।"

শশধরবাবু উঠিয়া বলিলেন—"আমি সেই গোঁয়ার ছেলেটাকে ধরে' আনতে চল্লুম।"

মায়া এতক্ষণ নতমুখে বসিয়াছিল। মুখের ভাবে বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছু ছিল না—এবার মুখ তুলিয়া বলিল—"না বাবা,আপনি তাঁর কাছে অপমান হ'তে আর যাবেন না—কেন যে তিনি আসেন নি, আমি সে কথা বুঝেছি আপনি গেলেও তিনি আসবেন না।"

—"তা'কে আনবই এই বলে' গেলাম—তোমাদের মনগড়া বোঝার কোন মূল্য নেই মা।" বলিয়া শশধর বাহির হইয়া যাইতেছেন, দেখিলাম শশধরবাবুর ছোট ছেলেটিকে বগলদাবা করিয়া বিনয় ঘরে ঢুকিতেছে।

মোটা খদ্দরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা এই অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহ যুবকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই প্রথমে কেমন যেন হইয়া গেলেন। মায়া উঠিয়া বলিল—"এই যে উনি এসেছেন।"

একযোগে উপস্থিত নরনারী তাহার দিকে

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া বিনয় বোধ হয় কুণ্ঠা বোধ করিল।

শশধরবাবু বুঝিতে পারিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিলেন এবং আসনে বসাইয়া বলিলেন,—"লজ্জা কি বিনয়বাবু, —এরা সব অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিদের বংশধর কি না তাই হাঁ করে দেখছে। তবে আপনার শরীর-খানি যে দেখবার মত, এ সত্য আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।"

শশধরের কনিষ্ঠ পুত্র নীলু এতকাল বিনয়ের বক্ষলগ্ন হইয়াছিল; এবার সরিয়া আসিয়া বলিল —"দেখ, তোমরা কেউ আনতে পারলে না, আমি গিয়ে ধরে' নিয়ে এলাম। আমায় একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দিতে হবে।"

—"নিশ্চয় তুমি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছ, নিমন্ত্রণ তোমার ন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু এই অঘটনটা তুমি ঘটালে কি করে' সেইটে আগে বলতে হচ্ছে।"

বক্তাটীকে এতকাল লক্ষ্য করি নাই, এবার দেখিলাম। সদানন্দ প্রৌঢ়ভদ্রলোক দেয়ালের দিকে একখানা আরাম কেদারায় অঙ্গ এলাইয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। শশধরবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু; এই গৃহে তাহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা! তিনি পুনরায় বলিলেন—"কই নীলু, বিনয়বাবুকে ধরে' আনবার পালাটা শেষ কর।"

—"সে কথা বলতে পারব না কাকাবাবু, নিষেধ আছে।"

ইহার একটী কথাও যে নীলুর নিজের নয় তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম; কিন্তু রহস্যটা ঠিক ধরা গেল না। কল্পনায় অনেক কিছুই ভাবিয়া লইলাম, কিন্তু কিনারা হইল না।

মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সখী-পরিবেষ্টিতা মায়া এখন আর আধঘণ্টা পূর্ব্বের মায়া নাই—আনন্দের আতিশয্যে বিজয়িনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বুকটা দমিয়া গেল—কপালটায় একটু যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। বিনয়ের প্রতি প্রতি মনটা বিরূপ হইল।

কিন্তু সে নির্ব্বিকার। সেই যে তখন হইতে শশধরবাবুর সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে—মায়ার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না। তাহার আধুনিক বিদ্বেষ জানি—ইহা লইয়া অনেক খণ্ডযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এতগুলি তরুণীর সমাবেশ দেখিয়া তাহাদের প্রতি এক-আধটা গোপন কটাক্ষও যে সে করিবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মনটা আরও দমিয়া গেল।

মায়ার মা এতকাল এই গৃহে ছিলেন না; বোধ হয় কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন; আসিয়া বলিলেন—"তোমরা পরে গল্প কোরো,একটু মুখে দিয়ে নাও কিছু। এস বিনয়, তোমার আলাদা বন্দোবস্ত আমি করেছি।"

সকলে বিস্মিত হইয়া ব্যাপারটা জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন—"সব জিনিষ উনি খান না—তা' ছাড়া সকলের ছোঁয়াও নয়।"

—"এই ছুৎমার্গ পরিহারের যুগে এটা আর কেন বিনয়বাবু।"

বিনয় মুখ তুলিয়া বক্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সে চোখের দৃষ্টি দেখিয়া বক্তার রহস্যের স্পৃহা নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"কিছু মনে করবেন না বিনয়-বাবু, ও-টা কথার কথা।"

বিনয় উত্তর করিল—"কথাটা চিরদিনই কথার কথা—তবে আমার কাছে নয়, বিশেষ মানুষের আচার-ব্যবহার উপলক্ষ করে। একটা অনুরোধ আমার—"

বক্তা বিনয়কে বাধা দিয়া বলিলেন—"সে আমি বুঝেছি—এ ভুল আর যাতে না হয় তার চেষ্টা সাধ্যমত করব।"

মায়া উভয়ের আলাপ বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। এইবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"কেন, ওঁর খেয়ালকে মেনে চলতে না পারা ভুল কেন হবে?"

বিনয়ের চোখ আবার উজ্জল হইয়া উঠিল। আমি বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া বসিল—"ভুলটা যে ভুল, সেকথা বোঝবার মত শক্তি না থাকার মত দুঃখ আর নেই। আর সব চাইতে বড় দুঃখ এই যে, যারা বোঝে না, তাদের বোঝান যায় না কোনদিন।"

মায়া ক্ষেপিয়া গেল—তাহার বুদ্ধির লাঘবতাকে এমন তীক্ষ্ণ পরিহাসে একজন সদ্য-পরিচিত ব্যক্তি বিশ্লেষণ করিবে, শিক্ষিতা নারী সে—সহিতে পারিল না। বলিল—"রহস্য বোঝবার মত বুদ্ধি মানুষমাত্রের থাকা উচিত, কিন্তু আপনার তা' নেই। দোষ আপনার; যিনি রহস্য করেছেন, তাঁর নয়। আপনি অকারণ একজন ভদ্রলোকের অপমান করবেন আর এখানকার সকলে তাই সহ্য করবেন, এ আশা আপনি মনে স্থান দেবেন না।"

বিনয়কে জানি—এই ঘটনার পর যে তাহাকে কোন মূর্ত্তিতে দেখিব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাহার কাছাকাছি হইবার আশায় দুই-একপদ অগ্রসর হইতেই বিনয় ইঙ্গিতে নিষেধ করিল। তারপর সেই শুদ্ধ গৃহের নির্ব্বাক ও হতবুদ্ধি সমাগত সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মায়ার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—"আপনার রহস্য গ্রহণের শক্তি অসাধারণ, সে শক্তি আমার নেই। কেন না—উপহাসকে রহস্য মনে করে' আমোদ করা অভ্যাস করবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু ডেকে এনে নিজের ঘরে যারা নিমন্ত্রিতের অযথা অপমান করে, তাদের সংশ্রব আমার অসহ্য। মেয়েরা আমার মাতৃস্থানীয়া—কিন্তু যারা আপনার মত নির্বিষ খোলস, তাদের আমি ঘৃণা করি।"

শশধরবাবুর পদধূলি লইয়া বিনয় যখন সেই গৃহ ত্যাগ করিল, কিছুকাল তখন সেখানে জীবনের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর শশধর একবার কন্যার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে প্রস্থান করিতেই একে একে সকলে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কিন্তু তাহার মধ্যে কোথায় কি যেন একটা বড়রকম বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

মনোজ্ঞ অভিনয় শেষ হইয়া গেলে প্রেক্ষা-গৃহের যে দর্শক সকলের শেষে স্থান ত্যাগ করে, আমার অবস্থা তাহার অপেক্ষাও করুণ। দুই-একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় রহিল না।

চার

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আর থাকিব না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা দায় হইল। বাঙ্গালাদেশের কোন পল্লীতে তাহার দেশ জানিতাম—যে অবস্থায় মেসে সে থাকিত, তাহাতে তাহার অবস্থা ধনাঢ্য বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু কোনদিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার ভরসা হয় নাই। জানিতাম, সে বলিবে না। একান্ত অভাবের দিনেও তাহাকে কাহারও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হইতে দেখি নাই; অনর্থক ব্যয় বাহুল্যের পরিণামে ঋণগ্রহণের অভ্যাস তাহার ছিল না। অথচ মেসের ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলা-মিশায় সে কোনদিন কাহারও পিছনে পড়িয়া থাকিত না।

সেদিনের প্রতিজ্ঞার পর আজ কয়দিন বিনয়ের সহিত অনাবশ্যক কোন কথা বলি নাই—আজ কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল। সকালেই শশধরবাবুর কাছ হইতে সংবাদ

পাইলাম, বিনয়কে তাঁহার একান্ত প্রয়োজন—তাহার গতিবিধি এবং সাংসারিক জ্ঞাতব্য বিষয় যেন তাঁহাকে অবশ্য জানাই। কারণ জানিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কারণ জানাইবার আশ্বাস দিয়া তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন; সুতরাং হেতু উপলক্ষে কৌতূহলের উদ্দামতা সংযত করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

কলেজ হইতে ফিরিয়া বিনয় ঘরেই ছিল। শশধরবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই বিনয় বলিল—"আমি বুঝেছি—কিন্তু সে হয় না—একেবারে অসম্ভব।"

কি হয় না এবং কেন অসম্ভব জিজ্ঞাসা করিবার অবসর ঘটিল না। বিনয় আবার বলিল—"হয় ত আমার অনুমান সত্য নয়—সত্য না হয় ভাল; হ'লে ব্যাপারটার শেষ বড় দুঃখের হবে নির্ম্মল।"

—"কি তাঁকে বলব তা' হ'লে?" জিজ্ঞাসা করিলাম এবং এতক্ষণ মনে কোনখানটায় একটু আঘাত অনুভব করিতেছিলাম—তাহা মিলাইয়া গেল।

বিনয় বলিল—"তিনি যা' জান্তে চেয়েছেন জানাবে—সত্য গোপন করা আমার স্বভাব নয়, তা' তুমি জান।"

—"কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে—"

—"কিছুই জান না এক গোঁয়ারতুমি ছাড়া, কেমন? আমি না জেনে তোমায় বলতে বলছি না; তুমি সব জেনেই বলবে। চল না আমাদের দেশে যাবে; সত্যি বল্‌ছি, গেলে বড় আনন্দ হবে।"

বিনয়ের সম্বন্ধে সব কিছু জানিবার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে পরিচয় হইতেই ছিল; সুযোগ মিলিয়া গেল। বলিলাম—"চল।"

বিনয় উল্লসিত হইয়া বলিল—"আজই, কেমন?"

রাজী হইলাম—এবং বিনয়ের দেশে তাহার মায়ের স্নেহের আস্বাদ পাইয়া সেখান হইতে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ফিরিতে হইল।

শশধরবাবুর পরিবারের সহিত পরিচয়ের গল্প করিতে বিনয় আমাকে নিষেধ করিয়াছিল—কিন্তু মায়ের কাছে পুত্রের বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ না করিয়া পারি নাই। শুনিয়া মায়ের মুখের সস্নেহ আনন্দের অভিব্যক্তি আমার চিরদিন মনে থাকিবে। তিনি বলিয়াছিলেন—"ছেলে মানুষের মত একটা কাজ করেছে শুনলে মায়ের বুকে যে সুখের স্রোত বয় নির্ম্মল, সে শুধু মা-ই জানে—বিনে যদি সেদিন ও কাজ না করত, আমি তার মুখ দেখতাম না।"

বাঙ্গালীদের সব মায়েরাই যদি বিনয়ের মায়ের মত হইত! বলিলাম—"এখন বুঝতে পাচ্ছি মা, বিনয় আর আমাদের মধ্যে এত তফাৎ কেন।"

"কেন বলত?" বলিয়া মা যে দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহাতে বুঝিলাম কথাটা অনেকের কাছে যত মধুর লাগুক, এই অসাধারণ শক্তির অধিকারিণী নারীর নিকট ভাল লাগে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অন্যায় বলেছি মা?"

মায়ের মুখে হাসি মিলাইয়া গিয়াছে, কণ্ঠস্বরে অটল গাম্ভীর্য্য। বলিলেন—"একজনের সুখ্যাতি করতে গিয়ে এদেশের আর সব মায়েদের অপমান করা হ'ল যে বাবা! ছেলে মেয়েদের—সে থাক্; নিজে বোঝবার দিন আসুক—দেখবে, কেন বাঙ্গলা দেশের মায়েরা ছেলের বিপদের আশঙ্কায় এমন নির্ম্মম, এমন আত্মহারা। এই কথাটা কোনদিন ভুলো না—যে সন্তানের সৎসাহসে মা কোনদিন বাধা দেয় না।"

তারপর অনেক কথাই শুনিলাম। সংসারের সকল কথা, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মা আমার

সঙ্গে আলোচনা করলেন। বিনয়ের অবস্থা সচ্ছল ; তবে বড়লোক বলতে আমরা যা' বুঝি, বিনয় সে ধরণের বড়লোক নয়।

ফিরিয়া আসিয়া শশধরবাবুকে সব জানাইতে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করিলাম—বুকের কোন-খানটায় যেন সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া ফকির হইয়া বসিলে যে রিক্ততার ভাব জাগে, সেই সর্ব্বহারা নিঃস্বের অভাব অনুভব করিলাম। বিনয়ের বিপরীত বুদ্ধির কথা মনে পড়িয়া এই নিরাশার হাহাকারের মধ্যে আশার সান্ত্বনার সুর বাজিয়া আমাকে সাহায্য না করিলে বোধ হয় মরিয়া হইয়া উঠিতাম।

ইহার পরের ঘটনার কারুণ্যটুকু বাদ দিলে তাহা লইয়া আমোদ করা চলে। সময় নাই, অসময় নাই শশধরের দূত বিনয়ের কাছে আসে আর ফিরিয়া যায়—হয়ত প্রতিবারেই প্রচুর উদ্যোগ-আয়োজন হয় ; তাহার পরে যাহার সাগ্রহ প্রতীক্ষায় এত সমারোহ, তাহার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে সমস্ত নিষ্ফলতায় শেষ হয়।

সেদিন শশধর স্বয়ং আসিলেন। বিনয় শান্ত শিশুর মত তাঁহার সমস্ত কথা শুনিল—আর চরম বিস্ময় এই যে, বিনা প্রতিবাদে তাঁহার সহিত যাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমি প্রায় সন্ধ্যায় সেখানে যাইতাম এবং বিনয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে আত্ম-প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু বুঝিয়াছি—কোন আশাই নাই ; সুতরাং, আজ শশধরবাবুর সাগ্রহ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু বিনয়ের এই পরিবর্ত্তনের মূল কোথায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। শশধর ও বিনয়ের প্রস্থানের পর মেসে থাকা দুঃসাধ্য হইল—পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে বোধ করি নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, পাশে সশব্দে মোটর আসাতে চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটাইবার পূর্ব্বেই মায়া গাড়ী হইতে নামিয়া কহিল—বেশ লোক ত আপনি! বাবার সঙ্গে গেলেন না কেন—আসুন, আর দেরী নয়—।" সর্ব্বাঙ্গে তাহার আনন্দের আতিশয্য—যাহার কণামাত্রও এই কয়দিন দেখি নাই।

এই আনন্দের উৎস কোথায় অনুমান করিয়া মনের অস্বস্তি বাড়িয়া গেল ; বলিলাম— "আজ থাক ; তা' ছাড়া, আমার কাজও আছে।"

—তা' থাক কাজ ; আপনার ঘুরে বেড়ান ত, সে না হয় আর কোনদিন করবেন, এখন উঠুন গাড়ীতে। এই কম্‌লি, তুই সামনে বোস—উঠুন না—"

উঠিয়া বসিতে হইল। মায়ার সঙ্গে এক আসনে বসিবার লোভ সংবরণ আমার পক্ষে অসম্ভব।

বিনয় ও আমি একত্র মেসে ফিরিলাম, পথে বিনয় বলিল—"শশধরবাবুকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছে নয় নির্ম্মল। কিন্তু যা' হবার নয় তা' না হওয়ার ফলে দুঃখ পেলে আমি কি করতে পারি।"

ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক শুনিবার আগ্রহ ছিল। শশধরের অভিপ্রায়, মায়ার মনোভাব কিছুই আমার অজ্ঞাত নহে ; বিশেষতঃ, এই যোগাযোগ ঘটাইতে শশধর আমার সাহায্য চাহিয়াছেন ; ফলে অনেক কিছুই আমার জানা ছিল। তথাপি বিনয় মায়াকে কি বলিয়াছে, মায়ার পিতাকেই বা কি জানাইয়াছে জানিবার আগ্রহ আমার উদ্দাম হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম —"তোমার কথা বুঝলাম না বিনয়।"

বিনয় বলিল—"শোন আগে। তোমার সে-দিনের কথা মনে আছে? নিশ্চয়।"

—"কোনদিনের কথা?"

—"যেদিন মায়ার বাবা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জানতে বলেছিলেন।"

—"হাঁ মনে পড়েছে; তুমি বলেছিলে—তোমার অনুমান সত্য হ'লে পরিণাম দুঃখের হবে।"

—"তাই হ'য়ে দাঁড়াল। মায়াকে আমার বিবাহ করা চলে না—আমি যাকে বিবাহ করব, তার স্বতন্ত্র সত্বা থাকবে এ আমি চাই না; আমার স্ত্রী আর আমি পৃথক,এ কল্পনা আমি করতে পারি না। মায়ার মত স্বাধীনচেতা মেয়ের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে এক-আত্মা হওয়া সম্ভব নয়।"

আমার বুকে তখন ঝড় বহিতেছিল।

বলিলাম—"আমারও তাই মনে হয়।"

—"মায়াকে বিলাতী প্রেয়সীরূপে কামনা করা চলে—পত্নী সে হ'তে পারে না।—তার বাবাকে আমি আজ তাই বলে এলাম।"

মনে মনে বলিলাম—"তোমার হয়ত পারে না—কিন্তু আমার অনায়াসে পারে।" প্রকাশ্যে বলিলাম—"কারণটা জানতে পারি?"

—"না তুমি বুঝবে না—শুধু তর্ক করবে।"

—"মায়ার সঙ্গে কথা হ'ল?"

"হ'ল ফাঁকা ফাঁকা।"

—"আর কোনদিন যাবে তাদের বাড়ীতে?"

—"ডাকলে যেতে হবে; মা তাই আদেশ দিয়েছেন।"

সুবোধ বালকের মত শশধরের অনুসরণ বিনয় কেন করিয়াছিল, এইবার বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা যদি মায়াকেই বিবাহের আদেশ দেন, তা' হ'লে?

—"সেকথা আমিও ভেবেছি—তখন হয়ত আমাকে বাধ্য হয়ে—"

আগুন হইয়া বলিলাম—"যাকে ঘৃণা কর—তার সর্ব্বনাশ কর্‌তে হবে?"

বিনয় হাসিল কথা কহিল না। ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। নিজের বুকের হাতুড়ির ঘা বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতেছে।

পাঁচ

পরীক্ষার পর দেশে যাইতে হইয়াছিল—মাসখানেক একান্ত অনিচ্ছায় সেখানে কাটাইয়া একদিন কলিকাতায় মেসে ফিরিয়া দেখিলাম বিনয় সেখানে নাই। শুনিলাম তাহার মা আসিয়াছেন মনটা দমিয়াই ছিল, এই বা'র ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল।

সন্ধ্যায় শশধরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সকলেই আছে মায়া নাই। এই রকমের না থাকা তাহার পক্ষে এই নূতন নহে—তথাপি কি একটা আশঙ্কায় বুকটা দুলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই দোলা বন্ধ হইবার অবসর পাওয়া গেল না—শুনিলাম মায়া এবং বিনয়ের মিলন একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে—বিনয়ের সামান্য আপত্তি যা' আছে, তাহাও বেশীদিন থাকিবে না।

সেখানে বসিয়া থাকার কোন অর্থই আর নাই। শশধর এবং আর সকলের অনুরোধ এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পথে বাহির হওয়া আর ঘটিল না।

হলঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই মায়ার পড়িবার ঘর। ঘরে এ সময়ে বড় কেহ থাকে না; আজ যেন কাহারা কথা বলিতেছে। কণ্ঠস্বরে অধিকারী চিনিতে দেরী হইল না—চরণদ্বয় সেখানে অচল হইয়া গেল।

শুনিলাম একজন বলিতেছে—"সাধারণ একটী মেয়ে—যার না আছে উচ্চশিক্ষা না আছে বিচার। তেমন একটী মেয়ে নিয়ে তাঁর চলবে এবং সুখেই চলবে—একথা তুই বিশ্বাস করিস মায়া?"

—"অন্যের সম্বন্ধে না হোক্, বিনয়বাবুর সম্বন্ধে সব কথাই আমার বিশ্বাস হয়। তিনি সব

পারেন। কি বলেন জানিস—শুনলে তা'কে দোষ দিতেও পারি না।"

—"কি বলে সে?"

—"বলেন—'আমি চাই আমার গৃহিণী, সে আমার ক্ষুদ্র সংসার থেকে আমাকে পৃথক করে' দেখবে না—পেতে চাইবে না।—আমার যা' কিছু নিয়ে আমি, তার সব কিছুকেই সে আপন করে' নেবে। উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে তা' পারে না'।"

—"এ কথা শুনেও তুই তা'কে এত ভালবাসিস? আশ্চর্য্য!"

—"আশ্চর্য্য মোটেই নয় বীণা—আর মিথ্যে যে নয় সে কথা তোর কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে।"

—"জানি নে ভাই—ভালবাসার বালাই আমার নেই—আর কোনদিন যেন না হয়।"

মেয়েটীকে একবার দেখিবার লোভ প্রবল হইল; কিন্তু উপায় ছিল না। পা দুইটা কাঁপিতেছিল। শুনিলাম—"তিনিও তাই বলেন—শিক্ষিতা মেয়ে—হয়ত সব পারে—সে ভালবাসতে পারে না। সে চায় অধিকার সৃষ্টি করে' উঁচু হতে—স্বাভাবিক অধিকারকে তার শিক্ষিত চোখ দেখতে পায় না। তাই তা'কে নিয়ে রসালাপ চলে—প্রেমিকার আসনে বসিয়ে তা'কে নিয়ে কাব্য-রচনা বেশ চলে—চলে না বিবাহ করা—চলে না সংসারে সকল বিষয়ের কর্ত্রীত্বে স্থাপন।"

—"তুই শুন্‌লি এসব মায়া এবং বিনা প্রতিবাদে?"

—"শুন্‌লাম এবং বুঝলাম—আমার মধ্যে আগেকার মায়া মরে গেছে—যে আছে, সে একটী নারী; চায়—তার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তার প্রিয়র সঙ্গে মিশে যেতে।"

—"তোর পরিণাম দেখে এবং পরিণতির কথা ভেবে আমার মনে কি হচ্ছে জানিস্?"

—"না"।

—"মনে হচ্ছে, বৃথাই তুই স্কুল-কলেজে গেছিস—আজ তোকে দিয়ে আমাদের জাতের সব চেয়ে বড় ক্ষতি হলো।"

—"তর্ক আমি করব না বীণা—তাঁর কথা শুনে আমার ভিতরে বিদ্রোহী মেয়ের অভিনয় যে কচ্ছিল, সে পালিয়ে গেছে। যে আছে তার বিদ্যাশিক্ষার অভিমান নেই, অধিকারে দাবী নেই, আছে শুধু—থাক্, সে কথা তোকে বলে' লাভ নাই, এখন তা' বুঝবি নে।"

—"কি করবি তা' হ'লে—বিনয়ের পায়ে ধরে' বলবি—ওগো, আমায় নাও, তোমার দাসী হ'য়ে থাকবার অধিকার দাও! সত্যি মায়া—ঘেন্না ধরিয়ে দিলি তুই মেয়েদের ওপরে। এই ভিক্ষা-বৃত্তিতে তোর লজ্জা হয় না মায়া?"

—"লজ্জা হয় বলেই ত তাঁকে বলতে পারি না যে আমি, আমার সব কিছু নিয়ে হবো তাঁর গৃহিণী—হ'তে পারব তিনি যা' চান্ তাই।"

—তা' হ'লে এখনও আশা আছে—কিন্তু কি দেখে তুই পাগল হলি বল ত—তার গুণ্ডামী দেখে?"

—"সত্যি বীণা তার ঐ বীরত্বের তুলনা নেই! তুই দেখলেও মুগ্ধ হ'তিস।"

—"তা হ'লে—কোনদিন কাবুলীর দৌরাত্ম্য দেখে তা'কে বিয়ে করে' বসবি। না মায়া, আমি গায়ের জোরকে ভয় করি, ঘৃণা করি, তা'কে শ্রদ্ধা করি না কোনদিন। কিন্তু সে ত তোকে চায় না—কি করবি।"

—"আমি তাকে চাই—এবং পাবই একদিন।"

আর শুনিবার প্রয়োজন ছিল না—এবং মায়া যে তপস্যায় নিরতা তাহাতে—

দূরে ফটকের কাছে বিনয় এবং তাহার মাকে দেখা গেল। আমি থামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া তাহাদিগকে পথ করিয়া দিলাম এবং মূর্ত্তি দুইটী অদৃশ্য হইতেই পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

দৈনন্দিন

শ্রীমতি জ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

এক

ভাগ্য-দেবতার নিষ্ঠুর আঘাতে—অণিমা যখন পর পর তিনটী পুত্রের জননী হইয়াও বঞ্চিতা হইল, তখন অনেক দেবতার দুয়ারে মাথা কুটিয়া মানসিক করিয়া সদ্যজাত পুত্রটীর দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিল—কিন্তু বিমুখ দেবতার প্রীতি-প্রফুল্লতা ফিরিল না, এবারকার পুত্রটীকেও অণিমা হারাইল। ধৈর্য্যশক্তি এবার কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল; অণিমা এ শোকে সান্ত্বনা খুঁজিয়া না পাইয়া দেবতাকে উচ্চকণ্ঠে অভিশাপ দিতে লাগিল। ভবতোষ শোক-সন্তপ্ত স্ত্রীকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

অণিমার পিতা শোকাভিভূতা কন্যাকে লইয়া অনেক দেশ-বিদেশ বেড়াইয়া আসিলেন, কিন্তু বুকের ভিতর যার বাড়বানল, বাহিরের প্রলেপে তার কি হইবে? সান্ত্বনা মিলিল না।

ফিরিয়া আসিলে অণিমার মা আবার কতকগুলি মাদুলী মেয়ের হাতে ও গলায় পরাইয়া দিলেন। আবার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাই-লেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অণিমা এবার সেগুলি ধারণ করিল, কেবল মায়ের অনুরোধ রক্ষায়। সত্য কথা বলিতে কি, অণিমার আর দেবতার উপর বিশ্বাস ছিল না, তাই কাঁদিয়া মাকে বলিল —"ও-সব মিথ্যে-দেবতার পায় মাথা কুটে, মিছে এ সব বাজে খরচা করে' কি ফল হচ্ছে তা'ত দেখছই মা, আর কেন?"

মা শিহরিয়া উঠিলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে বার-কতক নাক-কাণ মলিয়া ঘাট মানাইয়া লইলেন; কিন্তু অণিমার বিশ্বাসহীন হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় ভগবান এবার একটি হৃষ্ট-পুষ্টা কন্যা অণিমাকে দিলেন। তাহার স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের বুভুক্ষু প্রাণ শীতল করিতে কন্যাটী বাঁচিয়াও গেল। অণিমা কন্যাটিকে পাইয়া তাহাকে বুকের সবটুকু উচ্ছ্বসিত স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিয়া ক্রমে পুত্রশোক ভুলিয়া গেল, কন্যাটি বাঁচিয়া গেল।

দুই

নয় বৎসর পরের কথা।

বিধাতার মার না কি ভয়ানক, আর তাহা মানুষ নিবারণ করিতে পারে না, তাই অণিমার মাতৃহৃদয় তখনকার মত তৃপ্ত হইলেও কন্যাটিই অণিমার ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইল। সাধ করিয়া অণিমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিল পাড়া ঘরেই—সর্ব্বদা চোখের উপর দেখিতে পাইবে, ইচ্ছামত আনিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না; অণিমাকে কন্যার বিবাহ দিয়া পস্তাইতে হইল। অনিমার সব সাধ আশা জীবনের মত মিলাইয়া গেল। সর্ব্বাণীর শাশুড়ী লোকটি একবারে চণ্ডাল-প্রকৃতি স্ত্রীলোক। লোকে ভবতোষ ও অণিমাকেই দোষ দিতে লাগিল। জানিয়া-শুনিয়া তাহারা কেন এ কাজ করিল—একমাত্র আদরের দুলালীকে ওই খাণ্ডার শাশুড়ীর বধূ করিয়া দিয়া চিরজীবন অশান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিল।

অণিমা নিত্যই বেয়ানের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্টভোগ করিতেছিল, আর মনে মনে ভাবি-তেছিল, কন্যার মঙ্গল কামনায় সে এ কি করিয়া বসিল! অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার ছিল

না। ভবতোষ শুধু তাহার অনুরোধেই ওই কঙ্কাল রমণীর পুত্রকে জামাতা করিয়াছে। কিন্তু তাহা না হইলেই বা উপায় কি ছিল? অবস্থা ত তাহাদের কোন দিনই সচ্ছল নহে; হইবারও কোন আশা নাই। পঁয়ত্রিশটি টাকা ত মোট স্বামীর মাসিক পারিশ্রমিক, তাহা হইতে সংসার চালাইয়া কোন ভাল পাত্রে কন্যার বিবাহ দেওয়া অসম্ভব, তাহার চেয়ে এ বরং ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্যই। কারণ দিনে দিনে পলে পলে পড়শীরা যে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া যোগাইত, তাহার ভার-বোঝা বুকে তুলিবার ক্ষমতা কোন মাতৃ-হৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। অনিমাও পারিত না; কিন্তু নীরব রোদন ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কি তার।

সেদিন হঠাৎ অনিমার দিবা-নিদ্রার মাঝখানে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সর্ব্বাণী ত্রস্তা ভীতাভাবে ক্ষিপ্র-পদে ঘরে ঢুকিল, অনিমা পদশব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। মেয়েটা মায়ের কোলের মধ্যে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনিমা সস্নেহে তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি? কেন এমন করে ছুটে এলি মা। পাড়াঘর, নিন্দে হবে যে। কেন তারা এ শাসন করলে, তুই কি করেছিলি?

সর্ব্বাণী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাহিরে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ভীষণ তর্জ্জন ও চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। বালিকা সভয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইল। বাহিরে ক্ষ্যান্ত বামনীর কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ উচ্চগ্রামে উঠিল—"বলি মেয়েকে নিয়ে ঘরের ভেতর ত দিব্যি সোহাগ করা হচ্ছে! কিন্তু আবাগী ওখানে কি করে' এসেছে, জান?" বলিয়া সশব্দে ঘরে ঢুকিল।

অনিমা ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি করেছে?"

—"কি করেছে?" কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া ক্ষ্যান্ত-ঠাকুরাণী অনিমার পানে রূঢ় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সর্ব্বাণীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ওকেই কেন জিজ্ঞেস্ কর না। রাতদিন মাধুর ছেলে মেয়েগুলোর সঙ্গে খুনসুটি ক'রে'। বলি যে 'ওরা দু'দিন এসেছে, কেন বাছা তুমি ওদের অমন কর?' তা' কার কথা কে শোনে! তা' বই, আজ এতবড় জাম বাটিটা, হাত থেকে ইচ্ছে করে' আছাড়ে মেরে ফেলে দিলে, আর ভেঙে দু'-আধখান হ'য়ে গেল! তা'তেই আমি একটু বকেছি, না হয় দু' ঘা মেরেছি, তাই একেবারে কেঁদে-কেটে বাড়ী থেকে পালান! বলত এতে মুখে চুণকালি পড়লো কার? না, এতবড় আসপদ্দা! আমি যে বউকে ছেড়ে দোব, সে শাশুড়ী আমায় পাও নি। একটানে কথাগুলি বলিয়া ক্ষ্যান্ত-ঠাকুরাণী রোষ-কষায়িত-নেত্রে বধূর দিকে চাহিলেন। তারপর বধূর হাত ধরিয়া হেঁচকা টান দিতে দিতে বলিলেন,—"নাও, আর সোহাগ করে' মায়ের কোলে বসে' থাকতে হবে না, বাড়ী চল।" বলিয়া রুক্ষ কটাক্ষে সর্ব্বাণীর পানে তাকাইল।

অনিমা সর্ব্বাণী উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। নীরস স্বরে উঠিয়া আসিবার জন্য আর একবার আদেশ করিল—"শীগ্‌গির ওঠ বল্‌ছি সবি।"

অনিমা এবার উত্তর দিল; তিক্তস্বরে বলিল —"এসেছে আজ থাক্, আমি দু'দিন পরে ওকে পাঠিয়ে দোব।"

—"না ওকে এখুনিই যেতে হবে, আমার সঙ্গে।"

অনিমার মেজাজ কয়দিন হইতে বিরক্ত

হইয়াছিল। বারবার তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়াছে, দাসী-চাকরদের পর্য্যন্ত অপমান করিতে ছাড়ে নাই, সেদিন আসিয়া এমনি একটা তুচ্ছ কারণে উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া-ডাকিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার মাত্রায় লজ্জাও লজ্জা পাইয়া যায়। ঘাটে-পথে পড়শীদের কাছে অণিমার মুখ দেখান ভার; আজ তাই আর চাপিতে পারিল না—"কি ঝক্‌মারী করেই মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।"

প্রচণ্ড ঝাঁজের সঙ্গে অণিমা আজ এই কথা কয়টি বলিয়া ফেলিল। অন্যদিন হইলে সে বেয়ানের আওয়াজ পাইলেই ঘরের ভিতর নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া থাকিত; আজ তাহা পারিল না, সর্ব্বাণীকে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ক্যান্ত-ঠাকুরাণীও সহজে ছাড়িবার লোক নহে। বলিল—"কে মাথার দিব্যি দিয়ে দিতে বলেছিল।"

অণিমাও সমান ওজনে জবাব দিল—"সে কথার উত্তর দিতে আমি আপনার কাছে বাধ্য নই! বিয়ে দিয়েছি বলেই যে মাথা বিক্রী করেছি, তা' নয়। মেয়ে আমি পাঠাব না।"

ক্যান্ত-ঠাকুরাণী সদর্পে মাটীতে পা ঠুকিয়া জোরগলায় বলিল—"না পাঠাও, মেয়ে নিয়ে থাক—আমার ছেলের বিয়ে, এই অঘ্রাণ মাসেই আমি দোব। নরেকে আমি তখনই বলেছিনু যে—'ও কুটুম করিস নি'; তা' নরেন তা'ত শুনলে না—সেই ত ক্ষেন্তি বামুণীর কথাই ফল্‌ল! আমি কি একটা যা'-তা' লোক, হুঁ—যে আমার কথা মিথ্যে হবে।" বলিতে বলিতে ক্যান্ত-ঠাকুরাণী উঠানে নামিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে চলিল—"এতবড় অপমান দাঁড়িয়ে কবুল, ভবর বউ—ফাঁকি দিয়ে বিয়ে দিলে, একটা কাণাকড়ি পর্য্যন্ত দিলে না, আমার দুটো পাশ করা ছেলে, কতজন পায়ে ধরে' মেয়ে দিত, আর এখনই কি দেবে না!"

অণিমা সবই শুনিল। শুনিয়া নীরব পাষাণবৎ বসিয়া রহিল।

শনিবার দিন ভবতোষ আসিয়া সব শুনিল; বলিল—"আমায় না জানিয়ে কেন তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলে?"

অণিমা উত্তর দিল না, রাগ বিরক্তি অভিমান তার সারা দেহকে তখন যেভাবে মথিত করিতেছিল, বাহ্যিক তাহার হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করিবার মত ইচ্ছা বা ধৈর্য্য তাহার ছিল না। সব জানিয়া স্বামী এ প্রশ্ন করিতেছেন, এইটাই না আশ্চর্য্য!

সাদা প্রাণে ভবতোষ প্রশ্নটা করিয়াছিল, সাদা প্রাণেই সে আবার বলিল,—"বিয়ে যখন হয়েইছে অনু, তখন মেয়ের ওপর আমাদের কতটুকু অধিকার! জেদের বশে ওকে আমরা হয়ত ধরে' রাখতে পারি, কিন্তু ভেবে দেখ, তা'তে ওর কপাল ফিরবে কি? আমাদের কুলিনের ঘরে ছেলের বিয়ে আটকাবে না; তখন মেয়ে নিয়ে তুমিই বা কি করবে, আমিই বা কি করব!"

এ কথাতেও যখন অণিমা কোন কথা কহিল না, তখন ভবতোষ নিজে মাথায় করিয়াই মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী রাখতে গেল।

—তিন—

কালো গয়লার বউ বেড়াইতে আসিয়া যাহা বলিয়া গেল, তা'তে অণিমা বেশ রীতিমত ব্যথাই পাইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কিছু বলিবার মত ভাষা সে খুঁজিয়াও বুঝি পাইল না।

গয়লা-বউ বলিল—"আজ তিনদিন মা, মেয়েটাকে চাবি দিয়ে রেখেছে। ধন্নি প্রাণ বাপু

তোমাদের, পেটে জায়গা দিয়েছ, হাঁড়িতে জায়গা দিতে পার নি—সে কি শাসন রে বাপ! চোরকেও লোকে এমন ধ'রে মারে না।"

দেহের রক্তটা হয়ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়, কিন্তু মুখে বলিবার মত ভাষা, না, সে খুজিয়া পায় না। গয়লা-বউ চলিয়া গেলে, একটা জামবাটিতে কিছু ভাত, তরিতরকারী সাজাইয়া অণিমা পাঁদাড় পথে কন্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

—"সর্ব্বাণী।"

ডাকের উত্তরে টলিতে টলিতে যে জানালার দিকে আগাইয়া আসিল, তাহার চেহারা দেখিয়া অণিমা ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, গলিত অশ্রু অবাধে নামিয়া চলিল। সর্ব্বাণী বলিল—"আর ভয় নেই মা, শীগ্‌গির আমি ভাগ্যবতী হব!"

কথাটার সোজা অর্থ মা বুঝিলেন না, ধীর-কণ্ঠে বলিলেন—"জামাই কি?—"

কিন্তু কথাটা শেষ হইল না, হড়াস্ করিয়া খিল খুলিয়া কে যেন গৃহে প্রবেশ করিল। অণিমা কন্যারই জন্য কন্যার মুখের দিকে চাওয়া আর কর্ত্তব্য মনে ভাবিল না, সরিয়া আসিল

—চার—

-"সতি, ভাগ্যবতী বলতে হবে বৈকি, আজ-কালকার দিনে মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া নিয়ে যে যেতে পারে, তা'ছাড়া সে আর কি!"

কথাটা যাহার মুখ বহিয়া আসিল, অণিমা হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে শুধু জলহারা দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল, অশ্রুতে বুকের ব্যথা বা চীৎকারে নিদারুণ যন্ত্রনা কিছুই প্রকাশ করিতে পারিল না।

কিন্তু যে সংবাদবাহী, সে ত তাহা চাহে নাই, তাই কথাটা হয়ত সে বুঝিতে পারে নাই, বুঝিয়া আবার বলিল—"তোমার মেয়ে গো, তোমার মেয়ে, সতি-সাধ্বী আজ ভোরে চলে' গেছে!"

অণিমার কণ্ঠ ফুটিল না। রক্তমাখা-দৃষ্টিতে অশ্রুও নয়! বক্তা সোহাগী ভয় পাইয়া আপন-মনে বলিল—"পাগল হ'ল না কি? আশ্চর্য্য নয়, উপরি উপরি শোক সয়ে, ওইটে ধরেই ত ছিল।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সরিয়া পড়িল। হয়ত দেখিতে শ্মশান যাত্রীর যাত্রার আয়োজন।

* * * *

"আর কেন তোল, তোল!"

কিন্তু ভূমি হইতে তুলিবার অগ্রেই সে বাধা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তার মুখের দিকে চাহিয়া দজ্জাল ছেলের মা'ও কিন্তু ভড়খাইয়া গেল। শুধুমুখে এ সময় এ আবার কি ঢঙ বলিতে বলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

অণিমা কাহাকেও কিছু বলিল না, কাহার দিকে চাহিলও না কেবল কন্যার আরক্ত-সিঁদুর-পুষ্প-শোভিত দেহ-লতা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মৃতার মুখে অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া তুলিল।

কে একজন বলিল—"এ সোহাগ আর কেন! দু'দিন আগে এর অর্দ্ধেক যদি কর্‌তে, মেয়েটা মর্‌ত না।"

অনিমা একবার বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। ভবতোষ সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল, বলিল—এ কি করচ বৌ, ছি উঠে এস।

অনিমা স্বামীকে দেখিয়া আরও জোরে হাসিয়া উঠিল, বলিল "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। ওরা কি বলে জান, সর্ব্বাণী মারা গেছে। আজ সোহাগ করতে না এসে দুদিন আগে এলে সে মরত না। কিন্তু কুলিনের ছেলের বিয়ে ত আটকাত না, তখন মেয়ে

নিয়ে তুমিই বা কিরতে আমিই বা কি করতুম বলত।"

ভবতোষের চ'খে জল ভরিয়া আসিতেছিল। সে জোর করিয়া অনিমাকে টানিয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

ঘরের লক্ষ্মী বৌ মরিয়াছে—আয়োজনের ত্রুটী হইল না—সব কণ্ঠে রব উঠিল—বল হরি হরিবোল।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী, বধূ মাতাকে জ্ঞাতি বাহকেরা বাহির করিয়া লইয়া যাইতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া বাড়ীর চারিধারে গোবর জলের ছিটা দিতে লাগিলেন, মুখে বলিলেন, মরণ আর কী। মাগী কম দজ্জাল গা—মেয়ের বিয়ে দিয়ে ত হাড় জ্বালিয়েছে—মরণেও বাদ দিলে না। দিদি চলানটা দেখ্‌লে ত তোমরা? গা জ্বালা করে!

রবি-গ্রহ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দৃশ্য

একখানি কক্ষ। সচরাচর মধ্যবিত্ত কেরানিদের কক্ষে যেমন সাজসজ্জা থাকে,—তেমনই।... কক্ষের একধারে একখানি খাট; খাটে রাজকুমারবাবু নিদ্রিত। আজ রবিবার বলিয়া বেলা সাতটা বাজিয়া গেলেও তিনি ঘুমাইতেছেন।... ...খোলা জানালা দিয়া রৌদ্র প্রবেশ করিতেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে :—

রাজকুমার—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথাঃ
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং—মহাপাতক নাশনং—।

—তারা, তারা, মা। কালী, দুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। জয় দুর্গা, জয় দুর্গা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত—(উঠিয়া বসিলেন) যা' দিনকাল চাকরীতে আর ভরসা নেই। যে-কটা দিন যায়, দুর্গাকালী জ'পতে জ'পতে যেন—সু ভালাভালি কেটে যায় মা! দোহাই মা, দেখিস তোদের কৃপা থাকলে—আপিসের বড়বাবু, সায়েব ওদের কে কোন তোয়াক্কা রাখে! হরিবোল, হরিবোল। কৈ গাড়ুটা আবার গেল কোথায়? এই যে। আজ এদের রান্নার তাড়া নেই কেন? (সহসা) ও হরি—আজ যে রবিবার। বেতো ঘোড়া কি না, ঠিক সাতটায় গেল ঘুম ভেঙে। সাত সকালে নিজেও জাগলুম! আবার ঘুমন্ত ঠাকুর-দেবতাদেরও টেনে তুললুম! অপরাধ নিয়ো না, মা, অপরাধ নিয়ো না, বাবা—এই আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রছি। খুব ক'সে একটা ঘুম, ন'টার কম আর চোখ মেলচি না—যে যতই ডাকুক।—

(শয়ন)।

কিছুক্ষণ পরে পত্নী কাত্যায়নীর প্রবেশ।

কাত্যায়ণী

রবিবারের বাজার পেয়ে খুব ঘুম হচ্চে! এ-দিকে যে নানান কর্ম্ম সব ভুলে গেছেন! তারা ন'টায় আসবে, নিজেই রাত্রিতে খেতে বসে' সে-কথা জানানো হ'লো, এখন নিজেই ভুলে বসে' আছেন। এমন মানুষ নিয়ে কি ঘর-সংসার চলে? (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) বলি, ও গো। একেবারে ঘুমে যে বেহুঁস। শুনচো? কাল রাত্তিরে যা' ব'ললে সব ভুলে বসে' আছ?

রাজকুমার—

(হাই তুলিয়া) না, গো, না। সর, একটু ঘুমুই।

কাত্যায়ণী—

তাঁরা যে ন'টায় আসবেন। কখনই ঘরদোর গুছোবো, কখনই বা কি হবে! বাজারের কাজ, রান্নার কাজ—

রাজকুমার—

নাঃ, রবিবারটাই মাটি! তিন প্রাতঃকালে ঘুমন্ত-দেবতা জাগিয়েচি—আর কি ভরসা আছে! (উঠিয়া) কি, হ'য়েচে কি?

কাত্যায়ণী—

হবে আবার কি, তুমি ঘুমোও। (গমনোদ্যত)

রাজকুমার—

আহা—হা! রাগ ক'রে চ'ললে যে। শোন, শোন। আমি ভাল বুঝতে পারছি নে।

কাত্যায়ণী—

কি জানি বাপু, কাল নিজেই ব'ললে, বেলা ন'টার সময় বেহালা থেকে কারা ইন্দুকে দেখতে আসবে—ঘরদোরগুলো সব ঠিক ক'রে রেখো। এদিকে ত সাড়ে সাতটা বাজে, কখনই বা কি হবে ?—

রাজকুমার—

হাঁ, হাঁ, প্রাণগোপালবাবু আসবেন। হালের বড় লোক। তাঁরা সুন্দরী মেয়ে খুঁজচেন; একটু গাইতে বাজাতে জানে। তা', আচ্ছা তবে আমি কাজটা সেরে আসি। (গাড়ু হাতে লইলেন)

কাত্যায়ণী—

(ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে) যা'-হোক আক্কেল! আগে এ, না আগে ও।

রাজকুমার—

(মনে মনে) ছেলেবেলার পাঠ বদল হ'য়েচে দেখচি। এখন দেখচি, 'এ'র আগে 'ও'!

কাত্যায়ণী—

(গাড়ু কাড়িয়া) রাখ এখন। এস দেখি এদিকে। খাটখানা ওইখানেই থাক, কি বল ? (দু'জনে জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল)। এই পাশে ওদের বড় টেবল হারমোনিয়মটা আনিয়ে রাখাই। আলনাটা মাঝখানে থাকুক। আর একটা ছোট টেবল কেবল আলনার সামনে সাজিয়ে রাখা যাক্। যে তোমার এক ছটাক ঘর, দু'খানা যে ভাল চেয়ার—একটা আলমারী এনে রাখবো সে যো নেই! এতেই যেন কুঁচকি-কণ্ঠায়!

রাজকুমার—

(নেপথ্যে চাহিয়া) ওকি হারু যে টেবল টানাটানি ক'রচে ?

কাত্যায়ণী—

যাও, যাও, ধর। (সকলে মিলিয়া টেবল হারমোনিয়ম আনিলেন) হাঁ, হাঁ, এইখানে। এইবার আলনাটাকে মাঝখানে রাখি। হারু, ঐ গোল টিপয়টা নিয়ে আয়, টেবল ধরবে না। উঁহু—ওদিকে নয়—এদিকে নয়—এইখানে—এইখানে। হাঁ। দেখ, ছোট হারমোনিয়মটাও এখানে থাক, বাঁয়া তবলাও। ওপর থেকে ক্লক ঘড়িটা আনাতে পারলে ভাল হ'তো। ভাল কথা, বড় আয়নাটা যে ফিট করা চাই-ই।

রাজকুমার—

(ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া) জায়গা কোথায় ? ঘড়িটা বসাতে হ'লে আলনার মাথা আর আরসীটা খাটের ওপর ছাড়া কোথায় রাখবে ?

কাত্যায়ণী—

হবে, সাজাতে জানলে সব হয়। আয়নাটা দিতেই হবে, ঘড়ি না হয় না হবে। ওপরে বাজলেই শুনতে পাবে, বলা যাবে 'খন ও ঘরে বাজচে। আয়নাটা কিন্তু চাই। হারু, জাজিমটা পেতে দে। আর এক কথা, এঁরা এলে শুধু বাজারে দু'চার পয়সার সিঙ্গাড়া কচুরি কিনে খাওয়ালে চলবে না। মনে করচি খানকতক লুচি ভাজবো।

রাজকুমার—

লুচি!

কাত্যায়ণী—

হাঁ, এ আর হাঙ্গামা কি! তুমি কিছু বেগুন এনে দাও, আলু ঘরে আছে। ঘি-ময়দা যা'

আছে হ'য়ে যাবে। ভদ্রলোক কতই বা খাবেন! সব শেষ একটু দই মিষ্টি।

রাজকুমার—

তা হ'লে বাজারে যাই।

কাত্যায়ণী—

যেয়ো 'খন, দাঁড়াও। গেল রবিবারে তোমার কথা শুনে যেমন অপ্রস্তুত, তেমনটি হ'তে দেব না। তুমি ব'ললে বরপক্ষ খুব বড়-লোক; যদি মেয়ে চোখে ধরে একটি পয়সা লাগবে না, গরিবীয়ানা দেখানো ভাল। সেই কথামত না সাজালুম ঘর, না আনালুম ভাল খাবার। তারা ত সব দেখে-শুনে পালাতে পথ পেলে না। এবার আমার বুদ্ধিতে চলবে, দেখ কি হয়। ঘরদোর দেখচ ত, এইবার যা' বলি শোন মন দিয়ে। তারা এলে একটু বড়মানুষী দেখাতে হবে। ব'লবে, ঠাকুর রাঁধচে, চাকর ব্যাটা মহা আহাম্মখ; ঝি বেটীর তেমনি লজ্জা—

রাজকুমার—

কোথায় চাকর—বামুন—ঝি?

কাত্যায়ণী—

ঠাকুর হেঁসেলে রাঁধবে—বাবুদের সামনে বেরুবে কি? চাকর ঐ হারুকে সাজালেই হবে। ও চালাক আছে, থিয়েটারে অমন কত সাজে। আর ঝি সাজতে হবে—তোমায়!

রাজকুমার—

(সবিস্ময়ে) আমায়! বল কি? তা' হ'লে ভদ্রলোকদের আদর-অভ্যর্থনা ক'রবে কে? তুমি?

কাত্যায়ণী—

(হাসিয়া) তুমিই ক'রবে। যেমন কর্ত্তা সেজে আছ তেমনি থাকবে; মাঝে মাঝে ঝি হ'য়ে দেখা দেবে।

রাজকুমার—

তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি নে।

কাত্যায়ণী—

দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি। অলীকবাবু প্লে দেখ নি? আচ্ছা দাঁড়াও। (আলনা হইতে একখানি কাপড় আনিয়া কর্ত্তাকে পরাইয়া দিলেন) এমনি ক'রে। বুঝেচ? আর এইখান থেকে দেখা দিয়ে এই দিক্ দিয়ে পালাবে। (তাঁহার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন)। নিতান্ত কথা কও ত খুব মিহিগলায় 'কর্ত্তাবাবু' ব'লে ডাকবে। (ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু—

(ঘোমটাবৃত রাজকুমারকে দেখিয়া) ও মা! ও আবার কে?

রাজকুমার—

(ঘোমটা ফেলিয়া কাতরভাবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে) ইন্দু, একটু তামাক খাওয়া দিকি, মা!

ইন্দু—

(হাসিয়া) বাবা যে! (প্রস্থান)

রাজকুমার—

দাও, দাও পাখাখানা, হাঁপিয়ে ম'রচি।

কাত্যায়ণী—

(বাতাস করিতে করিতে) একবার ঘোমটা দিয়েই এত হাঁপানি! বলি কলম পেষ কি করে'?

রাজকুমার—

সে আর একদিন বুঝিয়ে ব'লবো। মোদ্দা—ঝি চাকর হারুকেই সাজিয়ো—আমি ও-সব পারবো না।

(কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ইন্দুর প্রবেশ)

কাত্যায়ণী—

আবার তামাক! হ'য়েচে!

রাজকুমার—

তা' হোক্, একটু খাই। সারাদিনের যে হাড়ভাঙা মেহন্নৎ।

কাত্যায়ণী—

মেহন্নৎ কি গো। ঘরে বসে' ক'টি লোককে দেখানো, এতে কি এমন—

রাজকুমার—

ওতেই সব। (কাতরভাবে) যাদের মেয়ে হয় নি—তারা না হয় ব'লতে পারে 'কি এমন!' কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি ও-কথা ব'লো না। (তামাকে টান দিয়া প্রফুল্ল-কণ্ঠে) হ্যাঁরে খেঁদি—

ইন্দু—

কি বাবা!

রাজকুমার—

তুই ত খুব গাইয়ে হ'য়েচিস শুনচি। শোনা-দিকি একখানা। কেমন শিখলি শুনি।

ইন্দু—

(লজ্জায় অধোবদন)

রাজকুমার—

লজ্জা কিরে পাগলি! এখুনি একঘর লোক আসবে, তাঁদের সাম্‌নে গাইতে হবে। লজ্জা কিসের, গা।

ইন্দু—

আমি ওঁদের সামনে গাইতে পারবো না, বাবা।—

রাজকুমার—

তা' কি হয় মা? যে কালের যা' রীতি। আজকাল সবাই গায়, ওতে লজ্জা নেই।

কাত্যায়ণী—

গাও মা, উনি শুনতে চাইছেন।

ইন্দু—

কি গাইব?

রাজকুমার—

কি গাইবি? ওই যে আজকালকার মেয়ে-ছেলে সবাই গায়, কি ভাল—গজাল না, —(হরেনের প্রবেশ)

হরেন

গজাল, জামাইবাবু, গজাল। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়। বুকে বিঁধলে সাধ্যি কি ওস্তাদের টেনে তোলেন। (সুরে) "শেফালী তোমার আচলখানি—"

কাত্যায়ণী

দেখ হারু, বালতি ক'রে জলটল সব ঠিক রাখবি। তোয়ালে, সাবান কিনে এনেছিস ত?—

হরেন

হুঁ, ওদের বাড়ী থেকে ট্রেখানা শুদ্ধ চেয়ে এনেছি। দেখ না, আজ ক্যায়সা পার্ট করি। কিন্তু দিদি, ঘরখানা যেন বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রালয়ের গুদোম ঘর হ'য়েছে। ভদ্রলোকেরা ব'সবেন কোথায়?

কাত্যায়ণী—

এই মেঝেয় ব'সবেন। তুই যা', বাইরে কি কি দরকার দেখ গে। …আর একটা কথা বলি শোন। (কাণে কাণে কথন)

হরেন—

(সোৎসাহে)—কুচ পরোয়া নেহি, মোদ্দাৎ একখানা মেডেল অফার করো। (সুরে) "শেফালী তোমার আচলখানি"— (প্রস্থান)

রাজকুমার—

খেঁদু, গাও না মা।

ইন্দু

ছোট মামা যা' ক'রলেন, গজল গাইতে গেলেই হাসি পাচ্ছে।—

রাজকুমার—

আচ্ছা, অন্য গানই গাও।

ইন্দু (গাহিল)

বহুদিন পরে নীল অম্বরে

হেরিনু তোমারে জননী—।

তারা ছল ছলে—তব আঁখি জলে,
কালো কেশ রচে রজনী ॥
(তব) অভয় হাস্য দিগবিথারি,
শিশির সোহাগে পড়িতেছে ঝরি—
(তব) কোমল পরশ সমীরণ রূপে
করিছে শীতল অবনী।
মৌন আঁধারে পাতি স্নেহ-কোল
আঁখিতে দিতেছ তন্দ্রার দোল,
সে ঘুমের জলে মন শতদলে
ফিরে অভেদ রূপিনী।

রাজকুমার—

বাঃ, সুন্দর!—আমার এ মেয়ে যে শালা অপছন্দ ক'রবে, সে শালা—নেহাৎ, নেহাৎ আহাম্মুক, কাতু!— (ইন্দুর প্রস্থান)

কাত্যায়ণী—

সে না হয় তুমি আমি বুঝি, পোড়া বাঙলা দেশে এমন লোক ত দেখলুম না যারা মেয়ের গুণ বিচার ক'রে পণের বাঁধন আলগা ক'রলে!

রাজকুমার—

তা' হ'লে আমি—ওদিককার কাজ সেরে নিই গে। তোমার হরেন না সব কাঁচিয়ে দেয়!

কাত্যায়ণী—

না, গো, না,—যতটা ভাব—হাবাগোবা ও মোটেই না। মোট কথা, তুমি খুব সাবধান। খুব মিনতিও করো না, বেশী চালও দেখিও না।

রাজকুমার—

আচ্ছা। (কিছুদূর গিয়া ফিরিলেন) হাঁ গা, ঘরে শাঁখ আছে ত?

কাত্যায়ণী—

হাসালে! শাঁখ আর শাঁখা, যত গরীবই হোক্, কোন্ বাঙালীর ঘরে না থাকে! মনে ক'রেচ—হারমোনিয়ম, আয়না, কারপেট, সুজনী ওদের কাছে ধার ক'রে আনচি ব'লে—ওছুটো জিনিষও নেই?—হাঁ, আর এক কথা, ওরা এলে খবরদার—খাটে বসিও না। ওপরে চাকন-চোকন এই সুজনী, ভেতরে কিন্তু পেল্লাই খড়—যত রাজ্যের ছেঁড়া তোষক, কাঁথা, চট—বুঝেছ? —আর পুরোণো কাঁথায় কত গণ্ডা যে সূচ বিঁধে আছে তাই বা কে জানে? খবরদার যেন ওখানে বসিয়ো না।

রাজকুমার-

না।—

কাত

আর যদি কোনখানে বাধে—চট ক'রে 'গিন্নি' ডাকচে ব'লে ও ঘরে যেয়ো—আমি সব ঠিক ক'রে দেব। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) দেখো বাবু, এত ক'রে পাখী পড়ানো গোছ পড়ালুম, যেন সব মাটি ক'রো না। (কাত্যায়ণীর প্রস্থান)

রাজকুমার—

মাটি ত করবো না, কিন্তু কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরদোর দেখে ত মনে হয় না এ আমার বাড়ি। বল্লেন, বিছানায় বসিয়ো না, কিন্তু এমন সুন্দর বিছানা—ইচ্ছে ক'রচে (আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া) খানিক গড়াগড়ি দিই।—(সনিঃশ্বাসে) অদৃষ্ট বাবা! গরিব কেরানী,— জুল্ জুল্ ক'রে দেখেই যাই। সকাল থেকে একছিলিম পেটে পড়লো না। (পেট বাজাইয়া) শক্ত মাটি, মোটে চেষ্টাই নেই।—জানি না,—রবিবারের ভোগ কতদিনে টুটবে?— (প্রস্থান)

(বিমল ও ইন্দুর প্রবেশ)

বিমল

আজ রবিবাবুর একখানা নতুন গান তোমায় শিখিয়ে দেব।

ইন্দু—

গান আমি শিখবো না

বিমল—

কেন? গানের ওপর হঠাৎ রাগ হলো কেন?

ইন্দু—

তুমি লেখাপড়া শিখচো কিসের জন্য? পাশ ক'রে টাকা উপায় ক'রবে এই জন্যই ত?—

বিমল—

আমাদের ঘরের ছেলেরা এর বেশী কি আশা ক'রতে পারে?

ইন্দু—

কেবল তোমাদের ঘরের মেয়েরাই আশা ক'রতে পারে—নতুন নতুন গান শিখে—নিত্যি সে-সব গাইবে!

বিমল—

তা' সত্যি, ইন্দু। ক্যাসান আমাদের খেয়েচে। বিয়ের সময় ক'নেকে লেখাপড়া গান ইত্যাদির পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু বিয়ের পর শতকরা নব্বই জনের ভাগ্যে হাঁড়ি-হেঁসেল ঘরকন্না নিয়েই কেটে যায়। গান গাওয়া ত দূরের কথা, শোনবার ফুরসৎ মেলে না।

ইন্দু—

তবু গান শেখা চাই। সেখানে গিয়ে মন যদিই গানের সুরে পাগল হয়—সে পাগলামী সংসারের ঘা' খেয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে। আমাদের কোন জিনিষ প্রাণ দিয়ে শিখতে বারণ; কেন না, প্রাণটাই অন্যের ইচ্ছায় চালনা করতে হয়।

বিমল—

তবু হিন্দুর মেয়ে—

ইন্দু—

হিন্দুর মেয়ে! হিন্দুর মেয়ে! মুখে ওকথা আওড়ালে কি হবে? আমাদের তেমন শিক্ষা তোমরা দিচ্ছ কৈ! গরিব কেরানীর মেয়ে; কিন্তু ঘরখানা চেয়ে দেখ। আমি গান শিখচি; সেলাই, বোনা, চালচলন কোন্‌টা আমার সেকেলে? বাবা যে হাসিমুখে এ সব সইচেন,—তা' নয়। উপায় নেই ব'লেই তিনি স্রোতে গা ঢেলে দিয়েচেন। তোমরা কাজ ক'রতে যেমন প্রাণপণ কর, এ-সবে আমাদেরও তেমনি মরণ পণ! আমরা না ঘরের—না পরের হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি। (কাঁদিয়া ফেলিল)

বিমল—

চুপ কর, ইন্দু। দেখচি, বুঝচি সব, কিন্তু প্রতিকার খুঁজে পাই নে। চোখের সামনে ঘরে আগুন লাগলে—মানুষ যেমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখে, হাত-পা নাড়বার সামর্থ্য থাকে না, —আমাদের হ'য়েচে তাই। আসল কথা কি জান, আমরা সৃষ্টির বড়াই করি, কিন্তু মূল্য যাচাই করি কাঞ্চন কষ্টিতে। গান না-জানা মেয়েদেরও বিয়ে হয়—পণের মোটা দাবী মিটলেই হ'লো।—

(হরেনের প্রবেশ)

হরেন—

বিমল, তোমার আজ কিসের পার্ট! সেক্রেটারী-টেক্রেটারী যা'-হয় হ'য়ো। লেখা-পড়া জান—নেহাৎ চাকর-বাকর ত হ'তে পারবে না। (সুরে) "শেফালী তোমার আঁচলখানি —"

বিমল—

ছোট মামার কি চাকরের পার্ট?

হরেন—

হাঁ ভাই, বাইরে চাকর। দোরগোড়ায় জলের বালতি, গাড়ু, গামছা, সাবান, তোয়ালে নিয়ে হুজুরে হাজির—আবার অন্দরে ঝি। পান-সিগারেট, মিহি গলায়,—'কর্ত্তাবাবু' ডাকছি, বাউচি জয়স্তি। বুঝলে? বাবাজিকে বাবাজী —তরকারীকে তরকারী। তাঁরা আসবেন, মাথা কিনবেন। তারপর হয়ত নাক-মুখ

সি'টকে ব'লবেন, আচ্ছা, বাড়ি গিয়ে খবর দেব। সে খবরের মানে জান ত, বিমল?

(ব্যস্তভাবে কাত্যায়ণীর প্রবেশ)

কাত্যায়ণী—

নাঃ, হরেন, তুই সব মাটি করবি। যা', যা' শীগগির দোরগোড়ায় দাঁড়াগে যা'। (হরেনের প্রস্থান) বিমল, তুমি বাবা বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে নিয়ে এস। —আর খেঁদি, চুলটা বেঁধে ফেল না। ভাল কাপড় পরিয়ে দিই গে আর সময় পাব না। ওরা সব এল ব'লে। (নেপথ্যে আসুন, আসুন ইত্যাদি) ঐ এলো বুঝি? আয়—আয়।—

(সকলের ব্যস্তভাবে প্রস্থান)

(হরেন, প্রাণগোপাল ও ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

হরেন—

আসুন, বসুন। পথে কোন কষ্ট হয় নি ত? বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল?

প্রাণগোপাল—

না বৃষ্টি হয় নি। তোমার বাবু কোথায়?

হরেন—

বাবু এই এলেন ব'লে—আপনারা বসুন। (খাট দেখাইয়া দিল)

ক্ষুদিরাম—

বসবো বই কি—ব'সবো বই কি। (বিছানায় উপবেশন ও চীৎকার করিয়া) উ—হু-হু—! প্যাট ক'রে কি ফুটে গেল? উ—হু-হু— (হাত বুলাইতে বুলাইতে) আলপিন, না সূচ? উ-হু-হু—(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার—

নমস্কার। এই একটু ওদিক গিয়েছিলাম। ওকি? আপনি এমন ক'রচেন কেন?—

ক্ষুদিরাম—

এই বিছানায় ব'সতেই প্যাট ক'রে কি ফুটে গেল। উ-হু-হু—

রাজকুমার—

বোধ হয় ছারপোকা।—গাধা কোথাকার নীচেয় বসাতে পারিস নি?—(ধমক খাইয়া হরেন পলাইল)

ক্ষুদিরাম—

ছারপোকার কি অতবড় হুল হয়? উ-হু-হু—

রাজকুমার—

হয়, হয়। সিমলের সেবার—(প্রাণগোপালের প্রতি) আপনি বসুন। হাঁ, এই নীচেয়—

প্রাণগোপাল—

পাহাড়ে ছারপোকা নেই ত।

রাজকুমার—

না, না—আপনি নির্ভয়ে বসুন। আপনিও বসুন।

ক্ষুদিরাম—

বসচি। উ-হু-হু—(সকলের উপবেশন)

রাজকুমার—

পাহাড়ে ছারপোকাই বটে। হরে—তামাক সেজে নিয়ে আয়। তারপর, কোন কষ্ট হয় নি ত? পথে বোধ হয় বৃষ্টি হ'য়েছিল?

প্রাণগোপাল—

না। তবে ভায়ার চোখে কিছু বৃষ্টির ছাট লেগে আছে। আর কষ্ট? ঐ পাহাড়ে ছারপোকার হুল— কি বল ভায়া?—

ক্ষুদিরাম—

উ-হু-হু-হু। দেখুন রাজকুমারবাবু (উঠিয়া) এদিকে আসুন দিকি—বিছানাটা ভাল ক'রে উল্টে-পাল্টে দেখি, কোথায় সে ব্যাটা পাহাড়ে ছারপোকা? (চাদর উঠাইতে গেলেন)

রাজকুমার—

(সশব্যস্তে বাধা দিয়া) উহু—অমন কাজটি ক'রবেন না। চাদর তুলেছেন কি একেবারে পিল পিল ক'রে ছেয়ে ফেলবে।

ক্ষুদিরাম—

(অন্তরে পিছাইয়া) বলেন কি ? ... থাকেন কি করে ?

রাজকুমার—

(হাসিয়া) কি জানেন, আমাদের একরকম গোষ মেনে গেছে। আসুন, আসুন, নীচেয় বসুন। (ক্ষুদিরামকে জোর করিয়া বসাইলেন)

প্রাণগোপাল—

রাজকুমারবাবুর ঘরটি ছোট, অথচ—জিনিষ পত্র—

রাজকুমার—

—(তাড়াতাড়ি) বুঝলেন না! অথচ গিন্নীর, মেয়ের সখ, নিজের সখ মিটাতে তিনখানি ঘরে ... রণের জায়গা নেই।

প্রাণগোপাল—

তাইত দেখচি! তবে চাকরটা আপনার ...াড়ি—

রাজকুমার—

...ক ব'লেছেন।—ঠাকুরটাও অমনি, অথচ মাইনের বেলা দু'খানি হাতেও কুলোয় না! (দু'টি হাতের দশটি আঙুল দেখাইলেন)

প্রাণগোপাল—

তাড়াও দেখছি মোটা রকম গুণতে হয়।

রাজকুমার—

(ব্যস্ত হইয়া নেপথ্যে চাহিয়া) কিরে, কি —ব'লচিস ? (দ্রুত প্রস্থান)

[আবার পাশে ঝি বেশে হরেনের প্রবেশ ও পান সিগারেট ভর্ত্তি ট্রেখানি দুয়ারগোড়ায় রাখিয়া প্রস্থান]

রাজকুমার—

(প্রবেশ করিয়া) কৈ ঝি বেটি গেল কোথায় ? তাকে যে পান দিয়ে যেতে ... এই ... বেটি এই ... দিয়ে ... লজ্জায় ...ভিতরে আনতে পারেনি। (ট্রে লইয়া সম্মুখে রাখিলেন) আসুন, পান ইচ্ছে করুন। বেটীর লজ্জা দেখলেন ? চিরকালটা এইরকম। বাইরের লোক দেখেচে কি লজ্জাবতী লতা। কৈ আপনি ত কিছু নিলেন না ?—

ক্ষুদিরাম—

নাঃ, একেবারে জলটল খেয়ে—

প্রাণগোপাল—

(রোষ-কটাক্ষে) ক্ষুদিরাম—

ক্ষুদিরাম—

(ঢে'কুর তুলিয়া) জল বিন্দুটি নয়। একেবারে গলায় গলায়—

রাজকুমার—

না না, ও কথা বলবেন না, গরীবের বাড়ী যখন পায়ের ধুলো পড়েছে, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে বই কি ? আমি তখনই বন্দোবস্ত করছি।

প্রাণগোপাল—

সে তখন হবে। আগে মেয়েটীকে নিয়ে আসুন, আসল কাজ বাকী রেখে বাজে কাজে ব্যস্ত হতে হবে না!—

রাজকুমার—

একটু বসুন,—আমি আনচি।—(প্রস্থান)

প্রাণগোপাল—

ক্ষুদিরাম,—এই জন্যই তোমায় আনতে চাই নি; তুমি যেখানে যাবে আগে খাবার খোঁজ ক'রবে। তারপর খাবে এমন গোগ্রাসে যে—

ক্ষুদিরাম

(সদুঃখে) আপনি আমার খাওয়াই দেখেন শুধু! বছর দুই ধরে' ডিসপেপ্সিয়ায় ভুগে ভুগে আমার দেহে আছেই বা কি, খাই বা কতটুকু! রবিবারে শালকের মেয়ে দেখতে গিয়ে, অমনি ... খোকের মধ্যে আটখানা চপ আর

General Wedemeyer also cited reports from Manchuria that "sizable elements of Korean troops are operating with possibly to acquire battle conditioning."

There also was evidence, the report said, that Sovi equipment were being used to groom the North Korean army.

General Wedemeyer's report urged that the United Sta equip, and train a South Korean constabulary force, simil Philippine Scouts." Such a force should be strong enough threat from the north, the report added, and was "necessa forcible establishment of a Communist government after th and Soviet Union withdraw their occupation forces."

The Wedemeyer report also noted South Korea's inabi an economy without external assistance and urged that su

In presenting its conclusions, the 1947 report sai

> "The peaceful aims of freedom-loving peoples jeopardized today by developments as portentous a World War ll.
>
> "The Soviet Union and her satellites give no conciliatory or cooperative attitude in these deve United States is compelled, therefore, to initiat of action in order to create and maintain bulwarks protect United States strategic interests.
>
> "The bulk of the Chinese and Korean peoples to communism and they are not concerned with ideo desire food, shelter, and the opportunity to liv